শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

মাসিক পত্র

পঞ্চম খণ্ড

—০—

দ্বিতীয় ভাগ

(সন ১৩২১ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২১ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত)

ইণ্ডিয়া প্রেস—২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

১। আলোচনা

আনন্দ তত্ত্ব ... ৬০৮
আমাদের অক্ষমতা ... ৭০৬ক
আমাদের মেলা ... ৭৯৫
আয়ুর্ব্বেদীয় ভেলসংহিতার প্রামাণ্য ৬০৬
ইউরোপে গ্রন্থ প্রকাশ ... ৮৮৯
ইউরোপে যুদ্ধ ... ৯৮৫
উপাধি প্রত্যাখ্যান ... ৯৯১
এশিয়ার ঐক্য ... ৯৯৭
ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের স্মৃতিস্তম্ভ ... ৬৯৮
ঐতিহাসিকের সমস্যাস্থল ... ৯৯৯
কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৬৯৩
কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা ... ৬০৫
কাব্যে কাঠিণ্য ধর্ম্ম ... ৭০১
খৃষ্টজগতে হিন্দু প্রভাব ... ৯৯৪
গ্রন্থ ব্যবসায়ে সংরক্ষণ-নীতি ... ৮৯২
গুরুকুলের সৎচেষ্টা ... ৯৯৩
গ্রীসে ও ভারতে ভাববিনিময় ... ১০০০
চরিত্র সংগঠন ... ৭৯৩
চিত্রশিল্পে ভারত ও চীন ... ৯৯১
জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ... ৮৯৯
জাতীয় শিক্ষা ... ৮০২
জাতিভেদের সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎ ১০৮৫
জাপানের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি ৬০৫
দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণ ... ৯৯৬
দিনাজপুরের ঐতিহাসিক পল্লী ... ৯০০
পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যশিল্পের আদর ৭০০
প্যান ইসলাম ... ৮৯৩
প্যানামা খালে ভারত প্রদর্শনী ... ৮৯৬
প্যানামা বিশ্বমেলা ... ৯৯০
প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য ৬৯৮
প্রাচীন জাপানের গণিত চর্চ্চা ... ৯৯৮
প্রাচীন বাঙ্গালীর ভাষা ... ৭০৬
ফরাসীকবি মিষ্ট্রাল ... ৮৯৬
বঙ্গসাহিত্যে দর্শন চর্চ্চা ... ৭০২
বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ... ৭৯৭
বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান ... ৯৯৪
বর্ণাশ্রম ও বিশ্বশক্তি ... ১০৮৩
বর্ত্তমান রাষ্ট্র সমস্যা .. ৯৮৮
বার্গ্‌সোঁতত্ত্ব ... ১০৮৮
বাঙ্গালীর অনাবিষ্কৃত ইতিহাস ... ৭০৬ক
বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি ... ৭০২
বাঙ্গালীর বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন ... ৭০৩
বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্য ... ৭০৬
বিগত বর্ষের দান ... ৫৯৭
বিগত শতাব্দীর ইউরোপ ... ৯৮৬
বিদেশে ভারতবাসীর অবস্থা ... ৬০০
বিলাতের লেখক ও প্রকাশক ... ৮৯০
বিলাত যাত্রা ... ৯০২
বিংশ শতাব্দীর মুসলমান ... ৮৯৪
বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ... ১০৯০
বেহারে শিক্ষা সমস্যা ... ৬৯৬
বৈষ্ণব সমাজের কেদারনাথ ... ৯০৩
ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র-শাসন ... ৬০৪
ভারতের চিত্র-শিল্প ... ১০৯০
মহীশূরে শিল্প শিক্ষা ... ৯৯৬
মহীশূরে বার্ত্তিক সম্মিলনী ... ১০৯৩
যোধপুর জৈন সাহিত্য-সম্মিলন ... ৬০৮
যুদ্ধের ভাবীফল ... ৯৯০
রাজ পিপ্‌লায় নূতন বিদ্যালয় ... ১০৯২
রুশিয়ার সমবায় সমিতি ... ৮০৩
সমাজশক্তির নবীনমূর্ত্তি ... ১০৮৭
সামাজিক সরলতা ... ৬৯৯
সামাজিক সমস্যা ... ৬০৩
সাহিত্য সম্মিলনের প্রস্তাব ... ৬৯৬
সাহিত্যে জনসমাজ ... ৭৯৪
স্থানীয় মিউজিয়ম ... ৮৯৮
স্বাস্থ্যহীনতার হেতু ... ৮০৪
হিন্দুকাব্য সাহিত্যের আদর্শ ... ৭০০
হিন্দু মুসলমান সমিতি ... ৬৯৮
হিন্দুসমাজবিকাশের বিচিত্র উপকরণ ১০৮৭
হিন্দুসমাজে নবশক্তি প্রবেশের পথ ১০৮৬

২। প্রবন্ধ

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন—শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার ৮৪১
অভিব্যক্তির কারণ-নির্ণয়ে ল্যামার্কীয় সিদ্ধান্ত—খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি-এ ... ১১৩৬
ইয়োরোপে ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্র কলা—"স্ত্রীশিক্ষার্থী" ৮৭০
ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ—শশাঙ্কমোহন সেন ৯২০, ১০৪১, ১১৫৫
ইংলণ্ডে ভারতীয় সাহিত্য প্রচার—ব্রজগোপাল দাস ৭৪৭
উনবিংশশতাব্দী—"ইতিহাস" ১১৪৫
একাদশী—রামচন্দ্র লাহিড়ী .. ৬৮১
কপটতা—সত্যবন্ধু দাস ১০৬৭
কৃষি-প্রসঙ্গ—যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ৮২০
খাদ্যে শ্বেতসার—প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩৫
গেটের নাটকশিল্পে অধ্যাত্মবাদ—আদিত্যনাথ মৈত্র ... ... ৯'০
গৃহিণীর কর্ত্তব্য—গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ ১০৬০
দান পত্রাবলী—নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৮২১
দাশরথি রায়—শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় ১১৭১
দুঃখে সুখ—যোগেন্দ্রনাথ বসু ১০১৩
ধূপ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (বর্দ্ধণ) ১১৪৯
নব্য-বিলাতের স্বদেশ-সেবক ১১২১
নগর-বিজ্ঞান এবং অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস্ ১১৬৪
নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর—অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার ৬২৫, ৭২৯, ৮০৯, ৯০৫, ১০০১, ১০৯৯
নাট্য সাহিত্য ও দীনবন্ধু—শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় ৮৫৯
পদার্থের চেতনাচেতন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত—জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন ... ৭৬১
পথ কোথায়?—যোগেন্দ্রনাথ বসু ৮৭৯
পল্লী সংস্কার—শশিভূষণ দাস গুপ্ত ৯৫১
প্রাচীন চীনের শিক্ষাপ্রচারক—বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী ৬৭০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার ও তাহার ক্রমোন্নতি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথদত্ত গুপ্ত ১১১৩
বঙ্গের ঐতিহাসিক—বিনোদবিহারী রায় ... ১০২৮, ১১২৮
বঙ্গে শিক্ষাসমস্যা—প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩৪
বঙ্গ সাহিত্যের অভাব ও অভিযোগ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৮৩
বঙ্গ-সাহিত্যে সেখ সাদি—শ্রীযুক্ত আবদুল করিম ১১৪১
বিলাত যাত্রা—পঞ্চানন তর্করত্ন ৭২১
বৈদিক সাহিত্য—রমেশচন্দ্র সাহিত্য সরস্বতী ৭৫৭
ভারতীয় স্থপতি-শিল্প—(আচার্য্য ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতামত)—মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী বি-এ ৬৭২
ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার—কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা ৮৩১
ভাষা ও জাতি—বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩৯
ময়নামতীর পুঁথি—মোহিনীমোহন দাস ... ৬৪৫, ৭৬৭
মহাকবি ভাস-বিরচিত অবিমারক নাটক—যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যবেদান্ত তীর্থ ... ৭৪০
মানব জাতির বিবর্ত্তন—খগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র ১০১৯

মেদ হ্রাস—প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪৬
যৌথকারবারের বিষয়ে দু' একটা কথা—যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ৯৭১
রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ—নগেন্দ্রনাথ হালদার ৮১৬
রাম চরিত ও সন্ধ্যাকর নন্দী—বিনোদবিহারী রায় ৯৫৯
লৌকিক ধর্ম্ম—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯৪১
শক্তি পূজা—শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় ১০৯৪
শিন্‌টো উৎসব—প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ৮২৫
শূন্ত রহস্য—তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৬৫
সভাপতির অভিভাষণ—(রাজা) কুমুদচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ) ৬:৩
সভাপতির অভিভাষণ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৭০৯
সুন্দরবনের দেবদেবী—অঘোরনাথ বসু কবিশেখর ১০৫০
সুবর্ণবিহার—প্রফুল্লকুমার সরকর ৯৩৬
হস্তীর জীবন-যাত্রা—ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল এম-বি ও ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু বি এস সি, এম-বি ... ৬৬৩,৭৫১
হিন্দু ট্র্যাক্ট—(ঈশ্বর নিজজন) তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৫২

৩। মফঃস্বলের বাণী

অঙ্গারের উপকারিতা ... ৬৮৬
আমাদের স্বাস্থ্য ... ৮৮৬
ইয়োরোপীয় সমর ও আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ... ৭৮৫
উদ্বোধন ... ৭৯১
কন্যাদায় ... ৬৮৬
কাটোয়ায় মুমূর্ষু-আশ্রম ও তৎসংলগ্ন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা ... ৮৮৪
ধূমপানের অপকারিতা ... ৮৮৭
নিরামিষ আহারের উপকারিতা ... ৭৮৭
নিরক্ষর কবি রামুমালী ... ৯৭৮
পল্লী সংস্কার ... ৯৭৪
পুকুরে মাছের চাষ ... ৬৮৭
প্রাথমিক শিক্ষা ... ৯৮০
ব্যবসা ও ধর্ম্ম ... ১০৭৬
ব্যবসায়ীর অত্যাচার ... ১১৮৩
ভারতের হস্ত-শিল্প ... ৬৯১
ভারতে ভলাণ্টিয়ার আন্দোলন ও দেশ সেবা ... ১১৮০
ভাবিবার কথা ... ৭৯০
ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ... ৮৮৫
মালদহের গোঁসাঞী গম্ভীরা ... ৯৭৫
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ... ১০৭৫
স্বদেশীর আবশ্যকতা ... ৭৯২
স্বদেশী গেল কেন ? ... ১০৭৮
সভ্যতায় স্বাস্থ্যহানি ... ১০৭৬

৪। পরিশিষ্ট

জৈমিনীয় উপদেশ সূত্রম ... ৮৯—৪০৪, ১০৫—১১২
জ্যোতিষপ্রসঙ্গ ... ১২১—১৩৪,
মার্কণ্ডেয় পুরাণম ৩৯৭—৪৩৬, ৪৩৭—৪৪৪

আজীবন সাহিত্য-সেবক দার্শনিক

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

"এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই মনুষ্যের সমগ্র জ্ঞান-মন-প্রাণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে—আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে,—'নাই' শব্দই সেখানে নাই।"

"মনে পড়ে সে বালকে ? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রুকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরু ছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতিবিন্দু অনুভব।
* * * * *
* * * * * কত ফিবিলাম,—

কোথা লোক ? প্রাণ যার মুক্ত ? পৃথিবীর
সর্ব্বচাপ পড়ে বক্ষে ? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ জড়জীবে বক্ষে এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
দৃঢ়বাহু—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বক্ষ তুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাশূন্য ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা নহলে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে ?
—জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।"

৺সতীশচন্দ্র রায়

৫ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩২১ | সপ্তম সংখ্যা
৫ম বর্ষ

আলোচনা

১। বিগত বর্ষের দান

বাঙ্গালী জাতির একটি বর্ষ আজ চলিয়া গেল। এই ৩৬৫ দিন ধরিয়া যাহার সহিত বাস করিলাম তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছি তাহা আর একবার স্মরণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিব।

৩৬৫ দিন অতিবাহিত হইয়াছে; সবগুলিরই সমান মূল্য আছে, সব দিনেরই একটা হিসাব নিকাশ লইতে হইবে এমন কথা আমরা বলিতেছি না। সমগ্রভাবে এই বৎসরের মধ্যে আমরা জাতীয় উন্নতির কোন্ দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছি তাহারই আলোচনা করা যাক্। আমরা পূর্ব্বে অনেক-

বার বলিয়াছি এ বৎসরে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এটা জনসাধারণের যুগ। এই যুগে আমরা আবার নূতন আশা নূতন বিশ্বাস লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। নূতন নূতন কার্য্যাবলী দেখিতে পাইব। কথাটা যে কত সত্য তাহা ক্রমশই বুঝিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে দুই তিন বৎসর আমরা খুবই কর্ম্মতৎপর ছিলাম। পরে নানা কারণে সে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইল। আমরা ক্রমশঃ নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিলাম। শিল্প বল, ব্যবসায় বল, শিক্ষা বল, রাজনীতি বল সমস্ত দিকেই আমাদের চেষ্টা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িল। কিন্তু এবার আবার আমাদের মধ্যে যে বিপুল কর্ম্মশক্তি জাগিয়াছে, টাউন হলের বিরাট সভায় তাহার প্রথম পরিচয় আমরা পাই। অবশিষ্ট যে আলস্য-জড়তা ছিল, তাহা দামোদরের বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে আমরা আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আফ্রিকার প্রবাসী নিপীড়িত ভারতবাসীর জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি, নানা সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের জন্য আন্দোলন করিতেছি। আমাদের হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ সমাজ-শক্তিকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া সনাতন ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে এবার সমবেত হইয়াছেন। সমাজের কুপ্রথা-সমূহের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চারিদিকে বিরাট আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে; সে আন্দোলনে সমাজের নেতা হইতে সাধারণ জন-সমাজ পর্য্যন্ত সকলেই যোগদান করিয়াছে। বঙ্গবাসী, এরূপ কর্ম্ম-প্রবণতা গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে দেখিয়াছ কি? ঐ সময়ে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিগঠনের জন্য দেশের নেতারা সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু কেহ সেদিকে এতদিন বিশেষ দৃক্‌পাত করে নাই। তোমরা হয়ত বলিবে, বিগত কয়েক বৎসরে এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই, যাহার ফলে দেশ-বাসীর বিশেষভাবে সাড়া দিবার আবশ্যকতা ছিল। আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব। তুরস্কের যুদ্ধের সময় যখন গত বৎসর মুসলমানেরা স্থানে স্থানে সভা করিয়া আহত সৈনিকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল, তখন কেবলমাত্র কতিপয় নেতা ও শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের ডাকের উত্তর দেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের কর্ম্ম করিবার অনিচ্ছা। যাক্, দূর অতীতের কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। পুনরায় যখন আমাদের আশা ও উৎসাহ ফিরিয়া পাইয়াছি, তখন তাহাই লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হই।

মনে রাখিও, বাঙ্গালী, বিগত বর্ষ তোমাদের জাতীয় জীবনের আর এক শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দিয়াছে। এই বৎসরে তোমরা যেমন বীরোচিত, মনুষ্যোচিত কাজ করিয়াছ তেমনি আবার চারিদিক হইতে যথেষ্ট সম্মানও পাইয়াছ। ডাক্তার রাসবিহারীর দানে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধিত হইল, অপর দিকে বাঙ্গালী জাতির বিশেষতঃ হিন্দুর দানতৎপরতার কথা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অবশ্য এই দানকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান বলিয়া ঘোষণা করিতেছি না। ডাক্তার ঘোষও এই দানের ফলে কম লাভবান হন নাই। তিনি এইজন্য গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের নিকট যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার

তুলনায় ঐ দশ লক্ষ টাকার মূল্য অতি নগণ্য। আর যদি তিনি সম্মান নাও পাইতেন, তবু অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি যে সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতেছেন তাহারই বা তুলনা কোথায়? ইতিপূর্ব্বে দানবীর তারকনাথ, ব্রজেন্দ্রকিশোর ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও যথেষ্ট দান করিয়া আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে দানের অনুকরণ বড় কেহ করেন নাই। কিন্তু রাসবিহারীর দানের পর আমরা শিক্ষার জন্য নানাদিক হইতে আরও দুই হাজার দশ হাজার দানের কথা শুনিতেছি। আমরা এই সকলকে ঐ বিগত শুভ বর্ষেরই দান বলিয়া মনে করি।

তোমাদের জাতীয় সম্মান লাভের আর দুই একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিব। দামোদরপ্লাবনের কালে ছাত্রগণ যে জীবনপণ পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহাতে একদিকে ঐ হতভাগ্য বন্যাপীড়িতগণের হৃদয় যেমন ক্রয় করিয়া রাখিল, অন্যদিকে তেমনি স্বয়ং বড়লাটের নিকট হইতে প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট আদায় করিয়া ছাড়িল। এ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের অনেক কর্ম্মচারী ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রবর্গকে 'হুজুগে', হঠকারী, বিলাসী প্রভৃতি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন, এবার তাঁহাদের মুখ বন্ধ হইয়াছে। ছাত্রগণের এই সম্মান-লাভ তোমাদেরই জাতীয় সম্মান।

তৃতীয় কথা, তোমাদের জগৎপ্রসিদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের সম্মানলাভের কথা। তিনি ধর্ম্মে ব্রাহ্ম হইলেও জাতিতে হিন্দু, তাঁহার শরীরে হিন্দুর রক্ত বিদ্যমান; হিন্দুস্থানের মাটীতে তাঁহার জন্ম; হিন্দুস্থানের মাটীতে তিনি লালিত পালিত। তিনি যে চরম সত্য কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজ জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বিবেচিত হইতেছেন, তাহাই হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ সুতরাং তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাকে তোমরা হিন্দুই মনে করিও। বিগত বর্ষে তিনি যে সম্মানলাভ করিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহাকে গৌরবান্বিত করে নাই; বাঙ্গালী জাতিকেও তাহার অংশভাগী করিয়াছে। তাই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবাসীকে সম্মানিত করিয়াছে বলিলেই সত্য কথা বলা হয়।

পাশ্চাত্যের নিকট আমাদের এই সম্মানলাভ অন্যে কি চক্ষে দেখিবে, জানি না। তবে আমরা দেখিতেছি, ১৯০৫ সাল যে যুগের সূচনা করিয়াছে, ইহা সেই যুগোপযোগী একটি কর্ম্ম মাত্র। এই যুগের শেষভাগে যে অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাইব, ইহা তাহার সূচন মাত্র। আজ রবীন্দ্রনাথের যে সম্মানলাভে তোমরা আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছ, তাহার যোগ্য অধিকারী তোমাদের মধ্যে এখনও বহুল রহিয়াছেন; তোমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে ও সম্মান করিতে চেষ্টা কর। সাবধান, ইঁহারা যেন আবার এ কথা বলিতে সুবিধা না পান, যে "দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগে পৌঁছেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতাবৎকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন ক'রে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মানলাভ করলুম, তা এখনো পর্য্যন্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলী দিয়েছিলুম, তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন সে কথা আমি জানতুম

না।”—ইঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ ইঁহাদের ন্যায় পাশ্চাত্যকে জয় করিয়া—তাহার উপর প্রাচ্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করা; প্রাচ্যের ভাবে প্রতীচ্যকে বিভোর করিয়া তোলা। তোমরা ভারতের অধিবাসী; সুতরাং তোমরা ইচ্ছা করিলেই তাহা পারিবে।

এখন চিন্তা ও ভাব জগত ছাড়িয়া শিক্ষা-ও সাহিত্যের দিক ছাড়িয়া শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি কর্ম্মজগতে প্রবেশ করা যাক্। এদিকে আমাদের দেশবাসী ভাবী গৌরবযুগ-গঠনোপযোগী কোন কর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত আরম্ভ করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত বিভাগে আমাদের উপযুক্ত কর্ম্মীরও একান্ত অভাব। চাকরীগতপ্রাণ বাঙ্গালী জাতি সংসারের দায়ে পড়িয়া ভবিষ্যৎ দেখিতে পারে না। প্রথমে একটু স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে এই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়াদিতে লাভবান হওয়া যায় না; কাজ আরম্ভ করিতেও মূলধনের প্রয়োজন। সুতরাং আমরাও প্রথম হইতে অন্য পথে মনোনিবেশ করি। ইদানীং শিল্প-কৃষির উন্নতির জন্য কতকগুলি প্রচেষ্টা চলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অবস্থা আমাদের আশানুরূপ নহে। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী মহাশয়ের ন্যায় শত শত কর্ম্মীর আবির্ভাব না হইলে শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভের আশা সুদূর-পরাহত। বিদেশে যাঁহারা শিল্পাদি শিক্ষার্থ যাত্রা করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাকরী গ্রহণ না করিয়া যদি স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য সামান্য মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন, তাহাই দেশের প্রকৃত মঙ্গলের কারণ হইবে। কয়েক বৎসর হইতে দেশীয় ছাত্রগণের বিদেশ-যাত্রা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। গত বৎসরে এই বিদেশ যাত্রিগণের সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী। ইহা আমাদের আশার কথা। বঙ্গের অধিবাসী, এই প্রসঙ্গে তোমাদিগকে কয়েকটী কথা স্মরণ করাইয়া দি। তোমরা খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিষয়ে ভারতের শীর্ষস্থানে ছিলে। তোমাদের সেই যুগের ইতিহাস এখন বিস্মৃতির গহ্বরে লুক্কায়িত; কিন্তু তাহার নিদর্শন এখনও লুপ্ত হয় নাই। স্মরণ রাখিও, তোমরা সেই শিল্পগুরু বিট্‌পাল ও ধীমানের উত্তরাধিকারী; তোমরা সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পাল-রাজগণের উত্তরাধিকারী। তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ সুমিত্রা, যবদ্বীপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিত। আর আজ কোথায় তোমরা? কিন্তু আমরা বলি, তোমরা হতাশ হইও না। এখন পুনরায় তোমাদের বংশে মার্টিন কোম্পানির কর্ত্তা স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিপোড্রোম সার্কাসের স্বত্বাধিকারী ও চালক কৃষ্ণলাল বসাক, চিত্র-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্ম্মসমবায়ের ধুরন্ধর অম্বিকাচরণ উকীল প্রভৃতি লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন। তাই নৈরাশ্য আনিও না, পরন্তু জীবনব্যাপিনী সাধনায় প্রবৃত্ত হও। আগে চরিত্র গঠন কর।

২। বিদেশে ভারতবাসীর অবস্থা

আমরা গৃহস্থের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি ভারতের বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়া আছে, তাহার অনেক স্থানে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ব্যবসায়াদি উপলক্ষে বাস করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স প্রভৃতি স্থানসমূহ ইঁহাদের

প্রধান উপনিবেশ। সম্প্রতি এই উপনিবেশ সকলের অধিকাংশেই ভারতবাসীকে লইয়া যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত, তাহা আফ্রিকার ব্যাপার হইতে সকলেই বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। অদ্য আমরা এই জাতীয় আর কয়েকটী সংবাদ আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি।

কানাডার কথা

কানাডা উত্তর-আমেরিকায় ব্রিটিশের একটী উপনিবেশ। এসিয়ার নানা দেশ হইতে বহুলোক ব্যবসায়, কৃষি প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া এই রাজ্যে যাইয়া বসবাস করিতেছে। ১৯০৬।১৯০৭ সাল হইতে এই সমস্ত ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল যে কানাডার অধিবাসীরা তাহাতে একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কানাডাকে বিশুদ্ধ শ্বেতজাতির দেশ করিয়া রাখিতে অভিলাষী। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রাচ্য জাতির ঐ দেশে উপনিবেশ-স্থাপনের একান্ত অপক্ষপাতী হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ফলে স্থির হইল আর কোন প্রাচ্য জাতিকে কানাডায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। চীন ঔপনিবেশিক-দিগের Head tax-নামক কর বাড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে কানাডার বিশেষ কিছু লাভ হইল না, কারণ সেন্সস্ রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি বৎসর যে সমস্ত লোক চীন হইতে আসে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম নহে। জাপান গবর্ণ-মেণ্ট কানাডার সহিত মীমাংসা করিয়া লইলেন যে, তাঁহাদের যাত্রীর সংখ্যা প্রতি বৎসরে ৫০০এর অধিক হইবে না। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য তাই তাহার সহিত এরূপ কোন সন্ধি হইল না। বিশেষতঃ তাহারাই কানাডায় শেষে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং আইনের চাপ তাহাদের উপরই বেশী পড়িল। তবুও ভারতবাসী ইংরাজ-রাজের প্রজা বলিয়া তাহাদের প্রবেশাধিকারের একটা পৃথক্ আইন ছিল। কিন্তু কানাডা গবর্ণমেণ্ট আর এক অদ্ভুত আইন জারি করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রাচ্য জাতি তাঁহাদের দেশ হইতে জাহাজে উঠিয়া অন্য কোন স্থলে না অবতরণ করিয়া সোজাসুজি যদি কানাডায় উপস্থিত হন, তবে তাঁহাদিগকে নামিতে দেওয়া হইবে কি না বিচার করা যাইবে। এই আইনে প্রকারান্তরে ভারতবাসীকেই সেখানে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে; কারণ ভারতবর্ষের কোন স্থানে কানাডার টিকেট পাওয়া যায় না। আমাদিগকে ইংলণ্ড জাপান হইয়া যাইতে হয়। আমরা ভারত-বাসী এই আইন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কানাডা শ্বেতাঙ্গদের দেশ থাক্ তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই; কিন্তু যখন অন্য জাতি সেখানে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পায় তখন আমাদের জন্য এ আইন কেন? কানাডার উপর তাহাদের অপেক্ষা কি আমাদের দাবী অধিক নয়? যদি সেখান হইতে সকলেই বিতাড়িত হইত তবে আমাদের ততটা ক্ষোভের কারণ ছিল না। ভারতবাসী দুর্ব্বল, তাই কি তাহার প্রতি এত অত্যাচার?

এখন সে দেশের আর কয়েকটা পাশবিক অত্যাচারের কথা বলি। বিগত অক্টোবর মাসের ১৭ই তারিখে ৫৬ জন হিন্দু কানাডায় উপস্থিত হয়। তাহাদের ১৭ জনকে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ৩৯ জনকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই সমস্ত যাত্রীর প্রায় সকলেই কোথাও না নামিয়া

কানাডায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু উপনিবেশ-বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ ঐ আইনের নানা ভিন্ন অর্থ দেখাইয়া তাঁহাদিগের অনেককে বন্দী করেন, অবশিষ্ট কতকগুলির প্রত্যেকের নিকটে ছয়শত ছাব্বিশ টাকা না পাওয়ার দরুণ তাহাদিগকেও আবদ্ধ রাখা হয়। এই আবদ্ধাবস্থায় তাহাদিগকে ধর্ম্মের অনুমোদিত অখাদ্য ভোজন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের দেশের কোন লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতেও পায় নাই। অপরদিকে কারাগারে তাহারা জাপানী, চীনা প্রভৃতি জাতিগণ কর্তৃক যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই যে, ভগবান সিং নামক জনৈক পুরোহিতকে ১৫ই অক্টোবর তারিখে বলপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। তিনি ৫ মাস যাবৎ সেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না। হঠাৎ একদিন শুনা গেল তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে, কারণ তিনি সেখানে রাজবিদ্রোহ-সূচক বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু সেখানকার কেহই সে কথা বিশ্বাস করেন না। যাই হোক তাঁহাকে জোর করিয়া নির্ব্বাসিত করা হইল।

যে সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় তাঁহাদের মধ্যেও আবার কানাডার কর্ত্তারা শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। একটা আইন আছে স্ত্রীলোক লইয়া কোন ঔপনিবেশিক কানাডায় বাস করিতে পাইবেন না; কিন্তু কেহ কেহ যে এরূপ করিতেছেন সে দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সুতরাং বলিতে হয়—ইহার নাম অন্তরঙ্গ বাছাই।

নিউজিল্যাণ্ডের কথা

টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, নিউজিল্যাণ্ডেও হিন্দুর প্রবেশ অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তথাকার গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই হিন্দু অথবা অন্য কোন এসিয়াবাসীর প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিবেন। হিন্দুরা শুধু দা'ল ভাত খাইয়া থাকে, তাহাদের সহিত ব্যবসা-সংগ্রামে জয়লাভ করা সহজ নহে। সেইজন্য নিউজিল্যাণ্ডবাসী এবং ইউরোপীয়-দিগের স্বার্থের পক্ষে তাহারা নিতান্তই চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজা। তাই তাহাদের প্রতিকূলে হঠাৎ কোন বিধি প্রণয়ন করা বড়ই কঠিন। ওদিকে আবার চীনবাসীরা ফলের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে, এবং হয়ত শীঘ্রই আবার অন্য কোন ব্যবসায় হাত দিবে। অতএব দেখা যাইতেছে এই সমস্ত এসিয়াবাসীদিগকে বিতাড়িত না করিতে পারিলে নিউজিল্যাণ্ডের কিছুতেই মঙ্গল নাই।

পূর্ব্ব আফ্রিকার কথা

পূর্ব্ব আফ্রিকা ব্রিটিশের অধীন একটী রাজ্য। ইহা তাহার উপনিবেশ নহে। ভারতবাসীরা সর্ব্বপ্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এখানে সভ্যতার আলোক বিস্তার করে। বহুপরে ইউরোপীয় ও এসিয়ার অন্যান্য দেশবাসী এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব আফ্রিকার ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়গণের মনে ভেদবুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারাও এসিয়াবাসীকে তাহার স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প। সম্প্রতি উপনিবেশ-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হারকোর্টের নিকট তাহারা ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-নির্ব্বাচন-প্রথা রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট

কর্ত্তৃক মনোনয়ন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য একটি দরখাস্ত করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, কেবল এসিয়ার ঔপনিবেশিকগণের জন্য এই নির্ব্বাচন প্রথা রহিত হইল, তাহাদিগের পক্ষ হইতে গভর্ণর দুই একজন ইউরোপীয় বে-সরকারী ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। যে ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় জাতি এসিয়ার নামে নাসা কুঞ্চিত করে, যাহারা কোন দিন এসিয়ার হাবভাব, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সহিত বিন্দুমাত্র পরিচিত নহে, তাহারা নামে মাত্র প্রতিনিধি সাজিয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবে এবং হিতে বিপরীত ঘটাইবে। কিন্তু এসিয়াবাসী সংখ্যায় সেখানে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা অনেক বেশী হইলেও ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিল না।

ভারতবাসী এই তোমাদের সম্মান! জগতের চক্ষে তোমরা কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তোমরা মানুষ না হইলে আর এ কলঙ্ক ঘুচিবে না। তোমরা পুনরায় মানুষ হও, বিশ্ববাসীকে বুঝাইয়া দাও, ব্যর্থ কীটজীবন যাপন করিবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ কর নাই।

দেখ, তোমাদের জন্য বিদেশের লোকও কাঁদিতেছে; আফ্রিকায় তোমাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য ইংলণ্ডের কর্ম্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন। কানাডায়ও বহু ইংরাজ তোমাদের সাহায্য করিতেছেন। সেখানকার বিচারক গভর্ণমেণ্টের আদেশ আইন বিরুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসামীদিগের ৩৪ জনকে মুক্তি দিলেন। আর তোমরা তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পার না! ইহা কি কম দুঃখের কথা?

* *
*

৩। সামাজিক সমস্যা

বিবাহের পণপ্রথা রহিত করিবার জন্য দেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে ব্যক্তিগত ভাবে সমাজের কাহারও যে কিছু কিঞ্চিৎ উপকার না হইবে, এরূপ কথা আমাদের মনে হয় না। তবে সাধারণ ভাবে উপকারের আশা বড় কম। আবেগের বশে, উচ্ছ্বাসের তাড়নায় অনেকেই সৎপথে প্রধাবিত হন। কিন্তু সে সাময়িক। অবস্থাটা প্রকৃত ভাবে তলাইয়া মজাইয়া দেখিবার অবসর যখন আসে, তখন মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

এই পণপ্রথা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসে সমাজে ইহার প্রবর্ত্তন হইল কেন? তদুত্তরে মনে হয়, খেয়ালের বশে ইহা কেহ প্রবর্ত্তিত করেন নাই। আর্থিক দুরবস্থা বা লোভই ইহার কারণ। তবে একজন যে কারণেই হৌক কোন একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলেই অন্য লোকে সেই দৃষ্টান্তেরই সুবিধা লইয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে সেই প্রথাটাই প্রচলিত হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই যে আর্থিক দুরবস্থা, এই যে ধনের প্রতি অনাবশ্যক লোভ, এ সকলের মূলীভূত কারণ আমাদের ধর্ম্মহীনতা। আমাদের দেশ হইতে ত্যাগের শিক্ষা বৈরাগ্যের আদর্শ অন্তর্হিত প্রায়। তাই ধনকে আমরা তুচ্ছ করিতে পারি না—দৈন্যকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হই।

অতএব যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আর্থিক দুরবস্থার অপনোদন না হইতেছে, ধর্ম্ম-জীবন গঠন করিবার আয়োজন না হইতেছে, ততদিন পণপ্রথা রহিত করিলেও, অর্থ-শোষণের অন্য কোন উপায় অচিরেই সমাজ উদ্ভাবিত করিয়া লইবে।

যাহা হৌক, পণপ্রথা বন্ধ করিবার আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা আমাদের খুবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নেতারা ইহার মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে, এবম্বিধ আন্দোলনের যে বিশেষ কোন মূল্য নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

*
* *

৪। ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র-শাসন

ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গের প্রতি বহু বিদেশীরই বড় একটা শ্রদ্ধা নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই সব রাজারা স্বৈরশাসক এবং অমিতাচারী। এই মিথ্যা ধারণা অপনোদন-কল্পে "রাজপুত হেরল্ডে" একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।—

ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির শাসনপদ্ধতি নিতান্তই গণতন্ত্রমূলক। সামান্য একটা ষ্টেটের রাজারও প্রজাদের উপর স্বেচ্ছাচার-প্রসূত কর্তৃত্ব দেখা যায় না। প্রজাসাধারণের সহিত পরিচিত মন্ত্রী এবং পারিষদবর্গই তাঁহার পরামর্শদাতা। বিশেষতঃ মন্ত্রিত্ব বংশানুগত হওয়ায় তাঁহাদের সহিত লোকের আন্তরিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সেই জন্য তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের গৌরব সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন, ধনরক্ষকের মত প্রজাদের মঙ্গল তাঁহাদিগকে অহোরহ রক্ষা করিতে হয়, প্রজাদের মনের কথা তাঁহাদের মুখ দিয়াই বাহির হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে রাজা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্যস্থলে তাঁহারা দণ্ডায়মান। এই সব লোকের নাম ঘরে ঘরে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। স্যর সলর জঙ্গ, স্যর মাধব রাও প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কর্ম্ম-প্রণালী অবগত হইলেই বুঝা যায়, তাঁহাদের চালিত রাজ্যগুলির অবস্থা একেবারেই অনুন্নত নহে। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, গোন্দাল, হায়দারাবাদ এবং বড়োদার শাসনপ্রণালী ব্রিটিশ শাসনের সহিত তুলিত হইতে পারে, এমন কি কোন কোন অংশে তাঁহাদের শাসন বেশী উন্নত বলিয়াই বোধ হইবে। সাবেক ধরণের রাজ্যগুলি যথা উদয়পুর, কাশ্মীর, জয়পুর, যোধপুর এবং বিকানীর, ইহাদেরও শাসন সম্বন্ধে একটা বিশেষ রকমের প্রসিদ্ধি আছে। সর্ব্বস্থলেই কতকগুলি শিক্ষিত, দায়িত্ববোধবিশিষ্ট এবং শক্তিমান কর্ম্মচারীর হস্তেই শাসনভার ন্যস্ত। বলা বাহুল্য তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাবিধিই পালন করিয়া থাকেন।

স্বাধীন রাজাদিগকে অমিতাচার বলা হয়, কিন্তু তাহাও সত্য নহে। তাঁহাদের রাজ্যে নানাদিক হইতেই উন্নতির জন্য অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। তাহা হইতেই বুঝা যায়, প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজকোষ কতখানি মুক্ত। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটাকে আর একটু স্পষ্ট করা যাক।

গোন্দাল ষ্টেটে নানাবিধ সংস্কার ও উন্নতি-জনক প্রতিষ্ঠান নিতান্তই বিস্ময়কর। মহানুভব ঠাকুর সাহেব প্রজাদের শিক্ষা ও সুবিধার জন্য একেবারেই পশ্চাৎপদ নহেন। স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা এবং শাসন বিষয়ে তিনি যেরূপ মঙ্গলকর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সেরূপ উপায় ব্রিটিশ-শাসিত বহু জেলায়ই এখনও অবলম্বিত হয় নাই।

বিকানীর ষ্টেটের জেলের ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিদেশীরাও সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার শাসক স্যর গঙ্গাসিং জী একজন আদর্শ পুরুষ। তাঁহার শাসন-ক্ষমতা সর্ব্বজনবিদিত।

মহীশূর এবং বড়োদার বিষয় সকলেই জানেন। এমন কি আমেরিকা ও ইউ-রোপের দৃষ্টিও এই দুইটি রাজ্যের শাসন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। মহীশূরের শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, আইন সমিতি, বড়োদার বিচার-পদ্ধতি, শিক্ষা সংস্কার, গ্রন্থশালা, কলাভবন প্রভৃতি অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় এই রাজ্য গুলি উন্নতির দিকে কত অগ্রসর।

ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দারিদ্র্য-নিবারণ কল্পে এখানে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাতে ষ্টেটের বহু অর্থ ব্যয়িত হয়।

কোচিনের অবস্থাও মন্দ নহে। প্রজা-দিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফল কথা, বড়ই হৌক, ছোটই হৌক সব ষ্টেটেই উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। এবং সব ষ্টেটই প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র, সচ্চরিত্র, শিক্ষিত রাজনীতিবিদ্ মন্ত্রীদিগের সাহায্যে পরিচালিত।

*
* *

৫। জাপানের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি

আমরা গত অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, "এত উচ্চ সম্মান-লাভ অন্য কোন এসিয়া-বাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই—এমন কি জাপানেরও এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দুর্ল্লভ যশঃ প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই।" কিন্তু বৎসর যাইতে না যাইতেই আমাদের কথার পরিবর্ত্তন করিতে হইল। আমরা দেখিলাম জাপানও নোবেলপ্রাইজ পাইলেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় প্রাচ্য প্রভাব পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

জাপানে যিনি ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার নেগুচি। তিনি একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। নেগুচি পূর্ব্বে কখনই ভাবিতে পারেন নাই তাঁহাকে চিকিৎসা ব্যবসা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার হস্তে একবার অস্ত্র চিকিৎসা করা হয়. তাহার ফলে তিনি রোগ মুক্ত হন। সেই অবধি ডাক্তারী শিখিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ জন্মে। তিনি নিজের চেষ্টায় বহুদূর অগ্রসর হন। তারপর কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে চলিয়া যান। রকফেলার ইনষ্টিটিউটে তাঁহাকে সহকারী রূপে গ্রহণ করা হয়। সেই খানে তিনি সর্প বিস সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। তাহাতেই প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরে তিনি তথায় কিছুদিন অধ্যাপকের কাজ করেন। বীজতত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহার গত দুই বৎসরের আবিষ্কারগুলি বৈজ্ঞানিক জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বহু মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

এসিয়ার দুইটি সন্তান,—একজন আধ্যাত্মিক অপর এক জন বৈষয়িক উভয় জগতেই পাশ্চাত্যজাতিকে বিমুগ্ধ করিল। ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পক্ষে ইহার মূল্য বড় বেশী।

*
* *

৬। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা

গত অক্টোবর মাসের ১লা তারিখে কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা-গৃহে সভার বিংশ অধি-বেশন হইয়া গিয়াছে। বারানসীর কমিশনার মিঃ ই, এ, মোল্যোনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের বাৎসরিক বিবরণ হইতে সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ১৪০টী জেলা হইতে বহুলোক এই সভার সভ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৬৪৩। যে সকল খ্যাতনামা মহোদয়গণ সভা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সারজেম্স্ মেষ্টন, ভারতসভার সদস্য সার কে জি, গুপ্ত এবং ছাত্তারের মহারাজা-ধিরাজের পরিদর্শন উল্লেখ যোগ্য। সভার বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, রেওয়া, গোয়ালিয়র, বিকানীর, বরোদা, ছাত্তারপুর,

আলোয়ার এবং বেনারস প্রভৃতি স্থানের রাজা মহারাজগণ ইহার পৃষ্টপোষক এবং ইহার উদ্দেশ্য ও আশা পূরণের জন্য তাঁহারা সভাকে প্রতিপদে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

সভার কার্য্যাবলীর মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে ৩৪৫ খানা হস্তলিখিত পুরাতন হিন্দীগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান বিভাগের কার্য্যাবলী বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামবিহারী মিশ্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছে। সভার তিনটী কার্য্যের সম্পাদন ব্যতীত হিন্দী ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্য "পৃথ্বীরাজ রাসো" সম্পাদিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বাবু রাধাকৃষ্ণ দাসের জীবনী এবং রাজা সার টি, মাধব রাওর "মাইনর হিণ্টস্" প্রবন্ধও মুদ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি কার্য্যাবলীর মধ্যে খণ্ডাকারে মুদ্রিত হিন্দী অভিধান ব্যতীত ডেন্সবুর মেটাফিজিক্স (Metaphysics) এবং প্রাচ্য দর্শন হিন্দীতে অনূদিত হইতেছে। শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সভার অধীনে সাধারণের সহানুভূতিতে একটী লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যহ সেখানে অনেক পাঠক আসিয়া থাকেন।

পাঠাগারে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দেওয়া হয়। সভা হইতে পণ্ডিত রামচন্দ্র সুকুলাকে, বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের জীবনী রচনার জন্য একটী রৌপ্য পদক দেওয়া হইয়াছে। লালা সন্তরাম গোয়েল হিন্দী ভাষা ও নাগরী অক্ষরের উন্নতি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ এবং পণ্ডিত শ্রীলাল উপাধ্যায় পারিবারিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সভা তাঁহাদের উভয়কেই এক একটি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন।"

৭। আয়ুর্ব্বেদীয় ভেলসংহিতার প্রামাণ্য

প্রধানতঃ আয়ুর্ব্বেদ দুইটি শাখায় বিভক্ত। সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিয়া যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, যথা রক্তপিত্ত, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি, তাহাদের চিকিৎসাপ্রণালী যে শাখায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার নাম কায়চিকিৎসা। অন্য শাখার নাম অস্ত্রচিকিৎসা। প্রথম শাখার প্রতিষ্ঠাতা আত্রেয় মুনি। দ্বিতীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা রাজর্ষি ধন্বন্তরি। ভেল আত্রেয় মুনির অন্যতম শিষ্য। তাঁহার প্রণীত তন্ত্রখানির নাম 'ভেলসংহিতা'। এই পুস্তকখানা খুব অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুদ্রিত হয় নাই। তেলেগু অক্ষরে লিখিত মূল পুস্তকখানা তাঞ্জোর প্যালেস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈদ্য যাদবজী ত্রিকুমজী আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার একখানি দেবনাগর অক্ষরে প্রতিলিপি করান হয়। সেই প্রতিলিপিখানি চিকিৎসাধুরন্ধর কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম্, এস বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাই দেখিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল, সি মহাশয় 'সাহিত্য সংহিতায়' ভেল সম্বন্ধে এক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বর্ত্তমান বঙ্গপ্রচলিত চরকসংহিতা অগ্নিবেশসংহিতার চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং দৃঢ়বল কর্ত্তৃক সম্পূরিত পুস্তক। অপর সংহিতাগুলি কেবল সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়া তাহাদের প্রাচীনতা এবং বর্ত্তমান লুপ্ততার সাক্ষ্য দিতেছে। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে যাঁহারা উদ্ধরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সময়ে হয়ত উহাদের কয়েকখানি বর্ত্তমান ছিল। বার্ণেল ভেলসংহিতায় গান্ধার এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া গ্রন্থকারকে তদ্দেশবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ভেলসংহিতা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুদ্রিত হয় নাই। উহার সম্বন্ধে সংগ্রহকারগণ ও টীকাকারগণ অনেক সময়ে হীনমত প্রকাশ করিলেও সময়ে সময়ে নিজ পুস্তকের মধ্যে উহাকে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতে বিরত হন নাই। যথা বাগভট :—

ঋষি প্রণীতে প্রীতিশ্চেৎ মুক্‌ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যা কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাৎ গ্রাহ্যং
সুভাষিতম্।

বাগ্‌ভটের এই উক্তিতে বুঝা যায় যে তাঁহার সময়ে চরক সুশ্রুতের পাঠনা প্রবল হইয়াছিল এবং ভেলাদি বোধ হয় পঠিত হইত না। তিনি এই কথা উল্লেখ করিয়াই বলিতেছেন যে যাহা সুভাষিত তাহাই গ্রাহ্য। ঋষি প্রণীত বলিয়াই যদি আদর করিতে হইত তাহা হইলে ভেলাদি গ্রন্থ কেহ পরিত্যাগ করিতেন না এবং চরক সুশ্রুতের পাঠনা পরিত্যক্ত হইত। এই উক্তিতে ভেল সেই সময়ে লুপ্ত হয় নাই, তবে মরণোন্মুখ তাহা বুঝা যায়। হর্ণলে (Hoernle) সাহেব বলিয়াছেন যে বাগ্‌ভট প্রধানতঃ ভেলসংহিতার অনেক বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন বাগ্‌ভটের এই উক্তির সহিত হর্ণলে সাহেবের মন্তব্যের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। আমরা বলি তাহা নহে। বাগ্‌ভটের গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে বড়খানি আমাদের দেখা নাই এবং কোন্ পুস্তক উহার পূর্ববর্তী গ্রন্থাদির নিকট কতদূর ঋণী তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হয় না; সুতরাং কোন্ গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ববর্ত্তী লেখকগণের গ্রন্থ হইতে কোন্ কোন্ অংশ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা আলোচনা না করিয়া তিনি উহাদের নিকট কতদূর ঋণী তাহা বলা যায় না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে বাগ্‌ভট চরক সুশ্রুত হইতে প্রভূত পরিমাণে উদ্ধরণ করিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আর আমার বোধ হয় যখন মূল ভেলসংহিতা মুদ্রিত হইবে তখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিলে ভেল এবং চরকাদি উভয় পুস্তকের অনেক শ্লোক একই দেখান যাইতে পারিবে। এখনকার চরক সুশ্রুতের মধ্যে অনেক শ্লোক সমান দেখা যায়। এইরূপ স্থলে কোন্‌টি প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া উঠে। যেমন মূল সুশ্রুত চরকের অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, বর্ত্তমান চরকসংহিতাই প্রচলিত সুশ্রুতের অপেক্ষা প্রাচীনতর। এতদবস্থায় বার্ণেল সাহেবের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া যদি ধরা যা[illegible] বাগ্‌ভট্ট ভেল হইতে কোন স্থান উদ্ধা[illegible]ছেন, তাহা হইলেই নিশ্চিত হইবে যে [illegible] স্থান হইতে বাগ্‌ভটের মতে গ্রাহ্য বা [illegible] হইতে পারে। আর এক কথা, বাগ্‌[illegible] উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে বোধ হয় [illegible]। প্রচলিত চরক ও সুশ্রুত [illegible] পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক দেশ ও কালানুযায়ী [illegible] সংস্কৃত ও তন্ত্রান্তরের সাহায্যে [illegible] হওয়াতে তাহাদের মূল্য মূলসংহিতা [illegible] যে অধিক হইবে তাহাতে বিচিত্র [illegible] বোধ হয় এই কারণেই ভেলাদি [illegible] গ্রন্থাদির পঠনার লোপের সূত্রপাত [illegible] একেবারে সমস্ত বর্ত্তমান গ্রন্থ [illegible] হইতে তাহা হইলে লোকে কেন [illegible] অন্যান্য অসংস্কৃত মূল পুস্তক [illegible] গ্রহণ করিবে? আর এক কথা, [illegible] বোধ হয় ভেলাদি [illegible] সুগৃহীত হইয়াছে। কারণ [illegible] যে তাহার সময়ে যে চরক [illegible] সুশ্রুত অগ্নিবেশ তন্ত্রের চিকিৎসা [illegible] অধ্যায় পর্য্যন্ত পাওয়া [illegible] চিকিৎসার বাকী [illegible] কল্প ও সিদ্ধি স্থানদ্বয় [illegible] এক্ষণে যদি ভেলসংহিতা [illegible] করিয়া পরীক্ষা করা যায় তবে [illegible] করা যাইতে পারিবে যে [illegible] অনেক সাহায্য [illegible] উহারা যে একই সম্প্রদায়ের [illegible] পুস্তক তাহা আমি প্রমাণ করিবার [illegible] করিব। অনেক স্থলে অধ্যায়ের [illegible] এবং প্রতিপাদ্য বস্তুও এক। [illegible] ক্রমেরও সামঞ্জস্য আছে।

ভেলসংহিতার [illegible] আকাঙ্ক্ষৎকরত্ব প্রমাণের জন্য শ্রীযুক্ত [illegible] সেন মহাশয় তদীয় পুস্তকে ডল্‌হন হইতে আর একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, [illegible] 'ইদানীং ভেলভালুকি পুষ্কলাবতাদীনামল্প তন্ত্রাবদাং মতেন বিষম জ্বরোৎপাত্তিম[illegible]' ইত্যাদি। এস্থলেও যখন প্রয়োজনীয় বলিয়া উদ্ধার করিতেছেন, তখন আবার তাহার উপর গ্রন্থের মূল্যের লাঘবকারী টিপ্পনীও সংযোজন করা উচিত বলিয়া

মনে করি না। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে এরূপ অভ্যাস বিরল নহে। * * যেমন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মহামহোপাধ্যায় শূলপাণিকে যেখানে আক্রোশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার মত অগ্রাহ্য, তিনি অর্ব্বাচীন ইত্যাদি বলিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় শব্দের উল্লেখ করেন নাই; আবার যেখানে তাঁহার মত আপনার সহিত মিলিয়া গিয়াছে, সে স্থলে মহাসমাদর করিয়া মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির উক্তি বলিয়া তাহা যত্ন পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং প্রাসঙ্গিক মতামতের প্রতি লক্ষ্য করিবার কথা আমার মনে বিশেষ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক গ্রন্থকারের (শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন) সম্মতিক্রমে প্রত্যক্ষ শারীরের ভূমিকা হইতে বিজয় রক্ষিত এবং শিবদাস কর্ত্তৃক ভেলের উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি নিম্নে লিখিত হইল। উহাতে ভেলের মূল্য পাঠকগণ স্থির করিবেন। বিজয় রক্ষিত জ্বরাধিকার নিদান টীকায় লিখিয়াছেন—

"ভেলেহপি পৈত্তিকঃ পঠ্যতে—
আমাশয়স্থঃ পবনো হৃস্মিমজ্জগতোহপি বা।
কুপিতঃ কোপয়ত্যাশু শ্লেষ্মাণং পিত্তমেন চ॥"

শিবদাস ও চক্রসংগ্রহের নিম্নলিখিত শ্লোক ভেলের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং বৃহতীদ্বয়ম্।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহম্॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যখন বাগ্‌ভট, শিবদাস, বিজয় রক্ষিত, বৃন্দ ও চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতির পুস্তকে ভেলের গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন ভেল নিশ্চয়ই অপ্রামাণ্য নহেন, পরন্তু সংহিতাকারগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিশেষ সম্মানের পাত্র।"

*
* *

৮। যোধপুরে জৈন সাহিত্য-সম্মিলন

বিগত মার্চ্চ মাসে যোধপুরে জৈন সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। জৈনগণের ব্যবসাক্ষেত্রে নিপুণতা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে একনিষ্ঠা ভারতে সুবিদিত। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতের অন্যান্য জাতির ন্যায় জাতীয়জীবনের সর্ব্বতোমুখীন্ জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সাহিত্য-সম্মিলন তাহার অন্যতম লক্ষণ সভায় ছয় হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

এই সম্মিলনী নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন।

(১) বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী জৈন গ্রন্থের প্রণয়ন।

(২) বিভিন্নভাষায় জৈন গ্রন্থের অনুবাদ।

(৩) জৈন সাহিত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা।

(৪) জৈন যাদুঘর নির্ম্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহ।

(৫) একটী স্থায়ী সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা।

যাদুঘর নির্ম্মাণের জন্য সভাস্থলেই ২০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৯। আনন্দ-তত্ত্ব

মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য আনন্দ। কিন্তু বাহ্যজগতের কোন কিছু বিষয় আমাদিগকে তাহা দিতে পারে না। তাই আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মধ্যে তাহার সন্ধান করিতে হয়। সেই সন্ধানের নামই সাধনা বা ধ্যান। তাহার ফলেই আমাদের তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। সেই চক্ষুই দেখিতে পায়—আনন্দই নিখিল জগতের জীবনস্পন্দন। এই আনন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"ভিখারী ভিক্ষা পেয়ে আশীর্ব্বাদ করে গেল 'আনন্দে রহো'; মহাপুরুষগণের মুখনিঃসৃত উপদেশও এই "আনন্দে রহো"। এরূপ স্বল্পাক্ষরে জীবনের লক্ষ্য নির্দ্দেশ আর কি হতে পারে? মণি মুক্তা লয়ে মালা গাঁথার ন্যায়, সূত্রকারে এইরূপ কতকগুলি সারতত্ত্ব সংগ্রহ করে, হৃদয়ের জন্য একটা জপমালা রচনায় সমর্থ হলে কত না সুখের হয়। এইরূপ জপমালার একটি মণি বা বীজ

হইতেছে অদ্যকার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমালোচ্য "আনন্দে রহো।"।

ভাবের গুণে বা খেয়ালের বশে, অনেক ভাল জিনিসও মন্দ এবং মন্দ জিনিসও ভাল হয়ে দাঁড়ায়। "আনন্দে রহো" উপদেশ-বাণীরও সেই দশা ঘটেছে। "খনির তিমির-গর্ভে লুক্কায়িত মণি," দেখিলেও সহসা চেনা যায় না, উহাকে মাজিয়া ঘসিয়া উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলেই উহার কত গুণ ও কি দাম ধরা পড়ে।

"যাবজ্জীবেৎ সুখী ভবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ," চার্ব্বাক ঋষির মুখের এ কথাটা সেই কোন্ সুপ্রাচীন যুগে প্রচারিত হয়েছিল; শুনেই সকলে শিহরে উঠা সত্ত্বেও এবং উহাকে ভুলে যাবার জন্য শত উপদেশ দিয়ে এবং শত আয়াস পেয়েও জনস্মৃতি হইতে উহা লুপ্ত হয় নাই কেন? নিশ্চয় জানিও, কথাটি সাধারণতঃ যত হেয় ও অসত্য বলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাই না কেন, উহার ভিতরেও সার সত্য আছে। শত বাধা সত্ত্বেও উহার এতদিন তিষ্ঠিয়া থাকাই তাহার প্রমাণ। য়ুরোপে প্রাচীনকালে এপিকিউরিয়ান্ দর্শন নামে একটা জীবনাদর্শ প্রচারিত হয়েছিল এবং সবিশেষ আলোচনান্তে অনেকে উহা জীবনাদর্শ বলে গ্রহণও করেছিলেন, ইঁহারা সকলেই যে ঘোরতর অধার্ম্মিক ছিলেন মনে করা অহমিকার ফল মাত্র। সত্য বটে কালবশে এপিকিউরিয়ান্ দর্শনের কদর্থটাই লোকে ভাবিতে শিখিল এবং চার্ব্বাকের সেই প্রসিদ্ধ বাণীর ন্যায় এপিকিউরিয়ান দর্শনের সমাদরও লুপ্তপ্রায় হইল।

সত্য কিন্তু চাপিয়া রাখিবার নহে। ঐ চার্ব্বাক ও এপিকিউরিয়ান্ দর্শনের ভাবের প্রতিধ্বনি লয়ে বাঙ্গলার সাধারণ নর-নারীর মুখে গীতাংশ এখনও শ্রুত হয় "হেসে খেলে লওরে যাদু মনের সুখে" ইত্যাদি। এই ধরণের কথা সব আমরা যখন শুনি, কখন কি ভেবে দেখি, শ্রদ্ধার দৃষ্টি লয়ে আলোচনা করিলে উহাদের ভিতর কত দার্শনিক সত্যের আভাস পাওয়া যায়—ভাবরাজ্যে উহারা কিরূপ অমূল্য রত্ন?

জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়—ইংরাজিতে এক দলকে পেসিমিষ্ট্ বা দুঃখতন্ত্রী এবং অপর দলকে অপ্‌টিমিষ্ট্ বা সুখতন্ত্রী বলে। এক দলের দৃষ্টিতে জগতের যাবতীয় বিষয়ই ঘোর দুঃখময় ও পরিত্যজ্য বিবেচিত এবং অপরের চোখে সেইরূপ জগতের তাবদ্ব্যাপারই সুখপ্রদ ও আনন্দের নিকেতন রূপে প্রতিভাত হয়। এই আপাত বিরোধী দুটা দলের কিন্তু একটা সন্ধিস্থল আছে, সেটা হচ্ছে—"আনন্দে রহো।" উভয়েরই এখানে একমত, উভয়েরই উদ্দেশ্য দুঃখ-মুক্তি, উভয়ে একই লক্ষ্য সাধনে সচেষ্ট; সুতরাং পরস্পরের বস্তুতঃ বিরোধী নহেন। প্রস্থান ভেদ দেখেই সহসা উভয়দলকে পরস্পরের বিরোধী বলে ভ্রম হয়। দুই ভায়ে যেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত, কেহ একদিকে কেহ বা অন্য দিকে এই মাত্র প্রভেদ। এক দল দুন্দুভিনাদ সহকারে এই সুখসংলেজ বার্ত্তা ঘোষণা করছেন, 'ভাইরে আর ভয় নাই, দুঃখ-জয়ের সন্ধান পেয়েছি। বিষয়ের সহিত সংযোগ হইতেই সুখ-দুঃখ আসে, কোন উপায়ে এই বিষয়বন্ধন ছিন্ন করে, এই দ্বৈতজ্ঞানটা উড়িয়ে দিয়ে, আপনাতে আপনি অবস্থিত হও। পরের সোণা কানে দিয়ে আর সুন্দর সাজতে যেও না, সর্ব্বমাত্মবশং সুখং সর্ব্বংপরবশং দুঃখম্। সুখ-দুঃখ উভয়েরই মূল এই দ্বৈতজ্ঞান বা বিষয়ের হাত এড়িয়ে নির্দ্বন্দ্ব হও, পরমানন্দে বিরাজ করিবে। ইহাই পরম যোগ, পরম তপস্যা, পরম পুরুষার্থ দুখের অত্যন্ত নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পথ। আর একদলও সেইরূপ মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে অভয়বাণী প্রচার করছেন, "মাভৈঃ কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের ভয়? মায়া পিশাচীর প্রলোভনে ভুলে না গিয়ে প্রকৃত দ্বৈতভাবে মজে যাও, যিনি মায়াতীত বিকার-রহিত, তাঁহার সহিত সংযোগ দৃঢ় হতে দৃঢ়তর কর, তিনিই তোমার নিজ হতে নিজ জন। এইটি কর না বলেই আনন্দসাগরে অবস্থিত রহিয়াও আনন্দলাভে বঞ্চিত হও। "ভাইরে, যে জিনিস সদাই দুলিতেছে তাতে বসে স্থির থাকিবার চেষ্টা পাগলের কর্ম্ম। এ জগতের সবই দুলিতেছে, একমাত্র কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্থির। অতএব স্থির হইতে হইলে,

সেই নিত্যস্থির পদার্থটিকে আশ্রয় কর। তাকে ছাড়িয়া ধন-জন-যৌবন কিছুতেই শান্তি পাইবে না। কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণনামকে ছাড়িও না, সুখে থাকিবে।" (পাগল হরনাথ, ৩য় খণ্ড, ১০ম পত্র)।

"বাবার কোলে চেপে দেখলে, রাজা দেখলে, দেবতা দেখলেও যেমন নির্ভয়ে আনন্দ অনুভব করিব, ভূত দেখিলেও তেমনই ভয়শূন্য হইব। তখন আমার কিছুতেই ভয় হবে না। এখানে সকলই আনন্দের জন্য হইয়াছে, তবে যে আমরা ভয় পাই তার মানে আমরা বাবার নৈকট্য ভুলে যাই, তাই শিব দেখে সুখ পাই, আর শিবের সঙ্গী ভূত-প্রেত দেখে ভয় পাই। বাবাকে মনে রাখিলে এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বই নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্ত নাই, বেশ বুঝিতে পারা যায়।" (পাগল হরনাথ ৪র্থ খণ্ড ৮৪শ পত্র)।

এই আনন্দে রহিবার জন্য একদল নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দেন, আর একদল বলেন, "খেলিতেই আসিয়াছি, চিরদিন খেলিব, বুড়ী ছুঁয়ে জড় হয়ে থাকিবার বাসনা যেন কখন না হয়, চিরদিন এই ভবে আসিব, খেলা দেখাইয়া আমার প্রাণবল্লভকে আনন্দ দিব। ভবে আসিতে ভয় পাইও না, ভ্রমেও মুক্তি চাহিও না, যারা নিতান্ত দুর্ব্বল বা রুগ্ন তারাই খেলা ছেড়ে জড়বৎ থাকিতে ইচ্ছা করে।" (পাগল হরনাথ ৪র্থ খণ্ড ১০৮ম পত্র)।

ফলে সকল দলেরই সার কথা হচ্ছে "আনন্দে রহো।" সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও দেখিলাম, আনন্দে রহিবার উভয় দল সম্মতত। আর একটি সঙ্কেত হইতেছে— জাগতিক ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়া। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে নিত্যানন্দলাভের সম্ভাবনা অল্পই।

মায়ার বন্ধন কাটান আর নিষ্ঠুর হওয়া এক কথা নহে। ভগবান্ বামা ক্ষেপা বলিতেন যার মায়া নাই সে ত রাক্ষস; মায়ার অধীন না হওয়ার নামই প্রকৃত মায়াতীত হওয়া। দুঃখে পড়িলে অত্যন্ত কাতর এবং সুখের দিনে যদি মদমত্ত হও তা হলে তুমি মায়াধীন। ভোগের ভিতর ত্যাগের ভাব রেখে জীবন-যাপন করাতে দোষাবহ নহে। এইরূপ অনাসক্তভাবে জীবন-যাপন-চেষ্টা যদি আমাদের সফল হয়, তাহা মাত্র আনন্দ লাভে আমরা সমর্থ হইব। পার্থিব আনন্দও ভোগ করিব, পারমার্থিক আনন্দলাভেও বঞ্চিত হব না। থিয়েটার দেখে বা ভাল কোন কাব্য-উপন্যাস পড়ে যখন আমরা বিমুগ্ধ হই, আমরা তখন মনে জ্ঞানে জানি সবই কল্পনার খেলা, তথাপি মাঝ থেকে ঐ আনন্দটুকুই আমাদের উপরি লাভ এবং এ লাভ ছাড়িব কেন?

মনে হতে পারে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে গেলে কর্ম্মে যত্ন হবে না, তাচ্ছিল্য আসিবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী যাঁরা তাঁদের কর্ম্ম এরূপ নহে। জড় বৈজ্ঞানিক ঠিক যোগীর ন্যায়ই একমনে প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে সমীক্ষ ও পরীক্ষা লয়ে ব্যস্ত থাকেন। বিদ্বান্ এইরূপ সারা জীবন বিদ্যানুশীলনতৎপর। ইঁহাদের সকল চেষ্টা সব সময় সফল হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া কি ইঁহারা নিরুদ্যম হন, না কর্ম্ম করে সুখ পান না? Oh let me perish but let my cause live—আমি যাই ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার কর্ম্ম যেন সফল হয়। এইরূপ ষোল আনা সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর নিজের ফল-ভোগ-কামনা নাই বলিলেই হয়। কর্ম্ম করে যে একটা আনন্দ আছে, সেই আনন্দের আকর্ষণেই এই শ্রেণীর লোক কর্ম্মরত রহেন। এইরূপ সকাম নিষ্কাম উভয়-ভাব-মিশ্রিত কর্ম্মও নিষ্কাম কর্ম্ম নামেই অভিধেয়। মনের মত কাজে রত রহিলে চেষ্টা সফল হউক বা বিফল হউক একটা আনন্দ ভোগ হয়। ইংরাজিতে যাহাকে ennui বলে—কোন কাজেই মন না যাওয়া, মনের মত কিছু খুঁজে না পাওয়া, তার তুল্য মহাকষ্ট আর নাই। নিষ্কাম পুরুষ তাঁহার মনোমত বলিয়াই অদ্বৈতভাবে অবস্থানে আনন্দ পান, আবার সকাম ভক্তও তাঁহার মনোমত সুন্দরের সহিত সংযুক্ত হইয়া আনন্দে বিরাজ করেন। এ ভাবে দেখিলে সকলেই গৌর-নিতায়ের উপাসক; যিনি নিত্য গৌরাঙ্গ বা পরমসুন্দর, তিনিই সেই নিতাই গৌর কিম্বা যিনি পরমসুন্দর ও নিত্য

আনন্দ যাঁর সহচর তিনিই সেই গৌর-নিতাই। কেহ সগুণ কেহ নির্গুণ ভাবে এই গৌর-নিতায়ের উপাসনায় রত। তিনিই সেই কৃষ্ণ যিনি আমাদিগকে আকর্ষণ ও আমাদের কর্ষণ বা উন্নতি সাধন করছেন। পরম সুন্দর জ্ঞানে যাঁহার অভিমুখে আমরা আকৃষ্ট হই এবং উহাতে উন্নতি হইল বলিয়া অনুভব করি, আনন্দও পাই, অধোগতি হইল বলিয়া অনুতপ্ত হই না বা দুঃখ বোধ করি না। জগতের যাবতীয় সুন্দর বিষয়ই এই পরম সুন্দরের অংশ বা বিভূতি স্বরূপ এবং দর্শনশক্তি বিকশিত হলে এ জগতে অসুন্দর কিছু আর অনুভূত হয় না। তখন যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা এক সচ্চিদানন্দ ব্যতীত আর সমস্তেরই প্রকৃত অস্তিত্বাভাব বুঝিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য ইহা সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক ভাব। "সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।' তুমি সৌম্যা, সৌমতরা, অশেষসৌম্য হইতেও অতি সুন্দরী এবং সকলের শ্রেষ্ঠা সেই পরমেশ্বরী। শৈব ইঁহাকেই সত্যং শিবং সুন্দরম্, বৈষ্ণব ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা গৌর নিতাই, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ও এইরূপ নানা নামে অভিহিত করেন। সকলের নিকটই তিনি মনের মত সুন্দর। জীবনে এই মনের মত সুন্দর বস্তুটির নির্ণয় ও তাহাকে পাইবার জন্য জীবনোৎসর্গ, আনন্দে রহিবার প্রধান উপায়।

অভীষ্ট লাভে যেমন আনন্দ হয়, ত্যাগের আনন্দ তার চেয়ে কিছু কম নহে বরং যেন বেশী বেশী বলেই মনে হয়। বাহ্য, প্রস্রাব প্রভৃতি শারীরিক ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে অধ্যাত্মরাজ্যেও তত্ত্বানুসন্ধান কর বুঝিবে পাইবার আনন্দের তুলনায় ত্যাগের আনন্দও কিছুতেই কম নহে। আগে পাওয়া তারপর ত্যাগ, সুতরাং ত্যাগী, পাইবার আনন্দ যে কি অবগত আছেন এবং উহা সত্বেও যখন ত্যাগে উদ্যত তখন বলিতে হইবে বৈ কি ত্যাগের আনন্দ পাইবার আনন্দ অপেক্ষাও অধিক। অনেক বিষয় পাইবার আগে কল্পনা যতটা আনন্দদায়ক বিবেচিত হইত, পাইবার পর আর তাহা মনে হয় না। কর্ম্মসমাপ্তির পর কর্ম্মত্যাগের অবস্থাতেই শান্তি ও আনন্দের উদয় হয়। সুখং স্বপাপ পিঙ্গলা" পিঙ্গলা বেশ্যা আশা ছেড়ে দিবার পর সুখে ঘুমাল। ত্যাগের মাহাত্ম্য ও ত্যাগের আনন্দ বুঝাইবার জন্য অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক।

ত্যাগটা স্বেচ্ছায় না হলে সুখকর হয় না। প্রেম উপজিলে স্বেচ্ছায় ত্যাগের শক্তি আসে, গার্হস্থ্য জীবনে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটা পুরাতন গীতাংশ শুন।

আমি রসিকের স্থানে পেয়েছি সন্ধান
তোমার নাকি আছে সখি প্রেমের সন্ধান?
আমি জানি নাকো তাই সুধাই তোমারে
সখিরে! তুমি এস বল দেখি মোরে,
কেন [illegible] মহাদেব যোগী
প্রহ্লাদ [illegible] কিসের তরে।

আমাদের প্রেম নাই, তাই আমরা দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রেমপূর্ণ ত্যাগের আনন্দ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তা হউক, প্রেমের ফলে যে আনন্দ ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। আনন্দ এইরূপ ত্যাগ ও প্রেমে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রেম বাড়লে সমগ্র জগৎই প্রেমের পাত্র হয়ে দাড়ায়, বসুধৈব কুটুম্বকম্ মনে হয়। জগতের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি জন্য যাঁরা জীবনোৎসর্গ করেছেন তাঁদের আনন্দের তুলনা নাই। কারণ তাঁহাদের প্রেম যেমন অধিক, আনন্দও সেই পরিমাণে অধিক। জগতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ আমি; সমষ্টি দুঃখনিমগ্ন রহিলে আমার সুখ-সম্ভাবনা কোথায়? হয়ত ক্ষণস্থায়ী একটু সুখ পাই। নিত্য সুখের সম্ভাবনা ঘটিলে অন্যকে দুঃখে ফেলে রেখে নিজে নিশ্চিন্ত মনে সুখ-ভোগে অনেকের স্পৃহা হয় না।

আনন্দটা বিতরণে বৃদ্ধি পায়। বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি যেমন "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" আনন্দও সেইরূপ। সঙ্গী না পেলে, সুখ যেন জমাট বাঁধে না। দেখ নাই কি, শ্রেয়ের সন্ধান না পেয়ে প্রেয়ের জন্য পাপ-স্রোতে যাহারা গা ভাসাইয়াছে তাহারা

অবধি কেমন আনন্দ বৃদ্ধি জন্য অপরকে নিজদলে টেনে লইতে যায়। সুখ-দুঃখে অংশী মিলিলে সুখ বাড়ে দুঃখ কমে। আনন্দ বিতরণ, আনন্দে রহিবার একটা সঙ্কেত।

আনন্দলাভের একটি উপায় হচ্ছে, প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়ের অনুসরণ। যাহার প্রথমে সুখ শেষে দুঃখ তাহার নাম প্রেয়ঃ, আর যাহার শেষ ফল সুখ তাহাই শ্রেয়ঃ। প্রথমে দুঃখদায়ক হলেও শ্রেয়ের অনুসরণ করাই আনন্দকামীর সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। রন্ধন-ক্লেশ থাকিলেও আহারের জন্য কষ্ট স্বীকারে কে কবে পরাঙ্মুখ হন?

অনুরূপ যুক্তি দেখাইয়াই প্রেয়ের অনুসরণ-কারী শ্রেয়ঃকে ত্যাগ করিতে কখন কখন সাহসী হন। কাঁটা ফুটিবার ভয় আছে বলে কি মাছ খাওয়ায় বিরত থাকি? 'সধবার একাদশী'র নিমে দত্তও একদিন অনুরূপ যুক্তি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত করেছিল, লিভার পাকিবার ভয়ে কি মদ ছেড়ে দিতে হবে? তবে আর মেডিকাল সায়ান্স কি জন্য? পাপের কুফল নাশ করে পাপের আনন্দ উপভোগ জন্য একদল নিয়ত চেষ্টিত।

এইরূপে চেষ্টা হইতে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' প্রভৃতি কথার সৃষ্টি। যাঁহারা শ্রেয়ের অনুসরণতৎপর এই শ্রেণীর কথা শুনিলে তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে শিহরিয়া উঠিবার বা ঐরূপ পথভ্রান্ত পাপীদিগকে ঘৃণা করিবার কিছু নাই। ভিতরের প্রকৃত কথা কি? আনন্দের সন্ধানে সবাই ঘুরিতেছে এবং আনন্দময়ই সকলকে পরিচালিত করছেন। অভিমান-ভরে এ তত্ত্ব ভুলে গিয়ে অপরকে অবজ্ঞা করিতে আমরা সাহসী হই মাত্র। একবার সাহায্যে ভেবে দেখ, বুঝিবে এ জগতে পাপী কেহই নাই, থাকিতে পারে না। সবাই আনন্দের সন্ধানে ঘুরিতেছে এবং নিজ নিজ শক্তি-বুদ্ধির অনুরূপ আনন্দেই অবস্থিত আছে। বিষ্ঠার কৃমিকীট অবধি আনন্দবঞ্চিত নহে। ঘোর নিরানন্দের মাঝেও আনন্দবোধ প্রচ্ছন্ন থাকে। মৃত্যুকামী কাঠুরিয়ার সমীপাগত যমরাজকে কাঠ তুলে দিতে বলার গল্পটা স্মরণ কর। অনেক স্থলে আনন্দবোধের তারতম্যটাই সুখদুঃখ নামে অভিহিত হয়। যাহার যে পরিমাণ শক্তিস্ফূর্ত্তি সে সেই পরিমাণে আনন্দের আস্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়। উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতররূপে পরমানন্দের সহিত মিলন সংঘটন করে দেওয়াই পুরুষো-ত্তমগণের কার্য্য এবং ইহাই ধর্ম্মের একটা প্রধান লক্ষণ। ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু আনন্দের পরিমাণে ও আনন্দ লাভের উপায়ে।

কর্ত্তৃত্বাভিমানই যত অনিষ্টের মূল। দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী উভয়েই এখানে একমত। সেই আনন্দময়ের চরণে আপনাকে বিসর্জ্জন দাও। 'নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতিং পরমেশ্বরঃ' অথবা 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।' কিম্বা অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হও। কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতে পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

ভয় উদ্বেগ ত্যাগ করে আনন্দময়ের চরণে শরণ লও। আনন্দের অনুসন্ধানই জীবনের ব্রত কর। কেহ দেখে শিখে, কেহ বা ঠেকে শিখে। পাপ কি পুণ্য কি আপনিই বুঝিবে, কালে সব ঠিক হয়ে যাবে। যারা শুধু দণ্ডের ভয়েই সাধু, প্রকৃত সাধু হতে এখনও তাদের বহু বিলম্ব। সার কথাটি ভুল না—সেটি হচ্ছে "আনন্দে রহ।"

সভাপতির অভিভাষণ *

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
বেদাধীনা জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণা দেবতাঃ॥

অদ্য যে মহদুদ্দেশ্যে আমরা পূতসলিলা-জাহ্নবী-তটস্থিত মহাপীঠ ৺কালীঘাটে সমবেত হইয়াছি, তাহা বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিবস বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। ৺কালীঘাট ভারতবিখ্যাত মহাতীর্থ; ইহার পবিত্র রজঃস্পর্শে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন পবিত্র হইলেন। ব্রহ্মণ্যদেব ইহার উপর অমোঘ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

আমি ব্রাহ্মণসন্তান এবং "ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ" এই আশ্বাস-বাণীর উপর নির্ভর করিয়াই নিতান্ত অক্ষমতাসত্ত্বেও মহা-সম্মিলনের সভাপতিত্ব ভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছি। সমবেত ভূদেব ব্রাহ্মণবর্গকে সবিনয় নমস্কার জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমি বিষম দায়িত্বপূর্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলাম; আমার ধৃষ্টতা আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন, ব্রহ্মণ্যদেবের আশীর্ব্বাদে এবং আপনাদের সহায়তায় ও ৺মহামায়ার কৃপায় কৃত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইব।

অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখিতে পাই যে, এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যখনই কোনও জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা বা নির্দ্ধারণ প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই উদারহৃদয়, লোক-হিতৈষণা-প্রণোদিত, পরম কারুণিক ঋষিসম্প্রদায়, জনকোলাহল ও অশান্তিপূর্ণ লোকালয় হইতে সুদূরস্থিত শান্তরসাস্পদ, পবিত্র নৈমিষারণ্য প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে সমবেত হইয়া অতি ধীর ভাবে ও সমাহিত চিত্তে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় সমাজের চিরক্রমাগত প্রথা। অদ্যকার এই সম্মিলনও সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই, নৈমিষারণ্য প্রভৃতির ন্যায় নির্জ্জন স্থানে না হউক, অন্ততঃ অতি পবিত্র পীঠস্থানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছেন; ভরসা করি, তাঁহারাও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের ন্যায় সংযত ভাবে, কোন সম্প্রদায় বা জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত বা অপ্রিয় বচন-পরম্পরা প্রয়োগ না করিয়া, আলোচ্য বিষয়গুলির যথাযথ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করতঃ ব্রাহ্মণত্বের গৌরব রক্ষা করিবেন। তাহা হইলেই এই মহাসম্মিলনের সদভিপ্রায়-সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইবে। নতুবা ইহা নিরর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। নানাবিধ প্রতিকূল কারণে এবং কালচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে ভারতীয় অতি প্রাচীন ও পবিত্র হিন্দুসমাজ কিছু বিপর্য্যস্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে; অত্রাবস্থায় সমাজকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সুপথে পরিচালিত করিতে না পারিলে ইহা বিপদসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ সংকীর্ণ বর্ত্মে প্রধাবিত হইয়া ঘোর বিপন্ন হইবে; হইবেই বা বলি কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে

* কালিঘাট ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত।

হইতেছেও তাহাই। এই ভাবে সমাজ চলিতে আরম্ভ করিলে ইহা অচিরাৎ বিলয়-দশা প্রাপ্ত হইবে এবং হিন্দুনামও চিরতরে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে। হিন্দুসমাজের উপর দিয়া বহু প্রবল ঝঞ্ঝাবাত এবং ভীষণ বন্যার স্রোত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা এ পর্য্যন্তও একেবারে অতলজলধিগর্ভে নিমজ্জিত হয় নাই; নানা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও হিন্দুজাতি সম্যক্ প্রকারে না হউক, কথঞ্চিৎ প্রকারেও তাঁহার বৈশিষ্ট ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কোন্ মহাশক্তি প্রভাবে এবং কি সুদৃঢ় অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়াতে হিন্দুসমাজ আজও একেবারে বিলয়দশা প্রাপ্ত হয় নাই এবং হিন্দুজাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড কোন্‌টী, তাহা চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই অভিনিবেশ সহকারে চিন্তনীয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদুর ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় **ধর্ম্ম** ও **সমাজ-শক্তিই** হিন্দুসমাজের প্রাণ এবং **বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই** ইহার মেরুদণ্ড। **বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম** ও **সমাজশক্তি** এবং **ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস** অক্ষুণ্ণ থাকিলে কিছুতেই হিন্দুসমাজ নষ্ট হইতে পারিবে না; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা বর্ত্তমানকালে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আত্মহারা হইয়াছি, তাহাতেই আমাদের নানা দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম-রক্ষার ভার রাজার বা রাজশক্তির উপর ন্যস্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণ তাহার নিয়ামক, চালক ও উপদেষ্টা ছিলেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন *"রাজ্ঞশ্চ বর্ণাশ্রমপালনং যৎ। স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ॥"* বর্ত্তমান কালে আমরা যে রাজার শাসনাধীনে আছি, তিনি বৈদেশিক হইলেও আমাদের ধর্ম্ম বা সমাজের উপর কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না; ইহা রাজপুরুষদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও সমীচীনতারই পরিচায়ক। অতএব সমাজ-শক্তির অপ-ব্যবহার হইয়া থাকিলে বা ধর্ম্মকার্য্যে অবহেলা সমাজে প্রাবল্য লাভ করিয়া থাকিলে আমরাই তজ্জন্য দায়ী। ব্রাহ্মণ ভারতীয় হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইহা ভারতের চিরপ্রচলিত বাক্য। সেই ব্রাহ্মণ যদি বিপথগামী বা আত্মহারা এবং আচারভ্রষ্ট হইয়া থাকেন তবে সমগ্র সমাজ তৎপথবর্ত্তী হইবেই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকেন ইতর ব্যক্তি তদনুসরণই করিয়া থাকে এবং তিনি যাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেন, লোক তাঁহারই অনুকরণ করে।

"**ব্রাহ্মণ**" সমাজের উত্তমাঙ্গস্বরূপ, উত্তমাঙ্গ বিকৃত হইলে মানবদেহ যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়, সমাজ-দেহের উত্তমাঙ্গ অপ্রকৃতিস্থ হইলেও সমগ্র সমাজই তদ্রূপ বিপর্য্যস্ত হয়; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে উত্তমাঙ্গ প্রকৃতিস্থ এবং সুস্থ রাখা কর্ত্তব্য। অতীত-কালে ব্রাহ্মণ যে গুণে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, সেই গুণ হইতে চ্যুত হইলে তিনি আর *সম্মানার্হ বা গৌরবান্বিত* হইবার আশা করিতে পারেন না। জন্মগত ব্রাহ্মণ্য ও গুণগত ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণ মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে *বিভক্ত হইতে পারেন। এই মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব* লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে

"তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্" যাঁহারকেবলমাত্র জন্মগত ও সংস্কারগত ব্রাহ্মণ্য আছে তাঁহাকেই গৌণ ব্রাহ্মণ বলা যায়। জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব, জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কার দ্বারা পরিস্ফুট ও নির্ম্মল হয়। যাহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কারহীন ও আচারভ্রষ্ট হইলে সমাজে মুখ্য ব্রাহ্মণত্বের সম্মান-লাভের অধিকারী হইতে পারেন না, ইহা অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে—

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।
যদ্যপ্যধীতং সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।"

ভগবান্ মনু বলিতেছেন :—

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥"

সদাচারবিহীন হইলে ষড়ঙ্গবেদ পাঠদ্বারাও ব্রাহ্মণগণ পবিত্র হইতে পারেন না; অতএব সদাচার অবশ্য পালনীয়। চিত্তশুদ্ধি সদাচারের উপরই নির্ভর করে এবং সদাচার ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রভৃতি বিচারসাপেক্ষ।

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥
অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রাঞ্জিঘাংসতি॥
আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবিদ্ দ্বিজঃ॥"

(মনু)

শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে :—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥"

প্রসঙ্গাধীন এখানে বক্তব্য এই যে, অধুনা *পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশেরই ধারণা* এই যে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। এই মত কতটা বিচারসহ তাহা চিন্তনীয়। অন্নের বিকারই প্রাণ, প্রাণের সূক্ষ্মাবস্থা মন, মনের সূক্ষ্মাবস্থা আত্মা; অতএব চিত্তশুদ্ধি যে আহার শুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তৎপক্ষে তর্কদ্বারা মীমাংসায় উপনীত হওয়া একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি না হইলে মানুষের ধর্ম্মভাব উন্মেষিত হইতে পারে না, অতএব আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ আছে কি? এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা আহার করিবার জন্য জীবন ধারণ করি না, পরন্তু জীবন ধারণ করার জন্যই আহার করি। যে আহারে পাশবিক প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয় তাহা মানুষের পক্ষে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। আহার-বিহারের সংযম না থাকিলে কখনও মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না; প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে কখনও মনুষ্য জীবনে সুখী হইতে পারে না। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদং।
ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যং বিদুর্বুধাঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন ক্ষীয়তে রোগসন্ততিঃ।
সন্মতির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
ইহামুত্র সুখং যস্মাৎ তদেবার্চ্চ্যং প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ্ গরলং যথা॥"

যে আহার্য্য দ্রব্য দেহের শান্তিজনক, চিত্তের প্রফুল্লতাকারক ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপক তাহাকেই *পণ্ডিতগণ সুপথ্য বলিয়া থাকেন।* যাহা দ্বারা ইহকালে সুখ এবং পরলোকে শান্তি লাভ করা যায়, তাহাকে সুপথ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি অন্যপ্রকার আহার বিষবৎ *ত্যাগ করিবেন।* আহার্য্য দ্রব্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-ভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা

হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতায় কথিত হইয়াছে :—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥"

আহার-ভেদে মানুষের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ সম্বন্ধে তারতম্য হইয়া থাকে। ইতর প্রাণিগণও প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীনে আহার সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকে। "মানুষের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের প্রয়োজন নাই,"—এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার হইতে পারে না, অতএব ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার সম্বন্ধে ঋষিদের যোগজ্ঞান-লব্ধ, শাস্ত্রানুমোদিত মতই গ্রাহ্য হওয়া সমীচীন। সাময়িক পরিবর্ত্তনানুসারে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয় করিতে হইলে গীতোক্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা করাই শ্রেয়ঃ। বর্ত্তমান কালে অন্নবিচার প্রায় রহিত হওয়ার উপক্রম দেখা যাইতেছে, ইহার ফল যে শুভ হইবে তাহা আমার মনে হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ও কালধর্ম্মে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারের শিথিলতা হইলেও এ বিষয়ে সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক ;—

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥"

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ আমি ইহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিও। ব্রাহ্মণাদি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) চতুর্ব্বর্ণ সত্ত্ব, সত্ত্বরজঃ, রজস্তম ও তমোগুণের প্রাধান্যজাত। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতির গুণ হইতেই কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হয়। এই গুণ ও কর্ম্ম স্বাভাবিক, মানুষের ইহাতে স্বাধীনতা নাই। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যমত)। এই প্রকৃতির প্রেরণাতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। কর্ম্মকে শাস্ত্রে "স্বভাবজ" বলা হইয়াছে, তদ্ যথা :—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষি-গো-রক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

উপরোক্ত শ্লোকগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, জাতি বা বর্ণভেদ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জগতের সমগ্র মানব-সমাজেই কোন না কোন প্রকার জাতি বা শ্রেণী-ভেদ আছেই। ভারতের বর্ণ বা জাতি-ভেদের বৈশিষ্ট এই যে, এখানে ইচ্ছা করিলেই কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইতে পারে না। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে, জন্মজন্মান্তরে জাত্যন্তর সংঘটিত হইতে পারে। হিন্দু জন্মান্তরবাদী, অতএব তিনি যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে দুঃখিত হইতে পারেন না। আমাদের বর্ত্তমান পূর্ব্বজীবন পূর্ব্বজন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের সমষ্টিমাত্র,

অতএব জন্মান্তরীণ সুকৃতি-দুষ্কৃতিই আমাদের ইহজীবনের সুখ-দুঃখের কারণ বা নিয়ামক। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক মহাত্মারই ধারণা এই যে, জাতি বা বর্ণভেদই, ভারত-বর্ষের সর্ব্ববিধ অনিষ্টের মূলীভূত কারণ এবং তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম ও আচারনিষ্ঠতার শত বন্ধনেই সমাজ বিকল ও মৃতকল্প হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন তাঁহাদের এই মতবাদের সমালোচনা করিবেন এইরূপ আশা করিতে পারি। আমার বিশ্বাস বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই হিন্দুসমাজ শত বিপ্লবের ভীষণ তাড়নাতেও অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। অন্য কোন দুর্ব্বল ভিত্তির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই তাহা আর ভারতীয় সমাজ থাকিবে না। যে কোন জাতির বৈশিষ্ট নষ্ট হইলেই তত্তজ্জাতি বিলুপ্ত হইবেই। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ-কামী, তাঁহারা যেন হিন্দুজাতির জাতীয়ত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কাল, দেশ ও পাত্র অনুসারে সেগুলি যত পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা সমীচীন, ব্রাহ্মণ-সমাজ এ বিষয়ে যথাশক্তি চিন্তা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। যুগভেদে ব্যবহারিক ধর্ম্মভেদ ঋষিগণের অনভিপ্রেত নহে। "কৃতে তু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং শঙ্খলিখিতৌ"—ইত্যাদি ঋষি-দেরই মত। "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" এ কথা পণ্ডিতগণের সুবিদিত। মনু বলিতেছেন—"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগ-হ্রাসানুরূপতঃ॥" কাল, দেশ ও পাত্র অনুসারে বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনীয় বা পরিবর্জ্জনীয়। শাস্ত্র চিরকালই এই নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন: "দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ। দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ" প্রভৃতি বচনেই ইহার প্রমাণ। সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন চিরকালই বুধমণ্ডলী কর্ত্তৃক, বিশেষ বিবেচনা সহ, সাধিত হইয়াছে। সামাজিক রীতি, নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে বিশেষ ধীরতা, দূরদর্শিতা ও সমীচীনতা সহকারে করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ঋষিগণের স্থানে বর্ত্তমান কালে অধ্যাপক ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাঁহারা অপক্ষপাত-বিচার সহ শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তির আশ্রয়ে সর্ব্ববিধ সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিলে সমাজ সু-প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং
গতিম্॥"

যে শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘন করতঃ যথেচ্ছাচারী হইবে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এই মহতী বাণীই সমাজ-রক্ষার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যানু-সারেই মানুষের বর্ণভেদ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে :—

"ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বর্ণ যথা-ক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণ। এই নিয়ম অব্যভিচারী নহে। ইহা প্রায়িক মাত্র। কারণ প্রাচীন ভারতে মহর্ষি ব্যাসদেব ব্রাহ্মণ হইয়াও কৃষ্ণবর্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ত্রেতা-

বতার শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও শ্যামবর্ণ এবং বলদেব ক্ষত্রিয় হইয়াও শ্বেতবর্ণ ছিলেন। ঋগ্‌বেদে উক্ত হইয়াছে :—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্‌ বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদেশ বৈশ্য এবং পাদদেশ শূদ্র হইল। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী অনেক ভারতীয় সুধীগণ বেদের এই উক্তিটী প্রাচীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা এই সূক্তটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন; আমি এ বিষয়ে কোনও বিচার করিতে ইচ্ছা করি না। বেদপন্থীদের মতে জাতি ও বর্ণ-বিভাগ অনাদি কাল হইতেই বর্ত্তমান, ইহা মনুষ্যকল্পিত নহে, ইহা প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম বশেই হইয়াছে; এ বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের ১০ম সর্গে বলিতেছেন :—

"চতুর্ব্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগাঃ।
চতুর্ব্বর্ণময়ো লোকস্তত্ত্বং সর্ব্বং চতুর্মুখাৎ॥"

প্রকৃতির প্রেরণাতেই যে জাতি ও বর্ণ বিভাগ হইয়াছে ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে প্রকৃত মুখ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, আমাদের অধিকাংশই এখন "ব্রুবাণ ব্রাহ্মণ" মাত্র। এরূপ হওয়ার বহুবিধ কারণ বিদ্যমান; সে সমস্তের প্রতীকার কতকগুলি আমাদের সাধ্যায়ত্ত এবং কতকগুলি নহে। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তবেই উদ্দেশ্য সফল হইবে, নতুবা ইহা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তদ্‌ যথা,—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

এই দশবিধ ব্রাহ্মণের অবান্তর ভেদ এই প্রকার কথিত হইয়াছে :—

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্য-পূজনং।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ১
বৈশ্বদেবঞ্চেত্যনন্তরং কুর্ব্বন্নিতি পূরণীয়ম্‌।
শাকে পাত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ
নিযতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥৩
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
প্রারম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥৫
লাক্ষালবণ সম্মিশ্র কুসুম্ভ ক্ষীর সর্পীষাং।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৬
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৮
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ৯
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥" ১০

বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে কে কোন্‌টীর অন্তর্গত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে গুণ ও কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ

প্রাচীন ভারতের সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন ছিলেন তাহা অনন্য-সাধারণ। আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমির একচ্ছত্রী সম্রাটের বহুমূল্য রত্নরাজিখচিত মুকুটযুক্ত মস্তক যে ব্রাহ্মণের পদতলে স্বতই অবনত হইত, সে ব্রাহ্মণ কখনও দুগ্ধফেণনিভ শয্যা-শায়ী, অভ্রংলিহপ্রাসাদবাসী ধনকুবের ছিলেন না। তিনি বাছিয়া বাছিয়া এমন একটী বৃত্তি জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহার তুল্য হীন ও দুঃখের বৃত্তি আর হইতেই পারে না, সেটী কি? না "ভিক্ষা"। সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ-কামনাতেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্যাগী, পর্ণকুটীরবাসী এবং শাকান্নভোজী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধনবান্, বা অস্ত্রবান্ ছিলেন না; অথচ তিনি এমন একটী ধনে ধনী ছিলেন যাহা "জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।" জ্ঞানবল তাঁহার প্রধান বল ও অস্ত্র ছিল এবং সংযম ও ত্যাগই তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ-প্রতিপাদক ছিল। ব্রাহ্মণই ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অর্থকে পরমার্থের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অধঃপাতের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম, নির্লোভ, নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু না হইতে পারেন তবে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব অটল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণোচিত বাহ্যাভ্যন্তরশুচিতা না থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতৃপুরুষের বহু আয়াসলভ্য অতুল সম্পত্তি হারাইয়া বাস্তবিকই আজ অতি দরিদ্র হইয়াছেন ও হইতেছেন। আর্থিক দারিদ্র্য তাঁহার চিরকালই ছিল; কিন্তু প্রকৃত ধন হারাইয়া তিনি আজ পথের ভিখারী হইতেছেন। যাঁহার নিকট পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি জ্ঞানলাভের জন্য এক সময় দ্বারস্থ ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণই পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী; আমাদের স্বীয় কর্ম্মফলেই এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, ভো বিড়ম্বনা!! ভূদেব ব্রাহ্মণবর্গ! আপনারা সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করুন, নতুবা আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যহীন শিক্ষাপ্রণালীই আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ, ইতঃপর সমাজ-শক্তির খর্ব্বতা এবং অন্যান্য প্রতিকূল কারণ-সমবায় এই দশাবিপর্য্যয়ের হেতু বটে। ব্রহ্মচর্য্য-পালন ব্যতীত প্রকৃত মনুষ্যত্ব উন্মেষিত হইতে পারে না। হিন্দুর চতুরাশ্রম অতি সুচিন্তিত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ-বর্ণনকালে চতুরাশ্রমের একটী সুন্দর আভাস দিয়াছেন, তাহা এই:—"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং। বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্, রঘুনামন্বয়ং বক্ষ্যে" ইত্যাদি। ইহাই মানব-জীবনের স্বাভাবিক বিভাগ; এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিভাগ আর কখনই কল্পনা করা সম্ভবপর নহে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অপব্যবহারই যে আমাদের অধঃপাতের মূলীভূত কারণ তাহা বোধ হয় আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" এবং "রেতো বৈ ব্রহ্ম" এই কথাগুলির মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের বলহানি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইতেছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" অষ্টবিধ

মৈথুনবর্জনই ব্রহ্মচর্য্যব্রত। স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥" বর্ত্তমানকালে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরনিয়মসমূহ সর্ব্বথা পালন করা সম্ভবপর না হইলেও কতকটা পালন করা যাইতে পারে এবং ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে জীবন গঠনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তনীয়। আর্য্যঋষিগণ দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের) পক্ষে চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস করতঃ বিদ্যাভ্যাস ও বেদাধ্যয়নের কালই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের জন্য এই আশ্রমের কাল ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। অধুনা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, অন্ততঃ বঙ্গদেশে, তিন দিনেই শেষ হয়। কোন কোন স্থলে ইহা তিন ঘণ্টায়ই শেষ হয়; কোথাও বা ইহা একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইতঃপরই গার্হস্থ্যাশ্রম আরম্ভ হয়। মনু গার্হস্থ্যাশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কারণ গার্হস্থ্যাশ্রম ভিন্ন পঞ্চমহাযজ্ঞ সাধিত হইতে পারে না; বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, অতিথিসেবা, বলিকর্ম্ম (পশুপক্ষীকে আহার দান) পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি যথাক্রমে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ নামে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারাই মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, নতুবা সে পশুভাবাপন্ন হয়। মনু বলিতেছেন :—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥"

ব্রহ্মচর্য্যের পর সমাবর্ত্তনান্তে দার-পরিগ্রহ গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য। বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধানগুলি এত সুন্দর, পবিত্র ও সুচিন্তিত যে, জগতের কোন জাতির বিবাহবিধিই ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে আমরা বর্ত্তমান সময়ে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, শাস্ত্রবিধি অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করতঃ সমাজে কতকগুলি অতি ঘৃণিত ও যথেচ্ছ আচার-ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করিয়াছি ও করিতেছি। পণ-গ্রহণ-প্রথা তন্মধ্যে একটী অতি গুরুতর অনিষ্টজনক; ইহার মাত্রা ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সত্বর ইহার গতিরোধ করিতে না পারিলে পরিণাম ভয়াবহ। সমাজে তাহার অশুভফল প্রত্যহই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তথাপি আমরা তাহার কোনও প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছি না বা করিতে পারিতেছি না। কেবল মাত্র সভাসমিতি ও বক্তৃতাদ্বারা এই ঘৃণিত প্রথা সমাজ হইতে উন্মূলিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতঃ সুমীমাংসায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিবেন। অতঃপর অনেক প্রকার অশাস্ত্রীয় বিবাহও সমাজে অবাধে প্রচলিত হইতেছে। বংশ-পরিচয় প্রভৃতির অসদ্ভাবই এই প্রকার দুর্ঘটনার মূলীভূত কারণ। পূর্ব্বে কুলপুরোহিতগণই বংশপরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধাবস্থায় রাখিতেন। সম্প্রতি তাঁহাদের ব্যবসা প্রায় বিলুপ্ত। আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে সমাজ ক্রমেই হীনদশা প্রাপ্ত হইবে এবং পরিণামে জাতির ধ্বংস হইবে। সামাজিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় বিবাহ-ব্যবস্থা; কারণ বিবাহই সমাজ-বন্ধনের মূল সূত্র, এবং ইহার পবিত্রতা-রক্ষার উপরই সমাজের স্থিতি ও গতি নির্ভর করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সমাজকে চালিত করার চেষ্টা করা সমীচীন।

অভিভাষণের প্রারম্ভে ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কারোপলক্ষে তাঁহাকে গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ বলা হইয়াছে; কিন্তু জানি না আমাদের কোন্ মহাপাতকের ফলে তিনি অধুনা তদ্বদ্ধ্যায় হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে যে প্রকার প্রতিকূল লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় গো-ব্রাহ্মণ অচিরাৎ ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি ॥"

গো ও ব্রাহ্মণ এক কুলেই উৎপন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, একে (ব্রাহ্মণে) মন্ত্র এবং অন্যত্র (গোতে) হবি (ঘৃত) অবস্থান করিতেছে। "হবির্বৈ ব্রহ্ম" ঘৃতই ব্রহ্ম, এ কথার মূলেও গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে "গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ" অপরঞ্চ "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"। বস্তুতঃ ভারতের প্রধান সম্পত্তিই গো, এবং গো-রক্ষাতেই ভারত রক্ষিত। গোজাতির অবনতিতে যে ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে। গোজাত দুগ্ধাদিই আমাদের প্রধান জীবনীয় পদার্থ; গোজাতির অবনতি ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই দুগ্ধ, নবনীত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অসদ্ভাব ঘটিতেছে, তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; হলচালনা, ভারবহন ও শকটাদি-চালনের প্রধান সহায় গো, অতএব গোজাতির হীনতায় ভারতে কৃষি-বাণিজ্যের অন্তরায় ঘটিতেছে। ক্ষেত্রের প্রধান সার গো-মলমূত্র ন্যায় আর কিছুই নাই; তাহার অপ্রচুরতায় ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তির হানি হইতেছে। শাস্ত্রে গোমূত্র ও গোময় অতি পবিত্র পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। "শকৃন্মূত্রে পরম্ভাসামলক্ষ্মীনাশনং পরম্" ইহা রূপক না এবং বর্ত্তমান সময়ের ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

এক কথায় বলিতে গেলে গাভীর অবনতিতে ভারতের স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সব বিষয়েই অবনতি হইতেছে। গোবংশ-লোপের কতকগুলি প্রধান কারণ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১ম—গোপালনের প্রতি অশ্রদ্ধা।

২য়—গোচারণ-ক্ষেত্রের ক্রমে অসদ্ভাব।

৩য়—গো-মড়ক (বসন্ত, গলা-ফোলা প্রভৃতি) সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব।

৪র্থ—গোবংশ রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট বীজ-সেক্তা ষণ্ডের অভাব।

৫ম—যথেচ্ছ গোবধ।

৬ষ্ঠ—চর্ম্মব্যবসায়ের আধিক্য-হেতু চর্ম্ম-কার কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে গোবধ।

৭ম—গো চিকিৎসা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

ইতঃপর আরও অনেক প্রতিকূল কারণে গোবংশ ক্রমে ধ্বংসোন্মুখী হইতেছে। উপরোক্ত কারণ পরম্পরার মধ্যে যে গুলির প্রতিবিধান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর তাহা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এ বিষয়েও মনোযোগী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈনসম্প্রদায়ের অনুকরণে দেশের সর্ব্বত্র পিঁজরাপোলের অনুষ্ঠান করা

কর্ত্তব্য; অবশ্য এই কার্য্য বহুব্যয়সাপেক্ষ। সরল বঙ্গভাষায় গোচিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাদি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া বিধেয়। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ভারতের নানা স্থানে পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করতঃ প্রজাবর্গের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত পশুচিকিৎসালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলের পক্ষে সহজলভ্য নহে; অতএব যাহাতে অল্পব্যয়ে দরিদ্র কৃষকসমূহ গোচিকিৎসায় সহায়তা পাইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি গোরক্ষা-কল্পে ২।৪টী অতিরিক্ত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম; শ্রোতৃবৃন্দ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন "গো-ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলেই কি সমগ্র সমাজ ও দেশ উন্নত হইল"? প্রকৃতই গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষার উপরই ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল নির্ভর করে। এই দুইটী রক্ষিত হইলেই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ থাকিবে, নতুবা ইহা ভোগ-ভূমিতে পরিণত হইবে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে "ভারতঃ কর্ম্মভূমিস্ত অন্যে তু ভোগভূময়ঃ" ভারতবর্ষ যাহাতে ভোগভূমি না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষার উপর এত অধিক কথা বলাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি অশ্ব ও অন্যবিধ গৃহপালিত পশ্বাদি-রক্ষাবিষয়ে অবহেলা করিতে বলিতেছি। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে, ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা এবং শূদ্রের প্রতি অত্যাচার ও শাস্ত্রীয় কঠোর বিধি-ব্যবস্থাই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদিগেকে এই শিক্ষাই দিয়া থাকেন যে "ব্রাহ্মণ অতি স্বার্থপর ছিলেন' তাঁহারা কাহাকেও জ্ঞান বিতরণ করিবার ইচ্ছা করিতেন না এবং শূদ্রের প্রতি অসম্ভব নিষ্ঠুরতা করিতেন"। শাস্ত্রানভিজ্ঞতাই এই ভ্রান্ত ধারণার মূলীভূত কারণ। সত্য বটে পূর্ব্বতন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ স্ত্রীজাতি ও শূদ্রকে বেদ-পাঠের অধিকার দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই, কিন্তু তাহাদের অন্য প্রকার শিক্ষালাভের কোনও বাধা শাস্ত্রে কোথায়ও উক্ত হইয়াছে কি? আমার বিশ্বাস বিন্দু-মাত্রও নহে। পক্ষান্তরে, দেখিতে পাই যে, স্ত্রী ও শূদ্রের শিক্ষার অতি প্রকৃষ্ট উপায়ই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় সমাজের একদিক (পুরুষভাগ) নিয়ত জ্ঞানালোক-সমুজ্জ্বল হইবে, অন্যদিক্ (স্ত্রীভাগ) গাঢ়তম অজ্ঞান-তমসাবৃত থাকিবে, ইহা আর্য্যঋষির কল্পনায় আসে নাই। প্রাচীন-ভারতের সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি অশিক্ষিতা ছিলেন, এই কথা যাঁহারা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে আমি অক্ষম। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন দেশকালোচিত স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিতেও চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুরমণীর শিক্ষা বর্ত্তমানে যে ভাবে দেওয়া হইতেছে, তাহা ততটা মঙ্গলজনক হইবে কি না তৎপক্ষে গভীর সন্দেহ আছে। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ ইহাও ঋষি-বাক্য বটে, যে শিক্ষা দ্বারা হিন্দুরমণীর মাতৃত্বের ও অন্যান্য সদ্‌গুণবিকাশের বিঘ্ন ঘটে সে শিক্ষা অন্তঃপুরের ত্রিসীমা স্পর্শ না করিতে পারে, তৎপক্ষে তীব্রদৃষ্টি রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায় আবশ্যকমত যাহাতে শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি সহজে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য

হয়, তাহার উপায় করাও ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের অন্যতম কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত দেবভাষা, এই ভাষার রত্নভাণ্ডারে যে কত অমূল্য ভাস্বর রত্ন লুক্কায়িত আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমাদের রত্নভাণ্ডার হইতে বৈদেশিকগণ কত রত্ন আহরণ করিয়া ধনী হইতেছেন, আর আমরা অবহেলায় তাহা হারাইতেছি, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অতএব সংস্কৃতভাষার অনুশীলন দেশে যত প্রসারিত হইবে ততই কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে। বেদের পঠনপাঠন বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে; অতএব যাহাতে বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত হয় তাহারও চেষ্টা করা সমীচীন, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "বেদাধীনা জগৎ কৃৎস্নং" ইত্যাদি।

এস্থলে আরও একটী কথা বক্তব্য এই যে, টোলগুলিতে ব্যবহারিক বিদ্যারও যথাসম্ভব আলোচনা প্রবর্ত্তিত হওয়া সঙ্গত, অর্থাৎ জড়বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিদ্যারও কথঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া সঙ্গত। এগুলি বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ সাহায্যেই হওয়া সুবিধাজনক মনে করি। যদি পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সরল সংস্কৃতভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিতে পারেন, তবে বড়ই মঙ্গল হয়, অতএব এ সম্বন্ধে চেষ্টা করা সঙ্গত। যে সমস্ত অধ্যাপকগণ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় কৃতবিদ্য তাঁহারাই এবম্বিধ চেষ্টায় সহজে সফলকাম হইতে পারেন। প্রাচীন ভারতের ঋষি-সম্প্রদায় যদিও ব্রহ্মবিদ্যাকেই পরাবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন (পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে) এবং অপর সর্ব্ববিধ বিদ্যাকে অপরাবিদ্যা-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ইহলৌকিক উন্নতিবিধায়ক আয়ুর্ব্বেদ (মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ), গণিত, জ্যোতিষ, শিল্প-শাস্ত্র, গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীতশাস্ত্র,) ধনুর্ব্বেদ, বাস্তুবিদ্যা, চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যা, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনাতেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ লৌকিকালৌকিক, কোনও বিদ্যাই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের জ্ঞানের অবিষয়ীভূত ছিল না। বর্ত্তমানকালেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ইচ্ছা করিলেই ইহ-পারলৌকিক সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারেন। তাঁহাদের প্রতিভা ও বুদ্ধি অতি প্রখর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আর কেবলমাত্র এক শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ব্যবহারিক কৃতিত্বলাভ সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বিদ্যাচতুরস্র হওয়া সঙ্গত, নতুবা তাঁহাদের গৌরবহানি হইবে। "একা বিদ্যা সুশিক্ষিতা" এ কথা যথার্থ হইলেও, সর্ব্বশাস্ত্রে গতি থাকা আবশ্যক। অবশ্য পল্লবগ্রাহী বিদ্যা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। পাশ্চাত্য-জাতিসমূহ এখন নানাবিধ লৌকিক বিদ্যায় সমুন্নত ও তাঁহাদের অধ্যবসায় এবং জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা অতি বলবতী। তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে পূর্ব্বতন ঋষিগণ জ্যোতিষতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং" ইহা তাঁহাদেরই কথা। তাঁহাদের ইহাও মত যে

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

ভগবান্ মনু বলিতেছেন:—

"স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মং শৌচং সুভাষিতং।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥"

অতএব যে কোন জাতি হইতে অথবা যে কোন ব্যক্তি হইতে জ্ঞান আহরণে কোনও দোষের কারণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কখনও সঙ্কীর্ণমনা হইতে পারেন না; **ব্রাহ্মণত্ব ও অনুদারতা,** পরস্পরবিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত। "চণ্ডালমপি বিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ" ইহা ব্রাহ্মণেরই উক্ত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অথবা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী মানুষের গন্তব্য পন্থা। ব্রাহ্মণ নিবৃত্তি বা শ্রেয়ঃ পথকেই অবলম্বন করতঃ মোক্ষলাভের প্রয়াসী হইয়াছিল। ফলতঃ কেবলমাত্র প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া চলিলে মনুষ্যত্বের হানি হইবে। ত্যাগের মধ্যে ভোগকে গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকম্" "অয়ং নিজো পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্"। তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও জলোৎসর্গের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণের হৃদয় কত উচ্চ, কত উদার, কত নির্ম্মল ছিল। ভগবান্ মনু অতি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন:—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রংশিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

এই উক্তি কখনও উন্মত্তপ্রলাপ নহে, ইহা নিষ্ফলা নহে, ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, সমগ্র জগৎ আজ ভারতীয় ঋষির জ্ঞানের নিকট ক্রমে অবনতমস্তক হইতেছেন। ভারতীয় ঋষির চরণে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানদৃপ্ত জাতিসমূহ সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন বেদান্ত দর্শনের গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়াছে। "**চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং**" ভগবান শঙ্করাচার্য্যের এই গম্ভীর বাণী আজ জগতের দিক্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সনাতন বেদবাক্য **সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**" অচিরেই পাশ্চাত্য জগতে গভীর সত্য বলিয়া আদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আমরা ভারতের ঋষিবংশ সম্ভূত এ কথা যেন ভুলিয়া না যাই। পিতৃপুরুষের বহু আয়াসলব্ধ অতুল সম্পত্তি হেলায় হারাইলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ যদি **ব্রাহ্মণত্ব,** হারাইয়া কেবলমাত্র অস্ফালনে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি উপহাসাস্পদ হইবেনই। সত্য কথা বলিতে কি, হংসমালা যেমন শরৎকালে স্বতঃই গঙ্গাভিমুখে প্রধাবিত হয়, মহৌষধ যেমন নিশাকালে স্বয়ংই দীপ্তিমান হয়, লৌহ যেমন স্বভাবতঃই অয়স্কান্তমণির দিকে আকর্ষিত হয়, তেমনি যোগবলে বলীয়ান্, বেদপরিনিষ্ঠিত, শুদ্ধবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, (মনু বলিতেছেন—"শ্রুত্বা, স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ, ভুক্ত্বা, ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ। ন হৃষ্যতি গ্লায়তি চ স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥") সংযমী ও প্রশান্ত চেতা, পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত জগৎবাসী জ্ঞানার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইবেই। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ! আপনারা স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করিবেন না এবং সামান্য অর্থলোভে পরমার্থ হারাইবেন না, আপনারা স্মরণাতীত কাল হইতেই জগতের শিক্ষাগুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এ কথা ভুলিয়া যাইবেন না। উপসংহারে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, পারস্পরিক দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি ভুলিয়া, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করতঃ আপনারা সকলে মিলিত ভাবে ব্রাহ্মণের এবং তৎসহ চতুবর্ণবিশিষ্ট সমগ্র

ভারতীয় হিন্দুসমাজের হিতকামনায় নিখিল জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং শক্তি নিয়োজিত করুন, ব্রহ্মণ্যদেব আপনাদের সহায় হইবেন এবং ব্রাহ্মণ আবার জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হইয়া জগতের সমক্ষে উন্নত শীরে প্রশান্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন। যাহা সনাতন তাহা কখন নষ্ট হইতে পারে না, নষ্ট হইলে আর তাহা সনাতন হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান সনাতন এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রাহ্মণও সনাতন।

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার এই ক্ষুদ্র অভিভাষণে কোন অসম্বদ্ধ উক্তি থাকিলে, অথবা কোন প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গভীর ও অতি পবিত্র বেদবাণী উচ্চারণ করিতেছি :—

"সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসত॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং কেতো অভিসংরভধ্বং সংজ্ঞানেন বো হবিষা যজামঃ॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি॥
সহনা ববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।"
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর *

প্রথম অধ্যায়

গোলামাবাদের আব্‌হাওয়া

আমি কেনা গোলাম—জাতিতে নিগ্রো। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের ফ্রাঙ্কলিন জেলার কোন গোলাম-খানায় আমার জন্ম। ঠিক কবে কোথায় জন্মিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। শুনিয়াছি একটা ডাকঘরের নিকটে আমার জন্মস্থান; এবং বোধ হয় ১৮৫৮ কিম্বা ১৮৫৯ সালে আমি ভূমিষ্ঠ হই। কিন্তু জন্মের মাস, তারিখ ইত্যাদি কিছুই জানি না। নিতান্ত ছেলেবেলার কথার মধ্যে গোলামাবাদের কাজকর্ম্ম ও চালচলনগুলিই মনে পড়ে। আর স্মরণ হয় সেই আবাদের গোলাম-মহাল্লার কুঠুরিগুলি—যেখানে আমার স্বজাতিরা তাহাদের দাস-জীবন কাটাইত।

নিতান্ত ঘৃণ্য, অবনত, দারিদ্র্যদুঃখময়, নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই আমার বাল্য-জীবন কাটিয়াছে। অবশ্য এই দুঃখ-দৈন্য-ক্লেশের জন্য আমার মনিবদের বিশেষ কোন দোষ ছিল না। তাঁহারা অন্যান্য প্রভুগণের তুলনায় সহৃদয় ও দয়ালুই ছিলেন। তবে কেনা গোলামমাত্রের যে শোচনীয় দশা তাহাই আমাকেও ভোগ করিতে হইয়াছে। একটা ১৬ ফিট লম্বা এবং ১৪ ফিট চৌড়া

* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের "আত্মজীবন-চরিত" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

কাঠের কামরার মধ্যে দাস-জাতির সকলকেই বসবাস করিতে হইত। এইরূপ একটা কুঠুরিতে আমি, আমার মাতা, এবং এক ভাই ও ভগ্নী এই চারিজন আমাদের দাস-জীবন কাটাইতাম। পরে "যুক্তরাজ্যে"র গৃহবিবাদের ফলে দাসজাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তখন হইতে আমরা স্বাধীন হইয়া গোলামখানা পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমার পূর্ব্বপুরুষদের কথা কিছুই জানি না। গোলামাবাদের লোকজনেরা মাঝে মাঝে কাণাঘুষা করিত। তাহা হইতে অল্প-বিস্তর কিছু অনুমান করিয়া লইয়াছি মাত্র। আমরা আফ্রিকাবাসী। আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় চালান দিবার সময়ে জাহাজে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মানব-সম্প্রদায়ের লোকজনেরা যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বৃত্তান্ত এইটুকু মাত্র জানা যায়। বলা বাহুল্য সেই যুগে গোলাম-জাতির বংশতালিকা, পুরাতত্ত্ব, পিতামহের জীবন-কাহিনী ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজনই বোধ হইত না।

কোন উপায়ে এক ব্যক্তি আমার মাতাকে হয়ত কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের প্রভু হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। একটা নূতন গরু, ঘোড়া বা শূকর কিনিলে তাঁহার পরিবারে যেরূপ সাড়া পড়ে, আমার মাতা তাঁহাদের গোলামাবাদে প্রবেশ করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু হৈ-চৈ পড়ে নাই।

আমার পিতার সংবাদ আমি একেবারেই কিছু জানি না। বোধ হয় তিনি কোন শ্বেতকায় পুরুষ—সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী কোন আবাদের প্রভু জাতীয় একব্যক্তি। তাঁহাকে আমি কখন দেখি নাই—তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই, তিনি আমাকে মানুষ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টাও কোন দিন করেন নাই। এইরূপ পিতা বা জন্মদাতা গোলামীর যুগে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-সমাজে অসংখ্যই ছিলেন।

আমাদের কামরাটিতে কেবল মাত্র আমাদেরই গৃহস্থালী চলিত না। এই কুঠুরিটিতে সমস্ত গোলামাবাদের জন্য রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন হইত। আমার মাতা আবাদের সকল কুলীর জন্যই রান্না করিতেন। ঘরটা নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ অতিশয় অস্বাস্থ্যকর এবং পীড়াজনক। ইহার ভিতর আলোক বা বাতাস বেশী আসিত না। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁকের ভিতর দিয়া শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস যথেষ্টই প্রবেশ করিত। তাহার উপর, মেজেতে অনেকগুলি গর্ত্ত ছিল—তাহার মধ্যে একাধিক বিড়াল আসিয়া আশ্রয় লইত। মেজের উপর কোন কাঠের আবরণ ছিল না। মাটির উপরেই সকল কাজ-কর্ম্ম চলিত। মেজের মধ্যস্থলে একটা বড় গর্ত্ত করা হইয়াছিল। শীতকালে তাহার মধ্যে শকরকন্দ আলু রাখিয়া একটা কাঠের তক্তা দিয়া ঢাকা হইত। এই আলুগুদামের কথা আমার বেশ মনে আছে। এখান হইতে নাড়াচাড়া করিবার সময় দুই চারিটা আলু আমার হস্তগত হইত। সেইগুলি পরে নির্জ্জনে পুড়াইয়া খাইতাম।

রন্ধনাদির সরঞ্জাম অতি কদর্য্য রকমেরই ছিল। 'ষ্টোভ' দেওয়া হইত না। খোলা উননে রান্না করিতে হইত। ফলতঃ শীত-কালে যেমন ঠাণ্ডা বাতাসের দৌরাত্ম্যে প্রাণে বাঁচা কঠিন হইত, তেমনি গ্রীষ্মকালে এই খোলা উননের উত্তাপ আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব করিয়া তুলিত।

আমার বাল্যজীবনে এবং অন্যান্য হাজার হাজার গোলামের বাল্যজীবনে কোন প্রভেদই ছিল না। আমাকে এবং আমার ভাই ও ভগ্নীকে দিবাভাগে কখনই মাতা দেখিতে শুনিতে সময় পাইতেন না। খুব সকালে সরকারী কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে এবং রাত্রে সকল কাজ সারিবার পর আমার মাতা আমাদিগের জন্য কিছু সময় করিয়া লইতেন। মনে পড়ে কোন কোন দিন রাত্রে আমার মাতা আমাদিগকে জাগাইয়া কিছু মাংস খাওয়াইতেন। কোথায় যে তিনি তাহা পাইতেন কিছুই জানিতাম না। অবশ্য আমার মনিবেরই পশুশালা হইতে জন্তুটা লইয়া আসা হইত। এই কার্য্যকে আপনারা 'চুরি' বলিবেন। আমিও আজকাল ইহাকে চুরিই বলিয়া থাকি। তবে যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ইহাকে কোন দিনই চুরি ভাবিতে পারি নাই, এবং কেহ আমাকে বুঝাইতেও পারিত না যে আমার মাতা চোর। গোলামী করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। দাস-জাতির ইহা স্বধর্ম্ম।

ছেলে-বেলায় আমরা কোন দিন বিছানায় শুইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা তিন ভাই বোন মাটিতে পড়িয়া থাকিতাম। কতকগুলি ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়ার বস্তার উপরে রাত্রি কাটাইতাম।

সম্প্রতি কেহ কেহ আমার বাল্যজীবনে খেলা-ধূলার কথা শুনিতে চাহিয়াছেন। খেলা-ধূলা কাহাকে বলে ছেলে-বেলায় আমি তাহা জানিতাম না। যতদূর স্মরণ করিতে পারি—প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত চিরকাল খাটিতে খাটিতেই আমার জীবন চলিয়াছে। কিছু খেলিতে পাইলে বোধ হয় আজকাল বেশী কাজই করিতে পারিতাম।

নিগ্রোজাতির গোলামীর যুগে আমার বয়স নিতান্তই অল্প ছিল। আমার দ্বারা বেশী কাজ হইতে পারিত না। তথাপি আমাকে আবাদের অনেক কাজই করিতে হইত। আমি উঠান ঝাড়িতাম—এবং কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের কাজের জন্য জল যোগাইতাম। অধিকন্তু কলে পিষিবার জন্য সপ্তাহে একবার করিয়া শস্যাদি বহিয়া লইয়া যাইবার ভার আমার উপর ছিল। এই কার্য্য বড়ই কষ্টদায়ক হইয়া উঠিত। আবাদ হইতে কল তিন মাইল দূরে। একটা ঘোড়ার পীঠের উপরে শস্যের প্রকাণ্ড বোঝা চাপান হইত—বোঝাটা ঘোড়ার দুই পার্শ্বে ঝুলিতে থাকিত। আমি মধ্যস্থলে বসিতাম। মাঝে মাঝে দুর্দ্দৈবক্রমে বোঝাটা ঘোড়ার পীঠ হইতে পড়িয়া যাইত—আমিও চীৎপাত হইয়া পড়িতাম। আমার সাধ্য ছিল না যে আমি একা সেই বোঝা অশ্বপৃষ্ঠে তুলি। একাকী নির্জন রাস্তায় বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতাম—কাঁদিয়া কাটাইতাম। হঠাৎ কোন লোক সেই দিক দিয়া গেলে তাহার সাহায্যে মাল ঘোড়ায় চড়াইয়া কলে পৌঁছিতাম। ইহাতে সময়ে সময়ে এতক্ষণ লাগিত যে কলের কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিতে বেশ রাত্রি হইয়া যাইত। অন্ধকার-পথে বড়ই ভয় পাইতাম। স্থানে স্থানে ঘন জঙ্গল ছিল—তাহার মধ্যে না কি চাকুরী ত্যাগ করিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈন্যাদি বাস করিত। শুনিয়াছিলাম - একা পাইলেই তাহারা নিগ্রো বালকের কাণ কাটিয়া রাখিত। সুতরাং ঐ রাস্তায় যাওয়া-আসা আমার পক্ষে বিষম উৎপাত বোধ হইত। বিশেষতঃ বেশী রাত্রে ঘরে ফিরিলে আবার জুতা লাথি গালি খাওয়ার সুব্যবস্থাও ছিল।

গোলামী করিতে করিতে আমি কখনও শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাই নাই। অবশ্য বিদ্যালয়-গৃহের ফটক পর্য্যন্ত অনেক-বারই গিয়াছি। আমার মনিবদের সন্তান-সন্ততিরা স্কুলে যাইত। আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাদি বহিয়া লইতাম। দূর হইতে দেখিতাম বিদ্যালয়ের ঘরগুলিতে ছেলে-মেয়েরা দলে দলে লেখা-পড়া শিখিতেছে। সেই দৃশ্য আমার চিত্তে কি অপূর্ব্ব ভাবই না সৃষ্টি করিত! ঐরূপ একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া লেখাপড়া করিতে পারা আমার নিকট স্বর্গ-প্রবেশের ন্যায় সুখকর মনে হইত।

আমরা যে গোলাম বা ক্রীতদাস তাহা আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত জানিতাম না। আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই। একদিন সকালে জাগিয়া দেখি আমার মাতা আমাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন:—"হে জগদীশ্বর, সেনাপতি লিঙ্কলনের সৈন্যদল যেন জয়লাভ করে। হে অনাথের নাথ, আমরা সপরিবারে এবং সদলবলে যেন স্বাধীন হই। হে পতিত-পাবন, এই অবনত দাসজাতিকে বন্ধন-মুক্ত কর।"

বলা বাহুল্য, গোলামাবাদের আমার স্বজাতিরা সকলেই নিরক্ষর ছিল। কেহই লেখাপড়া, পুস্তক, গ্রন্থালয়, সংবাদপত্র ইত্যাদির ধার ধারিত না। তথাপি দেখিতাম প্রায় সকলেই দেশের কথা বেশ জানিত ও বুঝিত। যুক্তরাজ্যের মধ্যে যে একটা বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাহারই অজানা ছিল না। কবে কোথায় কি ঘটিতেছে দাসজাতির সকলেই তাহা বুঝিতে ও শুনিতে পাইত। আমাদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য যুক্তরাজ্যের উত্তরপ্রান্তবাসী গ্যারিসন, লাভজয় ইত্যাদি মানবসেবকগণ যেদিন হইতে আন্দোলন সুরু করেন,—আশ্চর্য্যের বিষয় সেইদিন হইতেই দক্ষিণ-প্রান্তের গোলামাবাদের মহলে মহলে সংবাদ রটিয়া গেল। স্বাধীনতার আন্দোলনের দৈনিক ঘটনাগুলি গোলাম-সমাজে সুপ্রচারিত হইত।

উত্তর প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রান্তে এই বিষয় লইয়া লড়াই হইবার উপক্রম হইল। দক্ষিণ-প্রান্তের মনিবেরা গোলামের জাতিকে স্বাধীনতা দিতে নিতান্তই নারাজ। শেষ পর্য্যন্ত দুই প্রান্তে সংগ্রাম বাধিল। এ সকল কথা গোলামেরা—আমার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবগণ—অতি সহজেই বুঝিতে পারিত। তাহারা এই আন্দোলন ও সংগ্রামের যুগে কত রাত্রিই যে কাণাঘুষায়, গল্পগুজবে ও গুপ্ত পরামর্শে কাটাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমাদের গোলামাবাদ রেলের রাস্তা হইতে বহুদূরেই অবস্থিত ছিল—ইহার নিকট কোন বড় সহরও ছিল না। কিন্তু আমরা খবর পাইতাম যে, উদারহৃদয় সেনাপতি লিঙ্কলন্ যুক্তরাজ্যের সভাপতি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতাম যে তিনি সভাপতি হইলে আমরা স্বাধীন হইব। তাহার পর যখন যুদ্ধ বাধিল, তখনও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই যুদ্ধের ফলের উপর আমাদেরই ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লিঙ্কলন্ এবং তাঁহার উত্তরপ্রান্তবাসী জনগণ যদি দক্ষিণপ্রান্তবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত

করিতে পারেন, তাহা হইলে দাসজাতির গোলামী ঘুচিয়া যাইবে। এজন্য এই সংগ্রামের জয়-পরাজয়ের খবর পাইতে আমরা অতিশয় আগ্রহান্বিত হইতাম।

ভগবানের কৃপায় আমরা সকল সংবাদই পাইতাম। এমন কি, আমাদের প্রভুরা খবর পাইবার পূর্ব্বেই অনেক সময়ে ব্যাপার বুঝিয়া লইতাম। কথাটা কিছু হেঁয়ালির মত বোধ হইবে বটে, কিন্তু রহস্য আর কিছুই নয়। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের পরনির্ভরতাই আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ উপকার করিত। আমরা তাঁহাদের গোলাম সত্য, কিন্তু আমাদের মনিবেরাও অনেক বিষয়ে আমাদেরই গোলাম ছিলেন। আমাদের সাহায্য না পাইলে তাঁহাদের এক পাও চলিবার ক্ষমতা ছিল না। গোলামেরাই ডাকঘর হইতে চিঠিপত্র লইয়া আসিত। সপ্তাহে দুই বার করিয়া ডাকঘরে যাওয়া-আসা করিতে হইত। সেই সুযোগে ডাকঘরের নিকট জটলা ও মজলিশ এবং খোসগল্প ইত্যাদি হইতে দাস-পত্রবাহক সকল অবস্থা বুঝিয়া লইত। ফলতঃ, প্রভুরা চিঠি-পত্র পাঠ করিয়া বৃত্তান্ত জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই গোলাম-মহাল্লায় সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িত।

মায়ে ভায়ে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া কখনও আমি আহার করিয়াছি—এরূপ মনে হয় না। গোলামখানার খাওয়া কোন উপায়ে নাকে চোখে গোঁজা মাত্র। তাহাকে আহার বলে না। গরু ছাগল ইত্যাদি যেরূপ চরিয়া বেড়ায় এবং যেখানে যাহা পায় তাহাই খায়, আমাদেরও ভোজনব্যাপার সেইরূপই ছিল। কোন সময়ে কাজ করিতে করিতে হয়ত একটুকরা মাংস খাইলাম। কখনও বা দুই-একটা পোড়ান আলু হাঁটিতে হাঁটিতে চিবাইতে হইত। মাঝে মাঝে উননের কড়া হইতেই তুলিয়া কোন দ্রব্য মুখে দিতাম। কাঁটা চামচ ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে কোথা হইতে? ঠিক নিয়মিতরূপে যথাবিধি পান-ভোজনেরই যে ব্যবস্থা ছিল না! যখন কিছু বড় হইলাম, তখন বড় কুঠির সাহেব প্রভুর আহারের সময়ে পাখা টানিতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই উপায়ে মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মনিব-পরিবারের কথোপকথন শুনিতে পাইতাম। অনেক সময়ে গুপ্তকথাও বাহির হইয়া পড়িত। লড়াই সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বুঝিতে পারা যাইত। সময়ে সময়ে তাঁহাদের খানা দেখিয়া যথেষ্ট লোভও হইত। আর মনে হইত কোনও দিন ঐরূপ এক থালা অন্নব্যঞ্জন যদি আমার ভাগ্যে জুটে, তাহা হইলে আমার স্বাধীনতার চরম ফললাভ হইবে!

সংগ্রাম চলিতে লাগিল। আমার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খাওয়া-পরার বড়ই কষ্ট হইল। দূরদেশ হইতে চা, কাফি, চিনি, ইত্যাদি আসিলে তবে মনিবদের গৃহস্থালী চলে। কিন্তু ক্রমশঃ এ সব দুর্ল্লভ হইল। তাঁহাদের দুঃখের আর সীমা রহিল না। গোলাম-জাতির কিন্তু বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। কারণ আমরা অত পরমুখাপেক্ষী ত ছিলাম না। আমাদের আবাদেই যে সব শস্য জন্মিত তাহাতেই আমাদের ভরণ-পোষণ স্বচ্ছন্দে চলিত। আর শূকর-পালন ত সহজেই আমরা নিজ মহাল্লায় করিতাম। কাজেই লড়াই বাধিবার পর প্রভুদের দুর্গতি দেখিয়া আমরা বিব্রত হইলাম। আমাদের অবস্থা 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং'। তাঁহারা অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া চিনির পরিবর্ত্তে

ময়লা গুড় দিয়াই চা খাইতেন। অনেক সময়ে আবার সেই গুড়ও যোগাইতে পারিতাম না। মিষ্ট না দিয়াই তাঁহাদিগকে অনেক দিন চা পান করিতে হইয়াছে। আবার যখন প্রকৃত চা বা কাফিও থাকিত না, তখন তাঁহারা মুড়ি বা চিঁড়ে ভাজা অথবা অন্য কোন শস্যের গুঁড়া ভিজাইয়া 'দুধের সাধ ঘোলে' মিটাইতেন।

আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম যে জুতা পরি, তাহা কাঠের তৈয়ারী। উপরিভাগে কিছু চামড়া ছিল। তাহা পরিতে পায়ের তলায় বড়ই লাগিত। কাঠের জুতা তবুও ভাল—কিন্তু গোলামীর আমলে আমাদিগকে যে জামা পরিতে হইত তাহা অতি ভয়ঙ্কর। বোধ হয় দাঁত টানিয়া তুলিলে যে কষ্ট হয় এই জামা পরিতে তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট হইত না। ভার্জ্জিনিয়ার গোলামাবাদে খুব মোটা খড়খড়ে চটের শার্ট পরিতে দেওয়া হইত। ইহার নূতন অবস্থায় অসংখ্য কাঁটা বাহির হইয়া থাকিত। গায়ের চামড়ায় কাঁটাগুলি বিঁধিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিত। আমার চামড়া কিছু নরম—সেজন্য কষ্ট অত্যধিকই বোধ করিতাম। কি করিব ?—বাদ-বিচারের অবসর ছিল না। তাহাই পরিতে হইবে নতুবা অন্য কোন গাত্রাচ্ছাদন পাইব না। আমার দাদা 'জন' একবার দাস-মহলের পক্ষে অসামান্য উদারতা দেখাইয়াছিল। চটের নূতন জামা পরিতে আমার কষ্ট দেখিয়া সে নিজেই ১০।১৫ দিন সেটা পরিল। যখন ভিতরকার কাঁটাগুলি তাহার গায়ে লাগিয়া ঘষিয়া গেল, তখন হইতে আমি সেই জামাটা ব্যবহার করিতে লাগিলাম। এই জামাই আমার গোলামী যুগের বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র পোবাক ছিল।

আমাদের দুরবস্থার এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া আপনারা ভাবিতে পারেন—বোধ হয় দক্ষিণপ্রান্তের কাল গোলামেরা তাহাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবদের উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। সত্য কথা বলিতে পারি যে, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে কখনই বেশী তীব্রভাব পোষণ করি নাই। আমরা জানিতাম যে তাঁহারা আমাদিগকে চিরকাল গোলামের অবস্থায় রাখিবার জন্যই উত্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ মহোদয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। আমরা জানিতাম যে, আমাদের মনিবেরা জিতিলে আমরা চিরজীবন গোলামীই করিতে থাকিব। তথাপি আমরা আমাদের প্রভুদের প্রতি শত্রুতা আচরণ করি নাই—বরং সকল সময়ে তাঁহাদের সুখে সুখী হইয়াছি, দুঃখে দুঃখী হইয়াছি। আমরা কোনদিনই তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার ত্রুটি করি নাই। যুদ্ধে আমার একজন যুবক মনিব মারা যান, এবং দুই জন আহত হন। ইঁহাদের পরিবারে যতটা দুঃখ হইয়াছিল—এই ঘটনায় গোলামখানায় তদপেক্ষা কম দুঃখ হয় নাই। আমরা আহত প্রভুদ্বয়কে প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছি। কত রাত্রি তাঁহাদের রোগশয্যার পার্শ্বেও কাটাইয়াছি। তাহা ছাড়া, যখন আমাদের প্রভু-পরিবারের পুরুষেরা সকলেই লড়াই করিতে বাহির হইয়া যাইতেন তখন আমরাই তাঁহাদের গৃহের প্রহরী থাকিতাম,—তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিতাম। সমস্ত পরিবারের 'ইজ্জৎ' এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের হাতেই থাকিত। নিগ্রোজাতির সত্যনিষ্ঠা, হৃদয়বত্তা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার আর কোন প্রমাণ আবশ্যক কি ?

অধিক কি, নিগ্রোরা অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদের পূর্ব্ব মনিবদিগকে অন্নবস্ত্র দিয়া মানুষও করিয়াছে। চিরদিন সকলের সমান যায় না। আজ যে রাজা কাল সে গোলাম, আজ যে দাস কাল সে প্রভু। সুখদুঃখ চক্রের মত ঘুরিতেছে। দক্ষিণ-প্রান্তের শ্বেতাঙ্গ প্রভুসম্প্রদায়ের অনেকেই যুদ্ধের ফলে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি জানি সেই দুঃখের সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বতন গোলামেরা তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিত। আমি জানি এইরূপে গোলাম-জাতির দানে মনিব-সন্তানসন্ততিরা লেখাপড়া শিখিয়াছে। একজন মনিব-পুত্র চরিত্রহীনতার ফলে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আমি জানি গোলামেরা নিজেদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও চাঁদা তুলিয়া এই পাপাত্মা প্রভু-সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কেহ তাঁহাকে কাফি পাঠাইয়া দেয়, কেহ বা চিনি কেহ বা মাংস দেয়। এই দানের উপর নির্ভর করিয়া সেই ব্যক্তি এখনও জীবন ধারণ করিতেছে। পুরাতন মনিবের পুত্র বা দূর আত্মীয় বলিয়া যদি কোন ব্যক্তি নিগ্রোর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিজের কষ্ট জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে, আমি সদর্পে বলিতে পারি, দক্ষিণপ্রান্তে এমন কোন নিগ্রো নাই যে, তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য না করিবে। নিগ্রোজাতির কি হৃদয় নাই?—নিগ্রোজাতির কি কৃতজ্ঞতা নাই? কাল চামড়ার ভিতর কি পরমাত্মার সিংহাসন নাই?

আমি বলিলাম নিগ্রোরা কখনও অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই। তাহারা ধর্ম্ম-ভীরু, কৃতজ্ঞ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। তাহারা কথার দাম বুঝে, কোন প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ধর্ম্মবৎ পালন করে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের একটি কাল গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে একটা চুক্তি করিয়া লইয়াছিল। তাহার সর্ত্তে সে নিজে মনিবের আবাদে না খাটিয়া তাহার পরিশ্রমের মূল্য-স্বরূপ কিছু টাকা বৎসর বৎসর মনিবকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সেই টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য এই ব্যক্তি ওহায়ো প্রদেশে স্বাধীন ভাবে মজুরি করিত। বৎসর বৎসর ভার্জ্জিনিয়ায় যাইয়া প্রভুর হাতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা গুণিয়া দিত। ইতি মধ্যে লড়াই বাধে—লড়াইয়ের ফলে সমগ্র দাসজাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, পুরাতন চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, বন্দোবস্ত ইত্যাদি সবই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কোন প্রভুই তাঁহার পূর্ব্বতন কোন গোলামকে কোন বিষয়ের জন্যই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বা খাটাইতে পারিবেন না—এই আইন যুক্তরাজ্যের মন্ত্রণাসভা হইতে জারি হয়। সুতরাং এই গোলামটি যদি এই সুযোগে তাহার পুরাতন চুক্তি অমান্য করিত এবং প্রভুকে বাকী টাকা দিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে কোন আইনে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইত না। কিন্তু আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে এই ব্যক্তি যত দিন পর্য্যন্ত তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বেকার প্রতিজ্ঞা মত ভার্জ্জিনিয়ায় যাইয়া প্রভুর নিকট টাকা দিয়া আসিত। এমন কি, সুদের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্তও সে দিয়া আসিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার মূল্য নিগ্রোরা বুঝে না কি? এই কৃষ্ণকায় নিগ্রো বুঝিয়াছিল যে, সে স্বাধীন হইয়াছে বটে, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে এখন তাহার কোন দোষই হইবে না। কিন্তু সে শারীরিক স্বাধীনতা অপেক্ষা চিত্তের ও আত্মার স্বাধীনতাকেই বেশী সম্মান

করিল। সমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার পূর্ব্বে সে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জ্জন করিয়া লইল।

তবে কি নিগ্রোরা স্বাধীনতা চাহিত না? গোলামের জাতি গোলামীগিরিতেই কি তন্ময় হইয়া গিয়াছিল? গোলামী ছাড়াইয়া উঠিতে কি আমার স্বজাতিরা ইচ্ছাই করিত না? প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের হৃদয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অতিশয় বলবতীই ছিল। আমি এমন একজন নিগ্রোকেও জানি না যে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিত না। আমি এমন একজন গোলামেরও কথা শুনি নাই যে গোলামীতেই লাগিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল।

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুর্ভাগ্য জাতি মাত্রেরই দুঃখ দেখিয়া আমি মর্ম্মে মর্ম্মে কষ্ট অনুভব করি। এইরূপে শৃঙ্খলিত জাতির অশেষ দুরবস্থা। কোন কারণে একবার পরাধীন হইয়া গেলে সে জাতি শীঘ্র সেই অবস্থা কাটিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের সমাজ-বন্ধন, তাহাদের পারিবারিক জীবন সকলই এই পরাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায়। অন্নসংস্থানের উপায়গুলিও এই দাসত্বের সর্ব্বমুখী প্রভাবের অধীন হইয়া পড়ে। চলিতে ফিরিতে গেলেও সেই প্রভাব ভুলিয়া থাকা যায় না। কাজেই দাসজাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আমি এই কারণে আমার প্রভুদের সম্বন্ধে কখনও কোন শত্রুভাব পোষণ করি নাই। দাসত্ব অনেকটা জীবন-যাপনের স্বাভাবিক আব্‌হাওয়ার মধ্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দাসত্বপ্রথা বাদ দিয়া সেই যুগের যুক্তরাজ্যে কোন অনুষ্ঠানই চলিতে পারিত না। যুক্ত রাজ্যের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম সবই গোলামী-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। ফলতঃ এই গোলামীগিরিকে দোষ দেওয়া সত্যসত্যই বড় অবিচারের কার্য্য।

এমন কি, আমি এ কথা বলিতেও বাধ্য যে, গোলামীর ফলে নিগ্রো জাতির যথেষ্ট উপকারই সাধিত হইয়াছে। দাসত্বের আব্‌হাওয়ায় আমাদের অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য অনেকটা পুষ্ট হইয়াছে—আমরা নিয়মিতরূপে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের কর্ম্মপটুত্ব জন্মিয়াছে। আমরা অনেকটা চিন্তাশীল হইয়াছি। কৃষি ও শিল্প-বিদ্যায় আমাদের 'হাতে-কলমে' শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমাদের নৈতিক চরিত্রও কিছু গঠিত হইয়াছে—ধর্ম্মভাবও জাগিয়াছে। আমেরিকার গোলামাবাদগুলির আব্‌হাওয়া আমাদের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বিদ্যালয়স্বরূপই ছিল। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মনিবদিগকে এজন্য আমি সর্ব্বদা সম্মান করিয়াই আসিয়াছি।

আমি গোলামী-প্রথার পক্ষপাতী নহি—দাসত্ব-প্রথা ভাল এ কথা আমি বলিতে চাহি না—সংসারে গোলামীগিরির আবশ্যকতাও আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমি জানি আমার প্রভুরা আমাদিগকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন নাই। আমি জানি যে তাঁহারা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই আমাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি জানি—আমরা যে কোন দিন মানুষ হইয়া উঠিব তাহা ইঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—এবং মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সজ্ঞানে কোন চেষ্টাও করেন নাই। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে, ভগবানের কর্ম্মকৌশল বিচিত্র। জগদীশ্বর

যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা তিক্ত ও কঠোর, পরিণামে তাহাই মধুময় ফল প্রসব করে। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই উপায়ে জগতের মহৎকর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবানের অপার করুণায় বিশ্বে কত অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। মানুষ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিধাতার মঙ্গলহস্তে যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। এই আশাতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য এত কথা বলিলাম।

আজ কাল লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে—"তুমি এই ঘোরতর দৈন্য, অজ্ঞতা, ও কুসংস্কাররাশির মধ্যে থাকিয়াও নিগ্রো-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে এত আশান্বিত?" আমার একমাত্র উত্তর এই যে, আমি ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসবান্। যাঁহার করুণায় নানা দুর্দ্দৈবের ভিতর দিয়া আমরা এতদূর উঠিয়াছি তাঁহারই করুণায় আমরা আরও উন্নত হইব। নিগ্রো-জাতি জগতের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার স্বকীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া জগদীশ্বরের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিবে।

আমি বলিলাম গোলামীর ফলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। অবশ্য অপকারও কম হয় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস—আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভু মহোদয়গণেরই ক্ষতি বেশী হইয়াছে। মনিব মহাশয়েরা বিলাসে ডুবিতে লাগিলেন। শারীরিক পরিশ্রম তাঁহাদের কষ্টকর বোধ হইত। বড় মহলে খাটিয়া খাওয়া একটা নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচিত হইত। ক্রমশঃ তাঁহারা সকল বিষয়ে স্বাবলম্বন, এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইলেন। প্রভুগণের সন্তানেরা কেহই কোন কৃষি বা শিল্পের পটুত্ব লাভ করিতে শিখিল না। মনিবের কন্যারা কেহই রাঁধিতে, শেলাই করিতে অথবা ঘর ঝাড়িতেও শিখিল না। সকল কাজই দাসেরা করিত। কিন্তু গোলামদিগের স্বার্থ আর কতটুকু? তাহারা কোন উপায়ে কাজ সারিয়া মনিবকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত মাত্র। সুচারুরূপে বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে দাসেরা শিখিত না। ফলতঃ, প্রভু-পরিবারে কোন শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতাম না। লক্ষ্মীশ্রী যাহাকে বলে মনিবমহলের গৃহস্থালীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত না। ঘর ভালরূপ পরিষ্কৃত থাকিত না। জানালার খড়খড়িগুলি ভগ্নাবস্থায় বহুদিন পড়িয়া থাকিত। দরজার খিল না থাকিলে তাহা লাগাইবার জন্য কেহই মাথা ঘামাইত না। যাহা যেখানে পড়িত তাহা সেখানে সেই অবস্থাতেই পচিত। খাওয়া দাওয়ারও সুখ মনিব-মহলে দেখি নাই। কোন দিন ঝাল বেশী পড়িত—নুন কম পড়িত। কখনও তাঁহারা মাংস আধ কাঁচাই খাইতেন—কোন দিন বা বেশী পোড়া খাদ্যই তাঁহাদের কপালে জুটিত। অর্থব্যয় কম হইত না—সকল বিষয়েই অপব্যয় যৎপরোনাস্তি হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লক্ষ্মীশ্রী মনিব-মহল হইতে বিদায় লইয়াছিল।

ক্রমশঃ দেখা গেল যে, গোলামেরাই মনিবসমাজ অপেক্ষা বেশী সুখে আছে। যে সময়ে মনিবেরা বিলাসসাগরে ভাসিয়া অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে গোলামেরা সকলেই কর্ম্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম-স্বীকার, ইত্যাদি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতেছিল। যখন তাহারা স্বাধীনতা পাইল তাহাদের পক্ষে নবজীবন আরম্ভ করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। গোলামীর যুগের শিক্ষাই স্বাধীনতার যুগের কাজকর্ম্মের জন্য তাহা-

দিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যারই তাহাদের অভাব ছিল। তাহা ছাড়া অনেক বিষয়েই তাহাদের চরিত্র ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহারা কোন না কোন কৃষিকর্ম্মে বা শিল্পকার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মনিব মহাশয়দের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। তাঁহারা গোলামদিগকে খাটাইতে খাটাইতে নিজেরাই সকল বিষয়ে যথার্থ গোলাম, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে লড়াই শেষ হইয়া গেল। আমরা মুক্তি পাইলাম। গোলামাবাদে মহা আনন্দের রোল উঠিল। আমরা যে স্বাধীন হইতে পারিব সংগ্রামের অবস্থা দেখিয়া ইতি-পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। কারণ প্রায়ই দেখিতাম দক্ষিণপ্রান্তের মনিবেরা হারিয়া গৃহে ফিরিতেছেন—কেহ পলাইতেছেন—কেহ ঘরবাড়ী সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। উত্তরপ্রান্তের ইয়াঙ্কি সৈন্যেরা দলে দলে গোলামাবাদগুলি দখল করিতে আসিবে—এইরূপ ভাবিয়া আমাদের প্রভুগণ টাকা-কড়ি মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাই এই লুক্কায়িত ধনের পাহারায় নিযুক্ত হইলাম। আমরা ইয়াঙ্কি সৈন্যগণকে অন্ন বস্ত্র জল ইত্যাদি সকল জিনিসই দিতাম—কিন্তু সেই লুক্কায়িত ভাণ্ডার কাহাকেও দেখাই নাই। কারণ আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রভুরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

যতই দিন অগ্রসর হইতে লাগিল আমরা গলা ছাড়িয়া গান সুরু করিলাম। আগে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতাম মাত্র। ক্রমশঃ আওয়াজ বাড়িল—সন্ধ্যার আমোদ গভীর রাত্রে শেষ হইতে লাগিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বেই অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিলাম এই আনন্দ-উৎসবের সময়ে আমরা স্বাধীনতার গানই গাহিতাম। পূর্ব্বেও আমরা অনেক সময়ে স্বাধীনতার গান গাহিয়াছি। কিন্তু তখন যদি কেহ স্বাধীনতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিত আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম যে তাহা পরলোকের স্বাধীনতা মাত্র—আত্মার মুক্তি মাত্র। এক্ষণে আমরা আর সেই আবরণ রাখিলাম না। এক্ষণে আমরা সোজাসুজি বলিতাম যে স্বাধীনতার অর্থ এই জগতেরই স্বাধীনতা—এই ভৌতিক শরীরেরই মুক্তি—অন্নবস্ত্র, চলা-ফেরা ইত্যাদি সকল বিষয়ের বন্ধন-হীনতা।

সেই মহা আনন্দের দিনের পূর্ব্ব রাত্রে গোলামখানার মহলে মহলে সংবাদ পাঠান হইল "কাল সকালে প্রভুদের বড় কুঠিতে একটা বিশেষ সম্মিলন হইবে। তোমরা সকলেই উপস্থিত হইও।" সেই রাত্রে আমাদের আর ঘুম হইল না। সকালে উঠিয়াই আমরা প্রভুর গৃহে সমবেত হইলাম। দেখিলাম মনিব-পরিবারের সকলেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আছেন। সকলকেই যেন কিছু চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম—কিন্তু কাহাকেও বিশেষ দুঃখিত বলিয়া বোধ হইল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে তাঁহারা আর্থিক ক্ষতির জন্য বেশী চিন্তা করিতেছেন না—তাঁহারা যে এতদিনের সঙ্গী ও আত্মীয়গণকে একদিনে বিদায় দিবেন সেই দুঃখেই তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া রহিয়াছে। আর দেখিলাম একজন নূতন পুরুষকে, ইনি বোধ হয় যুক্তরাজ্যের কোন কর্ম্মচারী। তিনি একটা লম্বা কাগজ হাতে করিয়া একটা

ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। তার পর সেই কাগজ হইতে পাঠ করিলেন—স্বাধীনতার ঘোষণা।

পড়া শেষ হইয়া গেল, আমাদিগকে বলা হইল যে আমরা স্বাধীন হইয়াছি। যাহার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি। এখন হইতে যাহার যে কাজ ভাল লাগে সে সেই কাজই করিতে পারে। আমার মাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তার পর তিনি বলিলেন যে, এই দিনের জন্যই তিনি এত কাল প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ দুঃখ এই ছিল যে, বোধ হয় তিনি এই সুখের দিন দেখিবার পূর্ব্বেই মারা যাইবেন।

কিয়ৎকাল সর্ব্বত্র নাচানাচি এবং ধন্যবাদের পালা পড়িল। আনন্দের আর সীমা নাই—বিকট উল্লাসে সকলেই যেন অধীর। কিন্তু প্রতিহিংসা বা মনিবদের প্রতি বিরুদ্ধতাচরণ করিবার প্রবৃত্তি কোথায়ও লক্ষ্য করি নাই।

আনন্দের ধ্বনি ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলাম মহলে চিন্তা আসিয়া জুটিল। স্বাধীন ত হইলাম। কিন্তু স্বাধীনতার দায়িত্ব ত বড় কম নয়? স্বাধীন ভাবে চলিতে ফিরিতে হইবে—স্বাধীন ভাবে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। নিজে মাথা খাটাইয়া নিজ নিজ অভাব মোচন করিতে হইবে—নিজ বাহুবলে ও নিজ চরিত্র-বলে গৃহস্থালী, পরিবার-পালন, সন্তানরক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই চালাইতে হইবে। এ যে বিষম দায়িত্ব। দশ বৎসরের একটি বালককে যেন তাহার বাপ মা বলিলেন যে "বাছা তুমি নিজ শক্তিবলে যাহা পার কর—চরিয়া খাও—আমাদের কোন সাহায্য পাইবে না!" আমাদের পক্ষেও ঠিক যেন এইরূপ আদেশই হইল। ইহা অনুগ্রহ কি নিগ্রহ ভুক্তভোগী ভিন্ন কে আর তাহা বুঝিবে?

সমগ্র য়্যাংগ্লো-স্যাক্‌সন জাতি হাজার বৎসরেও যে সকল সমস্যার মীমাংসা এখনও সুন্দররূপে করিয়া উঠিতে পারে নাই, নিগ্রো-জাতির ঘাড়ে সেই সমস্যার সমাধান করিবার ভার হঠাৎ চাপাইয়া দেওয়া হইল! কাজেই দেখিতে দেখিতে স্বাধীনতা-লাভের আনন্দ গোলামাবাদের মহলে মহলে গভীর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে স্বাধীনতা-রত্নের জন্য তাহারা অনেকে এতদিন অশ্রু ফেলিয়াছে, আজ যখন তাহা সত্য সত্যই তাহাদের করতলগত হইল, তখন যেন তাহারা ভাবিতে লাগিল—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" অনেকের বয়স প্রায় ৭০.৮০ বৎসর। তাহারা নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। ইহাদের পক্ষেই কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অধিকন্তু তাহারা এত কাল মনিব-দের সেবা করিয়া তাঁহাদের প্রতি সত্য সত্যই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন জন্মিয়াছিল। তাঁহারা যে ইহাদের আপন হইতেও আপন। তাঁহাদের পারিবারিক সুখে ইহারা যে কতই না সুখ অনুভব করিয়াছে এবং দুঃখে কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছে। যাঁহাদের সঙ্গে বসবাস করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়াছে, তাঁহাদের মায়া যে কোন মতেই ছাড়ে না। সমস্ত গোলামাবাদের আব্‌হাওয়াতেই তাহাদের জীবন পুষ্ট হইয়াছে। তাহাদের হৃদয়ের শিকড়গুলি প্রভুর পুত্র-কন্যায় এবং মনিবের সম্পত্তিতে দৃঢ় ভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ একদিনে ছিঁড়িয়া ফেলা কি সম্ভবপর? সেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিলে কি তাহারা বাঁচিতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমার বাল্য-জীবন

স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ প্রান্তের গোলামেরা তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল। প্রথম সাব্যস্থ হইল যে তাহাদের নামগুলি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। গোলামী যুগের নাম রাখা আর কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। আর একটা প্রস্তাবেও সকলেরই যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। তাহারা স্থির করিল যে কিছু দিনের জন্য গোলামাবাদের বাহিরে যাইয়া তাহাদের বাস করা আবশ্যক। তাহা হইলেই তাহারা সত্য সত্য স্বাধীন হইয়াছে কিনা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। বিশষতঃ গোলামখানার গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারাটাই তাহাদের নব প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রথম লক্ষণ বিবেচিত হইবে।

গোলামীর যুগে দাসগণের নামগুলিও গোলামী সূচক ছিল। তাহাদের নামের আগে পিছে কোন পদবী বা সম্মান বা জাতি বা ব্যবসায় বা ধর্ম্ম বাচক কোন শব্দ সংযুক্ত থাকিত না। একটি মাত্র শব্দেই তাহাদের নাম প্রকাশিত হইত। কেহ 'জন', কেহ বা 'সুসান', কেহ 'হরা', কেহ বা 'পদা', ইত্যাদি। বড় জোর প্রভুর উপাধি বা পদবী এই সকল নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। প্রভুর পদবী 'হ্যাবরে' থাকিলে, তাঁহার দাসেরা 'হ্যাবারের জন' বা 'জন হ্যাবার' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। 'জন' ত হ্যাবারের সম্পত্তি বিশেষ। হ্যাবারের কুকুর বলিলে কুকুরে হ্যাবারে যেরূপ সম্বন্ধ বুঝায় এবং কুকুরকে যেরূপ সহজে চিনিয়া লওয়া যায়, 'হ্যাবারের সুসান' এই নামেও সুসানের সঙ্গে হ্যাবারের সেইরূপ সম্বন্ধই বুঝাইত এবং সেইরূপ সহজেই দাস-মহল হইতে সুসান গোলামকে চিনিয়া লওয়া যাইত। বলা বাহুল্য এরূপ নাম করণে স্বাধীনতার গন্ধ মাত্র নাই—ব্যক্তি একটি নির্জ্জীব পদার্থ স্বরূপ, কেনা গোলাম মাত্র। প্রভু যেন তাহার কপালে একটা দাগ দিয়া নিজ সম্পত্তির হিসাব ও চিহ্ন রাখিয়াছেন মাত্র।

সুতরাং পুরাতন নাম বর্জ্জন এবং নূতন নাম গ্রহণই স্বাধীন নিগ্রোর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। প্রভুদের নাম নিজ নিজ নাম হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পরিবর্ত্তে কেহ 'জন এস্‌লিঙ্কলন্' কেহ 'জন এস্ শার্ম্মান' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। মধ্যস্থলের 'এস্' শব্দের কোন অর্থই থাকিত না। তিন শব্দের নাম রাখিতেই হইবে—সুতরাং প্রথম শব্দে প্রকৃত নাম, তৃতীয় শব্দে উপাধি বা পদবী, দ্বিতীয় শব্দে যা হয় কিছু বুঝান হইত।

তাহার পর গোলামাবাদ ছাড়িয়া সকলেই কিছু দিনের জন্য এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। পরে কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন মনিবের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কারবার করিবার জন্য নূতন নূতন চুক্তি বা বন্দোবস্ত করিয়া লইল। বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। যাহারা এইরূপে পুরাতন

মনিবের সঙ্গেই বসতি করিতে চাহিল, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধদের সংখ্যাই বেশী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি আমার জনককে কখনও দেখি নাই। আমার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ছিলেন। তাঁহাকেও বড় বেশী দেখি নাই। আমরা যে মনিবের গোলাম ছিলাম তিনি সেই মনিবেরই গোলাম ছিলেন না। তাঁহার গোলামীর কর্ম্মক্ষেত্র কিছু দূরে ছিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বেই তিনি পলাইয়া একটা নবগঠিত প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রদেশের নাম ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া। সেই সময়ে লড়াই চলিতেছিল—এজন্য তাঁহার পলায়নের বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। যখন সকল দাসেরই স্বাধীনতা ঘোষিত হইল, তিনি আমার মাতাকে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নূতন বাসভবনে আসিতে আদেশ করিলেন। ভার্জ্জিনিয়া হইতে ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে যাইতে হইলে পার্ব্বত্য প্রদেশ পার হইয়া যাইতে হয়। দূরও বড় কম নয়—প্রায় ৭০০।৮০০ মাইল। আমাদের জামা কাপড় ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যাহা হউক গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা সকলে যাত্রা করিলাম। অবশ্য বেশী পথ হাঁটিয়াই চলিয়াছিলাম।

আমরা পূর্ব্বে কোনদিনই এক প্রদেশ ছাড়িয়া অন্য প্রদেশে যাই নাই। এমন কি, গোলামাবাদ ছাড়িয়া বেশী দূর যাইবার অবসর বা কারণও কখন উপস্থিত হয় নাই। এইবার কাজেই আমাদের বিদেশযাত্রার সমারোহ মনে হইয়াছিল। পুরাতন মনিবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে দৃশ্য অতিশয় হৃদয়-বিদারক। সেই চির-বিদায়ের কথা সর্ব্বদা আমার মনে আছে। তাঁহাদের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত আমি চিঠি-পত্রের আলাপ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এখনও তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারি নাই।

রাস্তায় কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। খোলা মাঠে শুইতাম, গাছতলায় রাঁধিয়া খাইতাম। এক রাত্রে একটা পুরাতন ভাঙ্গা-বাড়ী পাইয়া আমার মাতা তাহার মধ্যে রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ীতে একটা 'ষ্টোভ' ছিল। ষ্টোভের ভিতর আগুন জ্বালিবা মাত্র উহার নলের ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড কাল সাপ বাহির হইয়া আসিল। আমরা 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়া সেই গৃহে ভোজন-শয়নের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলাম। এইরূপে নানা সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। নগরটি ক্ষুদ্র—নাম ম্যাল্‌ডেন। ইহার পাঁচ মাইল দূরেই ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া-প্রদেশের রাজধানী বা প্রধান নগর চার্লষ্টন।

এই সময়ে ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়ায় নুনের কারবার বেশ চলিতেছিল। আমাদের নগরের ভিতরেই এবং আশেপাশে অনেকগুলি নুনের কল ছিল। এইরূপ একটা কলে আমার মাতার স্বামী একটা চাকরী পাইয়াছিলেন। তাহার নিকটেই তিনি একটা কামরাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কামরা আমাদের পুরাতন গোলামখানার কুঠুরী অপেক্ষা খারাপই হইবে, কোন অংশেই ভাল নয়। গোলামাবাদের কুঠুরিগুলি যেরূপই থাকুক না কেন, তাহার বাহিরে আসিলে নির্ম্মল বাতাস যথেষ্টই পাইতাম। কিন্তু এই স্বাধীন বাসভবনে ইহার অভাব যৎপরোনাস্তি। কামরাগুলি এত লাগালাগি এবং চারি ধারে এত ময়লা জমিয়া থাকে যে

একটা প্রকাণ্ড নরকের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি মনে হইত।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সাদা কাল দুই প্রকার লোকই ছিল। সাদা চামড়ার লোকেরা অবশ্য শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের অতি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের না ছিল বিদ্যাবুদ্ধি, না ছিল পরিচ্ছন্নতা, না ছিল ধর্ম্ম-ভয়। বরং অধর্ম্ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার যেন সেই আবহাওয়ার মধ্যে অপ্রতিহতগতিতে বিরাজ করিত।

পাড়ার প্রায় সকলেই নুনের কলে কাজ করিত। আমার বয়স অত্যন্ত অল্পই ছিল। তথাপি আমার মাতার স্বামী আমাকে একটা কাজে লাগাইয়া দিলেন। আমার দাদাও একটা কাজে লাগিয়া গেল। আমাকে প্রত্যূষে চারিটা হইতে কাজ করিতে হইত।

এই নুনের কলে কাজ করিতে করিতে আমার প্রথম কেতাবীশিক্ষা লাভ হয়। নুন বস্তাবন্দি করিবার পর বস্তার গায়ে একটা করিয়া নম্বর বসাইবার নিয়ম ছিল। আমার অভিভাবকের চিহ্ন ছিল ১৮। প্রতিদিন কলের কাজ শেষ হইবার সময়ে কলের একজন বড় সাহেব আসিয়া আমার অভিভাবকের বস্তাগুলির উপর ১৮ এই চিহ্ন লিখিয়া যাইত। আমি আর কোন চিহ্ন চিনিতাম না। অনবরত দেখিতে দেখিতে ১৮ চিহ্নটি আমার সুপরিচিত হইয়া গেল।

আমার প্রথম হইতেই লেখা পড়া শিখিবার বড় সাধ ছিল। শৈশবেই আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে জীবনে যদি আর কিছুই না করিতে পারি অন্ততঃ যেন কিছু বিদ্যালাভ করিয়া মরিতে পারি। আর কখনও যদি আমি লেখাপড়া শিখি তাহা হইলে অন্ততঃ সাধারণ খবরের কাগজ এবং সাদাসিধা পুস্তকাবলী পড়িয়া বুঝিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। এখানে আসিবার পর আমার মাতাকে অনুরোধ করিয়া একখানা পুস্তক আনাইয়া লইলাম। ওয়েবষ্টারের 'বর্ণ-পরিচয়' বই আমার হস্তগত হইল। আমি অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলাম। কোন শিক্ষকেরই সাহায্য পাই নাই। যাহা হউক, যেন তেন প্রকারেণ অক্ষরগুলি চিনিয়া ফেলিলাম। আমার মাতাই আমার এই প্রাথমিক শিক্ষালাভের চেষ্টায় একমাত্র সহায় ছিলেন। তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুই ছিল না সত্য—কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা, সৎসাহস, দৃঢ় সঙ্কল্প, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অশেষ গুণ ছিল। কাজেই আমার উচ্চ অভিলাষে তিনি যথেষ্টই সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট উৎসাহ না পাইলে আমার জীবনের গতি হয়ত অন্যরূপ হইত।

ইতিমধ্যে একটি নিগ্রো বালক ম্যাল্‌ডেনে আসিল। সে ওহায়োপ্রদেশের কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিত। তাহাকে পাইয়া আমার নিগ্রো স্বজাতিরা যেন চাঁদ হাতে পাইল। তাহার আদর দেখে কে? প্রতিদিন সন্ধ্যা কালে কাজ-কর্ম্ম সারিয়া আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিতাম। সে একটা খবরের কাগজ পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইত ও বুঝাইয়া দিত। সে আমাদের পাড়ার গুরু মহাশয় হইয়া পড়িল। তাহার এই সম্মান ও ক্ষমতা দেখিয়া আমি সত্যসত্যই তাহাকে হিংসা করিতাম। মনে হইত তাহার সমান বিদ্যার অধিকারী হইতে পারিলে আমি আর কিছু চাহি না।

ক্রমশঃ আমাদের পল্লীতে নিগ্রোদের জন্য একটা পাঠশালা খুলিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। মহা ধুমধাম আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ-কায় সমাজে একটা বিদ্যালয়ের কথা এ অঞ্চলে আর পূর্ব্বে কখনও উঠে নাই। সর্ব্বত্রই আন্দোলন পৌঁছিল। প্রধান সমস্যা হইল—শিক্ষক পাওয়া যায় কোথায়? ওহায়োর সেই বালকের নামই সকলের মুখে মুখে রহিয়াছে। কিন্তু সে যে নিতান্তই চ্যাংড়া। যাহা হউক, ওহায়ো হইতে আর একজন শিক্ষিত যুবক ম্যাল্‌ডেন নগরে হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। তাহার বয়স সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইল না। সে কিছুকাল সেনাবিভাগেও কাজ করিয়াছে। সুতরাং তাহাকেই শিক্ষকপদে নিযুক্ত করা হইল।

পাঠশালার খরচ চালাইবার জন্য নিগ্রোরা সকলেই মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইল। শিক্ষকের বেতন জোগান কঠিন। কাজেই বন্দোবস্ত হইল যে, সে প্রত্যেক পরিবারে একদিন করিয়া শয়ন ভোজন করিবে। এইরূপে চাঁদা করিয়া খাওয়ান-ব্যবস্থা শিক্ষকের পক্ষে মন্দ নয়। কারণ যেদিন যে পরিবারের পালা সেদিন তাহারা শিক্ষককে যথাসম্ভব 'চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়' না দিয়া থাকিতে পারে কি? আমার মনে আছে—আমি আমাদের পরিবারের সেই 'মাষ্টারের দিন' কবে আসিবে ভাবিয়া সুখী হইতাম। সেই দিন ফাঁকতালে আমারও বেশ ভাল খাদ্যই জুটিত!

এই প্রণালীতে আর কোথায়ও বিদ্যালয় হইয়াছে কি? আমি জানি না। সমস্ত জাতিটাই যেন একটা পাঠশালা—সমস্ত গ্রামটাই যে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ—পাড়ার সকল লোকই যেন বিদ্যালয়ের ছাত্র, অভি-ভাবক, পরিচালক। সমগ্র জাতির পক্ষে বিদ্যারম্ভ ও "হাতে খড়ী" হইল। এই উপায়ে আর কোন জাতি জগতের ইতিহাসে গড়িয়া উঠিয়াছে কি?

নিগ্রো সমাজের কেহই এই শিক্ষার আন্দোলনে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ রহিল না। বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলেই আগ্রহের সহিত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। "মরিবার পূর্ব্বে যেন অন্ততঃ বাইবেল-গ্রন্থ পড়িতে পারি"—এই আকাঙ্ক্ষায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ লোকেরাও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। কোনরূপে শিক্ষক পাইলেই পাঠশালা খোলা হইত। দিবাবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, রবি-বারের বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ পাঠশালার সাহায্যে নিগ্রোপল্লীতে বর্ণ-জ্ঞান, বানান, সরল ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা ইত্যাদি প্রচারিত হইতে লাগিল।

যাহা হউক আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় ত প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু আমার কপাল ফিরিল না। আমি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পাইলাম না। আমার অভিভাবক আমাকে নুনের কলে খাটাইয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। বড়ই অনুতাপের বিষয় হইত যখন আমি কল হইতে দেখিতাম যে, আমারই সমান-বয়স্ক নিগ্রো-বালকেরা সকালে সন্ধ্যায় স্কুলে যাওয়া আসা করিতেছে। অবশ্য আশা ছাড়িলাম না। আমি আমার সেই ওয়েবষ্টারের 'প্রথম ভাগ'ই পূর্ব্বের ন্যায় পড়িতে থাকিলাম।

পরে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। রাত্রে যাইয়া তাঁহার নিকটে কিছু কিছু শিখিয়া আসিতাম। এই উপায়েই আমি অনেকটা শিখিয়া ফেলিলাম। আমি নৈশবিদ্যালয়ের উপ-

কারিতা নিজ জীবনে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি আর কেহ তাহা বোধ হয় করেন নাই। এইজন্য আমি আজকাল নৈশ-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার এত পক্ষপাতী। এই অভিজ্ঞতার সাহসেই আমি পরে হ্যাম্পটনে এবং টাস্কেজীতে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি।

কিন্তু কেবলমাত্র নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়াই আমি কোন মতে স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম—দিবাভাগের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবই হইব। কান্নাকাটি করিতে করিতে অভিভাবকের অনুমতি পাইলাম। স্থির হইল যে, আমি খুব সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই নয়টা পর্য্যন্ত কলে কাজ করিব। পরে বিদ্যালয়ে যাইব এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পরেই আরও দুই ঘণ্টা কলে কাজ করিব।

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। পাঠশালা ঠিক নয়টার সময়েই বসে—অথচ আমার বাড়ী হইতে ইহার দূরত্বও কম নয়। কাজেই নয়টা পর্য্যন্ত কলে কাজ করিয়া স্কুলে পৌঁছিতে রোজই আমার দেরী হইতে লাগিল। এ অসুবিধা এড়াইবার জন্য আমি একটা ফিকির করিলাম। আপনারা আমার দুষ্টামী দেখিয়া চটিবেন। কিন্তু কি করিব? সত্য কথা বলিতেছি। আমাকে বাধ্য হইয়াই অসত্যের পথ ধরিতে হইয়াছিল। কলের আফিসে একটা ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়ি দেখিয়া সকলে কাজ-কর্ম্মের সময় ঠিক করিত। আমি রোজ সকালে যাইয়া সেই ঘড়ির কাঁটা সরাইয়া দিতাম। ঠিক ৮॥০ সময়ে ৯টা বাজিয়া যাইত। আমি কল ছাড়িয়া যথাসময়ে পাঠশালায় পৌঁছিতাম। পরে বড় সাহেব ব্যাপার বুঝিয়া আফিস-ঘরে চাবি লাগাইয়া দিলেন। আমি আর ঘড়ির কাঁটা সরাইতে পারিতাম না।

পাঠশালায় ত ভর্ত্তি হইলাম। হইয়াই বিপদ। সকল ছাত্রের মাথায়ই একটা করিয়া টুপি। কিন্তু আমার মাথায় কোন আবরণই ছিল না। মাথায় টুপি দিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা অবশ্য আমি পূর্ব্বে কখনও চিন্তা করিতেই পারি নাই। পাঠশালায় যাইবামাত্রই আমার অভাব বুঝিতে পারিলাম। তখন আমাদের অঞ্চলে নূতন ফ্যাশনের এক টুপি উঠিয়াছে। ছেলে বুড়ো সকলেই সেই টুপি ব্যবহার করে। আমার মাতার অত পয়সা নাই। তিনি দুই টুকরা কাপড় দিয়া ঘরেই একটা টুপি শেলাই করিয়া দিলেন। আমি টুপি মাথায় দিলাম!

আমি এই ঘটনায় একটা বড় শিক্ষা পাইয়াছিলাম। তাহা আমি চিরজীবন কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মাতা কখনও লোক-দেখান বাবুগিরি বা সামাজিকতা অথবা লৌকিকতার ধার ধারিতেন না। সর্ব্বদাই নিজের আর্থিক অবস্থানুসারে তিনি গৃহস্থালী চালাইতেন। অন্যান্য অনেক নিগ্রোকে দেখিয়াছি—যাহাদের পেটে অন্ন জুটে না—কিন্তু নূতন ফ্যাশনের টুপি মাথায় দিয়া বেড়াইতে না পারিলে ঘুম হয় না! এজন্য তাহারা ঋণগ্রস্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমার মাতার সৎসাহস দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তিনি ধার করিয়া বাবুগিরি ও ফ্যাশনের দাস হইলেন না। তৎকালীন নিগ্রো-সমাজের পক্ষে এরূপ চরিত্রবত্তা নিতান্তই বিরল। আজ অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে আমার সমপাঠীদের ভিতর যাহারা বাবুগিরি ও

বিলাসের নূতন নূতন অনুষ্ঠানগুলি ব্যবহার করিত তাহারা পরে অনাহারে দুঃখে দারিদ্র্যে জীবন কাটাইয়াছে।

পাঠশালায় ভর্ত্তি হইবার সময়ে আমাকে আর একটা বিপদ উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এতদিন আমাকে লোকে 'বুকার' বলিয়া ডাকিত। তাহাই আমার নাম জানিতাম। স্কুলে যাইবা মাত্রই নাম লইয়া মহা গোল-যোগে পড়িলাম। প্রত্যেক ছাত্রেরই দুইটা শব্দে নাম ডাকা হইতেছে। কাহারও বা তিন শব্দে নাম সম্পূর্ণ। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় যখন আমার নাম খাতায় তুলিবেন তখন কি বলিব? ভাবিতে ভাবিতে একটা ঠিক করিয়া লইলাম। যেই শিক্ষক আমার গোটানাম শুনিতে চাহিলেন, আমি গম্ভীর-স্বরে বলিয়া দিলাম 'বুকার ওয়াশিংটন' যেন চির দিন আমাকে লোকে এই নামেই জানে। পরে শুনিয়াছি, আমার মাতা আমাকে 'বুকার ট্যালিয়াফারো' নাম দিয়া-ছিলেন। কিন্তু 'ট্যালিয়াফারো" শব্দ কোন কারণে আমার মনে ছিল না। যখন ইহা জানিলাম তখন হইতে আমি তিন তিনটা শব্দের নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। সুতরাং আজ আমি বুকার ট্যালিয়াফারো ওয়াশিংটন।

অনেক সময়ে আমি নিজকে কোন বড় লোকের সন্তানরূপে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেন আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ধনী-সচ্চরিত্র, সুপণ্ডিত ইত্যাদি ছিলেন। যেন উত্তরাধিকারের সূত্রে আমি বংশ-গৌরব, সামাজিক কীর্ত্তি, জমিদারী ইত্যাদির অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। যেন আমি একটি বনিয়াদি ঘরের সন্তান। কিন্তু এইরূপ কল্পনায় আমি বিশেষ সুখী হইতাম না। আমি বুঝি, পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের দোহাই দিয়া যদি আমি বড় হইতে যাই তাহা হইলে আমার নিজের কৃতিত্ব কি হইল? পরের ঘাড়ে চড়িলে সকলকেই বড় দেখায়। নিজ ব্যক্তি-গত চরিত্রের প্রভাব তাহাতে কিছু বুঝা যায় কি? তাহা ছাড়া উন্নতির পথে একটা বড় অসুবিধা বোধ হয় আসিয়া জুটে। সকল বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, পরের ধনে পোদ্দারি করিতে ইচ্ছা হয়। নিজে খাটিয়া নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করিতে সুযোগ বেশী পাওয়া যায় না। নিজের দায়িত্বজ্ঞান এবং কর্ত্তব্যবোধও কমিতে থাকে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। নিগ্রোদের পূর্ব্বগৌরব কিছুই নাই। অতীত ইতিহাসের নজির আনিয়া তাহাদের কীর্ত্তি-কলাপ প্রচার করিবার কোন উপায় নাই। এমন কি, তাহাদের অতীত নাই বলিলেই চলে—যাহা আছে তাহা অন্ধকারময়, হয়ত ঘৃণ্য, নিন্দনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না—তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ বিচার করিতে যাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। তাহারা জাতীয় জীবন আরম্ভ করিতেছে মাত্র, সমগ্র নিগ্রোজাতির এখন শৈশব অবস্থা। কাজেই তাহাদের বিঘ্ন অনেক, অসুবিধা অনেক, অকৃতকার্য্যতার কারণ অনেক। আপনারা বহুদিন হইতে জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, আপনারা প্রারম্ভিক যুগের নৈরাশ্য, অকৃতকার্য্যতা ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া সফলতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এখন 'হাতে খড়ী'র অবস্থা। আপনাদের আজকালকার

কাজ-কর্ম্ম দেখিবার পূর্ব্বে সকলে ধরিয়া রাখে যে আপনারা কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু আমরা কাজ আরম্ভ করিলে লোকেরা ভাবিয়া থাকে যে আমাদের অকৃতকার্য্যতাই সুনিশ্চিত। আমাদের সফলতা 'হাতের পাঁচ' স্বরূপ। কারণ আর কিছুই না—পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনারা প্রবীণ, আমরা নবীন, আপনাদের এখন জীবন-মধ্যাহ্নের যুগ চলিতেছে, আমাদের জীবন-প্রভাতও বোধ হয় আরব্ধ হয় নাই।

সুতরাং অতীত ইতিহাসের সুবিধাও আছে। পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্র-সম্বল বর্ত্তমান কালে ব্যক্তির ও জাতির মূলধন স্বরূপ কার্য্য করে। অতীতের স্মৃতি মানুষকে বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়, ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব শিখাইয়া দেয়। আর বাপ দাদার দোহাই অত্যধিক না দিলেই আত্মসম্মান-বোধ বজায় থাকে। পূর্ব্বকীর্ত্তি খানিকটা মনে রাখিয়া চলিলেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আজকাল আপনারা কথায় কথায় শ্বেতাঙ্গ বালকবালিকা এবং নিগ্রো বালকবালিকার চরিত্র তুলনা করিয়া আমাদিগকে অবনত সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। আমরা অনেক বিষয়ে যে হীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার আপনারা কল্পনা করিয়া দেখিবেন যে আপনাদের কোন পিতামহ মাতামহ ইত্যাদি ছিল না, আপনাদের বংশকথা নাই, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাস্তভিটা ইত্যাদি কিছুই নাই। তাহা হইলে আমাদের নৈতিক চরিত্রের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

যাহাদের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাদের কি চরিত্র গঠিত হইতে পারে? যাহাদের পারিবারিক বন্ধন কিছু নাই, তাহারা কি চক্ষুলজ্জার ভয় করে? তাহাদের সমাজই যে নাই! যাহারা পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভাবিতে শিখে নাই, যাহারা বর্ত্তমানে রক্তের সম্পর্ক স্বীকার করে না, যাহাদের মামা খুড়ী দিদি শ্বশুর ইত্যাদি সম্পর্কবিশিষ্ট গুরুজন নাই, যাঁহাদের সন্তানসন্ততির জন্য মায়া বিকশিত হইতে পারে না, তাহারা কি মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের বিবেক, মানুষের সদসদ্‌জ্ঞান, ইত্যাদি অর্জ্জন করিতে পারে? নিগ্রো-জাতির এই অবস্থা। সমাজের বা আত্মীয়-গণের মুখ চাহিয়া তাহাদিগকে কোন কাজ করিতে হয় না। কাহারও গৌরব নষ্ট হইয়া গেলে সমাজে পরিবারের কলঙ্ক রটিবে, সে ভয় তাহাদের নাই। নিজে কোন কীর্ত্তির কর্ম্ম করিয়া গেলে পরিবারের দশজন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাহা লইয়া গৌরব করিবে—কোন নিগ্রোই এইরূপ ভাবিতে শিখে না।

আমার কথা বলিলেই সকলে বিষয়টা বুঝিতে পারিবেন। আমার মাতামহী কে ছিলেন কখনও জানি না। আমি শুনিয়াছি আমার মামা মামী, পিসা পিসী, কাকা কাকী এবং মাসতুত পিসতুত খুড়তত ভাইবোন ইত্যাদি আছেন। কিন্তু তাঁহারা কে কোথায় কি করিতেছেন কিছুই জানি না। আমাদের নিগ্রোজাতির সকলেরই পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এইরূপ। কিন্তু শ্বেতকায়দিগের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতিপদবিক্ষেপেই তাহাদিগকে পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইতে হয়। তাহারা যদি একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার চৌদ্দপুরুষের মুখে চুণ-কালি পড়িবে। এই জ্ঞান তাহাদের সর্ব্বদা থাকে। কাজেই প্রলোভন, অসংযম ইত্যাদি তাহারা

সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে। যখনই কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি কর্ম্ম আরম্ভ করে, তখনই তাহার মনে বিরাজ করিতে থাকে যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা নানা সৎকর্ম্ম করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং সেও যে সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা ত সুনিশ্চিত। পূর্ব্বপুরুষদের কৃতকার্য্যতা বর্ত্তমান প্রয়াসের একটা মস্ত সহায়।

আমার অভিভাবক বেশী দিন আমাকে পাঠশালায় যাইতে দিলেন না। কিছুকাল পরেই আমার নাম কাটা হইয়া গেল। তখন হইতে আমি আবার সেই নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই জীবনের সম্বল করিলাম। আমার বাল্য-জীবনের সকল শিক্ষাই আমি নৈশ-বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছি—এ কথা বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না। দিবাভাগে আমি লিখিবার পড়িবার অবসর কিছুমাত্র পাই নাই বলিলেই চলে।

অনেক সময়ে কার্য্য শেষ করিয়া নৈশ-শিক্ষার চেষ্টায় রত হইয়া দেখিতাম—শিক্ষক নাই। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমাকে খুব ভুগিতে হইয়াছে। অনেক শিক্ষক এমন জুটিয়াছেন যাঁহাদের বিদ্যা প্রায় আমারই সমান! বহুকাল এরূপও কাটিয়াছে যখন রাত্রিকালে শিক্ষালাভের জন্য ৫।৬ মাইল দূরে হাঁটিয়া যাইতাম। আমার বাল্যজীবনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ছিল—যেমন করিয়াই হউক আমি শিক্ষালাভ করিব। এই জন্য নৈরাশ্য আমাকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে নাই।

ওয়েষ্ট-ভার্জ্জিনিয়ায় বসতি করিবার সময়ে আমার মাতা একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। "নিজে শুতে ঠাঁই পায় না—শঙ্করাকে ডাকে!" আমাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—অথচ একজন নূতন লোক পরিবারে প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে ভাইএর ন্যায় গ্রহণ করিলাম। তাহার নাম দিলাম জেম্‌স্ বি ওয়াশিংটন।

নুনের কলের কাজ ছাড়িয়া একটা কয়লার খনিতে কাজে নিযুক্ত হইলাম। এই খনি হইতে কলের কয়লা জোগান হইত। কয়লার খনিতে কাজ করিলে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে তাহা জানা যায় না। সমস্ত দিন খাটিতে খাটিতে শরীরে এত ময়লা আসিয়া জমে যে তাহা আর উঠে না। এইজন্য আমি এই কাজে বিশেষ নারাজ ছিলাম। তাহার উপর, খনির মুখ হইতে কয়লার স্তর পর্য্যন্ত এক মাইল দূর। সেই রাস্তায় অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে তবে কয়লার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেইখানে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার কামরা বা পাড়া। সেইগুলিকে অন্ধকারের মধ্যে চিনিয়া বাহির করা বড় সোজা কথা নয়। সেখানকার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কয়লার কামরা-গুলিও আমি কোন দিনই খুঁজিয়া লইতে পারি নাই। অধিকন্তু হঠাৎ যদি লণ্ঠনের আলো নিবিয়া যাইত, তাহা হইলে 'ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি" হইত। এদিক ওদিক অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম—দৈবাৎ অন্য কোন কুলীর দেখা পাইয়া পথ বাছিয়া লইতাম। মৃত্যুভয়ও কম ছিল না। খনির ভিতর দুর্দ্দৈব প্রায়ই ঘটিত। কোন সময়ে একচাপ কয়লা ধসিয়া পড়িয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইত। কখনও বা বারুদ যথাসময়ের পূর্ব্বে ফাটিত। তাহাতে অসতর্ক কুলীরা মারা যাইত।

ছেলেবেলায় যখন আমি মুনের কলে অথবা কয়লার খাদে কাজ করিতাম, তখন আমি শ্বেতাঙ্গ বালকদের মনের অবস্থা এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। যৌবনকালেও অনেকবার শ্বেতাঙ্গ যুবকদের অন্তরের চিন্তারাশি অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিতাম তাহাদের উচ্চ অভিলাষকে বাধা দিবার কিছুই নাই—সংসারের সকল পদার্থই তাহাদিগকে বড় বড় কর্ম্মের দিকে উৎসাহিত করিতেছে। ভাবিতাম তাহারা অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত জ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সুযোগ পায়। কোন বিষয়ে ক্ষুদ্রত্ব, পঙ্গুত্ব, নীচত্ব তাহাদিগের চিন্তা ও কর্ম্মরাশিকে স্পর্শ করিতে পারে না। বড় বড় কারবার লইয়াই তাহারা ব্যাপৃত। তাহারা চেষ্টা করিলে যুক্তরাজ্যের সভাপতি হইতে পারিতেছে—বড় বড় অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক হইতেছে—বিশাল কর্ম্মকেন্দ্রের পরিচালক হইতেছে। তাহারা ধর্ম্মমন্দিরের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, দেশ-শাসকের মর্য্যাদা পাইতে পারে। কেহই তাহাদিগের উদ্যম আকাঙ্ক্ষা ও আশার সম্মুখে একটা সীমা-রেখা টানিয়া দিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না। আমি ভাবিতাম যদি আমার এই সকল সুযোগ থাকিত তাহা হইলে আমি সামান্য পল্লীর নগণ্য কুটিরে জন্মিয়াও ক্রমে ক্রমে সহরের নেতা, জেলার কর্ত্তা, প্রদেশের নায়ক, সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত হইতাম। হায় আমি নিগ্রো—এই কল্পনা আমার পক্ষে উন্মত্তের প্রলাপ, মরুভূমির মরীচিকা।

ও সব বাল্যজীবন ও যৌবনের মনোভাব। আজ কিন্তু সত্য বলিতেছি—আমার ওরূপ কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা হয় না। আমি শ্বেতাঙ্গ মানবের সঙ্গে ঠিক ঐরূপ তুলনা করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি না। আমি শ্বেতাঙ্গ মানবের সুযোগ সুবিধা সাহায্যগুলি আদৌ হিংসা করি না। আজ প্রৌঢ় অবস্থায় আমি অতীতের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতেছি, মান, মর্য্যাদা, কীর্ত্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মনুষ্যত্বের সত্য মাপ-কাঠি নয়। কোন লোক জগতে বিখ্যাত হইলেই সে কৃতকার্য্যতা লাভ করিল, আমি তাহা স্বীকার করি না, অথবা তাহার সাধনা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল—আমি এরূপ ভাবি না। আমি সফলতা অন্য প্রণালীতে মাপিতে শিখিয়াছি। আমি কৃতকার্য্যতার মূল্যস্বরূপ সাংসারিক যশোলাভ দেখিতে চাহি না। আমার মতে সেই ব্যক্তিই যথার্থ সফল যে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, বিঘ্ন-দুর্দ্দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে। কার্য্য উদ্ধার করিতে যাইয়া কোন ব্যক্তি যদি বিফল হয় তাহাতে আমি দুঃখিত হই না। তাহার প্রয়াস, তাহার সাধনা, তাহার দৃঢ়তা, তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদির পরিচয় পাইলেই আমি তাহাকে কৃতকার্য্য, সফল ও সার্থকতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি বলিব। হয়ত সে জগতে যশস্বী হইল না—হয়ত তাহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল না—হয়ত ভবিষ্যসমাজে তাহার কোন স্মৃতি থাকিবে না। তথাপি সে কৃতকার্য্য, কারণ সে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় বহিয়াছে—নৈরাশ্যের ভীতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় করিয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইহাই আমার মতে মনুষ্যত্বের কষ্টিপাথর—সফলতার মাপকাঠি। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখি নিগ্রোজাতির মধ্যে

জন্মিয়া আমার উপকারই হইয়াছে। আমি প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম দেখিয়াছি—যথার্থ জীবনের আস্বাদ পাইয়াছি। নিগ্রোজীবনের আব্-হাওয়া দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ, নিগ্রোর পক্ষে বিশ্বশক্তি একটা প্রকাণ্ড সয়তান, নিগ্রোর সংসার হতাশ্বাসের লীলানিকেতন। আমি বলি মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে, প্রকৃত জীবন-গঠনের পক্ষে এই অবস্থাই অতি হিতকর। কারণ, কষ্টই মানুষের পরীক্ষক, কষ্টই মানুষের বিচারক।

এই কষ্টের জগতে যাহাকে বাস করিতে হয় তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, আমি শ্বেতাঙ্গকে আজকাল হিংসা করি না—নিগ্রো জীবনই আমার শ্রেয়ঃ।

শ্বেতাঙ্গের কার্য্য উচ্চ অঙ্গের না হইলেও তাহার দোষ বেশী লোকে ধরে না। কিন্তু নিগ্রোর কর্ম্মে যদি সামান্যমাত্র ত্রুটিও থাকে তবে তাহার জন্যই সমস্ত পচিয়া যায়। কাজেই নিগ্রো সর্ব্বদা অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য। খুব ভাল করিয়া না খাটিলে তাহার কাজ বাজারে মনোনীত হইবে না। ইহা কি তাহার উন্নতির পক্ষে কম সুযোগ? কিন্তু শ্বেতাঙ্গের "সাত খুন মাপ।" ফলতঃ তাহার তত বেশী পরিশ্রমী এবং সহিষ্ণু না হইলেও চলে।

আমি নিগ্রোই থাকিতে চাই। দুঃখের সংসারই আমার শিক্ষালয় থাকুক—জগতের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধনাই আমার জীবনের ব্রত হউক।

আজকাল নিগ্রোজাতির অনেকেই রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী ক'রতে শিখিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করে না। কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া তাহাদের সমান হইতে চায়! আমি তাহাদিগকে বলি "ভাই নিগ্রো, তুমি সাদা কাল চামড়ার প্রভেদ মনে রাখিও না। নিজ কর্ত্তব্যবোধে কর্ত্তব্য করিয়া যাও। যদি শক্তি অর্জ্জন ক'রতে পার তোমাকে কেহই অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশ্বের মধ্যে সেই শক্তির স্থান আছেই আছে। গুণ কখনই চাপা থাকিবে না। তাহার সম্মান হইবেই হইবে। তোমরা আজ নির্য্যাতিত পদদলিত, কিন্তু ভগবানের এই সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন কর। দেখিবে, যথাকালে তোমার শক্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে" (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ময়নামতীর পুঁথি। *

(ময়নামতী ও রাজা গোপীচাঁদের কথা)

ইতিপূর্ব্বে "ময়নামতীর পুঁথি," "মাণিক চাঁদের গীত" বা "গোপীচাঁদের গান" সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার গ্রিয়ারসন্ এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রকাশিত পত্রিকার ৪৭ খণ্ডে † শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও

* চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† The Song of Manik Chand, J. A. S. B. Vol. XLVII.

সাহিত্যে,” শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল ষষ্ঠ বর্ষের “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য পরিষৎ পত্রিকায় পঞ্চদশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত “প্রতিভা” ২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যায় এবং মৌলবী আবদুল করিম “মানসী” ৫ম ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় এবং “ভারতবর্ষ” ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় এই অতি সুন্দর বহু প্রাচীন পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহার ঐতিহাসিক স্থান-নির্দ্দেশ এবং তাহার কবিত্ব-সমালোচনাদি সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ডাঃ গ্রিয়ারসন্ এবং বিশ্বেশ্বর বাবু ইহাকে রঙ্গপুরের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলবী আবদুল করিম ময়নামতী এবং গোপীচাঁদের এক বাড়ী চট্টগ্রামে থাকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ইহাকে বৌদ্ধযুগের এবং বৈকুণ্ঠ বাবু রাজা মানিকচাঁদ বৌদ্ধ ছিলেন এ কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই সব উক্তির সহিত একমত হইতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই পুস্তকের ঘটনাবলী অতি প্রাচীন। পুস্তক-খানাও বহু পুরাতন। ইহার স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব ও তাৎকালিক দেশের সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক অবস্থার কতক পরিমাণে আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হিসাবে পুঁথিখানি বড়ই মূল্যবান। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন মতদ্বৈধ নাই। তবে স্থানে স্থানে পাঠের অসঙ্গতি যাহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি। মৌলবী আবদুল করিম গ্রন্থখানাকে ২০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহাতে অল্প-বিস্তর চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষার ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া গৌরব করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলি যে পুঁথিনকলব্যবসায়িগণের * দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ দু'একটী কথা বাদ দিলে পুস্তকের আমূল ভাষা যে অবিকল ত্রিপুরা জেলার প্রচলিত গ্রাম্যভাষা, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। এমন কি পুস্তকের ভণিতা,—

“সুনহে রসিক জন এক চিত্য মন।
কহেন ভবানীদাসে অপূর্ব্ব কথন॥”

এই দুইটী ছত্রের মধ্যে কোন্‌টী ত্রিপুরা জেলার চলিত গ্রাম্যভাষা ও কোন্‌টীই বা চট্টগ্রামের প্রচলিত গ্রাম্যভাষা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এবং যদিও চট্টগ্রামের ও ত্রিপুরার বহুবিধ ভাষার আশ্চর্য্য রকম

* প্রাচীন কালে একদল প্রাচীন পুঁথিনকলব্যবসায়ী লোক ছিল। কিছু অর্থ দিলেই তাহাদের দ্বারা যে কোন প্রাচীন পুঁথি নকল করাইয়া লওয়া যাইত। তাহাদের ভাষাজ্ঞান ও শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধি বড় একটা বোধ ছিল না। কখনও পুঁথি দেখিয়া কখনও বা আবৃত্তি শ্রবণ করিয়াই তাহারা পুস্তক নকল করিত। “যদ্‌দৃষ্টং তল্লিখিতং” তাহাদের মূল মন্ত্র ছিল। এ সম্বন্ধে দু' একটী গল্প প্রচলিত আছে। কোনও নকল ব্যবসায়ীকে এক খানি পুঁথি নকল করিতে দেওয়া হয়। ঘটনাবশত ঐ পুঁথির এক স্থানে মৃত মক্ষিকা আবদ্ধ ছিল। নকলকারীর ভাষাজ্ঞান টন্‌টনে ছিল, সে এই মক্ষিকাটিকেও একটী অক্ষর মনে করিয়া তাহা অবিকল চিত্রিত করিয়া দিয়াছিল। আর একজন একখানি সংস্কৃত পুঁথি নকল করিতে যাইয়া ইচ্ছামত অনেকগুলি ং এবং ঃ বাদ দিয়া গিয়াছিল। পুস্তকের গ্রাহক মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন “আমরা—গার ভট্টাইজ (ংঃ) অনুস্বার বিসর্গ কলাজ্ঞান করি।” ইহাদ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে নকলকারীরা যেখানে বুঝিতে না পারিত সেখানেই নিজের বিদ্যা ফলাইতে যত্নবান হইত। এরূপে প্রাচীন পুঁথির অনেক পাঠ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমরা বর্ণজ্ঞানশূন্যা স্ত্রী নকলকারিণীর ও মুসলমান নকলনবীশের কথাও শ্রবণ করিয়াছি তাহারা যাহা দেখিত অবিকল চিত্রিত করিয়া যাইত।

মিল রহিয়াছে, তথাপি সমালোচ্য গ্রন্থে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা কেবল ত্রিপুরা জিলারই নিজস্ব, চট্টগ্রামে তাহার আদৌ ব্যবহার নাই। আমরা নিম্নে তাহার একটী ফর্দ্দ দিতেছি। যথা:—পিত্রুশূল (পিত্তশূল), ঢেপুয়া (গোলা), পাছরা (পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ), তাজিঘোড়া (তেজিয়ান ঘোড়া), মিরাশ (নিষ্কর বা পৈত্রিক মৌরশী), রুয়া (ঘরের চালের বাঁশ), জমেত্তে (জম থেকে), পশর (আলোক), জাদ (চুলে বাঁধিবার জড়োয়া দড়ি), লড় দিয়া (দৌড় দিয়া), মুষ্টেক (এক মুঠ), কুদাইয়া (খেদাইয়া), এরা এরি (ছাড়াছাড়ি), গেছিলানি (গিয়াছিলে কি না ?), পাত্তর (পাথার বা প্রান্তর), উলুর কচুরা (উলুশোনের দড়ি বা কাছি), জৈতা (ঘর ছানি দিবার শোন), মুলিবাঁশ (পাইয়া বাঁশ বা তল্লা বাঁশ), গাছা (শাল বা কাঁটা), পনি—হনি—(কাঁকই), বর্শ্চন=বশ্রান (পক্ষী ইত্যাদির মলত্যাগ), অব্রেথা (অকারণ); ইহা ছাড়া (জাগছিমু, বান্দিমু, করিমু, দিমু, গাথিমু, বেছিমু, ডাকিমু, রাখিমু, সহিমু প্রভৃতি বহুতর শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণে পুস্তকের কবির বাস গ্রামের নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও তাহার নিবাস যে ত্রিপুরা জেলায় ছিল তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। নতুবা উপরিউদ্ধৃত এতগুলি ত্রিপুরা জেলার নিজস্ব গ্রাম্যভাষা পুস্তকে প্রবিষ্ট হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ কবির বাড়ী যদি নিজ চট্টগ্রামে হইত, তবে তিনি নিজ দেশকে "চাটিগ্রাম" না লিখিয়া "ছাটিগ্রাম" লিখিতেন না। যথা:—"ছাটিগ্রাম পূর্ব্ব মাটি জানিবা বিশেষ।"

যদিও স্থলবিশেষে চট্টগ্রামেও "চ" স্থানে "ছ" বলিবার রীতি আছে সত্য, কিন্তু এস্থলে তাহা প্রযোজ্য নহে। কেননা নিজ দেশকে বিকৃত নাম দেওয়া সাধারণ কবিরও স্বভাবসিদ্ধ নহে।

ত্রিপুরা জেলার উত্তরাঞ্চলবাসীরাই 'চ'কে 'ছ' বলিয়া থাকে। অতএব পুঁথির কবির সম্পূর্ণ পরিচয় না পাইলেও তিনি যে ত্রিপুরা জেলা নিবাসী ছিলেন তাহা বুঝিতে বাধা হইতেছে না। দেখা যাইতেছে মৌলবী আবদুল করিম তাঁহার ভারতবর্ষে লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে পুস্তকের ভণিতাকারের পরিচয়ে—"কবি চট্টগ্রামবাসী না হউক অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী"—এই কথা বলিয়া নিজকে একটু সামলাইয়া লইয়াছেন।

বৈকুণ্ঠ বাবুর মতে "মূল পুঁথিখানি বোধ হয় গুপিচাঁদের সন্ন্যাসের পরেই লিখিত হইয়াছিল। তারপর সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহার নকল চলিয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী লেখকের হাতে পতিত হইয়া ইহাতে কয়েকটী বৈষ্ণবীয় ঘোষ ও বহু মুসলমানী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন কবির লেখার সহিত তাহা মিলান যাইতে পারে নাই।" মৌলবী আবদুল করিমের মতে "ত্রিপদী ছন্দগুলি প্রক্ষিপ্ত।" তাহা আমরাও অনুমোদন করি। ত্রিপদী ছন্দের একচরণে আমরা—"কহে ফকির করমের বেটা।"

এবং—

"আমি সবের পদরেণু না লায়েক চিজ তনু
মুই হিন্য জগতে ভুক্তিত।
লিখিতং পাপিষ্টমাত কি লিখিতে জানি পুঁথি
পড়িতে গোলা ক্ষেমিবা আমার।"

এইরূপ পাঠ প্রাপ্ত হইতেছি। এই "ফকির করমের বেটা" কে তাহা নিরূপণ

করা দুঃসাধ্য। আর "লিখিতং পাপিষ্টমতি" পদদ্বারা তিনি যে পুঁথির নকলনবীশ তাহাও বুঝা যাইতেছে, কেননা তিনি বলিতেছেন "আমি পুঁথি লিখিতে (নকল করিতে) ভাল জানি না, পাঠক আমার গোলা ক্ষমা করিবেন।" নকলনবীশেরাও অনেক সময় নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া পদ রচনা করিয়া দিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ত্রিপুরা জেলার সদর কুমিল্লা (প্রাচীন কমলাঙ্ক) * নগরীর ৫ মাইল পশ্চিমে মেহেরকুল পরগণা মধ্যে "লালমাই" নামক ১০ মাইল দীর্ঘ ও ১ মাইল প্রশস্ত অনতি-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বিদ্যমান আছে। ইহার সাধারণ উচ্চতা ৪০ ফিটের অধিক নহে, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা একশত ফিট হইবে।

এই লালমাই পাহাড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ অংশে "চণ্ডীমুড়া" † ও উত্তরে ময়নামতীর টিলা এবং "অদুনামুড়া" ও "পদুনামুড়া" নামক দুইটী পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন "রাজা মানিকচাঁদের কন্যা লালমতীর নামানুসারে লালমাই পাহাড়ের নাম হইয়াছে (কিন্তু আবার তাঁহারাই বলেন "ইহা জনশ্রুতিমাত্র") বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে ময়নামতী বলিয়া কোন স্থান ছিল না। বর্ত্তমান ময়নামতী যে স্থানে অবস্থিত তাহাও পূর্ব্বে লালমাই পর্ব্বতের অন্তর্গত ছিল (এই লালমাই এক্ষণে আসাম বঙ্গ রেলপথের একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশন) রাণী ময়নামতীর আমল হইতেই উহার এই নাম হইয়াছে।"

আমরা তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। যদি পূর্ব্বে ময়নামতী বলিয়া কোন স্থান না থাকা প্রতিপন্ন হয় এবং ময়নামতী লালমাই পর্ব্বতের অন্তর্গত থাকা সত্য হয় তবে দেখা যায় যে লালমাই ময়নামতীর পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব লালমাই ময়নামতীর মাতা তিলকচাঁদের স্ত্রী। কেননা কন্যার

* প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় "ত্রিপুরা রাজমালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন— প্রাচীন কালে সুহ্মদেশ (প্রাচীন ত্রিপুরা) অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্তছিল। সেই রাজ্যসমূহের ভৌগোলিক তত্ত্ব কিম্বা ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা নিতান্ত সুকঠিন। আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ শকাব্দের দশম শতাব্দে "কমলাঙ্ক" আখ্যাধারা অভিহিত ছিল। চীনপরিব্রাজক "হিয়োন সঙ্" সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব দক্ষিণে "কমলাঙ্ক" রাজ্যের স্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি কালিদাস যেমন ইহাকে "তালিবনের শ্যামোপকণ্ঠ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন হিয়োন সঙও কমলাঙ্ককে সাগরতীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তৎকালে নদরাজ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদকে সাগর সঙ্গম জন্য ঝাপুটার মোহনা অতিক্রম করিতে হয় নাই।

শকাব্দের দশম শতাব্দে পশ্চিম দিগন্থ পাটিকারা নামক স্থানে কমলাঙ্কের রাজধানী ছিল। ব্রহ্মের ইতিহাস "মহারাজোয়াং" গ্রন্থে লিখিত আছে যে ৯৭৯ শকাব্দে ব্রহ্মরাজ "থ্যানশিশ্যা" সিংহাসন আরোহণ করেন। তৎকালে পাটিকারার একজন রাজকুমার ব্রহ্মরাজ্যে গমন করেন। * * * ১১৪১ শকাব্দের একখণ্ড তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে রণবঙ্কমল্ল নামক জনৈক নরপতি কমলাঙ্ক ও পাটিকারার রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। উক্ত রাজকুমার রণবঙ্কমল্লের এক বংশীয় ছিলেন। আধুনিক মেহেরকুল, পাটি কাড়া ও গঙ্গামণ্ডল এবং তৎসন্নিহিত পরগণাগুলি এই রাজ্যের অধীন ছিল। কমলাঙ্ক বা পাটিকারা রাজ্যের পূর্ব্বদিকে রাঙ্গামাটীয়ানামে আর একটী রাজ্য ছিল। রাঙ্গা মাটীয়ার উত্তরদিকস্থ প্রদেশে কতকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু "তরপ" "গাঁড়" বা শ্রীহট্ট লাউর প্রভৃতি স্থানে যে সকল রাজবংশ শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা অপ্রাচীন নহেন। * * * পাটিকারা রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বেস্থিত প্রদেশে যে কতগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তাহাও এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। উক্ত নরপতি ও তাহার মন্ত্রী গবচন্দ্র সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। Rajmala pp. 4,5,6.

† প্রবাদ যে ভগবতী চণ্ডীদেবী এই মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার অন্য নাম "চণ্ডীগড়"। I bid.

নামে কোনস্থানের নাম হওয়ার পর মাতার নামে একটী স্থানের নাম হওয়া স্বাভাবিক নহে। বিশেষতঃ লালমাই ময়নামতীর কন্যা হইলে সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার কিছু না কিছু উল্লেখ থাকা সম্ভব হইত। সমালোচ্য গ্রন্থে আমরা কোথাও "ময়নামতী" পর্ব্বতের নাম-গন্ধও পাইতেছি না, কিন্তু "লালমাই" পর্ব্বতের নাম পাইতেছিঃ—

লালমাই পর্ব্বতের সব বাঁশ ছোক্‌কাইয়া।
(ছুঁচাল করিয়া)
কুণ্ডের নিকটে সব রাখিবে গাড়িয়া।"

(ময়নামতীর পুত্রবধূগণ ময়নামতীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া কুণ্ডের মধ্যে গাড়িয়া রাখিবার সংকল্পে মৈনাহাড়ীর প্রতি উপদেশ)। ইহাই ময়নামতী হইতে লালমাইর প্রাচীনত্বের জাজ্জল্যমান প্রমাণ। ইহার পর লালমাইকে ময়নামতীর অগ্রবর্ত্তী বলিতে কোন বাধা থাকিতেছে না। রাজমালা-লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই প্রবাদ বা জনশ্রুতিকে অন্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:— "প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামক জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম ময়নামতী ও কন্যার নাম লালময়ী ছিল (!) তদনুসারেই পর্ব্বতের নাম লালমাই ও ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।" পাঠক দেখিবেন জনশ্রুতি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত ও উলটপালট হইয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছি যে প্রথমে তিলকচাঁদের স্ত্রী লালমাইর নামানুসারে এই পর্ব্বতের নাম লালমাই হয়, পরে তাহার একাংশ তাঁহার কন্যা ময়নামতীর পাতাল-প্রবেশের পর তাহার নামানুসারে আখ্যাত হইয়াছে। ইহাই সমীচীন। ধরিতে গেলে ময়নামতী স্থানটী ঠিক পাহাড় নহে। ময়নামতী যদি লালমাইর মাতা হইতেন, তবে সমস্ত পাহাড়টা ময়নামতী বলিয়া উক্ত হওয়ার কথা ছিল আর তাহার একাংশ লালময়ী প্রাপ্ত হইতেন। এই সমস্ত কারণে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাইতেছে যে লালমাই ময়নামতীর মাতা—তিলকচাঁদের স্ত্রী। "লালমাই" শব্দের "মাই" অংশটুকুও মাতৃবাচক।

আর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের "ময়না পাখীর" নামানুসারে ময়নামতীর নামানুকরণের গল্পটা যে একেবারেই অসার তাহা আমরাও সমর্থন করি। যদি ময়নাপাখী হইতে ইহার নামকরণ হইত, তবে স্থানের নাম "ময়না-পাখী" বা "ময়নাপুরী" "ময়নানগরী" বা "ময়না পাহাড়" হইতে পারিত, কিন্তু কখনই "ময়নামতী" হইত না। ইহা বিশেষ করিয়া বুঝান অনাবশ্যক। মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের স্ত্রী "অদুনা" ও "পদুনা"র নামানুসারে দুইটী টিলার নামকরণ হইয়াছে এবং একটীর নাম "মাণিকচাঁদের মুড়া"। টিলা তিনটীই অদ্যাপি বিদ্যমান। কয়টী মুড়ার সহিত অন্য রাজার নামও লিপ্ত দেখা যায়। * পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে বহুতর দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটীর নাম "লাল খান্দা"। গান্দা—খাড্ডা—গাড়া। এই পুষ্করিণীটীকে লালমাইর কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। অন্য কয়েকটীর সহিত অন্যান্য রাজাদিগের নাম জড়িত রহিয়াছে। "সালমান রাজার দীঘি,"

* সম্ভবতঃ ইহারাই রাজা গোপীচাঁদের ৪০ জন করদ রাজার—অন্যতম

"আনন্দরাজার দীঘি," "বুধ রাজার দীঘি," "ব্রহ্মসাগর দীঘি" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ময়নামতীর পূর্ব্বাংশে "সাগর দীঘি" * বা "দেব দীঘি" নামক একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে সাগর দীঘির বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার দ্বারা ময়নামতীর উক্তির—"কাহার পুষ্করিণীর জল কেহ নাহি খাইত" সপ্রমাণিত হইতেছে। পাহাড়ের স্থানে স্থানে বহুতর ভগ্ন ইষ্টকালয় ও ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ইষ্টকপ্রস্তরাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বারা এইস্থানে "উনশত রাজার রাজত্ব করিবার অথবা উনশত রাজার বাড়ী † থাকার প্রবাদ সত্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ময়নামতী রাণীর উনশত রাজবাড়ী থাকা অনাবশ্যক, তথা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। উক্ত উনশত রাজার সময়ে বোধ করি উনশত কথার বিশেষ "ছড়াছড়ি" হইয়াছিল। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকারও বোধ করি সেই অনুকরণে পুঁথির উনশত স্থানে উনশত কথার উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"উনশত রাজা," "উনশত বাণিয়া," "উনশত নফর," "উনশত কোদাল" "উনশত টুকরী," কত বলিব এরূপ উনশত!

"১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "কালীর বাজার" রাস্তা প্রস্তুত কালে এই পর্ব্বত-শিখরে একটী সুন্দর গিরিদুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে লোকে "কোটঘর" বলিয়া থাকে। এই দুর্গের পার্শ্বে মৃত্তিকা-নিম্নে সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" ‡ ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে এই পর্ব্বতের রাজত্বকারী নরপতিগণ পৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন। "রণবঙ্কমল্লের" তাম্রশাসনখানিও ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পর্ব্বত মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। তৎকালে ইলিয়ট সাহেব ত্রিপুরার জজ মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই তাম্র-শাসন ১১৪১ শকাব্দে লিখিত উহা এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে।

ময়নামতীর বাটীর চতুঃসীমা এইরূপ :—চণ্ডীমুড়া, উত্তরে দেবপুর প্রভৃতি গ্রাম, দক্ষিণে পূর্ব্বে গোমতী নদী এবং পশ্চিমে পাটিকাড়া ও গঙ্গামণ্ডল পরগণা—কিন্তু মৌলবী আবদুল করিমের নির্দ্দেশিত "দক্ষিণে চণ্ডীমুড়া প্রকাশ চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড" এই কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। চণ্ডীমুড়া ময়নামতীর বাড়ী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে লালমাই পর্ব্বতের সর্ব্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত, কিন্তু তাহা "প্রকাশ" করিতে চণ্ডীমুড়া হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন একশত মাইল দূরবর্ত্তী "চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ডের" উল্লেখ বড়ই অসমীচীন মনে হয় না কি? চণ্ডীমুড়ার অন্যনাম যদি চন্দ্র-নাথ বা সীতাকুণ্ড হইত, তবে এই "প্রকাশে"র

* আমরা ইতিহাসে অনেকগুলি "সাগর দীঘির" নাম পাইয়াছি। একটী মুর্শিদাবাদে নলহাটী আজিম-গঞ্জে। ইহা ৭৪০ শকে খনিত হয়। ইহার খনন কার্য্যে ১০ সহস্র বর্ব্বর কুলী, ৬ সহস্র খনক, ১০ লক্ষ ইষ্টক ও দুই দুই লক্ষ মণ তৃণকাষ্ঠাদি লাগিয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য প্রবাদও প্রচলিত আছে। অন্য গুলির মধ্যে একটী ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে, একটী শ্রীহট্টে ও অন্যটী এই ময়নামতীতে। প্রত্যেকটীই আকারে বৃহৎ। বোধ করি সাগরের ন্যায় বিস্তৃত বলিয়াই প্রত্যেকে এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ একের অনুকরণে অন্যটী খনিত হইয়াছিল। আর খননের সমসাময়িকতারও বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

† এই উনশত রাজার বাড়ী রাজা গোপীচাঁদের বিপুলবাণিজ্যপরিচালক "উনশত বাণিয়ার" বাড়ী হওয়া বিচিত্র নহে। আমরা গোবিন্দচন্দ্রের উক্তিতে "নএয়ান গড় এড়িয়ার উনশত বাণিয়া।" পাঠ প্রাপ্ত হইতেছি, এই জন্যও অন্যান্য কারণে গোপীচাঁদকে বণিক জাতীয় রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহা ক্রমে দ্রষ্টব্য।

‡ Rajmala p 420.

অর্থ সঙ্গতি হইত সন্দেহ নাই কিন্তু কোথায় চণ্ডীমুড়া আর কোথায় চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড! এইরূপ সামঞ্জস্যহীন চৌহদ্দী হইতেই পারে না। এবং এইজন্য চট্টগ্রামে রাণী ময়নামতীর বাড়ী থাকা প্রতিপন্ন হয় না। সত্যতাত দূরের কথা। সমালোচ্য পুঁথির যে উদ্ধৃত অংশদ্বারা তিনি ময়নামতীর চারিদেশে চারিটী বাড়ী থাকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। * তাঁহার উদ্ধৃত অংশ * ‡

"অব্রেথা হইল শিষ্যা খ্যেতির (১) উপর।
এক নাম রাখি জাব মেহ্রাকুল (২) সহর॥
আদ্ধ্যমাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটী আছে কিছু বিক্রমপুর সহরে॥
আর আছে আদ্ধ্যমাটী তরপের (৩) দেশ।
ছাটিগ্রাম (৪) পূর্ব্ব মাটী জানিবা বিশেষ॥"

অথচ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্র দুইটী চরণ যথা:—

"তা দেখিয়া গোর্খনাথে মনে মনে গুনে।
এমন সুন্দরী যাবে জমের ভবনে॥

উল্লেখ করিলেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইত যে ইহা ময়নামতীর নিজের উক্তি নহে—তাহার গুরু "সিদ্ধা গোর্খনাথের" উক্তি এবং নির্দ্দেশিত চারিটী স্থান তাহার নিজের সিদ্ধ পীঠ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। গোর্খনাথের উক্তির দ্বারা ময়নামতীর চারিস্থানে চারিটী রাজবাটী থাকা নির্দ্দেশ করা অবশ্য তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে। একজন সিদ্ধযোগীর চারিস্থানে চারিটী "আস্তানা" থাকা বিচিত্র নহে। ১ম—মেহারকুল, ২য়—বিক্রমপুর, ৩য়—তরপের দেশ (শ্রীহট্ট), ৪র্থ—চাটিগ্রাম শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব এই "তরপের দেশ" রঙ্গপুরে কি না জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের মতে তাহা রঙ্গপুরে নহে, শ্রীহট্টে। কেন না শ্রীহট্টে "তরপ" বলিয়া একটী বিস্তৃত পরগণা বা দেশ অদ্যাপিও বিদ্যমান। আর রঙ্গপুরের সহিত এই ঘটনার কোন সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা একবারেই মনে করি না। এইগুলি প্রমাণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থল প্রাপ্ত হইয়াও যদি কেহ তাহাকে অযথা রঙ্গপুরের ঘটনা বলিতে চান তবে নাচার। তরপের দেশের একটা "ওরফে" নাম "কৌলীন্যনগর" দিয়া কষ্ট করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করার কোন অর্থ নাই।

আর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য "ষোল দণ্ডের পথ বিস্তৃত ছিল" বলিয়া দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত গোপীচাঁদের গীতে পাওয়া যাইতেছে। এই হিসাবে বর্ত্তমান ময়নামতী হইতে রঙ্গপুর ষোল দণ্ডের বহুগুণ অধিক দূরবর্ত্তী হইবে সন্দেহ নাই। অথচ আমাদের নির্দ্দেশিত তরপের দেশ বর্ত্তমান ময়নামতী হইতে ষোল দণ্ডের পথের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তরপের দক্ষিণ ও কুমিল্লা জেলার উত্তর সীমা এক। এক দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উল্লিখিত মাণিকচাঁদ রাজার ও ময়নামতীর পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল বিবরণ সংক্ষেপতঃ এইরূপ:—রাজা মাণিকচাঁদের পরলোক-গমনের পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন এবং অতীব বিলাসী ও অত্যাচার পরায়ণ হইয়া উঠিতে থাকেন। তাঁহাকে চারিটী বিবাহ করান

* মানসী ৫ম ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ (১) খাত্তির। (২) মেহারকুল। (৩) তরপ-পরগণা—শ্রীহট্ট। (৪) চট্টগ্রাম।

হয়। সর্ব্বদা রমণী-সংসর্গে থাকিয়া তিনি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন। তাই রাণী ময়নামতী পুত্রকে নানা প্রকার হিতোপদেশ দিয়া বিলাসিতা ও প্রজাপীড়ন প্রভৃতি হইতে বিরত করিতে যত্নবতী হন। এবং যোগ সাধন করিয়া শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। এই উপদেশ-বাক্য নমুনা স্বরূপ কতক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ইহাতে বেশ মূল্যবান কথা পাওয়া যাইতেছে।

"কামিনীর রূপ দেখি চিত্তে হইল ভোল।
কিছু নহে গুপীচাঁদ হল্‌দির ফুল॥

কচুপাতার পাণি জেন করে টলমল।
তেন মতে যাবে তোমার যৌবন সকল॥
নল খাগ কাটিলে জেহেন পরে পানি।
তেন মতে জাইব বাপু তোমার জোওয়ানি॥ ১

* * *

প্রদীপ নিবিলে বাপ কি করিবে তৈলে।
আইল বান্ধিলে কিবা ফল জল ফুটি গেলে॥

শিখড় কাটিলে বাপু বাতাসে পড়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে সুখনাএ ২ জিএ ৩ মাছ॥
রাজা নহে আপনা কোতয়াল নহে মিত। ৪
ঘরে স্ত্রি আপনা নহে চঞ্চল পিরিত॥
জে ঘরে থাকয়ে জান আপন মুখা ৫ নারী।
ভাগ্য বৃদ্ধি নাহি তার পুরুষের নহে স্ত্রী ৬॥
যে ঘরের নারী সবে পুরুষে বোলে তুই।
সেই ঘরের লক্ষি বোলে ছাড়িলাম মুই॥
যেই ঘরে হত্র জান নিত্যএ কন্দল ৭।
লক্ষিএ ছারিয়া যায় দারিদ্র বিকল ৮॥
কপাল তুলিয়া নারি জদি দেএ গাইল ৯।
আএউ ১০ ধন টুটি ১১ জাএ মরিবে আজু কাইল॥

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাবি চাহ মনে।
স্ত্রি পাপে গ্রিহ লক্ষী পলায় আপনে॥
ঘরে বাহিরে রজ্ ১০ নাই জার অসার ১১ জীবন।
মনিষ্যের চর্ম্ম মাত্র কুকুর বরণ॥
পতিকে সেবয়ে নারি হৈয়া সাবধানে।
পুণ্যফলে নারি জাবে বৈকুণ্ঠ ভোবনে॥
চারি জাতিএ লাগল পাইল গুপিচাঁদ রাজাএ।
মুখে মধু দিয়া জান সর্ব্ব ধন খাএ॥

* * * *

ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কেহ নহে সার।
পুত্র কৈন্যা সঙ্গে রাজা না জাবে তোমার॥
কাএয়া ১২ মাএয়া ১৩ সব ছারি বলে ধরি নিব।
এমন সুন্দর তণু থাকেত ১৪ মিশিব॥"

এই সমস্ত উপদেশ বাক্য শুনিয়া "গুপিচাঁদ" মায়ের নিকট চারি জাতি নারীর বর্ণনা জানিতে চাহিলে ময়নামতী চারি জাতি নারীর এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়া নারী জাতির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্র প্রজার উপর ৭॥ স্থলে ১০ এক আনা খাজনা স্থির করিয়া কর বৃদ্ধি করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন এই জন্য তাহার রাজ্যধন আয়ু নষ্ট হইয়া যাইবে, দেশে যথেচ্ছাচার হইবে এবং গোপীচাঁদ বহু দুঃখ পাইবেন এইরূপ অনেক কথা আছে।

(১) যৌবন কাল। (২) জলশূন্য স্থানে। (৩) বাঁচে। (৪) মিত্র। (৫) আত্মসুখী। (৬) লক্ষ্মী। (৭) ঝগড়া। (৮) কেবল ? (৯) গালাগালি। (১০) আয়ু। (১১) ক্ষয়।
(১০) মিল। (১১) অসার। (১২) কায়া, (১৩) মায়া (১৪) ছাই

"তোমার বাপের সৈত্য তুমি লহিলা
লাড়ি (৬)।
খেত পিছে (৭) দড়ি (৮) লইলা এক
পৌণ কড়ি॥
এহার কারণে রাজা বহু দুঃখ পাবে।
এ সুখ সম্পদ তোমার সব হারাইবে॥
কলির প্রবেশ হইব জানিয়া নিশ্চয়।
এ কারণে স্বর্গে গেল রাজা মহাশএ॥"

কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে গুরুতর অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ বাবু কেবল "কলির প্রবেশ হইব"—এই কথাকে কবির অত্যুক্তি বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ গ্রন্থের অন্যত্রও পাইতেছি।—গোপীচাঁদ, রাণী ময়নামতী, তাহার পিতার সহিত সহমরণ যাইতে চাহিয়াছিলেন কি না তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ কালে "দ্বিজ সন্দিহরের" সত্য বাক্য অবিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"কলি হইল ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা কএ।
তে কারণে ব্রাহ্মণের সম্পদ নাহি হএ॥"

বৈকুণ্ঠ বাবুর হিসাব মতেই গোপীচাঁদের ঘটনা প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইতেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা যে আজকালকার তুলনায় বহুল পরিমাণে উন্নত ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। আজকাল ভূম্যধিকারীরা ১৲ স্থলে প্রজার উপর ১০৲ টাকা খাজনা বৃদ্ধি করিয়াও নিজকে ততটুকু অপরাধী মনে করেন না যতটুকু রাণী ময়নামতী পুত্র গোবিন্দ-চন্দ্র কর্ত্তৃক চিরন্তন প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া মাত্র ।৭॥ গণ্ডা স্থলে কাণি প্রতি ৴৹ আনা খাজনা বৃদ্ধি করায় তাহাকে অপরাধী মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রজাপীড়ন মহা-পাপ ছিল। তখন কথার মূল্য ছিল। "হাতিকা দাঁত মরদ কা বাত" অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। পৃথিবী উল্টাইলেও বাক্যের নড়চড় হইতে পারিত না। তখন পথে সোনা পড়িয়া থাকিলেও কেহ ছুঁইত না। এইজন্যই রাণী ময়নামতী পুত্রকে তাঁহার পিতার "সত্য লাড়িয়া" ফেলিতে দেখিয়া "কলির প্রবেশ" মনে করিয়া বিভীষিকা দেখিতেছিলেন অত্যুক্তি কোন জায়গায় বোঝা গেল না। এমন "ঘোর কলি" কালের লোকেরাও কোন বিষয়ে অন্যায় দেখিলে 'ঘোর কলি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। উপমাস্থলে অত্যুক্তি অবশ্য মার্জ্জনীয়।

তারপর ময়নামতী তাঁহার স্বামীর রাজত্বের গৌরব করিয়া তখনকার দিনের লোকের আচার ব্যবহার ও সুখ-সাচ্ছ্যন্দ্যের কথা, ভূষণ বাহনের কথা, ও আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা বলিতেছেন। এই উক্তিগুলির ভিতর বেশ একটু ঐতিহাসিক বিবরণ রহিয়াছে।

"বড় পুণ্যের লাগি দিল দিঘি আর জাঙ্গাল
সোনা রূপায় গড়া গড়ি (৯) না ছিল
কাঙ্গাল॥
হিরা মাণ মাণিকা লোকে তলিতে (১০)
সুখাইত।

---

(৬) পরিবর্ত্তন। (৭) জমি পতি = কাণি প্রতি। (৮) পড়িঅঙ্গ = খাজনা। দর বাকরা = খাজনা।

(৯) মৌলবী আবদুল করিমের প্রাপ্ত পুঁথিতে "গরাগরি" লিখা আছে। তাহা ভুল। বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রাপ্ত পুঁথির পাঠ "গড়াগড়ি" ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। আবার (১০) বৈকুণ্ঠ বাবুর পুঁথিতে "তুলিতে" ও ও মৌলবী আবদুল করিমের পুঁথিতে "তলিতে" পাইতেছি। এখানে তুলিতে কথার অর্থ হয় না। তুলি ঘরের মটকা। ঘরের মট্‌কায় মনিমাণিক্য শুকান অসম্ভব। তলিতে অর্থে তলই বা তলাইছা, চাটাই বা পাটি। তাই বলি "তলিতে" ধনরত্ন ছড়াইয়া শুকান স্বাভাবিক কথাটা যদিও আমাদের নিকট আজগবী। কিন্তু

কাহার পুষ্কর্ণির জল কেহ নাহি খাইত ॥
কাহার বাড়ীতে কেহ উদারে (১)
না যাইত।
সোনার ঢেপুয়া লইয়া বালকে খেলাইত ॥
হারাইলে ঢেপুয়া (২) পুণি না চাহিত আর।
এমতে গোয়াইল (৩) লোকে হরিশ অপার ॥
মেহের কুল বেড়ি ছিল মুলি বাঁশের (৪)
বেড়া।
গ্রিহস্তের পরিধান সোনার পাছরা (৫) ॥
গরিবে চড়িয়া ফিরে খাশা (৬) তাজি (৭)
ঘোড়া।
ফকিরে গাহে (৮) দিত খাসা খাসা কাপড়
জোড়া ॥
তোমার বাপের কালেরা সব ছিল ধনি (৯)।
শোনার কলসি ভরি লোকে খাইত পাণি ॥
রূপার কলসি ভরি বিধবায় জল খাইত। (১০)
কিবা রাজা কিবা প্রজা চিনন না
জাইত ॥ (১১)

* * * *

দুই পহর (১২) মুজুরী করে গ্রিহস্তের ঘর।
এক পহর দৌড়ায় ঘোড়া ময়দান
পান্তর ॥ (১৩)
অশ্ব আরহিয়া সেই মজুরীর করি খাএ।
জার জেই নিতি কর্ম্ম এড়ান (১৪) না জাএ ॥
দেড় বুড়ি কড়ি ছিল কাণি খেন্তের কর।
চৌদ্দবুড়ি কড়ি ছিল তঙ্কার মোকর ॥ (১৫)
দশ টাকার বাড়ী খাইত দেড় বুড়ি দিত।
বার মাস ভরিয়া বচ্ছরের খাজনা নিত ॥

এই উক্তিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা না দিলেও ইহাদ্বারা ময়নামতীর স্বামীর সময়ে দেশের অবস্থা বুঝিতে বাধা হইতেছে না। লোকে এত সুখ-স্বচ্ছন্দে ও ধন-সম্পদে দিন কাটাইত যে রাজা প্রজা চিনিয়া উঠা যাইত না। অতঃপর রাজা গোপীচাঁদ মাতার বাক্যের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন

"এই মতে কৈল জদি মৈনামতী মাএ।
জোর হস্তে নিবেদিল গুপিচাঁদ রাজাএ ॥
আমি রাজা যুগি হোবো তারে যদিক নাই।
কিন্তু,—এসব সম্পদ আমি এড়িমু
কার ঠাঁই।"

এইখানে গোপীচাঁদের মনে একটু "কিন্তু" রহিয়া গিয়াছে। কাজেই মায়ের কথা এড়াইবার জন্য পন্থা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা হইতেছে। মাতাকে প্রশ্ন করা হইতেছে। "আমি যেন যোগী হব, কিন্তু এসব বিষয়-বৈভব কার কাছে রাখিয়া যাইব?"

আমরা শিশুকালে শ্রুত হইয়াছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোন এক চতুর দেওয়ান "টাকা রৌদ্রে না দিলে ঘুণে ধরিবে" এই কথা বুঝাইয়া বৎসরে একবার রাজকোষের ধন-রত্নাদি রৌদ্রে দেওয়াইত এবং প্রত্যেক বারেই কিছু কিছু গুথ্‌তিবাদ যাইত। এবং ঐ গুথ্‌তির অর্থে দেওয়ানের বিস্তৃত জমীদারী সঞ্চিত হইয়াছিল। আধুনিককালে যখন এরূপ হইয়াছিল তখন পুরাকালে চাটাইতে ধন-রত্ন শুকান আশ্চর্য্য হইলেও বিশ্বাসযোগ্য।

(১) উধার=হাওলাত। (২) গোলা (Ball)। (৩) কাটাইল। (৪) তলাবাঁশ। (৫) পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ। (৬) উত্তম। (৭) তেজীয়ান। (৮) গায়ে। (৯) মৌলবী আবদুল করিমের পুঁথিতে "তোমার বাপের কালে রসের ছিল ধনি" এইরূপ পাঠ আছে তাহা ঠিক নহে। তাই পরিত্যক্ত হইল। (১০) মৌলবী আবদুল করিমের আবিষ্কৃত পুঁথিতে "বিধবার" স্থলে "ধুপিএ জল খাএ" এইরূপ পাঠ আছে। (১১) রাজা প্রজা চিনা যাইত না। (১২) প্রহর। (১৩) প্রান্তর=ময়দান। (১৪) বাদ যাওয়া। (১৫) মৌলবী আবদুল করিমের পুঁথিতে "মোহর" লিখা আছে। মোহর হইতে "মোকর" ভাল অর্থ হয়। মোকর=মূল্য অর্থাৎ টাকার মূল্য ৵১০ দিল। আবার "মোহর অর্থও নামাঙ্কিত মুদ্রা। তবুও এস্থলে মোকরই ঠিক মনে হয়।

"গাঙ্গেতে এরিয়া জাবে বত্তিশ কাহোন
নাও। (১)
পুরিমধ্যে এরি জাবে তুমি হেন মাও॥ (২)
ফিলঘরে (৩) এরি জাবে আশি হাজার হাতি।
বিদেশ গমন কৈলে কে ধরিবে ছাতি॥
আস্তাবিলায় (৪) এরি জাবে নয়লাখ ঘোড়া।
জোর মন্দিরে এরি জাবে শাহেমানি (৫)
দোলা॥
পুরিমধ্যে এরি জাবে পঞ্চ পাত্র বর। (৬)
পান জোগাণি এরি জাবে উনশত নফর॥ (৭)
শ্বেতবান্দা (৮) এরি জাবে হারিয়া
ছোহর। (৯)
অদুনা পদুনা (১০) এরি জাবে কার ঘর॥
বাতেনে (১১) এড়িয়া জাবে সত্তর কাহন
(১২) বেত।
গোয়াইলে এড়িয়া জাবে গাই বারশত॥
এহি সব এড়ি জাবে আপনে জানিয়া।
নএয়ানগড় এরি জাবে উনশত
বাণিয়া॥
বাপের মিরাশ এরি জাইমু গৌড়
(১৩) সহর।
দাদার মিরাশ এরি জাবে কমলাক (১৪)
নগর॥
তুমি মায়ের জত বাড়ী কলিকা
নগর (১৫)।
আমি বাড়ী বান্ধিয়াছি মেহার কুল (১৬)
সহর॥
চল্লিশ রাজায় কর দেয় আমার গোচর।
আমা হতে কোনজন আছএ ডাঙ্গর (১৭)॥

গোপীচাঁদের এই উক্তিতে আমরা তাহার বিশাল রাজত্বের তথা বাণিজ্য-বৈভবের একটা ধারাবাহিক ফর্দ্দ পাইতেছি। নদীতে বত্রিশ কাহন নৌকা, পুরী মধ্যে বৃদ্ধা মাতা, হাতীশালায় আশি হাজার হাতী, বিদেশ-গমনের ছাতিবরদার, আস্তাবলে নয় লাখ ঘোড়া, জোড় মন্দির, ও সাহাবাণী দোলা, পুরী মধ্যে পঞ্চপাত্র অর্থাৎ পাঁচজন মন্ত্রী, পান জোগাণী এবং উনশত নফর, শ্বেতবান্দা (শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট চাকর) চামরধারী হারিয়া, অদুনা ও পদুনা দুই স্ত্রী, বিতানে সত্তর কাহন বেত, গোয়ালে বারশত গাই, আরো বিশেষ ভাবে পাইতেছি "নয়ানগড়," উনশত বাণিয়া, বাপের পৈত্রিক রাজত্ব "গৌড়" দাদার (মাতামহের) মৌরশী রাজত্ব "কমলাঙ্ক" মায়ের বাড়ী "কালিকানগর," নিজের বাড়ী "মেহের কুল সহর"।

বৈকুণ্ঠ বাবুর পাঠে "নয়ানগড়" এবং মৌলবী আবদুল করিমের পাঠে "নএয়ানগর" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মৌলবী আবদুল করিম সাহেব এই নয়ানগড়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ইহাকে ত্রিপুরা জিলার বরদখ্যাত পরগণার "নবিনগর" কি না তাহার আলোচনা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে এই "নএয়ানগর" বা "নয়ানগড়" ত্রিপুরা জিলার সুর্ণশর পরগণার "নয়ানপুর" (এ, বি, আর) বলিয়া বিবেচিত হয়।

(১) নৌকা।

(২) তোমার মত বৃদ্ধা মাতা। (৩) হাতিশালায়। (৪) অশ্বশালায় (৫) সাহেব লোকের ব্যবহার উপযুক্ত দোলা। (৬) পঞ্চজন মন্ত্রী। (৭) চাকর। (৮) শ্বেতবর্ণের দাস (৯) চামরধারি হারিয়া। ছোহর = চোয়র = চামর॥ মৌলবী আবদুল করিমের "মানসী" পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে "ফিল্ ঘরে" স্থলে "কিলঘরে" এবং "আস্তাবিলায়" স্থলে "আস্তাবিনায়" মুদ্রিত হইয়াছে, আরও "হারিফা" স্থলে "হারিকা" ও "কাণুকা" স্থলে "কানুকা" হইয়াছে ইহা অবশ্যই ছাপাখানার ভূতের কাণ্ড। (১০) রাজা গোপীচাঁদের দুই স্ত্রী।

(১১) বিতানে। (১২) কাহন। (১৩) গৌড়-শ্রীহট্ট। (১৪) কুমিল্লা। (১৫) কালিকাপুর (কুমিল্লা)। (১৬) রাজমালাকার বলিয়াছেন "মিহির" কুল হইতে "মেহার কুল" নামের উৎপত্তি।" মিহির অর্থ সূর্য্য। তাই অর্থ হয় সূর্য্যকুল এবং সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হন এই জন্য অর্থ—পূর্ব্বকূল। প্রাচীনকালে পাটীকারা ও মেহেরকুল সমুদ্রের (হ্রদ) পূর্ব্বতীরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত। ইহা সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত। (১৭) শ্রেষ্ঠ, বড়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবদুল করিম "নয়ানগড়কে" ত্রিপুরা জিলার নবীনগর কি না অনুসন্ধান করিতে বলিয়া অন্যদিকে রঙ্গপুরের প্রতি অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেছেন। যা হ'ক নয়ানপুর হইতে নবীনগর যে অনেক আধুনিক তাহা বলাই বাহুল্য, বিশেষতঃ নয়ানপুরের সন্নিকটে আমরা আরো কয়েকটী "গড়"এর নাম পাইতেছি। যথা :—"লৌহগড়," "বিশাল-গড়" ও "কৈলাড় গড়" (আধুনিক কসবা)। আরো দেখিতে পাই যে ময়নামতীর নিকটবর্ত্তী "চণ্ডীগড়," গুগুরিয়া দুর্গ, মেহার-কুল দুর্গ, সোনামাটীয়া দুর্গ, রাঙ্গামাটীয়া দুর্গ, প্রভৃতিও প্রায় একই সমসূত্রে স্থাপিত। সম্ভবতঃ "নয়ানগড়" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াই "নয়ানপুর" হইয়া থাকিবে। অথবা নয়ানগড় বা নয়ানপুর দুইটিই এককালে বিদ্যমান ছিল এক্ষণে "গড়" লুপ্ত হইয়া "পুর" রহিয়া গিয়াছে। নয়ানপুর এখনও একটী বন্দর। এখানে পুরাকালে উনশত বাণিয়ার দ্বারা পরিচালিত রাজা গোপীচাঁদের বিশাল বাণিজ্যাগার থাকাও বিচিত্র নহে। তৎকালে এই স্থান গুলি সমুদ্র বা হ্রদ * তীরবর্ত্তী ছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। ইহার কতক আভাষ পূর্ব্বেও দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বর্ণিত নয়ানপুরের সন্নিহিত পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান রেল রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রাকৃতিক হস্তনির্ম্মিত একটী অতি সুন্দর "গড়" দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে পর্ব্বতরাজি দ্বারা এবং উত্তরাংশে একটী পার্ব্বত্য নদীদ্বারা সুরক্ষিত। ইহাই যে আমাদের উদ্দিষ্ট নয়ানগড় নহে কে বলিবে?

মৌলবী আবদুল করিমের লিখিত "বাপের মিরাশ † গৌরব সহর" ঠিক পাঠ নহে। বৈকুণ্ঠ বাবুর পুঁথির "গৌড় সহরই" সত্য। প্রাচীন শ্রীহট্টের অন্য নাম গৌড় লিখিত আছে। অতএব সমালোচ্য গ্রন্থের গৌড় সহর যে বাঙ্গালার রাজধানী নহে—শ্রীহট্ট গৌড় ‡ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণের কবি নারায়ণ দেব তাঁহার গ্রন্থে এই শ্রীহট্ট

* এই রাজ্য সমুদ্র বা হ্রদ তীরবর্ত্তী। শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ, ত্রিপুরা জিলার উত্তর-পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধ হয় এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বৃহৎ হ্রদ ছিল। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহিত কর্দ্দম-রাশি দ্বারা ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সন্ধিস্থলে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইলে এই হ্রদ মানবমণ্ডলীর দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছিল। এই জন্যই দ্বাদশ শতাব্দির পূর্ব্বে চিয়োন সঙ শিলহট্ট ও কমলাঙ্ক বা পাটিকারা রাজ্যগুলিকে সাগরতীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বড় বক্র, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ প্রভৃতি নদীসমূহ এই হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। এই সকল নদীপ্রবাহে আনীত কর্দ্দমরাশি দ্বারা এই হ্রদ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্ট হইয়াছে. এই সকল বিলের কান্দি বা উচ্চ স্থানস্থিত গ্রামগুলিকে অদ্যাপি বর্ষাকালে সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। আনুমানিক শ্রীহট্ট জিলার প্রায় চতুর্থাংশ বিল ও নিম্নভূমি ও ইহার সহিত ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত নিম্ন ভূমি ও বিল সংযুক্ত করিলে বোধ হয় উল্লিখিত হ্রদের পরিমাণ ফল দুই সহস্র বর্গ মাইলেরও অধিক হইবে। Rajmala, pp. 285 286.

† মিরাশ শব্দের দুইটী অর্থ হয়। এক মিরাশ নিষ্কর ভূমি বা যাহার সামান্য কর দিতে হয়, সত্ব চিরস্থায়ী। শ্রীহট্টের অনেক ভূম্যধিকারী "মিরাশদার" "তরপদার" বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। মিরাশের দ্বিতীয় অর্থ মৌরশী বা পৈতৃক। আমাদের মতে এই সমস্ত পৈতৃক ও ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়াই "মিরাশ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "তরপ" শব্দের অর্থ জমিদারী।

‡ প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট তিনটী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১। গৌড়-শ্রীহট্ট। ২। লাউর। ৩। জয়ন্তীয়াপুর। এই তিনটি রাজ্যমধ্যে গৌড় বা শ্রীহট্টের অধিপতি অধিক বলশালী ছিলেন। Rajmala, P. 287.

কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজা "গৌড় গোবিন্দের" নামানুসারে "গৌড় নামকরণ হয়। জনশ্রুতি।

গৌড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহট্ট গৌড়ের পরগণা "তরপ" ও "মিরাশী" এবং "মাণিকচন্দ্রের" সহিত রাজা মাণিকচাঁদের বিশেষ সংগ্রহ আছে বলিয়া মনে করি। রাজা মানিকচাঁদ শ্রীহট্ট গৌড়ের অধিবাসী বা অধিকারী ছিলেন।

গোপীচাঁদের গীতে "সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধাড়িচন্দ্র পিতা, তান পুত্র মাণিকচাঁদ শোন তার কথা"—এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। এখন বুঝা যাইতেছে ধাড়িচন্দ্রের পুত্র—সুবর্ণচন্দ্র মহারাজের পৌত্র মাণিকচাঁদ, "তিলকচাঁদের ঝি" ময়নামতীকে বিবাহ করিয়া মেহারকুলের রাজগদীর অধিকারী হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে মাণিকচন্দ্র, পালবংশীয় রাজা মহীপালের পুত্র। এ কথা যে সত্য নয় তাহা উপরি-উক্ত পদাবলী দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ময়নামতী গোপীচাঁদকে বলিতেছেন,—

"তোর বাপের ঘর ছিল শঙ্খছরা মাটী।"

ময়নামতী সেখানে যাইয়া "গঙ্গাজল পাটীর * উপর "মনোরঙ্গ গালিচা" পাতিয়া পুষ্পের বিছানা, পুষ্পের পালঙ্ক" সাজাইয়া নেতের শৈয্যা" পাতিয়া চান্দোয়া টাঙ্গাইয়া বৃদ্ধরাজা মাণিকচাঁদকে কাছে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য "আড়াই অক্ষরি মন্ত্র" + গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে রাজা মাণিকচাঁদ ময়নামতীর সহিত এক বাটীতে বাস করিতেন না। তাঁহার স্বতন্ত্র বাড়ী "শঙ্খছরা" গ্রামে ছিল। আরো দেখিতেছি মাণিকচাঁদের মৃত্যুর সময়ও ময়নামতী ভিন্ন বাড়ীতে ছিলেন। এবং সেই বাড়ী মাণিকচাঁদের বাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে ছিল না। কেননা তাহাতে "লড়" ‡ দিয়া বা দৌড় দিয়া যাওয়া যাইত। যথা—

তোর বাপে মরি মৈল রাত্রি নিশাভাগে।
আমি খবর না পাইল সকালের আগে॥
লড় দিয়া গেল মুই রাজা দেখিবারে।
মের্ত্ত্যা দেহ লাগ পাইল শৈজ্যার উপরে॥"

এই কথা দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে "রাত্রি নিশাভাগে" মাণিকচাঁদ রাজার মৃত্যু হয়। ময়নামতী "সকালের আগে" অর্থাৎ রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে খবর পাইল না। তার পর খবর পাইয়া "লড়" দিয়া রাজাকে দেখিতে গেল এবং সেখানে যাইয়া রাজার মৃতদেহ শয্যার উপর দেখিতে পাইল। আমাদের বর্ণিত "শঙ্খছড়" অদ্যাপি ত্রিপুরা জিলার "লৌহগড়" পরগণায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাও কুমিল্লা বা কমলাঙ্কের সমসূত্রে উত্তরাংশে অবস্থিত এবং লড় দিয়া যাইবার মত নিকটবর্ত্তী। এক্ষণে লোকে ইহাকে "শঙ্খছাইল" বলিয়া থাকে। এই গ্রামের মধ্য দিয়া ও পার্শ্ব দিয়া কয়েকটী পার্ব্বত্য ছড়া বা

* এই গঙ্গাজল পাটিও শ্রীহট্টের জিনিষ। উহা হস্তীদন্তে নির্ম্মিত হইত। আজকালও শ্রীহট্টে সুন্দর সুন্দর শীতল পাটি পাওয়া যায়।

† হিন্দু গায়ত্রীর বীজমন্ত্র (আড়াই অক্ষর)।

‡ ইহাদ্বারা স্ত্রী-স্বাধীনতার ও একটু আভাস পাওয়া যায়। যেমন "খাশুড়ী দর্ব্বারে বধু চলিল হাটিয়া।" খাশুড়ীকে হত্যা করিবার জন্য গোপীচাঁদের বধূগণের বিষ ক্রয়ার্থ নিমাই বাণিয়ার বাড়ী যাওয়া। ময়নামতীর স্বয়ং হাড়িকার বাঙ্গালা ঘরে যাওয়া। এরূপ যখন তখন যেখানে বিনা বাধায় যাওয়ার আরো অনেক কথা গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা স্ত্রী-স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে ছিল বলিয়া মনে হয়।

ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে এখানে একটী বাজার আছে। কয়েকটী পুরাতন বৃহৎ দীর্ঘিকাও দৃষ্ট হয়। * গ্রামটীও বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বাজারটীও একটী বৃহৎ দীর্ঘিকার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। কোন রাজা রাজড়া ভিন্ন এত বড় দীর্ঘিকা খনন অন্য দ্বারা সম্ভবে না। বিশেষতঃ মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর তাহাকে দাহ করিবার জন্য স্থান পাওয়া গিয়াছিল না; পৃথিবী জলময় ছিল।

"আষার মাসেতে মৈল মাণিকচাঁদ গোসাই।†
প্রিত্যিস্থিতে জলময় পুরিতে স্থল নাই॥
সৈত্য যুগে গঙ্গাদেবী শুমুর্হতে ‡ আছিল।
গোমুইদের কুলে বসি কান্দিতে লাগিল॥

দেখা যাইতেছে মানিকচাঁদ রাজাকে দাহ করিবার জন্য গোমতী নদীর তীরে লওয়া হইয়াছিল। আমাদের বর্ণিত "শঙ্খছড়া" গোমতী নদীরও অতি নিকটবর্ত্তী স্থান। রাজা মাণিকচাঁদের সহিত ময়নামতীর সহ-মরণের কথায় বিশ্বাস না করিয়া সাক্ষী তলপ করিলে ময়নামতী বলিয়াছিল,—

"হেন সাক্ষী দিবে হেন নাহি মেহার কুল।
হাসিতে হাসিতে মৈনাএ কহিতে লাগিল॥
সেই দিনের তিন সাক্ষি আছে হেন জানি।
তাহারে আনিয়া শুন সে সব কাহিনী॥
এক সাক্ষী আছে মোর ভাট দামোদর।
আর সাক্ষী আছে রাজা ব্রাহ্মণ সন্দিহর।§
আর সাক্ষী আছে রাজা সাউধ লক্ষীধর।
সাক্ষী আনিবারে শীঘ্র পাঠাও অনুচর।"

এই উক্তিকেও মাণিকচাঁদের অন্যত্র মৃত্যুর সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। ময়নামতীর বাড়ী "মেহারকুল—কালিকা-নগর" আর মাণিক চাঁদের বাড়ী "শঙ্খছড়া—লৌহগড়"। এই দুইটাই পৃথক পরগণা। এই জন্যই বোধ করি ময়নামতী বলিয়াছিল যে মাণিকচাঁদের মৃত্যুকালে তাহার সহমরণ যাইবার চেষ্টার সাক্ষী মেহেরকুলে পাইবার

* শঙ্খছরা বা শঙ্খছাইলের পার্শ্ববর্ত্তী ছগাও প্রভৃতি গ্রামেও অনেক দীঘি পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ প্রাচীন দীঘিকাগুলিকে প্রায়ই ত্রিপুরা রাজাদিগের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি; কিন্তু এমন অনেক দীঘি পুষ্করিণী আছে যাহা ত্রিপুররাজগণের কাছাড় ত্যাগ করিয়া দক্ষিণবাহিনী হইবার বহু পুর্ব্বে খনিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কোচের কাটা অনেক দীঘি পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ যে কোচেরা "একে অন্যের পুষ্করিণীর জল খাইত না" ইহাদ্বারা ময়নামতীর উক্তি "কেহর পুষ্করিণীর জল কেহ নাহি খাইত" সপ্রমাণিত হইতেছে। আমরা উক্ত দীর্ঘিকাগুলিকে প্রাচীন রাজগণের রাজ্য চিহ্নরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

† এস্থলে গোসাই = গোস্বামী = ভূস্বামী = রাজা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

‡ গোমুতীনদী।

§ ব্রাহ্মণ সন্দিহরের বাসগ্রাম কুমিল্লা সহরের সন্নিহিত উত্তরাংশে গোমুতি নদীর পরপারে "শানধর বা শালধর" নামে অবস্থিত। শন্দিহর শব্দ যে শান্দর বা বর্ত্তমান শালধর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। ময়নামতী তিন জন সাক্ষীর নাম করিলে রাজা গোপীচাঁদ কেবল মাত্র দ্বিজ শন্দিহরের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপই সমালোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ তাহার বাড়ী অতি নিকটে ছিল বলিয়া তাহাকেই উপস্থিত করা হইয়াছিল। শালধর গোমুতীর পরপারে অবস্থিত বলিয়া ময়নামতীর কথারও সত্যতা রক্ষিত হইতেছে কেন না তাহা নিকট হইলেও পৃথক পরগণা। সন্দিহরকে আনিবার জন্য যখন দূত প্রেরণ করা হয় দূত যাইয়া দেখিল "বসিছে ব্রাহ্মণ নদি ঘাটের উপর" ইহাদ্বারাও দ্বিজ শন্দিহরের নদীতীরবর্ত্তী আবাসের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য সাক্ষীর মধ্যে ভাট দামোদরকে আমরা ঢাকা সাভারের রাজা হরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী "দামুরাজা" বলিয়া এবং লক্ষ্মীধরকে চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষ্মীধর বা লখিন্দর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এই হিসাবে তাঁহারা অতিদুরদেশবাসী বলিয়া সাক্ষীস্থলে তাঁহাদিগকে উপস্থিত করা হয় নাই। লেখক।

সম্ভাবনা নাই। মাণিকচাঁদের বাড়ী ভিন্ন জিলায় ও বহু দূরবর্ত্তী স্থানে হইলে তাহাকে গোমুতী নদীর তীরে আনিয়া দাহ করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় মাণিকচাঁদ লৌহগড়ের রাজা ছিলেন এবং শঙ্খছড়া বা বর্ত্তমান শঙ্খছাইলে তাঁহার রাজপাট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ময়নামতী একজন প্রতাপান্বিত রাজার কন্যা বলিয়াই বোধ করি পিত্রালয়ে বাস করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পিতা তিলকচাঁদের কোন পুত্র সন্তান থাকার কথা পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ ময়নামতীই তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। তিলকচাঁদের মৃত্যুর পর মাণিকচাঁদ তাঁহার রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই কারণেই বৃদ্ধ বয়সে "মেহেরকুলের রাজা মৈল মাণিকচাঁদ গোঁসাই" লিখিত হইয়া থাকিবে।

দৌড় দিয়া বা "লড়" দিয়া যে সকল স্থানে যাওয়া যাইত এগুলিকে নিকটে অনুসন্ধান না করিয়া সারা বঙ্গ খুঁজিয়া বেড়ান আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। প্রাচীন বঙ্গগৌড়ের সহিতও এই ঘটনার কোন সংস্রব থাকা প্রতিপন্ন হয় না। যাঁহারা "মাণিকচাঁদের গানের" একটী গান প্রাপ্ত হইয়া বা শ্রুত হইয়া নানা প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে; কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভালমতে বিচার না করিয়া কোন কথা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি না। যে বিষয়ের কোন ইতিহাস নাই তাহার একটু সামান্য খুঁটি নাটি প্রাপ্ত হইলে তাহা দ্বারাই একটা অনুমান করিয়া লইতে হয়, কিন্তু যাহার এরূপ একটা বহুপ্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার স্থাননির্দ্দেশে এত অসামঞ্জস্য কেন হইল একটু চিন্তা করিবার বিষয়। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন যখন এই বিষয়ের আলোচনা করেন তখন তিনি এই প্রাচীন পুঁথিখানা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মত কোন দিকে যাইত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। অথচ আমরা এখনও সেই ধুয়া ধরিয়াই চলিতেছি। তৎকালে রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাসকাহিনী দেশবাসীর হৃদয়ে বিশেষভাবে আঘাত করিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া দেশে দেশে নানা প্রকার গীত, ছড়া, কবিতা ও চিত্র রচিত হইয়াছিল। ভাট ও চারণগণের দ্বারা ইহা দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই গীত বা গাথারই দু'একটী আবিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ স্থান-নির্দ্দেশে বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

আমরা এক সময়ে আমাদের এক মাড়োয়ারী বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তাহার গৃহসৌষ্ঠবের একখানি চিত্রপট দৃষ্টে কৌতূহলপরবশ হইয়া চিত্র-পরিচয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৃহস্বামী খাস হিন্দিতে বলিয়াছিলেন "ইহা রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস-যাত্রার চিত্র।" তখন কৌতূহল একটু রূপান্তর ধারণ করিল, কেন, বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই গোপীচাঁদ কে এবং কোথাকার রাজা ছিলেন?" তিনি বলিলেন "ইনি ময়নামতীর পুত্র রাজা গোপীচাঁদ, ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল—তাহা ঠিক আমি জানি না। তিনি হিন্দীতে "ঢাকেকা তরফ্‌কা" বলিয়াছিলেন। এই ঢাকেকা তরফ শব্দ দ্বারা বোধ হয় ময়নামতীকেই (মেহারকুল) লক্ষ্য করিতেছে। এই সম্বন্ধে বোম্বাই নগরে না কি

গুজরাটী ভাষায় পুস্তকও আছে। এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই বোধ করি ভারতের শিল্পীকুলগৌরব রাজা রবিবর্ম্মা এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। উক্ত চিত্র রবি-উদয় প্রেসে মুদ্রিত। ভাগ্য বলিতে হইবে যে, বন্ধুবর ঘটনাটীকে মাড়োয়ার বা বোম্বাই প্রদেশের বলিয়া বসেন নাই। ছবিখানি এই রূপ :—

গোপীচাঁদ গৈরিক আলখেল্লা পরিধান করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর বেশে এক হাতে এক ছড়া জপমালা ও এক হাতে ভিক্ষার থালা লইয়া ভিক্ষা করিতেছেন। ছবির ভাবে ভিক্ষায় অনভ্যস্ততা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমবেত রমণীবৃন্দ মধ্যে এক সুন্দরী ভিক্ষা দান করিতে উদ্যতা. অন্যা রমণীগণ তাহাই নির্ব্বাক ও আশ্চর্য্য ভাবে দর্শন করিতেছেন। বন্ধুবর বলিয়াছিলেন ভিক্ষাপ্রদানোদ্যতা সুন্দরী রমণী না কি গোপীচাঁদের ভগিনী। এ সম্বন্ধে পুস্তকে কোন বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছি না। এই চিত্র-দর্শনে পুস্তকোক্ত—

দিন অবশেষে গেল রাজা গোবিন্দাই।
কালিকা নগরে ভিক্ষা মাগেন্ জোগাই।"

কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে। এই চিত্র বর্ত্তমানেও দুষ্প্রাপ্য নহে। রাজা রবি বর্ম্মা অদুনা ও পদুনার চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। "পুত্র কন্যা নাহি আর একলা গুবিন্দাই।" পাঠ দ্বারাই ময়নামতীর অন্য পুত্র কন্যা না থাকা প্রমাণিত হইতেছে। যাহা হ'ক—এখন দেখা যা'ক—"দাদার মিরাশ কমলাক সহর" কি? "কমলাক" যে কমলাঙ্কের নামান্তর তাহা বিশেষ করিয়া বুঝান অনাবশ্যক।* কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা ময়নামতীর অতি নিকটবর্ত্তী সংলগ্ন স্থান। এখন কথা হইতেছে "দাদার মিরাশ" অর্থে পিতামহের না মাতামহের মিরাশ? দুইজনই দাদা। মাণিকচাঁদের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট-গৌড় তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মাণিকচাঁদ শ্রীহট্টের রাজা ধাড়িচন্দ্রের পুত্র। অতএব তাঁহার পিতৃরাজ্য গৌড়-শ্রীহট্ট। এবং এইজন্য গৌড়-শ্রীহট্টকে গোপীচাঁদের পিতামহের রাজ্য নির্দ্দেশ করা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা "দাদার মিরাশ" অর্থে সোজাসুজিভাবে পিতামহের মিরাশ ঠিক করিয়া লইয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইত। আমাদের মতে এই "দাদার মিরাশ" গোপীচাঁদের মাতামহের মিরাশ বলিয়াই বোধ হয়। ময়নামতী রাজা তিলকচাঁদের ঝি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিলকচাঁদের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় দৌহিত্র-সূত্রে এই রাজ্য গোপীচাঁদের অধিকার-ভুক্ত হয়। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। মৌলবী আবদুল করিম তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন "মাণিক-চাঁদ কোথাকার রাজা ছিলেন এখনও কেহ নিশ্চিত রূপে স্থির করিতে পারেন নাই।" অথচ তিনিই মাণিকচাঁদের পিতার রাজ্যকে কমলাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া তাহা গোপী-চাঁদের পিতামহের (দাদার) মিরাশ বলিতে সঙ্কোচ মনে করেন নাই।

তুমি মায়ের যত বাড়ী কলিকা নগর।"

ইহার জন্যও বেশীদূর অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। ইহাকে আমরা কুমিল্লার নিকট-বর্ত্তী "কালিকাপুর"† নির্দ্দেশ করিতে পারি।

---

* কমলাঙ্ক নগরী বহু প্রাচীন, চীনভ্রমণকারী হিয়োনসঙও ইহা দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

† জিলা ত্রিপুরা ৫৩টী পরগণায় বিভক্ত, তন্মধ্যে এই "কালিকাপুর"ও একটা পৃথক পরগণা।

—Rajmala, P. 541.

হয় "কালিকা" "কলিকা" রূপধারণ করিয়াছিলেন, নয় "কলিকা" কালিকা রূপে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর "পুর" ও "নগর"—এখানে কবির পদ মিলের স্বাধীনতা! তাঁহারা অনেক স্থলে পুরকে নগর এবং নগরকে সহর লিখিয়া গিয়াছেন। এখনও কুমিল্লাকে কেহ কুমিল্লানগরী, কেহ কুমিল্লা সহর লিখিয়া থাকে। একটা গানের পদে "কমলাঙ্ক পুরী" ব্যবহার হইতেও দেখিয়াছি। এক হিসাবে ধরিতে গেলে পুরী, নগরী, সহর (একার্থজ্ঞাপক বলিয়া) একের স্থলে অন্যের ব্যবহার তেমন দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

ময়নামতীর বাড়ী রাজা গোপীচাঁদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ছিল। যখন তখন আসা যাওয়া করা যাইত। যেমন,—

"একরাত্র ছিল রাজা নিকুঞ্জ মন্দিরে। (১)
প্রভাতে চলিয়া গেল মায়ের হুযুরে॥ (২)
বসিয়াছে মৈনামতী হরশিত মন।
হেন কালে গেল রাজা মায়ের সদন॥
সোনার খাটে বৈসে মৈনা রূপার খাটে পাও।
দণ্ডেকে দণ্ডেকে পড়ে শেত ছোহরের (৩) বাও॥"

অন্য পক্ষে ময়নামতী বধূদিগের কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া গোপীচাঁদের নিকট নালিশ করিবার জন্য "গোপিছান্দের মহল্লাতে উত্তরিল গিয়া।" এইরূপ অনেক পাঠ পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা ময়নামতীর বাড়ী ও গোপীচাঁদের বাড়ী অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ময়নামতীর বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া যখন গোপীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তাহার চারি স্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া ময়নামতীকে লাঞ্ছনা করিবার পরামর্শ করিয়া মনে মনে ধমকাইতেছে।—

"অবশ্য মরিবা তুমি আমরার বাসরে। (৪)
সপ্ত দিনের বাসি মরা করিব তোমারে॥"

তারপর বিষের লাড়ু "নিমাই বাণিয়ার" নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভার সহ ভেট দিবার জন্য—

"ভেট ঘাট জতেক বেগারের(৫) মাথায় দিয়া।
শাশুরী দর্ব্বারে (৬) বধূ চলিল হাটিয়া॥

এই সকল উক্তিদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ময়নামতী ও গোপীচাঁদের বাড়ী অতি নিকট ছিল।

এই জন্যই মৌলবী আবদুল করিমের নির্দ্দিষ্ট "মায়ের মিরাশ" (যদিও পাঠে তাহা নাই) কলিকা নগর কি তরফের দেশ ওরফে কৌলিন্য নগর বা রঙ্গপুর?" স্থান-নির্দ্দেশের গোলোযোগ প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমালোচ্য গ্রন্থের বিষয়াদির সহিত রঙ্গপুরের কোন সংস্রব থাকা প্রমাণিত হয় না। ইহাদ্বারা তিনটী প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ১। নিজবাড়ী, ২। অন্দর মহল, (প্রত্যেক বধূর বাড়ী পৃথক, যথা—অদুনা মুড়া ও পদুনা মুড়া) ৩। মায়ের বাড়ী। সবগুলি একে অন্যের নিকটবর্ত্তী অথচ পৃথক পৃথক।

গোপীচাঁদের রাজবাটীর সহিত কালিকা-পুরের নৈকট্যসম্বন্ধে আর একটী কথা পাওয়া যাইতেছে। গোপীচাঁদ সন্ন্যাস-যাত্রার পথে এই গ্রামে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

(১) অন্দরমহল। (২) মায়ের বাড়ী। (৩) শ্বেতচামর। (৪) আমাদের বাড়ী অর্থাৎ গোপী-চাঁদের অন্দরমহল। (৫) মুজুর। (৬) শাশুড়ীর বাড়ীতে।

"দিন অবশেষে গেল রাজা গোবিন্দাই। (১)
কলিকা নগরে (২) ভিক্ষা মাগেন্ত জোগাই॥
ধোও ধোও করিয়া সিঙ্গাতে দিল ফুক।
পুরী থাকি চারি বধূ শুনিতে লাগে সুখ॥
(শোক)!

গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের দিন দিবা অবশেষে রাজা গোবিন্দাই কলিকা নগরে ভিক্ষামাগিয়া যোগাইতে ছিলেন। "ধূ ধূ" করিয়া সেখানে সিঙ্গাতে যে "ফুঁক" দিয়াছিলেন, পুরী হইতে তাহা শুনিয়া চারি বধূর "শোক" লাগিয়াছিল "সুখ" নহে। ইহাও নকল-নবীশগণের ফলিত বিদ্যা! তাঁহারা যে কালিকাকে কলিকা করেন নাই তাহার বিশ্বাস কি? যাহারা শোকের স্থলে সুখ লিখিতে পারেন, তাহাদের দ্বারা অসম্ভব কিছুই নয়। এই সময়ে গোপীচাঁদের স্ত্রীগণের সুখ লাগিবার কথা নহে, শোক লাগিবারই কথা। কালিকা-পুরের সিঙ্গার ধ্বনি গোপীচাঁদের অন্দর বাড়ী হইতে শোনা গিয়াছিল। এখন পাঠকগণ তাহার দূরত্ব নির্ণয় করিবেন।

"আমি বাড়ী বাঁধিয়াছি মেহারকুলসহর।"
"চল্লিশ রাজায় কর দেয় আমার গোচর।
আমা হতে কোন জন আছয়ে ডাঙ্গর।" (৩)

ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

ইহাদ্বারাও গোপীচাঁদকে বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আর বুঝা যাইতেছে তাহার এক ডাকে ১২ লক্ষ সৈন্য (পদাতি) উপস্থিত হয়, তাহার ৬২ উজীর (সেনাপতি), ৬৪ সিকদার (সহকারী সেনা-পতি), আবার ৮২ হাজার সৈন্য (অশ্বারোহী), নয় হাজারী ধানুকী ছিল। আরো বিশেষ, তত প্রাচীন কালেও বন্দুকের ব্যবহার ছিল।—

"সাজ সাজ করি রাজা দিলে এক ডাক।
এক ডাকে সাজি আইল বাসত্তের লাক।
হস্তি ঘোড়া সাজে আর মোহা মোহা বীর।
সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজীর॥
বাষাট্ট উজির সাজি চৌশট্ট শিকদার॥
হোস্তে ঢাল সৈন্য সাজে বিরাশি হাজার॥
নয় হাজার ধনুকী সাজে গুণ টঙ্কারিয়া।
বন্দুকি সাজিয়া আইল পলিতা হাতে লৈয়া॥"

গোপীচাঁদের রাজ্যের চতুঃপার্শ্বে যে অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তাহা আমরা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রাজমালা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সম্ভবতঃ ইহারাই গোপীচাঁদের করদ রাজা ছিলেন। এবং তাঁহারা গণনায় ৪০ জন ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

(১) "গুবিন্দাই বা গোবিন্দাই" বোধ হয় গোপীচাঁদের আদরের ডাক নাম ছিল।
(২) বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধে ইহাকে "কণিকানগর" লিখা হইয়াছে, হয়তঃ ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ।
(৩) ডাগর = বৃহৎ।

হস্তীর জীবন-যাত্রা

রোগের কারণ ও নিবারণোপায়

বন্য অবস্থায় হস্তীর রোগাদি খুব কম হয়। যখন ইহাদিগকে গৃহে রাখিয়া পালন করিতে আরম্ভ করা যায় তখনই ইহাদের নানাবিধ রোগ হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ হস্তী বন্য-জীব, বনই ইহাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ আবাসভূমি। যদি গৃহপালন-অবস্থায় ইহাদিগকে বিশেষভাবে যত্ন করা যায়, তাহা হইলে অনেক রোগ হইতে ইহারা নিষ্কৃতি পায়। অনেক সময় দেখা যায় গৃহপালিত হস্তীর প্রতি অত্যল্প যত্ন লইয়া ইহাদিগের দ্বারা বহুল পরিমাণে কার্য্য করাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে হস্তী ঘর্ম্মাক্ত হইয়া দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কোন কোনও হস্তী-পরিদর্শকের হস্তী সম্বন্ধে আদৌ জ্ঞান নাই। এ কারণ ইহারা মাহুত এবং হস্তী-পরিচর্য্যা-কারীদের দোষগুণ-বিচারে অসমর্থ। মাহুতেরা নিজ ইচ্ছামত হস্তীর তত্ত্বাবধান করে বলিয়া গৃহপালিত হস্তী অনেক সময় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

ভার-বহন এবং জিনিষপত্র স্থানান্তরিত করিবার জন্য হস্তী অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। যদি ইহারা উপযুক্ত যত্ন পায়, তাহা হইলে ইহারা প্রায়ই পীড়িত হয় না। হস্তী নম্র, ধীর ও আজ্ঞাবহ জন্তু। অন্যান্য ভারবহনকারী জন্তুদিগের প্রতি যেরূপ যত্ন লওয়া হয়, অনেক সময় হস্তীর প্রতি সেরূপ যত্নও লওয়া হয় না। যদিও ইহাদের বল খুব বেশী এবং শরীরের আয়তনও খুব প্রকাণ্ড, তাহা হইলেও ইহাদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন লইতে অবহেলা করিলে শীঘ্রই ইহারা রোগাক্রান্ত এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। হস্তীর প্রায়ই পৃষ্ঠে এবং পদতলে ক্ষত হয়। একটু যত্ন লইলে কখনও এরূপ হইতে পারে না। ইহাদের খাদ্য এবং পানীয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেখানে হস্তী আদৌ চরিয়া বেড়াইতে পারে না, সেখানে পরিদর্শকেরই হস্তীর খাদ্য এবং পানীয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। হস্তীর নিদ্রা অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, এ কারণ যাহাতে ইহাদের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত না হয় সে জন্য সন্ধ্যা হইবামাত্র রাত্রের খাদ্য দিতে হয়। অধিক রাত্রে ইহাদিগকে আহার করিতে দিলে আহার্য্য চর্ব্বণ করিতেই ইহারা সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দেয় এবং একেবারেই নিদ্রা যাইতে পারে না। যে হস্তী যে পরিমাণ ভার বহন করিতে সক্ষম, সেই হস্তীকে সেই পরিমাণ ভার বহন করিতে দিতে হয়। কার্য্যের পূর্ব্বে এবং পরে ইহাদের সর্ব্ব শরীর বিশেষভাবে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। অধিক উত্তাপে ইহাদিগকে অনেক-ক্ষণ কার্য্য করিতে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

প্রাকৃতিক খাদ্য

হস্তীকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখিতে হইলে ইহাদের আহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আহারের প্রতি যত্ন না লইয়া অন্য প্রকারে বহু যত্ন করিলেও ইহাদিগকে সুস্থ রাখা যায় না। বাহাদুরি কাষ্ঠের কারখানায় নিযুক্ত হস্তী এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হস্তী ভিন্ন অন্যান্য হস্তীদিগকে কার্য্যের পর জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বনে ছাড়িয়া দেওয়ার সময় ইহাদের পায়ে বেত্রনির্ম্মিত শৃঙ্খল

পরাইয়া গলদেশে একটি ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতে হয়। গলদেশে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে জঙ্গলের নিস্তব্ধতার মধ্যেও ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা বনের কোন্ কোন্ বৃক্ষলতা খাইতে ভালবাসে তাহা জানিতে হইলে বন্য হস্তীর খাদ্য পরিদর্শন করিতে হয়। সাধারণতঃ ইহারা বৃক্ষলতা অপেক্ষা ঘাস খাইতে অধিক ভাল বাসে। খাদ্য সম্বন্ধে বন্য হস্তীর কিছুই অভাব নাই। ইহারা ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া ইচ্ছামত তৃণলতা ভক্ষণ করিতে পারে। সময়ে সময়ে ইহারা পাহাড়ের উপর এবং সময়ে সময়ে নিম্ন সমতল-ভূমিতে চরিয়া বেড়ায়। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইহারা জলাশয়ের নিকট আসিয়া স্নান ও পানের জন্য যে সমস্ত জলাশয়ের উপকূলে বিস্তর ঘাস থাকে সেই সমস্ত জলাশয় ঠিক করিয়া লয়।

হস্তী ইক্ষুদণ্ড খাইতে বড় ভাল বাসে। বন্য হস্তী ইক্ষুবনে একবার প্রবেশ করিলে তিন চারি দিনের কম বাহির হয় না। ইহারা প্রথমতঃ মূল সহিত ইক্ষুদণ্ড তুলিয়া যেটুকু খাইতে খুব মিষ্ট সেই টুকু খাইয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেয়। গৃহপালিত হস্তীকেও যদি প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুদণ্ড খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে পরিমাণ খাদ্য হস্তীর শরীরের পক্ষে বিশেষ দরকার তদপেক্ষা কিছু বেশী দিতে হয়, কারণ ইহারা খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় কিছু কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে। যদি এরূপ না করা যায় তাহা হইলে ইহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হস্তীর উচ্চতা দেখিয়া ইহাদের খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে। শরীর-পোষণের জন্য যে হস্তীর যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন সেই হস্তীকে সেই পরিমাণ খাদ্য দিতে হয়।

রেঙ্গুণে হস্তীকে অনেক সময় জলীয় ঘাস খাইতে দেওয়া হয়। জলীয় ঘাস ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় স্বাস্থ্যকর খাদ্য নহে। প্রত্যহ হস্তীকে এই প্রকার জলীয় ঘাস খাইতে দিলে শীঘ্রই ইহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সময়ে সময়ে নানারূপ বিষাক্ত পদার্থ জলীয় ঘাসের ভিতর দেখা যায়। হস্তী-পরিচারক যদি এই প্রকার ঘাস বিশেষরূপ পরীক্ষা না করিয়া হস্তীকে খাইতে দেয় তাহা হইলে বড়ই কুফল ফলে। জলীয় ঘাস দিতে হইলে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেওয়া উচিত। প্রত্যেক ঘাসের আঁটি খুলিয়া ফেলিয়া ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি উহার মধ্যে কোনও প্রকার অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর জিনিষ থাকে, তৎক্ষণাৎ বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। অনেক সময় ঘাস সংগ্রহ করা কষ্টকর বলিয়া মাহুতেরা নিকটস্থ বৃক্ষপত্রাদি হস্তীকে খাইতে দেয় এবং হস্তী-স্বামীর নিকট "ঘাস পাওয়া যায় না" বলিয়া অনুযোগ করে। হস্তীস্বামীর এ বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। মাহুতেরা যদি হস্তীর উপর উপযুক্ত যত্ন লয়, তাহা হইলে কখনই হস্তীর এত রোগ এবং অকালমৃত্যু হইত না। বৃক্ষ-পত্র, লতা, বেত্র ও নানাবিধ ফল হস্তীকে খাদ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে। পেপুল, কলা, ধান, তাল, বেল, তরমুজ, নারিকেল, আনারস প্রভৃতি ফলও হস্তী অত্যন্ত ভাল বাসে। সুবিধামত হস্তীকে চরিয়া বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অনেক রোগা হস্তী এই প্রকারে ভাল হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

ইক্ষুদণ্ড পাওয়া গেলে অন্য কোন ঘাস হস্তীকে না দেওয়াই ভাল। শুষ্ক ঘাসের পরিমাণ বুঝিয়া কি পরিমাণ কাঁচা ঘাস

ইহাদিগকে প্রত্যহ দেওয়া উচিত, তাহা ঠিক করিতে হইবে। ভাল কাঁচা ঘাস পাইলে ইহারা যে পরিমাণ সহজে পরিপাক করিতে পারে তাহাই দেওয়া যাইতে পারে।

হস্তী যাহাতে রীতিমত খাদ্য পায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রতিদিন অন্ততঃ ৮০০ শত পাউণ্ড আহার্য্য যাহাতে ইহারা পায় তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পেপুল পত্র অত্যন্ত উত্তেজক। প্রত্যেক দিন হস্তীকে পেপুল পত্র খাইতে দেওয়া ভাল নয়। শীতকালে কলার পাতা ও গুঁড়ি ইহাদিগকে দিতে নাই। শুষ্ক ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ইহারা রীতিমত কাঁচা ঘাস পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত।

হস্তী একটি উৎকট রুচিবিশিষ্ট জীব। যদি ইহারা মনোমত খাদ্য না পায় তাহা হইলে ইহারা একেবারেই খাদ্য গ্রহণ করে না। ইহাদিগকে কখনও জলা ভূমিতে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।

মনুষ্যকৃত খাদ্য

গৃহপালিত হস্তী নৈসর্গিক অবস্থায় থাকে না বলিয়া প্রকৃতিজাত খাদ্য বেশী পায় না। নৈসর্গিক অবস্থায় ইহাদের যে সামান্য শক্তিটুকু প্রয়োগ করিতে হয় তাহা পূরণের জন্য ইহারা সমস্ত দিন এবং রাত্রের কতকাংশ চরিয়া বেড়ায়। বন্য হস্তী অপেক্ষা গৃহপালিত হস্তীর অনেক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কার্য্যাদি করিতে হয় এবং ইহাদের বিশ্রাম-সময়ও অতি অল্প, এ কারণ ইহারা যাহাতে রীতিমত পুষ্টিকর খাদ্য পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যেক দিন হস্তীকে চাউল, ধান্য কিংবা ময়দা খাওয়ান উচিত। ইহা হস্তীর পক্ষে বড় পুষ্টিকর এবং ইহারা উহা সহজে হজম করিতে পারে। প্রত্যহ ইহাদিগকে ২০ হইতে ৩০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাউল খাইতে দেওয়া উচিত। যদি চাউল অথবা ধান্য সামান্যরূপ চূর্ণ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহারা উহা আরও সহজে হজম করিতে পারে। অনেকে বলেন যে ধান্যের খোসা (তুঁস) হস্তীর পরিপাক-যন্ত্র খারাপ করে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা দ্বারা ইহাদের পরিপাক-যন্ত্রের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে সমস্ত হস্তী থাকে, তাহাদিগকে চাউল দেওয়ার সময় কতকগুলি খড়ও ঐ সঙ্গে দেওয়া হইয়া থাকে। খড়ের মধ্যে চাউলের পুটুলি বাঁধিয়া দিলে ইহারা অধিক অনিষ্ট করিতে পারে না। ভারতবর্ষে গমের ময়দা পিষ্টকাকার করিয়া হস্তীকে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই পিষ্টকগুলি চিনি, গুড় কিংবা মধুদ্বারা সুমিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহার সঙ্গে দা'ল এবং পিঁয়াজ সিদ্ধ করিয়া মিশাইয়া দেওয়াও চলে। হস্তীর দাঁত পরিষ্কার রাখিবার জন্য গরমের সময় ইহাদের খাদ্যের সঙ্গে তেঁতুলের শাঁস মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। যে সময় হস্তীর বেশী কার্য্য পড়ে, তখন প্রতিদিন ইহাদিগকে ৩ হইতে ৬ পাউণ্ড পরিমাণ এক একখানি রুটি অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহাদিগকে খাইতে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অসুস্থ হইলে চাউল এবং গমচূর্ণের মধ্যে ঔষধাদি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সামান্যরূপ কিছু খাদ্যাদি দেওয়ার পর ইহাদিগকে চাউল, ধান্য ও গমচূর্ণ খাইতে দেওয়া উচিত।

সুগন্ধি মসলা বর্ত্তুলাকার করিয়া সময়ে সময়ে হস্তীকে খাইতে দেওয়া হয়। নিম্ন-

লিখিত দ্রব্যগুলির দ্বারা সাধারণতঃ মস্‌লা প্রস্তুত হয় :—আদা, হরিদ্রা, যমানী, পেঁয়াজ, সরিসা, লবঙ্গ, মরিচ, ধনে, এলাইচ, রশুন, লঙ্কা, জায়ফল ইত্যাদি। এই সমস্ত মস্‌লা গ্রীষ্মকালে হস্তীর পক্ষে বড় উপকারী। ইহাতে হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। উক্ত মস্‌লার উপাদানগুলির সহিত ঘৃত, গুড় কিংবা মধু মিশ্রিত করিয়া দেওয়া চলে। প্রতিদিন ইহাদিগকে মস্‌লা খাইতে দেওয়া ভাল নহে। এরূপ করিলে ইহাদের পাকশক্তি এবং শরীরের অন্যান্য স্বাভাবিক শক্তিসমূহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ মিশাইয়া মিশাইয়া ইহাদিগকে লবণ খাইতে শিখান উচিত। লবণে হস্তীর নাড়ী পরিষ্কার রাখে। বন্যহস্তী লবণের অভাবপূরণের জন্য লবণাক্ত মৃত্তিকা খায় এরূপ দেখা গিয়াছে।

এই পরিচ্ছেদের শেষে দেখান যাইবে যে সামান্য তহবিল তছরূপ করা এবং হস্তীর খাদ্য দ্রব্য হইতে খাদ্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া বিক্রয় করা মাহুতদের প্রকৃতিগত দোষ। বিশ্বস্ত লোকের সম্মুখে হস্তীর আহার্য্য প্রদান করিতে পারিলে, শেষোক্ত দোষটি কতক পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে।

আহারের কাল ও পরিমাণ

হস্তীকে কার্য্যের সময় ব্যতীত যে কোনও সময় আহার্য্য প্রদান করা যাইতে পারে। কার্য্যের পূর্ব্বে এবং অব্যবহিত পরে ইহাদিগকে আহার্য্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সময় মাহুতেরা কার্য্যের ২।৩ ঘণ্টা পরে ইহাদিগকে আহার্য্য প্রদান করে। ইহা অতীব অন্যায়।

সৈন্যাদির রসদ-ব্যবস্থাকারী কর্ম্মচারীদের রিপোর্ট হইতে হস্তীর খাদ্যাদির পরিমাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিয়মাদি প্রদত্ত হইল :—

(১) প্রতিদিন হস্তীকে দুই আউন্স লবণ এবং এক আউন্স তেল খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

কাঁচা ও শুষ্ক খাদ্যের পরিমাণ

	খাদ্য	
	সতেজ কাঁচা Green	শুষ্ক (Dry)
বৃহৎ হস্তী (৮½ ফিটের অধিক উচ্চ)	৬৫০ পাউণ্ড	৩৩০ পাউণ্ড
মধ্যমাকারের হস্তী (৭½ হইতে ৮½ ফিট উচ্চ)	৫৭৫	২৯০ „
ক্ষুদ্র হস্তী (৭½ ফিটের অনধিক উচ্চ)	৫০০	২৫০ „

(২) যখন কলাগাছের গুঁড়ি, বৃক্ষের ডাল কিংবা বনজাত লতা-গুল্ম ইহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, তখন নিম্নলিখিত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে :—

বৃহৎ হস্তী……………………১,৩০০	পাউণ্ড	যদি বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়।
মধ্যমাকার হস্তী………………১,১৫০	„	
ক্ষুদ্র হস্তী…………………১,০০০	„	

(৩) যদি সতেজ কাঁচা ঘাস না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত।

(৪) নিম্নে যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত হস্তীর খাদ্যের পরিমাণ প্রদত্ত হইল :—

কার্য্যে নিযুক্ত	শস্যাদি	শুষ্ক	কাঁচা	ভূসি	লবণ	তৈল
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	আউন্স	আউন্স
বৃহৎ হস্তী	১৫	২০০	৪৮০	...	২	১
মধ্যমাকার হস্তী	১৫	১৭৫	৪০০	...	২	১
ক্ষুদ্র হস্তী	১২	১৫০	৩২০	...	২	১

(৫) হস্তীর খাদ্যাদি যদি মাহুত কর্ত্তন করিয়া দেয় তাহা হইলে সে প্রতিদিন চারি আনা বৃত্তিস্বরূপ পায়।

(৬) হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে উপরিতন কর্ম্মচারি উক্ত বৃত্তি বন্ধ করিতে পারেন।

যদি ময়দা কিংবা চাউলের পরিবর্ত্তে হস্তীকে ধান্য খাইতে দেওয়া যায়—তাহা হইলে ধান্যের পরিমাণ চাউলের দ্বিগুণ করিতে হয়।

হস্তীর খাদ্যাদি সম্বন্ধে উপরে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা সব সময় ঠিক হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে একটি মধ্যমাকার হস্তী একটি বৃহদাকার হস্তী অপেক্ষা অধিক খাদ্য গ্রহণ করে।

পানাদির ব্যবস্থা

হস্তী প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্নান করে এবং জল ভাল হইলে সেই সময়ই প্রয়োজনীয় জল পান করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই পানীয় জলের পরিমাণ ১৩ হইতে ১৮ গ্যালন পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। যদি স্নানের জল ঘোলা হয় তাহা হইলে স্নানের পূর্ব্বে হস্তীকে উপযুক্ত পরিমাণ পরিষ্কার জল পান করিতে দেওয়া কিংবা হস্তীর শরীর ভাল করিয়া ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত। ঝরণা কিংবা কূপের জলই হস্তীর পক্ষে প্রশস্ত। অপরিষ্কার জল পান করিতে দিলে হস্তীর নানারূপ পীড়া হয়। হস্তী স্রোতের জল পান করিতে বড় ভাল বাসে। যদিও হস্তী ঘোলা অপরিষ্কার জল পান করিতে ঘৃণা প্রকাশ করে না, তাহা হইলেও যাহাতে ইহারা স্বচ্ছ নির্ম্মল জল পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে স্রোতস্বতীর বালুকাময় স্তরে জল রক্ষা করিবার জন্য গর্ত্ত খনন করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। যে সমস্ত জলাশয়ে গবাদি গৃহপালিত পশু স্নান করে, সে সমস্ত জলাশয়ে হস্তীকে কোনও ক্রমেই নামিতে দেওয়া উচিত নহে। হস্তী সাধারণতঃ সূর্য্য উদয়ের এবং সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে জলপান করে। ইহাদিগকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার স্নান করিতে দেওয়া উচিত। সম্ভব হইলে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার ইহাদিগকে স্নান করান যাইতে পারে। খাদ্যগ্রহণের ৪৫ মিনিট পূর্ব্বে ইহাদের স্নানের ব্যবস্থা করা উচিত। চলিতে চলিতে পথিমধ্যে যদি ইহারা জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ইহাদিগকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জলপান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। যদি পথিমধ্যে জলের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে হস্তীকে সেইরূপ রাস্তায় ৭ ঘণ্টার অধিক কাল চলিতে দেওয়া কোনও ক্রমেই বিধেয় নহে। এরূপ রাস্তায় ইহাদিগকে

অধিকক্ষণ চলিতে দিলে ইহারা শীঘ্রই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

কার্য্য

এক একটি হস্তীর দ্বারা কি পরিমাণ কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার কোনও বাঁধা নিয়ম নাই। হস্তীর শরীরের অবস্থা এবং মেজাজের উপর কার্য্যের পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। একটি হস্তীর পক্ষে যাহা সহজসাধ্য কার্য্য অন্য হস্তীর পক্ষে তাহা সহজসাধ্য না হইতে পারে। ইহাদের দেহের পরিমাণ, শরীরের অবস্থা, বয়স একরূপ হইলেও কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রায়ই একরূপ হইতে দেখা যায় না। অনেক সময় মাহুতেরা হস্তীর সামান্য সামান্য অনেক রোগের কথা হস্তীস্বামীকে বলে না এবং বলিলেও অনেক সময় হস্তীস্বামী ইহাদের রোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না। ফলে হস্তী দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল এবং রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হস্তীর দ্বারা নিয়মাতিরিক্ত কার্য্য করাইয়া লইতে যাওয়াই ইহাদের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ। গ্রীষ্মকালে ১০টার পর এবং ৩½ টার পূর্ব্বে ইহাদিগকে কোন ক্রমেই কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কার্য্যের সময় তিনঘণ্টা অন্তর ইহাদিগকে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা ছায়াতে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। এই সময় ইহাদের গাত্রসজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া শরীরের বিভিন্নাংশে কোথায়ও কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। পরিষ্কার জল এবং কিছু খাদ্যও এই সময় ইহাদিগকে দেওয়া উচিত।

হস্তী অলস অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে ইহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় কার্য্য না করিতে করিতে ইহারা অলস হইয়া পড়ে। হস্তী যদি প্রত্যহ খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয় তাহা হইলে ইহারা অলস হইতে পারে না। যদি এরূপ করিবার সুবিধা না থাকে তাহা হইলে ইহাদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২।১ ঘণ্টা ভ্রমণ করিতে দেওয়া উচিত। গ্রীষ্মকালে ১০টা হইতে ৩½টা পর্য্যন্ত ইহাদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য করান উচিত নহে। অধিক উত্তাপে কার্য্য করিতে দিলে ইহাদের সর্দ্দি-গর্ম্মি হইতে পারে। হস্তীর শরীর ভাল থাকিলে ইহাদের দ্বারা একটু আধটু বেশী কাজ করাইয়া লইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না এবং ইহার জন্য ইহাদিগকে বেশী খাদ্য দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। রীতিমত খাদ্য পাইলে সুস্থকায় হস্তী দৈনিক ৬।৭ ঘণ্টা অক্লেশে কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু অবিরত ৬।৭ ঘণ্টা যদি কঠোর পরিশ্রমের কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সুস্থ হস্তীরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কার্য্যের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয় :—(১) বোঝাইএর পরিমাণ, (২) যাতায়াতের রাস্তার অবস্থা, (৩) সময়, (৪) রাস্তার আবরণ, (৫) হস্তী কতদিন কার্য্যের পূর্ব্বে বিশ্রামলাভ করিয়াছে এবং কার্য্যের পর কতদিন বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে, (৬) খাদ্য ও পানীয় জলের পরিমাণ এবং অবস্থা।

হস্তী রাত্রিতে চরিয়া বেড়াইতে বেশ ভাল বাসে, এ কারণ খুব প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যায় ইহাদের দ্বারা অধিক কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। বোঝা লইয়া হস্তীকে এক সময় অধিক পথ চলিতে দিলে ইহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কাঠের গুঁড়িগুলি ভারি হইলে উহা

টানিয়া লইয়া যাইতে প্রথমতঃ ইহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করে। বলপূর্ব্বক ইহাদের দ্বারা ঐ কার্য্য করাইয়া লইতে গেলে কিয়দ্দূর গুঁড়িগুলি টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দেয়। ইহাদের পৃষ্ঠে কোনওরূপ বোঝা চাপাইবার সময়ও বিশেষ বিবেচনা করিয়া বোঝা চাপাইতে হইবে। যদি বোঝা লইয়া অধিক রাস্তা চলিতে হয় তাহা হইলে যেরূপ বোঝা ইহারা সাধারণতঃ বহন করিতে অভ্যস্ত তদপেক্ষা কিছু কম করিয়া দিতে হয়। এরূপ না করিলে পথিমধ্যে ইহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সময় সময় এরূপ ভাবে অনেক হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এরূপও দেখা গিয়াছে।

হস্তী ভারবহনকারী জন্তু। কোনও কিছু টানিয়া লইয়া যাইতে হইলে ইহারা বড়ই অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং উহাতে সমস্ত বলও প্রয়োগ করিতে পারে না। রাস্তা যত বেশী হয় বোঝাইএর পরিমাণও তত কমাইয়া দিতে হয়।

গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হস্তীগুলি সময়ে সময়ে ১০০০ হইতে ১২০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত টানিতে পারে দেখা গিয়াছে।

পাহাড়ের উপর কার্য্য করিতে হইলে ইহাদিগকে তিন ঘণ্টা এবং সন্ধ্যাকালে তিন ঘণ্টা কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। এক এক ঋতুতে যদি এক একটি হস্তী সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০ টন্ কাঠ টানিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। পাহাড়ের উপর কোন কোন স্থানে স্রোতস্বতীগুলির উপর দিয়া অবাধে কাষ্ঠের গুঁড়িগুলি ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। এরূপ স্থলে হস্তীর কার্য্য অনেক কমিয়া যায়। এরূপ সুবিধা না থাকিলে হস্তীকে অনেক দূর পর্য্যন্ত কাষ্ঠগুলি টানিয়া লইয়া যাইতে হয়।

আজকাল বড় বড় কাষ্ঠ টানিবার জন্য একরূপ গাড়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা হস্তীর পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে।

কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ও পরে হস্তীর শরীরের কোনও অংশে কোনও রূপ ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে কি না বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। কার্য্য করিবার পর ইহাদের পৃষ্ঠদেশ ভাল করিয়া টিপিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যের সময় শুণ্ড এবং পদতলের মধ্যে কোনও কণ্টক কিংবা বাঁশের গোঁজ প্রবেশ করিয়াছে কি না কার্য্যের পর ভাল করিয়া দেখিতে হয়। বর্ষাকালে ইহাদের শরীরে উকুন হয়, যাহাতে এরূপ না হইতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। উকুনের দ্বারা অনেক সময় ইহাদের শরীরের উপর ক্ষত উৎপন্ন হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র সান্ন্যাল, এম্, বি
ও
শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, বি, এস্, সি
এম্, বি।

প্রাচীন চীনের শিক্ষাপ্রচারক

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর ইতিহাস ভারতের একটী গৌরবময় অধ্যায়—রাষ্ট্রনীতির ও ধর্ম্মনীতির অভ্যুদয়কাল। সেই সময় বঙ্গে পরাক্রান্ত পালরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, নালন্দার মঠে শ্রমণগণ শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন, সমস্ত বঙ্গদেশ তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মে প্লাবিত। তখন বঙ্গীয় শিল্পী বিটপাল ও ধীমান তাঁহাদের কলাবিদ্যায় চীন, নেপাল তিব্বত প্রভৃতি দেশকে মুগ্ধ করিতেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে চোল রাজগণ পালবংশীয় নরপতিগণের ন্যায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। সমগ্র দ্রাবিড়প্রদেশে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল। কনৌজে ও কাশ্মীরে তখনও পরাক্রান্ত নৃপতিগণ দেশের গৌরবরক্ষা করিতেছিলেন। ভারত হইতে তখনও বহু বহু পণ্ডিতগণ নিজ নিজ জ্ঞান ও স্বদেশের সভ্যতা লইয়া চীনদেশে একটী বৃহত্তর ভারত গড়িতেছিলেন। চীন-রাজগণ ভারতীয় শ্রমণগণের সম্মান-প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডে, মাঝে মাঝে, এল্‌ফ্রেড্ প্রভৃতি নরপতিগণ রাষ্ট্র, সাহিত্য ও শিক্ষার সংস্কারসাধন করিতেছিলেন। সারলেমেন (Charlemagne) খৃঃ ৮০৩ অব্দে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। সেই সময় মুসলমানদিগের গৌরবযুগ চলিতেছিল। পাশ্চাত্য সারলেমেন (Charlemagne) মুসলমান সাম্রাজ্যের বিক্রমাদিত্য স্বরূপ পরাক্রান্ত প্রাচ্যভূপতি হারুণ-অল-রসিদের নিকট সন্ধি ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন।

এই সময়ে চীন-সম্রাট্ সিন্ সাং (Hsien Tsung) তাঁহার একজন সত্যবাদী মন্ত্রীর মন্ত্রিত্বে এবং স্বীয় উদার শাসনের দ্বারা একটী বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহাই একমাত্র গৌরবের ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে নবম শতাব্দীতে দুইটী প্রধান সমবেত শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও চীন সাম্রাজ্য সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। আমরা এই প্রবন্ধে চীনের সেই মন্ত্রীবরের জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিব।

মন্ত্রীবর হানিউ নিজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা হইতে স্বকীয় প্রতিভা-বিকাশোপযোগী বিশেষ কোন সুবিধাই পান নাই। কিন্তু যদিও পার্থিব উত্তরাধিকারীর ন্যায় বংশগত যোগ্যতানুসারেও অনেক সময় সেরূপ আশা করা গিয়া থাকে, কিন্তু সময়ে সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। হানিউর জীবনেও আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত ভীরুতার মধ্যে সাহসের একটা উজ্জ্বল গৌরবময় রেখা, অথবা বাগ্‌দেবীর অভীপ্সিত অভিসম্পাতের ফলে চিরমূর্খতার মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মি প্রজ্জ্বলিত হইতেও দেখা যায়। এই সকল অভাব-অসুবিধার মধ্য দিয়া যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা শৌর্য্য-মহত্ত্ব, দয়া-ভক্তি, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা দেশ প্লাবিত করেন। ইঁহারা শুধু ধরণীর গৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্তই যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা যে কর্ম্মবীরের জীবনী আলোচনা করিতেছি তিনিও এইরূপ ছিলেন।

খৃঃ ৭৬৮ অব্দে চীনদেশে হানিউ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন উচ্চবংশে বা কোন রাজপরিবারের অতুল ঐশ্বর্য্যের অংশভাগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথবা বংশগত কোন সম্মানের দাবীও তাঁহার ছিল না। তিনি অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। হানিউ স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে শ্রেষ্ঠ লেখক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বলিয়া দেশময় খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী চীনভাষার আদর্শ। তিনি নিজ প্রকৃতিগত উদারতা ও অমায়িকতা দ্বারা সকল শ্রেণীর লোককেই বাধ্য করিয়াছিলেন।

সম্রাট সিন্ সাং (Hsien Tsung) অনেকাংশে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি পার্থিব সৌন্দর্য্যের অসারতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি জনসাধারণকে বুদ্ধের মহত্ত্ব বুঝাইয়া, তাঁহার কেশ-নখাদির পূজা প্রচলন করিয়াছিলেন।

চীন-রাজমন্ত্রী হানিউ (Hanyu) বৌদ্ধধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন। ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাবান্ চীন-সম্রাট্ নিজ বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে কোন কাজে হাত দিতেন না। কোন এক সময় যখন তিনি সমস্ত নাগরিকগণকে আহ্বান করিয়া একই আসনে উপবেশন করিয়া অযুতকণ্ঠে গুণগান করিয়া বুদ্ধের প্রতি সম্মান দেখাইতে ছিলেন, সেই সময় সমবেত জনতার মধ্য হইতে করুণ-কঠোর নিনাদে সমাগত জনমণ্ডলীকে নিরস্ত করিয়া চীন-রাজমন্ত্রী স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন "বুদ্ধ অসভ্য জাতির সন্তান, তাঁহার পরিধেয় বসন-ভূষণাদি চীনীয়দিগের অনুরূপ ছিল না, তাঁহার ভাষাও চীনীয়দিগের মত নহে, তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা ধর্ম্মমত বুঝাইতে পারেন নাই, পিতা-পুত্র, রাজা-মন্ত্রীর মধ্যে স্নেহ ও ভালবাসার পবিত্র বন্ধন স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদিগের রাজধানীতে তাঁহার আগমনে এই মাত্রই বুঝাইতেছে যে, তিনি তাঁহার স্বদেশ হইতে একটী স্বাধীন জাতির সুবিধা ও শান্তি স্থাপন করিবার নিমিত্তই দৌত্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং চীন সম্রাট্ও তাহাকে তদনুরূপ সম্মান আদান-প্রদান দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।"

হানিউ স্বীয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, ধর্ম্মনীতির ভিতর দিয়া জাতিগত বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন নিজকে একজন ধর্ম্ম-প্রচারকের আসনে উপবেশন করাইবার জন্য জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন।

হানিউ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হইল না। জনসাধারণ তাঁহাদের সম্পত্তি—বুদ্ধের বাণী ত্যাগ করিয়া সংসার-যন্ত্রণায় আর অভিভূত হইতে চাহিল না। জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। চীন-সম্রাট্ নিজেও তাঁহাকে বুদ্ধ-বিদ্বেষী প্রতিপন্ন করিয়া, মন্ত্রিত্ব হইতে বিদায় দিয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশে কাণ্টনের নিকটবর্ত্তী গভীর অরণ্য-প্রদেশে কোন একটী সামান্য রাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিলেন। যিনি একদিন চীনের রাজধানীতে নাগরিকগণের মধ্যে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় খুঁজিতেন, সেই রাজমন্ত্রী হানিউ আজ সাম্রাজ্যের একটী অজ্ঞাত

অশ্রুত প্রদেশে দৈহিক জীবনের একটী নূতন অধ্যায়ের উন্মেষ করিতেছেন। আজ তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতিকূলে কেহই দাঁড়াইয়া রহে নাই, অথবা তাঁহার বাগ্‌বিন্যাসের কৌশলে কেহই মুগ্ধ হইয়া যায় নাই। অরণ্যানীর গভীরতম প্রদেশে তাঁহার মন্ত্রিত্বের আজ আর সে সমাদর নাই।

হানিউ বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে যে ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে চিরকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। অসভ্য অশিক্ষিত সমাজ এখন তাঁহার জীবনের সাথী, হানিউ তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি আজ একটী নগণ্য প্রদেশের নরনারীগণের হৃদয়-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন।

ক্রমশঃ তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী চীনরাজ-দরবারে উপস্থিত হইল। গুণগ্রাহী সম্রাট্ তাঁহাকে রাজধানীতে আনাইয়া সুদীর্ঘকাল পর আবার সম্মান করিলেন। হানিউ পুনরায় উপযুক্ত আসনে আসীন হইলেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধি-স্তম্ভের উপরে খোদিত ছিল—"তিনি যে পথ দিয়া গমন করিতেন, তাহা পবিত্র হইয়া যাইত।"

ইহার প্রতি অক্ষরে হানিউর প্রতি তাঁহার স্বদেশবাসিগণের গাঢ় স্নেহ মিশ্রিত রহিয়াছে। তিনি বিপুল প্রতিভা লইয়া অশিক্ষিত পরিবারে দরিদ্রসমাজে জন্মিয়াছিলেন, আবার জীবনের শেষভাগে তাঁহাদের জন্য জীবন পাত করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। যদিও এক সময় তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার চরিত্র স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে, স্বদেশের কবিগণের কাব্যে ও গাথায় চিরকাল প্রকাশিত রহিয়াছে। চীনের হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি রহিয়াছে। নবম শতাব্দীর ইতিহাসে তিনি প্রাচীন চীনের শিক্ষা-প্রচারক বলিয়াই খ্যাত থাকিবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

ভারতীয় স্থপতি-শিল্প

আচার্য্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতামত

আচার্য্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম জগৎ-বিখ্যাত। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভার কথা দেশ ও জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমস্ত সভ্য জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। মানব-জ্ঞানের এমন বিভাগ নাই যাহাতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসামান্য নহে। দর্শন, সাহিত্য, গণিত, অর্থনীতি, ইতিহাস, কোন বিষয়েই তাঁহার সমকক্ষ লোক পৃথিবীতে অধিক নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনে সত্যই বলিয়াছিলেন—"তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত লোক বহুশত বৎসর ভারতবর্ষে জন্মে নাই এবং শীঘ্রই যে জন্মিবে তাহাও আমার মনে হয় না।"

ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী

লোকই তাঁহার নাম অবগত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার দেশবাসী এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এতদিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে King George V Professor of Philosophy পদে মনোনীত করিয়া যথেষ্ট গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। গত ১৬ই জানুয়ারী হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে Comparative Philosophy অর্থাৎ তুলনামূলক দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে ইহাতে একটী নূতন যুগের অবতারণা হইল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। Comparative Philosophy সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশেই প্রণালী বদ্ধভাবে (Systematically) আলোচনা হয় নাই। কারণ ইহা করিতে হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত দর্শনেই অসামান্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি যখন একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন শীঘ্রই জগতের দর্শনে ইতিহাসে একটী নূতন অধ্যায় যুক্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমরা ডাক্তার শীলের ছাত্র। আমরা মনে করিয়াছি বর্ত্তমান যুগের বহু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের তাঁহার কি সমাধান আছে, তাহা জানিয়া প্রকাশ করিব। এ বিষয়ে পূজনীয় অধ্যাপক বিপিন বাবুই বাঙ্গালা সাহিত্যে পথ-প্রদর্শক। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ-ভাবে ঋণী।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গ ভারতের art ও architecture লইয়া। শ্রোতার পক্ষে এ বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে মনে না করিয়া তিনি এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হইবে না।

বন্ধু যোগেন্দ্রনাথের সহিত একদিন বেলা আটটার সময় এই উদ্দেশ্যে রামমোহন সাহার লেনে আচার্য্য শীলের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন অধ্যাপক প্রমথ বাবু ও অপর কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

প্রমথ বাবুর সহিত আলাপ হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি মহাশয় সেদিন ডাক্তার শীলের বক্তৃতা কি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন ?"

আমি বলিলাম "না, সম্পূর্ণ পারি নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক নূতন কথা তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত বিষয় ধরিতে পারি নাই। সেই জন্যই ত আজ আসিয়াছি।"

ডাক্তার শীল শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন— "আগামী সপ্তাহ হইতে আমি তোমাদিগকে আর একদিন করিয়া lecture দিব ভাবিতেছি।"

প্রমথবাবু আমাকে বলিলেন "মহাশয় উঁহাকে বিশেষ খাটাইবেন না। যদি উঁহার শরীর আবার অসুস্থ হয় তাহা হইলে একেবারে সকল বিষয়ই পণ্ড হইবে।"

এই সকল কথার পরে প্রমথবাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ উঠিয়া গেলেন। আমরা দুইজন ও ডাক্তার শীল রহিলাম। তখন হিন্দু-সভ্যতা সম্বন্ধে আমি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই কাগজ পেন্সিল লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যথাসম্ভব ডাক্তার শীলের কথাগুলি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।

ডাক্তার শীলকে প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি সেদিন যে বলিয়াছিলেন রামানুজ তাঁহার ভজনের অনেক স্থানে খৃষ্টান রোমান ক্যাথোলিক ধর্ম্মের ভজনের অনুসরণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কি বিশেষ কোনো প্রমাণ পাইয়াছেন ?"

ডাক্তার শীল বলিতে লাগিলেন—

"রামানুজের ভজনের অনেক স্থানে খৃষ্টান ধর্ম্মের যে কোনো কোনো ভাবের আভাষ পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে রামানুজের লক্ষ্মীর চিত্র Maryর Intercession for sinnersএর আভাষে অঙ্কিত। এতদ্ভিন্ন Christian Sonship ও Parable of the Prodigal Sonএর ছায়াও স্থানে স্থানে বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ অন্য কিছুই নাই। তবে ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—রামানুজের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কোনো সাহিত্যে এরূপ ভাবের আভাষ পাওয়া যায় না। রামানুজ যে সময়ে তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছিলেন সে সময়ের পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—তখন খৃষ্টান ধর্ম্ম দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিশেষ প্রবল ভাবে বিরাজ করিতেছিল। এমন কি তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই উহা ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তামিল সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে সাহিত্যের বহু বিখ্যাত লেখকই খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এমন কি খৃষ্টানেরা একখানি নবীন বেদ পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি রামানুজের দর্শনের উপর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

"ইহাতে কিন্তু অপমানের কোনো কারণই নাই। ভারতবর্ষের সভ্যতার ইহাই এক বিশেষত্ব যে-যদিও ভারতবর্ষ বাহির হইতে অন্যান্য জাতির কোনো কোনো সাধনা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তবুও সে তাহাকে তাহার Synthetic geniusএর সাহায্যে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ভারতের Art and architecture সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। গ্রীকদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনই তাহার National peculiarity যে সে ইহাকে তাহার নিজের সাধনার অনুরূপ করিয়াছে।"

এই স্থানে আচার্য্যকে বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"গ্রীকদের নিকট হইতে যে হিন্দুদের Art ও architecture borrow করা, সে সম্বন্ধে কি বিশেষ কিছু প্রমাণ পাইয়াছেন ?"

ডাক্তার শীল বলিতে লাগিলেন—

"প্রমাণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আছে। তবে একটী কথা বলিলেই বুঝিবে যে, গান্ধার form of architectureএ হারকিউলিসের উপাখ্যান ঘটিত অনেক বিষয় উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের একটী বিশেষ ভুল যে আমরা মনে করি বিদেশ হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছি, ইহা স্বীকার করা অপমানজনক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সজীবতার চিহ্নই হইতেছে Assimilation আর সম্পূর্ণ originalityর দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রীকদের architecture ত তাহাদের নিজের নহে। উহা Egyptiansদের নিকট হইতে গৃহীত।

Art ও Architecture এর প্রসঙ্গ উঠাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"দক্ষিণ ভারতবর্ষের অনেক দেব-মন্দিরে যে বহু কুরুচিপূর্ণ চিত্র উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আপনার ব্যাখ্যা কি? এবিষয় লইয়া ত অনেকে অনেকই কল্পনা জল্পনা করিতেছেন।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই আচার্য্য বলিলেন—

"হাঁ, এ বিষয়ে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন আমি যাহা বলিয়াছিলাম বোধ হয় তাহা কোনো magazine এ published হইয়া থাকিবে। সেদিন বিপিন বাবুও (Prop. B. V. Gupta) এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা আমার যাহা মনে হয় তাহা বলিতেছি।

"বাস্তবিকই পবিত্র দেবমন্দিরের গাত্রে কিরূপে যে এরূপ অশ্লীল চিত্র আসিল, ইহা প্রথমতঃ বড়ই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে ইহা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ঘটিত ব্যাপার হইতে গৃহীত হইয়াছে। কেহ বা আবার ইহার মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানে নিহিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহার কোনটীই সত্য নহে। বৈষ্ণব বা বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ইহাকে কোনো দিক্ দিয়াই সংশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে না।

"ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে গেলে আমাদিগকে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষের architecture এর initiative, monks অথবা সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে আসিয়াছিল। ইহা এ দেশের একটী বিশেষত্ব। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এই সকল monks বা সন্ন্যাসী ভাস্কর ও শ্রমজীবীদিগকে suggestions দিতেন। তাহারা ইহার উপর নির্ভর করিয়াই মন্দিরাদি গঠন করিত।

"এখন ভারতবর্ষের সাধনার একটী ইহাই বিশেষত্ব যে ভারতের জ্ঞানিগণ কখনই পরলোকের কামনা করিয়া কোনো কার্য্য করেন নাই। তাঁহারা মুক্তি চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে মুক্তি পৃথিবীর বাহিরে অন্য কোনো পারলৌকিক জীবনে নহে। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল জীবন্মুক্তি এবং এই মুক্তি লাভ করিবার জন্য তাঁহারা passions বা প্রবৃত্তি নিচয়কে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় mediaeval বা মধ্যযুগের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষত্ব (important character)। European mediaeval timesএর তুলনায় এ বিষয়ে এ দেশের একটী বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে বলিব।

"ভারতবর্ষীয় জ্ঞানী সন্ন্যাসীরা এই যে প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া মুক্তি চাহিয়াছিলেন—ইহার জন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একটী বিষয় এই ছিল যে, যে **প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিতে হইবে তাহাদিগকে বীভৎস ভাবে বাহ্য আকার প্রদান করা।** যাহাকে principle of auto-suggestion বলে অনেকটা তাহারই উপর ইহার ভিত্তি ছিল। ক্রমাগতঃ প্রবৃত্তিগুলিকে এইরূপ বীভৎস ও ভীষণ ভাবে কল্পনা করিতে করিতে সমস্ত

অন্তঃকরণ ইহা হইতে ঘৃণায় দূরে সরিয়া আসিবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। শিক্ষা বিষয়ে এ প্রথা অবলম্বন করা যে নিরর্থক নহে, এ সম্বন্ধে কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিতও আজকাল এই কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সের মৃত মহাপণ্ডিত Guyanএর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"যাহা হউক এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা দেবমন্দির ও অন্যান্য উপাসনা স্থানে এই সকল বীভৎস চিত্র উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতেছ দেব-উপাসনা-গৃহে অশ্লীল চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি হিন্দুদের মধ্যে নৈতিক অবনতির প্রমাণ নহে। বরং ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ moral ও religious".

আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু দোলাইতে দোলাইতে ক্রমশঃ উত্তেজিত কণ্ঠে আচার্য্য যখন এই সকল ব্যাখ্যা করিতেছিলেন আমরা সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া তাহা শুনিতেছিলাম। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মনীষা ও অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যে দেশে এমন লোকের জন্মগ্রহণ এখনও সম্ভবপর হইয়াছে, সে দেশের ভবিষ্যৎ কখনই নৈরাশ্যপূর্ণ নহে।

আচার্য্য শীল বলিতে লাগিলেন—

"তাহা হইলেই দেখিতেছ এই সকল উৎকীর্ণ চিত্রের মধ্যে বৌদ্ধ অথবা বৈষ্ণবীয় ভাব কিছুই নাই। বাসনার বস্তুকে কদর্য্য ও ভীষণ ভাবে কল্পনা করিয়া তাহা হইতে চিত্তবৃত্তিকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল।

"কিন্তু এইখানে প্রাচীন monkগণ একটী মহাভ্রম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক সাধনার নিরাপদ পরিখার মধ্যে থাকিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রাকৃত জনের চিত্তে এই সকল চিত্রের প্রভাব মঙ্গলজনক হইবে না। জনসাধারণের অশিক্ষিত মন ইহা হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হয়তো গ্রহণ করিতে পারিবে না ইহা তাঁহাদের মনে হয় নাই। ফলে হইয়াছেও তাহাই। এই সকল mural decorations জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক অবনতি বিস্তারের একটী প্রধান কারণ হইয়াছে। আমার মনে হয় দক্ষিণ ভারতবর্ষে অনেক দেবমন্দিরের সহিত যে সকল কুপ্রথা বিজড়িত রহিয়াছে ইহাই তাহার মূল কারণ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"অনেক চিত্রে দেখিতে পাই—কোনো যোগী বা সন্ন্যাসী মালা জপ করিতে করিতে এই সকল অশ্লীল কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছেন—ইহার কারণ কি মনে করেন?"

ডাক্তার শীল বলিলেন "ইহার উত্তর অতি সহজ। যখন দেশে mural decorationএর এইরূপ একটী tradition হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্য উদ্দেশ্য সাধন করা দেশের অন্য কোন লোকের পক্ষে কঠিন হয় নাই এইজন্য এদেশের ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় যখন আপনাদের মধ্যে কলহে ব্যস্ত ছিলেন তখন একদল আর একদলকে সাধারণের চক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বরং এই typeএর মধ্যে শ্রেণী বিশেষের ও ব্যক্তি বিশেষের tastes ও requirements অনুসারে variation হওয়াই স্বাভাবিক। এই বৃহৎ গণ্ডির মধ্যে স্বাধীন শক্তি প্রকাশের যথেষ্ট অবসর ছিল।

আমি বলিলাম "আপনি যাহা যাহা বলিতেছেন সমস্তই যুক্তিসিদ্ধ ও অতি original বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আমি একটী বিষয় বুঝিতে পারিতেছি না—কেন উড়িষ্যা ও দক্ষিণাঞ্চলেই প্রধানতঃ এই শ্রেণীর mural decorationsএর প্রাবল্য হইল ?"

আচার্য্য আগ্রহের সহিত উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমিও তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে কেন এরূপ traditions আদৌ স্থায়ী হইল তাহাই বলিতেছি। ইহার প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষের power of rejection অথবা পরিবর্জ্জনকারিণী শক্তির বিশেষ অভাব। ইহা হইতেই তাহার conservatism। সুতরাং একবার mural decoration-এর যে ধারা দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, দোষগুণ সর্ব্বসত্বেও তাহা রহিয়া গেল। বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না।

"কিন্তু ইহাতে কেন Southern India-তেই বিশেষ ভাবে ইহা থাকিল তাহা বুঝা যাইতেছে না। তাহা বুঝিতে গেলে দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস তোমাদিগকে কিছু কিছু বলিতে হইবে।

"যখন সামাজিক ইতিহাসের কথা উঠিল তখন একটী কথা তোমাদিগকে না বলিয়া পারিতেছি না। আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও হইবে না। বৈদিক সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সে সময়ে আমাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। ইহা অস্বাভাবিকও নহে। সমাজের প্রথম অবস্থাতে যখন বিবাহের বিশেষ কোন দৃঢ় বন্ধন হয় নাই এবং যখন স্ত্রীপুরুষের আসক্তির উপরই, আমরা যাহাকে বিবাহ বলি, তাহা নির্ভর করিত তখন অধিক বয়সে বিবাহই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আর্য্যেরা শীত-প্রধান দেশের আদিম অধিবাসী, এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহই থাকে না। যে কারণেই হউক বৈদিক যুগে early marriageএর প্রচলন ছিল না—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু স্মৃতির যুগে মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। এই দুই যুগের মধ্যে এই যে সামাজিক প্রথার একটী বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি ?

"Southern Indiaতে আর্য্যদিগের উপনিবেশ স্থাপন হইবার পূর্ব্বে অনার্য্য দ্রাবিড়জাতি বাস করিত। আর্য্যেরা যখন তথায় আগমন করিলেন তখন এই সকল জাতি মধ্যে promiscuity ও polyandry বিশেষভাবে প্রচলিত। Sexual relation সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কিন্তু পক্ষান্তরে আর্য্য ঔপনিবেশিকদের মধ্যে তখন Patriarchal form of family প্রচলিত হইয়াছে। সামাজিক অন্যান্য নিয়মও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে তখন বাল্য বিবাহের আদৌ প্রচলন আরম্ভ হয় নাই।

"এইরূপ বিভিন্ন সামাজিক রীতিপদ্ধতি লইয়া দুইটী বিভিন্ন জাতি যখন দক্ষিণ ভারতবর্ষে মিলিত হইল, তখন সভ্য ও শক্তিশালী আর্য্যজাতি প্রথমতঃ অনার্য্য দ্রাবিড় সভ্যতাকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহাকে নিজের

অঙ্গীভূত করিয়া লইতেই বাধ্য হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে আর্য্যসমাজে কুমারীগণের বিবাহের বয়ঃক্রম কমাইয়া দিতে হইল। পারিপার্শ্বিক promiscuityর মধ্যে থাকিয়া আর্য্যকুমারীগণের চরিত্র অবনত হইয়া পড়ে, এইজন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাহাদিগের বিবাহের ব্যবস্থা হইল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রিপুর উত্তেজনা শীতপ্রধান দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক—ইহাও অপর কারণ হইতে পারে, সন্দেহ নাই। ইহার আর একটী ফল এই হইল যে, আর্য্যগণকে বিবাহের definition অর্থাৎ সংজ্ঞাটী wider করিয়া লইতে হইল। গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি যে সকল বিবাহের কথা আমরা স্মৃতিতে দেখিতে পাই, এই খানেই ইহার উৎপত্তি। অনার্য্য প্রথাকে ব্রাহ্মণ্য influenceএ পরিমার্জ্জিত ও সম্ভবমত বিশুদ্ধ করিয়া একটী religious sanction দেওয়া হইল।

"যাহা হউক, ইহা আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয় নহে। দক্ষিণ ভারতবর্ষেই বিশেষ করিয়া obscene mural decoration কেন আসিল ইহাই আমরা বুঝিতেছিলাম। সেখানকার আদিম অধিবাসী দ্রাবিড় জাতির মধ্যে sexual relationটা বিশেষ strict ধরণের ছিল না—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং সেখানে mural decorationএর এই ধারা সামাজিক প্রথার সহিতই বেশ মিশিয়া খাপ খাইয়া গিয়াছিল। সমাজগত ভাবের সহিত তাহার কোন বিরোধ উপস্থিত না হওয়াতে ক্রমে তাহা সেখানে স্থায়ী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।"

ডাক্তার শীলের কথা শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের দেশে এই দুইটী ভিন্ন আর কি কি architectureএর ধারা আছে জানিতে ইচ্ছা করি।"

ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। আচার্য্য এক ঘণ্টারও অধিক কাল আমাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, কিন্তু তবুও কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ না করিয়া প্রসন্ন চিত্তে উত্তর করিলেন—

"আমাদের দেশের architectureকে সাধারণতঃ তিন ধারায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমটীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা এক হিসাবে ভারতবর্ষেরই বিশেষ প্রণালী। তবে আর এক হিসাবে য়ুরোপে ইহার analogous একটী architecture-এর ধারা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"ইহা ছাড়া আর দুইটী ধারা এদেশের architectureএ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা য়ুরোপের architectureএ-ও বর্ত্তমান।

"তাহার মধ্যে একটী হইতেছে supernatural বা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটিত বিষয় লইয়া। ভারতবর্ষে নানা যুগে নানা ধর্ম্ম মুক্তিবার্ত্তা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। অবতারবাদ ভারতবর্ষের একটী প্রধান বিশেষত্ব—যাহার সহিত য়ুরোপের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয় না। সমস্ত দেশের উপর এই যে ধর্ম্মবীরগণের, অবতারগণের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল তাহার ফল architectureএ প্রকাশ পাইয়াছিল। ভারতের বহু মন্দির-গাত্রে ভগবানের লীলাঘটিত নানা চিত্র এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই এই শ্রেণীর mural decoration সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উঠিয়াছিল। বুদ্ধের জন্ম কর্ম্ম মৃত্যু—যাহাকে অতিপ্রাকৃত আকার প্রদান করিয়া

বৌদ্ধ জাতকের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই architectural expression মন্দিরে, গিরিগুহায় ও বৌদ্ধমূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। Museumএ একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এই শ্রেণীর architectureএর নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে দেখিবে।

"কিন্তু বৌদ্ধ ভিন্ন বৈষ্ণবীয় প্রভৃতি ধর্ম্মে ভগবানের লীলা লইয়াও অনেক mural decoration ও মূর্ত্তি দেখিবে। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি বহু অবতার অন্যান্য দেবদেবী-ঘটিত বহু ব্যাপারেও architectural expression প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। ভারতবর্ষের architecture এইখানেই তাহার চিত্ত ও চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছে।

"য়ুরোপে খৃষ্ট ও তাঁহার কাহিনী লইয়া এবং গ্রীসে নানা দেবদেবী লইয়া যে সকল art ও architecture উঠিয়াছে তাহার সহিত ইহার যথেষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে গ্রীসে ভারতবর্ষের মত অতিপ্রাকৃত ভাব এরূপ প্রবলভাবে প্রকাশ পায় নাই। গ্রীসের art ভারতের অপেক্ষা অনেকাংশে naturalistic। অবতারবাদ য়ুরোপে এরূপ ভাবে জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে নাই, বোধ হয় ইহাই তাহার কারণ হইবে।

ভারতবর্ষের mural decorationএর তৃতীয় ধারা হইতেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবন লইয়া। তোমরা হয়তো ভাবিয়া থাক ভারতবর্ষের সাধনা যখন বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া মুক্তির দিকে, তখন সাংসারিক জীবনের কোনও ভাব তাহার art ও architectureএ ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহা ভুল ধারণা। পুরীর মন্দির-গাত্রে এবং অন্যান্য অনেক স্থানেই ভারত-সমাজের তাৎকালিক চিত্র প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সৈন্য-দিগের যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য-বহরের সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের চিত্র পুরীর মন্দির-গাত্রে দেখিতে পাইবে। Mural decorationএর এ ধারা স্বাভাবিক, সুতরাং ইহা এ দেশের কোনো বিশেষত্ব-প্রকাশক নহে। য়ুরোপের architectureএ-ও ইহা বিদ্যমান।"

ডাক্তার শীলের কথা শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি যে প্রথম ধারার—mural decorationএর analogous ধারা য়ুরোপে আছে বলিয়াছিলেন তাহা কি?"

ডাক্তার শীল বলিতে লাগিলেন—

"ভারতবর্ষের যে mural decorationএর প্রথম ধারার কথা বলিয়াছি তাহার motive হইতেছে religious। য়ুরোপে ইহার যে analogous ধারা দেখা যায় তাহার motive-ও religious কিন্তু form অন্যরূপ। ইহার কারণ এই যে য়ুরোপের মধ্যযুগ ভারতীয় মধ্যযুগ হইতে একটু স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ জীবন্মুক্তি চাহিয়াছিল; কিন্তু য়ুরোপের monkগণ পরলোকের যে সুখ তাহাই কামনা করিয়াছিলেন। এই জন্য সেখানে পরকালের কথা একটু বিশেষ ভাবে art ও architectureএ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্গ ও নরকের যত প্রকার চিত্র মানুষের মন কল্পনা করিতে পারে তাহার প্রায় সকলই য়ুরোপের art ও architectureএ ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নরকের অনন্ত ভীষণ শাস্তির কথা এবং স্বর্গের অনন্ত শান্তি ও সুখের কথা মনে করিয়া যেন ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতে পারে। ভারতবর্ষের architectureএ কিন্তু স্বর্গ ও নরকের এই সকল চিত্র বিশেষ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।"

দান্তের Divina Comediaর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় আচার্য্য শীল বলিলেন—

"হাঁ, Danteএর স্বর্গ ও নরক বর্ণনার সহিত ইহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা ইহা নহে যে Danteর চিত্র হইতেই ইহা গৃহীত। বরং Danteর বর্ণনা ও architectureএর এই ধারা একই common ideasএর parallel expression। পরলোক সম্বন্ধে কতকগুলি ভাব, আমার মনে হয়, বহু প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্য ও অনার্য্য সমস্ত মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে। Flora ও Fauna সম্বন্ধে যেমন সমস্ত পৃথিবীকে কতকগুলি zones অর্থাৎ মণ্ডলে বিভক্ত করা যাইতে পারে, স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধীয় ভাবেরও সেইরূপ কতকগুলি zones দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল zonesএর মধ্যে ভাব-ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও ইহাদের মূলে কতকগুলি ভাব common। এই জন্যই পাপপুণ্যের কতকগুলি শাস্তি ও পুরস্কার য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে একই প্রকার দেখিতে পাইবে।

"এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই ভাব এক দেশ আর এক দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় borrowingএর theory এ সকল বিষয়ে আদৌ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যেমন beast fable আর্য্য ও অনার্য্য সকলের মধ্যেই কোন না কোন formএ দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকল ভাবও সেইরূপ। Beast fable সম্বন্ধেও কেহ কেহ এই borrowingএর hypothesis উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। নিগ্রো, বাসুতোষ, হটেনটস্ প্রভৃতি আফ্রিকার অসভ্য জাতি ও আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতির মধ্যেও যেরূপ ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, আবার আর্য্যজাতির মধ্যেও ইহার সেরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান।"

আমি বলিলাম "যদি তাহাই হয়, তবে ত ভারতবর্ষেও জনসাধারণের মধ্যে এই সকল স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধীয় ভাব বহু প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান ছিল। অথচ তাহার কোন architectural expression হয় নাই, ইহার কারণ কি?"

ডাক্তার শীল বলিলেন—"ইহার কারণ কি সম্পূর্ণ নির্ণয় করা যায় না। এই সকল ভাবের উপর নির্ভর করিয়াও ত প্রাচীন মনীষিগণ লোকশিক্ষার অনুকূল art ও architectureএর প্রচলন করিতে পারিতেন। কিন্তু কেন তাহা করেন নাই ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে হয়তো যাঁহারা architectureএর suggestion দিয়াছিলেন সেই monkদের মধ্যে এই ভাবগুলি সেরূপ প্রবল না হওয়ায় এগুলি architectureএ প্রকাশিত হয় নাই।"

এ দেশের architecture সম্বন্ধে আর কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় আচার্য্য উত্তর করিলেন—

"হাঁ, জানিবার অনেক বিষয়ই আছে। যাহা বলিলাম এগুলি ভাবের দিক্ দিয়া মোটামুটিভাবে শ্রেণী-বিশ্লেষণ মাত্র। এ ছাড়া forms of architecture সম্বন্ধে জানিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু তাহাতে অনেক technicalities আসিয়া পড়িবে। তাহা কি তোমাদের সেরূপ চিত্তাকর্ষক হইবে? তবে একটী কথা জানিয়া রাখ যে এই forms of architecture সম্বন্ধেও borrowing theory প্রয়োগ

করিবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবিয়া দেখা উচিত। খুব strong প্রমাণ ভিন্ন এক জাতি আর এক জাতি হইতে ধার করিয়াছে ইহা বলা অন্যায়। কিন্তু আজকাল দেখিতে পাই একশ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ lightly এই মত প্রচার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ architecture এর ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, কতকগুলি masonic traditions সমস্ত জাতির মধ্যেই common ছিল।

"ভারতের architecture সম্বন্ধে আর একটী কথা এখন আমার মনে হইতেছে। এ বিষয় সংক্রান্ত যে সকল পূরাতন সংস্কৃত পুস্তক এদেশে আছে, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই theoretical। ইহার কারণ এই যে এদেশে masonic class ও যাঁহারা এ বিষয়ে theoretical suggestions দিয়াছেন সেই monkদের মধ্যে একটী বৃহৎ ব্যবধান চিরদিনই ছিল।"

তন্ময় হইয়া আমরা ডাক্তার শীলের এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলাম। বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছে সে কথা কাহারও মনে হয় নাই। যতই তাঁহার এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতেছিলাম, ততই আমাদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি আবার বলিলাম—

"এই architecture ও art সম্বন্ধে যখন কথা আসিয়াছে, তখন আমি আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষে লিঙ্গ-পূজার যে প্রচলন হইয়াছে, ইহার কি অর্থ আপনার মনে হয়?"

ডাক্তার শীল ঘড়ির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সে অনেক কথা। আর একদিন হইবে।" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী
বি, এ।

একাদশী

আজকাল আমরা (শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হউক বা না হউক) সকল বিষয়েতেই, একটা না একটা স্বাধীনমত প্রকাশ করিয়া মীমাংসা করিয়া থাকি। বালিকা বা বৃদ্ধা বিধবা রমণীদিগের একাদশীর উপবাসজনিত কষ্ট যতদূর হউক বা না হউক, কিন্তু আমরাই দয়ার সাগর হইয়া বাগাড়ম্বরে তাহাদিগের কষ্ট এতদূর বাড়াইয়া দেই যে, তাহা বলিবার নহে। মনে করি প্রাচীন আর্য্যঋষিরা বড়ই নিষ্ঠুর ছিলেন বলিয়া, এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু একবার ভাবিয়াও দেখি না যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতদূর মহৎ. ইন্দ্রিয়সংযমাদি করিবার যদি প্রকৃষ্ট উপায় থাকে ত তাহা একমাত্র উপবাস। বহির্জ্জগতের সহিত যে অন্তর্জ্জগতের কতদূর মিল, তাহা ত্রিকালজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণই বুঝিতেন; এবং তাই বলিয়া তাঁহারা চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই দেহে বাহ্যজগতের সবই আছে। এই বহির্জ্জগতে যেমন উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বর্ত্তমান, দেহেও তদ্রূপ ঊর্দ্ধ দক্ষিণাংশ দক্ষিণ

মেরু ও ঊর্দ্ধ উত্তরাংশ উত্তর মেরু। বাহিরে যেমন পৃথিবীর মধ্যভাগে বিষুবরেখা দ্বারা পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, দেহে তদ্রূপ মেরুদণ্ড দ্বারা দেহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাহিরে যেমন সুমেরু ও কুমেরু উভয় প্রদেশ স্তুপীকৃত বরফবেষ্টিত এবং সেই বরফরাশির আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা সমস্ত জীবজগৎ প্রাণ ধারণ করে, দেহে তদ্রূপ দুই পার্শ্বে দুই ফুস্ ফুস্ আছে, তদ্দ্বারা আকুঞ্চন প্রসারণ বা শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় এবং সমস্ত জীবদেহ পরিচালিত হয়। সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরু অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার এই সপ্তচক্রবেষ্টিত মেরুদণ্ড। সরিৎ-দেহগত রসধাতু, সাগর-দেহের রুধির, শৈল—অস্থিপঞ্জর। ক্ষেত্র—দেহ বা তন্মধ্যস্থ বিভিন্ন স্থান; ক্ষেত্রপালক—ক্ষেত্ররক্ষক। সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা-যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য। চন্দ্রের গুণ বিসর্গ, এবং সূর্য্যের গুণ আদান। চন্দ্র যে শীতল বায়ু দান করেন, তাহা জীবজন্তু শ্বাসরূপে গ্রহণ করে এবং সূর্য্য যে উষ্ণ বায়ু গ্রহণ করেন, তাহাই জীবজন্তু প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে। সুতরাং গ্রহণই দেহের স্থিতি, আর ত্যাগই দেহের লয়। এই দেহে সর্ব্বদাই জন্ম-মৃত্যু বা সৃষ্টি-সংহার-ক্রিয়া চলিতেছে। এই সংহার-ক্রিয়াকেই খণ্ডপ্রলয় বলা যায় এবং ত্যাগ করিয়া আর গ্রহণ করিতে না পারাকে মৃত্যু বা মহা প্রলয় কহে।

বহির্জগতেও যেমন বায়ু, অগ্নি ও জলের হ্রাস-বৃদ্ধি, সমতা ও অসমতা ঘটে, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ ঘটে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ঝড়, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, প্রভৃতির সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উপর্য্যুপরি দুইদিন বৃষ্টি হইলেই শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে, বেশী শীত হইলেই শরীর থর থর করিয়া কাঁপে, বেশী গ্রীষ্ম হইলেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। দশমী, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে সুস্থ শরীরও ভার ভার বোধ হয়। রোগ পুরাতন হইলে দশমী, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে বৃদ্ধি হইবেই হইবে। এই সকল কারণেই সহজে বুঝা যায় যে, বাহ্যজগতের সহিত শরীরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আর্য্যদিগের এই সকল যে সূক্ষ্মগবেষণার সূক্ষ্মনিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শরীর চেতনার অধিষ্ঠান ও পঞ্চভূতাত্মক। শরীরের সমযোগবাহী ধাতুসকল যখন বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তখন শরীর ক্লিষ্ট ও বিনষ্ট হয়। সাম্যভাব রাখাই শরীর রক্ষার হেতু। বৈষম্য নষ্ট করার জন্যই ঔষধাদির প্রয়োজন। তদ্রূপ উপবাসও একটী বৈষম্য-ভাব নষ্ট করিয়া সমতা রক্ষা করার প্রধান উপায়।

আর্য্যদিগের কি সুব্যবস্থা—দশমীর দিন হইতেই শরীরে রসের ভাগ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া, সংযম করিয়া তৎপর দিনে একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে পারণ, এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে নিশি-পালন দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শরীরের রসধাতু শোষণ দ্বারা সাম্য আনয়ন করাই মহৎ উদ্দেশ্য। এই সকল সুবন্দোবস্ত দ্বারা জনসাধারণের হিত-কর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, তাঁহারা অসীম দয়ার সাগর। কিন্তু তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া রসাধিক্য সময়ে কতকগুলি গণ্ডেপিণ্ডে ভোজ্যদ্রব্য ভোজন দ্বারা রসাদির বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের সাধনী-ভূত শরীরের ধ্বংসের উপায় করিয়া থাকি। তাহা না করিয়া তাঁহাদের সুনিয়ম পালন করতঃ ধাতু সকলের সাম্য রক্ষা দ্বারা আমরা

বল বর্ণ স্বাস্থ্যাদি যুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া ধর্ম্মার্থ কাম ও পরলোকে পরমগতি লাভ করিতে পারি।

উচ্চ সোপানে তুলিবার জন্য আর্য্যগণ, অষ্টম বর্ষ হইতে বালকদিগকে কষ্টকর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা আরম্ভ করাইতেন। আজ কি না আমরা হিন্দু বিধবাদিগের অতিশয় কষ্ট হইবে বলিয়া তাহাদিগকে একাদশীর উপবাস-রূপ ব্রত হইতে বিচ্যুত করিবার প্রয়াসী হইয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে বসিয়াছি। বিধবাদিগের যে ব্রতোপবাসাদি দ্বারা দুর্নিবার কামাদি রিপুজয় করা প্রধান কার্য্য, তাহা ভাবিয়াও দেখি না। ইহা যুগ-মাহাত্ম্য বই আর কি বলা যা বে? বিধবার অনুকল্পাচরণ শাস্ত্রসম্মত কি না, তাহা যুক্তিতর্কপূর্ণ স্মার্ত্তাভিপ্রায় দ্বারা নিম্নে ব্যক্ত করা গেল।—

ছাত্র। শাস্ত্রানুসারে অশক্ত বিধবা একাদশীর উপবাসস্থলে অনুকল্পাচরণ করিতে পারে কি না?

অধ্যাপক। হাঁ, পারে।

ছাত্র—কি করিয়া পারে? স্মার্ত্ত যখন "বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ।" "বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে। তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥" এই বচন তুলিয়া সকল প্রকারে নিত্যত্বই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অ—তুমি ভুল বুঝিয়াছ। কারণ সর্ব্বথা অর্থাৎ সকল কালে

"অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং
স পাপকৃৎ॥"

অষ্টম বৎসরের অধিক এবং অপূর্ণ অশীতি বৎসরের মধ্যে, মোহবশতঃ একাদশীতে মানব সাধারণ মাত্রেরই ভোজন করিলে পাপ করা হয়। সুতরাং অষ্টম বৎসরের পূর্ব্বে এবং অশীতি বৎসরের পর অর্থাৎ বাল বৃদ্ধ বয়সে বিধবারও একাদশী ব্রত বিষয়ে কাম্যত্ব প্রযুক্ত, সর্ব্বথা এই বাক্য দ্বারা তৎকালের মধ্যেই তাহার নিত্যত্ব স্বীকার করা হইল। ইহাই স্মার্ত্তাভিপ্রায় বলিয়া বোধ করিতেছি।

ছা—সে কি মহাশয়। যখন "আগ্নেয়ে—

"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নি স্তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

ইত্যাদি বচন দ্বারা পূর্ব্বেই সামান্য গৃহস্থ মানব মাত্রের পরিগ্রহ দ্বারাই ত, বিধবারও পরিগ্রহ করা হইয়াছিল, আবার "বিধবা যা ভবেন্নারী" এই বচন দ্বারা বিধবার একাদশীতে ভোজনাভাব করার তাৎপর্য্য কি? ইহা দ্বারা অনুকল্প বারণ ভিন্ন আর কি বুঝিব।

অ—তাহা নহে। দেখ "অশক্তং প্রতি নারদীয়ে—

"অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।
মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং॥"

মনুঃ—

"বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আপৎসু মরণাদ্ভীতৈর্বিধিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ॥"

ইত্যাদি বচন দ্বারা সবিশেষরূপে অসমর্থ মানব মাত্রেরই অনুকল্প বিধান করায়, বিধবাতিরিক্ত কল্পনা করিতে গেলে, বচনের সঙ্কোচ হইয়া পড়ে। সুতরাং অসমর্থ পক্ষে বিধবার অনুকল্পাচরণই শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই বিচার-মূলেই পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ আচরণ প্রচলিত আছে এবং আজকাল আমরাও অনুকল্পরূপে লুচি মোহনভোগের ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ছা—আজ্ঞা না।

"একাদশী ব্রতং নিত্যং, তদাহ ব্রহ্মবৈবর্ত্তঃ,—

"ইতি বিজ্ঞায় কুর্ব্বীতা বশ্যমেকাদশীব্রতং।
বিশেষনিয়মাশক্তোঽহোরাত্রং ভুক্তিবর্জ্জিতঃ ॥"

ভবিষ্যে—

"নিত্যমেতৎ ব্রত্যং নাম কর্ত্তব্যং সার্ব্ববর্ণিকং।
সর্ব্বাশ্রমাণাং সামান্যং সর্ব্বধর্ম্মেষমুত্তমং ॥"

ইত্যাদি বচন দ্বারা নর মাত্রের নিত্যতা প্রাপ্তি হইলেও, বিধবাদিগের পুনরায় নিত্যতা বিধানের অদগ্ধ দহন ন্যায় দ্বারা "যাবদ্‌ প্রাপ্তং তাবদ্বিধীয়তে" এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে বিধবাদিগের নিত্য উপবাসের অপ্রাপ্তি হইবে, সেই খানেই তাহাদিগের উপবাসের প্রসক্তি হইবে। এই নিয়মানুসারে "অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যো" ইহা দ্বারা অষ্টাব্দের মধ্যে অশীতি বৎসরানন্তর বয়সে বালবৃদ্ধের যেরূপ উপবাসের অপ্রাপ্তি এবং অসিতৈকাদশী দিনে, পুত্রী নোপবসেৎ গৃহী।" ব্রহ্মপুরাণের এই বচন দ্বারা গৃহস্থ বিধবাদিগের কৃষ্ণা একাদশীতে যেরূপ উপবাসের অপ্রাপ্তি, সেইরূপ অসমর্থ পক্ষেও উপবাসের অপ্রাপ্তি হওয়ায় সেই সেই অপ্রাপ্তি স্থলে উপবাসের আবশ্যকতা প্রতিপাদন জন্য, বিধবাদিগের, একাদশ্যুপবাসের পুনর্নিত্যতা বিধান করা হইল। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অ। ঐরূপ স্থলে বিনিগমনা ব্যতিরেকে ঐরূপ ব্যবস্থা কি করিয়া করিতে পার ?

ছা। সে কি কথা—অদগ্ধদহন ন্যায়ানুসারে "যাবদপ্রাপ্তং তাবদ্বিধীয়তে" ইহা দ্বারাই ত সর্ব্বত্র বিধানের কর্ত্তব্যতা হইয়া পড়িয়াছে।

অ। দেখ ঐরূপ করিতে গেলে অর্থাৎ অশক্তস্থলে উপবাসের বিধান করিতে গেলে, অশক্যানুষ্ঠানোপদেশেরই আপত্তি হইয়া পড়ে।

ছা। কেন মহাশয়! আপনার মতেও যে, অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যো ইত্যাদি বচন দ্বারা, বালবৃদ্ধের পক্ষেও ত অশক্তমূলকই উপবাসাভাব বিধানস্থলে বিধবাদিগের পুনরায় উপবাসের বিধান করিয়াছেন; সেটা কি অশক্যানুষ্ঠানোপদেশের আপত্তির বিষয়ীভূত হয় নাই ?

বাস্তবিক পক্ষে অশক্ত বলিতে যাহার অন্যান্য লোকাপেক্ষা অতিশয় উপবাসজনিত ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহাকেই বুঝাইবে। যাহার উপবাসকরণানুকূল শক্তির একেবারেই অভাব তাহাকে কখনই বুঝাইবে না। "অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।" এই বচনে দুর্ব্বলেরই অনুকল্প বিধান করা হেতু "মরণান্তীতৈঃ" এই কথাটী যাহার উপবাস দ্বারা সদ্যই মরণ হইবে তাহার পক্ষে খাটিবে না, কিন্তু যাহার রোগাদ্যনুবন্ধ সম্ভব তাহার পক্ষেই খাটিবে। অর্থাৎ যাহারা ব্যাধিপীড়িত কিম্বা স্বভাবতঃ অতিশয় ক্ষীণতা প্রযুক্ত উপবাসে একেবারেই অসমর্থ তাহারাই অনুকল্পাচরণ করিতে পারিবে। আর আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি যে, বিধবারা উপবাস করিয়া সদ্যই মরিয়া গেল ? বরং যেমন অগ্নির উত্তাপে দুগ্ধের জলটুকু মরিয়া গাঢ় ক্ষীরটুকু হয়, সেইরূপ উপবাসজনিত প্রবল উদ্দীপ্ত জঠরাগ্নি দ্বারা রসরক্তাদিধাতু সকল শোধিত অর্থাৎ পরিপাক পাইয়া, লঘুতা প্রাপ্তি জন্য সারময় ওজোধাতুর বৃদ্ধিবশতঃ জড়তা নষ্ট হইয়া চৈতন্যের বিকাশ ও মনঃস্থির হওয়ায়, দেহ অষ্টাঙ্গের সাধনীভূত হইয়া পড়ে। পরিশেষে শরীর দৃঢ় ও হাতীর মত হইয়া উঠে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

অ। তোমার কথা সব বুঝিলাম। আচ্ছা বল দেখি "বিধবা যা ভবেন্নারী" এই বচন দ্বারা বিধবাদিগের সম্বন্ধে যখন একাদশী

ব্রতেরই নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে, তখন অনুকল্প দ্বারা ব্রতের নিত্যতা রক্ষা করা হইবে না কেন, ইহার কোন সদুত্তর আছে কি?

ছা—মহাশয় চটিবেন না—আপনার যে স্থলেই ভুল "ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে" ঐ বচনের এই অংশটুকু বলার তাৎপর্য্য কি, বুঝিয়াছেন কি? ভোজনে দোষ দেখাইয়া উপবাসেরই যে নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে। আর অনুকল্পের ব্রতত্ব স্বীকার করিতে গেলে, নিষ্প্রমাণ লক্ষণার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তা ছাড়া কৃষ্ণৈকাদশীতে পুত্রবতী, শক্ত-বিধবাদিগের পক্ষেও উপবাসের আবশ্যকতা নষ্ট হইয়া যায়। কারণ অনুকল্প দ্বারা ব্রতের নিত্যতা পালন হেতু, নিষেধ-বাধার অনুপপত্তি হইয়া পড়িতেছে। আর ভাবিয়া দেখুন, কৃষ্ণৈকাদশীতে পুত্রবতী বিধবাদিগের উপবাসের আবশ্যকতা আপনারও অনভিমত নহে; সুতরাং "বিধবা যা ভবেন্নারী" এই বচন দ্বারা একাদশী সামান্যে বালবৃদ্ধাদিগের এবং কৃষ্ণৈকাদশীতে পুত্রবতী বিধবাদিগের পূর্ব্বেই উপবাসের আবশ্যকতা বিধান করা হইয়াছে, কেবল অশক্ত বিষয়ে আপনি উপবাসের আবশ্যকতার স্বীকার করেন নাই। এখন সেই সেই স্থলেই যদি ব্রতের নিত্যতা বিধান অভিমত হয়, তবে বিধবার বিশেষ নিষেধটা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে

"একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে
দ্বাদশী দিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥"
"অহং তে কথয়িষ্যামি শৃণু পাণ্ডুকুলোদ্ভব।
নিত্যমেতৎ ব্রতং নাম কর্ত্তব্যং সার্ব্ববর্ণিকং।
বাঞ্ছদ্ভিঃ সর্ব্বদা সদ্ভিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ং॥"
"রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে
হরিবাসরে॥"
"ইতি বিজ্ঞায় কর্ত্তব্যমেকাদশীব্রতং।
বিশেষনিয়মাশক্তোঽহোরাত্রং ভুক্তিবর্জ্জিতঃ॥"

ইত্যাদি প্রমাণবচনে একাদশীর উপবাসেরই ব্রতত্বাভিধান হেতু অনুকল্পের ব্রতত্ব কিছুতেই হইতে পারে না। তবে উপবাসের অনুকল্পটা ব্রতানুকল্প বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আর

"উপোষ্য নক্তেন বিভো।"
"একভক্তেন যো মর্ত্ত্যা উপবাস ব্রতঞ্চরেৎ।"

ইত্যাদি বচনদ্বারা নক্তাদিতেও উপবাস পদপ্রয়োগ থাকায় নক্তাদ্যুপবাসে গৌণোপবাসত্বের ন্যায় ব্রতানুকল্পটা গৌণব্রতত্বরূপে সিদ্ধ হইল, কিন্তু মুখ্যব্রতত্বরূপে কিছুতেই অভিহিত হইবে না। তাহা না হইলে অনুকল্প ধেনু-দানাদিরও প্রাজাপত্যাদিব্রতপদবাচ্যত্বাপত্তি হইয়া পড়ে।

সেই হেতু আপনার মত ব্রতের নিত্যতা-বাদীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপবাসটা নিত্যতা স্বীকারের বিষয়ীভূত হওয়ায়, অদগ্ধ দহন ন্যায় দ্বারা যে যে সকল বিষয়ে উপবাসের অভাব, অন্যান্যের তাবৎ সেই সকল বিষয়েতেই উপবাসের প্রাপ্তি হইতেছে; সুতরাং বিধবাদিগের উপবাসের নিত্যতা হেতু অশক্ত হইলেও উপবাসের আবশ্যকতা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল। এই জন্যই গ্রন্থ-কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্বথা নিত্যত্ব বলিয়াছেন। সর্ব্বথা পদের অর্থ সর্ব্ব-প্রকার হওয়ায় কোনও প্রকারে বিধবার উপবাসের বাধা না হয়, ইহাই স্পষ্টতঃ জানা গেল।

অ। বাপুহে, তোমার সাধু যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

শ্রীরামচন্দ্র লাহিড়ী।

মফঃস্বলের বাণী

১। অঙ্গারের উপকারিতা

কাঠের কয়লা আমরা অনেক সময়ে অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দেই। এই সকল অঙ্গার প্রকৃত পক্ষে কত প্রয়োজনীয় প্রত্যেক গৃহস্থের তাহা জানিয়া রাখা উচিত।

অঙ্গার সর্ব্বপ্রকারের দুর্গন্ধ নষ্ট করে, রোগের বীজাণু ধ্বংস করে। ব্যবহার্য্য ধাতু-পাত্রাদিতে কোন প্রকার গন্ধ হইলে কয়লা দিয়া মাজিয়া ফেলিলে গন্ধ দূর হইবে। মাছ টাটকা রাখিতে হইলে উহাদিগকে কয়লার মধ্যে রাখিয়া দাও, মাছ বেশ ভাল থাকিবে। যদি মাছ পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া থাকে, রাঁধিবার সময় রন্ধন পাত্রে দুই তিন খানি কয়লা ফেলিয়া দিবে, উহাতে মাছের কোনই দোষ থাকিবে না, যেন টাট্‌কা মাছ রন্ধন করা হইয়াছে এইরূপ মনে হইবে।

যে ঘরে মৎস্যমাংসাদি রাখা হয়, তথায় তারের ঝুড়ি কিম্বা আর কিছুতে করিয়া কয়লা রাখিয়া দিবে, ঘরে কোন প্রকার গন্ধ হইতে পারিবে না। বিছানা-পত্রের জন্য ঘরে দুর্গন্ধ হইলে ঘরের ছাদ হইতে কয়েক ঝুড়ি কয়লা টানাইয়া দিবে—গুদাম-ঘরেও কয়লার ঝুড়ি রাখিয়া দিবে, ঘরে কিছুমাত্র গন্ধ থাকিবে না। যদি কোন জিনিষে এমন দুর্গন্ধ হইয়া থাকে যে, উহাতে পীড়ার বীজাণু আকর্ষণ করে, তবে কয়লার গুঁড়া ও জল দিয়া উহা ধুইয়া লইলেই পীড়ার ভয় থাকিবে না।

ঘরের নল, চুঙি প্রভৃতিতে দুর্গন্ধ হইলে কিছু কয়লার গুড়া ও জল দিয়া ধুইয়া দিবে। উহাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে এবং কোন দোষ থাকিবে না।

কয়লার গুঁড়াতে দন্ত বেশ পরিষ্কার হয়। কয়লার গুঁড়ায় মুখ ধুইলে দাঁত খুব পরিষ্কার হয়, আহারের পরে দন্তের অভ্যন্তরে যে সকল খাদ্যের কণিকা থাকে উহা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মুখে কোনই গন্ধ হইতে পারে না।

এক টুকরা মলমল কাপড়ে কয়েক খানি অঙ্গার বান্ধিয়া পানীয় জলে ফেলিয়া দিলে জল বিশুদ্ধ হইবে। কোন স্থান পুড়িয়া গেলে দগ্ধ স্থানে তৎক্ষণাৎ অঙ্গারচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে পারিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইবে। বহু দিনের দুর্গন্ধ ক্ষতের উপর কয়লার গুড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে দুর্গন্ধ দূর হইবে ও ক্ষত ভাল হইয়া যাইবে।

দুই খণ্ড তারের জালের মধ্যে কয়লা পাতাইয়া দিয়া উহা বাড়ীর আশপাশের ছোট ছোট গলির মধ্যে বসাইয়া দিলে কোন দুর্গন্ধ থাকিবে না।

কয়লা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহা আগুনে দগ্ধ ও রক্তবর্ণ করিয়া লইতে পারিলে উহার উপকারিতা খুব অধিক হইবে।

মেদিনীপুর হিতৈষী।

২। কন্যাদায়

বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য-জাতীয় ব্যক্তিগণের দুরবস্থার অনেক গৌণ কারণ থাকিলেও মুখ্য কারণ কন্যাদায়। কতলোক যে কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি গিয়াছে, কাহারও ব্রহ্মোত্তর গিয়াছে, কেহ বা খাস-খামার জমিগুলি জমা করিয়া দিয়া অন্নাভাবে কায়ক্লেশে কালযাপন করিতেছেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ

শ্রবণ করিলে লোকে এখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। প্রসূতীরা ২।৩টি কন্যা প্রসব করিলে স্বামীর বা সংসারের অন্যান্য লোকের বিষ-নয়নে পতিত হন। 'নন্দিনী' শব্দের আর সে অর্থ নাই। এখন কন্যা-মাত্রেই সংসারের ঘৃণা ও আপদের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল অনেকেই সুপাত্রে কন্যাদান করিয়া ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। পণ-প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি কত সংসার উৎসন্ন গিয়াছে, কত আনন্দবাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার অবধি নাই। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই শুক্র-বিক্রয়-প্রথা—এই মহাপাপ এদেশে ছিল না। কিসের অনুকরণে যে বঙ্গদেশে এই পাপস্রোত প্রবাহিত হইল তাহা বুঝা দায়। আমরা যে ইংরাজ-জাতির আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে এই প্রথা নাই।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণই শিক্ষিত বিধায় নেতৃস্থানীয়। কিন্তু এই বিষম পাপস্রোতের ধ্বংসে তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন দেখা যায় না কেন? আজকাল এই বিষয় লইয়া দুই একটি সভাসমিতি হইতেছে বটে, সংবাদ-পত্রেও লেখালেখি চলিতেছে। কিন্তু সে আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল দর্শিতেছে না। কেহ কেহ পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ না করিয়া উদারতা দেখাইতেছেন। কিন্তু সে উদারতা "সিঙ্গি খাই না, সিঙ্গির ঝোল খাই" রকমের বরকর্ত্তা পণ লইলেন না, কিন্তু কন্যাকর্ত্তার কন্যার আভরণ, বরশয্যাদি দিতে নগদের উপরে গেল। যাহা হউক, এই পাপের প্রতিকার করিতে সর্ব্বসাধারণের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে রক্ষা করিতে হইলে বিবাহে পণ-গ্রহণ-প্রথা একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। পণ-প্রথা তুলিয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত-রূপে কার্য্য করিলে ফললাভ হওয়া সম্ভব।

বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামে অথবা দুই পাঁচটি গ্রাম লইয়া এক একটি কমিটি গঠন করা উচিত। এই সকল কমিটির মেম্বরগণ যাহাতে তাঁহাদের ভিতর কেহ বরপণ গ্রহণ না করেন, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কেহ বর-পণ গ্রহণ করিলে উক্ত পণ-গ্রহণ-কারীর সহিত আলাপ ও সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবেন। এইরূপে জেলার নানা-স্থানে এই ভাবের কমিটি গঠিত হইলেও যাহাতে ঐ সকল স্থানের সম্ভ্রান্ত ও ভাল ভাল লোকও কমিটির মেম্বরভুক্ত হন, তৎপক্ষে চেষ্টা করিলে ক্রমে এই পাপস্রোত দূরীভূত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক বৎসর অন্তে প্রত্যেক জেলার প্রধান স্থানে ঐ জেলার সমস্ত কমিটিগুলির কার্য্য একটি সাধারণ সভায় প্রকাশ করিলে ও সংবাদপত্রে প্রচার করিলে ভাল হয়। যাহারা প্রকৃতই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, যাহাদের হৃদয় মধ্যবিত্ত ব্যক্তি-গণের জন্য কাঁদে, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া এই উপায় অবলম্বন করুন এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণসাধন করুন।

পল্লীবার্ত্তা।

৩। পুকুরে মাছের চাষ

পুকুরে অনেক রকমের মাছের চাষ করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়, এবং উহাতে লাভ আছে। কিন্তু রুই, কাত্‌লা, মৃগেল্‌ এবং কালবোস্‌ এই কয়েকটী মাছের চাষেই সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক পুকুরেই বোয়াল, কই এবং সোল মাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বোয়াল এবং সোল মাছ অত্যন্ত পেটুক। ইহারা অন্য মাছ খাইয়া ফেলে।

রুই, কাত্‌লা, মৃগেল এবং কালবোস্‌ পুকুরে ডিম পাড়ে না। উহারা কেবল নদীতেই ডিম পাড়ে। জুন এবং জুলাই মাসই ডিম পাড়িবার সময়। যেমন বর্ষা আরম্ভ হয় অমনি মাছেরা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। ধাড়ী মাছেরা ছোট ছোট দল বাঁধিয়া নদীতে সাঁতার দিয়া বেড়ায়। মাদী মাছেরা ডিম পাড়ে, ঐ ডিমের সঙ্গে মদ্দা মাছের কোমল বীজ মিশিলে উহাতে প্রাণ সঞ্চার হয়। ঐরূপ ডিম দেখিতে ছোট, (প্রায় আলপিনের মাথার আকার,) স্বচ্ছ এবং আঠাল। এই ডিমগুলি সচরাচর নদীর তীরের দিকে ভাসিয়া যায়; জেলেরা কাপড় দিয়া ছাকিয়া ইহাদিগকে সংগ্রহ করে এবং জলপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে রাখে। ডিমগুলি ছোট হাঁড়িতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে ও বাড়িতে পারে, তবে দিনের মধ্যে অনেক বার হাঁড়ির জল বদলান দরকার। ডিম পাড়িবার পর প্রায় দশ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। বর্ষাকালে অনেক লোক নদী হইতে রুই, কাত্‌লা, মৃগেল এবং কালবোস্‌ মাছের ডিম সংগ্রহ করিয়া, ঐ ডিম কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল মাছের ডিম জলপূর্ণ হাঁড়িতে বাঁচিয়া থাকিতে ও বাড়িতে পারে বলিয়া, ইহাদিগকে রেল বা নৌকা করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠান যাইতে পারে। তিন বৎসর পূর্ব্বে রেলে করিয়া রুই মাছের ১,০০০ ডিম কলিকাতা হইতে লাহোর পাঠান হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে ৯০০ শতের উপর ডিম জীবন্ত এবং সুস্থ অবস্থায় পঁহুছিয়াছিল। ডিমের দাম কিছু কমে বাড়ে। ডিম যদি টাট্‌কা হয়, এবং বেশী বড় না হয়, তাহা হইলে, ১ কুনিকার দাম ৫৲ কিম্বা ৬ টাকা। এক কুনিকায় প্রায় ৫,০০০ ডিম থাকে। যদি ডিম, ধর, পাঁচদিনের হয়, তাহা হইলে উহার দাম আরও বেশী হইবে। আর যদি ছোট চারা মাছ কেনা যায়, তাহা হইলে উহার দাম হাজার করা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা। বাঙ্গালা দেশে সচরাচর পুকুরে রুই এবং এই প্রকারের অন্য মাছের ডিম ভর্ত্তি করিয়া রাখা হয়। এই প্রথা বিহার ও উড়িষ্যায় এত প্রচলিত নহে। এই কার্য্য অতি লাভজনক; কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা, প্রথমতঃ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে ডিমগুলি নিশ্চয়ই ফুটিবে ও শেষে বাড়িয়া বড় বড় মাছ হইবে, সেই সকল কথার আলোচনা করিব।

যে পুকুরে ডিম বা ছোট মাছ ছাড়া হয়, তাহা খুব বড় বা খুব গভীর হইবে না। কারণ তাহা হইলে দরকার মত মাছ ধরিতে পারা যাইবে না।

যদি ও বাঙ্গালা দেশের অনেক পুকুরই রুই ও এইরূপ অন্যান্য মাছের ডিমে ভর্ত্তি থাকে, তথাপি ইহার ফল সকল সময়ে ভাল হয় না। ইহার অনেক কারণ আছে। কোন কোন স্থলে ঐ সকল পুকুরে বোয়াল, সোল প্রভৃতি পেটুক মাছ থাকে। এইরূপ পুকুরে ডিম ফেলা হইলে, বোয়াল সোল মাছে সমস্ত কিম্বা প্রায় সমস্ত রুই মাছের ডিম খাইয়া ফেলে। সুতরাং পুকুরে ডিম ফেলিবার পূর্ব্বে যত্নের সহিত পুকুর হইতে সমস্ত পেটুক মাছ তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। নতুবা অতি শীঘ্র অন্য সমস্ত মাছ নষ্ট হইবে। পুকুরে মাছের চাষে প্রায়ই যে ভাল ফল পাওয়া যায় না, তাহার আর একটি কারণ এই যে, রুই মাছের ডিমের সঙ্গে বোয়ালাদি পেটুক মাছের ডিমও আসিয়া পড়ে। হাঁড়িতে কেবল ছোট ডিমই থাকে, সেই হাঁড়িতে কোন ডিম রুই প্রভৃতি মাছের ও কোন ডিম বোয়ালাদি পেটুক মাছের তাহা বলা প্রায়ই অসম্ভব। এরূপ স্থলে একমাত্র উপায় এই যে, যতদিন ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির না হয়, ততদিন ডিমগুলিকে একটা বড় হাঁড়িতে রাখিয়া বাড়িতে দিতে হয়। ইহাতে ৭।৮ দিন মাত্র সময় লাগে। যদি কোন পেটুক মাছ থাকে, তবে তখন তাহারা ধরা পড়িতে পারে ও তাহাদিগকে বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তার পর ভাল মাছ গুলিকে পুকুরে ছাড়িতে পারা যায়। যদি এইরূপে হাঁড়িতে ডিম ফুটাইতে হয়, তবে মনে রাখা উচিত, জলটি খুব ঘন

ঘন, অন্ততঃ দিনে ত্রিশবার, বদলাইতে হইবে। যদি রুই মাছ প্রভৃতির ডিমের সঙ্গে মন্দ অর্থাৎ পেটুক মাছের ডিম পুকুরে ফেলা যায় তবে যেমনঃ পেটুক মাছেরা বড় হইবে, অমনই তাহারা সব মাছ খাইতে আরম্ভ করিবে।

আবার যাহাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের সঙ্গে পুকুরে পেটুক মাছের ডিম আসিতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, কারণ যদি কোন পেটুক মাছ পুকুরে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারা সেই পুকুরের রুই মাছের সমস্ত ডিম খাইয়া ফেলিবে।

সমুদায় কাছিম এবং কচ্ছপ গুলিকে পুকুর হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং বেঙ সকল যাহাতে মাছের ডিম খাইতে না পারে, যতদূর সম্ভব, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছু কিছু সবুজ আগাছা জলে জন্মিতে দিতে হইবে। অধিকাংশ পুকুরে অতিরিক্ত আগাছা থাকে। মধ্যে মধ্যে পুকুরের আগাছা-গুলিকে পাতলা করিয়া দিতে হইবে এবং উহাদিগকে এমন ঘনভাবে বাড়িতে দেওয়া যাইবে না যাহাতে পুকুরে জাল টানার ব্যাঘাত হয়। পুকুরে নিম্নলিখিত আগাছা-গুলি জন্মিতে দেওয়াই ভাল— ।

(১) জঙ্গী (বাঙ্গালা), ঝঙ্গী, কুরুঙ্গী (হিন্দি);

(২) পাট্টা (বাঙ্গালা); সারয়ালা, শ্যালা (হিন্দি);

(৩) উদ্ধি পানা (বাঙ্গালা);

(৪) কেশর দাম (বাঙ্গালা);

(৫) কলমী শাক (বাঙ্গালা); নরী (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ), নলিচী বগা (বোম্বাই), কৈলঙ্গু (তামিল); তুটিকরা (তেলেগু), কলম্বী (সংস্কৃত);

(৬) মথ (বাঙ্গালা); তাঁদম্বুরা (সাঁওতাল), মুস্তা গুণ্ড্রা, মুষক (সংস্কৃত), কোরাই (তামিল), গণ্ডলা (তেলেগু) মুস্তা বারিথ-মথ (বোম্বাই); বিম্বল (মারাটী), মোথা (গুর্জ্জর), কাসত্তুরা (Sing).

যে সকল গাছ জলে জন্মায় তাহাদের গুঁড়ি প্রভৃতি যাহাদের দ্বারা জল খারাপ হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। সমুদায় পেটুক মাছ পুকুর হইতে তুলিয়া ফেলিবার পরও দেখা যায় যে, কতকগুলি পুকুরে রুই মাছ অন্য পুকুর অপেক্ষা অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। মাছের বৃদ্ধি, খাদ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কতকগুলি পুকুরে প্রচুর খাদ্য থাকে, কতক-গুলিতে থাকে না। যে পুকুরে খাদ্যের পরিমাণ অল্প সে পুকুরে এক বৎসরে রুই মাছ বাড়ে ও উহার ওজন আরও অধিক হয়।

বাঙ্গালা দেশে ও অন্যান্য স্থানের প্রত্যেক পুকুরে এক প্রকার ছোট প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খুব বেশী জন্মায় এবং দেখিতে 'চিংড়া' মাছের মত। কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ছোট "চিংড়ী"গুলি বোধ হয় সব বৎসর ধরিয়াই ডিম পাড়ে। রুই মাছেরা এই ছোট চিংড়ী খায়।

রুই মাছেরা আগাছাও খায়, কিন্তু তাহারা অন্য মাছ খায় না; অতি অল্প উদ্ভিজ্জই আছে যাহা রুই মাছে খায় না। সাধারণতঃ মাছদের খাইবার জন্য কৃত্রিম কোন খাদ্য পুকুরে ফেলিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু কখনও কখনও এইরূপ উচিত মনে হয়, বিশেষতঃ যদি এক বৎসরের শেষে দেখা যায় যে মাছেরা যেরূপ বাড়া উচিত ছিল সেই পরিমাণে বাড়ে নাই, তাহা হইলে এরূপ করা উচিত। তখন কিছুভাত, রুটির টুকরা, স্বল্পপরিমাণ তরকারী ইত্যাদি মাছের জন্য মধ্যে মধ্যে পুকুরে ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু এমন পরিমাণে ফেলা উচিত নহে, যাহাতে পরিশেষে জল খারাপ হইয়া যায়।

এক্ষণে রুই এবং এইরূপ অন্যান্য মাছের বৃদ্ধির সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে ২০ সের ওজনের রুই ধরা পড়ে এবং দশ সের ওজনের রুই মাছ খুবই দেখা যায়।

মাছের ছানা বা ডিম, পুকুরে ফেলা হইলে এক বৎসরের শেষে প্রত্যেক মাছের ওজন কত হইবে তাহা, মাছের প্রচুর খাদ্য থাকিলে, প্রত্যেক মাছের ওজন তিন পোয়ার কম হওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয় বৎসরের

শেষে রুই মাছ ওজনে একসের হইতে দুই সের হওয়া উচিত। তৃতীয় বৎসরের শেষে উহাদের প্রত্যেকের ওজন তিন সেরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। যদি পুকুরের অবস্থা ভাল না হয় তবে মাছের ওজন এরূপ বাড়িবে না। কিন্তু যদি পুকুরের অবস্থা ভাল হয় এবং খাদ্য প্রচুর থাকে, তবে তিন বৎসরে তাহারা ওজনে তিন সেরের অধিক হইতে পারে।

পুকুরে কত ডিম ফেলিতে হইবে, তাহা পুকুরের আকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি পুকুরে চারা মাছের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে মাছেরা ভাল বাড়িতে পারিবে না, অনেকেই মরিয়া যাইবে এবং যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাদের আকার ছোট হইবে। আরও, যে পুকুর গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় কিম্বা যাহাতে জল তিন ফুটের কম হইয়া যায়, সে পুকুরে মাছের ডিম ছাড়ায় কোন ফল নাই। ডিম ছাড়িবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া কার্য্য করা উচিত। আবার, যদিও একটী পুকুরে ২,০০০ অতি ক্ষুদ্র মাছের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল মাছ যখন বাড়িবে তখন ঐ খাদ্যে তাহাদের কুলাইবে না। ৫০ ফিট লম্বা, ৫০ ফিট চওড়া এবং ১৪ ফিট গভীর একটী পুকুর এক ইঞ্চি ২,০০০ ছোট মাছকে ৪ মাস হইতে ৬ মাস কাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট খাদ্য দিতে পারে বটে, কিন্তু এই সময়ের শেষে, যাহাতে অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি না হয় সে জন্য অধিকাংশ মাছকেই এই পুকুর হইতে উঠাইয়া অন্য পুকুরে ফেলিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোস্ মাছের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। যাহাদের পুকুর আছে, তাহারা সামান্য ভাবে চাষ করিয়া যে লাভ করিতে পারে, স্যার কে, জি, গুপ্ত মহাশয় তাহার এইরূপ আন্দাজী হিসাব প্রদান করিয়াছেন—"দুই বৎসরের রুই মাছের ওজন গড়ে দেড় সের হয়। যদি কোন পুকুরে ১,০০০ ডিম ছাড়া যায় মনে কর তাহাদের মধ্যে ৫০০ মরিয়া গেল—তাহা হইলে ২ বৎসরের পরে ৫০০ মাছ প্রত্যেকে দেড় সের ওজনের হইবে, মাছের সের ।০ আনা ধরা গেল। ৫০০ মাছের প্রত্যেকের ওজন দেড় সের হিসাবে ৭৫০ সের। ।০ আনা করিয়া সের হইলে মোট দাম ১৯০৲ টাকা হইল। খরচার মধ্যে ছানা মাছের দাম, জেলের খরচা এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচা আছে। নিম্নের তালিকায় তাহা দেখান হইয়াছে :—

জমা।

	টাকা।
৭৫০ সের মাছের মূল্য প্রতি সের ।০ হিসাবে	১৯০৲

খরচ

	টাকা।
১,০০০ ছানা মাছের দাম	১৫৲
জাল টানা ইত্যাদি বাবদ জেলে খরচা	৩০৲
অনুসঙ্গিক খরচা ...	৫৲
মোট	৫০৲

তাহা হইলে দেখা গেল খরচা বাদে ১৪০৲ টাকা লাভ হইবে। ইহাতে কম লাভই ধরা হইয়াছে, অনেক স্থলেই ইহা অপেক্ষা বেশী লাভ হয়।" উল্লিখিত হিসাবে পাওয়া যে, ছানা মাছের দাম ১৫৲ টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু যদি ডিম ফেলা হয়, তবে ১,০০০ ডিম কিনিতে ১৲ টাকা মাত্র পড়ে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমস্ত ডিমই রুই মাছের ডিম না হইতে পারে। বোয়ালের ডিম উহাদের মধ্যে থাকিতে পারে। ঐ ডিমগুলিকে হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া বাড়িতে দিলে পেটুক মাছগুলিকে সরাইয়া ফেলিতে পারা যাইবে। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বোয়াল ও সোল উভয়ই পেটুক মাছ, অর্থাৎ তাহারা অন্য মাছ খাইয়া থাকে। পুকুরে তাহাদেরও চাষ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের চাষ রুই মাছের চাষের অপেক্ষা কঠিন। বোয়াল ও সোলের ডিম পাওয়াই দুষ্কর; আবার

যদি পাওয়া যায়, তবে ঐ সকল মাছ যেমন বাড়িতে থাকে, উহাদিগকে অন্য মাছ খাওয়াইবার আবশ্যক হয়।

জল ছাড়িয়া কই মাছ অনেকক্ষণ বাঁচিতে পারে। এই মাছ যে পুকুরে থাকে সময়ে সময়ে তাহা ছাড়িয়া অতি নিকটবর্ত্তী অন্য পুকুরে যাইয়া থাকে। যে পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোস্ মাছ থাকে সেখানে বোয়াল, সোল, কই ও চিতল মাছের ন্যায় মাছ সকলকে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এ কথা যেন মনে থাকে।

আশা করা যায় যে, যাঁহাদের পুকুর আছে, তাঁহারা এই পুস্তিকার লিখিত প্রণালী অনুসারে রুই ও তদ্রূপ অন্যান্য মাছের চাষ করিবেন। এইরূপে সহজেই বেশ লাভ করিতে পারা যাইবে এবং বঙ্গদেশে মাছের সরবরাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহারা রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের চাষে নিযুক্ত বা এরূপ চাষ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে, কলিকাতার রাইটার্স বিলডিংস্ ভবনে অবস্থিত মৎস্যসংক্রান্ত বিভাগ আনন্দের সহিত এসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ ও সংবাদ প্রদান করিবেন।

বরিশাল হিতৈষী।

৪। ভারতের হস্তশিল্প

যন্ত্রশিল্পের অভ্যুদয়ে ভারতের হস্তশিল্পগুলি দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিক যুগে লোকে অল্পপরিশ্রমে অধিকতর কার্য্যলাভ করিতে চায় এবং যে শিল্প সুলভে দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে পারে, লোকে তাহারই পক্ষপাতী হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে হস্তশিল্প যন্ত্রশিল্পের সহিত কার্য্য দেখাইতে পারে না এবং শিল্পাদিও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে অক্ষম। তাই হস্তশিল্পিগণ যন্ত্রশিল্পের নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছে। যন্ত্রাদির দ্বারা এক পক্ষে সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু দেশীয় শিল্পীদের অবস্থা কেহ ভাবিতেছেন কি? দেশীয় কল-কারখানা এক্ষণে দেশীয় শিল্পীদিগকে উৎসাহ দিতেছে না, কেবল মাত্র কুলী-মজুরের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিতেছে। তাই দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা দিন দিন স্বকীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ কৃষিকার্য্যাদি অবলম্বন করিতেছে।

কার্য্যের প্রতিযোগিতায় এবং সুলভের হিসাবে যন্ত্রশিল্পের প্রাধান্য শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সর্ব্ববিষয়েই হস্তশিল্পের প্রাধান্য সর্ব্ববাদীসম্মত। হস্তশিল্পের কার্য্য যেরূপ স্থায়ী, সুদৃশ্য এবং কারুকার্য্যসম্পন্ন হয়, যন্ত্রশিল্প তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। ঢাকার হস্তশিল্প মসলিন-বস্ত্র এখনও জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। ঐ মস্‌লিন-নির্ম্মাণোপযোগী সূত্র এবং ঐ বস্ত্র-বয়ন যেরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হয়, সেরূপ কৃতিত্ব জগতের কোন যন্ত্রশিল্প ত দূরের কথা হস্তশিল্পও দেখাইতে পারিয়াছে কি? কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের অবহেলায় আমরা এমন একটী উচ্চশিল্প চিরদিনের জন্য হারাইতে বসিয়াছি। মস্‌লিন-বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি সমগ্র ঢাকা নগরীতে মাত্র একজনের অধিক নাই। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ভারতের একটী সুন্দর শিল্প লয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? ভারতবাসি, তুমি ইটালীর রাফেল কৃত একখানি চিত্র বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঘরে রাখিতে পার, আর তুমি দেশের শিল্পের উৎসাহ দিতে পার না?

আমাদের দেশে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বস্ত্রশিল্পী বিদ্যমান আছে, উৎসাহ পাইলে তাহারা আরও সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে। ম্যানচেষ্টার বাসী কলওয়ালারা বহুদিন হইতেই তাহাদের ভাত মারিবার চেষ্টায় আছে। তাহাদের নির্ম্মিত বস্ত্রের অনুকরণেও বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই নিকৃষ্ট নকল নাম ভিন্ন অন্য কোন সম্মানসূচক পদবি বা কার্য্যক্ষেত্রে উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই। দেশীয় তাঁতের বস্ত্রগুলি যেরূপ টেকসই এবং দেখিতে সুন্দর হয়, যন্ত্রনির্ম্মিত বস্ত্রের সে স্থান অধিকার করিতে এখনও বিলক্ষণ সময়ের প্রয়োজন

আছে। আবার হস্তশিল্পের ভিতর সে সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য আছে, যন্ত্রশিল্প তাহার সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে কি? জাপানি কলওয়ালারা আমাদের দেশের শালের অনুকরণে হাঁসিয়া প্রস্তুত করিতে গিয়া উপহাসাস্পদই হইয়া আসিতেছেন। এ স্থলে মূল্যের স্বল্পতার মূল্য কি?

এক সময়ে ভারতবর্ষ হস্তশিল্পের জন্য জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। ভারতের হস্তশিল্প সুদূর ইউরোপখণ্ডেও সৌখিনতার পরাকাষ্ঠা প্রদান করিত। কথিত আছে ইটালীর অধীশ্বর পর্য্যন্তও এক সময়ে সৌখিন-দ্রব্যাদি ভারতজাত না হইলে পছন্দই করিতেন না। ভারতের রেশমী বস্ত্র এক সময়ে ইউরোপ-খণ্ডে স্বর্ণ মূল্যে বিক্রয় হইত। তাই বলি ভারতের হস্তশিল্প আধুনিক নহে। হস্তশিল্পের প্রত্যেক ধারা অনুসারে এ দেশের জাতিভেদেরও এক অঙ্গ রহিয়াছে। কোন শিল্পই এক পুরুষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। তাই শিল্পের ক্রমবিকাশের জন্যই যে এরূপ জাতি-বিভাগের প্রবর্ত্তন তাহা কে অস্বীকার করিবে?

আমরা যতই যন্ত্রশিল্পের পক্ষপাতী হইতেছি, দেশের শিল্পীদের অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। দেশে যদি হস্তশিল্পের আদর থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ঘরের ভাই তন্তুবায় হায় হায় করিত না। তাহাদের অনেকে তাঁত ছাড়িয়া খেতে নামিয়াছে, অনেকে আবার দেশী ও বিদেশী বস্ত্রের খিচরী দোকান সাজাইয়া স্বীয় ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। শুধু তাঁতের উপর নির্ভর করিয়া কাহারও দিন সুখে স্বচ্ছন্দে যাইতেছে কি? তবে মধ্যে স্বদেশীর একটা হাওয়া আসিয়াছিল, তাই তাঁতগুলি এত দিনও ভারতে আছে। এই যন্ত্রশিল্পের প্রভাবে কুম্ভকারের মস্তক চক্রপাকে ঘুরিতেছে। সে দিন পর্য্যন্তও কৃষ্ণনগর, ঘূর্ণী প্রভৃতি স্থানের কারিকরগণ মৃত্তিকাজাত বহুবিধ কার্য্যোপযোগী ও সৌখিন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া জগতবাসীকে বিমোহিত করিয়াছে। এক্ষণে আর তাহাদের প্রতিষ্ঠা কোথায়? জার্ম্মান্, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ কলের সাহায্যে নানাবিধ সৌখিনদ্রব্য খেলনা ইত্যাদি সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া তাহাদের লাভের ভাত আত্মসাৎ করিতে বসিয়াছে। দায়ে পড়িয়া তাহাদের অনেকেই কাণে কলম গুঁজিয়া মাছিমারা কেরাণীর দল বৃদ্ধি করিতেছে। আজকাল কাষ্ঠের ও লোহার কার্য্য অনেকটা যন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। কালে সূত্রধরের শিল্প, লাঙ্গলের গুঁটিতে এবং কর্ম্মকারের বাহাদুরী কাস্তের ধারেই যে শেষ হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের চর্ম্মকারের পাদুকা আর সৌখিন বাবুদের ভাল লাগে না। তাই তাহারা "সেলাই ক্রস" বলিয়া পথে পথে ঘুরিতেছে। এক্ষণে যে দিকেই দেখি না, হস্তশিল্পের অবনতি ভারতের দিকে দিকে। এই হস্তশিল্পের অবনতিতে যে ভারতের অবনতি এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যন্ত্রশিল্পে অর্থাগম যথেষ্ট হইলেও তাহা সমাজ পোষণ করে না। কতকগুলি অংশীদারের অবস্থার পরিবর্ত্তন করে মাত্র, আর দেশে কুলী-মুজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এক্ষণে দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে হস্তশিল্পীদিগের উৎসাহ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য ভারতে যে সমস্ত হস্তশিল্প প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল আমরা যদি উৎসাহ দিয়া সে গুলিকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশের হস্তশিল্পের কাঠাম বজায় থাকিবে। হয়ত সেই কাঠামেতেই আবার একদিন মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়া দেশের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া দিবে।

সুরাজ।

পরিশিষ্ট

পাপদ্বয় সহ উভয় স্থানেই সম সংখ্যক শুভ বা অশুভ গ্রহের যোগ থাকিলেও কেমদ্রুম যোগ ভঙ্গ হয় না। উক্ত যোগে পুনর্ব্বার চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে যোগের প্রাবল্যই জ্ঞাতব্য। কারিকা বচনে গ্রাহ্য কারকের উল্লেখ নাই বলিয়া সূত্রান্তর্গত স শব্দের অন্যার্থে ব্যবহার করা সুবোধিনী কারের যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ॥ ১১৯ ॥

চন্দ্রদৃষ্টৌ বিশেষেণ ॥ ১২০

প্রোক্ত যোগে দ্বিতীয়াষ্টময়োঃ শ্চন্দ্রদৃষ্টৌ সত্যাং বিশেষেণ কেমদ্রুম যোগো ভবতি ॥ ১২০ ॥

কেমদ্রুম যোগ সংঘটিত হইলে যদি তদ্দ্বিতীয়াষ্টম স্থানে পুনর্ব্বার চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে বিশেষরূপে তদ্‌যোগোক্ত ফল পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থোক্ত কেমদ্রুম যোগ ব্যতীত শাস্ত্রান্তরে ভিন্ন প্রকারে কেমদ্রুম যোগ ও তৎফল লিখিত আছে। যথা—

ন ধনে ন ব্যয়ে খেটা শ্চন্দ্রাদিশ্চ ভবন্তি চেৎ।
তদা কেমদ্রুমং প্রাহুঃ পণ্ডিতা মিহিরাদয়ঃ

কেমদ্রুমে সুরপতে রপি নন্দনোঽয়
দেশান্তরং ব্রজতি পুত্র কলত্র হীনঃ।
ধর্ম্মচ্যুতো বিকলিতো গদসংগভীতো
নানাধিতাপ সহিতো মহিতোম হীনঃ
সদ্বিত্তসূনু বনিতান্নজনৈ বিহীনঃ
প্রেষ্যো ভবেৎ তু মনুজো হি বিদেশবাসী
নিত্যং বিরুদ্ধধিষণো মলিনঃ কুবেশঃ
কেমদ্রুমে চ মনুজাধিপতেঃ সুতোঽপি।

চন্দ্রের দ্বিতীয় এবং দ্বাদশ এই উভয় স্থানই গ্রহবর্জ্জিত হইলে তাহাকে কেমদ্রুম যোগ বলে। কেমদ্রুম যোগজাত ব্যক্তি ইন্দ্রপুত্র হইলেও ধন ধান্য এবং পুত্র কলত্রাদি স্বজন বিরহিত হইয়া মলিন বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে। সে ব্যক্তি পরান্নসেবী ধর্ম্মচ্যুত বিকলিত রোগপীড়িত বিবিধ মানসিক সন্তাপ সমন্বিত এবং সংসারে সন্তোষ বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করে ॥ ১২০ ॥

সর্ব্বেষামেবং পাকে ॥ ১২১

সূত্রেঽস্মিন্ দ্বিভাবো বর্ত্ততে। সর্ব্বেষাং রাশীনাং গ্রহাণাং চৈব বা পাকে দশায়াং পূর্ব্বোক্তানি যোগফলানি ভবন্তি অথবা সর্ব্বেষাং রাশীনাং গ্রহাণাং বা পাকে দশারম্ভকালে তাৎকালিক গ্রহ স্থিত্যা

কেমদ্রুম যোগবিচারঃ কার্য্যঃ। কেমদ্রুমে সতি দশায়াং দারিদ্রং স্যাদিতি ॥ পারাশরীয়েঽপি—

কারকাংশেষু যে যোগাঃ পূর্ব্বোক্তা গদিতা ময়া।
তৎতৎ রাশি দশাপাকে সর্ব্বেষাং ফলমাদিশেৎ ॥
এবং তন্বাদি ভাবানাং দশারম্ভেষু যোজয়েৎ।
তৎতৎ গ্রহানুসারেণ ফলং বাচ্যং বুধৈঃ সদা ॥ ১২১ ॥

এই সূত্রমধ্যে দুই প্রকার অর্থ নিহিত আছে। প্রথম—পূর্ব্বে যে সমস্ত যোগের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। তৎতৎ রাশি বা গ্রহদশাকালে সেই সমস্ত যোগফল কীর্ত্তন করিবে। অথবা রাশি ও গ্রহগণের দশারম্ভ কালেও তাৎকালিক গ্রহ সন্নিবেশাদি দ্বারা কেমদ্রুম যোগ বিচার করা কর্ত্তব্য কারণ তৎকালে কেমদ্রুম সত্বে দশাকালে কেবল মাত্র দারিদ্র দুঃখ সংঘটিত হয় ॥ ১২১ ॥

ইতি উপদেশ সূত্রে প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

উপদেশ সূত্রং

প্রথম পরিচ্ছেদে তৃতীয়পাদঃ।

অথ পদং ॥ ১ ॥

অথ অনন্তরং "যাবদীশাশ্রয়ং পদমৃক্ষাণাং ইতি সূত্রসিদ্ধং লগ্নারূঢ় পদং অবলম্ব্য ফলং বিবৃণোতি ॥ ১ ॥

এক্ষণে লগ্নারূঢ় পদকে লগ্ন কল্পনা করতঃ ফলবিচার আরম্ভ হইল। গ্রন্থ মধ্যে পদশব্দে সর্ব্বত্রই কেবল লগ্নারূঢ় পদ জ্ঞাতব্য ॥ ১ ॥

ব্যয়ে সগ্রহে গ্রহদৃষ্টে শ্রীমন্তঃ ॥ ২ ॥

লগ্নপদাৎ ব্যয়ে (১১) একাদশ স্থানে সগ্রহে কেনচিৎ শুভেন পাপেন বা গ্রহেণ সহিতে তথা গ্রহ দৃষ্টে তথা বিধেন কেনচিদ্ গ্রহান্তরেণ চ দৃষ্টে সতি পুরুষঃ শ্রীমন্তঃ ভাগ্যবান্ ভবতি ॥ ২ ॥

লগ্ন পদের একাদশ স্থানে শুভাশুভ কোন গ্রহ থাকিয়া তথাবিধ অপর কোন গ্রহকর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। এস্থলে একাদশ স্থানগত গ্রহের প্রতি গ্রহান্তরের দৃষ্টি বিশেষ আবশ্যক। কোন কোন টীকাকার সূত্র হইতে যোগ বা দৃষ্টি অর্থ করতঃ বর্ত্তমান সূত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেও জানা উচিত যে কেবল মাত্র যোগ বা দৃষ্টি সামান্য ধনযোগের কারক হইলেও শ্রীমন্ত যোগের কারক হইতে পারে না। তবে দৃষ্টি বা যোগের অন্যতর থাকিলে কিছু না কিছু ভাগ্য যোগ কল্পনা করা যায়। অনুক্তি সত্ত্বেও পরবর্ত্তী দ্বাদশ সংখ্যক সূত্র পর্য্যন্ত প্রতি সূত্রেই এই দৃষ্টি শব্দের অনুবৃত্তি অগ্রাহ্য নহে। স্থিত গ্রহের প্রতি গ্রহান্তরের দৃষ্টি ফলের দৃঢ়তা সম্পাদন করে ॥ ২ ॥

শুভৈর্ন্যায্যোলাভঃ ॥ ৩ ॥ পাপৈরমার্গেণ ॥ ৪ ॥
উচ্চাদিভি বিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

লগ্নপদা দেকাদশে শুভৈঃ শুভগ্রহৈ র্যুক্তে দৃষ্টে বা সতি ন্যায্যোলাভঃ ন্যায় পথেন লাভঃ স্যাৎ। পাপৈঃ পাপগ্রহৈ র্যুক্তে দৃষ্টে বা সতি অমার্গেণ অসৎ পথেন কুবৃত্ত্যা বা লাভো ভবেৎ। অতএব শুভাশুভৈ র্মিশ্রগ্রহৈ র্যুতেক্ষিতে সতি মিশ্র প্রকারেণ লাভঃ সূচিতঃ। উচ্চাদিভিঃ উচ্চ স্বক্ষেত্রাদি স্থানগতৈর্গ্রহৈ যুক্তে দৃষ্টে বা সতি বিশেষাৎ বাহুল্য রূপেণ লাভো নিশ্চিতঃ। অত্রাপি পারাশরীয়ে।—

পদাদেকাদশে স্থানে শুভগ্রহ যুতেক্ষিতে ।
লক্ষ্মীবান্ জায়তে বালঃ প্রজাবান্ শীলসংযুতঃ
বিত্তোপার্জ্জন ন্যায়েন নীতিমান্ জায়তে সদা ।
নরো ন নাস্তিকো নূনং নতু শাস্ত্র বিরুদ্ধকৃৎ ॥
পদাদেকাদশে বিপ্র পাপখেট যুতেক্ষিতে ।
অন্যায়োপার্জ্জিতং বিত্তং বিরুদ্ধং শাস্ত্রমার্গতঃ
মিশ্রৈর্মিশ্রফলং জ্ঞেয়ং উচ্চস্বর্ক্ষাদিগৈ গ্রহৈঃ ।
বহুধা জায়তে লাভং যত্র যত্র দ্বিজোত্তম ॥

পদের একাদশ স্থানে যে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি বশতঃ লোকে ভাগ্যবান্ হইলেও শুভ এবং পাপগ্রহ জনিত ফলের বিশেষ বিলক্ষণতা আছে। শুভ গ্রহের যোগ ও দৃষ্টি বশতঃ মনুষ্য সৎপথে এবং সৎকার্য্যে অর্থোপার্জ্জন করে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ অসৎ পথে কিম্বা কুবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পাপগ্রহের ফল। দ্রষ্টা বা স্থিত গ্রহ উচ্চ স্বর্ক্ষাদি স্থান গত হইলে বিশিষ্টরূপ লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে উক্ত একাদশ স্থানে শুভ এবং পাপ উভয় বিধ গ্রহের যোগ দৃষ্টিতে সদসৎ উভয়বিধ মিশ্র ভাবাপন্ন কার্য্যে মনুষ্য ভাগ্যশালী হয়। দ্রষ্টা এবং স্থিত গ্রহের সংখ্যা এবং বলের ন্যূনাতিরেকে ফলের তারতম্য অবশ্যই কল্পনীয় ॥ ৩।৪।৫ ॥

নীচে গ্রহদৃগ্‌যোগাৎ ব্যয়াধিক্যং ॥ ৬ ॥

নীচে (৬০=১২) লগ্নপদাৎ দ্বাদশ স্থানে গ্রহদৃগ্ যোগাৎ গ্রহ সত্ত্বে গ্রহান্তর দৃষ্টে চ ব্যয়াধিক্যং ভবতীত্যর্থঃ। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বং বিচার্য্যং যথা দ্বাদশে শুভগ্রহৈর্যুক্তেক্ষিতে সৎ কর্ম্মণি, পাপৈ রসৎকর্ম্মণি, নীচ কর্ম্মণি বা তথা মিশ্রখেটে মিশ্র প্রকারেণ ব্যয়ঃ স্যাৎ। উচ্চাদিভি গ্রহৈ র্ব্যয়াধিক্য চিন্তনীয়ং ॥ ৬ ॥

লগ্নপদের দ্বাদশে যে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি বশতঃ মনুষ্যের ব্যয়াধিক্য ঘটে। একাদশ স্থানের ন্যায় এখানেও গ্রহগণের শুভাশুভত্ব এবং বলপরিমাণাদি সমস্তই বিচার্য্য। শুভগ্রহের দৃষ্টিযোগে শুভকার্য্যে পাপগ্রহের দৃষ্টিযোগে পাপ কর্য্যে এবং শুভাশুভগ্রহের দৃষ্টিযোগে সদসৎ কার্য্যে ব্যয় হইয়া থাকে। এই আয় ব্যয়ের বিচারে গ্রহগণের কারকত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখাও বিশেষ আবশ্যক। এক্ষণে প্রধানতঃ কোন্ গ্রহ হইতে কি প্রকারে আয় ব্যয় হইয়া থাকে লিখিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

রবি রাহু শুক্রৈ র্ন্পাৎ ॥ ৭ ॥

লগ্নপদাৎ দ্বাদশে রবি রাহু শুক্রৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্বা, পূর্ব্ব সূত্রানুবৃত্ত্যা যুক্তে দৃষ্টে বা সতি নৃপাৎ রাজমূলাৎ ব্যয়ঃ স্যাদিতি ॥ ৭ ॥

লগ্নপদের ব্যয় স্থানে রবিরাহু এবং শুক্র এই গ্রহত্রয়ের ব্যস্ত বা সমস্ত ভাবে দৃষ্টি যোগাদি থাকিলে ভূপতির নিমিত্ত মনুষ্যের ব্যয় হইয়া থাকে। টীকাকারগণ কেহই এস্থলে রব্যাদি গ্রহের স্থিতি ভিন্ন দৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ সূত্রে গ্রহ দৃগ্‌যোগাৎ লিখিত থাকায় দৃষ্টি শব্দ পরিহার করা যুক্তি যুক্ত নহে ॥ ৭ ॥

চন্দ্র দৃষ্টৌ নিশ্চয়েন ॥ ৮ ॥

চন্দ্রেতি রব্যাদি গ্রহ যুক্তে দৃষ্টে তৎ দ্বাদশে পুনশ্চন্দ্রদৃষ্টৌ সত্যাং নিশ্চয়েন রাজ মূলাদ্ ব্যয়ঃ স্যাদন্যথা সন্দিগ্ধ ইতি ॥ ৮ ॥

উক্ত দ্বাদশ স্থানে রব্যাদি গ্রহদিগের যোগ বা দৃষ্টি সত্ত্বে পুনর্ব্বার চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে ব্যয় বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না, নহিলে অবস্থা বিশেষে নাও ঘটিতে পারে। প্রায় সর্ব্বত্রই চন্দ্রের দৃষ্টি ফলের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে। পারাশরী মতে উক্ত দ্বাদশ স্থান গত শুক্রের প্রতি রবি ও রাহুর দৃষ্টি থাকিলেই নৃপতি কর্ত্তৃক মনুষ্যের ধন নাশ হইয়া থাকে। যথা—

পদারূঢ়াদ্ ব্যয়ে শুক্রে ভানুস্বর্ভানু বীক্ষিতে।
রাজ মূলাদ্ ব্যয়ং বাচ্যং চন্দ্র দৃষ্ট্যা বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥

বুধেন জ্ঞাতিভ্যো বিবাদাদ্ বা ॥ ৯ ॥
গুরুণা কর মূলাৎ ॥ ১০ ॥
কুজ শনিভ্যাং ভ্রাতৃমুখাৎ ॥ ১১ ॥

লগ্ন পদাদ্ দ্বাদশগেন বুধেন জ্ঞাতিভ্যো জ্ঞাতি নিমিত্তং বিবাদাদ্ বা, গুরুণা করমূলাৎ করব্যাজেন তথা কুজশনিভ্যাং ভ্রাতৃমুখাদ্ ভ্রাত্রাদিভি র্ব্যয়ঃ স্যাৎ ॥ ৯।১০।১১ ॥ পারাশরীয়েঽপি।—

পদারূঢ়াদ্ ব্যয়ে সৌম্যে শুভখেট যুতেক্ষিতে।
জ্ঞাতি মধ্যে ব্যয়ো নিত্যং পাপদৃক্ কলহাদ্ ব্যয়ঃ ॥
পদাদ্ব্যয়ে সুরাচার্য্যে বীক্ষিতে চান্য খেচরৈঃ।
কর মূলাদ্ব্যয়ং বাচ্যং কর ব্যাজেন বৈ দ্বিজ ॥
আরূঢ়াৎ দ্বাদশে সৌরী ধরা পুত্রেণ সংযুতে।
অন্য গ্রহেক্ষিতে বিপ্র ভ্রাতৃ মূলাদ্ ধনব্যয়ং ॥

লগ্নপদের দ্বাদশে বুধের যোগ থাকিলে জ্ঞাতি নিমিত্ত বা বিবাদ জনিত, মনুষ্যের ধন ব্যয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ বৃহস্পতির যোগ থাকিলে করদান হেতু এবং শনি বা মঙ্গলের যোগে

ভ্রাত্রাদি কারণে ধন ব্যয় ঘটে। উক্ত যোগ যুক্ত দ্বাদশ স্থানের প্রতি গ্রহান্তরের দৃষ্টি থাকিলে ফলের উপচয় এবং নিশ্চয়তা কল্পনা করিবে। স্থিত এবং দ্রষ্টা গ্রহের শুভাশুভত্বে ব্যয় সম্বন্ধে ও শুভাশুভত্ব চিন্তনীয়। যথা—দ্বাদশস্থ বুধের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞাতি-পোষণে এবং পাপের দৃষ্টি যোগে বিবাদে ধনাদি হানি বিচার্য্য ॥ ৯—১১ ॥

এতৈ র্ব্যয় এবং লাভঃ ॥ ১২ ॥

এতৈ র্দ্বাদশ স্থানাদিগৈ রব্যাদি গ্রহৈ র্যথা ব্যয় উক্ত স্তথা তৈরেব একাদশাদিগৈ স্তেনৈব প্রকারেণ লাভোঽপি ভবেৎ ॥ ১২ ॥

আরূঢ়াৎ দ্বাদশে স্থানে যে যোগা কথিতা ময়া।
লাভ ভাবেষু তে যোগা লাভযোগ করাঃ সদা ॥

লগ্ন পদের দ্বাদশ স্থান গত যে গ্রহ হইতে যদ্দ্বারা যে ভাবে ধন ব্যয় কথিত হইল, লাভ ভাবস্থ তদ্গ্রহ হইতে তদ্ ব্যক্তি দ্বারা সেই ভাবেই দ্রব্যাদি লাভ কল্পনা করিবে। এ স্থলে বৃদ্ধ কারিকা হইতে উক্ত লাভ ভাব ঘটিত কয়েকটি ফল আবশ্যক বোধে লিখিত হইল।

আরূঢ়াৎ লাভভবনং গ্রহঃ পশ্যেৎ ন তু ব্যয়ং।
যস্য জন্মনি সোঽপি স্যাৎ প্রবলো ধনবানপি ॥
দ্রষ্টৃ গ্রহাণাং বাহুল্যে তথা দ্রষ্টরি তুঙ্গগে।
সার্গলে চাপি তত্রাপি বহ্বর্গলি সমাগমে ॥
শুভ গ্রহার্গলে তত্র তত্রাপ্যুচ্চ গ্রহার্গলে।
সুখানি স্বামিনা দৃষ্টে লগ্নভাগ্যাধিপেন বা ॥
জাতস্য পুংসঃ প্রাবল্যং নির্দ্দিশে দুত্তরোত্তরং।

জন্মকালে লগ্নপদের দ্বাদশ স্থানে কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকিয়া কেবল লাভ-স্থানে থাকিলে মনুষ্য প্রবল ধনবান্ হইয়া থাকে। লাভ স্থানে বহুগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, লাভ স্থানদ্রষ্টা গ্রহ তুঙ্গাদি স্থান গত হইলে, উক্ত স্থান অর্গলা সংযুক্ত হইলে, বহু অর্গলার সংযোগ ঘটিলে, শুভগ্রহ জনিত অর্গলার সন্নিবেশ হইলে, অর্গলা কারকাগ্রহ উচ্চাদি স্থান গত থাকিলে, তৎস্থানে তদধিপতির বা লগ্নভাগ্যাধিপতির দৃষ্টি থাকিলে জাতক উত্তরোত্তর যোগ ক্রমানুসারে ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

লাভে রাহু কেতুভ্যা মুদর রোগঃ ॥ ১৩ ॥

লাভে (৪৩=৭) লগ্নপদাৎ সপ্তমস্থানে রাহু কেতুভ্যাং রাহৌ কেতৌ বা স্থিতে সতি উদর রোগো ভবতি ॥ ১৩ ॥

আরূঢ়াৎ সপ্তমে রাহু শ্চাথবা সংস্থিতঃ শিখী।
রোগার্ত্ত শ্চোদরে বাল: শিখিনা পীড়িতোঽধিকং ॥

লগ্ন পদের সপ্তমে রাহু বা কেতুর সংযোগে থাকিলে মনুষ্যের উদর পীড়া জন্মে। কেতুর যোগে রোগের প্রাবল্য জ্ঞাতব্য ॥ ১৩ ॥

তত্র কেতুনা ঝটিতি জ্যানি লিঙ্গানি ॥ ১৪ ॥

তত্র (২৬=২) লগ্ন পদাৎ দ্বিতীয় স্থানে কেতুনা কেতৌ স্থিতে সতি ঝটিতি শীঘ্রমেব জ্যানি লিঙ্গানি শরীরে বার্দ্ধক্য চিহ্নানি ভবন্তি ॥১৪॥

পদাচ্চ সপ্তমে কেতৌ পাপ খেট যুতেক্ষিতে।
সাহসী শ্বেত কেশীচ দীর্ঘ লিঙ্গী ভবেন্নরঃ ॥

লগ্ন পদের দ্বিতীয় স্থানে কেতুগ্রহের সংযোগ থাকিলে মনুষ্য শীঘ্রই শরীরে বার্দ্ধক্য চিহ্নাদি প্রাপ্ত হয়। পারাশরী মতে উক্ত কেতুর প্রতি পাপ গ্রহের দৃষ্টি যোগাদি থাকিলে মনুষ্য সাহসী শ্বেত কেশী এবং দীর্ঘলিঙ্গী হইয়া থাকে। সূত্রে তত্র শব্দের উল্লেখ থাকায় শব্দার্থানুসারে দ্বিতীয় স্থানকে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সপ্তম স্থান উক্ত তত্র শব্দের লক্ষ্য হইলে সূত্র মধ্যে উক্ত তত্র শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেতুনা ঝটিত্যাদি সূত্র করিলেই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অনুবৃত্তিতে সপ্তম স্থানই পরিলক্ষিত হইত। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী সূত্রে তত্র পদোপলক্ষিত স্থান হইতেই ধনভাবের বিচার করা হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম ভাব হইতে কোথাও ধন বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তত্র শব্দে এস্থলে দ্বিতীয় স্থান লক্ষ্য করাই সঙ্গত। পারাশরী এস্থলে, পরবর্ত্তী শ্লোকে, দ্বিতীয় এবং সপ্তম উভয় স্থান হইতেই ফল বিচারের পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু সেটি গ্রন্থ সংগ্রহ কারের বুদ্ধি বিচিত্রতা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না ॥ ১৪ ॥

চন্দ্র গুরু শুক্রেষু শ্রীমন্তঃ ১৫ ॥
উচ্চেন বা ॥ ১৬ ॥

পদাৎ দ্বিতীয়ে (পারাশরী মতেন সপ্তমে চ) ব্যস্ততয়া সমস্ততয়া বা চন্দ্র গুরু শুক্রেষু স্থিতেষু মনুষ্যঃ শ্রীমন্তঃ ভাগ্যবান্ ভবতি। উক্ত স্থানে শুভেন পাপেন বা কেনচিৎ উচ্চেন উচ্চ স্থিতেন গ্রহেণ মনুষ্য স্তথাবিধঃ শ্রীমন্তো ভাগ্যবান্ ভবতীতি ॥ ১৫ । ১৬ ॥

পদাচ্চ সপ্তমে স্থানে গুরু শুক্র নিশাকরাঃ।
একো দ্বয়ং ত্রয়ং তত্র লক্ষ্মীবান্ কারয়েৎ ধ্রুবং ॥
তুঙ্গস্থে সপ্তমে খেটে শুভো বাপ্যশুভঃ পদে।
শ্রীমান্ সোঽপি ভবেন্নূনং সৎকীর্ত্তি সহিতো নরঃ ॥
যে যোগাঃ সপ্তমে ভাবে রাহ্বাদি কথিতাঃ ময়া।
তে যোগাঃ বিত্তভাবেষু দূনবচ্চিন্তয়েদ্ দ্বিজ ॥

লগ্ন পদের দ্বিতীয় স্থানে (সপ্তমে ?) চন্দ্র গুরু এবং শুক্র এই গ্রহত্রয়ের ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অবস্থিতি থাকিলে মনুষ্য শ্রীমন্ত হয়। উক্ত স্থানে শুভ বা পাপ যে কোন গ্রহ উচ্চস্থ থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। সূত্রোক্ত চন্দ্রাদি কোন গ্রহ তথায় উচ্চস্থ থাকিলে অবশ্যই ফল বাহুল্য জ্ঞাতব্য। উপরোক্ত পারাশরী শ্লোকে প্রকাশ যে ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ সূত্র পর্য্যন্ত চারি সূত্রে যে সমস্ত দ্বিতীয় ভাবোক্ত ফল লিখিত আছে, আরূঢ় লগ্নের সপ্তম স্থান হইতেও তৎ সমুদায় বিচার্য্য। বৃদ্ধ কারিকায় এই দ্বিতীয় স্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ফল লিখিত আছে যথা—আরূঢ়াৎ ষষ্ঠভে (দ্বিতীয়ে) পাপে চৌরঃ স্যাৎ শুভ বর্জ্জিতে আরূঢ়াৎ বাহপি (দ্বিতীয়ে) সৌম্যে তু সর্ব্ব দিগধিপো ভবেৎ। সর্ব্বজ্ঞ সুর জীবে বাং কবি বাদী চ ভার্গবে ॥ ইতি। ১৩।১৬ ॥

স্বাংশবদন্যৎ-প্রায়েণ ॥ ১৭ ॥

অন্যৎ অত্র দ্বিতীয় স্থানে যদনুক্তং ফলং তৎ সর্ব্বং স্বাংশ বৎ করাকাংশবৎ প্রায়েণ বোধ্যং ন সর্ব্বত্র মিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭ ॥

যে যোগাশ্চ পদে লগ্নে যথাবদ্ গদিতো মম।
কারকাংশস্থ কুণ্ডল্যাং তৎসর্ব্বমপি চিন্তয়েৎ ॥

কারকাংশ কুণ্ডলী হইতে যে যে ভাবের যে প্রকার ফল চিন্তা করা হইয়াছে পদলগ্নে অনুক্ত অপরাপর ফল প্রায় সেইরূপই চিন্তা করিবে। পারাশরী হোরায় পদকুণ্ডলীর ফলই কারকাংশ কুণ্ডলী হইতে বিচার করিবার বিধি আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে পূর্ব্বোক্ত যোগ সমুদায় কারক কুণ্ডলী এবং পদ কুণ্ডলী উভয়ত্র প্রায় সম ভাবেই বিচার্য্য। জন্ম কুণ্ডলী হইতেও অনেক স্থানে ফল মিলিতে দেখা গিয়াছে ॥ ১৭ ॥

লাভপদে কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা শ্রীমন্তঃ ॥ ১৮ ॥
অন্যথা দুঃস্থে ॥ ১৯ ॥

লগ্নারূঢ়াৎ কেন্দ্রে কেন্দ্রস্থানে ত্রিকোণে পঞ্চম নবম রাশৌ বা লাভপদে সপ্তমারূঢ়ে স্থিতে সতি জাতকঃ শ্রীমন্তঃ ভাগ্যবান্ ভবতি। দুঃস্থে ষষ্ঠাষ্টম দ্বাদশগে সতি অন্যথা, শ্রীমান্ ন ভবতি। দরিদ্রঃ স্যাদিতি শেষঃ ॥ ১৮। ১৯ ॥

আরূঢ়াৎ কেন্দ্র কোণেষু স্থিতে লাভ পদে দ্বিজ।
শ্রীমাংশ্চ জায়তে নূনং চান্যথা নির্দ্ধনো ভবেৎ ॥

সপ্তমারূঢ় পদ লগ্নপদের কেন্দ্র বা ত্রিকোণ গত হইলে মনুষ্য ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। দুঃস্থান গত হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ দরিদ্র হয়। সুতরাং অবশিষ্ট স্থানত্রয়ে মধ্যবিধ ফল বিচার্য্য। ১৮।১৯ ॥

তদ্বদ্বুদ্ধিমশেষাণাং সত্ত্বানামেত্য যোগবিৎ।
পরিত্যজতি সম্প্রাপ্য বুদ্ধিসৌক্ষ্ম্যমনুত্তমম্ ॥ ২০ ॥
পরিত্যজতি সূক্ষ্মাণি সপ্ত ত্বেতানি যোগবিৎ।
সম্যগ্বিজ্ঞায় যোঽলর্ক তস্যাবৃত্তির্ন বিদ্যতে ॥ ২১ ॥
এতাসাং ধারণানাস্তু সপ্তানাং সৌক্ষ্ম্যমাত্মবান্।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ততঃ সিদ্ধিং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা পরাং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ কুরুতে ভূতে রাগং মহীপতে।
তস্মিংস্তস্মিন্ সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি ॥ ২৩ ॥
তস্মাদ্বিদিত্বা সূক্ষ্মাণি সংসক্তানি পরস্পরম্।
পরিত্যজতি যো দেহী স পরং প্রাপ্নুয়াৎ পদম্ ॥ ২৪ ॥
এতান্যেব তু সন্ধায় সপ্ত সূক্ষ্মাণি পার্থিব।
ভূতাদীনাং বিরাগোঽত্র সদ্ভাবজ্ঞস্য মুক্তয়ে ॥ ২৫ ॥
গন্ধাদিষু সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি।
পুনরাবর্ত্ততে ভূপ স ব্রহ্মাপরমানুষম্ ॥ ২৬ ॥
সপ্তৈতা ধারণা যোগী সমতীত্য যদিচ্ছতি।
তস্মিংস্তস্মিল্লয়ং সূক্ষ্মে ভূতে যাতি নরেশ্বর ॥ ২৭ ॥

তা'র পরে বুদ্ধিতত্ত্বে জন্মিলে ধারণা
সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয় ঘুচয়ে ভাবনা।
এ সিদ্ধি পেয়েও যোগী করি পরিহার,
সিদ্ধিতে না হয় মত্ত শ্রেষ্ঠ মতি যা'র। ২০
এ সকল সিদ্ধি, তবে করি পরিহার
লভে যোগী হৃদয়েতে আনন্দ অপার।
এই সপ্ত-তত্ত্ব সিদ্ধি লাভ হ'লে পরে
যে যোগী ত্যজিতে পারে প্রফুল্ল অন্তরে।
হে অলর্ক, সেই যোগী মুক্ত সুনিশ্চয়,
পুনরায় আগমন তা'র নাহি হয়। ২১।
এ সপ্ত ধারণা আসিবেক নিরন্তর,
পুনঃ পুনঃ ত্যজিবেক হইয়া তৎপর।
এই সপ্ত সিদ্ধি যেবা করে পরিহার
পায় সে পরমা গতি সন্ধ নাহি তা'র। ২২।
যে বিষয়ে ঘটে যাঁ'র আসক্তি উদয়
সে আসক্তি হ'তে নাশ ঘটে সুনিশ্চয়। ২৩।
সূক্ষ্মে ধারণায় লাভ করি' যেই জন
অনায়াসে ত্যজে তা'র সকল জীবন।
অনা'সে পরম পদ লাভ হয় তা'র
নিশ্চয় জানিহ ইথে সন্ধ নাহি আর। ২৪।
এই সপ্ত-সূক্ষ্মের সন্ধান লাভ করি'
ভূতচয়ে সদা অনুরাগ পরিহরি,
যেই জন সদ্ভাবের লভেন সন্ধান
সদ্ভাবজ্ঞ সেই জন, মুক্তি পদ পান। ২৫।
গন্ধাদিতে সমাশক্তি ঘটিবে যাহার
ব্রহ্মলোক হ'তে ঘটে আবৃত্তি তাহার। ২৬।
এই সপ্ত ধারণা সুসিদ্ধ হলে পরে
ত্যজিতে সমর্থ যেই যোগী ফুল্লান্তরে,
ইচ্ছা হ'লে সেই ভূতে লয় হয় তাঁ'র
শুন নরেশ্বর ইথে সন্ধ নাহি আর। ২৭।

দেবানামসুরাণাং বা গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
দেহেষু লয়মায়াতি সঙ্গং নাপ্নোতি চ কচিৎ ॥ ২৮ ॥
অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথাপরম্ ॥ ২৯ ॥
তত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতাংস্তথৈশ্বরান্।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্র পরং নির্ব্বাণসূচকান্ ॥ ৩০ ॥
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোঽণীয়ান্ শীঘ্রত্বং লঘিমা গুণঃ।
মহিমাশেষপূজ্যত্বাৎ প্রাপ্তির্নাপ্রাপ্যমস্য যৎ ॥ ৩১ ॥
প্রাকাম্যমস্য ব্যাপিত্বাদীশিত্বঞ্চেশ্বরো যতঃ।
বশিত্বাদ্বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমো গুণঃ ॥ ৩২ ॥
যত্রেচ্ছাস্থানমপ্যুক্তং যত্র কামাবসায়িতা।
ঐশ্বর্য্যকারণৈরেভির্যোগিনঃ প্রোক্তমষ্টধা ॥ ৩৩ ॥

দেবতা অসুর আর গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ
রাক্ষসেও হ'লে লয় নাহি হয় সঙ্গ। ২৮।
অনিমা, লঘিমা, সে মহিমা প্রাপ্তি আর,
প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, সে বশিত্ব নাম যার। ২৯।
কামাবসায়িত্ব নামে সিদ্ধি সে অষ্টম
ঐশ্বরিক গুণ অষ্ট অতি অনুপম,
নির্ব্বাণসূচক ইহা জানিও নিশ্চয়
ক্রমেতে যোগীর লাভ হয় সমুদায়। ৩০।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম হইবে স্বেচ্ছায়
যেই শক্তি বলে বলি' 'অনিমা' তাহায়।
শীঘ্রত্ব হইবে লাভ যেই শক্তি বলে
লঘিমা নামেতে গুণ শাস্ত্রে তা'রে বলে।
অশেষ ভূতের পূজ্য হয় যোগী যায়
"মহিমা" সে শক্তি বলি যোগ শাস্ত্রে গায়।
অপ্রাপ্যের লাভ হয় যেই শক্তি বলে
"প্রাপ্তি" নামে শক্তি তা'রে বলে ত
সকলে। ৩১
ব্যাপিত্ব শক্তির লাভ হয় ত যাহায়,
"প্রাকাম্য" নামেতে সিদ্ধি সবে কহে তায়।
সবার অধীশ হয় প্রভাবে যাহার,
"ঈশিত্ব" বলিয়া খ্যাতি জানিহ তাহার।
যে শক্তি প্রভাবে সবে বশীভূত হয়—
"বশিত্ব" তাহার নাম শাস্ত্র মাঝে কয়।
এই ত সপ্তম সিদ্ধি শুনহ রাজন্,
এরি ফলে নির্ভয়ে রহেন যোগিগণ। ৩২।
শেষ সিদ্ধি "কামাবসায়িতা" নাম যার
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় প্রভাবে তাহার।
অপূর্ণ না রহে ইচ্ছা এই সিদ্ধি বলে,
জগতের হিত হয় এই শক্তি বলে।
ঈশ্বরের অষ্ট বিধ এই শক্তি চয়
এর ফলে যোগী সর্ব্ব-সিদ্ধ সুনিশ্চয়। ৩৩।

মুক্তিসংসূচকং ভূপ পরং নির্ব্বাণমাত্মনঃ।
ততো ন যায়তে নৈব বর্দ্ধতে ন বিনশ্যতি ॥ ৩৪ ॥
নাপি ক্ষয়মবাপ্নোতি পরিণামং ন গচ্ছতি।
ছেদং ক্লেদং তথা দাহং শোষং ভূরাদিতো ন চ ॥ ৩৫
ভূতবর্গাদবাপ্নোতি শব্দাদ্যৈর্হ্রিয়তে ন চ।
ন চাস্য সন্তি শব্দাদ্যাস্তদ্ভোক্তা তৈর্ন যুজ্যতে ॥ ৩৬।
যথা হি কানকং খণ্ডমপদ্রব্যবদগ্নিনা।
দগ্ধদোষং দ্বিতীয়েন খণ্ডেনৈক্যং ব্রজেন্নৃপ ॥ ৩৭ ॥
ন বিশেষমবাপ্নোতি তদ্বদ্‌যোগাগ্নিনা যতিঃ।
নির্দগ্ধদোষস্তেনৈক্যং প্রয়াতি ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩৮ ॥
যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তঃ সমানত্বমনুব্রজেৎ।
তদাখ্যস্তন্ময়ো ভূতো ন গৃহ্যেত বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥
পরেণ ব্রহ্মণা তদ্বৎ প্রাপ্যৈক্যং দগ্ধকিল্বিষঃ।
যোগী যাতি পৃথগ্‌ভাবং ন কদাচিন্মহীপতে ॥ ৪০ ॥

মুক্তির সূচক এই অষ্ট, হে রাজন,
লভেন নির্ব্বাণ পরে মুক্তসঙ্গ জন।
জন্ম-বৃদ্ধি-নাশ আর না হয় তাঁহার
পরিণাম হীন হ'য়ে করেন বিহার। ৩৪।
ক্ষিতি আদি ভূত চয় হ'তে তাঁর ভয়—
ক্ষয় পরিণাম আদি আর নাহি হয়;
ছিন্ন ভিন্ন, ক্লিন্ন কিম্বা দগ্ধ, শুষ্ক আর,
হইবার ভয় আর না রহে তাঁহার। ৩৫।
শব্দ-স্পর্শ-আদি হ'তে আকর্ষিত হ'য়ে
অপহৃতান্তর নাহি হন, বদ্ধ র'য়ে। ৩৬।
দগ্ধ স্বর্ণ হ'তে গেলে অপদ্রব্য চয়
শুদ্ধ স্বর্ণ সনে তাহা যথা যুক্ত হয়। ৩৭।
না রহে প্রভেদ তার—যোগী সেই মত
যোগাগ্নি সংশুদ্ধ হয়ে যুক্ত অবিরত
ব্রহ্মসনে, ঐক্যলাভ করেন নিশ্চয়
জানিহ রাজন, ইথে নাহিক সংশয়। ৩৮।
অগ্নিতে অপর অগ্নি করিলে অর্পণ,
প্রভেদ - স্বাতন্ত্র্য কিছু না রহে যেমন। ৩৯।
দগ্ধ দোষ যোগী তথা পরব্রহ্ম সনে
সাযুজ্য সারূপ্য লভে; রেখো ইহা মনে। ৪০।

যথা জলং জলেনৈক্যং নিক্ষিপ্তমুপগচ্ছতি।
তথাত্মা সাম্যমভ্যেতি যোগিনঃ পরমাত্মনি ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ালর্কসংবাদে
যোগিসিদ্ধির্নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

জলেতে মিশালে জল, যেমন আবার
পৃথক করিতে সাধ্য না রহে কাহার,
তেমতি মিলিলে আত্মা পরমাত্মা সনে
যোগির স্বাতন্ত্র্য নাশ হয় ত্রিভুবনে। ৪১।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে দত্তাত্রেয় অলর্ক সংবাদে
যোগসিদ্ধি নামক চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অলর্ক উবাচ ।

ভগবান্ যোগিনশ্চর্য্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
ব্রহ্মবর্ত্ম ন্যনুসরন্ যথা যোগী ন সীদতি ॥ ১ ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ ।

মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রত্যুদ্বেগকরৌ নৃণাম্ ।
তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ ॥ ২
মানাপমানৌ যাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে ।
অপমানোঽমৃতং তত্র মানস্তু বিষমং বিষম্ ॥ ৩ ॥
চক্ষুঃপুতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপুতং জলং পিবেৎ ।
সত্যপুতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপুতঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ৪ ॥

শুনি, দত্তাত্রের মুখে এ হেন বচন
বলিলা অলর্ক—"পদে করি নিবেদন,
ভগবন, বল এবে হইয়া সদয়
যোগিজনচর্য্যা যেবা শাস্ত্র মত হয়,
শুনিতে বাসনা এবে হ'তেছে আমার
বিস্তারি বলহ সেই সর্ব্বতত্ত্বসার।
যেই রূপে ব্রহ্মবর্ত্মে করিলে গমন,
অবসন্ন নাহি হন কভু যোগিজন। ১।

দত্তাত্রেয় শুনি রাজার এ কথা,
বলিলেন নররায়,
মান অপমান উদ্বেগের হেতু
নাহিক সন্দেহ তা'য়।
যোগির সতত বিপরীত ভাব
এ দু'টির প্রতি হয়,
এই সে কারণে নিরুদ্বেগ তিনি
সর্ব্ব সিদ্ধি সুনিশ্চয়। ২।

মান অপমান বিষ ও অমৃত
তাঁ'র কা'ছে বোধ হয়,
অপমানামৃত মান বিষ সম
বিষম যাতনাময়। ৩।
চলিবার কালে পদক্ষেপ আগে
পথ দৃষ্টি-পূত করি'
পদক্ষেপ করি চলে যোগি সবে
সদা মন স্থির করি'।
বস্ত্রপূত করি' পবিত্র সলিল
করিবেন সদা পান,
সত্যপূত সদা বলেন বচন
রাখিয়া সবার মান।
বুদ্ধিপূত করি, করি বিবেচনা
চিন্তনীয় যে বিষয়
তাহা স্থির করি' করেন চিন্তন
যোগিজন সুনিশ্চয়। ৪।

আতিথ্য শ্রাদ্ধ-যজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু চ।
মহাজনেষু সিদ্ধ্যর্থং ন গচ্ছেদ্‌যোগবিৎ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥
ব্যস্তে বিধূমে ব্যঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তবজ্জনে।
অটেত যোগবিদ্ভৈক্ষ্যং ন তু তেষ্বেব নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥
যথৈবমবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
তথা যুক্তশ্চরেদ্‌যোগী সতাং বর্ত্ম ন দূষয়ন্ ॥ ৭ ॥
ভৈক্ষ্যং চরেদ্‌গৃহস্থেষু যাযবরগৃহেষু চ।
শ্রেষ্ঠা তু প্রথমা চেতি বৃত্তিরস্যোপদিশ্যতে ॥ ৮ ॥
অথ নিত্যং গৃহস্থেষু শালিনেষু চরেদ্‌যতিঃ।
শ্রদ্ধধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু ॥ ৯ ॥
অত ঊর্দ্ধং পুনশ্চাপি অদুষ্টাপতিতেষু চ।
ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে ॥ ১০ ॥

আতিথ্যের আশে কিম্বা শ্রাদ্ধ কালে
যজ্ঞ, যাত্রা, মহোৎসবে,
কিম্বা সিদ্ধি আশে মহাজন পাশে
গমন কভু না হ'বে। ৫।
ধূম অগ্নিহীন গৃহীর ভবন
হইবেক যে সময়,
গৃহীগণ যবে ভোজন করিয়া
বিশ্রামেতে রত হয়,
সেই ত সময়ে যোগবিৎগণ
ভিক্ষার বাসনা করি'
গৃহীর ভবনে করিবে গমন
মনে শান্তভাব ধরি,
নিত্য এক স্থানে না যাবে কখন
ভিক্ষাতরে যোগিজন
দেহ রক্ষামাত্র উপলক্ষ্য তার
ভোগে নহে রত মন। ৬।
যাহে পরিভব কিম্বা অপমান
নাহি ক'রে কোন জন,
হেন ভাবে সদা সাধুবর্ত্মে থাকি'
করিবেন বিচরণ। ৭।
গৃহীর ভবনে, যাযাবর-বাসে
ভিক্ষা যুক্তিযুক্ত হয়,
গৃহীর ভবন ভিক্ষার কারণ
শ্রেষ্ঠতম সুনিশ্চয়। ৮।
শালীন, সশ্রদ্ধ, দান্ত যেবা আর
শ্রোত্রিয় মহৎ জন,
হেন গৃহস্থের ভবনে ভিক্ষার্থে
যোগী করিবে গমন। ৯।
অদুষ্ট যে জন পতিত যে নয়
হেন গৃহস্থের বাসে
যথা কালে যোগী করিবে গমন
যথাযোগ্য ভিক্ষা আশে।
বিবর্ণ জনের ভবনে কখন
ভৈক্ষ্য আশে নহি যা'বে,
জঘন্য সে বৃত্তি জানে সাধুজন
তাহে বহু কষ্ট পাবে। ১০।

ভৈক্ষ্যং যবাগূং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব বা
ফলং মূলং প্রিয়ঙ্গুং বা কণ-পিণ্যাক-শক্তবঃ ॥ ১১ ॥
ইত্যেতে চ শুভাহারা যোগিনঃ সিদ্ধিকারকাঃ।
তৎ প্রযুঞ্জ্যান্মুনির্ভক্ত্যা পরমেণ সমাধিনা ॥ ১২ ॥
অপঃ পূর্ব্বং সকৃৎ প্রাশ্য তুষ্ণীং ভূত্বা সমাহিতঃ।
প্রাণায়েতি ততস্তস্য প্রথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা ॥ ১৩ ॥
অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়েতি চাপরা।
উদানায় চতুর্থী স্যাদ্ব্যানায়েতি চ পঞ্চমী ॥ ১৪ ॥
প্রাণায়ামৈঃ পৃথক্ কৃত্বা শেষং ভুঞ্জীত কামতঃ।
অপঃ পুনঃ সকৃৎ প্রাশ্য আচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ ॥ ১৫ ॥
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগোঽলোভস্তথৈব চ।
ব্রতানি পঞ্চ ভিক্ষূণামহিংসাপরিমাণি চ ॥ ১৬ ॥

যবাগূ সে আর,　　তক্র, দুগ্ধ কিম্বা,
　　যাবক, প্রিয়ঙ্গু, ফল,
মূল, কণ, শক্তু　　পিণ্যাক সে আর
　　ভৈক্ষ্য-দ্রব্য এ সকল। ১১।
এই সব দ্রব্য　　সদা শুদ্ধাহার,
　　সিদ্ধির কারণ হয়,
মৌনী হ'য়ে যোগী　　নিরজনে বসি'
　　ভুঞ্জিবেন সমুদায়। ১২।
প্রথমে কিঞ্চিৎ　　জল পান করি'
　　যোগী সমাহিত হ'য়ে,
"প্রাণায়" বলিয়া　　প্রথম, আহুতি
　　সদা বাক্‌যত র'য়ে।
প্রথম আহুতি　　এই ত যোগীর
　　বলে শাস্ত্রে এই মত
তা'র পর যেবা　　বলি শুন রাজা
　　আহার বিধি যেমত। ১৩।

"অপানায়" বলি　　দ্বিতীয় আহুতি
　　"সমানায়" বলি পরে।
"উদানায়" বলি'　　চতুর্থ যে হয়
　　পঞ্চম "ব্যানায়" স্মরে। ১৪।
পরে প্রাণায়াম　　করি' একবার
　　পৃথক ভাবেতে পরে,
ভুঞ্জিবেন অন্ন　　যথাসুখে যোগী
　　সদা প্রফুল্ল অন্তরে।
আহারের পর　　পুনঃ জল লয়ে
　　করিবেন আচমন,
আচমন পরে—　　হৃদয় স্পর্শিয়া
　　তবে ত্যজিবে আসন। ১৫।
অস্তেয়, অলোভ,　　ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ
　　অহিংসা এ পঞ্চ ব্রত,
ভিক্ষু যেই জন　　করিবে পালন
　　কায়-মনেতে নিরত। ১৬।

অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্।
নিত্যস্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৭ ॥
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধকম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা ॥ ১৮ ॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ ॥ ২০ ॥
শূন্যেষ্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনেষু চ।
নিত্যযুক্তঃ সদা যোগী ধ্যানং সম্যগুপক্রমেৎ ॥ ২১ ॥
বাগ্দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীগুরু শুশ্রূষা, অক্রোধ সে আর
শৌচ আর লঘ্বাহার
নিয়ত স্বাধ্যায় নিয়ম এ পঞ্চ
যোগীর জানিহ সার। ১৭।
সারভূত আর, কার্য্যের সাধক
জ্ঞান সেই সুনিশ্চয়
তাহার সাধনে রত রবে সদা
যোগীর কর্ত্তব্য হয়।
জ্ঞান লাভ তরে বহু বিচারের
চেষ্টা কভু ভাল নয়
যোগ বিঘ্নকর সে চেষ্টা জানিয়া
ত্যজিবে তাহা নিশ্চয়। ১৮।
এটা জানা চাই ওটা জানা চাই
এই ভাবে যেই জন,
তৃষিত হইয়া ঘুরে নিরন্তর
বৃথা ঘুরে সেই জন,
সহস্র কল্পেও কখন তাহার
জ্ঞেয় তত্ত্ব জ্ঞাত নয়,
বৃথায় ঘুরিয়া জীবন তাহার
অকারণে হয় ক্ষয়। ১৯।
ত্যক্ত সঙ্গ হ'বে হবে জিতক্রোধ
লঘ্বাহারী হবে আর,
জিতেন্দ্রিয় হয়ে ধ্যান যুক্ত হবে
রুদ্ধ করি সর্ব্বদ্বার। ২০।
শূন্যে, অবকাশে, গুহায়, কাননে
যোগী নিত্য যুক্ত হয়ে,
ধ্যানপর হবে ইষ্টে দৃঢ় করি
সতত সংযত র'বে। ২১।
বাক্-কর্ম্ম-মন তিন দণ্ড করি
সংযত সদা যে জন,
সেই সে ত্রিদণ্ডী মহাযতি সেই
রাখিও মনে রাজন। ২২।

বাঙ্গালার সর্ব্বজনসমাদৃত সচিত্র মাসিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র

"গৃহস্থ"—গৃহস্থের উপযোগী কাজের কথায় পরিপূর্ণ। সমাজ, ধর্ম্ম ও দেশের যাহাতে কল্যাণ হয়, যে সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে দেশের প্রতি গৃহস্থের উপকার হয়, গৃহস্থে সেই সমস্ত বিষয়ের—সেই সমস্ত কাজের কথার আলোচনা হয়।—ইহাই গৃহস্থের বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব রক্ষা করিবার জন্য গৃহস্থে "আলোচনা" ও "মফস্বলের বাণী" নামক দুইটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

"গৃহস্থের"—আর এক বিশেষত্ব, ইহা গল্প ও উপন্যাস-বর্জ্জিত পত্রিকা। আকার, ছাপাই, ও কাগজের তুলনায় গৃহস্থের বার্ষিক মূল্য সামান্য—রয়েল আট পেজী ফর্ম্মার একশত বার পৃষ্ঠা আকারের পত্রিকার ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র।

বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালার প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন;—"গৃহস্থ বাঙ্গালা মাসিকপত্রে একটী নূতন যুগ আনিয়াছে। সেই প্রথম যুগের 'বঙ্গদর্শন' হইতে এখন পর্য্যন্ত মাসিকপত্রের একরূপ ধরণ ধারণ, ছন্দ-শ্রী ছিল, 'গৃহস্থ' নূতন ছন্দ নূতন শ্রী আনিয়াছে। সে যুগের সেই আখ্যায়িকাংশ নাই, এ যুগের ছোট গল্প বা সুশ্রী বিশ্রী ছবিও নাই।

'গৃহস্থ' আমাদের এ সময়ের যে সকল কথা সমাজে প্রয়োজনীয় সেই সকল কথারই আলোচনা করিতেছেন। আর আলোচনার পন্থাও অতি নূতন ধরণের। তাহাতে কাব্যাংশ প্রায়ই থাকে না, আসল কথা কখন সংক্ষেপে কখন বিস্তারিত ভাবে থাকে। সকল বিষয়েই, আত্মদৃষ্টি ফুটাইবার বিশেষ চেষ্টা আছে।"

প্রসিদ্ধ মনস্বী শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে টি, এম্ এ, ডি এল্ মহাশয় বলেন—"'গৃহস্থে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত, এবং লেখকগণের চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় দেয়। এ পত্রিকা পাঠে আনন্দ ও অনেক স্থলে জ্ঞানলাভ করা যায়।"

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অক্লান্তকর্ম্মী সম্পাদক, বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয় বলেন—'গৃহস্থ' পাঠ করিয়া আনন্দ পাই। বাঙ্গালায় ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাগজ। 'গৃহস্থে'র পরিচালকগণ ইহাকে 'কেজো' কাগজ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং ইহাই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। দেশের কথা যেমন 'গৃহস্থ' হইতে জানা যায়, তাহা অন্য কোন পত্রিকা হইতে জানিবার উপায় নাই। ইহা আনন্দের কথা :—আমরা পরের দেশের কথা বরং কিছু জানি, নিজের দেশের কথা জানিতে আমাদের আগ্রহ পর্য্যন্ত নাই।

'গৃহস্থে'র আর একটা বিশিষ্ট ভাব আছে, ইহা 'কেজো' কাগজ বটে—ইহা কাজ করিতে চায়,—কিন্তু ভিতরে একটা উগ্র উৎসাহ আছে। যেমন করিয়া হউক, আমার দেশটাকে উঁচুতে তুলিতেই হইবে, এই প্রবৃত্তি ইহাকে কাজ করাইতেছে। ইহাকে উৎসাহ না বলিয়া উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। ভিতরে এই প্রকার উগ্র উদ্দীপনা না থাকিলে, আমাকে এই শ্রেণীর কাগজ ভাল লাগিত না। অন্যের কথা আমি বলিতে পারি না। এইজন্য আমাকে 'গৃহস্থ' খুব ভাল লাগে। দেশের যাহা কিছু আছে, তাহাই নূতন চোখে দেখিতে হইবে, চোখ নূতন হইলে অস্পষ্ট স্পষ্ট হইবে; অনুজ্জ্বল উজ্জ্বল হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। 'গৃহস্থ'ও সেই বিশ্বাসে কাজ করিতেছেন। গৃহস্থের মূলমন্ত্র স্বদেশভক্তি, অতএব গৃহস্থ আমার শ্রদ্ধার বস্তু।"

প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল মহাশয় বলেন—"গৃহস্থ" আমি মাঝে মাঝে দেখি। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে। 'গৃহস্থ' বেশ চলিতেছে।"

বাঙ্গালার নীরব সাহিত্য-সেবী, ভূতপূর্ব্ব 'বসুমতী,' 'হিতবাদী,' 'সুলভ সমাচার' ও বর্ত্তমান 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলেন—"গৃহস্থ নামক মাসিক পত্রিকাখানি আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত পড়িয়া থাকি। গল্প নাই, কবিতা নাই,—রহস্য নাই, তরল কিছুই নাই, অথচ এই পত্রিকাখানি পড়িতে বসিলে একটী পাতাও বাদ দিবার যো নাই। এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া আমরা অনেক কথা জানিতে ও শিখিতে পাই। এমন সুন্দর, এমন শিক্ষাপ্রদ পত্রিকার যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে, আমরা উন্নত হইয়াছি বলিয়া যে গর্ব্ব করি তাহা নিতান্তই শূণ্যগর্ভ।"

কাশ্মীর-মহারাজের শ্রীপ্রতাপকালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ এম এ, মহোদয় লিখিয়াছেন,—"গৃহস্থ খুব সুন্দর কাগজ হইয়াছে। গৃহস্থের সর্ব্বত্র একটা দেশ-প্রীতির ছায়া আছে, একটা কার্য্যোপযোগিতা আছে। এক কথায় গৃহস্থ বাঙ্গালার একখান শ্রেষ্ঠ কাগজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ভট্টপল্লী হইতে বহু শাস্ত্র-সম্পাদক প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"গৃহস্থ'—বিচক্ষণ গৃহস্থ, প্রাচীন ও নবীনের ভাব-সমন্বয়ে গৃহস্থের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। সমন্বয়-সাধনের দুই একটী পন্থা আমার মনঃপূত না হইলেও—অধিক পন্থাই আমার অনুমোদিত। বিলাস-জর্জ্জরিত সমাজের তামস অপবাদ কি উপায়ে বিদূরিত হইবে—গৃহস্থ তাহাই বুঝাইতেছেন। এ ভাবের মাসিক পত্র আর নাই—'গৃহস্থ' চিরজীবী হউন।"

মালদহ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব গোস্বামী শাস্ত্ররত্ন (অধ্যাপক কলিগ্রাম সংস্কৃত বিদ্যালয়) লিখিয়াছেন—"গৃহস্থ" প্রবন্ধ-গৌরবে গরীয়ান্, চিত্রশিল্পে সমুজ্জ্বল। ইহার বিশেষত্ব,—ইহা অযথা লিপি বিন্যাসে পরিপূর্ণ নহে।"

Amrita Bazar Patrika বলেন—"The special features of the magazine—the section on 'Alochana' or reflections at the beginning as well as on 'Moffussil Banee' or voice from the Moffussil at the end, continue to be as stimulating and thought-compelling as ever. These portions alone are simply worth their weight in gold and their perusal will mean a rich education for young Bengal."

Bengalee বলেন—"Alochana or a discussion of some important subjects of historical, philosophical and literary interests, is the most interesting feature of this excellent Bengali monthly magazine.

Empire বলেন—"Most of the articles which have appeared in the numbers before us, are well-written. They deal with social, religious and scientific subjects and will amply repay perusal. A feature of the Magazine is the serial publication of certain well-known Sanskrit works with translation in Bengali. Considering the amount of reading matter the subscription is certainly very cheap.

Grihastha continues to maintain its high standard in articles.

সাহিত্য বলেন—"'গৃহস্থের' নবজীবন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'আলোচনা' দেশের ও দশের কথায় পূর্ণ—ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে।"

ঢাকার "প্রতিভা" বলেন—"'গৃহস্থ' আজকাল শ্রেষ্ঠ মাসিকের আসন পাইয়াছে প্রবন্ধ-গৌরবে গৃহস্থ অদ্বিতীয়।"

চট্টগ্রামের "প্রভাত" বলেন—"'গৃহস্থ' মাসিক পত্রে মৌলিক গবেষণা পূর্ণ ও ইতিবৃত্তমূলক বহু প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, তাহা বঙ্গভাষায় নবজীবন সঞ্চারের পরিচয় দিতেছে।"

"ব্রহ্মবাদী" বলেন—"অল্প দিনের ভিতরে 'গৃহস্থ' সর্ব্বপ্রকারে উচ্চশ্রেণীর একখানি মাসিক-সাহিত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। আকার, আয়তন, প্রবন্ধ-গৌরব এবং চিত্র তুলনায় ইহার দুই টাকা বার্ষিক মূল্য কমই বলিতে হইবে।"

মহাজনবন্ধু বলেন—"বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে সাহিত্য-বিষয়ক মাসিকপত্রপত্রিকার মধ্যে 'গৃহস্থ' সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিকপত্র হইয়াছে। মাসিক পত্রে সংবাদ 'আলোচনা' করিবার নূতন পন্থা 'গৃহস্থে'র পক্ষে নূতন হইয়াছে।"

নায়ক বলেন—"চিন্তাশীলতায়, ভাবুকতায় এবং সামাজিক বিষয়ের বিশ্লেষণে 'গৃহস্থ' বাঙ্গালার মাসিকপত্রের শীর্ষস্থান অধিকার পাইয়াছে। 'আলোচনা'-শীর্ষক একটী নূতন অধ্যায় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই আলোচনায় বহু কাজের বিষয়ের আলোচনা আছে, সেগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

হিতবাদী বলেন—"গৃহস্থের বর্ত্তমান সংখ্যায় (ফাল্গুন) মহাকবি অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' নামক কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকের সহিত সৌন্দরনন্দের ও অশ্বঘোষের পরিচয় বড় অল্প, এমন কি নাই বলিলেই হয়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।"

বসুমতি বলেন—"'গৃহস্থের কয়েকটী বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব ইহার আলোচনা ও মফস্বলের বাণী। এই দুইটী প্রকরণেই অনেক আবশ্যকীয় কথা থাকে। যাহা জানিলে লোকের উপকার আছে, 'গৃহস্থে' সেইরূপ সন্দর্ভই অধিক থাকে। ইহাতে গল্প উপন্যাস প্রভৃতি স্থান পায় না। প্রত্যেক বিষয়ে বক্তব্য কথাগুলি বেশ গুছাইয়া বলা হয়।"

বঙ্গবাসী বলেন—"গৃহস্থের 'আলোচনা'র আলোচ্য বিষয়গুলি সমীচীন। ইহা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ—প্রথম কয়টী হিন্দুর গৌরব প্রকাশক।"

আনন্দবাজার বলেন—" 'গৃহস্থে'র বিশেষত্ব আলোচনা। আলোচনা-প্রসঙ্গ বঙ্গ-মাসিকের নব সৃষ্টি। এই আলোচনায় অনেক কাজের কথার অবতারণা করা হইয়াছে। কি প্রবন্ধ গৌরবে, কি আয়তনে, কি মুদ্রাঙ্কন পারিপাট্যে সর্ব্ব বিষয়েই গৃহস্থ, মাসিক পত্রের মধ্যে অতি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে। আমরা উত্তরোত্তর গৃহস্থের উন্নতি দর্শনে আশান্বিত হইতেছি।"

মেদিনীপুর হিতৈষী বলেন—" 'গৃহস্থে' গৃহস্থের উপযুক্ত বহু উপাদেয় প্রবন্ধ থাকে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ই গৃহস্থের প্রার্থনীয়। সেইজন্ত 'গৃহস্থ' চতুর্ব্বর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সুযোগে বঞ্চিত হওয়া কাহারই কর্ত্তব্য নহে।"

খুলনার পল্লীচিত্র বলেন—"গৃহস্থ উচ্চ শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্রিকা। "গৃহস্থ" উত্তরোত্তর আদর্শ গৃহস্থ হইয়া গৃহস্থ পূজার্জ্জন করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। যে গৃহস্থ এ গৃহস্থকে সমাদর করিবে তাহার লক্ষ্মীশ্রী পরিবর্দ্ধিত হইবে। আমরা এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি। সমস্তগুলি প্রবন্ধই মনকে শ্রীভগবানের দিকে আকৃষ্ট করে। পত্রিকাখানি অসার কথায় মন মজাবার মত নহে।"

মানভূম বলেন,—"প্রত্যেক শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির গৃহে এক

একখণ্ড গৃহস্থ পত্রিকা থাকা উচিত বলিয়া মনে করি। অন্যান্য নামজাদা, কি সাধারণ যত পত্রিকা আছে, তাহাদের সম্পাদকের কার্য্য প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন। পত্রিকা কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু সম্পাদকের গুরুতর কর্ত্তব্য যে আলোচনা, তাহা কেবল একজন সম্পাদকের কলমে কিছু বাহির হইয়া থাকে; অল্প হইলেও সেগুলি দরকারী। শিক্ষিত কৃতবিদ্য চিন্তাশীল সম্পাদকগণের নিকটেই আলোচনার আশা করা যায়; আর গতানুগতিক সম্পাদকগণ যে ও বিষয়ে হাত দিবেন না, তাহাও সুনিশ্চিত। গৃহস্থের বিশেষত্ব তাহার এই আলোচনা-অংশ।"

এডুকেশন গেজেট বলেন—"এ ভাবে চলিলে গৃহস্থ বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্র হইয়া দাঁড়াইবে। গৃহস্থের কোন স্থলেই কোন সমাজ বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রূপ নাই। পড়িতে গিয়া কোথাও রসভঙ্গ বা ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। গৃহস্থ উচ্চ হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত। আমরা গৃহস্থকে সকল বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে আদৃত হইতে দেখিলে সুখী হইব। কয়েকটি প্রবন্ধ অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। সকল গুলিই সময়ে উদ্ধৃত করিবার উপযুক্ত। সকল গুলিই পড়িতে পড়িতে দেশের প্রতি ধীর গভীর ও পবিত্র প্রীতির আভাষ পাওয়া যায়।

"হাব্‌লুল মাতিন্" (কলিকাতার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত দৈনিক পত্রিকা) বলেন:—'বৈশাখ সংখ্যা "গৃহস্থ" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। নয়খানি সুন্দর চিত্রের সমাবেশে, বর্ত্তমান সংখ্যার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিবিধ তথ্য সমন্বিত এবং সুখপাঠ্য প্রবন্ধের সম্মিলন বাঙ্গালা মাসিকপত্রকে সত্বর ইংরাজি ভাষার শ্রেষ্ঠ ম্যাগজিন (magazine) সমূহের সমকক্ষ করিয়া তুলিবে। গৃহস্থের "আলোচনা" দেশের প্রত্যেক সন্তানেরই পাঠ করা উচিত বিশেষতঃ আলোচ্য সংখ্যা সাময়িকপত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া এক উদার ও বিপুল আদর্শ, সম্মুখে রাখিয়া দেশবাসীর নিকট বিশ্বের সমাচার আনিয়াছে।

মালদহের "গৌড়দূত" বলেন—"'গৃহস্থ' একখানা উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংগৃহীত "আলোচনা" ও "মফস্বলের বাণী" বেশ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।"

"বাঁকুড়া-দর্পণ" বলেন—"বিবিধ প্রবন্ধ সম্ভারে সমলঙ্কৃত হইয়া 'গৃহস্থ' প্রকৃতই গৃহস্থমাত্রেরই হিতকারী বন্ধুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বাহিরের শোভা যেরূপ চিত্তহারিণী, প্রবন্ধগুলিও তদ্রূপ তৃপ্তিকর।"

"বীরভূমবার্ত্তা" বলেন—"আজকাল বাঙ্গালা মাসিকপত্রের মধ্যে এরূপ ধরণের নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ সুবৃহৎ মাসিকপত্র প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রবন্ধগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ।"

"নদীয়া বার্ত্তাবহ" বলেন—"প্রবন্ধের সারবত্তা এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগীতাই 'গৃহস্থের' বিশেষত্ব। গৃহস্থ গতানুগতিকের পন্থাবলম্বী—গল্প উপন্যাস প্রেম কবিতায় পূর্ণ আধুনিক সাহিত্যপত্রের পর্য্যায়ভুক্ত নহে; পরন্ত ইহা নূতন পন্থী—বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রের একান্ত উপযোগী।"

পাবনার "সুরাজ" বলেন—"'আলোচনা'-অংশ 'গৃহস্থের' বিশেষত্ব। প্রবন্ধাংশে বহু সুলিখিত ও সুচিন্তিত বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে কি আয়তনে, কি বিষয়-নির্ব্বাচনে 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রিকার মধ্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার উপযুক্ত।"

বাহুল্য ভয়ে আমরা আর প্রশংসা পত্র দিলাম না। গৃহস্থের প্রবন্ধাবলী ও 'আলোচনার' অংশ বঙ্গবাসী, বসুমতী, নায়ক, এডুকেশন গেজেট, সুরাজ, হাবলুল মাতিন, নদীয়াবার্ত্তা, বিশ্ববার্ত্তা, প্রতিভা, প্রবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সাদরে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

গৃহস্থের বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র।

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীরামরাখাল ঘোষ

২৪নং মিডিল রোড, ইটালী

কলিকাতা

সাহিত্য সম্মিলনের বিভিন্ন বিভাগের মনোনীত সভাপতিবৃন্দ।

ndia Press, Calcutta.

"মনে পড়ে সে বালকে ? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরু ছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
বোধ করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
[illegible] প্রাণে প্রতিভানন্দ অনুভব।

* * * * *

* * * * * কত [illegible],—

কোথা [illegible] ? প্রাণ যার মুক্ত ? পৃথিবীর
সর্ব্বছাপ [illegible] ? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ্ঠ [illegible] এক করি'
উপনীত [illegible] অসীম উপরি ?
দৃঢ়বাহু [illegible] জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বক্ষ ফুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে ভাসিয়া ভাসিয়া—
[illegible] জালশস্ত্র ফেলে কর্ম্মজাল—
"[illegible] মৎস্য" -দৈর্ঘ্যদৃঢ় জাল।
[illegible] অতি সো। ভালবাসে
[illegible] পাড় ওইরূপ হাসে ?
— [illegible], [illegible], আনন্দ জীবন।"

৺সতীশচন্দ্র রায়

৫ম খণ্ড জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ অষ্টম সংখ্যা
৫ম বর্ষ

আলোচনা

১। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সে দিন কলিকাতার বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক হইয়া গেল। এবার এই সম্মিলনকে—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস ৪টী শাখায় ভাগ করিয়া প্রত্যেক শাখায় এক একজন সভাপতি মনোনীত করা হইয়াছিল। আর তাঁহাদের সকলের উপরে একজন কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সম্মিলন-সভাপতি। ঐ বিভাগ চতুষ্টয়ে যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ঐতিহাসিক-প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়

সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। সম্মিলন-সভাপতি ছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মফঃস্বলবাসী জনসাধারণ এবারকার এই সম্মিলন-ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝেন নাই; কারণ এ পর্য্যন্ত সম্মিলনের এরূপ অধিবেশন আর হয় নাই। তাই তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেওয়া প্রথমে আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্য-সম্মিলন, বিজ্ঞান-সম্মিলন, ইতিহাস-সম্মিলন প্রভৃতি নানা প্রকারের সম্মিলন আছে। বৎসরের মধ্যে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিকগণের কেহ কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন কি না, বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত বিভাগের কোন্‌টা কতদূর উন্নতি লাভ করিল—ইত্যাদি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা ঐ সমস্ত সম্মিলনের উদ্দেশ্য।

আমাদের সাহিত্য-সম্মিলন এই সাত বৎসর যেরূপ ভাবে চলিল তাহাতে বুঝা যায় ইহার উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলন সাহিত্য-প্রসারের জন্য একটা অনুষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য—ইংরাজী শিক্ষা ও দীক্ষায় পরিপুষ্ট জনসমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব প্রচার করা, আর যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পায় নাই সেই অগণ্য মূঢ় মূক জনগণকে সাহিত্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা। তাই সাহিত্য-সম্মিলনের মণ্ডপে তিন চারি হাজার লোকের সমাবেশ হয়। ধন-গর্ব্ব ও ইংরাজী শিক্ষার গৌরব থাকে না। সাহিত্য-সম্মিলন-মণ্ডপে কখনও টিকিট ক্রয় বিক্রয় হয় না—এবার তাহা হইয়াছে—যাহারা বাঙ্গালা ভাষা বুঝে তাহারা দেশের মনীষী-দিগের নিকট দেশ সম্বন্ধে আলোচনা শুনে এরূপে শিক্ষিত প্রতিভাবান্‌দিগের সহিত অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতগণের একটা ভাবের ফলে মনীষিগণের চিন্তা সমগ্র সমাজে একটা আন্দোলন আনিবার সুযোগ পায়।

এবারকার সম্মিলনে এ সব উদ্দেশ্যকে একেবারেই বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষগণ নূতন প্রকার আয়োজন করিয়াছেন। সাহিত্যাদি চারিটী শাখায় ইহাকে ভাগ করিয়া তাহাদের পৃথক্ বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়া বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়া বিশেষ আলোচনা দ্বারা স্বীয় স্বীয় বিভাগের উন্নতি ও সংস্কার কল্পে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন ইহা তাঁহাদের মত। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিরাট সাহিত্য সম্মিলনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি আলোচনা-সমিতিতে পরিণত করিয়াছেন।

এই শাখা-বিভাগ লইয়া সম্মিলনে বেশ একটা গোলমালও হইয়াছে। শাখা-বিরোধী দলের সংখ্যা বড় কম ছিল না, তাঁহারা বলিয়াছেন—আমাদের বিশেষজ্ঞ-গণের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা এখন আসে নাই। কাজেই সাহিত্যকে চারিটা বা পাঁচটা শাখায় ভাগ করিবার কি প্রয়োজন? দেশের লোক শতকরা নিরানব্বই জন অশিক্ষিত; যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যশিক্ষিতের দলে। এমত অবস্থায় কতকগুলি বিভাগ করিয়া সম্মিলনের যে একটা উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তাহাতে বাধা দেওয়া কখনই সমীচীন মনে হয় না। এই সম্মিলনের মধ্য দিয়া আমাদের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের দেশের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা-সহানুভূতি জন্মিতেছে। লোকশিক্ষাও কম হইতেছে না। শাখা-বিভাগ হইলে বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করিয়া দুই একটি নিগূঢ় তথ্যের মীমাংসা করিতে পারেন, সত্য। কিন্তু এক এক বিষয়ের প্রকৃত বিশেষজ্ঞগণের সংখ্যাই বা কত? তাঁহারা ত মুষ্টিমেয়, তাঁহারা কি চিঠি পত্রে তাঁহাদের আলোচনা বিবেচনা করিতে পারেন না। যদি নাই বা পারেন, তবে তাঁহারা একটা পৃথক্ আলোচনা সমিতি করুন না কেন, সাহিত্য-সম্মিলনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রয়োজন কি? সাহিত্য-সম্মিলন কখনই কয়েকজন বিশেষজ্ঞের নহে, সাহিত্য-সম্মিলন দেশের, সমাজের, জনসাধারণের, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের। কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষগণ কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে

অনেক যুক্তি-তর্কের পর তাঁহারা বলিলেন অন্ততঃ এবার পরীক্ষা (experiment) করিয়াই দেখা যাক্ যে কি ফল হয়। অবশেষে ভোট দ্বারা বিভাগীয় সভার অধিবেশন স্থিরীকৃত হইল।

আমরা পৃথকীকরণের পক্ষপাতী নহি। যদিও ইতিহাস-শাখার সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবজ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন যে, এই শাখা-বিভাগের দ্বারা আমাদের কাজ সুন্দররূপই চলিয়াছে; যদি আমাদের মত-পার্থক্য থাকিত, তবে নিশ্চয়ই এত লোক আমরা এই সভায় উপস্থিত পাইতাম না। কথাটা কিন্তু আমাদের মতে ঠিক নহে। এক ইতিহাস-সভায় যত লোক সমবেত হইয়াছিল, অপর তিনটী বিভাগে একত্রে তত লোক ছিলেন এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইতিহাস-সভায় যে লোক-সমাগম বহুল হয়, তাহারও যথেষ্ট কারণ আছে। সে সবের আলোচনায় আমাদের কাজ নাই। তবে জিজ্ঞাস্য এই—এটা কি ইতিহাস-সম্মিলন ? তাহা যখন নহে, তখন অন্যান্য বিভাগ গুলিতে যাহাতে সকলে উপস্থিত থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে ? অবশ্য আছে। তাহার ব্যবস্থা করিতে গেলে হয় পৃথক্ সময়ে পৃথক সম্মিলন হউক নতুবা এমন কোন বিশেষ বন্দোবস্ত হউক, যাহাতে আর এরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়। সম্মিলনে আমরা দেখিলাম যে সভার চারিধারে লোকে কেবল হল্লা করিতেছে। সভাটা যেন একটা মজলিস আড্ডা বিশেষ! বিশেষতঃ যে উদ্দেশ্যে এই পৃথক্ সভা অনুষ্ঠিত হইল তাহারও কোন ফল বুঝিলাম না। কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ বলিয়াছিলেন পৃথক্ সভা করার একটা বিশেষ কারণ এই যে সময়ের অল্পতা হেতু আমরা লেখকদিগকে প্রবন্ধ পড়িতে দিবার সুযোগ পাই না। যদি একই সময়ে পৃথক সভা হয়, তবে অনেক প্রবন্ধ পঠিত হইতে পারিবে। কিন্তু এবার দেখিলাম সাহিত্য-সভায় ২৫টী প্রবন্ধের ৪।৫টী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অবশিষ্ট কুড়িটী দুই দিনে পঠিত হইলেও পাঠকদের মধ্যে অনেকেই দুই তিন মিনিট সময় পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সভাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অবশ্য ইতিহাস-বিভাগ বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছিল। অন্যান্য বিভাগে প্রবন্ধ অনেক কম ছিল সুতরাং কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু কথা এই, যদি কুড়িটা প্রবন্ধ হইলেও পাঠক-দিগকে দুই তিন মিনিট সময় দিতে হয়, তবে আর পৃথক বৈঠকে লাভ কি হইল।

আর এক কথা, সম্মিলন-সভাপতির কাজ কি কেবল অভিভাষণ-পাঠ ও ধন্যবাদ-গ্রহণ ? দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম দিন সভায় আসিয়া অভি-ভাষণ পাঠ করিলেন, পরে অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উপস্থিত হইয়াই বা তিনি কি করিতেন ? কোন্ সভায় তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত ? সাধারণ সম্মিলনের দিনে অর্থাৎ শেষ ধন্যবাদের পালার দিনে অবশ্য তাঁহার কাজ ছিল স্বীকার করি। কিন্তু সে কাজও ত বিগত সম্মিলনে যেমন হইয়াছিল —অপরের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত !

উপরোক্ত নানা কারণে আমরা সাহিত্যের পরিচালক ও সম্মিলন-কর্ত্তাদিগকে আর একবার এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। যাহাতে সব দিক আমরা বজায় রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা করা উচিত। এবার সম্মিলনে এইরূপ নানা গোলযোগ হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি। ইহার একটা শেষ মীমাংসা না করিলে সাহিত্যের যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে তাহার আর অবসান হইবে না।

উক্ত গোলযোগসমূহের প্রতিকারকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব হইয়াছে, আমরাও একটি প্রস্তাব করিতেছি। আমরা মনে করি ইহা কার্য্যকরী হইবে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাধারণ সম্মিলনের কাজ হউক এবং বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার জন্য অন্য সময় নির্দ্ধারিত হউক। প্রাতঃকালে তাঁহারা মিলিয়া আলোচনা করিলে কেহই তাঁহাদের কাজে বাধা দিবে না। সেখানে গোলযোগের আশঙ্কাও কম। নতুবা শাখা বিভাগ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ

একই সময়ে আলোচনা করিতে বসিলে একদিকে যেমন দুই চার জন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত হইবেন, অন্যদিকে তেমনি শ্রোতৃবর্গ বিদায় গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা ত সকলেই একেবারেই অজ্ঞ অথবা অ-বিশেষজ্ঞ, সুতরাং এ মিলন ব্যাপার তখন 'বান্ধব'-মিলনে পরিণত হইবে। তাহাতে সাধারণের সহানুভূতি থাকিবে না। ফলে এ প্রকার সম্মিলনের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না।

বাস্তবিক সম্মিলনে এবার যেরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছিল তাহাতে এইরূপ খুলিয়া বলা প্রয়োজন হইয়াছে তাই আমাদের এত কথার অবতারণা। আশা করি, ইহার একটা সুব্যবস্থা হইবে। সাহিত্য-সম্মিলন শেষে কংগ্রেসের অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত নয় কি?

*
* *

২। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রস্তাব

আমাদের দেশ যে কতটা চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই সম্মিলন হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনের গোলযোগও ঐ চিন্তাশীলতারই উদাহরণ। লোকের বিভিন্ন মত তাহার বিভিন্ন চিন্তার পরিচয় দেয়। এটা জীবনের লক্ষণ। জীবনশূন্য জাতির মতামত নাই, তাহার বিবাদ-বিসম্বাদও নাই। কলহ-বিবাদ না থাকে, দলাদলি না থাকে, পরস্পরের মিলন থাকে তাই ত আমরা চাই। কিন্তু জীবনশূন্য জাতির নির্বিকার অবস্থা স্পৃহনীয় নহে। এবারকার সম্মিলনে জীবনবত্তার পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

সাহিত্য-সম্মিলন এবার কতগুলি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা আজকাল আর হেয় ভাষা নয়। যে ভাষা নোবেল পুরস্কার লাভ করিতে পারে, পাশ্চাত্য জাতির নিকট তাহার মূল্য বড় বেশী। শুধু আমাদের নিকট নয়, জগতের নিকট আমাদের ভাষার সম্মান বড় কম নহে। তাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থার জন্য আপাততঃ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের জন্য আমরা সম্মিলনকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহাদের সাধু উদ্যম জয়যুক্ত হউক, এই আমরা কামনা করি।

আর একটী শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব উল্লেখ-যোগ্য। এই প্রস্তাব বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী-শিক্ষা দেওয়ার সমর্থনমূলক। বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালাভাষা দরিদ্র নহে। তাহাতে ভেষজ ও চিকিৎসাবিষয়ক কোন পুস্তকাদি নাই, অথবা প্রণয়ন হইতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং কেন যে আমাদের ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ডাক্তারী শিক্ষা পাইবে না তাহা বুঝি না।

আজকাল ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে। তাহাদের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যোগ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাই পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির ব্যবস্থা যাহাতে হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই মর্ম্মেও আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমরা এখন প্রায় এক সময়েই কতকগুলি সম্মিলন স্থানে স্থানে করিয়া থাকি। তাহাতে সকলে যোগ দিতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে সম্মিলনগুলি যাহাতে বসে, তাহার বন্দোবস্ত করা নিতান্তই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন একটি প্রস্তাবে ইহার জন্যও চেষ্টা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। বেহারে শিক্ষাসমস্যা

বেহার প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি মহাশয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বেহার শিক্ষা বিষয়ে এখনও খুব উন্নত নহে। অতএব সেখানে বিস্তীর্ণ ও গভীরভাবে শিক্ষা-প্রচার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় জীবনের অনুকূল নহে। শিক্ষাটাকে বেশী ব্যয়সঙ্কুল করিলে, তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং সেই জন্য দরিদ্র অতএব বহুসংখ্যক লোক তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। আজকাল দেখা যায়, ভাল বাড়ী, ভাল বেঞ্চ, ভাল চেয়ার প্রভৃতি না হইলে বিদ্যালয় খোলাই কঠিন। কিন্তু প্রাচীন প্রণালীতে এ সবের বিশেষ দরকার ছিল না। তখনকার ধরণে শিক্ষিত লোকেরা কি আজকালকার নব্য-প্রণালীতে শিক্ষিত লোক অপেক্ষা কোন অংশে হীন? হয় ত এই সব আড়ম্বর-আসবাবের অভাবেই অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতেছে! তারপর আর একটা কথা—বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা হয়। ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত শাখা খুলিবার নিয়ম আছে, তাহাতে শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়াইতে হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াইতে চাহেন না। সেইজন্য বেহারের অনেক জেলা স্কুল হইতে বহু ছাত্র প্রবেশাধিকার না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব নিয়মে এ সব উৎপাত ছিল না—তখন ছাত্রের সংখ্যা-বাহুল্য আকাঙ্ক্ষা করা হইত। বাস্তবিক পক্ষে তখনই শিক্ষাটা ব্যাপক করিবার চেষ্টা ছিল—কিন্তু আজ তাহার একেবারে উল্টা হইতে চলিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় অচির সম্ভাব্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহাতে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেন বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। ছাত্রেরা লক্ষ্ণৌ যাইয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। এক প্রদেশের লোক আর এক প্রদেশের উপর কেন নির্ভর করিতে যাইবে? তারপর আট জনের বেশী ছাত্র একযোগে সেখানে যাইতে পারিবে না, ইহাই বা কেন? যাহা হৌক, তাঁহার মতে পাটনা মেডিক্যাল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করাই ভাল, এবং জন-সাধারণের প্রয়োজন অনুসারে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও যতশীঘ্র বেহারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক

একটা প্রস্তাব হইয়াছে, নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন উঠিয়া যাইবে। তৎপরিবর্ত্তে "স্কুল ফাইন্যাল" পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে, অর্থাৎ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, স্কুল ইনস্পেক্টর কিম্বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কোন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা ছেলেদের কলেজে পড়িবার উপযোগিতা স্থিরীকৃত হইলে এবং তদনুসারে তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে। সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাবকে নিতান্তই ভীতিজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষাটাকে ব্যক্তিবিশেষের অধীনে রাখিলে অনেকদিকেই অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। হয় ত যে সব ছেলেদের আত্মীয়স্বজন সমাজ-হিতৈষী, নেতা বা কংগ্রেসওয়ালা, অথবা যে সব ছেলেরা স্বাধীন চিন্তা বা কর্ম্মের পরিচয় দিয়াছে, অথচ রাজনীতির ধারও তাহারা ধারে না, পরীক্ষক তাহাদিগকে সার্টিফিকেটের অনুপযুক্ত মনে করিতে পারেন, এবং তাহা হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছেলেদের কাছে একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবার কথা। অতএব বিষয়টা গভীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। পরীক্ষাটা কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর ন্যস্ত না রাখিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে সব ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিবে, তাহাদিগকে আর একটিবার মাত্র পরীক্ষা দিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। এ নিয়ম প্রবর্ত্তন করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহা

নিশ্চিতই শিক্ষা-বিস্তারের প্রতিকূল। দেখা যায়, অনেক ফেল-করা ছেলেও উত্তরকালে গভীর চিন্তার পরিচয় দিয়াছে—কর্ম্মশক্তি দেখাইয়া দেশের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব পরীক্ষায় দুই একবার ফেল করিলেই অপদার্থ বলিয়া তাহাদিগকে একেবারে বর্জ্জন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য নহে।

৪। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য

ফাঁকি দিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ সাজিবার দিন এখন গিয়াছে। বিদেশী লেখকের দুইএক খানা বইয়ের পাতা উলটাইয়া নিজের দেশের লুপ্ত রত্ন আহরণের চেষ্টা এখন হাস্যকর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। এখন আর দেশ মূর্খ নাই যে তাহাকে ঠকাইয়া সহজে বাহাদুরী লাভ সম্ভব। অনেকেরই চোখ যখন ফুটিয়াছে, তখন চেষ্টাও আমাদের নূতন ভাবে করিতে হইবে। সেই নূতন চেষ্টার ফলে আমরা যাহা আবিষ্কার করিব, হয়ত বিদেশীর পুঁথি হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-যুগে আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলকে শুনাইতেছি,——

"বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে এবং তাহাকেই কুদ্দালী হস্তে ভূগর্ভে অবতরণ করিতে হইবে; গায়ে কাদা লাগিবার ভয়ে বা অতিশয় শ্রমসাধ্য বোধে হটিলে চলিবে না। যিনি অর্থশালী, তাঁহাকে অর্থ দান করিতে হইবে, যিনি শ্রমশীল তাঁহাকে শ্রমস্বীকার করিতে হইবে, যিনি বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে মস্তিস্ক চালনা পূর্ব্বক লব্ধ বস্তুর বিশ্লেষণ করিতে হইবে—যিনি যে কার্য্যে পারদর্শী, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে। এইরূপ বিভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সমাবেশে এই কার্য্যের সূচনা করিতে হইবে, এবং প্রচুর ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিপুণ ও সতর্কভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই বাঙ্গালীর ইতিহাস সংকলিত হইতে পারিবে। ইহা একের কার্য্য নহে, বা শুধু গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে,—ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সমগ্র শক্তি-নিয়োগের প্রয়োজন।"

৫। হিন্দু-মুসলমান-সমিতি

আমরা মুসলমান-সমাজের মধ্যেও বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রভাব বেশ স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের মধ্যেও আত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে। তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দৃঢ়তর মিলন-ভিত্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিরোধভঞ্জন অভিপ্রায়ে কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত করিবার জন্য ঢাকার বিগত "মসলেম লীগ"-সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা এবম্বিধ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করি।

উক্ত সমিতি গঠিত হইলে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে এখনও যে সামান্য একটা বিদ্বেষ-বাধা আছে, তাহা অচিরে দূরীভূত হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে এক হওয়ায় পরস্পরের প্রীতি-সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হইবে। আমরা তখনই যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব—বিধর্ম্মী হইলেও ভারতের মুসলমানগণ ভারতমাতারই সন্তান।

৬। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের স্মৃতিস্তম্ভ

রিয়াজউস্ সালাতিন্ গ্রন্থের নাম ঐতিহাসিকগণের নিকট সুপরিচিত। এই গ্রন্থের রচয়িতা মালদহের লোক ছিলেন। মালদহের সদর সহর ইংরাজবাজারে মিউনিসিপলিটির যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহা তাঁহারই বাস্তুভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। রিয়াজের গ্রন্থকার ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সম্প্রতি মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ এই পরলোকগত রিয়াজ-রচয়িতার এক স্মৃতিস্তম্ভ

নির্ম্মাণ করাইয়া ঐতিহাসিকের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য পরিষৎ সাধারণের নিকট ধন্যবাদার্হ।

আমাদের রত্নপ্রসূ বঙ্গমাতার নিভৃত প্রদেশে এইরূপ কত হারাধনের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, তাহা কে গণনা করিবে? নব্যবঙ্গের অনেক স্থানে ইতিহাস-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, নানা অনুসন্ধান চলিতেছে। অনেক পুরাতন শিল্পগুরু, কবিসম্রাট, জননায়ক, বীর প্রভৃতির বিবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহাদের জন্মভূমিতে এইরূপ স্মৃতিফলক নির্ম্মাণ করান যায় না কি? এই সমস্ত স্মারকলিপি দ্বারা প্রধানতঃ দুইটী বড় কাজ হয়। প্রথমতঃ ইহা দেশের লোককে সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইতে উৎসাহ দান করে। দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা বাহিরের লোকের ঐ দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। রাজসাহীপ্রদেশ বা বরেন্দ্রভূমি না কি বীতপাল, ধীমান্ প্রভৃতি শিল্পগুরুর জন্মস্থান; বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন, বীরভূম জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বাসভূমি; এইরূপ আমাদের প্রত্যেক জেলাতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা সেই সমস্ত মহাত্মাদের স্মরণলিপি নির্ম্মাণ করাইতে দেশবাসীকে অনুরোধ করি।

৭। সামাজিক সরলতা

আজকাল আমাদের সামাজিক সরলতার নিতান্তই অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। সহরের মধ্যেই বিশেষ ভাবে সেটা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পল্লীর নিভৃত নিকেতনে এখনও সহরের বিষ তত প্রবেশ লাভ করিতে পায় নাই। তাই এখনও সেখানে সরলতা বিদায় গ্রহণ করে নাই— শুষ্ক শিষ্টাচারের আড়ম্বর সেখানে খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে সহরকেই যখন সকলে অনুকরণ-স্থল মনে করে, তখন সহরের আবর্জ্জনা গ্রামে আস্তে আস্তে আসিয়া জুটিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখন হইতেই আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের ভাল করিয়া বুঝা উচিত—গ্রামই সমাজ-শক্তির সুযোগ্য ক্রীড়াস্থল, অতএব তাহাকে সহরের আদর্শে বিনষ্ট করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাই সর্ব্ব প্রথমেই আমাদের গ্রামের দিকে নজর দিতে হইবে—আমাদের সমাজে সরলতার সাধন করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় "সাহিত্য"-পত্রিকায় বর্ত্তমান সমাজের সরলতা ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে আক্ষেপ ও আশা দুই ই মিশ্রিত আছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আজকাল বাক্যে এবং ব্যবহারে বাহিরে খুব ভদ্রতা দেখাইতে শিখিয়াছি বা শিখিতেছি, কিন্তু আমাদের ভিতরের সরলতা বা সহৃদয়তা ক্রমশই চাপা পড়িয়া যাইতেছে। যাহাকে তুমি বলিলে চলে, তাহাকে এখন আমরা আপনি বলি, কিন্তু আসল কাজের বেলায় অক্ষম ভাইকেও দু'টি ভাত দিতে নারাজ। ইহাই এখন সামাজিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কথা ঘুরাইয়া বলিতে না পারিলে এ কালের সমাজে বাস করা চলে না, ইহাও এখন অনেকেরই ধারণা। * * অল্প দিন হইতে আমাদের এই শিষ্টাচার-প্লাবিত সমাজে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই যে, দুই একজন বিবাহিত যুবক পিতার শিষ্টাচারে সর্ব্বস্বান্ত শ্বশুরের সাহায্য করিতেছেন। আর গত অর্দ্ধোদয়যোগের সময়ে বাঙ্গালার বালকদিগের ব্যবহারে যে সরলতাময় সৌজন্যের সূত্রপাত দেখিয়াছিলাম, এবার দামোদরের বন্যায় তাহার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছি। বালকেরা সেবার আপনাদের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া মহিলাদের স্নানের নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটে আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। এবার তাহারা শিষ্টাচারবর্জ্জিত হইয়া অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় জল সাঁতরাইয়া যাইয়া বিপন্নের সেবা করিয়াছে। ইহাতেই আশা হয় যে, আবার আমাদের সমাজে মানবহৃদয়ের অমূল্যনিধি সরলতা

ফিরিয়া আসিবে। যে সমাজে সরলতার অবতার পরমহংসদেবের ন্যায় গুরু, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শিষ্য, এবং দয়ার অবতার বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়, সে সমাজ হইতে সরলতা একেবারে ভাসিয়া যাইবে, ইহা মনে হয় না।"

৮। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য-শিল্পের আদর

সম্প্রতি প্যারিসনগরীর বার্ষিক চিত্রশিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতের অনেক চিত্রকলা প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রাচ্য-কলা-সমিতি হইতে এইগুলি প্রেরিত হইয়াছিল। প্যারিসের এই প্রদর্শনীতে প্রাচ্যশিল্পের বিজয়-গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কনশীল সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁহার কলা-পাণ্ডিত্যই এই গৌরবের প্রধান কারণ।

তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রভৃতি আরও অনেক ভারতীয় শিল্পীর চিত্র-কলায় প্রদর্শনী শোভিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে ইউরোপীয় পদ্ধতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু পরে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করেন এবং তাহার অনুশীলন করিয়া বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে এরূপ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার অঙ্কিত চিত্র-দর্শনে পাশ্চাত্যজগৎ বিস্মিত হইতেছেন। ইহাতে কেবল যে তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তৃত হইতেছে তাহা নহে, অনাদৃত প্রাচ্য চিত্রশিল্প পাশ্চাত্য-জগতে ক্রমেই বহু আদর লাভ করিতেছে।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিল্পি-গণের চিত্রকলা ভারতবর্ষীয়দের নিকট যতটুকুই আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হউক না কেন, কিন্তু পাশ্চাত্যজগতে যে তাহা সম্মান লাভ করিল, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কেবল সাহিত্য, দর্শন নহে, প্রাচ্যের প্রত্যেকটী বিষয়ই পাশ্চাত্য জাতিগণের নিকট সম্মানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে যাইতেছে ইহা খুব সুলক্ষণ।

৯। হিন্দু কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি —

"রঙ্গমণ্ডপে যাইয়া দর্শকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে যদি অভিনেতার অভিনয়-কৌশলে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তখন অভিনয় দেখিতেছি বলিয়া আর বোধ থাকিবে না। প্রত্যুত, তখন অভিনীত বিষয় ও পাত্রগুলি প্রকৃত বলিয়া মনে প্রতিভাত হইবে। অভিনেতাকে আর অভিনেতা বলিয়া চিনিতে পারা যাইবে না। বহিঃপ্রাঙ্গণে ও প্রকৃতির নাট্যলীলায় বিমুগ্ধ হইলে, প্রকৃতির নাট্যলীলাকে প্রকৃত মনে করিলে, সেই আদ্যন্তশূন্য নাটকের সূত্রধারকে আর চিনিতে পারা যাইবে না। প্রকৃতিসুন্দরী প্রথমতঃ তোমার যে দুইটী স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্ম্মিত পানপত্র আছে, তাহাকে পূর্ণ করিয়া অফুরন্ত মধুর দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিবে। তুমি বসিয়া বসিয়া সেই মদিরা পান করিবে, আর প্রকৃতির নাটক দেখিবে। পিপাসা বাড়িলেই আবার প্রকৃতির উন্মুক্ত ভাণ্ডারের সুমিষ্ট মদিরা পাইবে। * * * * *

বেদ-গুরুর ন্যায় দাঁড়াইয়া সুবর্ণ-বেত্র ঘুরাইয়া গুরুগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন,—সাবধান! এই পাপ-প্রকৃতির প্রদত্ত পাপ-মদিরা পান করিবে না, কদাচ করিবে না। সেই বৃদ্ধ গুরুর অনুবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন, পুরাণশাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন। এমন কি, ভারতীয় কাব্য পর্য্যন্ত তাহাই

বলিতেছে। তাই বৃদ্ধ আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন, শাস্ত্র তিন প্রকার; রাজতুল্য, বন্ধুতুল্য, কান্তাতুল্য। রাজাজ্ঞায় বিধি ও নিষেধের আজ্ঞা থাকে, যুক্তি থাকে না। বেদের উপদেশেও সেইরূপ বিধি-নিষেধ আছে, যুক্তি নাই। বন্ধু সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ও অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করে। পুরাণেও সেইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন আছে। কান্তা কান্তকে নিজেতে অনুরক্ত, ও অন্যে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে রাজার ন্যায় আজ্ঞা প্রচার করে না, বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিয়া যুক্তি প্রদর্শন করে না, কেবল নিজের সৌন্দর্য্যচাতুর্য্যের আতিশয্য বুঝাইয়া দেয়।

* * *

কাব্যও সেইরূপ অমুক কার্য্য করিবে, অমুক কার্য্য করিবে না, স্পষ্টাক্ষরে বলে না। কিন্তু আখ্যানোক্ত পাত্রদিগের মধ্যে সদ্‌বৃত্ত ও অসদ্‌বৃত্তের চরিত্র এত স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত করে এবং তাহার উত্তরফল—কল্যাণ ও অকল্যাণ—এত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, কাব্যের পাঠক ও দর্শকের পাপে প্রবৃত্তি জন্মে না, পুণ্যে প্রবৃত্তি জন্মে। দুঃখের বিষয়, বঙ্গ-সাহিত্যে সেই ভারতীয় আদর্শের তিরোধান হইয়াছে,—চণ্ডীমণ্ডপে আজ শঙ্খঘণ্টার পরিবর্ত্তে "ক্লারিওনেট" বাজিতেছে; সীতাসাবিত্রীর আসনে আজ কুন্দনন্দিনী উপবিষ্টা!"

*
* *

১০। কাব্যে কাঠিন্য-ধর্ম্ম

পণ্ডিতপ্রবর আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কবিতায় আর বীণার নিক্বণ, বেণুধ্বনি, বংশীরব শুনিতে চাহেন না, এখন চাহেন তিনি কাব্য-সাহিত্যে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জ্জন।

"তারপর ছন্দোবদ্ধ কবিতা। ছন্দোবদ্ধ কবিতারও বড়ই ছড়াছড়ি দেখিতেছি। কিন্তু সমস্তই এক বিষয়ে, সমস্তই প্রেমগাথা।"

* * *

পত্রিকায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বাহির হয়, সেই সমস্ত কবিতার মধ্যে আমরা এইরূপ প্রণয়ের একটা ইঙ্গিত পাই। যেমন নিয়ত মিষ্টরস গ্রহণ করিতে জিহ্বা অসমর্থ, যেমন অবিচ্ছিন্ন মধুর বংশীধ্বনিও কর্ণে মধুবর্ষণ করে না, সেইরূপ বিরতিশূন্য প্রেমকাহিনী শুনিতে কর্ণ অনিচ্ছুক—সেইরূপ ধারাবাহী প্রেমগাথা কর্ণে অমৃতবৃষ্টি করে না। সেই জন্য অন্য রসের অবতারণারও আবশ্যকতা আছে।

একদিন উত্তর গোগৃহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল; একদিন মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপূরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রলয়পয়োনিধির ঘোর গর্জ্জনে বিশ্ববিজয়ী মহারথীদিগকে পর্য্যস্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদখিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে গম্ভীর গর্জ্জন কি আর কবির মুখে শুনিব না? চিরদিনই কি বীণার নিক্বণ, বেণুধ্বনি ও নূপুরশিঞ্জিত শুনিব? বাঙ্গালীর শক্তি নাই, বলিতে পারি না। সে দিনও মেঘনাদবধে বাঙ্গালীর দেবেন্দ্র গভীর ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন, এই জন্য দুঃখ হয়।

কাব্যে রসস্বরূপ ব্রহ্মের পরিচয়

যাঁহারা বলেন আহারের পরে বিশ্রাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় ধূমপানের মত কবিতার প্রয়োজন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। ভিন্ন দেশে তাহা হইতে পারে, ভারতে তাহা নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি আবার বলিতেছি, বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ যেমন অন্তর্মুখীন কবিতাও সেইরূপ অন্তর্মুখীন। ভারতের সঙ্গীত যেমন স্বরের লহর তুলিয়া অন্তরে টানিয়া লয়, ভারতের কবিতাও তেমনি ভাবের তরঙ্গ ছুটাইয়া অন্তরে টানিয়া লয়। ভারতের চিত্র ভারতের ভাস্কর্য্য যেমন চক্ষু ও মুখের ভাবে অন্তর্দৃষ্টি বুঝাইয়া দেয়, ভারতের কবিতাও সেরূপ অন্তর্দৃষ্টি

খুলিয়া দেয়। ভারতের জ্যোতিষ যেমন গ্রহ-উপগ্রহ দেখাইতে দেখাইতে সত্য-লোকে লইয়া যায়, গণিত যেমন এক দুই করিয়া গুণিতে গুণিতে সংখ্যাতীতের সমাচার ঘোষণা করে, কবিতাও সেইরূপ এ রস সে রস বলিতে বলিতে রসস্বরূপ ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করে। সেই জন্য বলিতেছি কাব্য খেলার সামগ্রী, আয়াসের সামগ্রী নয়। কাব্য দিব্যচক্ষুর উন্মীলক, ব্রহ্মসত্তার পরিজ্ঞাপক। এইরূপ বিশিষ্ট ভাব আছে বলিয়া সহস্র চিত্রের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকে টানিয়া বাহির করিতে পারি; এইরূপ বিশিষ্ট ভাব আছে বলিয়া সহস্র কবিতার মধ্য হইতে ভারতীয় কবিতার অবধারণ করিতে পারি। বিদেশে যাহাকে রোম্যান্টিক (Romantic) কাব্য বলে, এ দেশীয় পণ্ডিতেরা তাহাকেই ধ্বন্যাত্মক কাব্য বলিয়াছেন। বাচ্যার্থের উপলব্ধি হইতেছে না—এমন কাব্যকে রোম্যান্টিক বা ধ্বন্যাত্মক কাব্য বলিতে পারি না। তাহা হইলে প্রসাদ-গুণকে জলে ভাসাইতে হয়। বাচ্যার্থের উপলব্ধি না হইলে অক্ষম কবির ভাষায় অস্ফুটতারই দ্যোতনা হয়। যে কাব্য পরিস্ফুটরূপে বাচ্যার্থের উপলব্ধি করাইয়া শব্দে যাহা নাই, বাক্যে যাহা নাই, ইঙ্গিতে এমন আর একটি অর্থ বুঝাইয়া দেয় এবং সেই বাচ্যার্থ অপেক্ষা সেই অর্থের যদি চমৎকারিতা থাকে, তাহাকেই ভারতীয় পণ্ডিতেরা ধ্বনিকাব্য বলিয়াছেন।”

১১। বঙ্গসাহিত্যে দর্শন-চর্চ্চা

দার্শনিকপ্রবর পণ্ডিত যাদবেশ্বর আমাদিগকে বঙ্গসাহিত্যে কতকগুলি সংস্কৃত দর্শনের অনুবাদ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার এস্থলে উপদেশ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য সন্দেহ নাই।

“কাব্যে যে দার্শনিকতা আছে, বিদেশে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই; এ জন্য তাঁহারা রোম্যান্টিক কাব্য কি—লক্ষণনির্দ্দেশ দ্বারা বুঝাইতে পারেন নাই; কিন্তু নিজে অনুভব করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ধ্বন্যাত্মক কাব্য আছে, প্রচুর পরিমাণে নাই, বাড়াইতে হইবে। বাঙ্গালায় অলঙ্কারশাস্ত্র আছে, আলস্য-প্রধান বাঙ্গালী গল্পপ্রিয় বাঙ্গালী তাহা পড়িতে যাইয়া মস্তিষ্কের ব্যায়াম করিতে অসম্মত।

* * *

প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসিকপত্রিকায় একটি দুইটি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতে হইবে; বঙ্গসাহিত্যে তরল বিষয়ের অবতারণা কমাইয়া গভীর বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে।

বঙ্গসাহিত্যে এখনও * * নব্য ন্যায়ের অনুবাদ করিতে কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। মীমাংসা-দর্শনের অনুবাদ হয় নাই, সিদ্ধান্তজ্যোতিষের অনুবাদ হয় নাই। অনেক পুরাণের অনুবাদ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত অনেক স্মৃতিতত্ত্বের অনুবাদ হইয়াছে; একাদশী-তত্ত্বের অনুবাদ হয় নাই। এস্থলে স্বর্গীয় পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্য বড়ই শোকসন্তপ্ত হইতেছি। তিনি রঘুনন্দনের তর্কজটিল মীমাংসাগুলি জলের মত বঙ্গভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে, আমরা অনেক গভীর তত্ত্ব বাঙ্গালায় পাইতাম। ভর্তৃহরি কৃত “বাক্যপদীয়” “বৈয়াকরণভূষণসার”—ব্যাকরণসম্মত দার্শনিক মতের প্রতিপাদক গ্রন্থ, “মহাভাষ্যের” স্থানে স্থানে ব্যাকরণের দর্শনবাদ আছে। এই সমস্ত গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদ হওয়া চাই। বৌদ্ধ দর্শনের ও জৈন দর্শনের বাঙ্গালায় অনুবাদ নাই। বাঙ্গালায় তাহা জানিতে হইবে।”

১২। বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে অনেকগুলি তথ্য ও যুক্তির সন্নিবেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিভাষণ হইতে কতগুলি বিষয়

উদ্ধৃত করিয়া বিভিন্ন নামে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই, কার্য্যে বা কর্ম্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমি এত উর্ব্বরা, বাঙ্গালায় এত শস্য উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায় এত বড় বড় নদী আছে, নৌকাযোগে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত সহজে যাওয়া যায়, ইহার জঙ্গলে এত অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটি অতিপ্রাচীন সভ্যদেশ। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে বাঙ্গালা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা Nineveh ও Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। কিন্তু এ কথা স্থির, বাঙ্গালা নূতন দেশ নহে। যখন আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বাঙ্গালাকে ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হয়।"

১৩। বাঙ্গালীর বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন

"বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল দ্বীপ কোথায়ও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি রাজার জন্য নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও আর একবার খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে এবং উপনিবেশ-সংস্থাপনে। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে; বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কি না জানি না; কিন্তু তাহা সংস্কৃত-মূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত। ফাহিয়ান তমলুক হইতেই গিয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়।

তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতেই যে তামা রপ্তানী হইত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামলজাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়।

* * * *

৭৩২ খৃ অব্দে যখন যশোবর্ম্মদেব কনৌজের রাজা, বৈদিকচূড়ামণি ভবভূতি তাঁহার রাজকবি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈদিকযজ্ঞের জন্য তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাঙ্গলাদেশে আসেন, তাঁহাদের হইতেই বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষ উপকার হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানসন্ততিগণ এদেশে আসিয়া প্রথম প্রথম বড় একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আসিবার পরেই বাঙ্গলাদেশে এক প্রবল বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নিষ্ঠাদিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের হস্তে নানাবিধ রাজকর্ম্মের ভার দিতেন। তথাপি বৌদ্ধগণই এদেশে প্রবল ছিল। কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রাণপণ করিয়া বিচার করিতে হইত। মুসলমানেরা বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার পর এদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের প্রভাব বিস্তার হয় এবং দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্যদেশসমূহ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার গৌরব—শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশে। শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রোর্ণা কেবল বাঙ্গালায়ই পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নিজ বঙ্গে এবং পৌণ্ড্রদেশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে উৎকৃষ্ট ক্ষেমি প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে অন্য দুই একটী দেশেও রেশমশিল্প ছিল, কিন্তু তাহা তত ভাল নহে। ঐ গ্রন্থেই আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তুলার কাপড়ও বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

মগধসাম্রাজ্যে দুইটী মাত্র প্রধান বন্দর ছিল। একটি ভরতকচ্ছ ভড়োঁচ ও আর একটি তমলুক। ভরতকচ্ছ হইতে আরল্-সাগর পার হইয়া লোকে বাণিজ্য করিতে যাইত। এবং তমলুক হইতে পূর্ব্ব উপদ্বীপ চীন ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইত। ভরতকচ্ছের সহিত আমাদের বড় সম্পর্ক নাই, কিন্তু বাঙ্গালা হইতে বহুসংখ্যক লোক জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশে যাইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের দশ ভূমীশ্বর নামক গ্রন্থে লেখা আছে, "তোমরা নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেছ, কর্ম্ম কর, শীলব্রত লও, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিবে এ সকলে কিছু উপকার হইতেছে না। যখন পাটলীপুত্র হইতে কেহ সমুদ্রের পারে ব্যবসা করিতে যাইত, সে ঘোড়া গাড়ী উট বোঝাই দিয়া নানাবিধ দ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া দেখিল এ সকলে কোন কাজই হইবে না। সমুদ্রে উটও যাইবে না, ঘোড়াও যাইবে না, গাড়ীও যাইবে না। তখন নূতন প্রকার যান-বাহনের আবশ্যক হইবে।" সেইরূপ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল শীলব্রতাদির দ্বারা কিছুই হইতেছে না। তখন যানের আবশ্যক। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সমুদ্রযাত্রা সেকালে অভ্যস্ত ছিল। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান তমলুকে জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন।

দশকুমারচরিতে লেখা আছে, তমলুক

হইতে জাহাজে গিয়া তিনি রাক্ষসদের দ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথায় রামেষু নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ হয়। অতদিনের কথায় দরকার নাই; মুসলমান-অধিকারের পরে ১২৭৬ সালেও তমলুকের কয়েকজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু পেগানে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ নামে চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজবংশীদাস লিখিতেছেন যে, চাঁদ সওদাগর সিংহল দ্বীপে ও দক্ষিণে চৌদ্দ দিনের পথ গেলে পর, সমুদ্রে মহা ঝড় উঠে। তাঁহার চৌদ্দখানি জাহাজ ছিল। ঝড়ের মধ্যে তাহার একখানিও দেখা গেল না। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নাবিককে বলিলেন, আমার সর্ব্বনাশ হইল, ইহার কিছু উপায় কর। নাবিক কতকগুলি তেলের পিপা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তেলে সমুদ্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল। তখন দূরে দূরে দেখা গেল চাঁদের একখানিও নৌকা ডুবে নাই।

প্রাচীনকালে কৃষি বিষয়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন। সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষিকার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি হইলেই দেশ সুভিক্ষ হয়। সুভিক্ষ হইলেই ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। হিয়নুসাং বাঙ্গালার তিনটি নগরীতে দশ সহস্র সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ বৌদ্ধদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া হিন্দু ও জৈন ভিক্ষুও যথেষ্ট ছিল। কার্পাস-তুলার চাষের জন্য বঙ্গদেশ বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। তুতের চাষ ভিন্ন রেশম হয় না। তুতের চাষ প্রভূত পরিমাণে না থাকিলে বাঙ্গালাদেশ রেশমশিল্পে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। শন, পাট, ধঞ্চে এখনও বাঙ্গালায় একচেটিয়া, চিরদিনই একচেটিয়াই ছিল।

সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাবা, বালি, মালয় উপদ্বীপ, পেগান প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুদিগের যে উপনিবেশ হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে গিয়া হইয়াছিল, ঠিক জানা যায় না। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে তিনটি প্রধান বন্দর ছিল, মাতুরা, কলিঙ্গনগর ও তমলুক; এই তিনটির মধ্যে তমলুক অতিপ্রসিদ্ধ। তমলুক হইতে নানাদিকে জাহাজ যাইবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনেকে মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিষিদ্ধ, তখন বাঙ্গালীরা কি করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে। কল্পসূত্রকার ঋষি বৌধায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে, আর্য্যাবর্ত্তবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রায় কোন দোষ নাই। যদি কোন দোষ থাকে, সে দাক্ষিণাত্যে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা প্রাচীনকালে অবাধে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং বিদেশে গিয়া মোকাম করিত এবং তথায় বাস করিত। প্রত্নতত্ত্বের প্রভাবে জানিতে পারা যায় যে, মগধদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ কাম্বোডিয়া আনাম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকবার উপনিবেশ এমন কি সাম্রাজ্যও স্থাপিত হইয়াছে। ফরাসীদিগের অধিকৃত কাম্বোডিয়া ও আনামে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীতেও সেখানে ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব ছিল এবং শৈবধর্ম্মের প্রচার ছিল। গত বৎসর ব্রহ্মদেশের যে Archeological Report বাহির হইয়াছে, তাহাতে পেগানে এককালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। Dr. Annandale বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে মালয়দ্বীপে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণদিগকে 'প্রা' বলিত। প্রায়েরা তাহাদিগের প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপনিবেশ কোথা হইতে গিয়াছিল, ঠিক বলিতে পারা যায় না। সকলে বলে মগধ হইতেই গিয়াছিল। মগধসাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল, বাঙ্গালা মগধের মধ্যে ছিল। সমুদ্রযাত্রায় বাঙ্গালাই অগ্রণী ছিল। সুতরাং এই সকল উপনিবেশের অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যায়।

একবার বলিয়াছি, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার যে এত প্রভাব, এত আত্মগৌরব ছিল, বাঙ্গালীরা এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমুদ্রে যাইতে চায় না, উপনিবেশ-স্থাপন ত দূরের কথা। শিল্পবাণিজ্যেও বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। আছে কেবল চাষ, তাহাও ক্রমে একমাত্র পাট ও ধানের চাষে পরিণত হইতেছে। সাহিত্য-চর্চ্চায় যদি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সাহিত্যসেবিগণ যদি আবার বাঙ্গালীদিগকে শিল্পী ও বণিক করিয়া তুলিতে পারেন, সাহিত্যেরও উন্নতি হইবে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইবে, শিল্পবাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। যদি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগকে সংস্কৃতব্যবসায়ী-দিগের ন্যায় ভিক্ষাজীবী হইতে হয় এবং সে ভিক্ষাও না মেলে, তাহা হইলে আমরা যেমন আছি তেমনই ভাল, সাহিত্যচর্চ্চায় কাজ নাই। এইবার বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চ্চার কথা কিঞ্চিৎ বলিব।"

১৪। প্রাচীন বাঙ্গালীর ভাষা

"এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এক-কালে তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। আর্য্যগণ আবর্ত্তে আবর্ত্তে বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর আরও অনেক জাতি বাঙ্গালায় আসিয়াছে। বাঙ্গালার ভাষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সিংহলের ভাষা বড় একটা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এবং সিংহলী ভাষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। এই ভাষা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষা কেমন ছিল, অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কার্য্য এখনও পুরাদস্তুর কেহ করেন নাই। সাহিত্য-সম্মিলন হইতে এই দুই ভাষার তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা একটু আধটু দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ঐ ভাষা সংস্কৃতমূলক। কিন্তু তাঁহাদের কথার উপর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ভাল করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। মধ্যে সিংহলে পালিভাষার বহুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। পালিভাষা সংস্কৃতমূলক। সিংহলে পালিভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ ছিল ও সিংহলে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, এই দুই ভাষার সমালোচনা আবশ্যক। পালিমিশ্রিত সিংহলী ভাষায় কোন কাজ হইবে না। বাঙ্গালাদেশে আমরা আর এক ভাষার সন্ধান পাইয়াছি, উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দগুলি মাত্র বুঝা যায়, আর কিছু বুঝা যায় না। ক্রিয়াপদগুলি এক অদ্ভুত রকমের। এ ভাষারও বিশেষরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। অতি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়া পাইয়াছি; তাহার অনেক idioms বাঙ্গালাতেই আছে, অন্য দেশে নাই। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

১৫। বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্য

যাঁহারা গান লিখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। সিদ্ধাচার্য্যদের মধ্যে যিনি আদি সেই লুই সিদ্ধাচার্য্যেরও গান পাইয়াছি। তিব্বতীয়েরা সিদ্ধাচার্য্যদিগের সকল গ্রন্থই আপনাদিগের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা সিদ্ধাচার্য্যদিগকে আজিও পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধাচার্য্যেরা যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহাকে সহজীয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বলে। সহজীয়া ধর্ম্ম কি, এখানে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতাম যে সহজীয়া ধর্ম্ম চৈতন্য-সম্প্রদায় হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বৌদ্ধ সহজীয়ার মত চৈতন্য দেবের প্রায় আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ লুই সিদ্ধাচার্য্যের গ্রন্থ ক্রমে দুর্ব্বোধ হইয়া আসিলে উহার টীকার আবশ্যক হয় এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০০০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উহার সংস্কৃত টীকা লিখেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালা হইতে তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংস্কার করেন। সুতরাং তিনি একজন

খুব বড় লোক ছিলেন। তিনি যখন লুইএর পুস্তকের টীকা করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে তিনি লুইকে একজন পুরাতন ও বড়লোক বলিয়া মনে করিতেন। বাঙ্গালায়ও লুইএর নাম একেবারে লোপ হয় নাই। ময়ূরভঞ্জে এবং পশ্চিমরাঢ়ে এখনও তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। দ্বারিক লুইএর নিজের চেলা। দারিকেরও গান পাওয়া গিয়াছে এবং আরও অনেকগুলি প্রাচীন সহজীয়া কবির গান পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণাচার্য্য এই মতের একজন বড় লেখক। তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় এই মতের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় তাঁহাকে কানু কহে। তাঁহার গানগুলি অতি সরস ও মিষ্ট। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে "কানু ছাড়া গীত নাই।" আমরা মনে করি এ কানু আমাদের কৃষ্ণ কানাই। যেহেতু এখন গান লিখিতে গেলেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলাই লিখিতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের এ প্রাদুর্ভাব চৈতন্যের পর; এ প্রবাদ-বাক্যটি কিন্তু তত নূতন বলিয়া বোধ হয় না। সেই জন্য আমি বিবেচনা করি এ কানু সেই প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু। সরোরুহপাদ বা সবহ সহজীয়া ধর্ম্মের আর একজন কবি। তাঁহার অনেকগুলি দোঁহাও পাইয়াছি। তিনি ব্রাহ্মণ মানেন না, জাতিভেদ মানেন না। ঈশ্বর মানেন না। ক্ষপনক ধর্ম্ম মানেন না। সৌত্রান্তিক মত মানেন না। তিনি বলেন বুদ্ধদেব সহজীয়া মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন ও সহজীয়া মত গুরুর মুখ ভিন্ন জানা যায় না। তাঁহার মতে মানুষের মন সহজেই মুক্ত। ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বদ্ধ না করিলে কে তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে? অদ্বয়বজ্র তাঁহার দোঁহাকোষের টীকা করিয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধার করিয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত রাজা রামপালের রাজত্বের ২৫ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামপালের রাজত্ব ৪২ বৎসর। ১০৬০ হইতে অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। অদ্বয়বজ্র তাঁহার পূর্ব্বে। সরোরুহ তাঁহারও পূর্ব্বে। সুতরাং বাঙ্গালায় মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইবার তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে, গান ও দোঁহা রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সময়ে আরও অনেক বাঙ্গালা গীত ও ছড়া লেখা হয়। আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই 'ধান ভানতে মহীপালের গীত'। সুতরাং মহীপালের গীত বলিয়া একটা জিনিষ সেকালে ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপাল ছিলেন। তাহার মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, সারনাথে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (১০২৬)। মহীপালের গীত পাওয়া যায় নাই। মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের গীত পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই রাজা ছিলেন। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে ইঁহাদিগকে লইয়া আসা যায় না। বরং কিছু পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহাদের গীতগুলি যেমনটি লেখা হইয়াছিল তেমনটি পাই না। কারণ সেকালের লেখা পুঁথি পাওয়া যায় নাই। হয় যাহারা গায় তাহাদের মুখ হইতে লিখিয়া লইতে হইয়াছে, অথবা একালের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে; এমন কি নূতন ভাবও প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক বিভক্তিযুক্ত শব্দ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি যে সহজীয়া গীত, গান, ছড়া ও দোঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি বদল হয় নাই। যে পুঁথিগুলি পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান-অধিকারেরও পূর্ব্বের লেখা। পুঁথিগুলি পাকানো তালপাতায় লেখা, সে তালপাতা প্রায় কাগজের মত, আর অক্ষর সেই সেকালের বাঙ্গালা। পুঁথিগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ঐ কালের যে সমস্ত তারিখ-ওয়ালা পুঁথি আছে, তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা আছে। তাই মনে হয় যদি তিব্বতী ভাষার গ্রন্থ সব খোঁজা যায়, আরও অনেক বাঙ্গালা গানের তর্জ্জমা পাওয়া যাইবে। হয় ত তিব্বত দেশে এই সকল

বাঙ্গালা গানের পুঁথিও আছে। সাহিত্য-সম্মিলনের একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে এই সকল বিষয়ে অন্বেষণ হয় তাহার বিষয়ে চেষ্টা করা।

* * *

পালবংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃঃ ৮০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা যে কেবল ব্যবসায়ের জন্য নানা দেশে যাইত, তাহা নহে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্যও নানা দেশে যাইত। তিব্বতে তেঙ্গুর নামে ২৫২ volume বই আছে। ইহা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহের তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা। ইহাতে প্রায় ৩০০০ পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। তর্জ্জমায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থকার কোন্ দেশের লোক তাহার নাম, তর্জ্জমাকর্ত্তার নাম প্রায়ই লেখা আছে। তর্জ্জমাকর্ত্তা প্রায়ই দুইজন থাকিতেন। একজন ভারতবর্ষীয় ও আর একজন তিব্বতীয়। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বাঙ্গালীই অধিক। এই তর্জ্জমা সপ্তম শতাব্দীতে আরম্ভ হয় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেষ হয়। এই তেঙ্গুরের এখনও পূরা catalogue হয় নাই। তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের কিছু কিছু catalogue হইয়াছে। সেই অল্প catalogue মধ্যেই আমরা প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালীর নাম পাইয়াছি। এই ৫০ জনের মধ্যে বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্গদেব কর্ম্মপালের সমকালীন। তাহা হইলেই বুঝা গেল বৃদ্ধকায়স্থ খৃঃ ৮০০ সালে বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা অনেক কায়স্থ, তেলী ও সাহাদিগের নাম পাইয়াছি। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিব্বতীয়দিগের গুরু ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেও তাঁহারা সমস্ত তিব্বত দেশ নূতন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক সময় মনে হয় নেপাল আগে বোধ হয় বাঙ্গালীরই উপনিবেশ ছিল। ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক পুরাতন কথা আছে। একটা কথা এই যে বাঙ্গালায় শান্তিপুর নামে এক নগর ছিল। তাহার তিন দিকে গড় ছিল, একদিকে মাত্র রাস্তা ছিল। সেখানে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হন। সিদ্ধাচার্য্য হইলে তাঁহার নাম হয় শান্তিকর। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভুক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এখন স্বয়ম্ভুক্ষেত্র নেপালী, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান। শান্তির ভনিতাওয়ালা দু'চারিটী গান পাওয়া গিয়াছে। সে শান্তিও সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। জানি না দুই শান্তি এক হইবে কি না। শান্তির গানগুলিতে ভাষার একটু বৈচিত্র্য আছে। তাঁহার ক্রিয়াবিভক্তির সহিত অন্য গানের ক্রিয়াবিভক্তি মিলে না।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে যখন রাজবিপ্লব ঘটে, তখন সেখানে রামগুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত নামে দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। ইহারা বাঙ্গালা অক্ষরে পুঁথি লিখিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইহারা বাঙ্গালীই ছিলেন। মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালার বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ নেপালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে করিয়া অনেক পুঁথি লইয়া যান। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস অন্বেষণ করিতে গেলে এই সকল পুঁথিই আমাদের প্রধান অবলম্বন করিতে হইবে। নেপালের না কি জল-হাওয়া ভাল, তাই সে সকল পুঁথি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই, এখনও খুঁজিলে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।

* * * *

আবার বলি আমরা বাঙ্গালী, আত্মবিস্মৃত জাতি; আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এককালে আমরা শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশ-স্থাপনে দক্ষিণ এসিয়ার মধ্যে প্রধান জাতি ছিলাম। ধর্ম্মপ্রচারেও বাঙ্গালীরা বড় কম ছিল না। সেদিনও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাঙ্গালীরা মণিপুর, আসাম, উড়িষ্যা ও বেহার চৈতন্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে এবং রাজপুতনার সুদূর মরুস্থলীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। অল্পদিন হইল বাঙ্গালীরা ইংরাজ-রাজের উৎসাহে উৎসাহিত ইহয়া

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের ও ইংরাজরাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। তাহাদের যত্নে, অধ্যবসায়ে ও উদ্যমে বাঙ্গালাসাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্যে সর্ব্বোপরি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সমবেত বাঙ্গালী লেখকমণ্ডলী সেই সাহিত্যকে সৎপথে চালিত করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন। পূর্ব্ব-গৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস।

১৬। বাঙ্গালীর অনাবিষ্কৃত ইতিহাস

বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুঁথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্ত্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম দেশ, যাবা দ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া এমন কি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নূতন নূতন কথা জানা যাইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিতান্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না। দেশের মধ্যে কত কাজ পড়িয়া আছে। সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহের পিতা কোথায় রাজত্ব করিতেন এবং কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহার আমরা কিছুই জানি না। অশোকেরও পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভারতের একটি প্রধান নগর ছিল। কিন্তু তাহা বঙ্গের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার কিছুই জানি না। এই যে নাথেরা আবির্ভূত হইয়া নানাদিকে শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী কি প্রকারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, কোথায়ই বা জন্মিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানি না। এই যে বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যেরা এত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন কথা জানি না। এই যে ভারতবর্ষে, বিশেষ বাঙ্গালায়, বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল বলিয়াই শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা কোথায় গিয়াছে? কেমন করিয়া গিয়াছে? তাহাই খুঁজিতেছিলাম। শেষে অল্পায়াসেই বুঝা গেল বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও লোপ হয় নাই। কয়েকজন অনুসন্ধানকারীর চেষ্টায় এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালায় অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও চারিদিক ব্যাপিয়া আছে। আমাদের চক্ষু নাই, তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

* * * *

একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন। ইতিহাস খুঁজিবার জন্য ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই পুরাতন জায়গা সকল খোঁড়া হইতেছে। পুরুষপুর, তক্ষশীলা, শ্রাবস্তী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে কত গূঢ়তত্ত্ব বাহির হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালায় এখনও এক কোদাল মাটিও উল্টান হয় নাই। সপ্তগ্রাম একটু আধটু খুঁড়িলে অনেক খবর পাওয়া যাইবে। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণ, বিহার, বল্লালঢিপি অনেক কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে। বলিবে এ সকল কথা অল্পদিনের; কিন্তু যাও না পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে, যাও না গৌড়ে, যাও না কর্ণসুবর্ণে। এ সকল জায়গা ত আধুনিক নহে, এ সকল খুঁড়িলে অনেক পুরাতনতত্ত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে বিষয়ে উদ্যম কই, অধ্যবসায় কই? এইরূপ সম্মিলন হইতেই তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

১৭ আমাদের অক্ষমতা

গত বৎসর বৈশাখের সংখ্যায় "ডাকাতী নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে আমরা 'ঢাকা হেরল্ডে'র মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। অস্ত্রহীন পল্লীবাসী ডাকাত ধরিতে বা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহে। তাহা সেই মতে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ঢাকা হেরল্ড' তাই গ্রামবাসীকে অস্ত্র প্রদান এবং অস্ত্র-চালনায় শিক্ষিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কুমিল্লার প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি মহাশয়ও সেই কথাটা

উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "রাজনৈতিক অপরাধকারীর সংখ্যা কম হইলেও বড় শক্তিশালী এবং দূরধিগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পুলিশ তাহাদিগকে অনেক সময়েই ধরিতে পারিতেছে না। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে তাঁহাদের এই কঠিন কার্য্যে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে যেরূপ সাহায্য আবশ্যক, তাহা করিতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্য এখনও গ্রহণ করেন নাই অথচ আমাদিগকে উদাসীন কপট এবং এমন কি ষড়যন্ত্র-আন্দোলনের সহানুভূতিপরবশ বলা হইয়াছে। আমরা উদাসীন এ কথা স্বীকার করি. কেননা এ পর্য্যন্ত আমরা প্রতি বিষয়েই, বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ঔদাসিন্য দেখাইয়া আসিয়াছি—তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদিগকে কেহ চাহে না। যাঁহারা আমাদিগকে অসরল বলিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা কি জানেন না যখন কোন জাতি, তাহার রাষ্ট্র-পালনের যোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার সাহায্য করিবার সমস্ত শক্তিই লুপ্ত হইয়া থাকে? তাঁহারা কি উপলব্ধি করিতে পারেন না যে, অস্ত্র আইনের ফলে জাতির চরিত্রের কতদূর অবনতি হইতে পারে?

"গবর্ণমেণ্ট ও ব্যক্তিবর্গ এক সঙ্গে কাজ করিয়া যাহাতে অসৎ রাজনৈতিক আন্দোলন উচ্ছেদ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা ইংরাজ-রাজনীতিবিদের পক্ষে সম্ভবপর কি না একবার ভাবিয়া দেখিতে গবর্ণমেণ্টকে কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? আমরা কি শুধু জনসাধারণের মত তৈয়ারী করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইতে থাকিব? শুধু মত প্রকাশ ছাড়া আর কোন অধিকতর কার্য্যকর ভাবে আমরা কি গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার সুযোগ পাইব না? তবে কথা হইতেছে এই, যে জাতি একেবারেই নিরস্ত্র, সে জাতি গবর্ণমেণ্টকে অন্য কি প্রকারে সাহায্য করিলে সাহায্যটা কার্য্যকর হইতে পারে? যে সকল যুবক সেদিনকার বর্দ্ধমান বন্যার সময় সাহস, নেতার আজ্ঞা-পালন ও সেবাপরায়ণতা দেখাইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যাপারে কি আনয়ন করা যায় না? তাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিচালনে শিক্ষিত করিয়া তোমরা যাহাদিগকে আধুনিক ঠগ বলিতেছ তাহাদিগের বিনাশ-সাধনে নিযুক্ত করা কি আধুনিক রাষ্ট্রনীতির নিতান্তই বহির্ভূত? ইংরাজ-রাষ্ট্রবিদের কৌশল কালোপযোগী ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া আমাদিগকে নিজেদের গর্ব্ব অনুভব করিতে এবং আমাদের সকলের উপর যে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে, তাহার যথার্থতা প্রমাণ করিতে কি একবার সুযোগ দিবে না?"

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় আরও বহু প্রয়োজনীয় ও জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে সেগুলির অনুবাদ ও সম্যক আলোচনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি আমাদিগকে স্বাবলম্বন নীতি গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় বিগত সম্মিলনে যে সুর বাঁধিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। জেলায় জেলায় পরগণায় পরগণায় গ্রামে গ্রামে একটা বিরাট সংঘ যাহাতে সংগঠিত হইয়া উঠে, তাহার আয়োজন করিতে তিনি মন্ত্রণা দিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের সঙ্ঘশক্তি না বাড়িলে কখনই কোন জাতির রাজনৈতিক আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'জগতে কেহই—শাসক-সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই—দুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত্ত, অজ্ঞ এবং একতাভ্রষ্ট ভিক্ষুকগণের মনোভাব গ্রাহ্য করে না। কিন্তু এটা যেন ভুল না হয় যে, আমরা ভিক্ষুক ততদিন যতদিন আমরা অজ্ঞ, ম্যালেরিয়া-পীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত একতাভ্রষ্ট এবং অসম্বদ্ধ।"

সভাপতির অভিভাষণ *

গত বর্ষে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, আচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারি নাই। বোধ করি আমার এই অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন বন্ধুগণ বর্ত্তমান বর্ষে বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্বের ভার আমার উপর অর্পণ করেন। এই বিষয়ে তাঁহারা আমার মতামতের অপেক্ষামাত্র রাখেন নাই। যোগ্যতা বিচার দূরে থাকুক, যেরূপ দৈহিক অবস্থা না হইলে এইরূপ সভার নেতৃত্বগ্রহণ কখনই সম্ভবপর হয় না, দুই বৎসর হইতে আমার সেই অবস্থাই নাই। যোগ্যতা এবং ক্ষমতা উভয়ের অভাবসত্ত্বেও সভার পরিচালন কিরূপে সাধ্য হইবে, সে বিষয়ে আমি তাঁহাদের উপদেশপ্রার্থী হইলেও তাঁহারা আমাকে সে উপদেশটুকু দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সভাপতিত্বের গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে, এই সংবাদ যখন আমার নিকট পৌঁছিল, তখন শুনিলাম এই ভার অস্বীকারেও আমার স্বাধীনতা নাই। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সদ্য যে আসন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই আসন গ্রহণে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে মনে মনে একটু শ্লাঘা এবং আনন্দ পাই নাই, এই কথা বলিলে মিথ্যা উক্তি হইবে। হয় ত সেই শ্লাঘার বশীভূত হইয়াই এ বিষয় লইয়া আর গণ্ডগোল করি নাই, কিন্তু সম্প্রতি ঘটনাক্রমে আমার দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র এরূপ আহত ও অবসন্ন হইয়াছে যাহাতে এই গুরুভার গ্রহণে নিতান্ত অসমর্থতার পরিচয় হইবে, ইহা বুঝিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম, এবং তৎসঙ্গে কোন যোগ্যতর পাত্রে এই ভার ন্যস্ত হয়, এইরূপ বিনীত নিবেদনও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার করুণ কাহিনী তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র করিল না। বিজ্ঞানসভার নেতৃত্ব-কার্য্যে যোগ্যতা বা ক্ষমতা কিছুরই প্রয়োজন নাই, সম্মিলনের অধ্যক্ষগণ কিরূপে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমার নিকট উৎকট সমস্যা থাকিয়া গেল। কিন্তু বঙ্গদেশের এই কেন্দ্রস্থলে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর পুরোভাগে আসীন হইয়া হংসমধ্যে বকের ন্যায় কিরূপ শোভমান হইব, ইহা মনে করিয়া আমার দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র কিরূপে কম্পিত হইতেছে, আমি স্বয়ংই তাহার ভুক্তভোগী। যাহা হউক, অধ্যক্ষগণ আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই মহতী সভার পুরোভাগে না দাঁড়াইলেও আমার চলিতে পারে। সেকালে নিয়ম ছিল, এবং একালেও হয় ত বহুস্থলে প্রথা আছে যে, রাজদরবারে বা গুণিগণের সভায় কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে নকিব ফুকরায়, অর্থাৎ, একটা লোক যাহার মূর্ত্তি এবং বেশভূষা সভাস্থ জনগণের হাস্য-উৎপাদনে সমর্থ, সে অতি উচ্চকণ্ঠে প্রায় অবোধ্য ভাষায় সভার কার্য্যারম্ভ ঘোষণা করিয়া দেয়। বুঝিলাম, বর্ত্তমান সভায় সেই নকিবের কার্য্য

* কলিকাতা বঙ্গীয়সহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখায় পঠিত।

করিলেই আমি অব্যাহতি পাইব এবং আমার বন্ধুগণ আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় নকিবের উচ্চকণ্ঠ আমার নাই, তবে বন্ধুগণের পরিতোষের জন্য আপনাদের মত বিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর সম্মুখে কয়েক মিনিটের মত গলা জাহির করিয়া কার্য্যারম্ভের ঘোষণা করিয়া দিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি। আমার অবস্থা দেখিয়া আপনাদের অন্তরে যদি হাস্যরসের সঞ্চার হয়, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইব না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন এবং তৎসংসৃষ্ট বিজ্ঞানশাখা যদি দেশের স্থায়ী অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায় এবং এতদ্দ্বারা দেশের যদি কোন স্থায়ী হিত সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে কোন ভবিষ্যৎকালে এই অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের প্রয়োজন হইতে পারে। আজিকার বিজ্ঞানসভায় আমি আর কোন কার্য্য করিতে না পারি, ভবিষ্যতের সেই ইতিহাসলেখকের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া যাইতে পারি। এ কাজটাও নকিবের কাজের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা-গ্রহণের পর একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য-পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা এবং অন্যের উপদেশ গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার সূচনা হইতে পারে। বিলাতের British Association for the Advancement of Science যেমন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন নগরে উপস্থিত হইয়া নূতন জ্ঞানের আহরণ ও পুরাতন জ্ঞানের প্রচার করিয়া থাকেন, সাহিত্য-পরিষদও সেই পথে চলিতে পারেন। British Association কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরই আলোচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে ঐরূপ বিজ্ঞান-সভা গঠিত হইবার এখনও সময় হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎকে সাহিত্যের সকল বিভাগেই কাজ করিতে হইবে। আজ যদি আমি স্বীকার করি যে, রবীন্দ্রনাথের এক একটা কথা এক এক সময়ে মন্ত্রের ন্যায় আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে নিতান্ত ক্ষীণজীবী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। এই প্রস্তাবটিও তদবধি আমার মোহ জন্মাইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লোকবল এবং ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষীণশক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিন্তা বহুরাত্রি আমার নিদ্রার

ব্যাঘাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ১৩১২ সালের শেষভাগে হঠাৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা হয়। রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এবং বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রায় এক সঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণকে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। বরিশালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু বরিশালের সাহিত্য-সম্মিলন সেই বৎসর বরিশালে আহূত রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের পুচ্ছ আশ্রয় করিতে যাওয়ায় সম্মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পর বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানও দৈবক্রমে নিষ্ফল হয়। তার পর বৎসর কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের আহ্বানে সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ঘটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের সেই প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান-আলোচনার বিশেষ কোন সুবিধাই ঘটে নাই। পর বৎসর রাজসাহী হইতে নিমন্ত্রণ আইসে। সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়, সম্মিলন কোন্ পথে চালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। সাহিত্যের নানা বিভাগের সম্যক্ আলোচনার জন্য সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান এই তিন শাখায় আপাততঃ বিভাগ করা যাইতে পারে, এই অভিপ্রায় আমি জানাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য ব্রিটিশ আসোসিয়েশনের আদর্শ আমার মনে জাগিতেছিল। শশধর বাবু এককালে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্থিমজ্জা বৈজ্ঞানিকের ধাতুতে নির্ম্মিত। নানা মাসিকপত্রে মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে আনন্দজনক ও অন্য শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। Eugenics বা মানবজাতির উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেশ মধ্যে লোকের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের যে সব ছাপান তালিকা ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার গৃহস্থগণও সম্ভবতঃ ভীত হইয়া পড়িতেছেন। গৃহস্থের জীবনের খুঁটিনাটি তত্ত্ববার্ত্তা সম্বন্ধে Life Assurance Companyদের ছাপান তালিকা ইহার নিকট হারি মানে। রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনকে শশধর বাবু যেরূপে প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পরিণত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেবার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা শশধর বাবুর সূত্রচালনায় রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ঘনঘটা হইয়াছিল। পর বৎসর ভাগলপুরে এবং তৎপর বৎসর ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ জটলার অবসর পান নাই। তবে ময়মনসিংহে স্বয়ং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটাই বৈজ্ঞানিকের অভিভাষণ। পৃথিবীর যে কোন বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে উহা সাদরে গৃহীত হইতে পারিত। তদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলনে তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তত্ত্ব সকল সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তিনি একটা নূতন পথ দেখাইয়া দেন। পর বৎসর ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভিন্ন শাখায় বিভাগের প্রস্তাব যথারীতি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তখন তখন উহা কার্য্যে

পরিণত হয় নাই। পর বৎসর হুগলীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া যে কয়েক জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কতকটা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। শশধর বাবু এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকদিগের একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইয়াছিল এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর বৎসর চট্টগ্রামে আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই; কিন্তু যে কয়েকজন বিজ্ঞানসেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মিলনের এই বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস এই চারি শাখায় সাহিত্য সম্মিলনকে বিভক্ত করিবার কল্পনা হইয়াছে, এবং আমার উপর বিজ্ঞানসভার নকিবি-ভার অর্পিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ শাখা-বিভাগ সর্ব্বত্র সাধ্য হইবে কি না বলা দুষ্কর। কলিকাতার পক্ষে যাহা সাধ্য, স্থানাভাব, কালাভাব এবং লোকাভাবে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র নগরগুলির পক্ষে তাহা সাধ্য না হইতে পারে। অন্য শাখার কথা বলিতে পারি না, বিজ্ঞান-শাখা এই কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যে স্বাতন্ত্র্যটুকু অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে সহজে প্রস্তুত হইবেন কি না সন্দেহ।

এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাখার একটু বিশেষ আবদারের কারণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ যে ভাষায় আপনাদের মধ্যে কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বোঝেন, জন সাধারণের তাহা বোধ্য নহে। তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের চিন্তার প্রণালী, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী কতকটা অদ্ভুত গোছের। তাঁহারা যে পথে, যে প্রণালীতে, যে মন্ত্রের সাধনা করিতেছেন, তাহা অধিকারী ভিন্ন অন্যের পক্ষে সুগম নয়। তাঁহাদের সাধনা-ক্ষেত্রে দীক্ষিত ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। তাঁহারা পরস্পর কথা কহিবার সময় যে সকল সঙ্কেতের, যে সকল ইঙ্গিতের, প্রয়োগ করেন, সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি মাত্র। সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে যে না পারা যায় এমন নয়, তবে তাঁহারা নিজের সাধনায় এত ব্যস্ত যে, সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিয়া তাহার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিবার অবকাশ তাঁহাদের একেবারে নাই। সে প্রবৃত্তিও সকলের নাই। এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সাধনার পথ সর্ব্বত্রই দুর্গম এবং সাধকেরা সর্ব্বত্রই আত্মগোপনে অভ্যস্ত এবং দূরে থাকিতে উৎসুক।

বাঙ্গালাদেশে ইহার মধ্যে যে একটা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বা বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে। এদেশে যাঁহারা স্বাধীনভাবে বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা এখনও অঙ্গুলি-সংখ্যায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে যে একটা নূতন হাওয়া বহিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ দেশের কতিপয় বিজ্ঞানসেবী যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এতকাল আমরা সম্পূর্ণভাবে পর-মুখাপেক্ষী ছিলাম। দূরদেশে কে কি নূতন

তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, গলা বাড়াইয়া দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিতাম; কে কি নূতন কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ থাকিতাম। যাহা দেখিতাম এবং শুনিতাম, তাহাই প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, ইহাই আমরা জানিতাম। এইরূপে দেখিয়া এবং শুনিয়াই আমাদের জীবন ধন্য হইল মনে করিতাম। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া জগতের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার আমাদের দ্বারা যে হইতে পারে, সে ক্ষমতা যে আমাদের থাকিতে পারে, এ বিষয়েই আমাদের সন্দেহ ছিল। বোধ করি এখনও বিশ বৎসর অতীত হয় নাই, Asiatic Societyর তাৎকালিক সভাপতি Sir Alexander Pedler কতকটা ক্ষোভের এবং কতকটা তিরস্কারের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে Asiatic Societyর কাগজপত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এদেশের লোক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একান্ত অক্ষম। বিশ বৎসর একটা জাতির জীবনে অধিক দিন নহে, কিন্তু Asiatic Societyর এখনকার সভাপতি বোধ হয় সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। Asiatic Societyর পত্রিকায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রমাণ পাওয়া যাইত না, পাশ্চাত্য দেশের বিবিধ বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকা উদ্ঘাটন করিলেই আজকাল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত নাই, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কৌমুদীতে এই সভা প্রদীপ্ত হইতেছে। সভাস্থানে আর যে সকল নমস্য বিজ্ঞানাচার্য্যগণকে সমবেত দেখিতেছি, তাহাতে কেবল এই সাহিত্য-সম্মিলনী যে দীপ্তিলাভ করিয়াছে এমন নয়, বঙ্গদেশের এই সাহিত্যকেন্দ্র হইতে যে আলোকের বিকীরণ আরম্ভ হইয়াছে এবং যাহা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া দেশ বিদেশে প্রতিফলিত হইবে, তাহা মনে করিয়াই আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গের এই ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্গজননীর আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকের উপরে মঙ্গল পুষ্পের ন্যায় বর্ষিত হউক। যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া আছি, তাহা আমার জীবনের এই অপরাহ্ণ কালে ভগ্নদেহে সামর্থ্য দান করিবে। পৃথিবীর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অধঃশয্যায় শয়ানা আমার প্রাচীনা জননী ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৌরবের মুকুট পরিয়া জগতের সম্মুখে পুনরায় দণ্ডায়মান হইবেন, এই আশা অন্তিমদিনে আমার বলাধান করিবে।

বলা বাহুল্য জগতের বিজ্ঞান-মন্দিরে আমরা এখনও শিক্ষার্থী এবং আরও বহু দিন ধরিয়া আমাদিগকে শিক্ষার্থী থাকিতে হইবে। যে সকল বৈদেশিক আচার্য্যগণের পদপ্রান্তে বসিয়া আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, যাঁহাদের প্রসাদে আমরা পার্থিব জীবনের ধূলি ঝাড়িয়া জীবনকে মধুময় করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরদিন প্রণত থাকিব। জাগতিক বিধানে সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্রের দ্বারায় অপিহিত ও আচ্ছাদিত রহিয়াছে, প্রতিভা-বলে এবং সাধনা-বলে যাঁহারা সেই জ্যোতির্ম্ময় আবরণ ভিন্ন করিয়া সত্যের কোন না কোন দেশ দেখিতে পান, যে দেশেই বা যে জাতি মধ্যেই তাঁহাদের জন্ম হউক, তাঁহারাই ঋষি। এদেশের প্রাচীন দার্শনিকেরাই বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আর্য্যে এবং ম্লেচ্ছে কোনরূপ লক্ষণ ভেদ নাই।

যেখানেই আমরা আলোক দেখিব, সেই-খানেই আমাদিগকে পতঙ্গবৃত্তি হইয়া দৌড়িতে হইবে, কিন্তু তাহাতে পতঙ্গের মত জীবনের নাশ না হইয়া জীবনের বর্দ্ধন হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান-মন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনা-মন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্ম-প্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে উর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম বস্তুতই নিষ্কাম ধর্ম্ম। কর্ম্মেই তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্ব্বাচন চলিবে না। এই জন্যই দেখিতে পাই যে বৈজ্ঞানিক-গণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতই ঋষি, যাঁহাদের দিব্য চক্ষু সত্য নিরীক্ষণে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই যেন প্রাণের তৃষ্ণায় বাহিরে আসিয়া আপামর সাধারণকে সেই সত্যের সহিত পরিচিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আমি জানি বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এমন অনেক মহাজন আছেন, যাঁহারা নির্জ্জন সাধনা ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে চাহেন না। জ্ঞান অর্জ্জন তাঁহাদের কার্য্য; জ্ঞানের প্রচারও কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। সর্ব্বত্রই যেরূপ, এখানেও সেইরূপ শ্রমবিভাগের প্রয়োজন। আহরণ ও বিতরণ উভয় কর্ম্মই একজনে গ্রহণ করিলে কোনটাই হয়ত সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় না। আহরণের শক্তি ও বিতরণের শক্তি ঠিক একজাতীয় নহে। যিনি অর্জ্জনে নিপুণ, বিতরণে তাঁহার নৈপুণ্য না থাকিতেও পারে। নিতান্ত অনধিকারীর নিকট বিতরণ করিতে গিয়া বিদ্যার মাহাত্ম্যকেও খর্ব্ব করিবার কতকটা আশঙ্কা থাকে। ভূমি যেখানে নিতান্ত অনুর্ব্বর, সেখানে বীজ ছিটান কেবল পরিশ্রমের অপব্যয়। এ সমস্ত যুক্তি স্বীকার করিলেও দেখিতে পাই, সত্যের অন্বেষণে যাঁহারা উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া পুরোগামী হইয়াছেন, তাঁহারাই আবার আপনাদের মেরুদণ্ড ক্ষণেকের জন্য অবনত করিয়া, নিম্নতর সোপানে নামিয়া আসিয়া জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচারে আনন্দলাভ করিতেছেন। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় কি না, এরূপ চেষ্টায় কোন লাভ আছে কি না, ইহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরেজিতে বলিলে, Scienceকে popularise করা চলে কি না এবং করা উচিত কি না, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও Lord Kelvin অথবা P. G. Tait, Hermann Helmholtz অথবা William Kingdon Clifford প্রভৃতির মত ভাস্করদ্যুতি জ্যোতিষ্ককে আলোক বিতরণ করিয়া ধরাধামের অজ্ঞান-

তিমির অপসারণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই কয়টা নাম উল্লেখের পর বোধ করি আর কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না যে, প্রাকৃত জনের সম্মুখে বিজ্ঞান-প্রচারে নিযুক্ত হওয়ায় কোনরূপ লজ্জা বা অগৌরবের হেতু আছে।

বাঙ্গালা দেশে যে সকল মনস্বী পণ্ডিত এবং তাঁহাদের উৎসাহী ছাত্র বিবিধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্বের আহরণে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারা একত্র উপস্থিত হইয়া পরস্পর ভাব বিনিময় করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণকেও একেবারে বিস্মৃত হইবেন না। এই প্রার্থনাও এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। সাধারণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের নিজের ভাষা ছাড়িয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে হইবে। অন্য দেশে যাহা সম্ভব, এদেশে এখনও তাহা সম্ভব নহে। এখনও বহুদিন ধরিয়া আমাদের যত্নার্জ্জিত জ্ঞান বিদেশী ভাষার সাহায্যে বৈদেশিক বুধমণ্ডলীর নিকট স্থাপিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য যে নিকষ পাষাণের প্রয়োজন, এদেশে তাহা বর্ত্তমান নাই। বিদেশের অগ্নিকুণ্ডে গলাইয়া ঢালাইয়া তাহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালাভাষা এখনও বিজ্ঞান-প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিবিধানে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙ্গালাভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাই আমার বাক্য সমর্থন করিবে। এমন এক সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কালেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কথোপকথনে বাঙ্গালার ব্যবহার বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিতেন। এখনও সর্ব্বত্র সেই ভাব চলিত আছে কি না জানি না। ক্লাসে বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙ্গালার ব্যবহার বোধ হয় এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই জন্য অন্ততঃ জীবিকার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞান আলোচনাও আমাকে করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙ্গালা-ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না। হয়ত ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞতা আমার এই দুষ্প্রবৃত্তির মূল কারণ। বাল্যকালে বেইন সাহেবের Higher

English Grammar, যার তাহার Companion, যথাশক্তি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং মুখস্থ বিদ্যা উদ্‌গিরণ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের বাহবা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজিও কোথায় shall এবং কোথায় will বসাইব, এই দুশ্চিন্তা আসিয়া ইংরেজি লেখাই বন্ধ হয়, কলমটাও অচল হইয়া পড়ে। ইংরেজি ইডিয়ম ও বানান সম্বন্ধে আমার সহস্র অপরাধ দিন দিন চিত্রগুপ্তের ব্লাক বহিতে লিপিবদ্ধ হইতেছে। কারণ যাহাই হউক, আমি এই পাপের বোঝা চিরজীবন ধরিয়া মাথায় বহিতেছি। কিন্তু সে জন্য অধ্যাপনা-কার্য্যে কখনও যে ব্যাঘাত অনুভব করিয়াছি, তাহা সহজে স্বীকার করিব না। পদার্থবিদ্যায় বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের একান্ত অভাব রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। অধ্যাপনার সময় ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও বোধ করি না। পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরেজি রাখিয়াই এবং সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ইংরেজি রাখিয়াই আর সমস্ত কথা বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, কোন স্থানে ঠেকিতে বা ঠকিতে হয় না, এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইংরেজি ও বাঙ্গলার মিশ্রণে এইরূপে যে খেচুরী ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা সাধু সাহিত্য কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাপনাকার্য্যে ঐ ভাষা-ব্যবহারে শিক্ষক বা ছাত্র কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। পদার্থবিদ্যার যে সকল তত্ত্ব ছাত্রদিগের নিকট নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়, আমার এই অপরূপ ভাষার আশ্রয়েও তাহা ছাত্রদিগের বুদ্ধিগম্য করিতে কখনও কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। Maxwell, Hertz অথবা Thomsonএর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া Electro-magnetic Fieldএর,—অর্থাৎ যে দেশে তাড়িত এবং চুম্বক-শক্তি যুগপৎ কাজ করে সেই দেশের,—অবস্থা বুঝাইবার জন্য black boardএর কালাপিঠে চা-খড়ির ধলা আঁচড় কাটিয়া সাঙ্কেতিক ভাষায় যখন বড় বড় equationগুলা লেখা যায়, তখন সেই অঙ্কগুলার বিকটমূর্ত্তি ছাত্রদিগের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা ভুক্তভোগী ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন। আমি কিন্তু দেখিয়াছি, সহজ বাঙ্গালায় সেই আঁচড়গুলার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রগণের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এমন কি তাহাদের মনের ভিতর একটা আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। কাজেই আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাহার উপর ভর করিয়া আমি বলিতে বাধ্য যে বাঙ্গালা ভাষা জনসাধারণের সম্মুখে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রচার-কার্য্যে একেবারে অসমর্থ নহে। রসায়ন-শাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক এবং যৌগিক দ্রব্যের পারিভাষিক নামগুলা এবং তাহাদের গঠনবিজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলা ইংরেজি রাখিব কি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত করিব, তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে। আপাততঃ সেই বিবাদের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার্থীরা—ইংরেজি ভাষায় যাহাদের দখল নাই তাহারা—রসায়ন-বিদ্যার রসাস্বাদনে যে একবারে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা উচিত নহে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা বিবিধ উদ্ভিদ্ জাতির এবং প্রাণিজাতির নামকরণে লাটিন ভাষার আশ্রয় লন; সেই উৎকট নামগুলি

কোন কালে বাঙ্গালাভাষার ধাতুর সহিত মিলিতে চাহিবে কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যেমনেই হউক—লাটিন নামগুলি বজায় রাখিয়াই হউক অথবা তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা করিয়াই হউক—উদ্ভিদ্‌ তত্ত্বকে এবং প্রাণিতত্ত্বকে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতেই হইবে। ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ আকরিকের ও বিবিধ শিলাখণ্ডের যে সকল নাম সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীর কোমল বাগ্‌যন্ত্র তাহার উচ্চারণে ছিড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা স্বীকার করি। যাঁহারা করাত এবং হাতুড়ি হাতে পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইয়া বেড়ান, তাঁহাদের দেহ ও মন আগেটের ও কোরণ্ডমের কাঠিন্য পাইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের এই কোমলতা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় কোমল হইবে, এরূপ আশা করি না; কিন্তু ঐ নামগুলাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটুকু মোলায়েম করিয়া লইলেই যদি আমাদের বাগিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কঠিন অন্তঃকরণকে একটু করুণরসার্দ্র করিতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিজ্ঞান-বিভাগ যে নিতান্ত দরিদ্র, এই আক্ষেপোক্তি সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের সম্যক্‌ ব্যবস্থা হয় নাই। শুনিতে পাই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি এ বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন যাহার উদ্দেশ্য, সেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে উপেক্ষা মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। কয়েক বৎসর হইতে সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগের ধারাবাহিক আলোচনার জন্য অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারী লাল চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ পরিষদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহারা উভয়েই সাহিত্য-পরিষদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু; কিন্তু তাঁহাদের নিকটেও পরিষৎ যেটুকু পাইয়াছেন, তাহা তৃষ্ণা-নিবারণের পক্ষে প্রচুর নহে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পুষ্ট করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি আমি পরিষদের সেবাকার্য্যে অশক্ত, তথাপি পরিষদের পক্ষ হইতে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এ বিষয়ে সাহায্য ভিক্ষার অধিকারী। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার এই জাগরণের দিনে সাহিত্য-পরিষদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, ইহাই আমার আশা। বাঙ্গালাসাহিত্যের বিজ্ঞান-বিভাগের দারিদ্র্য মোচন আপনারাই করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অভাব এই বিষয়ে অন্তরায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার মনের ভাব আপনা হইতে শব্দরূপে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইবে। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে একটা সূক্ত রহিয়াছে, অন্তঃশরীরের গুহামধ্যে চিত্তের নিভৃত প্রদেশে যে অশরীরী ভাবরাশি প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্ত আছে, তাহা অকস্মাৎ শরীর গ্রহণ করিয়া শব্দরূপে এবং নামরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ঋষি বৃহস্পতি তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত

হইতেছেন। বাস্তবিকই যখনই আপনারা শ্রদ্ধাশীল হইয়া আপনাদের ভাবরাশিকে প্রকাশ করিতে চাহিবেন, ভাবরাশি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তখনই শব্দরূপে প্রকাশ পাইবে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা। পরিভাষা-সঙ্কলনের অপেক্ষায় কোন দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে নাই। বিজ্ঞানও যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, বিজ্ঞানের পরিভাষাও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ভাব যেখানে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহা শব্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গের জনসাধারণ জ্ঞানার্থী হইয়া উর্দ্ধমুখে আপনাদের অভিমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করুন। ইহা আপনাদিগের কর্ম্ম; ইহা আপনাদিগের ধর্ম্ম। সাধ্যসত্ত্বে এ বিষয়ে কুণ্ঠিত হইলে আপনাদিগের প্রত্যবায় হইবে।

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা-ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রচারের যে উদ্যম ছিল, সম্প্রতি তাহা যেন দেখিতে পাই না। পশ্চিম দেশ হইতে নবাগত জ্ঞানালোকের ছটায় যাঁহাদের চক্ষু তখন ঝলসিয়াছিল, তাঁহারা সেই আলোক দেশমধ্যে প্রতিফলিত করিয়া দেশের আঁধার নিবাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া আমি দেখিয়াছি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে শ্রেণীর যতগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইত, বর্ত্তমানকালে সেই শ্রেণীর তত গ্রন্থ যেন প্রকাশিত হয় না। তখনকার তুলনায় এখন লেখকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, দেশে জ্ঞানলাভের স্পৃহা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞান-বিতরণে সমর্থ শিক্ষাদানে সমর্থ পণ্ডিতের সংখ্যা প্রচুরতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় কমিয়াছে গ্রন্থপ্রচারের সুযোগ বাড়িয়াছে, অথচ বাঙ্গালাসাহিত্যের কেন এই অবনতি, তাহা আপনাদের চিন্তার বিষয়। সেকালে যাঁহারা বঙ্গের সুধী সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই জনসাধারণ মধ্যে এই জ্ঞানপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করিতে পারি। ইঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত, যেরূপ অনুরাগের সহিত, যেরূপ যত্নের সহিত, বঙ্গের জনসাধারণ মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিতরণ করিতে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তিগণকে সেরূপ করিতে দেখিতে পাই না, ইহার কারণ কি? সে কালের রহস্যসন্দর্ভ, বিবিধার্থসংগ্রহ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতিকে যে জ্ঞান-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই, এ কালের কোন বাঙ্গালা পত্রিকার সেরূপ অধ্যবসায় দেখিতে পাই না কেন? হইতে পারে উল্লিখিত মনীষিগণ এবং উল্লিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলি যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেন, তাহার অধিকাংশ এখন বালকোচিত বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাহা সত্য হইলেও এ কালের উপযোগী বয়স্কোচিত কর্ম্মে কয় জন লোক এবং কয়খানি পত্রিকা নিযুক্ত আছে? আমার বাল্যকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত খগোল বিবরণ প্রভৃতি কয়খানি বাঙ্গালাগ্রন্থ সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। হয় ত এ গুলি

স্কুলপাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু একালেও যে সকল স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ঐ কয়খানির তুলনায় নিম্ন পদই পাইবে। স্কুলপাঠ্য নহে, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচার উদ্দেশে লিখিত, এরূপ গ্রন্থেরই বা একালে প্রাচুর্য্য কোথায়? বাঙ্গালা-সাহিত্যের চারিদিকে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, অথচ বিজ্ঞানাঙ্গের এরূপ অধোগতির কারণ কি? আমি যে কারণ অনুমান করি তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে এই সভায় উপস্থিত বিদ্বজ্জনের বিশেষ শ্লাঘার হেতু হইবে না। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্ব কালের তুলনায় আজিকার দিনে আমাদের দেশে মনীষী পণ্ডিতের অভাব নাই, অভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই, রচনাপটু দক্ষ লেখকের অভাব নাই, তবে কিসের অভাব? আমি অনুমান করি, বলিতে দুঃখ হয়, বলিতে লজ্জা হয়, বলিতে ভয় হয়, আমি অনুমান করি, ইহার মুখ্য কারণ শ্রদ্ধার অভাব, প্রীতির অভাব, অনুরাগের অভাব, প্রেমের অভাব। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা পাঁচজনের সঙ্গে বাঁটিয়া লইব, আমি যাহা অর্জ্জন করিয়াছি দেশবাসীকে তাহা বিতরণ করিব, আমি যে অমৃত রসের অধিকারী হইয়াছি, দীনদরিদ্র নির্ব্বিশেষে আমার ভাই-ভগিনীকে সেই অমৃত রসের আস্বাদনের ভাগ না দিলে, দুই হাতে তাহা বিলাইতে না পাইলে, আমার প্রাণের পিয়াস মিটিবে না, যে প্রেম হইতে এই মহাভাবের উৎপত্তি হয়, সেই মহাভাবের অসদ্ভাবই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমান করি। কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও অক্ষয়কুমার, তোমরা প্রীতির ধারা বিলাইয়া তোমাদের পার্থিব জীবনের লীলাভূমিকে উর্ব্বর করিয়া গিয়াছিলে, তোমাদের পরবর্ত্তী আমরা সেই ভূমির সম্পৎ অধিকার করিতেছি, কিন্তু তোমাদের তর্পণ-কর্ম্মে আমাদের অধিকার নাই।

অদ্যকার সভায় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে এই লজ্জাবিমোচনের জন্য আমার বিনীত অনুরোধ জানাইয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা কৃতবিদ্য, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা মনস্বী, আপনারা যশস্বী, আপনাদের চেষ্টায় বঙ্গের নব জাগরণ আরব্ধ হইয়াছে। জননী বঙ্গভূমির কীর্ত্তিধ্বজা আপনাদের হস্তে ধৃত রহিয়াছে। আপনাদের নিজের যশোরশ্মি দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গজননী আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, বঙ্গভাষা আপনাদের স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে, বঙ্গসাহিত্য আপনাদের করুণা প্রার্থী, বঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগের অন্তেবাসী. আপনাদের সম্মুখে এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, এক্ষণে আপনারা অবতরণ করুন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি; দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই। গণিতবিদ্যা বা জ্যোতির্ব্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন-বিদ্যা, জীবন-বিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা, কোন বিদ্যাতেই ভারতবর্ষের কিম্বা বঙ্গদেশের কোন বিশিষ্ট স্বত্বাধিকার থাকিতে পারে না। যাঁহারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, তাঁহাদের সকলেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অথবা বাঙ্গালাদেশের সহিত কোন কোন বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করা যাইতে পারে। আমাদের এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং

আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্গীয় সুধীগণ কর্ত্তৃক সেই সকল বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালার জল-বায়ুতে, বাঙ্গালার আব্‌হাওয়ার গতিতে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার বিশিষ্ট আলোচনায় বঙ্গের চিকিৎসক হইতে বঙ্গের কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালাদেশের বাতাবর্ত্ত বা cyclone অন্তরিক্ষবিদ্যায় বা meteriologyতে একটা নূতন পরিচ্ছেদ যোজনা করিয়াছে। এই বিশিষ্ট আলোচনাতে আরও কি কোন নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা হইবে না? বঙ্গের সমতল ভূমিতে একখানা কঠিন পাষাণ পাওয়া যায় না। যে অতি পুরাতন মালভূমির ক্ষুদ্র অংশ আজ পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলসীমার উর্দ্ধে থাকিয়া ভারতোপদ্বীপের দাক্ষিণাত্য অংশ গঠন করিয়াছে, গঙ্গাপ্রবাহ যাহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় প্রবহমাণ, সেই মালভূমিতে না কি একখানা পুরাতন জীবাশ্ম বা fossil পাওয়া যায় না, এই সকল কারণে এদেশের সমতলভূমি এ পর্য্যন্ত ভূবিদ্যাবিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তথাপি গঙ্গাপ্রবাহ-নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকারাশি কত কালে কিরূপে আমাদের বঙ্গভূমিকে নির্ম্মিত করিয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি? আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন বা কাব্য লেখেন, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, এই নিম্নবঙ্গ যেন সেই সেদিন সমুদ্রগর্ভে মগ্ন ছিল; কিন্তু এই কলিকাতা সহরের বহু নিম্নের ভূমি, যাহা এখন সাগরবক্ষের বহু নিম্নে অবস্থিত, তাহাই একদিন বনমণ্ডিত হইয়া সাগরের উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, এই তথ্যটা তাঁহাদিগকে জানান আবশ্যক নহে কি? ভাগীরথীর পশ্চিমে বীরভূমে যে অনুর্ব্বর রাঙ্গামাটির অস্তিত্ব দেখিতে পাই, উত্তরবঙ্গে ও ময়মনসিংহের জঙ্গলে যে রাঙ্গামাটি পুনরায় মাথা তুলিয়াছে, সেই রাঙ্গামাটির সহিত তদুপরি নিক্ষিপ্ত গঙ্গামৃত্তিকা-নির্ম্মিত নিম্নবঙ্গের সম্পর্কের কথা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি? যাঁহারা ভূতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট এই সকলের এবং এই শ্রেণীর বিবিধ তত্ত্বের সমাধান পথের পথিক প্রত্যাশা করে। বাঙ্গালার মাটিতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার বনে, যে সকল পশুপাখী, সাপব্যাঙ্, মশামাছি, পোকামাকড় আহার বিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, তাহাদের আহার-বিহারের প্রথা জানিবার জন্য আমরা কি কেবল বিদেশী শিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়াই থাকিব? Asiatic Societyর পত্রিকার এবং Indian Museumএর প্রকাশিত monograph-গুলির উৎকট বৈজ্ঞানিক ভাষার আশ্রয় ভিন্ন আমাদের মত অনভিজ্ঞের পক্ষে স্বদেশের তত্ত্ব জানিবার কোন গত্যন্তর থাকিবে না? বাঙ্গালাদেশের জীবজন্তু আপন আপন অবস্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিরূপে পরস্পরকে জীবন-দ্বন্দ্বে হঠাইতে চাহে, কিরূপে বেড়ায় এবং কি খায়, কিরূপে আততায়ীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করে, কিরূপ আকারে এবং আচারে অন্য জীবের, এমন কি আততায়ীর, অনুকরণ করিয়া, নানা ছদ্মবেশের আবিষ্কার করিয়া, আততায়ীকে ঠকাইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে, কিরূপে তাহারা সহস্র শত্রুর সন্নিধানে আপন বংশধারা রক্ষা করিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করে, এই সকল তথ্য জানিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছি;

আমাদের আকাঙ্ক্ষা কি মিটিবে না? বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার বায়ুমধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে, শয্যাতলে, খাদ্যের ভিতর, দেহের ভিতর, যে সকল জীবাণু অলক্ষিতে বাস করিয়া রক্তবীজের মত বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং কখনও বা আমাদের দেহ-রক্ষায় সৈনিকের কার্য্য করিতেছে, কখনও বা মহামারী উৎপাদন করিয়া লোকক্ষয় করিতেছে, তাহাদের আবিষ্কারের জন্য, তাহাদের বিবরণের জন্য, কি আমরা চির-কালই হকারাদি-নামা এবং রকারাদি-নামা বিদেশী পণ্ডিতদেরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিব? আশা করি, আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনে আপনারা বর্ষে বর্ষে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মধ্যে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিবেন এবং আপনাদের আলোচনার ফল, অনুসন্ধানের ফল, গবেষণার ফল আমাদের মত অজ্ঞজনকে উপদেশ দিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকা আপনাদের অনুসন্ধান-ফল-প্রচারের সুযোগ পাইলে গৌরবান্বিত হইবে। আর আমার বক্তব্য নাই। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বুধ-মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণে আমার অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য উপদেশের ধৃষ্টতা আমার নাই। সে জন্য আমি আপনাদের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি কেবল আমার নিবেদন জানাইতে, আমার প্রার্থনা জানাইতে, আমার ভিক্ষা জানাইতে, আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমার শারীরিক এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য আপনাদের দর্শনলাভে, আপনাদের সহযোগিতা-লাভে, আপনাদের উপদেশ-লাভে আমাকে সমর্থ করিবে কি না, এখনও আমি তাহা জানি না। নিতান্তই বন্ধুজনের আগ্রহাতিশয়ে আমি আপনাদের সময়ের অপব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার বিনীত ভিক্ষা যদি আপনাদের উন্নত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতসাধনে অবনত করে, তাহা হইলেই আমার এই চপলতা সাহিত্য-সম্মিলনের ভাবিষ্যৎ-ইতিবৃত্তলেখক কর্ত্তৃক মার্জ্জিত হইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বিলাত-যাত্রা

'ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীতে' যে বিচার ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা লইয়া জন কএক ব্যক্তি বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিতেছেন। এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের কএকটী কারণ আছে,—১। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ২য়। তাঁহারা সমাজের স্থিতি ও উন্নতির মূলতত্ত্ব পর্য্যা-লোচনা করেন না। ৩য়। অভিমান তাঁহাদের অত্যন্ত প্রবল।—অন্যান্য কারণ এক্ষেত্রে বলিব না; এই তিনটীর আলোচনা করিব। সেই বিচারের কালে মধ্যস্থগণের ঐকমত্যে যাহা নির্ণয় হইয়াছিল, আমি সভাস্থলে স্পষ্টাক্ষরে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। অদ্য তাহাই পুনরায় সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছি,—ব্রাহ্মণ যত কিছু পাপই করুন না কেন,—তাঁহার জাতি ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট

হয় না। তাঁহার সন্ধ্যা করিবার অধিকার, বিষ্ণুনাম স্মরণে অধিকার, এবং স্নানাদি কার্য্যে অধিকার আমরণ থাকিবে। ব্রাহ্মণ জাহাজে বসিয়া বিলাতে উপস্থিত হইয়া এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াও ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও পারিবেন। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য করিবার যে নিয়ম আছে তাহা মানিতে হইবে। চা বিস্কুট খাইয়া সন্ধ্যা করা চলিবে না। অনাহারে যথাকালে পূতভাবে সন্ধ্যা করিতে হইবে।—এই টুকুই মিলনক্ষেত্র। যিনি প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, সত্যই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন,—তিনি নিষ্পাপ হইয়া নিজের সকল প্রকার বৈধ কার্য্যই করিতে পারিবেন। পরন্তু যে পাপের জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহা তাঁহার অকর্ত্তব্য। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি সন্ধ্যা, নিত্য পূজা, পঞ্চমহাযজ্ঞ, দুর্গোৎসব, এ সমস্তই স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু পুরোহিত দ্বারা দুর্গোৎসব করাইলে পুরোহিত পাপী হইবেন। সমাজে বহু প্রকার নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত হইলেও বিশুদ্ধরূপে পরিচিত ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ, এক-পংক্তিতে ভোজন, এবং যজন, যাজন সম্বন্ধ নাই।—সেইরূপ বিলাত প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ-গণও ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত থাকিলেও অন্য ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও পংক্তি-ভোজনাদির অধিকারী হইবেন না।

যিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই, তাঁহার গৃহের পাত্রে ভোজন করিতে নাই। যিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাঁহার গৃহের পাত্রে ভোজন করা যায়। তবে ঐ পাত্র প্রায়শ্চিত্তের পরে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। যে সকল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং বৈদ্যের উপনয়ন সংস্কার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের পক্ষে এবং শূদ্রের পক্ষে নূতন সিদ্ধান্ত কিছু করা হয় নাই, পূর্ব্ব নির্ণীত সিদ্ধান্তই স্থির আছে। ঐ প্রকার সৎশূদ্র যাবৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিবেন, তাবৎ স্নান ও হরিস্মরণে অধিকারী। দীক্ষিত শূদ্র তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অধিকারী। প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর —নিত্য পূজাদিতেও অধিকার হইবে। আমি সভায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছি,—"যত দিন কোন হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিবে, তত দিন তাহার যত পাপই হউক না, সে হিন্দু নামের যোগ্য থাকিবে।" ব্রাহ্মণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও তাহার ব্রাহ্মণত্ব অপনীত হয় না, সে ব্যক্তির সন্ধ্যা বন্দনাদিতে অধিকার যায় না, তবে বর্ত্তমান ভাষানুসারে তাহাকে হিন্দু বলিতে পারি না, এই মাত্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – তিন পুরুষ পর্য্যন্ত নিজের জাতির অধিকারী। উদাহরণ; —রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খৃষ্টান হইলেন, তাঁহার বিবাহিতা সবর্ণাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র—জি, সি, চ্যাটার্জ্জী, যদি কোন ঐ প্রকার মুখার্জ্জী কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং তদীয় গর্ভজাত পুত্রের সবর্ণা গর্ভজাত পুত্র ভগবৎ কৃপায় প্রপিতামহাদির পাপাচরণ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপবশে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করেন, তবে তিনি উপবীত হইতে পারিবেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন। কিন্তু বিনা প্রায়শ্চিত্তে চতুর্থ পুরুষ কাটিয়া যাইলে তখন তাঁহার অন্য জাতি হইবে। আর ব্রাহ্মণত্বের দাবী থাকিবে না।

খৃষ্টান না হইয়া কেবল বিলাত গমন বা গৃহে বসিয়া পুরুষানুক্রমে বিলাতী অন্ন-ভোজনাদি স্থলেও এইরূপ ব্যবস্থা।

আমাদের জাতি কাঁচা রং নহে, পাকা ছিট, শত কলস জর্ডনের জলেও এ জাতি নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি বিবাহে গোল হয়, তবে তাহার জাতি এক পুরুষেই নষ্ট হইয়া যায়। চট্টোপাধ্যায় যদি চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করে; বা ভিন্ন জাতির কন্যা বিবাহ করে, তাহা হইলে সে বংশ আর পিতৃপুরুষ জাতির অধিকারী হইবে না।

যাঁহারা এক্ষণে হৈ হৈ করিতেছেন,—এসব তত্ত্ব তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন না। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিলাত প্রত্যাগতাদি ব্রাহ্মণের পুত্র কন্যাদি যদি পঞ্চম বৎসরের মধ্যে স্থানান্তরে রক্ষিত হয়, এবং অখাদ্য ভোজনাদি অন্য পাপ কার্য্য স্বয়ং না করে, তাহা হইলে অল্প প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার লাভে অধিকারী হয়। যদি অকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিলাত প্রত্যাগতের ঘরে বাবুর্চ্চির অন্ন প্রচলিত না থাকে, পরন্তু ব্রাহ্মণের অন্ন, অপর জাতি হইলে অন্ততঃ স্বজাতীয় অন্ন প্রচলিত থাকে এবং অভক্ষ্য মাংসাদি ব্যবহার না থাকে, তাহা হইলে তদীয় অধিক বয়স্ক পুত্র কন্যাদিও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার্য্য হইবে।

যদি পুত্র কন্যাদি বাবুর্চ্চি প্রভৃতির অন্ন ৪৮ বার জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তাহা হইলে আর ব্যবহার্য্য হইবে না। কৃত প্রায়শ্চিত্ত অব্যবহার্য্যের পুত্রকন্যাদিও প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার যোগ্য। ইহা আমার মত। বিলাত প্রত্যাগতের পুত্র কন্যাও অব্যবহার্য্য, একথাও কেহ কেহ বলেন বটে, কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া আমরা অনেকেই মনে করি না। মতদ্বৈধ হওয়াতে সম্মিলনীর মীমাংসা প্রকাশিত হয় নাই; আলোচনার্থ স্থগিত আছে।

এই সকল তত্ত্ব জ্ঞাত না হওয়াতে প্রতিকূল আন্দোলন অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা আন্দোলনকারীদের প্রশংসার কথা নহে।

২য় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই,—যে সমাজে জ্ঞানপূত দারিদ্র্যের আধিপত্য নাই, সংদর্পিত ধনেরই আধিপত্য—সে সমাজ নিত্য বিপ্লব বিভীষিকায় বিত্রস্ত, যে সমাজ ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজের উজ্জ্বলতা সৌদামিনী স্ফুরণের ন্যায় ক্ষণিক। যে সমাজের মর্ম্মস্থলে সংযমের অমৃত ধারা নাই, বিলাসের গরল ধারা প্রবাহিত, সে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। যে সমাজে জাতীয়ত্বের—জাতিগত বিশেষত্বের উন্মেষণা নাই, বিজাতীয় অনুকরণ প্রবলতা আছে, সে সমাজের মৃত্যু আসন্ন, ইহাই সমাজতত্ত্ব।

আমাদের সমাজ সনাতন। ধনের গরিমা, ভোগের প্রভুত্ব, বিলাসের প্রতিষ্ঠা এ সমাজে ছিল না, এখনও সমাজের মেরুদণ্ডে এ সব বিষয় উপস্থিত হয় নাই। তবে ধন হইতে আপনার প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিতেছে। এ সময়ে সাবধান না হইলে সমাজের সমস্ত অংশই অভিভূত হইবে। এই বিবেচনা করিয়া আত্মরক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও আচারপূত অন্য ব্রাহ্মণবৃন্দ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে মানভূম, মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি, পুরীধাম ও কাশীধাম—সর্ব্বস্থানস্থিত সুপণ্ডিত ও সদ্‌ব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই জানেন,—বিলাতপ্রত্যাগত বহু ব্যক্তিই সমাজে মাননীয়, ধনগৌরবে, শিক্ষাপ্রভাবে বরণীয়, তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বর্জ্জন করিয়া,

সার শস্য পরিত্যাগ করিয়া খোসা ভূষি লইয়া কি সমাজ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? এ প্রশ্নও যে কাহারও মনে হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু যাঁহারা মনীষী, তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন,—'বিলাতী পরিত্যাগই সমাজের মঙ্গল'। সমস্ত দেহের মধ্যে যাহার করপল্লবই সুন্দর, পল্লবকমনীয় সেই করপল্লবের চম্পক-কলিকাসন্নিভ অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়ের অপূর্ব্ব সুষমা। সেই অঙ্গুলি যদি সর্পদষ্ট হয়, প্রাণের মমতাবশে সেই কর-পল্লব-কান্তিকোমল অঙ্গুলিকেও ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হয়, সমাজের প্রাণের জন্যই—সমাজের এই সুশোভন 'বিলাতী' অংশ সম্ভবমত পরিহরণীয়। ইহা ঠিক অঙ্গুলিচ্ছেদ নহে। বিষদুষ্ট অঙ্গ ও অন্য অঙ্গের পরস্পর শোনিত প্রবাহ রুদ্ধকরিবার জন্য মধ্যে দৃঢ়বন্ধন মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বিষদুষ্ট অঙ্গে রক্তমোক্ষণে যদি বিষ দূরীভূত হয়, তখন বন্ধন শিথিল হইবে। আমাদের সমাজে যে ধনের, ভোগের, ও বিলাসের প্রচেষ্টা বাড়িতেছে, বিলাত গমনে তাহার পূর্ণ পরিচয়। বিলাতী গ্রহণে তাহার পরাকাষ্ঠা। দেশের মঙ্গলের জন্য কেহই বিলাতে গমন করেন না, অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের জন্যই বিলাতে গমন করিয়া থাকেন। বিলাত প্রত্যাগতগণ অর্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে বিলাসতরঙ্গে প্লাবমান। তদীয় সীমন্তিনী বিলাসিনী। ইহাদের সংস্রব—ঘৃণা বর্জ্জিত সংসর্গ দেশে যত বাড়িবে ততই দেশের অমঙ্গল। এই দরিদ্র গৃহে আমাদের কুলাঙ্গনাগণ প্রত্যুষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সহাস্য বদনে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহিনী ও পুত্রবধূগণ এ দুর্দ্দিনেও অন্নপূর্ণার ন্যায় ছাত্রদিগের অন্ন প্রদানে নিযুক্ত। নিজের অনাহারজনিত শ্রমে দৃক্পাত নাই, ভূষণের পারিপাট্যে লক্ষ্যনাই, চিরসংস্কার সম্ভূত কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাঁহাদিগকে সমস্ত উপদ্রব হইতে এখনও অধিকাংশ পল্লীসমাজে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যদি তাঁহারই সহোদরা বিলাত প্রত্যাগতের সহধর্ম্মচারিণী হন এবং সেই বিলাসরসস্নিগ্ধ বিলাতী পরিবারের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহধর্ম্মচারিণী অবাধে সংসৃষ্ট হ'ন, তাঁহার হৃদয়ে কি বিলাসের অতৃপ্তকামনা জ্বলিয়া উঠিবে না?

সাধারণতঃ বিলাসী ধনীর সংসর্গহেতু যে সমাজ বিষদূষিত হইতেছে, সেই সমাজে বিষতরঙ্গিনীর প্রবাহ—খাল কাটিয়া প্রবেশ করাইতে বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নহে। দরিদ্র দেশ বিলাসে অধিকতর দরিদ্র হয়। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান ধর্ম্মিষ্ঠ ধনিগণের ধন সমাজের নানা অংশে বিকীর্ণ হয়। পূজা, পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, সমস্ত কার্য্যই সমাজপোষক। কিন্তু অবাধে বিলাত যাত্রা প্রচলিত হইলে এ সকল ধনীর গতি কোনদিকে হইবে, তাহা বুদ্ধিমানের চিন্তনীয়। তাঁহারা কৌতুহল নিবারণনার্থ দলে দলে বিলাত যাইবেন, তাঁহারা বহ্নিমুখবিবক্ষ পতঙ্গের ন্যায় বিলাসের অনলে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাহার ফলে তাঁহারা দগ্ধসর্ব্বস্ব হইবেন। কাহার ধন সমাজে বিকীর্ণ হইবে?

আর যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত, তাঁহাদের ধনের খ্যাতি যতই থাক্, ধন অতি অল্প লোকেরই আছে। অর্জ্জন প্রচুর হইলেও বিলাতী হোটেলের খরচে, বিলাতী বিলাস সামগ্রীর সংগ্রহে সমস্তই নিঃশেষিত। তাঁহাদের অর্থ উপার্জ্জন অধিকাংশ স্থলে দেশীয় জমীদার বর্গের অর্থ শোষণদ্বারা

হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক স্থলে জমীদার নিঃস্ব। তাঁহারা পৈতৃক সম্বায়ে সঙ্কুচিত। সমাজ তাঁহাদের ধনাংশে পরিপুষ্টির সুযোগ লাভে বঞ্চিত। আর সেই ধন ব্যারিষ্টারদের হস্তগত হইয়া হোটেল-ওয়ালা প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকৃগণের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। বিলাতীয় অবাধ সংগ্রহ হইলে এই যে অর্থের অপচয়, তাহার মাত্রা শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। সদাচারপূত ধনীর অস্তিত্ব উঠিয়া যাইবে। সংযম বা সদাচার হিন্দুসমাজের বিশেষত্ব, ইহা বিলুপ্ত হইলেই হিন্দু জাতির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা বিলাতী চালাইতে চাহেন, তাঁহাদের অদূরদর্শিতা জাতীয় জীবনের উচ্ছেদে অগ্রসর; জাতীয় জীবনের কিঞ্চিন্মাত্রও অনুকূল নহে, কেবল বিলাতপ্রত্যাগত-সংসর্গেই যে সমাজে বিলাসরোগ বৃদ্ধি পাইতেছে বা পাইবে, তাহা নহে; অন্য কারণও আছে, সে কারণ দূর করিতে সময় লাগিবে। আজ "বলবন্তং চিকিৎসয়েৎ" নীতির অনুসরণ করিয়া বহুরোগ-নিপীড়িত সমাজের একটী প্রধান আগন্তুক রোগ নিবারণার্থই বিলাতী পরিহার ব্যবস্থা। "এ সময়ে অন্য রোগও আছে, তাহার প্রতিকার জন্য কি করা হইতেছে?" এরূপ আপত্তি করিলে চিকিৎসা করা হয় না।

যদি আবার পূত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথায় সমাজ ধনসম্পন্ন বিলাতীগণকে উপেক্ষা করিতে পারে, তখন অন্য রোগের চিকিৎসা করা চলিবে, নচেৎ কোন চিকিৎসাই হইবে না। পণপ্রথা রহিত করিবার জন্য যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহারাও এই সব তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। সমাজে ধনের আধিক্য থাকিবে, বিলাসের আতিশয্য থাকিবে, সদাচার থাকিবে না; কতিপয় ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র উপেক্ষিত হইবে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থা অনাদৃত হইবে, আবার পণপ্রথাও বর্জ্জিত হইবে, ইহা কি কখন হয়?

তোমার সুযোগ আছে, তুমি অন্য উপায়ে অর্জ্জন করিতে পার, আমার যদি অন্য উপায় না থাকে, তবে আমি পুত্রের বিবাহ দিয়া ধন অর্জ্জন না করিব কেন? ধনই যখন আরাধ্য, ধনের জন্য যখন তুমি সকল কার্য্যই করিতে পার, তখন আমি পুত্রের পিতা, পণ ছাড়িব কেন? পরের কন্যা আত্মহত্যা করুক, পর ভদ্রাসনচ্যুত হউক, তাহাতে আমার কি? ধন না হইলে আমার যে অস্তিত্ব যায়। আমার ধন চাই, কাজেই আমি ধন লইব; তুমি ধনী, তুমি পণ না চাহিলেও তোমার সমশ্রেণীর ধনী তোমাকে পণ দিবে, তোমার ক্ষতি হইল না; আর আমি দরিদ্র, আমার সমশ্রেণীর দরিদ্র, নিপীড়িত না হইয়া পণ দিতে পারে না, তা কি করিব, আমার ধন চাই, কাজেই পণ লইব, দরিদ্র নিপীড়ন করিব। তোমার কথা শুনিব কেন? এই আপত্তি কিরূপে মীমাংসিত হইবে?

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজতত্ত্ববিদ্ মনস্বিগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—দেশের চিন্তাশীল যুবকগণকে তাহা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

সমাজে যে অংশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রভুত্ব, তাহাই সমাজের মেরুদণ্ড,—সেখানে এখনও বিলাসের প্রাদুর্ভাব তেমন হয় নাই। দিন থাকিতে সাবধান হইলে সেই অংশ অবলম্বন করিয়া সমাজের মঙ্গলারম্ভ হইতে পারে। সকলেই যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করেন; তাহা হইলে পণ প্রথা উন্মূলনে বেগ পাইতে হইবে না, নতুবা নিষ্ফলতার আশঙ্কা বিস্তর আছে।

যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ চিন্তাশীল থাকেন, তিনি ভাবিবেন সমাজের অব্যবহার্য্যতায় তাঁহার কর্ত্তব্য বিনষ্ট হয় না, হিন্দু সমাজে অনেক অব্যবহার্য্য জাতি আছে, তাঁহারাও সমাজসেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবাগুণে হিন্দু সমাজ সুরক্ষিত। বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দু যদি হিন্দুত্বের যথা সম্ভব গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া হোটেল বাবুর্চ্চি ইত্যাদি বাদ দেন, সবর্ণা বিবাহ বজায় রাখেন, সমাজের সাধারণ কার্য্যে যোগদান করেন, এবং সদাচার রক্ষার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত না হইয়া সদাচার রক্ষার অনুকূল যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তান সন্ততির কালে পরিশুদ্ধি হইবেই। বিপরীত আচরণে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী। আজ বাঙ্গালায় যে অর্দ্ধাংশ মুসলমান, তাহার অনেক ভাগই হিন্দুর বংশধর। ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা যেমন হিন্দুজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না, সেইরূপ সদাচারসংযমপরিভ্রষ্ট হিন্দু সন্তানের অস্তিত্ব বৃদ্ধি দ্বারাও হিন্দুজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না, সেইরূপ সদাচার-সংযমপরিভ্রষ্ট হিন্দুসন্তানের অস্তিত্ব বৃদ্ধি দ্বারাও হিন্দু সমাজের পুষ্টি হয় না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিশেষ চিন্তনীয়। ফলতঃ দারিদ্র্যের প্রতিষ্ঠা, বিলাসের গতিরোধ, ত্যাগের পোষকতা, সংযমের পূজাই, 'বিলাতীবর্জ্জন' ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তৃতীয় কারণ—অভিমান।

কয়েকজন ব্যক্তির অভিমান এতই প্রবল যে তাঁহারা মনে করেন, আমরাই দেশের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে দেশনায়ক বলিয়াছিলেন, এখনও পণপ্রথানিবারণে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নেতৃত্ব স্বীকার করিতেছেন, আর আজ তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটী মত প্রদান করিয়াছেন বলিয়া সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকেই দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, এইরূপ অসঙ্গত ব্যবহার যে তাঁহাদের ঘোর অভিমানমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা অতি অল্প। তাঁহারা স্বদেশীর প্রভাবে যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার অভিমানে এমনিই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে জগদ্বরেণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত। আমাদের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ দুর্দ্দিনেও স্বয়ং নিরন্ন হইয়াও যে অন্নদান ও বিদ্যাদানের আদর্শ দেখাইতেছেন, যে ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, সমগ্র পৃথিবীতেও তাহার তুলনা অতি বিরল।

অভিমানবশে এই অতুলনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপেক্ষা, শাস্ত্র ব্যবস্থার উপেক্ষা, জাতীয়ত্বের অবসানলক্ষণমাত্র। বিলাত যাত্রার ন্যায় উপনয়ন সংস্কার বিরহিত জাতির উপনয়নে এই অভিমানের লক্ষণ পরিস্ফুট। মাসাশৌচ স্থলে দ্বাদশাহ প্রভৃতি অশৌচ গ্রহণ—ইহা অভিমানবশে শাস্ত্র অমান্য করিবারই একটা প্রকট নিদর্শন। এই অভিমানে কপটতা মিশিয়াছে; অন্তরে আছে, শাস্ত্র কিছু নহে, 'দলবাঁধা' মাত্র। অথচ শাস্ত্রের দোহাই কোন মতে দিয়া নিজ অভিমান বৃত্তি চরিতার্থ করা কি কপটতা নহে? যদি যথার্থ উন্নতির ইচ্ছা থাকে, কপটতা ত্যাগ করিতে হইবে। শরীরকে বর্ম্মাবৃত না করিয়া হৃদয়ে বর্ম্ম পরিধান করিতে হইবে। চরিত্রের উৎকর্ষে 'ব্রাহ্মণ্য' 'ক্ষত্রিয়ত্ব' বা 'বৈশ্যত্ব' যাহা ইচ্ছা তাহাই পাইতে পারিবে। সে উৎকর্ষের গুণে সূত্রধারী

না হইয়াও—সমাজের আদর্শ হইতে পারিবে। এ জন্মে সূত্র লইয়া আকর্ষণ-বিকর্ষণে কোনই ফল নাই। সমাজের মঙ্গল করিতে চাহ, ত—চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন কর। কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিও না।

যে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি অভক্ষ্য ভক্ষণে পাপ মনে করেন না, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত কি কপটতা নহে? যাঁহারা পাপ মনে করেন, তাঁহারা কি পাপ নিবৃত্তির জন্য যাহা যাহা করিতে হয়, যথাযথ তাহাই করিয়া থাকেন? যদি না করেন,—তবে সেই প্রায়শ্চিত্তের আবরণ কি কপটতা নহে? শত কপটতা সমাজে থাকিতে পারে, তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট হওয়া উচিত, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্তে নূতন কপটতার প্রশ্রয় দেওয়া কদাচ উচিত নহে।

অভিমান—আমি বড়, আমার সমাজ মূর্খ—ইহার মধ্যে আমি বড় এই যে স্পর্দ্ধা—ইহা হইতেই সদসদ্ বিবেচনা বিলুপ্ত হইতেছে। সমাজের মঙ্গল করিতে হইলে—সমাজের সেবক হইতে হয়, ব্যক্তিগত অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হয়। ব্রাহ্মণ যদি প্রাধান্য অভিমানে সকল দুষ্কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি যেমন সমাজের শত্রু, অন্য জাতি বা ব্যক্তিও সেইরূপ অন্য কোন প্রকার প্রাধান্য অভিমানে শাস্ত্রাদেশ বা শাস্ত্রপ্রচারককে উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচারী হইলেও তাঁহারা বা তিনিও সমাজের শত্রু, সমাজের সেবক বা মঙ্গল বিধায়ক নহেন।

অভিমানের নানা মূর্ত্তি আছে,—প্রাধান্যের অভিমান অনেক সময়ে কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করে। বলা বাহুল্য সে অভিমান আমাদের দোষাবহ নহে। যে অভিমান স্বার্থত্যাগে বিরোধী, যাহার সংযমরজ্জু নাই, যাহার নিকট সমস্তই তুচ্ছ, সেই অভিমানই আমাদের সমাজস্থ কয়েক ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করিয়া সমাজদেহে গরল সঞ্চার করিতেছে। এরূপ দুরভিমান পরিহার না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই। দেশ, কাল পাত্র অনুসারে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের যে একটা ধুয়া উঠিয়াছে, উহা কি যথেচ্ছাচারের নামান্তর নহে? দুরভিমানসম্পন্ন কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যাহা সুবিধা মনে করেন, তাহাই ধর্ম্ম এইরূপ ভাবই কি উহাতে নিহিত নাই? যাহা প্রবৃত্তির প্রতিকূল অথচ প্রকৃত মঙ্গলকর, যাহা প্রেয় নহে, কিন্তু শ্রেয়ঃ, তাহা কয়জন মানিতে চাহে? (দেশকাল পাত্র অনুসারে শাস্ত্রের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা সংযমের দিকে, সঙ্কোচের দিকে, কদাপি উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে পরিবর্ত্তিত হয় নাই।)

"যে সমর্থব্যক্তি স্বীয় গ্রামে বা জলকষ্টময় স্থানান্তরে জলাশয় খনন না করাইবেন, জল নিকাশের ব্যবস্থা না করাইবেন, এবং নিজ গ্রামের সদাচার রক্ষার জন্য যত্ন না করিবেন, তিনি পতিত হইবেন।"

"যে ভূস্বামী নিজপল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়া নগর আশ্রয় করিবেন, তিনি পতিত হইবেন।"

"যে ভূস্বামী আপনার ভূসম্পত্তির কিয়দংশ স্বীয় কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত না রাখিবেন, ভারতবর্ষের অন্তর্গত নিরন্ন প্রজা সংগ্রহ করিয়া সেই সকল ভূখণ্ডের কৃষিকর্ম্ম না করাইবেন, তিনি পতিত হইবেন।"

"যিনি কন্যা বিক্রয় করিবেন, বা পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিবেন, তিনি পতিত হইবেন।"

"যে কৃষিজীবী আপনার উৎপাদিত শস্যের প্রয়োজনমত অংশ সঞ্চিত না রাখিয়া অর্থলোভে বিক্রয় করিবেন, তিনি সমাজে পতিত হইবেন।"

"যে ভূস্বামী গোচারণ-ভূমির সুব্যবস্থা না করিবেন, তিনি এবং সমর্থ যে প্রজা অন্ততঃ একটী গাভীরও পালন না করিবেন, যে হিন্দু গোঘাতকের হস্তে গোবিক্রয় করিবে, তাহারা সকলের অনালাপ্য হইবে।"

ইত্যাদি নিয়ম বা সময়োপযুক্ত ধর্ম্ম, প্রচারিত হইলে কয়জন মানিতে প্রস্তুত আছে ?

অতএব দেখা যাইতেছে, দুরভিমানবশে ধনীর স্বেচ্ছাচার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানিয়া লউন, তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করুন। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেতা, নতুবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপদার্থ। ইহাই এখনকার দুরভিমানী স্বয়ংসিদ্ধ নেতৃবৃন্দের মূলমন্ত্র।

চিন্তাশীল যুবকগণকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া বলিতেছি—চিন্তা কর, সমাজের মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হও। ধনের প্রাধান্য, বিলাসের প্রতিষ্ঠা, ভোগের আধিপত্য দূর করিয়া দারিদ্র্যের, সংযমের, এবং ত্যাগের শরণাপন্ন হও। জাতীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন কর। তোমরাই জগৎগুরু হইবে, সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য যদি কেহ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত থাকেন, বিজ্ঞান-সঙ্গত শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষার অভাবে দেশের যে দুঃখ, দারিদ্র্য তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আপনার নরকদুঃখ গণনা না করিয়া শিক্ষার জন্য দ্বীপান্তরে গমন করেন, তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়; কিন্তু মুখের কথায় তাঁহার স্বার্থ-ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিলে চলিবে না। তিনি সমাজকে দান করিবেন, প্রতিদান লইবেন না; উপকার করিবেন, প্রত্যুপকার-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবেন, অধীত বিদ্যা বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করিবেন, তিনি চির-কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া এই শিক্ষা বিস্তার করিবেন—এরূপ ত্যাগীর আবির্ভাব বাঞ্ছনীয়। ত্যাগী পুরুষ অন্যকে আপনার পংক্তি ভোজনে বাধ্য করিবার জন্য ব্যগ্র হ'ন না; তিনি আপনার স্বার্থ ত্যাগেই পরিতৃপ্ত। ক্ষুদ্র স্বার্থে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয় না।

পরান্নত্যাগী পিতা কন্যার অন্ন ভোজন করেন না বলিয়া কন্যা কি পিতৃ সেবায় বিমুখী হয়, না পিতার ব্রতভঙ্গে ব্যাকুলা, ব্যাপৃতা হয়! না, তাহা কখনই হয় না। অনুপনীত পুত্রের স্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ-পিতা ভোজন করেন না বলিয়া পুত্র অভিমান করে না। হিন্দুর এইরূপ মজ্জাগত শিক্ষা অনেক আছে। যাঁহারা এই মজ্জাগত শিক্ষা বিসর্জ্জন দেন নাই, শাস্ত্রবিশ্বাস যাহাদের আছে, চিরকৌমার ব্রত রক্ষণে সমর্থ—তাদৃশ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন আচার-রক্ষায় যত্নবান্ পুরুষ শিক্ষার জন্য দ্বীপান্তরে গমনে অধিকারী। তাঁহার এই দ্বীপান্তর-গমন—পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে চল হওয়া যাইবে, এই আশায় নিজের সুখোপকরণ-সংগ্রহের জন্য নহে,—দেশের মঙ্গলের জন্য যুধিষ্ঠিরের ন্যায় স্বীয় নরকের বিনিময়ে মায়া-নরকস্থ ভ্রাতৃগণের দুঃখবিমোচন জন্য। এরূপ ত্যাগী ও ত্যাগের প্রতিষ্ঠা সমাজের মঙ্গলাবহ।

তাঁহারা আসিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিবেন—ভাই সকল! তোমাদের মঙ্গলের জন্য এই বিদ্যা আনিয়াছি, "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং" বলিয়া ইহা গ্রহণ কর। এই বিদ্যাপ্রভাবে তোমরা দারিদ্র্যমুক্ত হও, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা, আমার অন্ন দুই মুঠা গ্রহণ কর, এ কামনা আমি করিব না। এরূপ ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন হইয়াছে। এমন কেহ

থাক, যাও আপত্তি করিব না, কেননা তুমি একপ্রকার সন্ন্যাসী, তুমি ব্যবহারনিরপেক্ষ সমাজ-সেবক .তামার সাজ পরিয়া স্বার্থপর লোভী পুরুষ যদি দ্বীপান্তরে যায়, সে ভণ্ড, সমাজ তাহার নিকট কোন উপকার আশা করিতে পারে না, বরং তাহার নিকট সমাজ অপকার পাইবে। তাহাই পাইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তবে তাঁহারা যদি ভারতের বহির্ভাগে নিজ নিজ কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারেন, তাহা অর্থশাস্ত্রানুসারে প্রকৃষ্ট এই মাত্র।

৺ব্রহ্মবান্ধব উপধ্যায় ব্যবহার্য্যতা আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি গলদশ্রুলোচনে কেবল পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। কিন্তু বিশিষ্ট অধিকারী ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও সাধারণে পাইতে পারে না।

সমুদ্রযাত্রা, দ্বীপান্তরে গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণে কি তাহারা পাপ মানে যে প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হইবে? যদি পাপ মানিত, যদি নরকে বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে কয়জন ঐ সকল কার্য্য করিত?

বল দেখি সত্যবাদী যুবক! বুকে হাত দিয়া বল, কোন বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তি পাপ, পুণ্য, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন? যদি না করেন ত তুমি কেন কপটতার প্রশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের সমর্থন করিবে!

যদি কখন সমাজ আপনাকে চিনিতে পারে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়, তখন অলোভবিদ্ধ শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ সমাজের মঙ্গলকর উপদেশ মুক্তকণ্ঠেই প্রদান করিবেন। সে মঙ্গল কি? সে উপদেশ কি? তাহা এক্ষণে চিন্তা করিবারও সময় হয় নাই।

অতএব আমি দৃঢ়চিত্তে বলিতে পারি—যাঁহারা বিলাত-প্রত্যাগতের ব্যবহার্য্যতা পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা সমাজের ঘোর অহিতকারী। কি পরিতাপের বিষয়! ব্যবহার্য্যতা-পক্ষপাতী সংবাদপত্রসমূহ আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য অনায়াসে সত্যের অপলাপ করিতেছে, অথচ লজ্জিত হইতেছে না!

আর বলিব না। অদ্য এই খানেই শেষ

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যার্জ্জনে কঠিন প্রয়াস

কয়লার খাদে কাজ করিতেছি, এমন সময়ে একদিন দুইজন কুলীর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। ইঙ্গিতে বুঝিলাম ভাজ্জিনিয়া প্রদেশের কোন স্থানে একটা বড় রকমের নিগ্রোবিদ্যালয় আছে। আমার নিজের পল্লীর পাঠশালা অপেক্ষা বড় স্কুল-কলেজের কথা ইহার পূর্ব্বে আর শুনি নাই।

আমার আগ্রহ বাড়িল। খনির অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়া লোক দুইটির নিকটবর্ত্তী হইলাম। তাহারা বলাবলি

করিতেছে যে, ভার্জ্জিনিয়ার ঐ বিদ্যালয়টি নিগ্রোদের জাতীয় বিদ্যালয়। নিগ্রো ছাড়া আর কেহ ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পায় না। গরিব নিগ্রো সন্তানদের জন্য বিশেষ সুবিধাও আছে। যাহারা বাপ-মার নিকট হইতে টাকা-পয়সা আনিতে অসমর্থ, তাহারাও লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায়। এরূপ নির্ধন ছাত্রেরা খাটিয়া পয়সা রোজগার করে। পরিশ্রম করিতে পারিলে যে কোন বালকই যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া নিজের ভরণ-পোষণের খরচ নিজেই জোগাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা এজন্য একটা নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহারা সকল ছাত্রকে অন্যান্য বিষয় শিখাইবার সঙ্গেসঙ্গেই দুটা একটা কৃষি-শিল্পকর্ম্ম বা ব্যবসায়ও শিখাইয়া থাকেন। এই সুযোগেও ছাত্রেরা নিজের খরচ নিজেই চালাইয়া লয়। অধিকন্তু ভবিষ্যতের জন্যও তাহাদের অন্ন-সংস্থানের উপায় জানা হইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয়ের নাম "শিক্ষক ও শিল্প-বিদ্যালয়"। ভার্জ্জিনিয়ার হ্যাম্পটন নগরে ইহা অবস্থিত।

আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম আমি ঐ পাঠশালায় ভর্ত্তি হইব। আমার পক্ষে উহা অপেক্ষা সুবিধার স্থান আর কি হইতে পারে? নিজে খরচ চালাইয়া লইব। সুতরাং অভিভাবকের আপত্তি থাকিবে কেন?

আমি হ্যাম্পটনের নাম জপিতে লাগিলাম। হ্যাম্পটন কোথায়, আমার ম্যানডেন হইতে কোন্ দিকে বা কতদূর আমি কিছুই জানি না। দিবারাত্রি শুধু সেই বিদ্যালয়ের ধ্যান করিতে লাগিলাম। আমার মনে আর কোন চিন্তা আসিল না।

কয়লার খনিতে আরও কিছুকাল কাজ করিলাম। এই সময়ে একটা নূতন চাকরীর সন্ধান পাইলাম। আমাদের এই খনি এবং নুনের কল একজনেরই সম্পত্তি ছিল। তাঁহার নাম জেনারেল লুইস্ রাফ্নার। রাফ্নার-পত্নী বড় কড়া মেজাজের মনিব ছিলেন। তাঁহার চাকর কেহই টিকিত না। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সকলে পলাইয়া আসিত। দেখিলাম কয়লার খনিতে কাজ করা অপেক্ষা একটা পরিবারের চাকর হওয়া শতগুণে ভাল। আমি চেষ্টা করিয়া ১৫৲ টাকা মাসিক বেতনে রাফ্নার-পত্নীর ভৃত্য নিযুক্ত হইলাম।

রাফ্নার-পত্নীর নিকটে যাইতে প্রথম প্রথম আমার বড় ভয় হইত, আমি কাঁপিতে থাকিতাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মনিবের 'রাশ' বুঝিয়া লইলাম। তাঁহার বাপের বাড়ী ছিল যুক্তরাজ্যের সর্ব্ববিখ্যাত বিভাগ নিউ-ইংলণ্ড প্রদেশে। সে অঞ্চলের লোকদিগকে "ইয়াঙ্কি" বলে। ইয়াঙ্কিরা আমেরিকার কিছু "চালে" চলেন। তাঁহাদের দেখিয়া শুনিয়াই যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বিভাগের লোকেরা কায়দা কানুন, চাল-ফ্যাশন ইত্যাদি শিখিয়া থাকেন। কাজেই ইঁহাদের মন জোগাইয়া কাজ করা যে-সে চাকরের সাধ্য নয়। রাফ্নার-পত্নী সকল বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতেন। সময়-নিষ্ঠাও তাঁহার একটা বড় গুণ ছিল, তাঁহার লোক-জনের মধ্যে এই গুণের অভাব দেখিলে তিনি চটিয়া যাইতেন। বাড়ী ঘর, টেবিল-চেয়ার, থালাবাটী সবই ঝাড়া-পুছা ফিট্-ফাট চাই। তাঁহার নিকট পান হইতে চূণ খসিবার জো নাই। অধিকন্তু কুঁড়েমি এবং ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিও তিনি দেখিতে পারিতেন না। কাজেই নিয়মিতরূপে যখনকার যাহা কর্ত্তব্য

ঠিক তাহা করিলে দাসদাসীরা তাঁহার আদর পাইত।

তাঁহার নিকট আমি প্রায় দেড় বৎসর চাকরী করিলাম। এই মনিবের পরিবারে থাকিয়া আমার খুব উপকার হইয়াছে। এখানে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা অন্যান্য স্থানের শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। এখানে চাকরী করিতে করিতেই অনেক দিকে আমার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। আমি আজ কাল পল্লী বা সহরের কোনস্থানে ময়লা জমা দেখিলে তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া ফেলি। ঘরের কোন কোণে ছেঁড়া কাগজ বা ন্যাক্ড়া থাকিলে তাহা আমার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। ঘরের বা বাড়ীর বেড়া নড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মেরামত করিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করি না। কাপড় জামা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে আমি সর্ব্বদাই মনোযোগী। এই সকল সদ্‌গুণ আমি রাফ্‌নার-পত্নীর নিকট চাকরী করিয়াই লাভ করিয়াছি। সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা-জ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপালন, এবং যখনকার যা ঠিক তখন তাহা করা এবং নানা সদভ্যাস এই পরিবারেই অর্জ্জিত হইয়াছে। এই চাকরীই আমার কিয়ৎকালের জন্য শিক্ষালয়, শিক্ষাদাতা এবং গ্রন্থপাঠ-স্বরূপ ছিল এরূপ বলিলে অন্যায় হইবে কি?

রাফ্‌নার-পত্নী আমার কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া আমায় ভাল বাসিতে লাগিলেন। এমন কি, দিবাভাগের বিদ্যালয়ে যাইবার সুযোগও আমি পাইলাম। এতদ্দিন কেবল নৈশবিদ্যালয়েই পড়িতেছিলাম। রাফ্‌নার-পত্নীর কৃপায় এক ঘণ্টা করিয়া দিনের স্কুলেও যাইতে থাকিলাম। তিনি আমার রাত্রের পড়ায়ও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই আমি একটা কেরোসিনের বাক্স আনিয়া নিজ হাতে আল্‌মারী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুই তিনটা থাক করিয়া লইলাম এবং এখান ওখান হইতে কতকগুলি খাতা-পত্র, পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সাজাইয়া রাখিলাম। উহাই আমার প্রথম লাইব্রেরী বা "গ্রন্থশালা!"

সুতরাং রাফ্‌নারপরিবারে আমার দিন সুখেই কাটিতে লাগিল। আমি কিন্তু হ্যাম্পটনকে ভুলি নাই। আমার মাতা অতদূরে কোন অজানা স্থানে যাইব শুনিয়া ভাবিয়া আকুল হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। হাতে এক পয়সাও নাই। এত দিন আমি ও আমার দাদা যাহা কিছু রোজগার করিয়াছি, সবই গৃহস্থালীতে খরচ হইয়া গিয়াছে—এবং আমার অভিভাবক উড়াইয়াছেন। যাহা হউক, কোন উপায়ে যাইবই যাইব।

ভগবান্ সহায় হইলেন। দেখিলাম আমার পল্লীর নিগ্রোরা সংবাদে সকলেই আন্তরিক সুখী। তাঁহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন "নিগ্রোজাতির মুখ উজ্জ্বল কর।" তাঁহাদের আনন্দের বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদের চির জীবন গোলামীতে কাটিয়াছে। কখন সুদিন আসিবে ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। অথচ কেহ বৃদ্ধ বয়সে কেহ বা প্রবীণ বয়সে একে একে নবযুগের নতন নূতন লক্ষণগুলি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা স্বাধীনতা পাইয়াছেন—তাঁহাদের গ্রামে একটা জাতীয় বিদ্যালয় পর্যন্ত খোলা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, আজ তাহাদের এক সন্তান ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একটা মহাবিদ্যালয়ে

লেখাপড়া শিখিতে চলিল। আজ গ্রামের এক শিশু পরিবারের স্নেহ হইতে দূরে থাকিয়া একটা উচ্চশ্রেণীর পাঠশালায় বিদ্যার্জ্জন করিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা সত্যযুগ বৈ কি? কাজেই কেহ আমাকে একটা রুমাল, কেহ বা একটা ডবল পয়সা, ইত্যাদি উপহার দিতে লাগিলেন।

আমি যাত্রা করিলাম। মাতাকে অত্যন্ত অসুস্থ ও রুগ্ন অবস্থায় দেখিয়াই যাইতে হইল। সঙ্গে একটা থলে। তাহার মধ্যে কাপড় চোপড় ভরিয়া লইলাম। তখন ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া হইতে ভার্জ্জিনিয়ায় যাইবার রাস্তায় খানিকটা রেলপথ ছিল। অবশিষ্ট রাস্তা ভাড়াগাড়ী করিয়া যাইতে হয়।

ম্যালডেন্ হইতে হ্যাম্পটন ৫০০ মাইল। অতদূর যাইবার পথ-খরচ আমার নাই। একদিন পাহাড়ের রাস্তায় ভাড়াগাড়ীতে করিয়া যাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর গাড়ী একটা সাদা বাড়ীর নিকট থামিল। বুঝিলাম এটা হোটেল, আমার সহযাত্রীরা সকলেই শ্বেতকায়, আমিই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। তাঁহারা সকলেই একে একে নামিয়া এক একটা কামরা দখল করিয়া বসিলেন। হোটেলের কর্ত্তা তাঁহাদের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা হইতেছে এমন সময়ে ভয়ে ভয়ে আমি হোটেলের কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হাতে এক আধ্‌লাও ছিল না। ভাবিয়াছিলাম গৃহস্বামীর নিকট ভিক্ষা করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। সেই সময়ে ভার্জ্জিনিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে হাড়ভাঙ্গা শীত। ভাবিয়াছিলাম নিশ্চয়ই হোটেলের এক কোণে আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমার কাল চাম্‌ড়া দেখিবামাত্রই আমার প্রতি কঠোর আদেশ হইয়া গেল—"তোমার এখানে ঠাঁই নাই।" পয়সার অভাবই আমেরিকায় একমাত্র কষ্ট নয়। সাদা চামড়ার অভাবও বড় বিষম পাপ—এই ধারণা সেই রাত্রে আমার প্রথম জন্মিল।

সারারাত্রি সেই হোটেলের সম্মুখে হাঁটিয়া গা গরম রাখিলাম। গৃহস্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই। হ্যাম্পটনের স্বপ্নই আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছিল।

পথের কষ্ট আরও অসংখ্যপ্রকার ভুগিয়াছিলাম। খানিকটা পদব্রজে চলিয়া, খানিকটা গাড়ীওয়ালার হাতে পায়ে ধরিয়া বিনা পয়সায় গাড়িতে চড়িয়া, খানিকটা সহযাত্রীদের নিকট পয়সা ভিক্ষা করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের একটা সহরে পৌঁছিলাম। তাহার নাম রিচ্‌মণ্ড. এখান হইতে আমার গন্তব্যস্থান আরও ৮২ মাইল।

রিচ্‌মণ্ডে পৌঁছিতে বেশী রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। হাতে পয়সা নাই—তাহার উপর ছেঁড়া ময়লা পোষাক ও কাল রং। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কত গৃহস্থের বাড়ীতে স্থান পাইবার জন্য ভিক্ষা করিলাম। কেহই একটা ভালকথাও বলিল না। সকলেই পয়সা চায়। পয়সা দিলে তাঁহাদের বাড়ীতে শয়ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ গৃহস্থেরা এইরূপেই অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন! আমি নিরুপায় হইয়া রাস্তায় হাঁটিতে লাগিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে রুটি মাংসের দোকানে কত খাদ্যদ্রব্য সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহা হইতে একটুকু

পাইলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইতাম। ভাবিতেছিলাম যদি এক টুকরা মাংসও আজ উহারা আমাকে ধার দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে চিরজীবন আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব সমস্তই উহাদিগকে মূল্য-স্বরূপ দিব প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। কিন্তু আমার প্রতি কাহারও দয়া হইল না। একটা আলু বা এক টুকরা মাংস কেহই আমাকে দিল না। আমি অনাহারে কাটাইলাম।

রিচ্‌মণ্ডের প্রথম রজনীতে আমার এই অভিজ্ঞতা। আমি ক্ষুধার্ত্ত, দুর্ব্বল ও অবসন্ন ভাবে রাস্তায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকিলাম। কিন্তু তথাপি হতাশ হই নাই—জীবনের ধ্রুব-তারাকে ভুলি নাই—হ্যাম্পটনে বিদ্যার্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই। তার পর যখন আর পায়ে হাঁটা অসম্ভব বোধ হইল, তখন রাস্তার পার্শ্বে একটা কাঠের বড় তক্তার নীচে শুইয়া পড়িলাম। কোন লোক দেখিতে পাইল না। সেই রাত্রিতে কত লোক তক্তার উপর দিয়া চলাফেরা করিল। আমি মাটিতে শরীর রাখিয়া থলেটাকে বালিশ করিয়া হ্যাম্পটনের নাম জপিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি, আমি একটা জাহাজের নিকটে রহিয়াছি। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা। জাহাজের কাপ্তেনের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার অনুমতিক্রমে জাহাজ হইতে মাল নামাইতে লাগিলাম। তারপর যথাসময়ে মজুরির মূল্য পাইয়া খাবার খাইতে বসিলাম। ওরূপ সুখের খাওয়া বোধ হয় আর কখনও আমি খাই নাই।

কাপ্তেন সাহেব আমার প্রথম কাজেই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে আরও কাজ দিতে চাহিলেন। আমি রাজী হইলাম। যে মূল্য পাইতাম তাহা দিয়া দৈনিক আহারের খরচ চলিত—কিন্তু ঘরভাড়া কুলাইত না। কাজেই অল্প খাইয়া থাকিতাম—এবং রাত্রে আসিয়া সেই কাঠের তলায় মাটির উপরে শুইয়া থাকিতাম। এই উপায়ে কিছু পয়সা বাঁচিল। তাহার দ্বারা রিচ্‌মণ্ড হইতে হ্যাম্পটনে যাইবার খরচ সংগ্রহ করিলাম।

এই ঘটনার বহুকাল পরে রিচমণ্ডের নিগ্রো অধিবাসিগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। সম্বর্দ্ধনা-উৎসবে অন্ততঃ দুই হাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও রমণী যোগদান করিয়াছিল। ঘটনাচক্রে সেই কাঠের তক্তার সমীপবর্ত্তী এক গৃহে এই অভ্যর্থনা ও সাদর-সম্ভাষণাদি নিষ্পন্ন হয়। সকলে অতি আন্তরিকতার সহিতই আমাকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু এই আনন্দের দিনে আমি সম্বর্দ্ধনা অভিবাদন প্রভৃতিতে একেবারেই যোগ দিতে পারি নাই। আমি আমার রিচ্‌মণ্ডে প্রথম পদার্পণের কথাই মনে করিতেছিলাম। সেই রজনীর অভিজ্ঞতাই আমার চিত্তে অন্যান্য সকল চিন্তার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আমি সেই রাস্তার পার্শ্বের কাঠের তক্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কাপ্তেন মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া আমি আমার তীর্থযাত্রায় আবার বাহির হইলাম। হ্যাম্পটনে পৌছিবার পথে এবার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, পৌছিবার সময় হাতে ১॥৵০ পুঁজি থাকিল।

বিদ্যামন্দিরের বহির্ভাগ দেখিয়াই আমি রোমাঞ্চিত হইলাম। বড় বাড়ী যেন রাজ-প্রাসাদ। বিদ্যালয়ের এই ত্রিতল ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ আমার হৃদয়ে একটা নব জগতের বার্ত্তা আনিয়া দিল। ধনি-সমাজ, আপনারা

যদি একবার বুঝিতে পারিতেন যে, নূতন শিক্ষার্থীর চিত্তে বিদ্যালয়-গৃহের দৃশ্য কি অপরূপ ভাবলহরী সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আপনারা বোধ হয় আপনাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দেশের বিদ্যামন্দিরগুলিকে নানা উপায়ে সুন্দর সুশ্রী ও অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। আপনারা শিশুহৃদয়ের কোমল চিন্তাগুলি কখনও কল্পনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? নব শিক্ষার্থীর অন্তরের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি? আমি হ্যাম্পটনের বিদ্যালয়-গৃহটি দেখিয়া নূতন জীবন লাভ করিলাম—সবই যেন নূতন বোধ হইতে লাগিল—আমার চোখ একটা নূতন দৃষ্টি শক্তি পাইল। জগতের সকল পদার্থই এক নবভাবে আমার নিকট দেখা দিল—আমি সত্যসত্যই সেই চিরবাঞ্ছিত স্বর্গ-রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমি বাহিরে কাল বিলম্ব না করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হইলাম। প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমার বেশভূষা ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহাদের যোগ্য ছাত্র বিবেচনা করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন—এ একটা সঙ্, ছেলে-খেলা করিতে আসিয়াছে। অবশ্য একেবারে তাড়াইয়াও দিলেন না। আমি তাঁহার আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিখিবার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। ইতিমধ্যে কত নূতন নূতন ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল—আমাকে ভর্ত্তি করিলে ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইব না।

কয়েক ঘণ্টা পর শিক্ষয়িত্রী আমার উপর সদয় হইলেন। তিনি বলিলেন, "ওখানে ঝাঁটা আছে, ওটা লইয়া পার্শ্বের ঘরটা ঝাড় দাও ত।"

আমি বুঝিলাম—ইহাই আমার পরীক্ষা। রাফ্‌নার-পত্নীর গৃহে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এইবার তাহার যাচাই হইতেছে। ভাল কথা—আমি মহা আনন্দে ঘর পরিষ্কার করিতে গেলাম।

ঘরটা একবার দুইবার তিনবার ঝাড়িলাম। একটা ন্যাকড়ার ঝাড়ন ছিল—তাহা হইতে ধূলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। দেওয়ালের আশে পাশে অলি গলিতে যেখানে যটুকু ময়লা জমিয়াছিল সমস্তই পরিষ্কার করিলাম। বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক ইত্যাদি কাঠের সমস্ত আস্‌বাবই ঝাড়িয়া চক্‌চকে করিয়া রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম ঝাড়া হইয়াছে। তিনিও 'ইয়াঙ্কি' রমণী। তিনি খুঁটিনাটি সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়া বুঝিলেন ময়লা কিছুই নাই। নিজের রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন—চেয়ারের কোণ হইতেও কিছু ধূলা বাহির হয় কি না। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, ছোকরা বেশ কাজের।" আমি 'পাশ' হইলাম।

বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময়েও কোন বালককে এত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় না। হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইলে শুনিয়াছি ছাত্রদের যথেষ্ট 'বেগ' পাইতে হয়। যাহারা 'প্রবেশিকা' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হার্ভার্ড ও ইয়েলের কলেজে লেখাপড়া শিখিবার জন্য সার্টিফিকেট পায়, তাহারা বোধ হয় আমার এই দিনের আনন্দ কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিবে। আমিও পরে অনেক পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এই পরীক্ষার উপরই আমার ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। ইহার ফলেই আমার জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হইল। এরূপ অগ্নিপরীক্ষায় আর আমি কখনও পড়ি নাই।

হ্যাম্পটনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমার পরীক্ষাকর্ত্রীর নাম ছিল কুমারী মেরী এফ্ ম্যাকি। আমাকে নিজের খরচ নিজেই চালাইতে হইবে শুনিয়া তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের একটা খান্সামার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুনিতে হইত, খুব সকালে উঠিয়া বাড়ীর আগুন জালিয়া দিতে হইত। উনন ধরাইয়া দিতে হইত। খাটুনী যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম।

হাম্পটন বিদ্যালয়ের বহির্দৃশ্য পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু বলি। মিস্ ম্যাকি আমার জননীর ন্যায় স্নেহশীলা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও উৎসাহে আমি সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাঁহাকে আমার জীবনের অন্যতম গঠনকর্ত্রী বিবেচনা করিয়া থাকি।

একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের পরিচয় আমি এখানে পাই। তখন হইতে তিনি আমার হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। তাঁহার চরিত্রই আমার জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শস্বরূপ রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়াই আমি কর্ম্মক্ষেত্রে সাহসভরে বিচরণ করিতেছি। সেই উদারস্বভাব বৃহৎপ্রাণ পরোপকারী মহাপুরুষের নাম সেনাপতি স্যামুয়েল সি আর্মষ্ট্রঙ্গ।

সৌভাগ্যক্রমে আমি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। খাঁটি বড় লোক এবং তথাকথিত বড় লোক উভয় প্রকার নামজাদা লোকই আমি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গের ন্যায় চরিত্রবান্ ধর্ম্মভীরু মানবসেবক একজনও দেখি নাই। তিনিই আমার চিন্তারাজ্যের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মহাবীর, তাঁহাকে দেখিয়াই ত্যাগাবতার বৈরাগ্যাবতার প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট ও সাধু মহাত্মাদের পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছি বলিতে পারি। সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গকে আমি মূর্ত্তিমান্ ত্যাগধর্ম্মরূপে পূজা করিতাম।

গোলামাবাদের ঘৃণ্য জীবন এবং কয়লার খাদের দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করিবার পরক্ষণেই এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিলাম। বহু পুণ্যফলেই আমার এরূপ ঘটিয়াছিল। যেই আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম তখনই আমার মনে হইল যে, ইনি একজন আদর্শ মানব। তখনই যেন বুঝিতে পারিলাম ইঁহার ভিতর অলৌকিক, অনন্যসাধারণ বীরসুলভ শক্তি রহিয়াছে। সেই প্রথম দর্শন হইতে সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গকে আমি অনেকবার নানা ভাবে, আপনার জন ভাবে, বন্ধুভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমি আত্মীয় বিবেচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। ক্রমশঃ তিনি আমার জ্ঞানে মহৎ হইতে মহত্তররূপে অধিকতর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজার পাত্র হইয়াছিলেন।

যতই আমার বয়স বাড়িতেছে ততই আমি বিবেচনা করিতেছি যে, 'মানুষ' গড়িবার জন্য গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা বেশী নাই। পুঁথি-কেতাব, খাতা-পত্র, লাইব্রেরী, কল-কব্জা, ল্যাবরেটরী ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম

—এ সব হইতে ছাত্রেরা বেশী কিছু শিখিতে পায় না। এই নির্জ্জীব পদার্থগুলি মানুষের মনুষ্যত্ব গজাইয়া দিতে, বিশেষ সমর্থ নয়। আমি হ্যাম্পটনে থাকিবার কালে ভাবিতাম যে, এই বিদ্যালয় হইতে বাড়ী-ঘর, হাতিয়ার-যন্ত্র, খাতা-পত্র, ইট-কাঠ, বেঞ্চ-টেবিল, ইত্যাদি সবই যদি সরাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও বিদ্যালয়ের কিছু মাত্র অঙ্গহানি হইবে না। কারণ এই বিদ্যালয়ের প্রাণদাতা, এই বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, এই বিদ্যালয়ের পিতা স্বরূপ পরিচালক আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় একাকীই এই সমুদয় সাজসরঞ্জাম অপেক্ষা মূল্যবান্। তাঁহার নিকট নিগ্রো বালকেরা একবার করিয়া রোজ আসিতে পারিলেই তাহাদের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালাভের সুফল ফলিবে। আজও আমি সেই কথা বলিতেছি, প্রকৃত চরিত্রবান্ সমাজসেবক শিক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে সহবাস করিতে পাইলে যতখানি চরিত্র গঠিত হয়, মনের তেজ বাড়িতে থাকে, চিত্তের শক্তি বিকশিত হয়, কর্ম্মক্ষমতার উন্মেষ হয়, সৌজন্য-শিষ্টাচার অর্জ্জিত হয়, অন্য কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে না। আমাদের তথাকথিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে গ্রন্থ-পাঠের আড়ম্বর কমিয়া যাইবে না কি? আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রের কর্ম্মীরা সমগ্র জগতের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে রাখিয়া বালক-বালিকাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন না কি?

সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইমাস কাল আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ে কাটাইয়াছিলেন। তখন তিনি পক্ষাঘাতে ভুগিতেছিলেন। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তথাপি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার শিক্ষা-প্রচার-ব্রতে লাগিয়াই ছিলেন। কাজের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া ফেলিতে পারে—এরূপ লোক সংসারে বিরল। কিন্তু আর্মষ্ট্রঙ্গ নিজকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারিতেন—আত্মমুখী চিন্তা তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না। পরসেবাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। তিনি হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের জন্য এতদিন যাহা করিয়াছেন আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ের জন্যও সেইরূপ খাটিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে। আমাদের অঞ্চলে যেখানে যেখানে নিগ্রো-সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন, সেই সকল স্থানের জন্যও তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল কার্য্যেই তাঁহার সমান আনন্দ। তিনি নিজকে বিসর্জ্জন দিতে শিখিয়াছিলেন—আদর্শের মধ্যে তন্ময় হইতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব হইত না। যখন যেখানে থাকিতেন তখন সেইখানেই তাঁহার আত্মত্যাগী সাধনার কার্য্য চলিতে থাকিত। এখানে আমার কর্ম্মক্ষেত্র, ওটা তোমার কর্ম্মকেন্দ্র, এই আমার গণ্ডী, ঐ পর্য্যন্ত তোমার গণ্ডী—তাঁহার নিঃস্বার্থ চিত্তে এরূপ চিন্তা স্থান পায় নাই। সর্ব্বত্রই তিনি স্বার্থত্যাগের কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া লইতেন।

সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের অধিবাসী 'ইয়াঙ্কি'। বিগত সংগ্রামে তিনি এই প্রান্তের পক্ষে দক্ষিণ প্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, তিনি হয়ত দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতকায়গণের সম্বন্ধে শত্রুভাব পোষণ করিতেন। আমি বলিতে পারি, তাহা সত্য নয়। তিনি সংগ্রামের পর একদিনও কোন দক্ষিণপ্রান্তবাসী শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দা বা তিরস্কারসূচক বাক্য ব্যবহার করেন নাই। বরং যথা সাধ্য

তিনি তাহাদের উপকারের জন্য চেষ্টাই করিয়াছেন।

হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। আর্মষ্ট্রঙ্গের আরব্ধ কোন কর্ম্ম কৃতকার্য্য হইবে না—এরূপ আমরা ভাবিতেই পারিতাম না। তাঁহার যে কোন আদেশই আমরা পলকের মধ্যে সম্পন্ন করিতে প্রয়াসী হইতাম। তাঁহার আদেশ অনুসারে কাজ করিতে পাইলে আমরা কৃতার্থ বোধ করিতাম। একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। তখন পক্ষাঘাতে ভুগিতেছিলেন—নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার চেয়ার গড়ান রাস্তা দিয়া একটা পাহাড়ের উপর তোলা হইতেছিল। তাঁহার একটি ভূতপূর্ব্ব ছাত্র তাঁহার চেয়ার টানিয়া তুলিতেছিল। রাস্তা ভাল ছিল না বলিয়া সহজে ঐ কার্য্য সাধিত হয় নাই। অবশেষে যখন পাহাড়ের উপরে উঠা গেল, ছাত্রটি বলিয়া উঠিলেন—"যাহা হউক, আজ আমার সৌভাগ্য, সেনাপতির জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা কঠিন রকমের কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

যখন আমি হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ে ছিলাম তখন প্রায়ই নূতন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইত। আমাদের বড় স্থানাভাব ছিল। ছাত্রাবাসে আর ছাত্র লওয়া চলিত না। বাহিরে তাঁবু খাটাইয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া লইতে হইত। সেই সময়ে আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় পুরাতন ছাত্রদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ রাত্রে তাঁবুতে শুইয়া ঘরের ভিতর নূতন ছাত্রদের জন্য জায়গা করিতে প্রস্তুত আছ কি? অমনি প্রত্যেক ছাত্রই ঘর ছাড়িয়া দিয়া তাঁবুতে কষ্টে রাত্রি কাটাইবার জন্য অগ্রসর হইত।

আমিও এইরূপ একজন স্বার্থত্যাগী 'পুরাতন ছাত্র' ছিলাম। আমার মনে আছে—অত্যন্ত কঠোর শীতকালে আমাদের কয়েকবার তাঁবুতে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের যৎপরোনাস্তি কষ্টও হইয়াছিল। সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গের আদেশ, সুতরাং আমরা তাহা প্রাণপণে পালন করিবই। আমাদের কষ্টের কথা তাঁহাকে জানাইব কেন? আমরা একসঙ্গে দুই কাজ করিতেছিলাম—কারণ ইহার দ্বারা আর্মষ্ট্রঙ্গকে খুসী করিতাম, এবং নূতন নূতন ছাত্রের শিক্ষালাভের সুযোগ বাড়াইতে পারিতাম। এক এক রাত্রে মহা ঝড় বহিত—তাঁবু উড়িয়া যাইত—আমরা সেই কন্‌কনে শীতের মধ্যে খোলা মাঠে পড়িয়া থাকিতাম। সেনাপতি সকালে আসিয়া দেখিতেন—আমরা হাস্যমুখে প্রফুল্লচিত্তে শীত সহ্য করিতেছি।

আর্মষ্ট্রঙ্গের কথা এত করিয়া বলিবার কারণ আছে। আমি সকলকে জানাইতে চাহি যে, এইরূপ চরিত্রবলে বলীয়ান্ শিক্ষা-প্রচারকগণের প্রয়াসেই আমেরিকার নিগ্রোসমাজে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে। আর্মষ্ট্রঙ্গের আদর্শে বহু শ্বেতাঙ্গ শিক্ষিত নরনারী কৃষ্ণকায় সমাজে শিক্ষা-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আমার স্বজাতিকে উন্নতির পথে তুলিয়াছেন। জগতে এই নীরব নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীরগণের জীবনচরিত এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

হ্যাম্পটনে প্রাতিদিনকার প্রতি কর্ম্মেই, প্রত্যেক উঠা-বসায় আমি একটা নূতন কিছু শিখিতেছিলাম। সেখানকার জীবন-যাত্রা-প্রণালী এবং নিত্য কর্ম্ম-পদ্ধতি আমাকে

নানা ভাবে শিক্ষিত করিতেছিল। যথা-সময়ে নিয়মিতরূপে খাইতে হয়, এখানে আমি তাহা প্রথম উপলব্ধি করিলাম। টেবিলের উপর কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর থালা বাটি রাখিতে হয়—ইহাও আমি জীবনে প্রথম শিখিলাম। খাইতে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ খাদ্যের পর কোন্ খাদ্য লওয়া উচিত—ইত্যাদি আরও অনেকানেক বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মিল। বিছানার উপর চাদর দেওয়াও আমি পূর্ব্বে আর কোন দিন দেখি নাই। এইরূপে দৈনিক জীবন-যাপনের প্রায় সকল কর্ম্মেই হ্যাম্পটনে আমার 'হাতে খড়ী' হইল।

হ্যাম্পটনেই আমি আবার স্নান করিতেও শিখি। স্নান করিলে যে কত উপকার হয়, শরীর ও স্বাস্থ্যের কত উন্নতি হয়, চিত্তের প্রফুল্লতা বাড়িতে থাকে—তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতাম না। তখন হইতে আমি প্রতিদিন স্নান করিয়া আসিতেছি। মাঝে মাঝে এমন অনেকের বাড়ীতে অতিথি হইতে হইয়াছে, যেখানে স্নান করিবার ব্যবস্থা নাই। আমি সেখানে নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা ঝরণায় যাইয়া স্নান করিয়া পরিষ্কার হইয়াছি। নিগ্রোজাতিকে আমি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, বাড়ী তৈয়ারী করিতে হইলেই স্নানাগারও যেন প্রস্তুত করা হয়।

হ্যাম্পটনে আমার দুইটি মাত্র গেঞ্জি ছিল—ময়লা হইয়া গেলে আমি রাত্রে সাবান দিয়া কাচিয়া আগুনে শুকাইয়া লইতাম। পরদিন সকালে তাহা ব্যবহার করিতাম।

হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ খাওয়া খরচ মাসিক ৩০৲ টাকা। আমি যে খান্সামার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তাহাতে সমস্ত আয় হইত না—সুতরাং আমাকে মাসে মাসে নগদ টাকাও কিছু কিছু দিতে হইত। প্রথমে যখন ভর্ত্তি হই, তখন হাতে ১৸৵০ মাত্র ছিল। আমার দাদা কচিৎ কখনও ২।৩ টাকা পাঠাইতেন। কিন্তু তাহাতে আমার খাই খরচের জন্য দেয় টাকা কুলাইত না।

কাজেই আমি খান্সামাগিরি এত ভাল করিয়া করিতে লাগিলাম যে, শেষে আমি খাইখরচের সমস্ত টাকাই বেতনস্বরূপ পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতন ছিল বার্ষিক ২১০৲ টাকা। এতটাকা আমার সংগ্রহ করা অবশ্যই অসম্ভব ছিল। আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় একজন ইয়াঙ্কি বন্ধুকে বলিয়া আমার বেতন দেওয়াইতেন। বন্ধুটির নাম এস্ গ্রিফিথস্ মরগ্যান্। শ্রীযুক্ত মরগ্যান্ আমার হ্যাম্পটনের পুরাপুরি বেতন দিয়া আসিয়াছেন। আমি পরে যখন টাস্কেজীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি—তখন কয়েকবার এই সহৃদয় দাতার সঙ্গে দেখা করিয়া ধন্য হইয়াছি।

হ্যাম্পটনে পুস্তকাভাব ও বস্ত্রাভাব যথেষ্ট হইল। পুস্তক অবশ্য পরের নিকট ধার করিয়া লইলেই কাজ চলে। এইরূপেই আমার চলিত। কিন্তু পোষাক পাই কোথায়? সে থলের মধ্যে আমার যা কিছু সম্পত্তি তাহাতে ত এখানে চলা অসম্ভব। বিশেষতঃ সেনাপতি মহোদয় কাপড় চোপড়ের উপর বিশেষ দৃষ্টিই রাখিতেন। কোন ছাত্রের জামার বোতাম নাই দেখিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। জুতা বেশ কালী বা রং করা না দেখিলে তাঁহার বিরক্তি জন্মিত। কোটে কালীর দাগ থাকিলে কোন ছাত্র তাঁহার নিকট আসিতে ইতস্ততঃ করিত। আমার মাত্র একটি পোষাক। তাহা দ্বারাই খান্সামাগিরি ও ছাত্রগিরি করিতে হইবে। চব্বিশ ঘণ্টা এক পোষাক ব্যবহার করিয়া কি

তাহা পরিষ্কার রাখা যায়? আমার অবস্থা দেখিয়া শিক্ষক মহোদয়গণের দয়া হইল। তাঁহারা আমাকে পুরাতন জামা-পোষাকের বস্তা হইতে একটা পোষাক দান করিলেন। এই পুরাতন বস্ত্রগুলি যুক্তরাজ্যের ইয়াঙ্কি অঞ্চল হইতে হ্যাম্পটনের দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য দানস্বরূপ পাওয়া যাইত। বস্ত্র দানের এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আমার মত অসংখ্য বালক বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইত সন্দেহ নাই।

এইবার শয্যার কথা কিছু বলিব। এতদিন ত মাটিতে শুইয়া অথবা ন্যাক্‌ড়ার বস্তায় পড়িয়া রাত্রি কাটাইতে অভ্যাস করিয়াছি। হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখি—প্রত্যেকের বিছানার উপরে দুই দুইটা করিয়া চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে। দুইটা চাদরের সমস্যা আমি কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। প্রথম রাত্রিতে আমি দুইটা চাদরের নীচেই শুইলাম। দ্বিতীয় রাত্রে ভুল বুঝিতে পারিয়া—দুইটা চাদরের উপরেই শুইয়া পড়িলাম। আমার ঘরে আরও ছয় জন ছাত্র শুইত। তাহারা আমার দুরবস্থা দেখিয়া বোধ হয় মজা দেখিত এবং মনে মনে হাসিত। কেহই কিছু বলিত না। পরে তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে দুইটা চাদরের সার্থকতা বুঝিলাম। একটা গায়ে দিতে হয়—আর একটা পাতিয়া শুইতে হয়।

হ্যাম্পটনে বোধ হয় আমা অপেক্ষা ছোট ছেলে আর কেহ ছিল না। অনেক প্রবীণ পুরুষ ও স্ত্রী এখানে লেখাপড়া শিখিত। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে প্রায় চারি শত ছাত্র ও ছাত্রী ছিল। সকলকেই বিদ্যার্জ্জনে মহা উৎসুক দেখিতাম। অনেকেরই শিখিবার বয়স পার হইয়া গিয়াছে—অন্ততঃ বই মুখস্থ করিবার সময় আর তাহাদের ছিল না। তথাপি তাহারা চেষ্টা করিত। তাহাদের অকৃতকার্য্যতায় তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিত না। তাহাদের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। একে বেশী বয়স তাহার উপর দারিদ্র্য, তাহার উপর অকৃতকার্য্যতা—তথাপি তাহারা বিচলিত হইত না। এরূপ কর্ম্মযোগ বেশী দেখা যায় কি?

এত আন্তরিকতা, এত উৎসাহ, এত অধ্যবসায় এত কঠোর সাধনায় ব্রতী হইবার কারণ ছিল। তাহারা সকলেই স্বজাতিকে এবং সর্ব্বসাধারণকে উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহারা কেহই নিজ জীবনের জন্য ভাবিত না। নিজের কষ্ট, নিজের অক্ষমতা, নিজের অকৃতকার্য্যতা—এ সকল দুর্ব্বলতা ও নিরাশার কারণ তাহাদের চিত্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। সর্ব্বদা পরের কথা ভাবিত, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কথা ভাবিত, সমগ্র নিগ্রো সমাজের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিত। এজন্য লাঞ্ছনা ভয় তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আর শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কথা কি বলিব? তাঁহারা ত স্বর্গের দেবতা স্বরূপই ছিলেন। তাঁহারা নিগ্রোজাতির জন্য যে ত্যাগস্বীকার ও চরিত্রবল দেখাইয়াছেন, তাহা সভ্যতার ইতিহাস-গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। আমার বিশ্বাস, অনতিদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে সেই স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, মানবসেবা ও শিক্ষাপ্রচারের পুণ্যকাহিনী প্রচারিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মহাকবি ভাস-বিরচিত
অবিমারক নাটক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে সমাগতা হইলেন, মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হইয়া মার্ত্তণ্ড-তাপে উত্তপ্তা ধরিত্রী-দেবীর সন্তাপ কিঞ্চিৎ অপসৃত করিল, দুই একটী নক্ষত্র গগনাঙ্গনে অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইতে লাগিল, রাত্রিঞ্চর প্রাণিবর্গ আপনাদের অবাধ সঞ্চারের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্ট হইল। এই সর্ব্ব-জনাভিনন্দিত প্রদোষে রাজকুমারের হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে অর্দ্ধরাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষণক্ষীণা বিচার-শক্তি প্রকাশিত হইয়া গগনাঙ্গন বিক্ষিপ্ত তারকার শোভার অনুকরণ করিতেছিল। শান্ত-সমুজ্জ্বল ও জ্ঞান-ভাস্কর চিত্তপ্রান্তে অস্তমিত হইয়াছে। দুশ্চিন্তা রাত্রিঞ্চরীর মত অবাধে ছুটিতেছে, কখনও বা অস্তমিত জ্ঞানা-লোকের ঈষৎ প্রভায় কিঞ্চিৎ চকিত হইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যাদেবী অপসৃতা হইলেন। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে তিমির-গহন নিশীথ-কাল উপস্থিত হইল। নায়কের চিত্তও অবিবেক-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠার প্রেরণায় অবিমারক গভীর রাত্রিতে একাকী রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। চোরের বেশ ধারণ করিয়া রজ্জু ও তরবারি হস্তে নিশীথিনীর কৃষ্ণাঞ্চলে লুক্কায়িত হইলেন, কিন্তু তখনও বিবেক-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। তাই রাজকুমার যাইতে যাইতে একবার ফিরিলেন, চিত্ত যেন কি এক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন, ভোঃ কষ্টং তারুণ্যং নাম

রাগং বিজৃম্ভয়তি সংশ্রয়তে প্রমাদং,
দোষান্ ন চিন্তয়তি সাহসমভ্যুপৈতি।
স্বচ্ছন্দতো ব্রজতি নেচ্ছতি নীতিমার্গং,
বুদ্ধিং শুভাং সুবিদুষামবশীকরোতি॥

কবির এই কথাটী কত অভিজ্ঞতাপূর্ণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুভাং সুবিদুষাং এই দুইটী পদ এখানে বিলক্ষণ ঔচিত্য পোষণ করিয়াছে। মল্লিনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "ধন্যো ভাস কবির্বয়ন্তু কৃতিনস্তৎসূক্তিসংসেবনাৎ॥"

নায়ক এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া কন্যান্তঃ-পুরের দিকে চলিয়াছেন, একবার গভীর রাত্রির ভীষণতার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইল।

গর্ভস্থা ইব মোহমভ্যুপগতাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নিদ্রয়া
প্রসাদাঃ সুগমসুপ্তনীরবজনা ধ্যানং প্রবিষ্টা ইব।
প্রস্রস্তা ইব সঞ্চিতেন তমসা স্পর্শানুমেয়া নগঃ
অন্তর্ধানমিবোপযাতি সকলং প্রচ্ছন্নরূপং জগৎ॥

অর্দ্ধরাত্রির এরূপ বর্ণনা অতি বিরল। শ্লোকটী পাঠ করিবামাত্র যেন বর্ণনীয় সময়টী সম্পূর্ণরূপে চিত্তারূঢ় হয়। মহাকবি ভাস অন্ধকার-বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। "লিম্পতীব তমোঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ" এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটীও এই মহাকবির লেখনী-নিসৃত। পরবর্ত্তী শূদ্রক মেণ্ঠ প্রভৃতি মহাকবিরাও এই শ্লোকটীর লোভ পরিত্যাগ করিতে

পারেন নাই। নায়ক গভীর রাত্রিতে তিমির-সমাচ্ছন্ন রাজপথে চলিয়াছেন, মনে হইতেছে যে,—

তিমিরমিব বহন্তি মার্গনদ্যঃ
পুলিননিভাঃ প্রতিভান্তি হর্ম্যমালাঃ।
তমসি দশদিশো নিমগ্নরূপাঃ
প্লবতরণীয় ইবায়মন্ধকারঃ॥

রাজপথনদীগুলি অন্ধকারকে যেন বহন করিতেছে। হর্ম্ম্যমালা তটের মত প্রতিভাত। দশদিক অন্ধকারে নিমগ্ন—এ অন্ধকার যেন ভেলাদ্বারা পার হওয়ার যোগ্য। অন্ধকারকে "প্লবতরণীয়" বলা বড়ই সুন্দর, বড়ই নূতন। নায়কের কন্যান্তঃপুরে গমন-প্রসঙ্গে কবি নানা প্রকার রমণীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়াছেন। কোন স্থানে পুরবাসী নায়ক-নায়িকার প্রণয়কলহ, কোথাও বা নায়কানুনয়, কোনও স্থলে তস্কর-সঞ্চার, কোথাও বা সমবেত রক্ষিবৃন্দ, কাহারও বিষয়ই কবি ভুলেন নাই। কুমার অবিমারক ক্রমে রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজভবন অত্যুচ্চপ্রাকার-পরিবেষ্টিত, কাজেই কুমার সহজে প্রবেশ-লাভ অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া চোরের ন্যায় প্রাচীরগাত্রে রজ্জু আবদ্ধ করিয়া প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই গভীর রাত্রিতে চোরের মত রাজভবনে প্রবেশ করিতেও অবিমারক ভীত হইতেছেন না। নির্ভীক চিত্তে প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনের আয়োজন করিতে করিতে ভাবিতেছেন,

"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ
কো বা "ন সিধ্যতি মমেতি" করোতি কার্য্যং।
যত্নৈঃ শুভৈঃ পুরুষতা ভবতীহ নৃণাং
দৈবং বিধানমনুগচ্ছতি কার্য্যসিদ্ধিঃ॥"

প্রাচীরগাত্রে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাচীরে আরোহণ করিলেন ও রাজভবনের শোভা দেখিতে লাগিলেন। অত্যুচ্চ হর্ম্ম্যমালা-ভূষিত নৃপ-ভবন যেন আকাশমার্গে উড্ডীন হইতেছে।

নৃপভবনমিদং সহর্ম্ম্যমালং
জিগমিষতীব নভো বসুন্ধরায়াঃ॥

অবিমারক রাজভবনে প্রবেশ করিয়া ধাত্রী-কথিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে কন্যাপুর-প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মনে হইল এই সেই সুখারোহ প্রাসাদ। যদি এই প্রাসাদ সুখারোহ না হইয়া দুরারোহ হইত, তবে কি আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতাম? কখনই না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি পদ্মকণ্টকভীত হইয়া পদ্মশোভিত জলাশয় পরিত্যাগ করে কি?

"সংসক্তনালগতকণ্টকভীতচেতা-
স্তৃষ্ণাদিতঃ ক ইহ পুষ্করিণীং জহাতি॥"

অবিমারক চোরবেশ পরিত্যাগ করিয়া কন্যাপুরপ্রাসাদে আরোহণ করিলেন। এদিকে রাজনন্দিনী কুরঙ্গী উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে অর্দ্ধরাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ধাত্রীবাক্যে নায়কের আগমন সুনিশ্চিত জানিয়া অবস্থাদুর্লভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। কুরঙ্গীর সখী নলিনিকা অবিমারকের বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বলিতেছে, "কো নু খলু বৃত্তান্তো ভর্ত্তৃদারকস্য"? এই অবসরে নায়ক প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নলিনিকাকে বলিলেন "ভবতি! অয়ং মে বৃত্তান্তঃ।" নলিনিকা নায়ককে দেখিবা মাত্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বাগত-বাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। নিদ্রাভিভূতা কুরঙ্গীকে দেখিয়া অবিমারকের আনন্দ আর ধরে না। অনিমেষ নয়নে দেখিয়াও

যেন দীর্ঘপিপাসিত দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হইতেছে না।

"দৃষ্টি র্ন তৃপ্যতি পরিষ্বজতীব সাঙ্গং,
বুদ্ধিস্বরাং ব্রজতি বোধয়তীব সুপ্তাং।
রাগোভি চোদয়তি সাদয়তীব চাঙ্গং,
হর্ষাৎ প্রসীদতি বিমুহ্যতি চান্তরাত্মা॥"

আনন্দে নায়কের চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে, আবার আনন্দাতিশয্যে চিত্ত বিমুগ্ধও হইতেছে। এই ভাবটী বড় সুন্দর। আমরা ভবভূতির নাটকে এই ভাবটী দেখিতে পাই "বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তিচ"। কুরঙ্গীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু উৎকণ্ঠা-পূর্ণদৃষ্টিতে নায়ককে দেখিতে না পাইয়া নলিনিকাকে বলিলেন, "সখি! সেই নির্দয় কি বলিয়াছিল ?" নলিনিকা বলিল "সখি! তাহা পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলিয়াছি।" উৎকণ্ঠিতহৃদয়া রাজকুমারী কি বলিতে-ছিলেন বিস্মৃত হইয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি! আমি কি বলিতেছিলাম "? সখী বলিল, "না তুমি ত কিছুই বল নাই।" রাজনন্দিনীর মনে হইল, বলিলেন, "সখি কতক্ষণ আর বসিয়া কাটাইব? অর্দ্ধ-রাত্রি ত অতীত হইয়া গিয়াছে। একবার আমাকে আলিঙ্গন কর" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। নলিনিকা নায়ককে ইঙ্গিতে অগ্রসর হইতে বলিয়া স্বয়ং পদসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কুরঙ্গী অতর্কিতভাবে নায়ককে আলিঙ্গন করিবার পরক্ষণেই রহস্য বুঝিতে পারিলেন। লজ্জায় তাঁহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া গেল।

যাহার জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত প্রয়াস, বিনীত রাজপুত্র হইয়াও চোরের মত রাজভবনে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, মদমত্ত হস্তীর আক্রমণসময়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিসময়ে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কল্পনায় যাহা পল্লবিত হইয়াছিল, আজ তাহা কুসুমিত হইয়াছে, নায়িকার সহিত নায়কের মিলন সংঘটিত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ মিলন স্থায়ী হইতে পারে না, ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় নয়, ক্ষণিক প্রেরণায় সংঘটিত হইয়াছে মাত্র, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম অতিক্রম করিতে অসমর্থ। এরূপ মিলন প্রকৃত মিলন নহে। স্বর্ণকার যেমন অগ্নি-পরীক্ষায় সুবর্ণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া তাহাতে স্বীয় শিল্প প্রকাশ করে, নিয়তিও সেইরূপ স্বীয় শিল্প-প্রকাশের পূর্ব্বে অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই পরীক্ষায় কয়জন উত্তীর্ণ হইতে পারে? কবি এই মিলনের অগ্নি-পরীক্ষা দেখাইবার আয়োজন করিলেন, মহারাজ কুন্তিভোজ অবিমারকের কন্যাপুর-প্রবেশ-সংবাদ শুনিতে পাইয়া পুররক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। অন্তঃপুরাধিকারী অব্যাহত দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নলিনিকা প্রভৃতি সখীসমূহ ভীত হইল। রাজকুমার অবিমারক নিরুপায় হইয়া কন্যাপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

"কন্যালোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং
নিপাতয়তি।"

রাজনন্দিনী শোকে, লজ্জায় ও ভয়ে ম্রিয়মাণ হইলেন আর উপায় কি? অবিমারক কোনওরূপে কন্যাপুর হইতে বহির্গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু

"অদ্যাপি তন্মম মনো ন তু মামুপৈতি
নাবেক্ষতে ময়ি তথা প্রিয়য়াবরুদ্ধং।"

প্রিয়াবরুদ্ধ চিত্ত এখনও বহির্গত হইতে পারে নাই। স্বীয় অবস্থা-পরিণতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কুমারের একবার নায়িকার অবস্থার কথা মনে পড়িল

"বাষ্পাবিলা মা মনবেক্ষমানা
মোহং ব্রজেদ্ রাত্রিষু কিং করিষ্যে ॥"

"কিং করিষ্যে" ভাবিতে ভাবিতে কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইল। ভাবিলেন "প্রাণান্ পরিত্যজামি।" দেহনিরপেক্ষা রাজকুমারীর কথা মনে করিয়া নিজের দেহেও উপেক্ষা আসিল, জীবন বঞ্চনা বলিয়া মনে হইল, প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেকে কৃতঘ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, কিন্তু কেমন করিয়া দেহত্যাগ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। কবি গ্রীষ্ম ঋতুতে মধ্যাহ্নকালের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন।

"অত্যুষ্ণা জরিতেব ভাস্করকরৈরাপীত-
সারামহী
যক্ষ্মার্ত্তা ইব পাদপাঃ প্রমুষিতচ্ছায়া-
দবাগ্ন্যাশ্রয়াৎ।
বিক্রোশন্ত্যবশাদিবোচ্ছ্রিত গুহা ব্যাত্তাননাঃ
পর্ব্বতাঃ
লোকোঽয়ং রবিপাকনষ্টহৃদয়ঃ সংযাতি
মূর্চ্ছামিব ॥"
লিম্পন্তি রুক্ষপবনাঃ সিকতাগ্নিচূর্ণৈঃ
সংস্বেদয়ন্তি চ নগাঃ পরুষৈঃ পলাশৈঃ।
দাবৈ দ্রবীকৃততনুঃ স্রবতীব ভাস্বান্ ॥

বিরহ ক্রমেই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। মৃত্যুর নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অদূরে দাবাগ্নি দর্শন করিয়া দাবাগ্নিতে দেহ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দাবাগ্নির সমীপে যাইয়া বলিলেন ভগবান্ হুতাশন!

"ইষ্টং চেদকেচিন্তানাং যদ্যগ্নিঃ সাধয়িষ্যতি।
পরত্রাপি চ মে কান্তা সা ভবেদেককীর্ত্তনী ॥"

বলিতে বলিতে অধীর হইয়া দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অনুরক্তি-পরীক্ষার সমাপ্তি হইল। কবি প্রীতির ভিত্তিতে বজ্র প্রহার করিয়া তাহার দৃঢ়তা দেখাইলেন। প্রজ্বলিত বহ্নিতে নায়কের শরীর দগ্ধ হইল না দেখিয়া কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন "অগ্নির্দয়াং হি কুরুতে মদনাতুরেঽপি!!" "কিমতঃ পরং বিস্ময়নীয়ং অগ্নিঃ খলু মাং ন দহতি। অথবা এতদপ্যস্তি কারণং" বলিয়া দাহাভাবের কারণটী প্রকাশ করিলেন না। অন্য উপায়ে দেহ ত্যাগ করিয়া অসহনীয় দুঃখের প্রতিকারপ্রয়াসী হইলেন। অদূরে অসিতজলদবৃন্দশোভিত শৃঙ্গ নানা বর্ণের গৈরিকচিত্রিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পর্ব্বতের চিত্রটী বড় সুন্দর।

"অসিতজলদবৃন্দৈ মিশ্রসন্দিগ্ধশৃঙ্গো
গগনচরকুলানাং বিশ্রমস্থানভূতঃ।
সুকবি মতিবিচিত্রো মিত্রসংযোগহৃদ্যো
নরপতিরিব নীচো দৃশ্যতে নিষ্কলাঢ্যঃ ॥"

বহুবর্ণ-সমাবেশ হেতু পর্ব্বতটী সুকবি-মতির ন্যায় বিচিত্র হইয়াছে। এই কথাটী বড় রমণীয়, কবি-হৃদয়জ্ঞতার অতি সুন্দর পরিচয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাস কবির প্রাকৃতিক বর্ণনা অতি বিরল। আলোচ্য নাটকের এই অংশ পাঠ করিলে তাঁহাদের এই ধারণা বিনষ্ট হইবে।

অবিমারক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতীয় শীতল জলে স্নান ও আচমন করিয়া পবিত্র ভাবে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এত উৎকণ্ঠাতেও জীবিত লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই, নায়িকার সহিত প্রকৃত মিলনে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহা কামাতুরের ক্ষণিক মিলন নহে, তাই বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধির এত প্রয়োজন। বিশুদ্ধ অবস্থায় মিলনই প্রকৃত মিলন। অবিমারক ধ্যানমগ্ন হইয়া

পর্ব্বতোপরি সমাসীন হইয়াছেন এমন সময় আকাশ-পথে একটী বিদ্যাধরমিথুন মধ্যাহ্ন-নিদ্রাসুখ চন্দননগমলয়াচলে গমনেচ্ছু হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য উপস্থিত হইল। বিদ্যাধর-মিথুনের আকাশধামে আগমন প্রসঙ্গে কবি দূর হইতে পরিদৃশ্যমানা ধরিত্রী-দেবীর একটী সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।

"শৈলেন্দ্রাঃ কলভোপমা জলধয়ঃ
ক্রীড়াতটাকোপমা,
বৃক্ষাঃ শৈবালসন্নিভাঃ ক্ষিতিতলং
প্রচ্ছন্ননিম্নস্থলং।
সীমন্তা ইব নিম্নগাঃ সুবিপুলাঃ
সৌধাশ্চ বিন্দূপমা;
দৃষ্টং বক্রমিবাভিভাতি সকলং
সংক্ষিপ্তরূপং জগৎ ॥"

অর্থাৎ সুবিপুল পর্ব্বতমালা করিশিশুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। উদধি যেন ক্রীড়াপুষ্করিণী সদৃশ, বৃক্ষরাজী পৃথিবীর উপরিভাগে শৈবাল সদৃশ, পৃথিবীর নিম্নস্থান-সমূহ প্রচ্ছন্ন হইয়া সমতলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নদী সকল সীমন্ত-লেখার ন্যায় প্রকাশিত, সম্মুখস্থিত কুন্তিভোজনগরীর অত্যুচ্চ সৌধমালা বিন্দুসদৃশ, জগৎ যেন সংক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। এ স্থলে "দৃষ্টং বক্রমিবাভিভাতি" কথাটী চিন্তাগম্য। পৃথিবীকে যেন বক্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যাঁহারা গগনপথে বিচরণ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

আবার যখন বিদ্যাধর-মিথুন বেগে গগন-মণ্ডল হইতে পর্ব্বতে অবতরণ করিতেছেন সে সময়ের চিত্রটীও সুন্দর—

"জলদগহন মুঞ্চতীব বেগা
দভিপততীব মহী সমুদ্রমুদ্রা।
জলদ সময় তোয়দা ইবামী
ভৃশমভিভান্তি নগা বিজৃম্ভমানাঃ ॥"

মনে হইতেছে সমুদ্র-মুদ্রা মহী যেন বিদ্যাধর-মিথুনের দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; পর্ব্বত-সমূহ দিগ্‌ব্যাপিনী মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইতেছে।

আমরা এস্থলে অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

মহারাজ দুষ্মন্ত মাতলির সহিত ইন্দ্রালয় হইতে বিমানে আরোহণ করিয়া মনুষ্যলোকে আসিতেছেন, মহারাজ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন,

"শৈলানামবরোহতীব শিখরা-
দুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি
স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানাত্তনুভাব নষ্টসলিলা ব্যক্তিং
ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনা প্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং
মৎ পার্শ্বমানীয়তে ॥"

এই শ্লোকের চতুর্থ চরণ ভাস-বর্ণিত অভিপততীব কথাটীরই ব্যাখ্যাস্থানীয়।

বিশ্রামার্থী হইয়া বিদ্যাধরমিথুন সেই পর্ব্বতে অবতরণ করিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজকুমার অবিমারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের পরস্পর আলাপে উভয়েই আপ্যায়িত হইলেন। বিদ্যাধর স্বীয় বিদ্যা-প্রভাবে জানিতে পারিলেন কুমার অবিমারক অগ্নির পুত্র, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বীয় মাহাত্ম্যের উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না; রাজনন্দিনীর লাভে নিরাশ হইয়া জীবন বিনাশে উদ্যত হইয়াছেন। নায়কের অবস্থা দর্শন করিয়া বিদ্যাধরের করুণার সঞ্চার হইল। বিদ্যাধর রাজকুমারের সহায় হইলেন, লোক-লোচনের অদৃশ্যতা সম্পাদক একটী অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া কুমার অবিমারককে অনুগৃহীত

করিলেন। অঙ্গুরীয়ক লাভ করিয়া কুমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, বাধা প্রদান করিয়া বিদ্যাধর বলিতেছেন—

"ন ন অহমেবানুগৃহীতঃ কৃতঃ
ন তথা রত্নমাসাদ্য স্বজনঃ পরিতুষ্যতি।
যথা তৎ তদ্‌গতাকাঙ্ক্ষে পাত্রে দত্ত্বা প্রহৃষ্যতি"

রাজকুমার! তুমি অনুগৃহীত নও, বস্তুতঃ আমিই অনুগৃহীত হইলাম। সজ্জন রত্নলাভে ততদূর আনন্দিত হয়েন না, রত্নপ্রার্থীকে সেই রত্ন প্রদান করিয়া যেমন আনন্দিত হইয়া থাকেন। এইরূপে রাজকুমারকে অনুগৃহীত করিয়া বিদ্যাধর বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালীন বিদ্যাধরের উক্তিটী বড় রমণীয়—

"সখ্যৈ মম প্রতিনিবেদয় মামিমাং চ
ত্বং মামনুস্মর সখে! গতিরীক্ষ্যতাং মে।"

রাজকুমার, তুমি আমার সখীর নিকটে আমার ও আমার সহচরীর প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইবে, তুমিও আমাকে মনে রাখিবে ইত্যাদি।

অবিমারক কৃতার্থম্মন্য হইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন, অবতরণ-পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এদিকে কুমারের অকৃত্রিম বন্ধু বিদূষক কুমারের বিরহে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনাহারে অনিদ্রায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছেন, কোথায়ও বয়স্যের সন্ধান পাইতেছেন না, সঙ্কল্প করিয়াছেন "যদি ন প্রেক্ষে তত্র ভবতঃ পরত্র সহায়ো ভবিষ্যামি।"

শূন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই পর্ব্বতের নিকটে আসিয়াছেন। শরীর ও মন ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম করিবার জন্য একটী বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। রাজকুমার ঘটনাক্রমে বিদূষকের সমীপবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছেন, প্রাণাধিক বয়স্যের কথা মনে পড়িয়াছে, ভাবনায় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মনে হইল সেই সরলহৃদয় ব্রাহ্মণকুমার যদি আমার সংবাদ না জানিতে পারিয়া থাকে, তবে হয়ত তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইবে। হায়! তেমন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাইলে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?

"গোষ্ঠীষু হাস্যঃ সমরেষু যোধঃ
শোকে গুরুঃ সাহসিকঃ পরেষু।
মহোৎসবো মে হৃদি কিং প্রলাপৈ-
র্দ্বিধাবিভক্তং খলু মে শরীরং॥"

বিদূষকের প্রতি নায়কের এরূপ অনুরাগ আমরা অন্য নাটকেই দেখিতে পাই। রাজকুমার উৎকণ্ঠিতচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে করিতে বৃক্ষতলে শয়ান একটী পথিককে দেখিতে পাইলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এ পথিক আর কেহ নয়, তাঁহারই প্রিয় বয়স্য। রাজকুমার দ্রুত-গতিতে বিদূষকের সম্মুখীন হইলেন, বিদূষকের নিদ্রা ভাঙ্গিল, উভয়ে উভয়ের স্নেহালিঙ্গনে বিরহশোক পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে বিরহ-ব্যাকুলিতা রাজনন্দিনী কুরঙ্গী প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। সখীবৃন্দ নানা উপায়ে কুরঙ্গীর চিত্ত-বিনোদনের প্রয়াস পাইতেছিল, প্রাসাদে আরোহণ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে বিদ্যুল্লতা-লিঙ্গিত নীল স্নিগ্ধ জলধর সূর্য্যবিম্ব আবৃত করিল, মেঘ দেখিয়া কুরঙ্গীর চিত্তে কত কি ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এমন সময় বয়স্যের সহিত রাজকুমার অঙ্গুরীয়কপ্রভাবে লোকলোচন অতিক্রম করিয়া কন্যাপুর-প্রাসাদের সম্মুখীন হইলেন।

অবিমারক দূর হইতে কুরঙ্গীর বিরহক্লিষ্ট মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইলেন। বিমুক্তভূষা হাবভাবশূন্যা নির্ব্যাজমনোহরাঙ্গী কুরঙ্গী যেন হেতুবর্জিত বেদশ্রুতির ন্যায় প্রতীয়মানা হইল। নায়ক বলিতেছেন—

"রোগাদকালাগুরুচন্দনার্দ্রা,
বিমুক্তভূষা গতহাবভাবা।
বিভাতি নির্ব্যাজমনোহরাঙ্গী,
বেদশ্রুতি র্হেতুবিবর্জিতেব ॥"

হেতুবিবর্জ্জিত বেদশ্রুতি কথাটীতে যে কত ভাব নিহিত আছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।

অঙ্গুরীয়ক-প্রভাবে অলক্ষিতশরীর রাজকুমার নিঃশঙ্কচিত্তে বিদূষকের সহিত কন্যাপুরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে কুরঙ্গীর সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, রাজকুমারী একাকিনী আকাশে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, কি যেন এক ভাবতরঙ্গে নায়িকার চিত্ত বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অলক্ষিতভাবে একটী কথা নায়িকার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া তীব্রভাবে রাজকুমারের চিত্তে বিদ্ধ হইল। নায়ক বুঝিলেন রাজনন্দিনী আত্মহত্যায় উদ্‌যুক্তা হইয়াছেন। অবিমারক আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অঙ্গুরীয়কটী দক্ষিণ হস্ত হইতে বামহস্তে ধারণ করিয়া দ্রুতগতিতে যাইয়া কুরঙ্গীকে আশ্বস্ত করিলেন।

সৌবীররাজ ঋষিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কুন্তিভোজ নগরে-বাস করিতেছিলেন, শাপাবসানে কুন্তিভোজ-রাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে উভয়কে প্রেমালিঙ্গনে তৃপ্ত করিলেন। এই স্থলে কুন্তিভোজের উক্তি বড় মধুর—

"কিং প্রেক্ষসে মম মুখং চিরকালদৃষ্টো
গাঢ়ং পরিষ্বজ সখে! স্মর বালভাবং।
প্রীত্যা ভবন্তমনিমেষমবেক্ষিতুং মে;
স্নেহান্নবীকৃত ইবাদ্য বয়স্যভাবঃ ॥"

সৌবীররাজ দীর্ঘকাল পুত্র অবিমারকের অদর্শনে ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। আজ পরমসুহৃদ কুন্তিভোজের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে হৃদয়নিহিত শোকরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অশ্রুসংবরণ করিতে করিতে সৌবীররাজ বলিলেন—

"যো মে পুত্রগতঃ শোকো
হৃদয়স্থো বিজৃম্ভতে।
সোঽদ্য লব্ধা সহায়ং ত্বাং
বাষ্পরূপেণ নির্গতঃ ॥"

এই শ্লোকটী পাঠ করিলে পতিশোকাকুলা রতির "বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে" কথাটী মনে পড়ে। কুন্তিভোজ সৌবীররাজের মুখে পুত্রশোকের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলে সৌবীররাজ স্বীয় আমূল বৃত্তান্ত কুন্তিভোজরাজকে শুনাইলেন। মহারাজ কুন্তিভোজ অবিমারকের বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। অতঃপর দেবর্ষি নারদ আসিয়া সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। কুন্তিভোজরাজ পরম প্রীত হইয়া স্বীয় তনয়া কুরঙ্গীকে সৌবীররাজকুমার অবিমারকের সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের সময় অবিমারকের প্রতি কুন্তিভোজের আশীর্ব্বচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"ক্ষময়া জয় বিপ্রেন্দ্রান্ দয়য়া জয় সংশ্রিতান্।
তত্ত্ববুদ্ধ্যা জয়াত্মানং তেজসা জয় পার্থিবান্ ॥"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-
বেদান্ততীর্থ।

ইংলণ্ডে ভারতীয় সাহিত্য-প্রচার

পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যের আদর, প্রাচ্যের প্রতি সম্মান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে বিভিন্নবিষয়ক যতবিধ আন্দোলন চলিতেছে, ভাবতবর্ষকে বুঝিবার ভারতের অতীত-বর্ত্তমানকে সম্যক্ অবগত হইবার আন্দোলন তাহাদের অন্যতম।

এই আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। এটী শুভ লক্ষণ। কারণ সাহিত্য জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-রাষ্ট্র, শিল্প-বাণিজ্য, কলা-কৌশল প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের দর্পণস্বরূপ। একটী জাতি কোন্ যুগে বিভিন্ন বিষয়ে কিরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সেই জাতীয় জীবন-সমুদ্রে কখন কিরূপ বৈচিত্র্য-ময় চরিত্র-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা সেই জাতির সাহিত্য আলোচনা না করিলে জানিতে পারা যায় না।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের জাতীয় জীবন অবগত হইতে হইলে, সমগ্র জগতের নিকট বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদিগের কিরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এবং আমাদিগের জাতীয়-জীবনের বিশেষত্বের সন্ধান লইতে হইলে আমাদিগের সাহিত্য-সম্পদ্ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রায় দেড়শত বৎসরেরও অধিক হইল ইংরাজগণ ভারতে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু এতদিন তাঁহারা ভারতের জাতীয়-জীবনের প্রতি, ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি এক প্রকার অনাস্থাই প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সে ভাব আর নাই, এখন তাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র, সাহিত্য-কলা প্রভৃতি অবগত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যতই তাঁহারা এই সকল বিষয় অবগত হইবেন ততই তাঁহারা ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম্ম ও চিন্তা-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে মিঃ জে, ডি, ম্যাণ্ডার্সন বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। প্রধানতঃ দুই উপায়ে তথায় ভারতীয় সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে। প্রথমতঃ ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ, দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে ইংরাজীতে অনূদিত ভারতীয় নাটকের অভিনয়-প্রচলন। শেষোক্তটীর চিত্তাকর্ষণী শক্তি প্রাচ্যসাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতেছে। নাটকের অভিনয় প্রচলন বিষয়ে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্তের কার্য্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এস্থলে ইহা উল্লেখ্য যে ইউরোপে জার্ম্মাণ-গণই ভারতীয় সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এখানেই সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা অধিক। পাশ্চাত্য জগতে জর্ম্মাণিতেই ভারতীয় নাটকের অভিনয় অধিক হইয়া থাকে। প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় রমেশ-চন্দ্র দত্ত জর্ম্মাণির উইসবাডেন ও ফ্রাঙ্কফোর্ট

নগরে দোকানে দোকানে সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের জার্ম্মান্ অনুবাদ 'বসন্তসেন' নামে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছিলেন। এখানকার জনসাধারণের নিকট ইহা সুপরিচিত ছিল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম মহাকবি কালিদাসের অতুল সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন নাটক 'শকুন্তলা' ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া অভিনীত হয়।

ইংলণ্ডে ভারতের অতুলনীয় সাহিত্য-সম্পদের কথা যতই পৌছিতে লাগিল, ততই ইহা উপভোগের স্পৃহা তাঁহাদের বলবতী হইতে লাগিল এবং ইহার ফলে ভারতের মহাকবি কালিদাসের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাই কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক শকুন্তলা সর্ব্বাগ্রে অভিনীত হইল।

লণ্ডনের 'রয়াল বোটানিক সোসাইটীর (Royal Botanic Society) উদ্যানে এলিজাবেথান ষ্টেজ সোসাইটী (Elizabethan Stage Society) এই অভিনয় প্রদর্শন করেন। 'শকুন্তলা' সর্ব্বপ্রথমে সার উইলিয়াম জোন্স কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হয়। যে সময়ে ইহা অভিনীত হয়, তখন ইহার মাত্র দুইটী ইংরাজী অনুবাদ ইংলণ্ডে বিদ্যমান ছিল। প্রথমটী সার জোন্স কৃত এবং দ্বিতীয়টী সার মনিয়ার উইলিয়ামস্ কৃত। কিন্তু এই দুইটী অনুবাদের কোনটীই রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না। অবশেষে সার জোন্সের 'শকুন্তলা'ই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে অভিনীত হয়।

এই সময়ে লণ্ডনে রমেশচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার মল্লিক, শ্রীযুক্ত জি, সিংহ এবং আরও অনেক ভারতসন্তান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্নতার জন্য বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এইজন্য ষ্টেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত জি, সিংহ তখন লণ্ডনে ছাত্ররূপে অবস্থান করিতেছিলেন, ইনি দৈনিক কর্ত্তব্যের ক্রটী না করিয়া কৃত-অবসর সময়ে অভিনেতা-দিগকে সাজসজ্জা, ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি নাট্যকলার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অভিনয়ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট সন্তান উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কয়েকটী বিখ্যাত সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল।

'ষ্টাণ্ডার্ড' লিখিয়াছিলেন "শকুন্তলা বিদ্যমান নাটকসমূহের মধ্যে শুধু যে অতি প্রাচীন তাহা নহে, ইহা অত্যন্ত মধুর ও চিত্তাকর্ষক।"

'ডেলি মেল' বলিয়াছিলেন "ইহাকে অভিনয় না বলিয়া সুন্দর, সরস ও মনো-মুগ্ধকর কবিতা বলা যাইতে পারে।" 'ডেলি ক্রনিকল্, বলিয়াছেন "শকুন্তলার নাটকীয় প্রভাব একেবারেই বর্ত্তমান যুগোপযোগী।

১৯১২ অব্দের গ্রীষ্মকালে ঐ সোসাইটী কর্ত্তৃকই কেম্ব্রিজে দ্বিতীয়বার 'শকুন্তলা' অভিনীত হয়।

প্রথম বারের অভিনয় অপেক্ষা এই অভিনয় আরও অনেক বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে। অভিনেতৃগণের কলাকৌশল প্রদর্শন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। এবং ইংলণ্ডবাসীর প্রাচ্য নাট্য-সাহিত্যের রস-গ্রাহিতারও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আর একটী প্রধান উপকার হইয়াছে এই যে, ইতিপূর্ব্বে তথাকার শিক্ষাবিভাগীয় যে সকল মনীষী প্রাচ্য সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা শুধু

নাট্য-সাহিত্যে নহে, ভারতের সকল প্রকার সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

ইংলণ্ডে নাটকীয় সমালোচনার জন্য সুবিখ্যাত পত্রিকা 'ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ান' এই অভিনয় সম্বন্ধে বলেন "এই অভিনয় দর্শনে দর্শক অসামান্য কাব্য-সাহিত্য উপভোগ করিতে থাকেন।"

এই অভিনয়ের সৌষ্ঠবসাধনে শ্রীযুক্ত পি, কে, রায়ের এবং পি, এল্, রায়ের পত্নী বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইহার পর 'শকুন্তলা'র আরও কয়েকটী অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী গত-পূর্ব্ব জানুয়ারীতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্তের উদ্যোগে বিলাতের 'রয়াল আলবার্ট হল' থিয়েটারে অভিনীত হয়। কেদার বাবু ছাব্বিশ প্রকার বিভিন্ন অনুবাদ হইতে সঙ্কলন করিয়া এই উপাদেয় সংস্করণ প্রস্তুত করেন। এই অভিনয়ে ঝালওয়ারের মহারাজা, জার্ম্মাণির রাজদূত, সার্ভিয়া এবং দেন্মার্কের মন্ত্রী এবং বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই অভিনয়ের অধিকতর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯১২ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারই উদ্যোগে রয়াল কোর্ট থিয়েটারে এডউইন্ আরনল্ড কৃত 'লাইট অব্ এসিয়া' নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত এস, সি বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বুদ্ধ' অভিনীত হয়।

এই অভিনয়টী এত উপাদেয় হয় যে, এক সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রত্যহ ইহার অভিনয় চলিয়াছিল।

এই বৎসরই জুন মাসে শ্রীযুক্ত দাস গুপ্তেরই আয়োজনে আলবার্ট হল থিয়েটারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'আরাকানের মহারাণী' অভিনীত হয়। ইহা আরও মধুর এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই মাসে বিলাত-প্রবাসী কতিপয় ভারতীয় ছাত্র কর্ত্তৃক বঙ্কিম বাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকাকারে প্রণীত হইয়া 'আয়েসা' নামে লণ্ডনের হুইটুনী থিয়েটারে অভিনীত হয়।

শ্রীযুক্ত দাস গুপ্ত বিলাতে ভারতীয় নাট্যের প্রতি তত্রত্য জনসাধারণের আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু চেষ্টা ও শ্রম করিতেছেন। নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়া ভারতীয় কলা ও সভ্যতার প্রচারই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।

নাটকের প্রচার বিষয়ে অধ্যাপক এ, ডবলিউ বাইডারের কার্য্যও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় অনূদিত নাটকসমূহ অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে বলিয়া ইহার বহুল প্রচার সাধিত হইতেছে।

নাট্য-সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে তথায় ভারতীয় কলারও বেশ প্রচার হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরাজীতে অনূদিত কবিতাগুলি এবং গীতাঞ্জলীর প্রচার ইংলণ্ডের সাহিত্যিক সমাজে ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার গভীর-চিন্তা-প্রসূত কবিতাসমূহে ভারত-প্রকৃতি চিত্রিত।

এতদিন ধরিয়া ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি ইংলণ্ডবাসীর যে অনুরাগ উষার অস্পষ্ট ভাব ধারণ করিয়াছিল, প্রাচ্য রবির কিরণ-জাল তাহাকে সম্যক উজ্জ্বল করিয়াছে। ইহাতে শুধু ইংলণ্ডে নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি অপূর্ব্ব অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতের অন্যান্য উচ্চ সাহিত্যের ন্যায় বহু সম্মান লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রচারের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্য মৃদুমন্দগতিতে যেরূপভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য যাঁহারা এই প্রচার-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ অনেক হইয়াছে। সকলগুলির আলোচনা বর্ত্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এতদ্ব্যতীত ভারতের মূল সাহিত্যও তথাকার অনেকে পড়িয়া থাকেন কিন্তু এই গুলির অধিকাংশই বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, জনসাধারণের নিকট অপরিচিত এবং দুরধিগম্য। দেশের ইতিবৃত্ত বা সমাজচিত্র, নাটক, উপন্যাস অথবা গল্পরাজির আকারে যত সরস এবং চিত্তাকর্ষক হয় ও জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে পারে, নীরস বিবরণী তাহা পারে না। শিক্ষার্থী ঐতিহাসিক কিম্বা অনুসন্ধানকারী প্রভৃতি বিশেষ কোন শ্রেণীর পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় এবং উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের নিকট তাহা অনাবশ্যক, অরুচিকর এবং অনেক স্থলে দুর্বোধ্য হইয়া থাকে।

পরলোকগত লালবিহারী দের Folk-tales of Bengal বা বাঙ্গালার উপকথা পড়িয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ বঙ্গবাসীর এক সময়ের অতি স্পষ্ট সমাজ-চিত্র পাইয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহাদের নিকট ইহার আদর দিন দিন এত অধিক হইয়াছে। কেবল ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বাক্য-বিন্যাসের মনোহারিতার জন্য তাঁহারা এই গ্রন্থের আদর করেন তাহা নহে, বাঙ্গালীর দৈনিক জীবন-যাপন ইহাতে মধুরভাবে অঙ্কিত আছে বলিয়াই ইহার এত সমাদর। শ্রীযুক্ত এস, বি, বানার্জ্জি প্রণীত বঙ্গকাহিনীও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। মিষ্টার এফ. এইচ্ স্ক্রাইন কিছুদিন হইল Tales of Bengal নাম দিয়া ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নিরীহ প্রজাগণের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করিয়া দেশের মধ্যে হাহাকারের সৃষ্টি করিয়াছিল স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে তাহা প্রকটিত। রেভারেণ্ড জে, লং কর্ত্তৃক তাহা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বলিয়াই ইংলণ্ডের জনসাধারণ নীলকরদিগের এই বীভৎস আচরণের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর,' 'আনন্দমঠ,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রভৃতি গ্রন্থও ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন সেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীপ্রণীত 'বাল্মীকীর জয়' এবং ৺কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রসিনারা' ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বপ্রণীত অনেকগুলি উপন্যাস ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ বিভিন্ন-যুগ-চিত্র-পূর্ণ বহু মূল এবং ভাষান্তরিত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতেছে।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' এবং 'সতী' ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। শেষোক্তটী পুরাণ-কথিত সতীর দেহত্যাগ-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

'সতী' পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যসমাজ সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজের একটী উজ্জ্বল চিত্রের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—পতিই হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠ দেবতা, পতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান এবং সেবা-শুশ্রূষার জন্যই পত্নীর দেহ-ধারণ; পতিকে বাদ দিয়া স্বতন্ত্র-ভাবে জগদুপভোগের জন্য দেহ-ধারণের আবশ্যকতা হিন্দু রমণী উপলব্ধি করিতে পারে নাই, পতির সুখেই হিন্দু রমণীর সুখ এবং পতির দুঃখেই দুঃখ। সতী এই পাতিব্রত্যের মূর্ত্তিমতী আদর্শ। পতিপরায়ণতার উজ্জ্বল আদর্শ জগতের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম-পরিগ্রহ। পতি-নিন্দা-শ্রবণে কাতরা হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। এরূপ ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের অনাবিল আদর্শ পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে কি না জানি না।

যে যুগে পাশ্চাত্য রমণীগণ পুরুষ-শাসন ছিন্ন করিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোষণা করিতেছেন, সেই যুগে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় স্ত্রীজাতির এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের আদর্শ তাঁহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিতেছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্যের ভোগ-জগতে প্রাচ্যের ত্যাগ-বাণী আজ নূতন প্রচারিত হইতেছে না। ভারতের বেদান্তদর্শন পাশ্চাত্য জগতে যে গভীরতত্ত্বসমূহ প্রচার করিতেছে, বিবেকানন্দ তাঁহাদের ভোগপ্রবণ বিজ্ঞান-জগতে ভারতের যে আধ্যাত্মিকতা এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য যাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছে, ইহাও তাহারই অন্যতম প্রতিধ্বনি।

এই সাহিত্য-প্রচার ইউরোপীয় ভাব-জগতে একটী নূতন রকমের বিপ্লব সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। বহু প্রকারে ভারতীয় সুমহান্ আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজের লক্ষ্য-গোচর হইতেছে। বোধ হয় অদূর-ভবিষ্যতেই ভবিষ্যদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মহাবাক্য সফল হইবে। আমরা সেই মহাবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম—

"যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে; তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।"

শ্রীব্রজগোপাল দাস।

হস্তীর জীবন-যাত্রা

সহিষ্ণুতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হস্তী প্রকাণ্ড জীব হইলেও ইহাদের সহ্য করিবার শক্তি অতি অল্প। এ বিষয়টী অনেকে জানেন না বলিয়া ইহার প্রতি অনেকের আদৌ দৃষ্টি নাই। লোকের ধারণা হস্তী খুব বলশালী। অনেক সময় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের উপর অনেক কার্য্যের ভার চাপান হয়। ইহার ফলে ইহারা অচিরাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। ভারবহনকারী অন্যান্য জন্তুগুলি লোকালয়ে লালিত পালিত হয় বলিয়া হস্তী অপেক্ষা অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। হস্তী অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ইচ্ছামত বনে বনে চরিয়া বেড়ায় বলিয়া ইহারা বেশী কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে না। বন হইতে ইহাদিগকে ধৃত করিবার পর ইহাদিগকে কার্য্য করিতে শিখান হয়। এইরূপ কার্য্য শিক্ষা দিবার সময়ও ইহাদের প্রতি সম্পূর্ণ যত্ন লওয়া হয় না এবং সময়ে সময়ে ইহাদিগের দ্বারা ইহাদের ক্ষমতাতীত কার্য্যও করাইয়া লওয়া হয়। এই সমস্ত কারণে হস্তীর মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। হস্তীস্বামীর কেবলমাত্র হস্তীপরিচারকের উপর আদেশ দিলে চলিবে না; আদেশগুলি প্রতিপালিত হইতেছে কি না বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। অনেক সময় পরিচারকেরা আলস্যপরবশ এবং পরিশ্রম-কাতর হইয়া হস্তীর প্রতি আদৌ যত্ন লয় না। হস্তীও ধীরে ধীরে রোগাক্রান্ত হইয়া কালের করালগ্রাসে পতিত হয়।

ব্রহ্মপ্রদেশে বনবিভাগে নিযুক্ত হস্তীগুলির জীবনই মহাজনের প্রতিভূ। যদি হস্তী মরিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহাদের টাকা উঠাইয়া লইবার আর কোনও উপায় থাকে না। ইহাদের মৃত্যুসংখ্যা বৎসরে শতকরা ১০ হইতে ২০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ ইহাদের দ্বারা নিয়মাতিরিক্ত কার্য্য করাইয়া লইতে যাওয়া হয় এবং ইহাদের শরীরের প্রতি আদৌ দৃষ্টি করা হয় না। রেঙ্গুন এবং মৌলমেনে হস্তীকে অনেক উত্তাপ সহ্য করিতে হয়। এখানে ইহারা সাধারণতঃ সকালে তিনঘণ্টা এবং বৈকালে তিনঘণ্টা কার্য্য করিয়া থাকে। পরিচালকের সামান্য একটু বিবেচনা-শক্তি থাকিলে হস্তী প্রায়ই রুগ্ন হয় না। যে হস্তী যেরূপ বলবান সেই হস্তীকে সেইরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। কোনরূপ পীড়ার সূত্রপাত দেখিলে প্রথম হইতেই বিশেষ যত্ন লইতে হইবে, নতুবা একবার যদি ইহাদের শরীর রুগ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে শীঘ্র সুস্থ করা যায় না।

গতি

হস্তী দ্রুত কিংবা অশ্বের ন্যায় কদমে চলিতে পারে না। ইহারা একেবারেই লম্ফ দিতে পারে না। ৬, ৭ ফিট প্রশস্ত গর্ত্তগুলি পর্য্যন্ত ইহারা লাফাইয়া পার হইতে পারে না। ভাল রাস্তা হইলে ইহারা বোঝা লইয়া ঘণ্টায় তিন মাইল চলিতে পারে।

বিশ্রাম ও নিদ্রা

হস্তীকে এক সময় অধিক কার্য্য করিতে হইলে, বিশ্রামের সময় কিছু বেশী করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হস্তীর নিদ্রা অতি অল্প। এই অত্যল্প নিদ্রায় যাহাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কার্য্যান্তে হস্তীকে খাদ্যপ্রদানে বেশী বিলম্ব করা মাহুতদিগের উচিত নহে। এ বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যাহাতে রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে ইহাদের খাদ্য চর্ব্বণ শেষ হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বিশ্রামের জন্য ইহাদিগকে প্রস্তরশূন্য সমতল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়।

শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিবার ক্ষমতা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হস্তী রাত্রিতে চরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে। ইহারা সূর্য্যের

উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। যতদূর সম্ভব ইহাদের দ্বারা রাত্রিতে এবং খুব প্রত্যূষে কার্য্য করাইয়া লওয়া উচিত। এই সময় ইহাদের দ্বারা অল্প সময়ে অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিলে ইহারা বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করে এবং সর্ব্বদা পায়ের দ্বারা বালুকা ছুড়িতে থাকে এবং গাত্রাবরণের দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। বাহাদুরি কাষ্ঠের কারখানায় নিযুক্ত হস্তীর রৌদ্রে অধিক কার্য্য করিতে হয়। ইহারা প্রাতে ১১টা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে ১টা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ কার্য্য করে। কলের যন্ত্রাদি খারাপ হইলে এবং কার্য্যাদি না থাকিলে ইহারা একটু বিশ্রামলাভ করিতে পারে। এইরূপ ভাবে সময়ে সময়ে বিশ্রামলাভ করিতে পারে বলিয়া ইহারা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, নতুবা ইহাদের মৃত্যু-সংখ্যা আরও বেশী হইত এবং ইহাদের দ্বারা আর কাষ্ঠ-প্রাঙ্গণের কাজ চলিত না।

হস্তীকে গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্য-কিরণে কার্য্য করিতে হইলে ইহাদের চোখের উপর ভিজা কাপড় ঝুলাইয়া ঘাড় ও মস্তক পাতলা বস্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া উচিত। বুদ্ধিমান হস্তী-পরিচারক তাহাদের পাগড়ী হস্তীর মস্তকের উপর বিস্তার করিয়া সূর্য্যোত্তাপ হইতে ইহাদের মস্তকটি রক্ষা করে। বৃষ্টিতে হস্তীর শরীরের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাত্রিকালের ঠাণ্ডা বাতাস ইহাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক। যে সমস্ত অনাবৃত স্থান দিনের বেলায় সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হয় এবং রাত্রিতে যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়, সে সমস্ত স্থানে হস্তী রাখিলে হস্তীর নানারূপ পীড়া হইতে দেখা যায়। প্রকৃতিজাত বৃক্ষাদি যদি ইহাদের শরীর সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে যাহাতে সূর্য্যোত্তাপ হইতে ইহাদের শরীর রক্ষা পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। যেখানে হস্তী রক্ষিত হয়, সেখানে জল-নির্গমের সুন্দর ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে সমস্ত হস্তী কাষ্ঠ-প্রাঙ্গণে কার্য্য করে তাহাদের জন্য উপযুক্ত আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিতে হয় এই সমস্ত আবরণ যাহাতে উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত হয় এবং যাহাতে ইহার মেজে পাকা এবং ঢালু হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। তথায় মলমূত্র-নিঃসরণের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয় এবং হস্তী-বন্ধনের জন্য কতকগুলি শক্ত খুঁটি পুঁতিয়া রাখিতে হয়। হস্তী-পরিচারকদের জন্যও নিকটবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি চালা করিয়া দেওয়া উচিত; এরূপ করিলে সকল সময়ে ইহারা হস্তীর প্রতি যত্ন লইতে পারে।

যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতিজাত খাদ্য, স্নানের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত আশ্রয়স্থান না থাকে, সে সমস্ত স্থানে হস্তীর থাকিবার বন্দোবস্ত না করিলেই ভাল হয়। হস্তীকে উত্তম স্থানে যত্নের সহিত রাখিতে পারিলে রোগ-পীড়া খুব কম হয়। কার্য্য-গতিকে হয়ত সময়ে সময়ে ইহাদিগকে অস্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিতে হয়। কিন্তু যতদূর সম্ভব ইহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়। যে সমস্ত স্থান জোয়ারের জলে প্লাবিত হইয়া যায় এবং যে স্থান সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, সেখানে হস্তী রাখা কোনও ক্রমে উচিত নহে।

যদি হস্তী লইয়া ছাউনি করিয়া থাকিতে

হয় তাহা হইলে ঢালু স্থান বাছিয়া লইতে হয়, এবং সেই স্থানে যাহাতে পাথর কিংবা বৃক্ষের গুঁড়ি না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ হস্তী উপরে উঠিবার সময় যদি একবার পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সহজে উঠিতে পারে না।

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উক্ত স্থানের মলমূত্র, আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া দূরে নিক্ষেপ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

স্নান

স্নান হস্তীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বন্য অবস্থায় ইহারা প্রত্যহ নদী কিংবা স্রোতস্বতীর জলে অবগাহন করে। প্রত্যহ হস্তীকে স্নান না করাইলে ইহাদের চর্ম্মের উপর ময়লা জন্মে এবং উহা দ্বারা নানারূপ ফুস্‌কুড়ি উৎপন্ন হয়। ইহারা যাহাতে সমস্ত শরীর জলে ডুবাইয়া স্নান করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার ইহাদিগকে স্নান করিতে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। স্নান করাইবার সময় ইহাদের গাত্র নারিকেলের ছোব্‌ড়া কিংবা ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাদের শরীরের বিভিন্ন রন্ধ্র এবং পা গুলি প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। বিশ্রাম-স্থানে যদি জল না থাকে তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনিয়া ইহাদের গাত্র ভাল করিয়া ধোয়াইয়া দিতে হয়। কার্য্যের পর শরীর উত্তপ্ত থাকিতে ইহাদিগকে স্নান করিতে দিতে নাই। পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে নদী পড়িলে যতক্ষণ ইহাদের শরীর সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা না হয় ততক্ষণ নদী-তীরে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। স্নানের পর হস্তীর শরীর শুকাইয়া গেলে পরিচারকেরা ইহাদের মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকে। তাহারা বলে এরূপ করিলে হস্তীর মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে। যদি ইহাদের মস্তক রীতিমত পরিষ্কার রাখা যায় এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে উহা রক্ষা করিবার জন্য নরম গদি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ তৈল-মর্দ্দনের কোনও আবশ্যকতা নাই। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে মস্তকের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং সূর্য্যকিরণ পূর্ণমাত্রায় শোষিত হইয়া থাকে। এ কারণ পরিচারকদিগকে হস্তীর মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া উচিত।

পরিচারক ও তাহার কর্ত্তব্য

গৃহপালিত হস্তীর একজন করিয়া পরিচারক থাকে। ইহাদের নাম উসি (Oosi) অর্থাৎ মাহুত। গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে সমস্ত হস্তী থাকে তাহাদের দুই জন করিয়া পরিচারক থাকে। একজনের নাম উসি (Oosi), আর একজন তাহার সহকারী নাম পৈসি (Paisi)। কার্য্যের সময় ও কার্য্যের পর হস্তীর প্রতি যত্ন লওয়া উসির (oosi) কার্য্য। ইহারা হস্তীর ঘাড়ের উপর বসিয়া ইহাদিগকে চালাইয়া লইয়া যায়। কার্য্যান্তে ইহারা যাহাতে উত্তম খাদ্য, পরিষ্কার জল, উপযুক্ত বিশ্রাম লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াও উসির (oosi) কর্ত্তব্য। কার্য্যের সময় হস্তীর শরীরে কোনরূপ ক্ষত হইয়াছে কি না কার্য্যের পর বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। কোন পীড়ার লক্ষণ দেখা দিলেই উসির (oosi) তৎক্ষণাৎ উপরিতন কর্ম্মচারীকে জানান কর্ত্তব্য। কার্য্যের পর হস্তীকে বেত্র-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা

থাকে, সেই সমস্ত স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে উসি (oosi) হস্তীর নিকট যাইবে এবং জন্তুটি কি ভাবে রাত্রি কাটাইয়াছে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। হস্তী যদি দিনের বেলায় নিদ্রা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে রাত্রিতে সুন্দরভাবে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। ইহাদের সাজসজ্জা, আহার এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি উসি (oosi) বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, ধৃত এবং অবাধ্য হইলে বশীভূত করা সম্বন্ধে উসির (oosi) জ্ঞান থাকা দরকার। হস্তী অসুস্থ হইলে আদেশানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থাও উসিকে (oosi) করিতে হইবে; কিন্তু উসি (oosi) কোন সময় নিজের মতলবমত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

পৈসি (paisi) সর্ব্বদা উসির আদেশ প্রতিপালন করিবে। ইহাকে সাধারণতঃ কুলির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। খাদ্য সংগ্রহ করা, হস্তীর আবাস-স্থান পরিষ্কার করা পৈসির কার্য্য। যখন মাহুত হস্তী চালাইয়া লইয়া যায় তখন পৈসিকে হস্তীর অগ্রে অগ্রে যাইয়া যে সমস্ত পথে কর্দ্দম, চোরা বালি, প্রস্তর ইত্যাদি থাকে সে সমস্ত পথের কথা মাহুতকে পূর্ব্বে জানাইয়া দিতে হয়। হস্তীকে কাষ্ঠাদি টানিতে হইলে পৈসি কাষ্ঠের সঙ্গে শৃঙ্খলাদি বাঁধিয়া ঠিক করিয়া দেয়। উসির কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন সিন্‌ওক্ (Sin-ok বা gemader) থাকে। ইহার হস্তী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। হস্তীর কোনও রূপ পীড়া হইলে সর্ব্বদা দেখা, দুই একটি ঔষধের ব্যবস্থা করা, ক্ষত স্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ঔষধাদি দেওয়া ইহার কার্য্য।

খিট্‌খিটে এবং নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোকের উপর হস্তীর ভার দেওয়া উচিত নহে। অনেক সময় পরিচারকের দোষে হস্তী রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যে সমস্ত হস্তীচালক হস্তীর প্রতি সর্ব্বদা কর্কশ ব্যবহার করে এবং সর্ব্বদা অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীকে পীড়ন করে, তাহাদিগকে জবাব দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। উত্তম হস্তীচালক কোন সময় হস্তীকে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ কিংবা অঙ্কুশের দ্বারা তাড়না করে না।

হস্তীচালক হইতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়।

হস্তী-স্বামীর এক একটি হস্তীর জন্য এক একজন উত্তম পরিচারক নিযুক্ত করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ পরিচারক পরিবর্ত্তন করা ভাল নয়। পরিচারক যতই পুরাতন হয়, ততই হস্তীস্বামীর উপকারে আসিয়া থাকে এবং ততই ইহারা হস্তী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন চালকের উপর হস্তীর ভার দেওয়া উচিত নহে, ইহাতে ইহাদের স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ হস্তীর খাদ্য হইতে খাদ্য চুরি করিয়া বিক্রয় করার জন্য মাহুতেরা বিতাড়িত হয়। ইহা নিবারণ করিতে হইলে বিশ্বস্ত লোকের সম্মুখে হস্তীকে মধ্যে মধ্যে খাদ্য প্রদান করিতে হয়। যতদিন হস্তীচালক তাহার হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে সমর্থ হয়, ততদিন তাহাকে জবাব দেওয়া উচিত নহে। সামান্য কিছু চুরি করিলেই যদি হস্তীচালককে জবাব দিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে অনেক হস্তী-

চালক নিযুক্ত করিতে হয় এবং ইহাতে হস্তীর স্বাস্থ্যের অধিকতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। চুরি করে না এরূপ হস্তীচালক প্রায়ই পাওয়া যায় না। তহবিল হইতে সামান্য কিছু আত্মসাৎ করা, ঔষধের মিথ্যা বিল করা এবং খাদ্য-সামগ্রীর কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়া বিক্রয় করা ইহাদের মজ্জাগত দোষ। যদি হস্তীস্বামী ইহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপকার অপেক্ষা ক্ষতি হইবার অধিক সম্ভাবনা। ইহাদের সামান্য সামান্য দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে নাই। যদি হস্তীস্বামী এক সময় হস্তীর জন্য নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহা হইলে হস্তীচালক ঔষধের মিথ্যা বিল করিতে পারে না এবং উপযুক্ত বিশ্বস্ত লোকের সম্মুখে হস্তীকে যদি মধ্যে মধ্যে খাদ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে খাদ্য হইতেও ইহারা বেশী কিছু চুরি করিতে পারে না।

উত্তম হস্তীচালক তাহার হস্তী লইয়া সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া থাকে এবং কোনও সময় কর্কশ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া হস্তীকে কোনও রূপ আদেশ প্রদান করে না। ইহারা সাধারণতঃ কোমলস্বরে এবং মধ্যে মধ্যে হাঁটু এবং পদদ্বয়ের মৃদু আঘাতের দ্বারা হস্তীকে তাহাদের আদেশ জানাইয়া থাকে।

যে সমস্ত হস্তীচালক হস্তীর অভাবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের অভাবই প্রধান জ্ঞান করে, তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব জবাব দিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় ইহারা কার্য্যের পর হস্তীকে উপযুক্ত খাদ্য এবং পানীয় প্রদান না করিয়াই নিজেরা আহার করিতে কিংবা অলসভাবে তাম্রকূট সেবন করিতে বসিয়া যায়। ইহারা কোন সময় হস্তীর শরীর উত্তপ্ত থাকিতেই স্নানের জন্য ইহাদিগকে জলে নামাইয়া দেয়, আবার কোন সময় হয় ত স্নানের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াও ইহাদিগকে স্নান করায় না এবং প্রায়ই ইহাদের দ্বারা নিয়মাতিরিক্ত কার্য্য করাইয়া লয়। ইহারা ইহাদিগকে রাত্রিতে চরিয়া বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দেয় না এবং রুগ্ন হইলে আদেশানুযায়ী ঔষধ-পত্রেরও ব্যবস্থা করে না। এরূপ হস্তীচালক বিষবৎ পরিত্যজ্য।

সময় সময় হস্তীচালককে সামান্য সামান্য অপরাধের জন্য তাড়াইয়া দেওয়া হয়। হস্তীস্বামী ইহার দোষসকল বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া গুরুতর বিবেচনা করিলে ইহাকে জবাব দিবেন, নতুবা পুনঃ পুনঃ হস্তীচালক পরিবর্ত্তন করিলে প্রায়ই কুফল ফলে।

প্রায়ই দেখা যায় মাহুতেরা বংশানুক্রমে মাহুতের কার্য্যই করে; পিতা পুত্রকে এ বিদ্যা শিক্ষা দেয়।

ব্রহ্মপ্রদেশে যখন হস্তী ক্রীত হয়, তখন ইহারা সাধারণতঃ কেরেণ (Karen) অথবা সান (Shan) জাতীয় চালকের অধীনে থাকে। যদিও ইহারা ভারতবর্ষীয় চালকের ন্যায় হস্তীর সেবা শুশ্রূষা করিতে পারে না, তাহা হইলেও ইহাদের কার্য্যাদি মোটের উপর অসন্তোষজনক নহে। ভারতবর্ষীয় মাহুতেরা প্রায়ই গভর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রহ্মবাসী এবং কেরেণদিগের মধ্যেও অনেক উত্তম হস্তীচালক পাওয়া যায়। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু এবং জঙ্গলে কার্য্যোপলক্ষে বিশেষ উপযোগী।

যোগ্যতানুসারে একজন সিনওকের (sin-ok) বেতন মাসিক ২০ হইতে ৪০৲

টাকা, একজন মাহুতের বেতন ১২৲ হইতে ১৮৲ টাকা এবং একজন পৈসির (paisi) বেতন ১০৲ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

বৎসরান্তে হস্তীচালককে কিছু কিছু লভ্যাংশ দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা, এরূপ না করিয়া যদি উহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আরও ভাল হয়; কারণ বেতন বৃদ্ধি হইলে ইহাদের বড়ই ফূর্ত্তি হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,
ও
শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু বি, এস্, সি,
এম, বি।

বৈদিক সাহিত্য *

খ্রীষ্টান বাইবেলকে, মুসলমান কোরাণকে, হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় ও স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং এই শাস্ত্রত্রয় এক শ্রেণীর ইহা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানবই এই গ্রন্থগুলির অনুশাসনে পরিচালিত হইতেছে; আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র বেদ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

বেদ প্রধানতঃ দুই প্রকার—কৃণ্ঠপ্ত ও কল্প্য। হিন্দু সাহিত্যে দেখিতে পাই—

"যা তু স্মৃতি সদাচারাভ্যাং অনুমীয়তে সা কল্প্যা।"

"যা তু প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে সা কৃণ্ঠপ্তা।"

অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে তাহা কৃণ্ঠপ্ত, আর স্মৃতি বা সদাচারের বলে যাহা অনুমিত হয় তাহা কল্প্য শ্রুতি। সরল হৃদয় প্রাচীন ঋষিগণ প্রকৃতির বৈচিত্র সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যে সকল স্তবস্তুতি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহাই কৃণ্ঠপ্ত, ইহা ঋগাদি চারি ভাগে বিভক্ত। আর কল্প্য শ্রুতি সাময়িক কল্পনা মাত্র। মানবের আচার ব্যবহার কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, এই পরিবর্ত্তন অনুসারে হিন্দুর সামাজিক অনুশাসন-পদ্ধতি ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ থাকিত। ইহারই ফলে আজও আমরা হিন্দুশাস্ত্রে সত্য ত্রেতাদি বিভিন্নযুগে বিভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহারের উল্লেখ ও উদাহরণ পাই। সুতরাং এই সামাজিক অনুশাসন পদ্ধতি স্থায়ী ছিল না, সময় বিশেষে এক এক প্রকার কল্পনা করিয়া লইতে হইত বলিয়া ইহার নাম কল্প্য শ্রুতি।

* * *

কৃণ্ঠপ্ত শ্রুতি মন্ত্র ভেদানুসারে ত্রিবিধ,—ঋক্, যজুঃ ও সামমন্ত্র। পদ্য ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম ঋক্, গদ্যমন্ত্রের নাম যজুঃ এবং গেয় মন্ত্রের নাম সাম। এই কৃণ্ঠপ্ত শ্রুতি গ্রন্থ ভেদানুসারে আবার চতুর্ব্বিধ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ। ঋগ্বেদে ঋক্

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত এবং লেখক কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত। লেখক।

(পদ্য) মন্ত্র, যজুর্ব্বেদে গদ্যমন্ত্র, সামবেদে ছন্দোবদ্ধ গেয় মন্ত্র এবং অথর্ব্ববেদে পূর্ব্বোক্ত বেদত্রয়ের মিশ্রিত মন্ত্র সমষ্টি।

এই কৃৎপ্ত শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে আবার দ্বিবিধ। পূর্ব্বোক্ত বেদচতুষ্টয়ের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ সমূহের কোন কোন অংশ কর্ম্মকাণ্ডের এবং উপনিষৎ গুলি জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত।

কর্ম্মকাণ্ড আবার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে দ্বিবিধ, যে সকল বাক্য যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনার সহিত কোনও দেবতা বিশেষকে উপলক্ষ করা হয় তাহা মন্ত্র, যে সকল গদ্য গ্রন্থে কোন মন্ত্র কি কার্য্যে প্রযুক্ত ইহার উল্লেখের সহিত মন্ত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা আছে তাহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ভাগ আবার বিধি ও অর্থবাদ ভেদে দ্বিবিধ। ব্রাহ্মণ সমূহের যে ভাগে মন্ত্রের বিনিয়োগ সহ যজ্ঞ নির্ব্বাহের প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে তাহাই বিধি, আর মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা বিশিষ্ট অংশের নাম অর্থবাদ। বিধি আবার দুই প্রকার—"অজ্ঞাত জ্ঞাপক" এবং "অপ্রবৃত্ত প্রবর্ত্তক"। আর্ষকালে যে সকল যজ্ঞের বিলোপ ঘটিয়াছিল, সেই সকল যজ্ঞের প্রণালী যাহাতে লিখিত আছে তাহা "অজ্ঞাত-জ্ঞাপক"। পরবর্ত্তী কালে যে সকল নব নব যজ্ঞের আবিষ্কার হইয়াছে তাহার বিধান যাহাতে লিপিবদ্ধ তাহা "অপ্রবৃত্ত প্রবর্ত্তক"।

এই গেল বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রন্থানুসারে বেদ চারি প্রকার, এখন তাহারই আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম যজুর্ব্বেদের কথা বলিতেছি। যজুর্ব্বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতার অপর নাম তৈত্তরীয় সংহিতা। নব্য পণ্ডিতগণের মতে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। চরণব্যূহ মতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখা, পতঞ্জলীর মহাভাষ্যানুসারে ১০০ শাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের বারটি শাখা ও তেরটি উপশাখা মাত্র পাওয়া যায়। এই শাখাগুলির নাম—"চরক," "আহ্বায়ক," "কঠ" বা "কাঠক," "প্রাচ্যকঠ" "কাপিষ্ঠকঠ," "চারায়নীয়" "বার তন্ত্রবীয়" "শ্বেত" "শ্বেততর" "ঔপমন্যব" "পাতাণ্ডিনেয়" এবং "মৈত্রায়নীয়"। চরক শাখার দুইটি উপশাখা—"ঔখীয়" ও "খাণ্ডীকীয়"। খাণ্ডীকীয় উপশাখার পাঁচটি প্রশাখা—"শাট্যায়নী" "হিরণ্যকেশী" "বৌধায়নী" "সত্যাষাঢ়ী" ও "আপস্তম্বী"। মৈত্রায়নীয় শাখার ছয়টি উপশাখা—"মানব" "বারাহ" "ছাগলেয়" "হারিদ্রবীয়" "দুন্দুভ" ও "শ্যামায়নীয়"। এই সকল উপশাখা ও প্রশাখার (১) সংখ্যা ত্রয়োদশ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ বিশিষ্ট কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে অষ্টাদশ সহস্র যজুর্মন্ত্র আছে। ইহার মন্ত্রভাগ "তৈত্তরীয় সংহিতায়" সাতটি অষ্টক, প্রত্যেক অষ্টক আবার ৭।৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির অপর নাম প্রশ্ন আর অষ্টকগুলির অপর নাম প্রপাঠক। প্রত্যেক অধ্যায় অনেকগুলি অনুবাকে বিভক্ত, এই

(১) এক এক ঋষি বেদের এক এক অংশ অভ্যাস করিয়া শিষ্য সমাজে প্রচার করিতেন। অবশ্য ইহাতে মূলের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিত। পরবর্ত্তী কালে ঐ এক এক ঋষির প্রচারিত এক এক অংশই এক এক শাখা হইয়াছে। বেদ যতবার নব নব ঋষি কর্ত্তৃক অভ্যস্ত হইয়াছে, ততবার নব নব শাখা উদ্ভূত হইয়াছে। আর ঐ ঋষি সকলের শিষ্যগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা হইয়াছে উপশাখা, আর ইহাদের শিষ্যগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা হইয়াছে প্রশাখা। লেখক।

গ্রন্থে সর্ব্বসমেত সাত শত অনুবাক আছে। ইহাতে কোন মানব ঋষির নাম পাওয়া যায় না। প্রজাপতি, সোম প্রভৃতি বৈদিক দেবগণই ইহার ঋষি। এই গ্রন্থে নরমেধ, পিতৃমেধ, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিঃষ্টোম, রাজসূয় ও অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

এই গেল কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ডের কথা। তারপর জ্ঞানকাণ্ড, তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তরীয় আরণ্যক, তৈত্তরীয় উপনিষৎ প্রভৃতি ও মৈত্রায়নীয় শাখার মৈত্রায়নীয় উপনিষৎ, কঠশাখার কঠোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, নারায়ণ উপনিষৎ এবং বারুণি উপনিষৎ ইহার জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের আপন নাম "বাজসনেয়ী সংহিতা" ভগবান যজ্ঞবল্ক ইহার ঋষি; ইহাতে প্রায় দুই সহস্র এবং ইহার ব্রাহ্মণে সাড়ে সাত সহস্র যজুর্মন্ত্র আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের পঞ্চদশটি শাখা—কান্ব, মাধ্যন্দিন, জাবাল, শাকেয়, বুধেয়, তাপনীয়, কাপীল, পৌণ্ড্রবৎস, আচটিক, পরমাবটিক, বৈনেয়, পারাশরীয়, বৌধেয়, গালব ও ঔধেয়। "বাজসনেয়ী সংহিত" ৪০ অধ্যায়ে, ২৯০ অনুবাকে ও বহুসংখ্যক কাণ্ডিকায় বিভক্ত। ইহাতে অনেক ঋড়্মন্ত্রও পাওয়া যায়। দর্শপৌর্ণমাস, পিতৃপিণ্ড যজ্ঞ, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসুয়, অগ্নিহোত্র, চাতুর্ম্মাস্য, ষোড়শী, অগ্নিচয়ন, চরক-সৌত্রামণি, অশ্বমেধ, পুরুমেধ, সর্ব্বমেধ, পিতৃমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণে এই গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ। ইহা পাঠে বৈদিক যুগের সামাজিক রীতি নীতি অনেকটা জানা যাইতে পারে। বিখ্যাত "শত পথ ব্রাহ্মণ" শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ দশ কাণ্ডে ও দ্বিতীয় ভাগ চারি কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় সাড়ে সাত সহস্র কাণ্ডিকা আছে। বিখ্যাত বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ইহার চতুর্দ্দশ কাণ্ডের অন্তর্গত।

এই গেল যজুর্ব্বেদের কথা, এখন সামবেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুএক কথা বলিব। পুরাণ মতে সামবেদের সহস্র শাখা, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে প্রায় সকল গুলিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র সাতটি শাখা অবশিষ্ট আছে, যথা—রামায়নীয়, শাট্যমুগ্র, কাপোল, মহাকাপোল, কৌথুম, লাঙ্গলিক ও শার্দ্দূলীয়। এই শাখাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র কৌথুম শাখার ছয়টি উপশাখা পাওয়া যায়,—আসুরায়ণ, বাতায়ন, নৈগেয়, প্রাচীনযোগ্য, প্রাঞ্জলী ও বৈনধৃত।

সামবেদ প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব সংহিতায় ছয়টি প্রপাঠক, ইহার অপর নাম "ছন্দ আর্চ্চিক।" ইহা ছান্দোগ পুরোহিতগণের অবশ্য পাঠ্য। ইহাই তান লয় সংযুক্ত স্বর প্রক্রিয়া অনুসারে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া "গ্রামগেয়গণ" নামে আখ্যাত হইয়াছে। সামবেদীয় উদ্গাতাগণ ইহাই গান করিতেন। ইহাকে সপ্তসামও বলে। সামবেদের উত্তর ভাগের নাম উত্তরার্চ্চিক বা আরণ্যগণ। বঙ্গদেশে সামবেদের কৌথুম শাখা ব্যতীত অপর কোনও শাখার প্রচলন নাই। এই গেল সামবেদের মন্ত্রভাগের কথা, ইহার ব্রাহ্মণ ভাগে আটখানি গ্রন্থ,—আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ, সামবিধান, অদ্ভুত ও ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ এবং তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ।

সামবেদের জ্ঞানকাণ্ডে দুইখানি উপনিষদ প্রধান—ছান্দোগ্য এবং কেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় হইতে

দশম প্রপাঠক পর্য্যন্ত স্থান হইতে সঙ্কলিত। ইহা সুনীতি পরিপূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। এই উপনিষদে আটটি প্রপাঠক আছে। ইহার পঞ্চম প্রপাঠকে আত্মা ও ব্রহ্ম বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বড়ই মনোরম। কেনোপনিষৎ চারি কাণ্ডে বিভক্ত এবং আধ্যাত্মিকতত্ত্বের সুন্দর আলোচনায় ইহার কলেবর পরিপূর্ণ। সামবেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের প্রধান ভাষ্যকার সায়ণ ইহার ভাষ্যের নাম বেদার্থপ্রকাশ।

অতঃপর অথর্ব্ববেদের কথা, চরণব্যূহ মতে অথর্ব্ববেদের মন্ত্র পরিমাণ ১২৩০০; যথা—

"দ্বাদশানাং সহস্রানি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানিচ।"

কিন্তু আজকাল ৭০০টি মন্ত্রমাত্র পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের নয়টি শাখা, "পৌপ্পলপাদ," "শৌনকীয়," "তোত্তায়ণ," "দামোদ," "চারণবিদ্যা," "দেবদর্শী," "কুনখা," "জায়ল" এবং "ব্রহ্মপালাশ"। কিন্তু আজকাল কেবল মাত্র সৌনক শাখাটি বর্ত্তমান আছে। এই শৌনকশাখা বিংশতিকাণ্ডে বিভক্ত। অথর্ব্ববেদে শত্রুপীড়ন, আত্মরক্ষা, বিপদদূরীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বহুপ্রকার মন্ত্র ও ঔষদের ব্যবস্থা আছে। আমাদের বোধ হয় তন্ত্রের ষট্‌কর্ম্ম (মারণ বিদ্বেষণাদি) অথর্ব্ববেদ হইতে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

অথর্ব্ববেদের জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত অনেকগুলি উপনিষদ ছিল, কিন্তু আজ ৫২ খানি মাত্র পাওয়া যায়। যথা,—আশ্রম, জাবাল, কৈবল্য, পূর্ব্বরাম তাপনীয়, উত্তররাম তাপনীয়, কালাগ্নি, রুদ্র, গরুড়, ভৃগুবল্লী, আনন্দবল্লী, পরমহংস, হংস, বৃহন্নারায়ণ (দুইখানি), নারায়ণ, কেনেষিত, পূর্ব্বকঠবল্লী, উত্তরকঠবল্লী, পূর্ব্বনৃসিংহতাপনীয়, (৫ খানি) উত্তরনৃসিংহতাপনীয়, আত্মা, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আরুণীয়, সন্ন্যাস, যোগতত্ত্ব, যোগশিক্ষা, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, নাদবিন্দু, নীলরুদ্র, প্রশ্ন, মণ্ডুক, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চূলিকা, অথর্ব্ব শিরস (২ খানি), গর্ভ, মহাগর্ভ, প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম, মাণ্ডুক্য, নীলরুদ্র ও সর্ব্বোপনিষৎসার।

এই গেল অথর্ব্ববেদের কথা, এখন "ঋগ্বেদ" সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। চরণব্যূহ বলেন—

"দশচাংশ সহস্রানি ঋচাংশ পঞ্চশতানি চ।
ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ তৎপারায়ণমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ ঋগ্বেদে একসহস্র পঞ্চশত অশীতি সংখ্যক শ্লোক আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মুদ্রিত সংস্করণে ১৪১৭টি ঋক্ মাত্র পাওয়া যায়। শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য অনুসারে ঋগ্বেদের পাঁচ শাখা; যথা—"শাকল" "বাস্কল" মাণ্ডুক, শাঙ্খায়ণ ও আশ্বলায়ন। কৌষিতকী, শৈশিরী, পৈঙ্গী, ঐতরেয়ী প্রভৃতি আরও কয়েকটি উপশাখাও আছে। ঋগ্বেদীগণের আচার্য্য মহর্ষি শাকল নিজ নামে শাকল শাখার প্রবর্ত্তন করেন। মুদ্গল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির ও শিশির এই পাঁচ জন শাকলের প্রধান শিষ্য ও তাঁহার শাখা প্রবর্ত্তনের প্রধান সহায়ক। বিষ্ণু পুরাণ মতে শাকলের এই শিষ্যপঞ্চও শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা, যথা—

"মুদ্গলো গোকুলঃ বাৎস্যঃ শিশিরঃ
শৈশিরস্তথা।
পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখা ভেদপ্রবর্ত্তকাঃ।
বিষ্ণু পুরাণ।

মহাভাষ্য বলেন—"একবিংশতিধা বহ্বৃচাঃ" ঋগ্বেদের শাখা প্রশাখার সংখ্যা একবিংশতি।

কিন্তু কেবলমাত্র শাকল শাখাটি বর্ত্তমান আছে। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রানুসারে শাকল শাখার প্রবর্ত্তক শাকল ঋষির অপর নাম "বেদমিত্র।"

"ঋগ্বেদ সংহিতা" দশ মণ্ডলে, আট অষ্টকে ও চতুঃষষ্টি অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহার প্রত্যেক অনুবাকে দুই একটি করিয়া সূক্ত, প্রত্যেক সূক্তে দুই একটি করিয়া বর্গ, এবং প্রত্যেক বর্গে অনেকগুলি ঋক্ আছে। ইহার মণ্ডলের সহিত অষ্টকের কোনও সম্বন্ধ নাই। অনেকগুলি সূক্তের সমষ্টিতে একটি মণ্ডল এবং আটটি অধ্যায়ের সমষ্টিতে একটি অষ্টক হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে ২০।২৫টি করিয়া সূক্ত আছে। সূক্ত বহু প্রকার, মহাসূক্ত, মধ্যম সূক্ত, ক্ষুদ্র সূক্ত; আবার, ঋষিসূক্ত, ছন্দঃ সূক্ত, দেবতা সূক্ত; কিন্তু এই বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনীয় নহে।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ দুই খানি,—ঐতরেয় এবং শাঙ্খায়ন বা কৌষিতকী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট পঞ্জিকায় বিভক্ত। প্রতি পঞ্জিকা, পাঁচটি অধ্যায়ে, আবার প্রতি অধ্যায় অনেকগুলি কাণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে প্রায় তিন শত কাণ্ড আছে।

ঋগ্বেদের আর এক অংশ আছে। ইহার নাম ঐতরেয় আরণ্যক। ইহাতে পাঁচটি আরণ্যক ও আঠারটি অধ্যায় আছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী।

পদার্থের চেতনাচেতন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত

আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধ "মৌলিকতত্ত্বে" আকাশাদি পঞ্চ পদার্থকে চেতন-অচেতন সকল পদার্থের অবয়ব-গঠনের মূল বলিয়া মূল পদার্থ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই পঞ্চ দ্রব্য, পদার্থ-সমূহের অবয়বগঠনের কারণ হইলেও চেতনার কারণ নহে। বাল্যে বোধোদয় হইতে পড়িয়া আসিতেছি, "পদার্থ দুই প্রকার; চেতন ও অচেতন।" এই অচেতন অর্থাৎ জড়পদার্থেরই মূল ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাপদার্থ; কিন্তু যাহার চেতনা আছে, তাহাতে মৃত্তিকাদি পঞ্চ দ্রব্য ব্যতীত আরও কিছু আছে বুঝিতে হইবে। এই অতিরিক্ত দ্রব্যই আর্য্য মনিষিগণের নিকট আত্মা বলিয়া পরিচিত। আত্মাকে চেতনার মূল স্বীকার করিলে, মৃত্তিকাদি পঞ্চ মৌলিক ব্যতীত আরও মূল দ্রব্য আছে, স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিকই এই পাঁচটি মৌলিকের অতিরিক্ত আরও কয়েকটি মূল দ্রব্যের বিষয় শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।—

খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ॥

চঃ, সূ, ১ অঃ॥

অর্থাৎ আকাশাদি পাঁচটি এবং আত্মা, মন, কাল ও দিক্ মূলতঃ এই নয়টি দ্রব্য। ইহাদের মধ্যে আত্মা চেতনার মূল; এবং তিনিই ভারতীয় মনস্বিগণের নিকট পূর্ণব্রহ্ম, অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিত্য, বিভু (সর্ব্বগত) প্রভৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি আমাদের নিকট অচিন্ত্য-অব্যক্তরূপে প্রতীয়-মান, তাঁহাকে জানিবার বা জানাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই; কিন্তু একটি বিষয়

সতত মনে হয়, যিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত, তিনিই যখন চেতনার মূল, তখন জগতে অচেতন বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি?

বাস্তবিক ইহা প্রশ্নের বিষয়ীভূত হইলেও, আমরা কিন্তু চাক্ষুষ দেখিতে পাই, জীবশ্রেষ্ঠ মানবও কালে জড়ত্বে পরিণত হয়। ভারতীয় মনস্বিগণ, মানবের এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, অকালে যাহাতে দেহের এই ভাব না আসে, তাহার প্রতীকার জন্যই চিকিৎসা, শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন; এবং সে জন্যই তাঁহাদের বহুগবেষণাপ্রসূত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও চেতন-অচেতন সম্বন্ধে কিছু আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে আমরা এ সম্বন্ধে কি পরিমাণ তথ্য পাইয়াছি, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

চেতন পদার্থের অপর এক নাম জীব। কিন্তু জীব কি বিশেষভাবে জানিতে হইলে জানা আবশ্যক, আত্মা-মন এবং দেহের একত্র সমাবেশই জীব।

> সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্রিদণ্ডবৎ।
> লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ·········॥
> সপুমাংশ্চেতনং তচ্চ···॥ চ, সূ, ১ অঃ॥

অর্থাৎ মন, আত্মা-এবং শরীর এই তিনটি ত্রিপদির ন্যায়। যে কাল পর্য্যন্ত এই তিনটির একত্র সমাবেশ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে লোক অর্থাৎ জীব অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। এই লোকই পুরুষ অর্থাৎ চেতন নামে অভিহিত হন। আর এই অবস্থার যাহা বিপরীত অর্থাৎ যাহাতে এই তিনের একত্র সমাবেশ নাই, তাহাই অচেতন বা জড়-পদার্থ। একন্য আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও, ইন্দ্রিয়াদির অভাববশতঃ বস্তু মাত্রই চেতন বলিয়া অভিহিত হয় না। এই কারণেই আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ পাইয়াছি।—

'সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরেন্দ্রিয়মচেতনং॥'
চ, সূ, ১ অঃ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত দ্রব্যই চেতন, আর যাহাদের ইন্দ্রিয় নাই, তাহারাই অচেতন। সুতরাং চেতন-অচেতন বিষয় ভালরূপ জানিতে হইলে, ইন্দ্রিয় কি প্রথমে জানা আবশ্যক।

ইন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্র মহাভূতের বিকার; তন্মধ্যে আকাশ মহাভূতের বিকার শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের দর্শনেন্দ্রিয়, জলের রসনেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতির বিকার ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে দেহের কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু,জিহ্বা ও নাসিকা নামক স্থানসমূহে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়সমূহের আধার চক্ষু-কর্ণাদি জীবমাত্রেই রহিয়াছে, কিন্তু এই আধার বিদ্যমানসত্ত্বেও প্রাণীমাত্রেই যে, সকল ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকিবে তাহা নহে। ভৌতিক অংশের তারতম্যবশতঃ ইন্দ্রিয়-বিশেষের সবলতা, দুর্ব্বলতা অথবা হীনতা ঘটিয়া থাকে। সে জন্য আমরা প্রাণীবিশেষে ইন্দ্রিয়বিশেষের প্রখরতা ও দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই; সেইপ্রকার ভৌতিক অংশের হীনতাবশতঃ ইন্দ্রিয়-আধার চক্ষু কর্ণ বিদ্যমান সত্ত্বেও, অন্ধের দর্শন, বধিরের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অভাব দেখা যায়। কিন্তু এককালে সকল ইন্দ্রিয়েরই অভাব কোন প্রাণীতে দেখা যায় না।

ইন্দ্রিয়সমূহ সূক্ষ্ম-পঞ্চতন্মাত্র মহাভূত বিকার-সম্ভূত বলিয়া ইহারা প্রকাশ্য পদার্থ নহে— অনুভবগম্য মাত্র। যেমন আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আছে কি না কখন দেখা যায় না; একজন বধির, তাহার যেমন উক্ত ইন্দ্রিয়-আধার কর্ণ

আছে, আমারও সেইপ্রকার কর্ণ আছে। বধির, তাহার ইন্দ্রিয়ের অভাববশতঃই উক্ত ইন্দ্রিয়-বিষয় শব্দ গ্রহণে সমর্থ হইতেছে না, কিন্তু আমি ইন্দ্রিয়যুক্তহেতু শব্দ গ্রহণ করিতেছি। এইরূপে অনুভূত হইল, এই ব্যক্তি যখন শব্দগ্রহণে অসমর্থ, তখন ইহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই; আর আমি যখন গ্রহণ করিতেছি, তখন আমার উক্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্র, যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ-বিশিষ্ট; সেইপ্রকার তাহাদের বিকারসম্ভূত ইন্দ্রিয়গুলিও ক্রমান্বয়ে শব্দাদি গুণবিশিষ্ট। জীবগণ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাদের চেতনার পরিচয় দেয়; কিন্তু অচেতন পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অভাববশতঃ চেতনার পরিচয় দিতে পারে না। এজন্যই ইন্দ্রিয়যুক্ত দ্রব্য চেতন এবং ইন্দ্রিয়হীন দ্রব্য অচেতন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জীবগণ শব্দরূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি কি উপায়ে গ্রহণ করে বলা আবশ্যক। দেহিগণ মনের সাহায্যেই এই সকল ইন্দ্রিয়বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। সে কারণ ইন্দ্রিয় বিদ্যমান সত্ত্বেও, মনঃসংযোগের অভাববশতঃ অনেক সময় আমরা শব্দাদিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না; এবং মন স্বয়ং একটি পদার্থ বলিয়া, এককালে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্যাশক্তিরও পূর্ণ-বিকাশ দেখা যায় না।

যেমন, যদি কেহ কোন বিষয়ে গাঢ়চিন্তা-নিবিষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহার মন সেই চিন্তনীয় বিষয়ে এরূপভাবে সম্মিলিত হইবে যে, তৎকালে তাঁহার (ইন্দ্রিয় সকল বিদ্যমান সত্ত্বেও) চক্ষের নিকট বস্তু ধারণ করিলে অথবা কর্ণের নিকট শব্দ করিলে, হয় ত বা তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উন্মেষ হইবে না; সেইপ্রকার দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে মনঃসংযোগপূর্ব্বক কোন বস্তু দর্শন করিলে, তৎকালে তাঁহার শ্রবণাদি অন্য ইন্দ্রিয়সকল মনঃসংযোগ অভাবে কার্য্যকরী হইবে না। যদিও আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেতনার পরিচয় দিয়া থাকি, তথাপি ঐ সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের প্রবর্ত্তক মন।

মন যখন আমাদের জ্ঞানের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ মূল, তখন চেতন পদার্থ বুঝাইতে হইলে তাহার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

ক্ষিত্যাদি পঞ্চতন্মাত্রের বিকার ইন্দ্রিয়-সমূহের ন্যায়, আত্মার বিকার মন। মনও কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; ইহা সূক্ষ্ম, এক মাত্র এবং অচেতন পদার্থ। চিন্তা, বিচার, তর্ক প্রভৃতি কয়েকটি মনের গুণ আছে; এই গুণরাশি হইতেই ইন্দ্রিয়াতীত মনের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে। সূক্ষ্মত্ব হেতু ইহা ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে এবং দেহের বহিঃস্থ বিষয়ে সঞ্চারণে সমর্থ হয়। মন, চেতনা, ধাতু, আত্মার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ থাকায়, অচেতন হইলেও ক্রিয়াবান। এই মন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সংযোগে পুরুষ-পুরুষান্তরে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। মনের সত্ত্বগুণ-বাহুল্যে, পুরুষে ধর্ম্ম-শৌচাদি; রজঃ-গুণবাহুল্যে, ক্রোধ কামাদি এবং তম-গুণ-বাহুল্যে মোহ, ভয়, শোকাদি উপস্থিত হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনকে আত্মার বিকার বলা হইল, অথচ "নির্ব্বিকার পরস্তাত্মা" (চঃ শাঃ, ১ অঃ) এ কথাও আমরা শাস্ত্রে দেখিতেছি। যে আত্মা নির্ব্বিকার; তাহার বিকার মন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

পূর্ব্বে আত্মাকে চেতনার মূল স্বীকার করা

হইয়াছে, সুতরাং চেতন পদার্থ জানিতে হইলে আত্মা কি জানা আবশ্যক; তাহার পর নির্ব্বিকার আত্মার বিকার কি জানিতে হইলেও, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, যিনি আমাদের নিকট অচিন্ত্য, অব্যক্ত, পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে। তবে প্রাচীন মহর্ষিগণ, সেই স্রষ্টা পরমব্রহ্মের চিন্তার বা বর্ণনার যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই অনুসরণের চেষ্টা করিব মাত্র।

অবশ্য কেহ বলিতে পারেন যে, মহর্ষিগণ আমাদের ন্যায় মনুষ্য হইয়া কি উপায়ে সেই চিন্তাতীত অব্যক্তের চিন্তা বা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? এইরূপ প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বলিয়াছিলেন —

……তচ্চাক্ষরমলক্ষণং।

জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তজ্জ্ঞাতুমর্হতি॥

চঃ, শাঃ, ১অঃ

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম (আত্মা) চিহ্নের অতীত অক্ষর মাত্র। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিতে পারেন। যেহেতু, "গতির্ব্রহ্মবিদং ব্রহ্ম" (চঃ, শাঃ, ১অঃ) সুতরাং ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, তাহাতে লীন হইতে হইবে। "নাজ্ঞস্তজ্ জ্ঞাতুমর্হতি:" আমরা অজ্ঞ, সুতরাং আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব! যখন ব্রহ্মে লীন হইতে না পারিলে তাঁহার স্বরূপ পাওয়া যায় না, তখন কি উপায়ে ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়, এবং মহর্ষিগণই বা কি উপায়ে লীন হইয়াছিলেন, অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন বিষয় প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা করিলে, মন সেই চিন্তনীয় বিষয়ে সম্মিলিত হয়। এ অবস্থায় দেখা, সেই চিন্তনীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের ধারণা করিতে পারে না। কারণ মন, আত্মার সহিত চিরসংশ্লিষ্ট এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তক।

মহর্ষিগণ, এই উপায়ে যখন মনকে, বিচার, তর্ক, ইন্দ্রিয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ রসাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত রাখিয়া একমাত্র আত্ম চিন্তায় অভিনিবেশ করিতেন, তৎকালে তাঁহাদের মন আত্মায় লীন হইত। সকল প্রকার পার্থিব ও ঐন্দ্রিয় বিষয় হইতে মনের বিমুক্তি বশতঃ, এই সময়ে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। ইহাই মানবের সমাধি প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া।

যখন মানব-মন, রজ ও তম-গুণবিমুক্ত হইয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণান্বিত হয়, তখন (রজঃ-তমগুণের অভাববশতঃ) লোভ, ভয়, কাম, শোকাদি বিনির্ম্মুক্ত পুরুষ, (শুদ্ধ-সত্ত্ব গুণান্বিত হওয়ায়) ধর্ম্ম-শৌচাদির উদয়ে চিত্তকে ব্রহ্মে লীন করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যে শুদ্ধ-সত্ত্বের উদয়ে মানব, মনকে ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হয়, রজ ও তম-গুণের পুনরাবির্ভাবে তখন আর তাঁহার সে অবস্থা থাকে না। তখন সেই সমাধি-মুক্ত পুরুষ, স্বীয় মনের বিষয়—চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি সহায়ে ব্রহ্মকে ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয়-সাহায্যে স্থূলভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়েন।

এইরূপে সাধনা করিতে করিতে যে মানব, রজ ও তমঃ গুণ, বা তাহাদের বিষয় কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদি হইতে যত অধিক পরিমাণে মুক্ত থাকিয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইবার ক্ষমতা অধিক লাভ করিবেন, তিনি তত অধিক পরিমাণে মুক্তির বা ব্রহ্মে লীন হইবার

অধিকারী হইবেন। মহর্ষিগণও এই উপায়ে যিনি যে পরিমাণ সাধনার অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি তদনুযায়ী ব্রহ্ম বা আত্মা কি বুঝিতে ও বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ, ব্রহ্মকে ত্রিবিধরূপে দেখিয়াছিলেন, সে কারণেই তাঁহারা বলিয়াছেন ;—

"খাদয়শ্চেতনা ধাতু ষষ্ঠাস্ত্ব পুরুষঃ স্মৃতঃ।
চেতনাধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসঙ্ককঃ ॥
পুনশ্চ ধাতুভেদেন চতুর্ব্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ।
মনোদশেন্দ্রিয়ান্যর্থা প্রকৃতিশ্চাষ্টধুতুকী ॥

চঃ, শাঃ, ১অ।

যখন তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপে বিরাজমান, তখন তিনি অব্যক্ত, অনন্ত, বিভু ; কিন্তু সৃষ্টির পর যখন পদার্থে সংযুক্ত হইলেন, তখন ক্রমশঃ স্থূল পদার্থে সংযোগহেতু স্থূল আখ্যায় ষড়্‌ধাতুকী এবং চতুর্ব্বিংশতিকী পুরুষ নামে অভিহিত হইলেন। বলা আবশ্যক, তিনি অক্ষর, নিত্য, বিভু ; সুতরাং সৃষ্ট পদার্থে তিনি নূতন করিয়া প্রবেশ করেন না, বা তাঁহার কোন খণ্ডিত অংশবিশেষও জীবদেহে থাকে না। আমরা বুঝিবার বা বুঝাইবার জন্যই তাঁহাকে এই ভাবে পৃথক করিয়া লইয়াছি। যেমন শূন্য ময়দানে একখানি গৃহ প্রস্তুত হইলে, আমরা এই অখণ্ড আকাশকে খণ্ডিত মনে করিয়া, বহিঃস্থ এবং গৃহস্থ আকাশকে পৃথক মনে করি ; কিন্তু আকাশ গৃহ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যেমন এক ও অখণ্ড ছিল, গৃহ-নির্ম্মাণের পরেও সেই প্রকার এক ও অখণ্ড থাকে ; সেই প্রকার আত্মাও প্রাণী বা পদার্থ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বা পরেও সেই একই ব্রহ্ম। আরও প্রাচীরাদি ব্যবধানবশতঃ অপ্রতিহত আকাশ যেরূপ প্রতিহত দেখা যায়, সেই প্রকার দেহের ব্যবধানেও নিষ্ক্রিয়, চিহ্নাতীত আত্মার কার্য্যেও চিহ্নাদি দেখা যায় জীবদেহে, বিভিন্নগুণবিষয়ী মন এবং ইন্দ্রিয়াদি-সংযোগে তিনি সুখ, দুঃখ, লোভ, মোহাদির এবং কার্য্যের যে সমুদয় বিভিন্নতা উৎপাদন করেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার পৃথকত্ব অনুভব করি। এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদির অংশ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার বিষয় চিন্তা করিলে, তাঁহার পার্থক্য কিছু পাওয়া যায় না ; সে কারণেই এই জড়দেহ হইতে চিন্তার দ্বারা তাঁহাতে লীন হইতে পারা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম চেষ্টাদি শূন্য—নির্ব্বিকার থাকেন ; তাহার পর যখন সৃষ্টির মানস করিলেন, তখন তিনি সবিকার ; অর্থাৎ সৃষ্টির চিন্তা জন্যই তাঁহাকে মনযুক্ত হইতে হইল। এইরূপে নির্ব্বিকার আত্মার বিকার হইতে মনের উৎপত্তি হইল। তদনন্তর তিনি বুদ্ধিযুক্ত হইলেন (কারণ সৃষ্টির জন্য বুদ্ধির আবশ্যক), বুদ্ধির পর অহং অর্থাৎ আমিত্ব। যেহেতু সৃষ্টির কর্ত্তা নির্ণয় জন্য আমিত্বের প্রয়োজন উৎপাদন করিয়া তাহার পর ক্রমশঃ সৃষ্টির উপকরণ—সূক্ষ্ম আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকার সৃষ্টি করেন। আত্মা হইতে উৎপন্ন এই বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আকাশাদি প্রকৃতি অর্থাৎ জনয়িত্রী নামে পরিচিত এবং আত্মাই একমাত্র জনক অর্থাৎ পুরুষ নামে অভিহিত। এই প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে পর, আত্মা প্রথমে পঞ্চ তন্মাত্র আকাশাদির সমবায়ে সূক্ষ্ম অবয়ব সংগঠন পূর্ব্বক মন, বুদ্ধি অহঙ্কারাদিসহ কিঞ্চিৎ স্থূল ভাবে অবস্থান কালে, মানবের নিকট ষড়্‌ধাতুকী নামে অভিহিত হইয়াছেন। পদার্থ-সংগঠনের প্রথম উপকরণ আকাশাদি পঞ্চ-তন্মাত্র পদার্থসমূহ, পরস্পর হীনাধিক সম্মিশ্রণ-ফলে ক্রমশঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল মৃত্তিকা জলাদিরূপে পরিণত হইয়া,

তদনন্তর তাহাদের পুনর্ব্বার হীনাধিক সমবায়ে বিভিন্নগুণাকৃতি পদার্থসমূহের অবয়ব সংগঠিত হয়। এইরূপে এই স্থূল আকাশাদির সমবেত বিকার হইতেই জীবের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-আধার কর্ণাদি, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রভৃতির সমষ্টি-দেহ গঠিত হইয়া থাকে; আর ইহাদেরই সূক্ষ্ম অংশ হইতে জীবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন ষোড়শ বিকারের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের) সহিত পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকৃতির একত্র সমাবেশই জীব। ইনিই আমাদের নিকট চতুর্ব্বিংশতিকী জীবাত্মারূপে পরিচিত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত স্থূলপদার্থসমূহে অবস্থানকালে জীবাত্মার কতকগুলি অস্তিত্ব-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; শ্বাস, প্রশ্বাস, অচেতন মনের চিন্তাদি বিষয় গ্রহণ, ইন্দ্রিয়-সমূহে মনের গতি, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর-সঞ্চারণ, জন্ম, মরণ, বৃদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রাণিদেহে আত্মার অস্তিত্ব-চিহ্ন।

যস্মাৎ সমুপলভ্যন্তে লিঙ্গান্যেতানি জীবতঃ।
ন মৃতস্যাত্মলিঙ্গানি তস্মাদাহু মহর্ষয়ঃ॥
শরীরং হি গতে তস্মিন্ শূন্যাগারমচেতনম্।
পঞ্চভূতাবশেষত্বাৎ পঞ্চত্বং গতমুচ্যতে॥

চঃ, শাঃ, ১ অঃ।

যেহেতু প্রাণিগণই এই সকল চিহ্ন লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃতের এই সমুদয় আত্ম-চিহ্ন দেখা যায় না, সে কারণেই মহর্ষিগণ বলেন, আত্মা গত হইলে দেহ শূন্য গৃহের ন্যায় অচেতন হয় এবং এই কালে মাত্র পাঞ্চভৌতিক দেহের অবশেষ হেতু আত্মাহীন দেহকে 'পঞ্চত্বপ্রাপ্ত' জড়পদার্থ মাত্র বলা হয়।*

আত্মা, মন এবং ইন্দ্রিয়—এই তিনেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। এক্ষণে ইহা হইতে আর্য্যগণের চেতন-অচেতন সম্বন্ধে মতামত কি প্রকার জানিতে পারা যায় দেখা যাউক।

তাঁহারা একমাত্র আত্মাকেই চেতনা-ধাতু বলিয়াছেন। মনও অচেতন, আত্মার সংযোগেই তাহার চৈতন্য। পাঞ্চভৌতিক অবয়ব যখন জড়পদার্থ, তখন ক্ষিত্যাদিকেও চেতন বলিতে পারা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত এক পুরুষ ভিন্ন, প্রকৃতি ও তাহাদের বিকারসমূহ অচেতন বা জড়পদার্থ, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। মন এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ক্ষিত্যাদি প্রকৃতি, স্বয়ং অচেতন বা জড়ধর্ম্মী হইলেও, ইহাদের সহিত সৃষ্টির প্রাককাল হইতে আত্মার সংযোগ রহিয়াছে; আত্মা এই সংযোগবশতঃই পূর্ব্বোক্ত সড়্ধাতুকী নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে,

* ইহা হইতে আমরা আরও একটি বিষয় উপলব্ধি করিতেছি যে, এই মৃত্যু হইতে সচেতন পদার্থের অচেতনত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। এরূপ ঘটিবার কারণ;—জীবদেহের পুষ্টি স্থিতি প্রভৃতি সম্পাদন জন্য যে সমুদয় পাঞ্চভৌতিক খাদ্যাদি গ্রহণ করা যায়, তাহা যত দিন দেহস্থ ভৌতিক অংশের অবিরোধী হয়, ততদিন দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মল থাকে; কিন্তু ইহা দেহস্থ ভৌতিক অংশের বিরোধী হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকৃত হয়। ইহাই জীবের বিকার বা ব্যাধি। এই ব্যাধি প্রভাবে যখন দেহ অত্যন্ত বিকৃত হওয়ায় দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয় সকলের এককালীন সমুদয় কার্য্যশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহাকে "মৃত" বলা হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাহাদের কার্য্যশক্তি লোপ পাওয়ায় তাহার আর চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনা ধাতু আত্মার সহিত সৃষ্ট কাল হইতে চিরসম্মিলন হেতু সচেতন। তাহার পর এই সচেতন প্রকৃতি হইতে জাত স্থূল মৃত্তিকা জলাদি পদার্থ-গঠনের উপকরণগুলি বা ধাতু, উদ্ভিদ্, পশু, পতঙ্গ, মানবাদি ইতর সৃষ্ট পদার্থগুলিও কখন অচেতন হইতে পারে না। * সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষোৎপন্ন জগতের সমুদয় পদার্থই সচেতন; কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেতনার উপলব্ধি হইতে দেখিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়যুক্ত দ্রব্যকেই সচেতন বলিয়া থাকি; আর আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহাতে ইহার বিপরীত দেখি, তাহাকেই অচেতন মনে করি। চেতনাধাতু ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্বহেতু ব্রহ্মাণ্ডে অচেতন কিছু থাকিতে পারে না, তাহাও আমরা ভুলিয়া যাই।

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

ময়নামতীর পুঁথি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

গোপীচাঁদ তাঁহার বিশাল বিভবের বিবরণ দিয়া ও দেখাইয়া রাণী ময়নামতীকে বলিতেছেন "আমার এত লোক-লস্কর থাকিতেও ভয়ের কথা কি? আর এই বিপুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া যোগী হইব, আর কার উপরেই বা ইহার ভার দিয়া যাইব? তখন রাণী

"ময়নামতী বলে রাজা কিছু নহে সার।
দুই চক্ষু মুন্দিলে (১) সকল অন্ধকার॥"

হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে
জাইবা শৈন্য। (২)
সঙ্গে কইরা লৈয়া জাইবা পাপ আর পুণ্য॥"

এ সব দিয়া কিছুতেই যমের হাত এড়াইতে পারিবে না: যমের কাছে কোন প্রকারে নিস্তার নাই—

"তোমারে নেবারে জম নিত্য
বাউর পারে।" (৩)

এই সমস্ত কথায় রাজা গোপীচাঁদ একটু যেন ভীত হইয়া বলিতেছেন "তাই যদি হয়, তবে বাপের কালের চৌদ্দরাজার ধন, তোমার জোলার হিরামণি রত্ন, আমার কামাই রজত কাঞ্চন, চারি বধূর চারি গোলা ধন, এই সমস্ত যমের গোচরে ভেট দিলে যম আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। তখন ময়নামতী বলিতেছে—

"ধন দিয়া জমে যদি ফিরাইতে পারে।
তবে কেন বড় রাজা তোর বাপ মরে॥
ধনের কাঙ্গাল নহে সেই মহাজন।"

* পদার্থ মাত্রেই সচেতন ইহা মাত্র আয়ুর্ব্বেদপ্রচারকগণই বলিয়াছেন, তাহা নহে; ইহা প্রাচীন আর্য্য মনিঋষিগণের মত। মহর্ষি মনু উদ্ভিদের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাদের সচেতনত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতা ॥ ম সং ১ অঃ।

(১) মুদিলে। (২) শূন্য। (৩) বাউর=বাহরিয়া=ঘুরিয়া ফিরে।

রাত্রি দিনে অষ্ট প্রহরে আটবার যম যাতায়াত করিতেছে, কখন তোমাকে লইয়া যাইবে ঠিক নাই। তখন গোপীচাঁদ,—"সত্যই কি যম বাড়ীর ভিতর আসিবে?

"তবে লোহাত্র বান্ধিব পুণি (১)
আমার বাসর।
লোহার জাতনী (২) দিমু পুরীর ভিতর॥"

আশি হাজার সৈন্য পাহারা দিবে, নিজেও সর্ব্বদা খড়্গ হস্তে লইয়া জাগিয়া থাকিব। আর যদি নিতান্তই আসে

"লাল টঙ্গির রুয়া (৩) দিয়া জমেরে দিমু শাল।
মারিয়া জমেত্তে (৪) নিব বার রাজার মাল॥

ময়নামতী বলিলেন—

"আসিবেক সেই জম যম্ দেখা হইয়া। (৫)

তাকে তুমি কি করিতে পারিবে। সে "চিল" রূপে আসে "শাচান" (৬) রূপে যায়, মাছিরূপে ঘরে প্রবেশ করে। পাপিষ্ঠ যমের কাছে নিস্তার নাই। সে আত্মীয়-স্বজন কি ধন-জন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। যমে নিলে সকলেই তোমার জন্য যার যার ওজন মত কাঁদিবে, কিন্তু

"জননী কান্দিবে জান পুরা ছয় মাস।"

আর

"মায় জানে পুত্রের বেদন যার গর্ভের শাল।"

অতএব আমার কথা রাখ, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়া জীবন উন্নত ও আয়ু বৃদ্ধি কর।"

গোপীচাঁদ বলিতেছে,—

"তবে কেন বালককালে বিবা করাইল।

* * *

এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা। (৭)
সে সব সুন্দরী জানে আমার বেদনা॥
আর বিভা করাইলা খণ্ডাস্ত্রে জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মাইয়া॥

এবং এই বিবাহের সময় উরয়া রাজার সহিত দশ দিন লড়াই করিতে হইয়াছিল। তাহাতে "চৌদ্দপণ মনিয়া, সাত শত লঙ্কর, তেসট্টি হাজার হাতি ঘোড়া নিজ হস্তে কাটিলাম। যুদ্ধে হারিয়া নৃপ আমাকে কন্যা দান করিল।" এখানে গোপীচাঁদের চারি স্ত্রীর নাম পাইলাম। (১) অদুনা, (২) পদুনা বা পদ্মমালা, (৩) রত্নমালা, (৪) কাঞ্চনমালা। গোপীচাঁদের প্রথম বিবাহ অদুনা ও পদুনার সহিত হয়। অদুনা ও পদুনা সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। দুই জনের বিবাহ এক দিনে হয় বলিয়াই গোপীচাঁদ তাহাকে "এক বিবা" বলিয়াছেন। অদুনার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ গোপীচাঁদ পদুনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক স্থানে অদুনার উক্তিতে পাইতেছি—

(১) পুনরায়। (২) প্রশস্ত বেড়া। আমাদের মতে "জাতনী" স্থলে "আটনী" হইবে।
(৩) ডাশা বাত্তি। (৪) যম হইতে। (৫) অদৃশ্য হইয়া। (৬) বাজ পক্ষী।

(৭) অদুনা ও পদুনার বিশেষ সৌন্দর্য্য-খ্যাতি ছিল বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান কালেও ত্রিপুরা জেলায় সাদৃশ্য রূপবতী দুইটী সহোদরা ভগ্নী একত্রে দৃষ্ট হইলে তুলনাচ্ছলে রমনীগণ বলিয়া থাকেন যে কন্যা দুইটী কি সুন্দরী যেন "অদুনা পদুনা।" অদুনা পদুনা অবশ্যই তাহাদের ডাক নাম। পদুনার আসল নাম পদ্মমালা পাইতেছি, কিন্তু অদুনার আসল নাম পাইতেছি না। তিনি বোধ করি ডাক নামেই বিখ্যাত ছিলেন। আমাদের মতে অদুনা "অদৈন্যমালার" রূপান্তর। (পদ্মমালা) অদুনা যে অদৈন্যমালার রূপান্তর তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই কন্যার জন্মগ্রহণের পর রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়াই এই নাম রক্ষিত হইয়া থাকিবে। আমরা এরূপ ভাগ্যবান পুত্র-কন্যার নামকরণ সম্বন্ধে বহুতর সংবাদ অবগত আছি। অদৈন্য শব্দের অর্থ দৈন্যবিরহিতা বা সম্পদশালিনী। ইহাদের সৌন্দর্য্য-খ্যাতি এমনভাবে দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল যে, একসময়ে তাহা ভাট ও চারণগণের গাথায় সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হইত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "প্রতিভা" আষাঢ় ১৩১৯ বাং সংখ্যায় এই বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

"মোর ভৈন পদুনারে পাইলা বেভার (১)।
ধনরত্ন মোর বাপ আছিল অপার (২)॥"

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে অদুনা ও পদুনার পিতার নাম কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। তবে তাহাদের পিতার রাজধানীও যে বেশী দূরে ছিল তাহা বোঝা যায় না (৩)। অদুনার উক্তিতে আছে—

"যখন অদুনার মাথে ছোট ছিল চুল।
সেই দিন তোমার মাএ নিল পান ফুল॥
এক বৎসরের কালে নিত্য আইল গেল।
পঞ্চ বৎসরের কালে দেখি জোড়া দিল॥"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, অদুনা ও পদুনার জন্মের পর হইতেই রাজা গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী তাহাদের সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়া কেবল আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। অদুনার মাথার চুল ছোট থাকার সময় অর্থাৎ শৈশব কালেই ময়নামতী পুত্রের বিবাহ সংকল্প "পান ফুল" গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বৎসরের কালে নিত্য আসা যাওয়া করিয়া পঞ্চম বৎসরের সময়ই "জোড়া দিল" বা যোটক মিলাইল। ইহা বিবাহের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য আচার-ব্যবহার। তার পর—

"সপ্ত বৎসরের কালে আনি বিভা কৈলা।
নব বৎসরের কালে মন্দিরেতে নিলা॥
তুমি সাত আমি পাঁচ এমত কালের বিয়া।
হিরামণ মাণিক্য মুক্তা যৈক্ষদান দিয়া॥"

সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বাল্য-বিবাহ প্রচলন দেখা যাইতেছে। "তুমি সাত আমি পাঁচ এমত কালের বিয়া" উক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পাঁচ বৎসরের কালে যোটক মিলনকেই বিবাহ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, প্রকৃত বিবাহ সাত বৎসরের সময় সম্পন্ন হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্র মতে কন্যা বাক্‌দত্তা হইলেই বিবাহ হইল বলিয়া স্থির হয়।

আর বিভা "খণ্ডাএ" রাজার কন্যা। ইনি অবশ্যই খণ্ডলের রাজার কন্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। "খণ্ডাএ" ও "খণ্ডল" শব্দে বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায়। খণ্ডল ত্রিপুরা জেলারই একটী পরগণা।

তৎপর "উরয়া" রাজা। এই উরুয়া রাজাকে আমরা "উরুম্বা" বা হিড়িম্বা (কাছাড়) রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। আমাদের দেশে "হ" স্থানে "অ" বা "উ" বলার বিশেষ রীতি আছে। * তাই মনে হয় প্রথমে "হিড়িম্বা" তাহা হইতে (তুচ্ছার্থে) "উরুম্বা" তাহা হইতে সংক্ষেপ "উরুয়া" করিয়া লওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে কোন একটা কদাকার 'জবস্থব' বালিকা দেখিলে তাহাকে হিড়িম্বার সহিত তুলনা দিতে গিয়া "উরুম্বা" বলা হইয়া থাকে। কেননা প্রবাদ যে, হিড়িম্বা অতি কদাকার রাক্ষসী ছিল। অতএব আমাদের মতে "উরুয়া, উরুম্বা বা হিড়িম্বা রাজা (কাছাড়)।

(১) যৌতুক। (২) অশেষ ধনরত্ন যাচিল।

(৩) M. Martin's "Eastern India" নামক পুস্তকে অদুন ও পদুনাকে ঢাকা সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া মনে হয়, কেননা রাজা হরিশ্চন্দ্রের জাতীয় স্তরের সহিত মাণিকচাঁদের জাতীয় স্তরের ও সমসাময়িকতার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা রাজা মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদকে নিম্নস্তরের হিন্দু-বণিক রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাহিষ্য জাতীয় বংশধরগণ অদ্যাপিও সাভার ও তৎসন্নিহিত স্থানে বিদ্যমান। এবং তাহারা সকলেই হিন্দু-আচারসম্পন্ন।

* হোলা বিড়াল = উলা মকুর। হইল = অইল। পশ্চিম বঙ্গেও হলুকে উলু বলে।

এই জন্যই গোপীচাঁদকে এই বিবাহ করিতে দশদিন যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কেননা কাছাড়পতি একটা যেমন তেমন রাজা ছিলেন না।

আরও দেখিতে গেলে "উরয়া" যদি "উত্তরয়া" কথার অপভ্রংশ হয় বা লিপিকর-প্রমাদে "ত্ত" লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই কাছাড় রাজ্যকেই লক্ষ্য করিবে, কেননা ময়নামতী (মেহারকুল) হইতে কাছাড় উত্তরে অবস্থিত।

ধন-রত্ন ছাড়িয়া যাইবার কথায়, উপযুক্তা চারি স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যাইবার কথায়, কোন কথায়ই ময়নামতীর দৃঢ় পণ বিচলিত হইল না। তিনি পুত্রকে কেবলি যোগ শিক্ষা করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিতে জেদ করিতে লাগিলেন। এবার রাজা গোপীচাঁদ নাছোড়-বান্দা মাতার জেদ বজায় রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথায় অদুনা পদুনা প্রভৃতি চারি নারী ক্রন্দন করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। পতির সঙ্গে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। গোপীচাঁদ পথে বাঘের ভয় দেখাইলেন। পত্নীগণ কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইলেন না। বলিলেন,—

"খাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর।
তুমি আগে (১) মৈলে হইব
সাফল্ল (২) মোর।"

এইরূপে, কখনও বিনয়ে কখনও একটু জেদ করিয়া, কখনও বা প্রণয়ের কথা বলিয়া, গোপীচাঁদকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোপীচাঁদ এবার বেশ দৃঢ়। এস্থানের কবিতা বড়ই সুন্দর। বৈকুণ্ঠ বাবু তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রবন্ধের অতি দীর্ঘতার ভয়ে আমরা তাহা ইচ্ছা সত্ত্বেও ত্যাগ করিলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। এই অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা অনেকস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, তাই আমরা গ্রন্থের একটা অতি সংক্ষেপ বিবরণ দিয়া আমাদের মূল বক্তব্যের দু-একটী কথা যাহা বাকী আছে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই গ্রন্থের আমূল আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। প্রবন্ধও অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। এখন সংক্ষেপতঃ এই:—গোপীচাঁদের পত্নীগণ তখন শাশুড়ীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে পরামর্শ ক্রমে বানিয়ার বাড়ী হইতে বিষলাড়ু ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাকে ভেট দেওয়ার কথা, ময়নামতীর বিষভক্ষণ, তাহার লাঞ্ছনা, বিষজারণ করা, ময়নামতীর গোর্খনাথের নিকট জ্ঞান-শিক্ষার ও মন্ত্র-প্রাপ্তির ইতিহাস, মাণিকচাঁদের মৃত্যু-কাহিনী, তাহার দাহ-সংস্কার, ময়নামতীর সহমরণ-গমনের উদ্যোগ প্রস্তাবের সত্য-মিথ্যার সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ, বধূগণের বাক্যে গোপীচাঁদের মত-পরিবর্ত্তন, মাতার জ্ঞান-পরীক্ষা-গ্রহণ, তুষ্ট হইয়া যোগ-শিক্ষা করিতে গমনে সম্মতি-প্রকাশ, গুরু-অন্বেষণ, হাড়িকার সহিত গৃহত্যাগ, গুড়িপুর গমন, মদের কড়ির জন্য বেশ্যার নিকট হাড়িকার গোপীচাঁদ বিক্রয়, গোপীচাঁদ কর্ত্তৃক বেশ্যার প্রেম-প্রত্যাখ্যান, বেশ্যার কোপে রাজা গোপীচাঁদের ছাগল-রক্ষকের বৃত্তিগ্রহণ।

তুমি আগে অর্থে তোমার অগ্রে। (২) ধন্য সফল

গোপীচাঁদের পত্নীগণ কর্ত্তৃক তাহার শিক্ষিত শুকপক্ষী * ছাড়িয়া দিয়া তাহার সন্ধান জ্ঞাত হওয়া, ময়নামতীর আত্মগ্লানি, পুনরায় হাড়িকা সিদ্ধার নিকট গমন, পুত্রের উদ্ধার-সাধন, হাড়িকা কর্ত্তৃক গোপীচাঁদ-উদ্ধার। রাজ্যে আগমন, রাজ্যগ্রহণ, ময়নামতীর সুরঙ্গ † পথে মহাপ্রস্থান, কপিলমুনির আশ্রমে গমন ইত্যাদি।

আমরা এখানে গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদের সামাজিক স্তরের কথার একটু আলোচনা করিব। বৈকুণ্ঠবাবুর মতে "রাজা মাণিকচাঁদ বৌদ্ধ ছিলেন এবং গ্রন্থের আগাগোড়া সমাজচিত্র বৌদ্ধ তান্ত্রিকের সমাজচিত্র।" এ কথা আমরা স্বীকার করি না। তিনি গ্রন্থের যে দুইটী চরণ মাত্র উল্লেখ করিয়া আগাগোড়া গ্রন্থে বৌদ্ধত্বের ছায়া দেখাইয়াছেন তাহা এই :—

"মাণিকচাঁদের জ্ঞাতিগোত্র একাযুক্ত হৈয়া।
সপ্তদিন কাষ্ঠ কৈল লারিয়া চারিয়া॥"

তিনি এই সপ্তশব্দের পরে একটা "ম" যোগ করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন মাণিকচাঁদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া বৌদ্ধমতে সপ্তম দিনে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে দুইটী কথা চিন্তা করিবার আছে। আমাদের মতে উক্ত উদ্ধৃত চরণ দুইটী নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

"মাণিকচাঁদের জ্ঞাতিগোত্র একাযুক্ত হৈয়া।
সপ্ত দিল কাষ্ঠ কৈল লারিয়া চারিয়া॥"

"দিন" স্থলে "দিল" করিলেই ইহার পরিষ্কার অর্থ হয় যে, রাজা মাণিকচাঁদের জ্ঞাতি-গোত্র তাহার চিতায় "সপ্তকাষ্ঠ" দিল এবং লাড়িয়া চাড়িয়া কাষ্ঠ করিল বা দাহ করিল। কবি এখানে একটী "কাষ্ঠ" শব্দ দ্বারা "সপ্তকাষ্ঠ" "কাষ্ঠ করা" দুই দিকই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দু মাত্রেই বোধ করি অবগত আছেন, যে মৃতদেহ দাহ করিবার সময় শ্মশানে বন্ধু জ্ঞাতি গোত্রের একযোগে চিতায় "সপ্তকাষ্ঠ" দিতে হয়।

আমাদের বিশ্বাস "ল" স্থানে "ন" আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি নকলনবীশ মহাশয়দের কীর্ত্তি। প্রাচীনকালে "ন"র নীচে বিন্দু দিয়া "ল" "ল" লিখিবার প্রথা ছিল। বোধ করি নকলকারীদের কল্যাণে "ল" "ন" হইয়া পড়িয়াছে বিন্দু লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আর গুণবাচক পূরণ-বাচক তালাস করিবার এবং "সপ্ত" কথার

* আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গবেষণার ফলে বার্ত্তাবহ-কপোতের কথা শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য মনে করিবেন। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে শুকপক্ষীর দ্বারা গোপীচাঁদের সন্ধান গল্পটাকে "মিথ্যা বা বিশ্বাস যোগ্য নহে" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই শিক্ষিত পশু-পক্ষী দ্বারা বহুবিধ অলৌকিক কার্য্য সাধনের ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপ হইতে শোধিত হইয়া না আসিলে আমরা কোনটাই বিশ্বাস করি না।

† এই সুবাদ অদ্যাপি বর্ত্তমান। প্রায় দুইশত বৎসর হইতে ময়নামতী পর্ব্বতে ত্রিপুরার মহারাজার একটী বাঙ্গালা ঘর বিদ্যমান আছে। যে ভিটাতে এই বাঙ্গালা ঘর স্থাপিত তাহা বহু প্রাচীন—মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তুত নহে। এইখানে ময়নামতীর কেল্লা ছিল। উক্ত ভিটার চতুর্দ্দিকে বর্গক্ষেত্রাকারে একটী বিস্তীর্ণ মাঠ আছে উহা ইষ্টকরাশিতে গ্রথিত। উক্ত সুড়ঙ্গ বর্ত্তমান বাঙ্গালা ঘরের ১২ ফুট পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এখনও লোকে দুধ কলা ও নৈবেদ্যাদি উপকরণে উক্ত স্থানের পূজা করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন ইংরেজ পরিদর্শকের একটী অল্পবয়স্ক বালক সুড়ঙ্গ দেখিতে যাইয়া দৈবাৎ উহার মধ্যে পড়িয়া আহত হওয়ায় তাহার মুখ ইষ্টক দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সহিত আর একটা "ম" যোগ করিয়া লওয়ারও বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। আর যদি বৈকুণ্ঠ বাবুর কথাই ধরিয়া লওয়া যায়, তবুও সপ্তম দিনে রাজা মাণিকচাঁদকে কাষ্ঠ করিবার বিশেষ কারণ পাওয়া যায়।

"আশার মাসেতে মৈল মাণিকচাঁদ গোসাই।
প্রিথিম্বিতে (১) জলমত্র পুড়িতি স্থল (২)
নাই॥"

তারপর ময়নামতী গঙ্গার স্তব করিয়া গঙ্গার নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার স্নেহ উৎপাদন করিয়া গঙ্গার কৃপায় চরভূমি (৩) প্রাপ্ত হইয়া তবে রাজা মাণিকচাঁদকে দাহ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। হইতে পারে এই জন্যই সাত দিন পর দাহ সংস্কার হইয়াছিল। ঘটনাবশতঃ এরূপ হইয়াছিল বলিয়া কোন হিন্দুকে বৌদ্ধ-আচারসম্পন্ন মনে করার কোন হেতু নাই। আমরা জানি পুরাণাদিতেও এরূপ অনেক ঘটনা আছে। বিশেষতঃ কোন বৌদ্ধকে দাহ করিবার জন্য গঙ্গাতীর (৪) অনুসন্ধান করিতে হয় না। গঙ্গার কূলে বসিয়া গঙ্গার আরাধনা করাও বৌদ্ধ রীতি নহে। সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া মুখাগ্নি (৫) করিবার প্রথা এবং সহমরণ (৬) বৌদ্ধমতে নাই।

(১) পৃথিবীতে। (২) পোড়াইবার স্থান। (৩) এই চর বর্ত্তমান কালেও কুমিল্লা সহরের অংশ বিশেষ "গাংচর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গাপ্রদত্ত চর বলিয়াই ইহার এই গঙ্গার চর বা গাংচর নাম হইয়া থাকিবে। মেঘনাদ, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বহুতর বৃহৎ নদীর অনেক চর দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোনটা গাংচর বলিয়া উক্ত হইয়াছি কি না সন্দেহ। এমন কি নিজ গঙ্গা নদীর কোন চর-ভূমিও গাংচর বা গঙ্গার চর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে এমন শুনি নাই। অথচ এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী গোমতীর একটু ক্ষুদ্র চর-ভূমি কেন গাংচর নামে অভিহিত হইল, ইহা চিন্তার বিষয় নহে কি? বিশেষতঃ ময়নামতী গঙ্গার স্তব করিয়া চর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম গাংচর হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না কি? এবং ইহাই আমাদিগকে "সত্য যুগে গঙ্গাদেবী গোমুইদে আছিল" এই কথার সত্যতার প্রতি আকৃষ্ট করে না কি? আরও দেখুন—গাংচরের সংলগ্ন পশ্চিমাংশ "শাত্তন গাছা" বা শ্মশানগাছা বলিয়া উক্ত হইতেছে। এই শ্মশানগাছাও রাজা মাণিকচাঁদের শ্মশানস্মৃতির নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। দেখা গিয়াছে রাজা মাণিকচাঁদকে দাহ করিবার জন্য স্থল পাওয়া গিয়াছিল না। ভিজা সেঁতস্যাতে নূতন চরে মাটি পুঁতিয়া শ্মশান করারও অসুবিধা বলিয়া কেবলি গাছের দ্বারা চিতা রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা গাছের শ্মশানের পরিবর্ত্তিত নাম শ্মশানগাছা হইয়া থাকিবে। কেননা ময়নামতীর উক্তিতে বৃক্ষদ্বারা শ্মশান-রচনার বাহুল্য বিবরণে স্পষ্ট ইহা মনে জাগিয়া উঠে। ভারে ভারে লাকড়ী ও গাছ পুড়িয়া স্বর্গে ধোঁয়া উঠার বর্ণনা বাহুল্য করিব এই উক্তিতে পরিলক্ষিত হইতেছে। নতুবা লাকড়ী দিয়া চিতা রচনা করার বিবরণ না দিলেও চলিত। ([illegible])

"তবে তোর বাপেরে যে পুরিবারে নিল
গাছ গাছেরা দিয়া তারে প্রেত ডালি দিল।"

(৪) "সত্য কালে গঙ্গাদেবী গোমুইদে আছিল।" অর্থাৎ পুরাকালে গোমতীকে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র মনে করা হইত। যে কোন নদীকে হিন্দুরা গঙ্গা বলিয়া মনে করে। কোন স্রোতস্বতীর তীরে মৃত দেহ দাহ করা হিন্দুদিগেরই প্রধান রীতি। (৫) "সাত পাক দিয়া অগ্নি মুখে দিলাম মুই।"

মাণিকচাঁদের দাহ-বিবরণে ময়নামতী এই কথা বলিয়াছিলেন।

(৬) "আছিল চন্দন কাষ্ঠ আনিল কাটিয়া
আমি কৈলা শুতিলাম বা অঙ্গ চাপিয়া।
ভারে ভারে লাকড়ি সব দিলেন তুলিয়া।
তোর বাপেরে রখিলাম দীপাগ্নি করিয়া।
কাচা হইয়া পরে তপ্ করে ধর ধর।
উনাইয়া পরে রাজা অগ্নির ভিতর॥
সে সকল গাছ পরিগ গন্ধে উঠে ধোঁয়া।
সে অগ্নিতে রহিল মুই যেন কাঁচা সোনা॥"

ব্রাহ্মণ (৭) দ্বারা চিতাপূরকও বৌদ্ধেরা অবশ্যই দেয় না। বৌদ্ধদিগের দাহ-সংস্কার সপ্তম দিনে সম্পন্ন হওয়ারও কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। (৮) আরো দেখা যায় যদি তাহাদের সামাজিক প্রথায় "বাসিমড়া" করা রীতিবিরুদ্ধ না হইত, তবে ময়নামতীর বধূরা তাহার উপর ক্রোধবশতঃ মনে মনে তাকে গালি দিবার সময়

"অবশ্য মরিবা তুমি আমরার বাসরে।
সপ্ত দিনের বাশিমড়া করিমু তোমারে॥"

এইরূপ উক্তি করিতেন না। এই গ্রন্থে দেব-দেবীর অর্চ্চনা-বন্দনা বিশদভাবে না থাকিলেও অনেক স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গঙ্গার স্তব, অনাদি অব্যয় প্রভু নিরঞ্জনের নাম, দুর্গাদেবী, মহাদেবীর কথা, চন্দ্র, সূর্য্য, যমের কথা, গুরুর নিকট আড়াই-অক্ষরী বীজমন্ত্র-গ্রহণের কথা, গ্রহ-বিপ্র দ্বারা শুভদিন-নির্ণয়ের কথা, পাপ করিলে লক্ষ্মী ছাড়িবার কথা এইরূপ অনেক কথা আছে। অতএব ইহাদ্বারা কোন প্রকারেই একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন হইতেছে না। ইহা নিশ্চয় যে রাজা মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ প্রভৃতি সকলেই হিন্দু ছিলেন। এক্ষণে কোন্ শ্রেণীর হিন্দু ছিলেন তাহা দেখিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহারা বণিক-জাতীয় রাজা ছিলেন। আমাদের মতে তাঁহারা বৈশ্য ছিলেন। উচ্চশ্রেণীর নিষ্ঠাবান হিন্দু না হওয়াতেই তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপের সহিত কোন দেবদেবীর স্তুতি-বন্দনাদির বিশদ ভাবে উল্লেখ নাই।* তাহাদিগকে বণিক-জাতীয় হিন্দু রাজা বলিবার কয়েকটী কারণ পাইতেছি।

"গাঙ্গেতে এড়িয়া জাবে বত্তিশ কাহন নাও।"

"নয়ানগড় এড়ি জাবে উনশত বাণিয়া॥"

ব্যবসায়ী ভিন্ন এতগুলি নৌকা ও এতগুলি বণিক কর্ম্মচারী থাকিবার কোন কারণ নাই। তাহাদেরই উক্তির একস্থলে পাইতেছি

"সাধুগণে গৌরব করে যার কাছে নাও।"

(নৌকা) এর উপরও প্রমাণ চাই কি? সাধু অর্থে সওদাগর, কাহারও অবিদিত নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি রণপোত থাকাও বিচিত্র নহে।

গোপীচাঁদের টাকা দিয়া যম বশীভূত করিবার প্রস্তাবে ময়নামতী বলিয়াছিল "তাই যদি হইত তবে তোমার বাপ বড় রাজা মরিল কেন?

"ধনের কাঙ্গাল নহে সেই মহাজন।"

এই "মহাজন" শব্দও ব্যবসায়ী অর্থ-জ্ঞাপক। আর মাণিকচাঁদের শ্মশান-বন্ধু-গণের মধ্যে ময়নামতীর সাক্ষী † স্বরূপ দুইজন বণিক পাইতেছি, তার মধ্যে একজন "রাজা সাউদ লক্ষ্মীধর"। এখন বোধ করি, নিসঙ্কোচে ইহাদিগকে বণিক-রাজা বলা যাইতে পারে। স্বজাতীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় স্বজাতীয়ের আগমনই সমীচীন। কথাও আছে

(৭) "ব্রাহ্মণের কোলে থাকি লাটিছলিমাথিই।
সে অগ্নিতে পোড়া না গেল তিলকচাঁদের ঝিই॥"

(৮) হিন্দু ও বৌদ্ধের দাহ-সংস্কারে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় বৌদ্ধ দাহ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* প্রতিভা ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার রায় সাণ্ডারের প্রাচীন কীর্ত্তি প্রবন্ধে রাজা হরিশ্চন্দ্রের জাতি নির্দ্দেশে ইহা সমর্থিত হইতেছে।

† এক সাক্ষী আছে মোর ভাট দামুদর।
আর সাক্ষী আছে ব্রাহ্মণ সন্দিহর।
আর সাক্ষী আছে রাজা সাউদ লক্ষীধর।
সাক্ষী আনিবারে শীঘ্র পাঠাও অনুচর॥"

মৌলবী আবদুল করিমের প্রাপ্ত পুস্তকে "ভাট" স্থলে "বেটা" লিখা আছে। ইহাও ভুল। বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রাপ্ত পুস্তকের "ভাট" শব্দই নকলনবীশগণের লিপি-পিচ্ছলতায় যে বেটায় পরিণত হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। এই পুস্তকেই আমরা "ভেট" স্থলে "বেট" লিখা পাইতেছি।

"মাণিকচাঁদের জাতিগোত্র একাযুক্ত হৈয়া।
সপ্ত দিল কাষ্ঠ কৈল লাড়িয়া চারিয়া।"

এখানে উপস্থিত শ্মশান-বন্ধুরা যে মাণিকচাঁদের জাতি-গোত্র, এ কথা খুব পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যাইতেছে। জাতিগোত্র যার "সাধু মহাজন" "বণিক জাতি" তাহাকে নিশ্চিতরূপে বৈশ্যজাতীয় বলা যাইতে পারে।

"আমার কামাই আছে রজত কাঞ্চন।"

গোপীচাঁদ যম রাজাকে ধন দিয়া বশ করিবার কথায় মাতাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাতেও বেশ প্রতিপন্ন হয় যে, রাজার ছেলের "কামাই" "রজত কাঞ্চন" চাকুরী করিয়া রোজগার নহে, অবশ্যই বাণিজ্যপ্রসূত। বণিক হইলে রাজা হইতে পারে না বা রাজা বাণিজ্য করেন না এমন কথা হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে অনেক রাজাই বণিক, পুরাকালেও এমনই ছিল। চাঁদ সওদাগর রাজা ও বণিক ছিলেন। "কহে রাজা দণ্ডধর" এরূপ অনেক উক্তি মনসার পুঁথিতে দেখা যায়। সর্ব্বোপরি রাজা গোপীচাঁদের আর এক বড় ভাইয়ের নাম পাইতেছি "মুদাই তাম্বুলী" (১)। (অবশ্য এই ব্যক্তি রাজা মাণিকচাঁদের অন্যা স্ত্রীর গর্ভজাত, নতুবা বড় ভাইয়ের হিসাবে তিলকচাঁদের রাজত্ব ময়নামতীর পর গোপীচাঁদ না পাইয়া ইহারই পাইবার কথা) এই তাম্বুলী বা তামেলী ব্যবসায়ী জাতি নবশাখশ্রেণী। গোপীচাঁদ রাজ্য ত্যাগ

এই সম্বন্ধে দুইটী কথা দ্বারাই মৌলবীআবদুল করিমের ভুল ধরা পড়িতেছে। প্রথম—ময়নামতীর "বেটা" দামোদরই যদি মাণিকচাঁদের সহিত তাহার সহমরণ-চেষ্টার সাক্ষী হইত তবে ময়নামতী কখনও "হেন সাক্ষী দিব হেন নাই মেহার কুল।"—বলিতেন না। তাঁহার অবশ্য ইহা বোধ ছিল যে নিজের বেটা নিজের বাড়ীতে মেহারকুলেই আছে। আর এই সাক্ষীকে আনাইবার জন্য "[illegible] পাঠাও অন্তর" ইহাও অনুজ্ঞা করিতেন না। ২য় কথা—দামোদর বলিয়া যদি ময়নামতীর কোন পুত্র থাকা ঠিক হইত, তবে সেই পুত্র দামোদর রাজা গোপীচাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কেননা তিনি ময়নামতীর সহমরণ গমনের পক্ষে স্বয়ং চাক্ষুষ সাক্ষী। এ অবস্থায় গোপীচাঁদ রাজা না হইয়া দামোদরই রাজা হওয়ার কথা। তাহা যখন হয় নাই তখনই বোঝা যাইতেছে যে দামোদর ময়নামতীর পুত্র নহেন। বরং মাণিকচাঁদের কোন আত্মীয় শ্মশান বন্ধু "ভাই দামোদর।" সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক ভাগিনেয় (পরে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাধিকারী) দামোদরের কথা পাইতেছি, ইনিই সেই দামোদর কি না [illegible] তাম্বুলীর কথা যথাস্থানে উক্ত হইবে।

মৌলবী আবদুল করিম তাঁহার ভাবতত্ত্বে লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে থেতুয়া বা থেতু বলিয়া যে এক ব্যক্তিকে খাড়া করিয়াছেন তাহাও বেশ একটু রহস্যপূর্ণ। কথাটা "থেতু" নহে "থেওা" [illegible] নহে, ও তে আকার।

"থেওা স্থানে সমর্পিব ঘর আর বাড়ী।
কার স্থানে সমর্পিব এ চারি সুন্দরী॥"

থেওা=থেয়=গড়খাই বা পরিখা। গোপীচাঁদ বলিতেছে "মা আমি ত এক শরীর লইয়া দেশান্তরে যাইব, ঘরবাড়ী না হয় গড় খাইয়ে ফেলিয়া যাইব বা গড় খাইয়ে পড়িয়া ধ্বংস হইবে, কিন্তু এ চারি সুন্দরী স্ত্রী কাহার নিকট দিয়া যাইব?" আবার পরক্ষণেই মনে হইল "বড় ভাই আছে মোর মুদাই তাম্বুলী।"
তার ঠাই সমর্পিব এ চারী সুন্দরী॥"

অতএব "থেওা" থেতুয়া বা থেত্তা নামক কোন ব্যক্তি বিশেষ নহে। তজ্জন্য বিশেষ চিন্তা করিবারও আবশ্যকতা দেখা যায় না।

(১) ময়নামতীর সহিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস-যাত্রাকালে ধন-সম্পত্তি কাহার নিকট রাখিয়া যাওয়া যায় এই পরামর্শ কালের উক্তি—

"বড় ভাই আছে মোর মুদাই তাম্বুলী।
তার ঠাই সমর্পিব এ চারি সুন্দরী॥"

অন্যান্য পাঠেও তাম্বুলী শব্দ পাওয়া যায়।

"অঙ্গের যত জমা জোড়া এড়ে খসাইয়া
সোণার মুষ্ঠ তরবার তাম্বুলীরে দিয়া।
যাও যাও হস্তী ঘোড়া তারে নাহি দায়।
দান সাধিবারে যাই জীবন উপায়।

করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে মুদাই তাম্বুলীকেই সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিলেন। (২) "তামেলী" কথাটা "তাম্বুলী" শব্দেরই অপভ্রংশ। তিলি পাল ও তামেলী পাল আমাদের দেশে বিস্তর আছে। তাহারা সকলেই নিম্নস্তরের হিন্দু। পান-ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে সাধারণতঃ "বারই" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও উপাধি "পাল" কেহ কেহ "লতাবৈদ্য" ইত্যাদি। এই "পাল" শব্দ দেখিয়া যদি কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগকে বৌদ্ধ পালরাজাদের বংশধর বলিয়া মনে করেন এবং "বিদ্যা" শব্দ দেখিয়া বল্লাল সেনের বংশধর বলিয়া অনুমান করেন, তবে তাহাদের কল্পনার তারিপ বলিতে হইবে। সম্ভবতঃ এই পাল শব্দ দেখিয়াই কোন কোন মহাত্মা সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র ও মাণিক-চাঁদকে বৌদ্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। বিজয় বাবু সাভারের প্রাচীন কীর্ত্তি (৩) প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, "রাজবাটীতে যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন। ইংরেজ সংশ্রবে আমরা যেমন কতকটা সংস্কার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, মুসলমান সংশ্রবে তৎকালে যেরূপ আচার-ভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল, বৌদ্ধ প্রভাব কালেও অনেকে সেইরূপ অনেকটা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন—ইহা স্বাভাবিক। ইংরেজ আমলে অনেক হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছেন ও হইতেছেন। মুসলমান অনেকে মুসলমান—কেহ কেহ বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্ত্তে, অর্থাৎ না হিন্দু না মুসলমান হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাব কালেও অনেক হিন্দু বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই দুর্দ্দিনে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘর্ষ কালে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য উদ্ভূত হন। হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব রক্ষা হয়, মুসলমান আমলে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব রূপান্তরিত ভাবে হিন্দুধর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তিত করেন, নতুবা উপায় ছিল না। আর ইংরেজ আমলে মহাত্মা রামমোহন—তাহাও পরিবর্ত্তিত আকারে হিন্দুধর্ম্মের 'সমাজ' সৃষ্টি করিয়াছেন। আর ইহাও সত্য যে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও মাণিকচাদ প্রভৃতি কতক বৌদ্ধভাবাপন্ন থাকিলেও হিন্দু ছিলেন। কেননা অন্য ভাবাপন্ন হিন্দু আজিও ভারতে বিরল নহে। (৪) দোলমঞ্চ ও রথখলা দর্শনে এই কথাই সমর্থিত হয়। আর ধামরাইর যশোমাধব বা যশোপালের হিন্দুত্বের বিরাট নিদর্শন। *

(২) তাম্বুলী শব্দে পানব্যবসায়ীকেও বুঝায়।

মাণিকবাবা-কাহিনী—পৃঃ ৩২৫।

(৩) প্রতিভা ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা।

(৪) বিগত ১৯০৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ মার্শাল ও স্পুনারের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টার ফলে হিয়োনসাং বর্ণিত পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী রাজা কণিষ্কের স্থাপিত মঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে রক্ষিত কৌটা ও মুদ্রাতে খোদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে কণিষ্কের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় ইনি সম্পূর্ণ বৌদ্ধ ছিলেন না, হিন্দু দেবদেবীও মানিতেন। প্রতিভা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও পাল বংশের জাতীয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান রহিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন "সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রকে অনেকে হরিশ পাল বলিয়া জানে। * * * পালরাজগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন বলা যায় না। তাঁহারা যে জাতীয় থাকুন না কেন, পরে যে ইঁহারা রাজবংশী ও কোচগণের সঙ্গে স্থানে স্থানে মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালের বংশধর ভারতচন্দ্র রায় এখন নিকটবর্ত্তী কোন্ডা গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী। * * এই হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে পাটিকানগরের রাজা বিখ্যাত গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র বিবাহ করেন)।" প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯ বাং। উক্ত পাটিকানগর যে পাটিকারা (ত্রিপুরা) নামের রূপান্তর তাই বলাই বাহুল্য। পাটিকারার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

* ১৩১৯ বাং প্রতিভা কার্ত্তিক সংখ্যায় বিজয়কুমার রায় লিখিয়াছেন।—"হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন, একথা শুনিবা মাত্র কতিপয় নব্য ঐতিহাসিক প্রবর ঘরে বসিয়া বসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে 'পাল' উপাধিতে ভূষিত করিয়া

বৌদ্ধ হইবে এ কথার কোন অর্থ নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগের বৌদ্ধ-আচারসম্পন্ন সম্প্রদায় হইতে পৌরাণিক বৌদ্ধ ভিন্ন প্রকারের ছিল। হিন্দুগণও বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ভক্তি করিতেন এবং বৌদ্ধ মতে আস্থাবান ছিলেন। এখনকার মগ, চীন ও জাপানী প্রভৃতিরা অন্ত্যজ জাতি হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত, সেইজন্তই আচার ও সংস্কার-ভ্রষ্ট। ইহার পর বোধ করি রাজা মাণিকচাঁদের বংশকে কেহ হিন্দু ব্যবসায়ী বা সওদাগর রাজা বলিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

এই রাজবংশ নিশ্চয়ই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন না। তাহা হইলে রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রের স্ত্রী অদুনা সুন্দরী "সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর" বলিয়া গৌরব করিতেন না। "কায়েতের ঝি আমি" বা "বৌ আমি" বলিয়াই নিজকে গৌরবান্বিত করিতেন। ইহাদ্বারাও বুঝা যায় তাহারা কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন জাতি ছিলেন।

বৈকুণ্ঠ বাবু কৃত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ঐতিহাসিক সময় নিরূপণ ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি রাজা রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ে "তীরুমলয়ের" গিরি লিপিদ্বারা যে সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমাদের মেহারকুলের রাজা গোপীচাঁদের কথা নহে, উহা বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের কথা। সম্ভবতঃ ইহাকেই লোকে মহীপালের পুত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকিবে। ময়নামতীর গোপীচাঁদের প্রাচীন স্বহেন (ত্রিপুরার) অন্তর্গত কমলাঙ্কের (মেহারকুল ও পাটিকাড়ার) রাজা ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল ১০২১ খৃঃ বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রকে † পরাজিত করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে মূলেই ভুল। এখানেই "উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে" চাপিয়া পড়িয়াছে। দুই গোবিন্দচন্দ্রকে এক করিয়া অনেকেই ভুল করিতেছেন। ময়নামতীর গোবিন্দ-চন্দ্রের পিতা মাণিকচাঁদ তাহা শত স্থানে পাওয়া যাইতেছে। তবুও কি ইহাকে পালবংশীয় বলিতে হইবে? বৈকুণ্ঠ বাবুর গণনা ভুল হ'ক আর না হক এই রাজ্য যে বহু প্রাচীন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

মৌলবী আব্দুল করিম ভারতবর্ষে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে, বীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "প্রতিভা" ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য-অধিকার লইয়া ধর্ম্মপালের সহিত ময়নামতীর যুদ্ধ ও তাহাতে গোপীচাঁদের শ্বশুর রাজা হরিশ্চন্দ্রের তিস্তা নদীর তটে মৃত্যু ঠিক বলিয়া মনে হয় না। প্রতিভা ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বজয়কুমার রায় লিখিত "সাভারের প্রাচীন কীর্ত্তি" প্রবন্ধে রাজা হরিশ্চন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন লিখিত হইয়াছে। যুদ্ধে মৃত্যুর কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর কর্ত্তৃক তাহার কোন প্রকার যুদ্ধ-সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ

পাল বংশের তালিকা ভুক্ত করিতে ব্যগ্র হন। এরূপ গবেষণা প্রশংসাজনক বটে! আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র কাহারও নিকট এই ভিত্তিহীন কথার প্রমাণ পাইতে পারি নাই। বিশেষতঃ রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে অধস্তন পুরুষগণ এখনও বিদ্যমান আছেন তাঁহারা একথা ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন না।"

† দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র দেব বা কোপাকেশরীর দিগ্বিজয় জ্ঞাপক তীরুমলয়ের গিরিলিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে রাজেন্দ্র চোল বিহার রাঢ় ও বঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে দণ্ডভুক্তি বা দণ্ড বিহারে (বর্ত্তমান বিহার) ধর্ম্মপাল, উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর ও বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। রাজেন্দ্রচোল ১০২১ খৃঃ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। মুর্শিদাবাদকাহিনী ১২৭ পৃষ্ঠা। ১ম খণ্ড)। ডাঃ হুলজ্ রাজেন্দ্রচোলকে ১১শ শতাব্দীর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদকাহিনী ১ম খণ্ড পরিশিষ্ট ও টিপ্পনী

তামিল কবি কম্বণের রামায়ণে ৮০৮শকে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল কম্বণের সভায় ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে। ১ম শতাব্দে দিগ্বিজয় হওয়াই ঠিক হইতেছে। মুঃ কাঃ।

বীরেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রবন্ধে বেশ একটু রহস্যজনক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন "দুর্লভ মল্লিকের মতে—মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, সুতরাং মাণিকচাঁদের তেজস্বিনী পত্নী ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের রাজ্যঘটিত গোলযোগ এবং মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাহার ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র সসৈন্যে জামাতার (গোবিন্দচন্দ্রের) সাহায্যার্থ ত্রিস্রোতা অথবা তিস্তা নদীর তীরে উপস্থিত হন। যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র বোধ হয় নিহত হন।" নতুবা না কি তাহার সেখানে মরিবার কারণ ছিল না, যেহেতু তথায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে! তার পরক্ষণেই তিনি গ্রীয়ার্সনের প্রাপ্ত "মাণিকচাঁদের গীত" নামক গ্রাম্য গীতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। "মাণিকচন্দ্র বহুদিন অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন। পরে একজন দক্ষিণদেশী বাঙ্গালী (!) (মাণিকচাঁদ তবে কোন্ দেশী?) দেওয়ান নিযুক্ত করাতে তাহার অত্যাচারে প্রজাগণ প্রপীড়িত হইয়া বিদ্রোহী হয় এবং এই বিদ্রোহ দমনেই মাণিকচন্দ্র প্রাণত্যাগ করেন! (অথচ আমরা মাণিকচাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যুর বহুতর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ ও নিদর্শন সমালোচ্য গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি।) সতীপ্রথা অনুসারে ময়নামতী জলন্ত চিতায় মৃতস্বামীর অনুগমন করিলেন, কিন্তু অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাহার একগাছি কেশও দগ্ধ করিল না। তাঁহার মৃত্যু দেবগণের বাঞ্ছিত নহে জানিয়া ময়না চিতা হইতে অবতরণ করিলেন। ইহার ১৮ মাস পরে তাঁহার পুত্র গোপীচাঁদ ভূমিষ্ঠ হন। এই অস্বাভাবিক দীর্ঘকাল গর্ভবাস ভবিষ্যত মহত্বের নিদর্শন। ময়নামতী যথাসময়ে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় অদুনা ও পদুনার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন।" এই দুইটী উদ্ধৃতাংশে বিশেষ অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে না কি? পূর্ব্বে দেখা গেল মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরই ধর্ম্মপাল তাহার রাজ্য অধিকার করেন, তখন গোপীচাঁদ হরিশ্চন্দ্রের জামাতা এবং জামাতার সাহায্যার্থ হরিচন্দ্রের মৃত্যু। তারপরই দেখিতেছি মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পরও গোপীচাঁদ গর্ভবাস শেষ করিতে পারেন নাই। এই সকল অসামঞ্জস্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় না কি যে এই সমস্ত খণ্ডিত আকারের গ্রাম্য-গীতিগুলি মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ এবং ময়নামতীর কীর্ত্তি-কাহিনীর জনপ্রবাদ হইতে গৃহীত হইয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছে? এবং ইহারই এক এক খণ্ড এক এক জনে আবিষ্কার করিয়া একে আরে লিখিয়া যাইতে-ছেন। গ্রীয়ার্সন যে গ্রাম্যগীতিগুলি অনুবাদ করিয়া Epic of Rangpur নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানির ভাব ও ভাষা অনেক উচ্চ অঙ্গের দার্শনিকতায় ঐতিহাসিকতায় অনেক শ্রেষ্ঠ এই পুস্তকের কোন কোন কবিতার ছত্রের সহিত উক্ত গ্রাম্যগীতিগুলির আশ্চর্য্য রকম মিল রহিয়াছে। ইহাও একটু রহস্যজনক। বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধে দেখিতেছি এদিকে আবার বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় রঙ্গপুর জেলায় দুইটী বৃদ্ধ জুগীর আবৃত্তি অনুসারে দুইটী পাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাই অবলম্বনে এক প্রবন্ধ লিখিয়া এই ঘটনাকে রঙ্গপুরের ঘটনা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, যদিও তিনি নিজে কোন প্রাচীন পুঁথি পান নাই বলিয়া স্বীকারও করিয়াছেন এবং যদিও বলিয়াছেন ত্রিপুরা জেলায় উক্ত গাথা প্রচলিত ছিল। সমালোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি কি বলিবেন? বিজয় বাবুর মতে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭ম শতাব্দীতে (৬১২ সনে) রাজা হরিশ্চন্দ্র সাভারে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। * আমরাও তাহা একান্ত সমীচীন বলিয়া মনে করি। এই হিসাবে গোপীচাঁদকে তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া বিবেচিত হয় রাজেন্দ্র চোল ১০২১ খৃঃ বঙ্গাধিপতি গোবিন্দ-চন্দ্রকে পরাজয় করেন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তখন হইতে হিসাব করিলে ৮৯২ বৎসর পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে

বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র হইতে (১৩০০—৮৯২)—৪০৮ বৎসর পূর্ব্বে গোপীচাঁদ ও রাজা হরিশ্চন্দ্র যথাক্রমে মেহারকুলে ও সাভারে রাজত্ব করিতেন। রাজেন্দ্র চোলের বিজয়-কাহিনী ৪০৮ বৎসরের পরবর্ত্তী ঘটনা। এখন বোধ করি বুঝিতে বাধা হইতেছে না যে, বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর গোপীচাঁদ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, কালমাহাত্ম্যে একের কীর্ত্তি-কাহিনী অন্যের কাহিনীর সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থে দেখিতেছি—গোপীচাঁদের কোন পুত্রসন্তানাদি ছিল না, কেননা ব্রাহ্মণের শাপে তাহার বংশ রক্ষা হয় নাই। গোপীচাঁদ মায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিবার জন্য দ্বিজ সন্দিহরকে প্রলোভিত করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিয়া পুরী বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ভৃত্যকে আদেশ করিলে—

"ধাক্কা মারি ব্রাহ্মণেরে বাহির করি দিল।
দুঃক্ষ পাই ব্রাহ্মণে রাজারে গালি দিল॥
এই গালি দিল তাকে নির্ব্বংশ বলিয়া।
গোপীচাঁদের বংশ নাই ভুবন জুড়িয়া॥"

কিন্তু এখানে দেখিতেছি ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্র ওরফে উদয়চন্দ্র নামে তাহার এক পুত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার রাজধানীর নাম উদয়পুরও ছিল। তাহা "বাঘদ্বার" পরগণায়, কিন্তু কোথায় (?) তার ঠিক নাই। ইহা কি প্রকার আবিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। আমরা ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগ্রাম পরগণায় (বর্ত্তমান ময়নামতীর নিকটবর্ত্তী) এক ভবচন্দ্র রাজার রাজত্ব করার কথা জানি, তাহা পূর্ব্বে একবার উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রী হবচন্দ্রের বুদ্ধি (এত বেশী) উড়িয়া যাইবে বলিয়া সর্ব্বদা নাকে কাণে ঢিপ্‌লা দিয়া রাখিত, এজন্য লোকে তাহাকে "ঢিপাই পাত্র" বলিত। সেই কাল হইতে আমাদের দেশে বেকুবকে গালি দিবার জন্য "বুদ্ধির ঢিপাই" কথাটী গালি রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ভবচন্দ্র ও হবচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। এই ভবচন্দ্র যে পৃথক ব্যক্তি ও গোপীচাঁদের সমসাময়িক রাজা তাহাও বলা বাহুল্য। বাঘদ্বার পরগণার,—উদয়পুর পরগণার কথা জানি না, কিন্তু ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর কিঞ্চিদধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুররাজ উদয়মাণিক্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র রাজার রাজধানী দেওনাই নদীর পশ্চিমে বা পূর্ব্বে থাকিলেও আমাদের কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের ময়নামতীর গোপীচাঁদের রাজধানী মেহারকুল ছিল ইহাই যথেষ্ট। প্রমাণেরও অভাব নাই।

গোপীচাঁদের দীক্ষাগুরু হাড়িকাকে আমরা পিশাচসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তাহার কৈফিয়ৎ আবশ্যক। হাড়িফা যে পিশাচসিদ্ধ ছিল তাহা তাহার নিজের উক্তি এবং কার্য্যাবলী দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। একটু উল্লেখ প্রয়োজন—

"চারি সিদ্ধ্যায় শাপ পাইল দুর্গাদেবীর পাশে।
মীননাথ চলি গেল কদলীর দেশে॥
গোর্ক্ষনাথ চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘরে।
কাণুকা চলিয়া গেল ডাড়ার সহরে॥
হাড়িকা পাইল বর তোমা সেবিবারে।
তেকারণে হীন্ন কর্ম্ম করে তোমার ঘরে॥
মোহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে খাটে।
মোহা জ্ঞান আছে জ্ঞান হাড়িকার পেটে॥"

এখানে চারিটী সিদ্ধার নাম পাওয়া যাইতেছে। মীননাথ, গোর্ক্ষনাথ, কাণুকা এবং হাড়িফা। চারি জনে দুর্গাদেবীর শাপে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। মীননাথ কদলীর দেশে (১), গোর্ক্ষনাথ ব্রাহ্মণের ঘরে, কাণুকা ডাড়ার সহরে (রাঢ় দেশ) (২) যাইতে এবং হাড়িফা গোপীচাঁদের বাড়ীর হীন কর্ম্ম করিতে শাপ পাইয়াছিল। এখানে সবগুলিকেই সমশ্রেণীর সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তাহারা সকলেই এক অপরাধে দুর্গাদেবীর নিকট হইতে শাপগ্রস্ত হইয়াছিল। গোর্ক্ষনাথ ও হাড়িফা একই প্রকারের

(১) কুচনীনগর। (২) রাঢ়দেশ। "গোর্খ বিজয়" প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। গোর্খ বিজয় প্রবন্ধ ইহার পরে প্রকাশিত হইবে। (লেখক)

জ্ঞানের অধিকারী ছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। * গোর্ক্ষনাথের জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও তাহার চারি স্থানে চারিটী সিদ্ধ পীঠের স্থান আমরা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছি।

গোর্ক্ষনাথ যেমন মন্ত্রবলে ময়নামতীকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল দেখাইয়াছিলেন।—একটী বট দ্বারা দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে বটবৃক্ষ উৎপাদন করিল, একটী চাউল কাঁচা হাঁড়িতে রন্ধন করিয়া উনকোটী সিদ্ধাকে ভোজন করাইয়াছিল—এক সিদ্ধার ভাত হাঁড়িতে রহিয়াও গিয়াছিল, যেমন—

"তবে জ্ঞান কহে সিধ্যা মন্দি আর ছন্দি।
জর্ম্মে জর্ম্মে কৈল নাথে পিরা খারা বান্দি॥
তবে জ্ঞান কহে গোর্খ অনাদির তত্ত্ব।
আপনি জম রাজাএ লিখে দিল খত॥
তবে জ্ঞান কহি দিল ব্রহ্মজ্ঞান বুলি।
জমের সহিত নাথে কৈল কুলাকুলি॥
মৈনামতীর নামের লেখা ফেলিল ফারিযা।
আড়াই মক্ষর জ্ঞান কহে কর্ণতলে দিয়া॥"

যেই প্রকরণে গোর্খনাথ ময়নামতীকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিল, "অন্দি," "সন্ধি" "অনাদির তত্ত্ব" "পাড়া ফারা বন্ধ করা" শিক্ষা দিয়া "আড়াই অক্ষরী বীজ মন্ত্র" তাহার কর্ণমূলে প্রদান করিয়াছিল—সেই প্রকরণে হাড়িফাও গোপীচাঁদকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিল। হাড়িফা গোপীচাঁদের বাড়ীর সর্দ্দার মেথর ছিল। ময়নামতী পুত্রকে বলিল "হাড়িফা মেথরের কার্য্য করে বলিয়া তাহাকে হীন মনে করিও না। আমি তোমাকে তাহার আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল দেখাইব। আজ রাত্রিতে তুমি "লাল টঙ্গির" উপর শয়ন করিও, আমিও সেইখানে থাকিব।" তাহাই হইল। রাত্রি প্রভাতে দেখা গেল,—

"রজনী প্রভাত হইল উদিল তপন।
কান্দেতে কোদাল হাড়ি করিল গমন॥
একজন আগে জাএ দুইজন পিছে।
জমের পুত্র মেঘনালে ছত্র ধরিয়াছে॥
ধীরে ধীরে হাড়িপাএ দখলেতে (বাড়ী
ভিতরে) গেল।
বসুমতী হস্ত বাড়াই খাট আনি দিল॥
এক হুঙ্কার সিদ্ধায় দিলেন ছাড়িয়া।
উনশত কোদালে জাএ দখল চাছিয়া॥
সোনার ঝাড়ু এ জাএ খলা (উঠান)
ঝাড়ু দিয়া।
সুবর্ণ কৌটরাএ জাএ চন্দন ছিটিআ।
চন্দন ছিটিয়া পুণঃ গেলেন উড়িয়া॥
উনশত টুকরিএ আসি সব ফেলাইল।
তা দেখিয়া গুপিচাঁদে আশ্চর্য্য হইল॥"

এই কারবারে ৬ দণ্ড সময় লাগিল। তারপর সিদ্ধ পানে আড়াই প্রহর বেলায় পঞ্চকামিনী সহ স্নান। আবার ভাঙ্গ খাওয়া হইল। তখন নারিকেল খাইবার ইচ্ছা। রাজার নারিকেল বাগে উপস্থিত। উনশত নারিকেল "সেলাম" জানাইল। এক হুঙ্কারে উনশত নারিকেল জলসহ উড়িয়া আসিয়া পড়িল। তখন উনশত নারিকেল, ইচ্ছামত আম কাঁঠাল, বার হাজার তাল খাইল। "নগরীয়া পুলাপানেরে" অর্থাৎ ছেলেদেরও কতক দেওয়া হইল। আর এক হুঙ্কারে যেখানের যে ফল পুনরায় জোড়া লাগিয়া গেল। নারিকেল গাছে নারিকেল, আমগাছে আম, কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ও তালগাছে তাল জোড়া লাগিয়া যেমন ছিল তেমনি হইল। ইহা দেখিয়া গোপীচাঁদ আশ্চর্য্য হইল! আমরাও ততোধিক! এই জন্যই মনে হয় যে পিশাচসিদ্ধ দ্বারাই এইরূপ কার্য্য সম্ভবে। *

* কেহ কেহ গোর্ক্ষনাথকে নেপালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গা দেবীর কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা গেল না! যাহার ইষ্টদেবী এবং ভগবতী "মহাদেবী দুর্গা" তিনি কি করিয়া কেবল সন্ন্যাসী বা তান্ত্রিক হিন্দু সন্ন্যাসী না হইয়া "বৌদ্ধ সন্ন্যাসী" পদবাচ্য হইলেন বুঝা গেল না।

মীননাথ ও তাহার শিষ্য গোর্ক্ষনাথকে আমরা জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানি। কোন কোন স্থলে গোর্ক্ষনাথ মহাদেব নামেও পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই পুস্তকে তাঁহাকে হাড়িফার সহিত সমশ্রেণীতে গ্রহন করিয়া হীন করিয়া ফেলা হইয়াছে।

* ভূত সিদ্ধি দ্বারা নানাপ্রকার দ্রব্য আনয়ন ও গৃহস্থালীর দৈনন্দিন কার্য্যাদি করাইয়া লওয়ার গল্প আধুনিক কালেও শুনা যাইতেছে।

গোপীচাঁদ এইরূপ জ্ঞান পাইলে সন্ন্যাসী হইতে স্বীকৃত হইল। ময়নামতী বলিলেন "তোমাকে ইহাপেক্ষা আরোও আশ্চর্য্য কার্য্য দেখাইব।" ময়নামতী একদিন এক তাম্বুলীর মাথা কাটিয়া ফেলিল। গোপীচাঁদ মাতাকে ডাকিনী বলিয়া গালি দিল। ময়নামতী বলিলেন "হাড়িফা এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিবেন, কাটা দেহ জোড়া লাগিবে—এই জন্যই তাহাকে বধ করিয়াছি।" তাম্বুলীর মৃতদেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া ময়নামতী হাড়িফার নিকট উপস্থিত হইয়া সব বলিল এবং এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়া দিলে গোপীচাঁদ তাহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবেন—তাহার শিষ্য হইবেন জানাইল।

এত শুনি সেই মেত্যা (১) হস্তেতে করিয়া।
মত্রন্দি (২) সাগর মধ্যে গেলেন্ত চলিয়া॥ (৩)

এবং নিজ জ্ঞানবলে মৃতদেহ জীবিত করিয়া আনিয়া দিলেন। রাজা গোপীচাঁদ তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "মুদাই তাম্বুলীর" নিকট রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়া গেলেন।

আরো দেখুন পিশাচসিদ্ধের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজা, হাড়িফার সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে চলিতেছেন,—

'আগে জাএ হাড়িফা সিদ্ধ্যা ত্রিশূল (৪)
কান্ধে লৈয়া।
পিছে জাএ গোপীচাঁদ কাঁথা গলে দিয়া॥"

* * *

দৃষ্টি করি হাড়িফায় রাজা পানে চাএ।
হাটিতে বহুল গছা (৫) ফুটীয়াছে পাএ॥
সিদ্ধ্যা বোলে পিশাচ যে গুণ
আগু হৈয়া।
রাজার পায়ের কাটা ফেলাও বাছিয়া॥
"সিদ্ধা বোলে দৈত্যবর মোর আজ্ঞা পরে।
সুরিপুর যাইতে এক জাঙ্গাল বান্ধ মোরে॥
হাড়িফার আজ্ঞা যদি দৈত্যগণে পাইল।
আজ্ঞা অনুসারে এক জাঙ্গাল বান্দিল॥"

তারপর শুড়িপুর গমন, মদের কড়ির জন্য গোপীচাঁদ বিক্রয়। (৬) বেশ্যার প্রেম-প্রত্যাখ্যান, মেষ-রক্ষা, উদ্ধার, রাজ্যে আগমন।

এই শুড়িপুর কোথায় নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে পুরাকালে ইহা যে একটী শৌণ্ডিক বা মদ্যবিক্রেতাদিগের আবাস-গ্রাম ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। চৌদ্দগ্রামের এলাকায় শুড়িকরা নামক একটী গ্রাম দৃষ্ট হয়। এই গ্রাম বহু পুরাতন। তথায় কয়েকটী পুরাতন বৃহৎ দীঘিকাও বিদ্যমান আছে। এককালে এই গ্রাম যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল তাহা গ্রামের আকৃতিদ্বারা প্রমাণিত হয়। এই শুড়িকরা বা সুরিকরা সুরিপুর নগরেরই পরিবর্ত্তিত নাম কি না চিন্তার বিষয়। কথিত আছে রাজা গোপীচাঁদের শিক্ষিত শুক তাহার সন্ধান করিয়াছিল—

"বহুদিন উড়ি পক্ষি সুরিপুরে গেল।"

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে সুরিপুর ময়নামতী হইতে কিছু দূরবর্ত্তী। বিশেষতঃ

'সুরিপুর উদ্দেশে শুক চলে ততক্ষণ।
উড়িতে উড়িতে গেল সূর্য্যের সদন॥"

শুকপক্ষী সুরিপুর কোন দিকে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া "সূর্য্যের সদনে" গিয়াছিল অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকেই গিয়াছিল। অতএব দেখা যায় সুরিপুর ময়নামতী হইতে পূর্ব্ব দিকে ছিল। আমাদের নির্দ্দিষ্ট "সুরিকরা"ও ময়নামতী হইতে পূর্ব্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং কিছু দূরবর্ত্তীও বটে। অবশ্য একটা

(১) মৃতদেহ। (২) নদী, নাক। (৩) সম্ভবতঃ আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত—ফিরোন সওএর উল্লিখিত সমুদ্র বা হ্রদ মধ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। (৪) বৌদ্ধ তান্ত্রিকের ত্রিশূল ব্যবহার নাই। (৫) শাল, কাটা।

(৬) বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধে "ভাঙ্গের কড়ির জন্য লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলে সুরিপুর নামের সার্থকতা হয় না। "সুরি" কথাটার সহিতই যেন মদের গন্ধ জড়িত রহিয়াছে। হাড়িফাও সুরিপুর প্রবেশ করিয়াই মদের গন্ধে আকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

'মদের গন্ধ পাই সিদ্ধা কহে রাজার স্থানে।
নব কড়া কড়ি দেও মদ খাইবারে॥"
"নব কড়া কড়ি দিয়া সিদ্ধা মদ খাইল।'

পাখীর পক্ষে অনুসন্ধান করিয়া সেইস্থানে পৌঁছাইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল।— এবং প্রথমে দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া কেবলি পূর্ব্ব দিকে গিয়াছিল তাই "বহুদিন উড়ি পক্ষি স্থারপুরে গেল।" লিখিত হইয়া থাকিবে। আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে "স্থরিপুর" যাইতে কোন প্রকার বিস্তৃত জলা বা নদী সাগরাদি অতিক্রম করিতে হয় নাই। তাহা হইলে হাড়ি সিদ্ধ্যা তাহার "তাল বেতাল" বা সিদ্ধিকরা পিশাচ দৈত্যগণকে "স্থরিপুর যাইতে একা জাঙ্গাল দেহ মোরে।" বলিয়া স্থলপথ পস্তত করিতে না বলিয়া জলযানের বন্দোবস্ত করিতেই বলিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি "মেহারকুল" সাগরতীরবর্ত্তী দেশ ছিল। অতএব স্থরিপুর মেহারকুল বা ময়নামতী হইতে পূর্ব্বাংশে হওয়াই সমীচীন মনে হয়।

সমালোচ্য গ্রন্থে আমরা তৎকালের ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্যের নাম পাইতেছি। (১), বসন, (২) ভূষণ, (৩) ব্যবহার্য্য দ্রব্য (৪) বাণিজ্য ও রণ-পোতাদি।

"মদুনাম্ভ্র পিন্দে কাপড় মেঘনাল শাড়ী।
সেই শাড়ীর মূল্য ছিল বাইশ লাখ কৌড়ি॥
পাদুনাএ পিন্দে কাপড় তলে বান্দি নেত।
মাঞ্জাকরে ঝলমল বনের স্থন্দি বেত॥
রত্নমালাএ পিন্দে কাপড় নামে যে তসর।
আন্ধারিয়া ঘর জ্বান আগুনে পশর॥
কাঞ্চনমালাম্ভ্র পিন্দে কাপড় নামে খিরাবালি।
রূপ দেখি ভূপ ভঙ্গ ভুলিয়ে জাএ অলি॥"

পুরাকালে বস্ত্রবয়ন-শিল্পে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রাজমালা হইতে কতক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি * আমাদের বিশ্বাস এই "মেঘনাল

---

* বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে [illegible] বলিয়াছিলেন "ভারতের শিল্পিগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিল একণে আমরাও বলিতে পারি "ইংরাজ শিল্পিগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।" কার্পাস বস্ত্র বয়ন ত্রিপুরার প্রধান শিল্পকীয়া ছিল। * * সরাইলের তন্তুবায়গণ কাপাস [illegible] উৎকৃষ্ট "তাঞ্জেব", ধুতি, চাদর ও [illegible] প্রস্তুত করিত। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণে তাহা লোপ পাইতেছে প্রাচীন "ঢাকাই মসলীন" জগতে অতুলনীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই মসলীনেরই স্থানীয় নাম "তাঞ্জেব" যে তাঞ্জেবের পোষাক পরিধান করতঃ ওরংজেব বাদশাহের এক কন্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সম্রাট তাহাকে "উলঙ্গ" বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন। "তাঞ্জেব" প্রচুর পরিমাণে সরাইলে (ত্রিপুরা) প্রস্তুত হইত * * * সরাইলের তন্তুবায়গণের প্রস্তুত ২০৲।২১৲ টাকা মূল্যের ধুতি আমরা দর্শন করিয়াছি। পাড়ের সুক্ষ্ম কার্য্যের জন্য এই সকল বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইত না। কারণ সরাইলের তন্তুবায়গণ পাড়ের কার্য্যকে অতি তুচ্ছ বিবেচনা করিত। সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা তাহারা অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিত।

Rajmala p. 503, 504.

In the north of the District in the Fiscal division of Sarail, a very fine description of "Muslin" is made called "Tanjib" which is said to be nearly as good in texure and quality as the shabnam muslin of Dacca. The thread is spun by hand and the muslin is not usually made by the weavers unless they have special orders.

Statistical account of Bengal Vol. vi. p. 418.

ত্রিপুরা জিলায় পর্ব্বতজাত কাপাশ দ্বারা নিম্মিত উৎকৃষ্ট "বাপতা" বস্ত্র (তসর) প্রস্তুত হইত। এইজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকটী বাণিজ্যাগার স্থাপিত ছিল। অন্যূন ১২ লক্ষ টাকার বাপ্তা তাহাদের দ্বারা প্রতিবৎসর বিদেশে প্রেরিত হইত। এক্ষণে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

Rajmala p. 456.

ত্রিপুরার যুগীগণ নানা প্রকার মোটা কাপড় ও প্রস্তুত করিত। নরনগর পরগণার বাসকাইট নামক স্থানে মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ স্ত্রীলোকের পরিধেয় শাড়ী ও ধুতি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যে (আলোচ্য) ময়নামতী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী যুগিগণ এক প্রকার ছিট বস্ত্র বয়ন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ছিট দ্বারা পিরান সার্ট ও পেণ্টুলন প্রস্তুত করা যায়। ইহা অনেকটা বিলাতী এগ্রোলারের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে উক্ত স্থানের নামানুসারে তাহা "ময়নামতী চারখানা" বলিয়া খ্যাতি পাইতেছে

Rajmala p. 504

শাড়ী" "ঘিরাবালী শাড়ী" এবং "তসর" ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের ঘরের জিনিষ ছিল। এবং তৎকালে তাহা বহুমূল্য ছিল এবং বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। সমালোচ্য গ্রন্থে "গৃহস্থের পরিধান সোনার পাছড়া" বলিয়া এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্রের কথা পাওয়া যায়। এই "পাছড়া" কাপড় অদ্যাপিও "ত্রিপুরা" ও "মেঘলী" জাতীয়দের দ্বারা পর্ব্বতজাত কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণতঃ ইহার নাম "তিপরাই পাছড়া।" "মেঘডম্বুর" শাড়ীর কথা প্রচলিত গানে ও গল্প-কবিতায় পাইয়া থাকি। ইহাই কি কালে 'মসলীন' বা 'তাঞ্জেব' নামে পরিচিত হইয়াছিল?

এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার শিল্প-কার্য্যেই ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের কারুগণ বিশেষ দক্ষ ছিল। কাঠের জিনিষ ও গজদন্তের নির্ম্মিত নানা প্রকার অলঙ্কার এবং পাটী বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। গঙ্গাজল পাটীর কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। *

অলঙ্কারের মধ্যে "মূট শঙ্খ" নামক এক প্রকার শাঁখার উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

"রাম লক্ষণ দুই মুটশঙ্খ হস্তে তুলি দিল।
পুর্ণমাসীর চন্দ্র যেন আকাশে উদিল।"

এই মুট শঙ্খ বহুকাল যাবৎ এতদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমানে তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা বাল্য-কালেও এই শঙ্খ দর্শন করিয়াছি। অদ্যাপি শ্রীহট্টের প্রাচীনাদের হস্তে তাহার স্থলভ সংস্করণের শোভা দেখা যাইতে পারে। তা ছাড়া "আবের কঙ্কই" (১) "লৈক্ষ টাকার জাদ" (২) "লৈক্ষ টাকার থোপা" (৩) "সোণার নেপুর" কর্ণেতে "মাণিক্য মদন কৌড়ি" (৪) "বাহুতে সোণার তার" "গলায় "সাত ছরা হার।" ইত্যাদি।

কাঁসা ও পিত্তলের কাজেও এই দেশবাসীরা হেয় ছিলেন না। আমরা ময়নামতী কর্ত্তৃক গোরক্ষনাথের আতিথ্য-সৎকার কালে "লাহুরী" থালার উল্লেখ দেখিতে পাই।

"ঘৃতেতে মলিয়া ভাত দুগ্ধেতে মাখিয়া।
লাহুর থালাতে অন্ন দিলেন্ত আনিয়া॥"

সম্ভবতঃ এই থালা শ্রীহট্ট "লাউরের" প্রস্তুত। † দেশ-প্রথামতে এখানেও "উ" স্থানে "হু" ব্যবহৃত হইয়াছে।

* ত্রিপুরাবাসী স্বর্ণধরগণ যে শিল্প কার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ গজদন্তের কারুকার্য্যের দ্বারা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে গজদন্ত দ্বারা নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। দেশীয় মহিলাগন স্বর্ণ রৌপ্যের পরিবর্ত্তে এই সকল অলঙ্কার পরিধান করিতেন। ইংরেজ ভ্রমনকারী রল্ফ ফিচ তাহা দর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রস্তরের শিল্প কার্য্যে, লোহার কার্য্যে, কাগজ প্রস্তুত করিতেও তাহারা বিশেষ দক্ষ ছিল;—অদ্যাপি তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়; ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে। সরাইলের হসপুরের কুম্ভকারগণ মাটীর কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিল—অদ্যাপি তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। Rajmala p. 505.

(১) অভ্র নির্ম্মিত চিরুণী কঙ্কতিকা। (২) চুল বাঁধিবার জড়োয়া দড়ি বিশেষ। বোধ করি "জড়োয়া শব্দের" "জা" ও দড়ির "দ" লইয়া এই "জাদ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে। (৩) বেণীর অগ্রভাগ শোভি থোপনা বিশেষ। (৪) মদন কৌড়ির মদন শব্দ হইতে "মা" আর "কড়ি" সংযোগে বর্ত্তমান "মাকড়ী" কথা নিষ্পন্ন হয় নাইত?

† All the old indigenous industries of this province are decaying such as the muslins and others of the finest Cotton fabrics of the coarser clothes, the brass wares, the wicker works and others.

Bengal administration Report 1874-75.

শ্রীহট্টবাসিগণ শিল্প কার্য্যে সুনিপুণ। শ্রীহট্টের কারুগণ গজদন্ত দ্বারা পাটী পাখা চুড়ী ও চেইন প্রস্তুত করিতে পারে। চুয়াল্লিশের শীতল পাটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তরপ পরগণার কোম্পের কাগা ইটা পরগণার উৎকৃষ্ট লৌহের কার্য, ও পাথরিয়া পরগণার আগর দ্বারা আতর প্রস্তুত প্রসিদ্ধ। আরব ও শাম দেশীয়গণ এই আতর বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। পাটী ও তসর, মুগা প্রেরণের জন্য বাদসাহ দরবারে ৩১টী মহাল জায়গীর ছিল। Rajmala p. 300.

নৌকা জাহাজ প্রস্তুত এবং বহির্বাণিজ্যেও তাঁহারা অগ্রণী ছিলেন। * এই প্রদেশের "ভাওলিয়া" "লালডিঙ্গী" "কোষ" "ময়ূর-পঙ্খী" "লাখাই" † এবং বৃহৎ আকারের সওদাগরী পান্সী প্রভৃতি নৌকা বর্ত্তমান সময়েও দর্শনীয় পদার্থ। এদেশের বৃহৎ পালোয়াড় পান্সী সময় সময় বাষ্পীয় পোতকেও পরাস্ত করিতে দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের নৌকা সরবরাহ করিবার জন্য সরাইল শ্রীহট্ট বাদসাহের নাওয়ারা মহাল ছিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, "ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির প্রতিবাদ জন্য আমার পরম সুহৃদ মৌলবী আবদুল করিম তাঁহার সংগৃহীত পুরাতন পুঁথির একখণ্ড নকল প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের আবিষ্কারের জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রবন্ধাদিরও প্রতিবাদ করিতে হইল। ‡

শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

বঙ্গ সাহিত্যের অভাব ও অভিযোগ

বর্ত্তমান অবস্থা

আমাদের কর্ত্তব্য

জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যখন কোন জাতি তাহার জাতীয় জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার জন্য সমাজে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে যায়, তখনই মুখ্য ভাবে তাহাকে জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ সাহিত্য মানবজাতির প্রাণ। প্রাণে কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিলে মানব যেমন তাহার তাড়নায় একদিন না একদিন অভিভূত হইয়া পড়ে, তেমনি সাহিত্যেও কোন নূতন ভাব বা আদর্শ প্রবেশ করিলে সমাজও তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য হয়। অধুনা ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। এই যুগে আমরা দেশকে নূতনভাবে অনুরঞ্জিত করিবার জন্য সমাজে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এই আদর্শে সমাজকে গঠন করিতে হইলে, সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ অতিক্রম করিলেও সাহিত্যের প্রতি দেশ-বাসীর অনুরাগ অতি অল্পদিনই দেখা দিয়াছে। এই অত্যল্পকালের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে সাহিত্যিকগণ যে সব রত্ন দান করিয়াছেন তাহাতে আমরা তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারি নাই। তাঁহারা আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন নাই, পরন্তু বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন, তাহা আমরা সাহিত্যের পরিপূর্ণ অবয়বের উপাদান স্বরূপেই গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু যাহাতে সমাজের মধ্যে সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার আয়োজন এখনও সম্যক্ হয় নাই।

* শ্রীহট্টের ফুলাউবা (এ. বি. আর) লাইনের রাজবাড়ী ষ্টেশনের নিকট ভাটেরা টিলায় প্রাপ্ত তাম্র ফলক দ্বয়ে গগন স্পর্শী শিব ও বিষ্ণু মন্দির বিশাল রন পোতের বহর পুষ্প ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ইত্যাদি বিবরণ প্রমাণে ব্যবহার্য্য। বিশিষ্ট প্রমাণ মনসা পুঁথির চাঁদ সওদাগর।

† লাখাই নৌকাগুলি বোধ হয় চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষ্মীধর--লক্ষ্মীন্দরে (লখাইর) সময় হইতেই এই নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। লখাই নামের সহিত ইহার নামের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

‡ বীরবংশ প্রসূত যুগ পণ্ডিত জেরুম বলিয়াছেন :

If an offence come out of the truth, better is that offence come, than the truth be concealed. JEROME.

¶ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে সাহিত্যশাখায় পঠিত।

যে সমস্ত গুণ সাহিত্যের জীবনীশক্তির প্রধান সহায়ক, লেখকের চিন্তাশীলতা তাহাদের অন্যতম। এই চিন্তাশীলতার অভাব প্রায় প্রত্যেক নব্য লেখকের মধ্যেই বর্ত্তমান। বাঙ্গালাদেশে আজকাল লেখকের অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় চিন্তাশীলতার অভাবে ইহাদের মধ্যে বেশী শ্রেণী-বিভাগও নাই। কবি, গল্পলেখক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক—ইহাদের দলে প্রায় সকলকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মাসিক-পত্রিকাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতিরেকে চিন্তাশীল অন্য যে দুই শ্রেণীর লেখক আছেন—বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক—তাঁহারা সংখ্যায় বড় দরিদ্র।

চিন্তা শীলতার অভাব

উপরোক্ত চিন্তাশীলতার অভাবের কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ আমরা কাজ অপেক্ষা নামটাকে শ্রেয়স্তর মনে করি। কাজেই যাহাতে সহজে বিনা আয়াসে নাম ক্রয় করা যায় তাহার চেষ্টা করিয়া থাকি। সচরাচর দেখিতে পাই মাসিকপত্রিকাদিতে গল্প, কবিতা লিখিয়া দুই চারিজন বেশ বিখ্যাত ও গণ্যমান্য হইয়াছেন; আমার পক্ষেও এটা চিন্তা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ঐ উপায়ে আমিও কিছু নাম যশঃ লাভ করি; যেহেতু আমার ধারণা এই কাজটী করিতে বিশেষ অনুসন্ধান বা গবেষণার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের একটু ভাবিবার ও লিখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা কিছু রচনা করিয়া অনতিবিলম্বে কোন সংবাদ বা মাসিক-পত্রে প্রকাশ করেন। একটু নাম বাহির হইতে না হইতেই বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহাদের নিকট রচনার জন্য দাবী করিতে থাকেন। দুর্নামের ভয়ে অপরিণত অবস্থায় তাঁহাদিগকে অনুরোধ রক্ষা বা আদেশ-পালনের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতে হয়, ফলে তাহাতে চিন্তাশীলতার নামগন্ধ মাত্র থাকে না। আলস্য ইহার তৃতীয় কারণ। অনুসন্ধান করিয়া কিম্বা দেখিয়া শুনিয়া পরে রচনা করা তাঁহাদের কাছে বড়ই অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ আবার মনে করেন তাহাতে নিজের মৌলিকতারও যথাযথ স্ফুরণ হয় না। চতুর্থ কারণ—অন্নাভাব, তবে সেটা বলাই বাহুলা।

অভাবের কারণ

উক্ত কারণগুলির তিনটী লেখকদের ইচ্ছাকৃত। তাঁহারা মনে করিলেই সেগুলিকে অপসারিত করিতে পারেন। কিন্তু তাহার জন্য উপযুক্ত সাধনা আবশ্যক। সাহিত্য-সাধনা বিশ্বের সৌন্দর্য্য-উপভোগ নয়, পার্থিব উন্নতিলাভও ইহার উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতির রহস্যময়ী লীলা বিশ্লেষণ করিয়া চরম সত্যের দ্বারে উপনীত হইবার জন্য মানবের যে চেষ্টা তাহাই সেই সাধনা, আর উপনীত হওয়াই তাহার লক্ষ্য। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের সমস্ত বিভাগই ঐ এক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভ্রান্ত মানবকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।

তাহার প্রতীকার ও সাহিত্যের আদর্শ

শ্রদ্ধাস্পদ লেখকবৃন্দ, আমাদের ভিতরে এই চিন্তাশীলতাকে আনয়ন করিতে পারিলে আমরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব। নূতন-ভাববিমণ্ডিত দেশ অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিবে। সাহিত্যের অন্যান্য অভাবও আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে পূরণ হইয়া যাইবে।

এখন আমি সাহিত্যের অন্যান্য অভাব ও অভিযোগগুলির আলোচনা করিব। বর্ত্তমান সাহিত্য উন্নতির যে স্তরে এখন অবস্থিত, তাহার সহিত অতীত সময়-অবস্থার তুলনা করিব না, শুধু বর্ত্তমানের দোষগুলি প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

অন্যান্য অভাব ও অভিযোগ; সমালোচনা-বিজ্ঞান

আমাদের সাহিত্যসমালোচনা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। কোন কোন সংবাদ বা মাসিকপত্রে 'পুস্তক-সমালোচনা' শীর্ষক একটি অংশ দৃষ্ট হয়। তাহাতে কেবল গ্রন্থকারের নিন্দা বা প্রশংসার কথাই থাকে। কোন কোন স্থলে পুস্তকের মলাট ও নামের সমালোচনা এবং পুস্তক-রচয়িতার নামোল্লেখ করিয়াই সমালোচক নিবৃত্ত হন। বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের কার্য্য সাধন করাই যেন এইরূপ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অবশ্য আজ-

কাল দুই একজন লেখক সমালোচনার দিকে একটু অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সাহিত্য-সমাজে তাঁহাদের বিশেষ আদর নাই। নিরপেক্ষ সমালোচনায় একদিকে সাহিত্যের আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া তাহাকে শিল্প-সৌন্দর্য্য দান করে, অন্য দিকে লেখকের ভ্রান্ত ধারণাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ও সমাজের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। এমনও দেখা গিয়াছে, দোষ-গুণের বিচার করিতে গিয়া সমালোচক অচিন্তিতপূর্ব্ব নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সব কারণে সমাজের আদর্শ ও গতি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক গ্রন্থাদির বিশেষ আলোচনার দ্বারা সাহিত্যে সমালোচনা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(২) উপন্যাসে ভাবুকতা ও নাটকের জটিলতা

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ভাবুকতা, সৌন্দর্য্য ও আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আধুনিক লেখকগণের দুই চারিজনে তাহার কিছু পরিচয় পাই, অবশিষ্ট সকলেই কেবল ঘটনার সমাবেশ করিয়াই নিরস্ত। বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ উপন্যাসের বড় ভক্ত। আশৈশব তাহারা উপন্যাসের ক্রোড়েই এক প্রকার লালিত পালিত। বালকেরা ফাঁক পাইলেই অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে উপন্যাস-গল্প প্রভৃতি পড়িয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। যুবা ও বৃদ্ধেরা মজলিসে অনেক সময় উপন্যাসের বিষয় লইয়া আলোচনা করেন; স্ত্রীলোকেরাও গৃহকর্ম্ম-সমাপনান্তে উপন্যাস লইয়া জটলা করিয়া থাকেন। সুতরাং উপন্যাসের সাহায্যে আমরা বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারি। উহাতে ভাবুকতা প্রবেশ করাইলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজ সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।

উপন্যাসে ভাবুকতার ন্যায় নাটকে জটিলতার আহ্বান করা আবশ্যক। কেহ কেহ আপত্তি করিবেন নাটকে জটিলতার সৃষ্টি সহজে সাধিত হয় না; উহা সমাজের জটিলতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু সমাজ ত এখন যথেষ্ট জটিল হইয়া পড়িয়াছে! বাঙ্গালীর মধ্যে নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন-আলোচনা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে। চারিদিক্ হইতে নানাবিধ সমস্যা আজ তাহার নিকট উপস্থিত। অতএব এমন যুগে—এমন জটিল জীবন-যাপনের দিনেও যদি আমরা সেই পুরাতন যুগের সহজ সরল সমাজচ্ছবি নাটকে চিত্রিত করি, তাহা হইলে সত্যসত্যই কি আমরা যুগধর্ম্মের বাহিরে পড়িয়া থাকিব না? তাহা হইলে সত্যসত্যই কি আমাদের নাটকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা হইবে না? বাস্তবিক পক্ষে নাটকের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের জটিলতা আনিবার খুব কম চেষ্টাই আমরা করিতেছি। আশা করি সে দিকেও আমাদের চিন্তাশীলতা, আমাদের সাধনা পরিচালিত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

(৩) দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা

কোন বর্ত্তমান চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন—"উচ্চ অঙ্গের দর্শন-সাহিত্যে আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার আশা নাই। জীবনের গতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই দর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য নূতন ভাবে বুঝাইবার সময় শীঘ্র আর আসিবে না। * * উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন-প্রবর্ত্তিত চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা সকল প্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, বেদান্ত ও পদার্থ-বিদ্যার সমন্বয় সাধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তি অর্থাৎ চরম Synthesis হইয়াছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম্মে। * * * এই যুগধর্ম্মের কর্ম্ম যতদিন না পরিসমাপ্ত হয়, ততদিন আর নূতন কোন দর্শনবাদ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। * * * তবে কতকগুলি পারিভাষিক দর্শন-সাহিত্য, কলেজপাঠ্য দর্শন-গ্রন্থ, মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান ও তর্ক-বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্কলন হইলেও হইতে পারে।" লেখকের উদ্দেশ্য আমরা বুঝিলাম। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে উচ্চ অঙ্গের দর্শন-সাহিত্যের অভ্যুদয় না হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে আমাদেরই

কোন নূতন দর্শনবাদ বিশ্বে নূতন সংবাদ আনিয়া দিবে, এ কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। এই ভাবী দর্শনের আবিষ্কার করিতে আমাদের বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া নানা তথ্যের মীমাংসার পর আমরা ঐ ভাবী বিশ্ব-দর্শনের দ্বারদেশে উপনীত হইতে সমর্থ হইব। যতদিন সেই সুযোগ ও শুভক্ষণ না আসিবে, ততদিন আমরা পাশ্চাত্য দর্শনাদির অনুবাদ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমাদের দর্শনবিভাগের জীবন-ধারাকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিব না কি? এদিকে দার্শনিকগণের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া উচিত।

যখন বিজ্ঞানের সাহায্যে সংসারের তর্কজাল ছিন্ন করিয়া তাহার উপর দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে হিন্দুসমাজ জীবিত, তখন সত্বর যাহাতে দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিশেষ আয়োজন করা যায়, তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত। আজ কয়েক বৎসর এদেশে বিজ্ঞান-আলোচনা আরব্ধ বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বঙ্গের বিজ্ঞান-জগতে যে কয়েকটী নূতন জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ এই সমস্ত বিজ্ঞানসেবিগণের সাহায্যে বঙ্গভাষায় পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তকাদি প্রণয়ন করাইয়া বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অভাব মোচন ও জনসাধারণের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

(৪) ভাব ও চিন্তা-পূর্ণ বিদেশীয় সাহিত্যের অনুবাদ

ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের জন্য আমরা বঙ্গভাষায় বিদেশীয় সাহিত্যের অনুবাদ দেখিতে চাই। আধুনিক বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ বোধ হয় অনুবাদকে হীনপ্রতিভার কার্য্য মনে করেন। নতুবা সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই কেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া যতটা প্রতিভার পরিচয় দেওয়া যায়, চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ অন্যান্য বিশ্ব-সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া জাতীয় ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়। গল্প বা উপন্যাস লিখিতে যেমন উদ্ভাবনী শক্তির দরকার, অনুবাদ করিতেও তেমনি বিদেশীয় ভাষায় যোগ্য অধিকার থাকা চাই। এক কার্য্যে যেমন উদ্ভাবনী শক্তি দেখাইয়া মানবের মন মুগ্ধ করিবার আশা থাকে, অন্যটাতে তেমনি অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রতিভা প্রকৃতির দান। প্রতিভাবান্ পুরুষের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই সে আত্মপ্রকাশ করে। আর বিদ্যাবত্তা স্বীয় আয়াসলব্ধ ধন। সুতরাং শুধু শেষোক্ত গুণের অধিকারীও আমাদের কম সমাদরের পাত্র নহেন। পরিষদ ও সুধীসমাজ এই অনুবাদ-কার্য্যেও মনোনিবেশ করুন, ইহা আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

(৫) সাহিত্যে স্বাস্থ্য ও অন্নসংস্থান

বিগত বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমি বলিব সাহিত্য সম্বন্ধে, ভাষা সম্বন্ধে, আর আমার চিরদিনের কথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।" আজ আমি সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, নির্জ্জীব বাঙ্গালী এখন স্বাস্থ্যের দিকে তাকাও। প্রাণের আলোচনা কর। কঙ্কালসার দেহ লইয়া আমরা আর ক'দিন টিকিব? কিন্তু এ কথা শুনাইবেই বা কে? বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ত এই বাণীর প্রচার করিতে হইবে। সাহিত্যিকসমাজ, সাহিত্যের নিম্নসোপান হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করুন। অন্নের অভাবে আমাদের এই দুর্দ্দশা। যাহাতে সকলে পার্থিব উন্নতির জন্য স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া লোকমত গঠন করুন। আপনারাই বর্ত্তমান সমাজের নেতা।

পরিশেষে কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ কাব্যের সাহায্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তথাপি বলিব আমাদের কাব্য-সাহিত্য সম্পূর্ণ নহে। রবীন্দ্রনাথ ভাব-জগতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দানও শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও চারিদিকে বহুল অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। আমরা কবিতায় যে নূতন জগৎ গঠনের আভাস পাইয়াছি, সমস্তদিকে সম্পূর্ণতা লাভ না করিলে তাহা আভাসেই পর্য্যবসিত থাকিবে। তাই নব্য কবিগণের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ঐ অভাব-পূরণ। আমার মনে হয় তাঁহাদের কবিতায় তিনটী অভাবের প্রভাব বড় বেশী—বিরাট কল্পনা, স্বাস্থ্য ও সবলতা। আজকালকার কবিতা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত; সুর সাধারণতঃ একঘেয়ে ও নিতান্ত নারীসুলভ; ভাষা যেন বিলাস-স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছে। একটা জগৎকে ভাঙ্গিয়া গড়ার ভাব তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যতদিন পর্য্যন্ত এই দোষগুলি সংশোধিত হইয়া উপরোক্ত গুণত্রয়ের আবির্ভাব না হয়, ততদিন কবিতা হইতে প্রকৃত সুর বাজিবে না। যদি অনুকরণ করিতেই হয়, তবে Keatsএর বাহ্যসৌন্দর্য্য-উপাসনা অনুকরণ করা উচিত কি? যে কবির মধ্যে অন্তর-সৌন্দর্য্যের অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়, আমরা মনে করি, তাঁহাকেই অনুকরণ করা হীনপ্রতিভ কবিদিগের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। গেটে, ব্রাউনিংএর ভিতর জীবন আছে, অন্তর সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ আছে, আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াস আছে,—যদি অনুকরণ করিতে হয়, তবে তাঁহাদিগকেই অনুকরণের প্রধান পাত্র বলিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে কাব্যের একটা নূতন ধারা সাহিত্যের মধ্যে সূচিত হইবে, নব্য কবি-বংশের চিন্তার রাস্তা বিস্তৃত হইয়া যাইবে।

(৬) কাব্য ও কবিতার বিরাট কল্পনা, স্বাস্থ্য ও সবলতা

উপসংহারে আমি লেখকসম্প্রদায়কে সাহিত্যে কাঠিন্য-ধর্ম্মের প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছি; এবং পাঠক-সমাজের নিকট নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন পুরাতন রুচির পরিবর্ত্তন করিয়া এই কাঠিন্যকে উপভোগ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ না হন। সম্প্রতি কোন মাসিক-পত্রিকায়* এই বিষয়ে একটী আলোচনা দেখিয়া আমরা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

(৭) সাহিত্যে কাঠিন্য ধর্ম্ম

সাহিত্য-সমাজ পূর্ব্বোল্লিখিত পন্থায় অগ্রসর হইলে অচিরে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের সমগ্রচিত্র সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, বাঙ্গালাদেশ আর ক্ষুদ্র নাই—নানাদিক হইতে নানা ভাবের সংমিশ্রণে বাস্তবিকই তাহার বিশালতা অতিশয় মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

শেষ কথা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মফঃস্বলের বাণী

১। নিরামিষ-আহারের উপকারিতা

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়াই অনেকে হয়ত একটু বিস্মিত হইবেন। আজকাল মৎস্য-মাংসাদির এই অবাধ প্রচলনের দিনে নিরামিষ-আহারের কথাটা বলিয়া যে হাস্যাস্পদ হইব তাহা বেশ জানি; কিন্তু তাই বলিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করার লোভটা সংবরণ করিতে

* গৃহস্থ, ফাল্গুন ১৩২০

পারিলাম না। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

মৃত্তিকাজাত পদার্থই মানুষের উপযোগী খাদ্য। ভগবান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের উদর পূরণ জন্য মৃত্তিকাতেই সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের শরীর-পুষ্টির জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক, তাহা সকলই মৃত্তিকাতেই জন্মে। ধান্য, কলাই, মুগ, বুট, অরহর, যব, গোধুম, ভুট্টা প্রভৃতি মনুষ্যের খাদ্য; ইহার প্রত্যেক জিনিষই মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই সকল জিনিষ ভক্ষণ করিয়াই মানুষ অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। তাহার পক্ষে অন্য কোন প্রকার পাশবিক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

হিন্দুর জীবন ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রকারগণ চিরদিনই নিরামিষ-আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দুর প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ জলন্ত অক্ষরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে এখন আর কেহ শাস্ত্রের অনুশাসনের প্রতি লক্ষ্য করে না। প্রবল দেশাচারই এখন একরূপ শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে কোনও হিন্দুপরিবারের একটী শিশুর জীবনের ইতিবৃত্ত ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শরীর-গঠন পক্ষে নিরামিষ-আহারই সম্পূর্ণ উপযোগী। বালক যতদিন মৎস্যাদি ভোজন করে না, ততদিন সে সুস্থ, সবল ও নীরোগ থাকে; কিন্তু যেই সে মৎস্য ভক্ষণ আরম্ভ করে, অমনি নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগের বীজাণু সকল অলক্ষ্যে তাহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে অচিরেই ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে। যাহারা আজীবন নিরামিষাশী তাহাদের শরীর যেমন সবল, পুষ্ট ও নীরোগ, মৎস্য ও মাংসাহারী ব্যক্তিগণের দেহ কিছুতেই তদ্রূপ হইতে পারে না।

হিন্দুপরিবারের ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ কথার যৌক্তিকতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। হিন্দু-গৃহের সধবা-ললনাগণ যতদিন মৎস্য ভোজন করেন, ততদিন তাঁহারা কোন না কোন প্রকার রোগের অধীন হইয়া জীবন যাপন করেন। তখন গৃহস্থকে গৃহিণীর পরিচর্য্যার জন্য পরিচারিকা ও রন্ধনাদিকার্য্যনির্ব্বাহ জন্য পাচক নিযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু কোনও বিধবার পরিচর্য্যা ও রন্ধনাদির জন্য কেহ কখনও কোন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন কি? সধবা দিনে তিনবার আহার করিয়াও দুর্ব্বল, অসুস্থ ও রোগক্লিষ্ট, আর বিধবা একবার মাত্র আহার করিয়াই সবল, সুস্থ ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? একমাত্র যত্যাচার ও নিরামিষ-ভোজনই কি ইহার কারণ নহে? যাহার দেহলতিকা সধবা অবস্থায় নানাপ্রকার রোগের আবাস-স্থল থাকে, তিনিই যদি আবার বিধবা অবস্থায় সবল ও সুস্থ হ'ন, তবে কি মনে করা যাইবে?

নিরামিষ আহার দীর্ঘায়ুঃ হইবার নিদান। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিরামিষাশী ব্যক্তিমাত্রই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও সুখ উপভোগ করিয়াছেন। শরীর নীরোগ হইলে যে মানুষ দীর্ঘায়ুঃ হইবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং নিরামিষাহারী দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? সাত্ত্বিক আহারে মনের প্রফুল্লতা জন্মে; মানসিক প্রফুল্লতা শরীর-গঠনপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে, তাই নিরামিষ-আহার শরীর-গঠন পক্ষেও উপকারী।

ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান স্থান। অন্য দেশে যে সকল খাদ্য অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা এদেশের উপযোগী নহে। এ জন্যই এদেশের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে খাদ্যাদির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাই এদেশের রোগীকে মুগের যুষ, মসুরের যুষ, খৈর মণ্ড, চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদেশের মনীষিগণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! কালমাহাত্ম্যে উহা অব্যবস্থা বা কুব্যবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত ও

সর্ব্বত্র উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের পাকস্থলী যাহা পরিপাক করিতে সমর্থ, তদপেক্ষা গুরুপাক খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে উহা যে পরিপাক হইবে না, তাহা নিশ্চিত; তাই আমরা অনেক সময় পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রানুমোদিত দুষ্পাচ্য পথ্যাদি আহার করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। স্থানীয় অবস্থা ও দেশের জল-বায়ু প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে হইবে, এ কথা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই। তারপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও নিরামিষ-আহারের উৎকর্ষতার বিষয় বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রফেসার জন রে বলেন—"মনুষ্যের দেহ-রক্ষার জন্য যে কোন খাদ্য প্রয়োজন হয়, এবং যে সকল জিনিষে মনুষ্যের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বিধান করে, তাহা সমস্তই উদ্ভিদ-জগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যকে মাংসাশী জীব রূপে সৃষ্টি করা হয় নাই।"

অনেকে মনে করেন যে, শরীর-গঠন জন্য যে পরিমাণ যবক্ষারজান বা তৎকর উপাদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা কেবল মাংসেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভারতবর্ষের মধ্যে এক বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে মৎস্য কি মাংস আহারের ব্যবস্থা নাই, অথচ সে সকল দেশের লোক বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক সুস্থ। যদি একমাত্র মাংসাদিতেই যবক্ষারজান পাওয়া যাইত, তবে তাহারা এত বলিষ্ঠ হইতে পারিত না। অনেক চিকিৎসকের মতও আমাদের মতের অনুকূল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার হেনরী টমসন এম্, ডি, এফ, আর, সি, এস্ বলেন—"মনুষ্য শরীরের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা সমস্তই উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়।"

গলিত ও পচা খাদ্য শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী। পচা খাদ্য আহার করিলে যে শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন ও শক্তিহীন হয়, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্য শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হইতে পারে সেগুলি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। সুতরাং খাদ্যাখাদ্য বিচার সময়ে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শাক-সবজী অপেক্ষা মৎস্য-মাংসাদি অতি অল্প সময়ে পচিয়া নষ্ট হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শাক প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য পচিয়া যত অপকার করে, মাংসাদি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অপকার করিয়া থাকে। মাংস সাধারণতই গুরুপাক, তাহার পর যে ভাবে পাক করা হয়, তাহাতে উহা একবারে দুষ্পাচ্য হয়। পরিপাক হওয়ার জন্য মাংসকে দীর্ঘকাল পাকস্থলীতে অবস্থান করিতে হয়, সুতরাং অম্লরস সহযোগে পচিয়া অনিষ্টকর হইয়া থাকে। ডাক্তার লুকাস সাম্পানিয়ার বলেন—মাংসাহার নিবন্ধন পাকস্থলী হইতে এক প্রকার বিষময় রস নিঃসৃত হয় এবং তাহা হইতে এপেণ্ডাইসটীস নামক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ইউরিক এসিড শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এ সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসকগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরে উক্ত এসিডের আধিক্য হইলে নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার হেগ বলেন—এক পাউণ্ড মাংসে ১৫ গ্রেণ ইউরিক এসিড থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যিনি যত অধিক পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ইউরিক এসিড উদরস্থ করিবেন।

আজকাল এদেশে গলনালীর রোগের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। এ রোগ দুশ্চিকিৎস্য ও দুরারোগ্য। এ রোগে শতকরা একজনও বাঁচে কি না সন্দেহ। এরোগ হইলেই রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত মনে করিতে হইবে। এ রোগও মাংস-ভক্ষণ-প্রসূত বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ডাক্তার রবার্ট বেল বলেন—"মাংস ভোজন হইতেই এই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।" তিনি মনে করেন যদি মাংসাহার ত্যাগ করা যায়, তবে গলরোগ (কেন্‌সার) আরোগ্য করা যাইতে পারে।

উপরে যে সকল অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত প্রকটিত হইল, তাহা হইতে দেখা যায়, মাংসাহার মনুষ্য জাতির উপযোগী নহে। মাংসাহারে যত অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা

বলিয়া বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন, নিরামিষ-আহারে সেরূপ সম্ভাবনা আদৌ নাই। পরন্তু নিরামিষ আহার শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখে। সুতরাং দেখা যায় আমাদের পক্ষে নিরামিষ আহারই বিধাতার বিধান। বলপূর্ব্বক পশ্বাদির ন্যায় মাংসাহার করিলে তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। ঢাকাপ্রকাশ।

২। ভাবিবার কথা

(ক) জাতীয় বিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলসমূহে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষার নামান্তর মাত্র। অথচ আজ তাহা অর্থকরী শিক্ষাও নহে। গ্রাডুয়েট অথবা আইন পরীক্ষা পাশ করিলে কিছু চাকুরী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ২০৲ টাকা বেতনের চাকুরীই আমাদের জীবনের উচ্চতম উন্নতি মনে হয়। এ কথা কাহাকেও আর শিখাইয়া দিতে হইবে না। প্রবেশিকার পূর্ব্বাবধি যাহাদের পাঠ শেষ হয়, তাহারা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। অথচ এই প্রকারে নিরুপায় শ্রেণী একান্ত কম নহে। আজ শিক্ষার ব্যয় যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, শাসনের কাঠিন্য যেরূপ গুরুতর হইতেছে, তাহাতে অধিক-সংখ্যক ছাত্রই "ষাঁড়ের গোবর" হইয়া পড়ে। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্র প্রথমাবধি স্বাবলম্বন অভ্যাস করে। জাতীয় বিদ্যালয় নামে যদি একটা আতঙ্ক না থাকিত তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়কে উৎসাহ প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল। অন্নকার এই অন্ন-সমস্যার দিনে এই ভাবে কতগুলি যুবকের অর্থাগমের পন্থা প্রশস্ত হইলে দেশের অশান্তি বহু-পরিমাণে লাঘব হইতে পারিত। যাহা'ক সে অন্য কথা। এখনও এই স্কুলগুলিকে যথা-সম্ভব সাহায্য করিয়া জীবিত রাখা দেশ-হিতকামী ব্যক্তিবর্গের একান্ত কর্ত্তব্য। আপনাপন মূর্খ পুত্রগণকেও যদি তাঁহারা এই সমস্ত স্কুলে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেও তাহারা মানুষ হইয়া কাজের যোগ্য হইতে পারে। একদিন ছিল এক মাত্র বিদ্যার গৌরবকেই গৌরবজনক মনে করা যাইত, কিন্তু আজ আর সেদিন নাই, আজ অর্থাগমের পন্থা দ্রুতগতিতে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এক্ষেত্রে কার্য্যকরী শিক্ষা বৃদ্ধি আবশ্যক। আজ চক্ষের উপরে দেখিতেছি একজন ফটোগ্রাফার, এক জন ঘড়ী-মেরামত-কারী, একজন চিত্রকর, বহু এল্‌-এ, বি-এ, বি-এল্ হইতে অধিক অর্থ আয় করিতেছে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু ভার তাহার অস্থি-মজ্জা শুষ্ক করিয়া দেয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ন্যাশনাল স্কুলে পড়িলে ডাকাত হয়, সে অপবাদ আর নাই, বরং ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে যাহাদের বন্ধন তাহারাও কুপথগামী হইতে পারে। এ অবস্থায় জাতীয় বিদ্যা-লয়ের প্রতি বিরূপ হওয়ার কাহারও কোনও হেতু নাই।

(খ) ব্যায়াম-চর্চ্চা

বর্ত্তমান সময় স্কুল-কলেজসমূহের উপরে শিক্ষা-বিভাগের প্রভুত্ব পূর্ণ রূপে বিস্তৃত হইয়াছে। শিক্ষক মাত্র ছেলেদিগকে পুস্তক পড়াইবেন এতদ্ব্যতিরিক্ত কোনও উপদেশ তাঁহারা দেন না বা বিপদপাত ভয়ে দিতে সাহস করেন না। তাঁহারা কোন্ উপদেশের কি অর্থ হইবে এবং তাহাতে তাঁহাদের চাকুরী রক্ষা পায় কি না এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। তাই এক হিসাবে যেমন ছাত্রগণ অতিরিক্ত শাসন-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, তেমন অপর দিকে তাহারা স্বাধীনতাও ভোগ করিতেছে। আমরা আজ ছাত্রগণের ব্যায়াম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ছাত্রগণ যাহাতে ফুটবল খেলে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষকগণের প্রতি উপদেশ আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত পক্ষে শরীর গঠন করিতে অপর কোনও ব্যায়াম করে কি না সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। ফলে শীতকালে ছাত্রগণ যদৃচ্ছা ব্যায়াম করে, কেহ বা আদৌ কোনও ব্যায়াম করেই না। আজকাল কেহ কেহ হকি খেলে, কেহ বা টেনিস প্রভৃতি "কোমল" ক্রীড়ায় মনোভিনিবেশ করিয়াছে।

অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ক্রীড়াসমূহে কাহারও রুচি দেখা যায় না। এই সম্বন্ধে উপদেষ্টাও বড় কেহ নাই। "হাডুডু" "ছি ছি" প্রভৃতি খেলায় একদিকে যেমন উপকার হইত, তেমন পয়সা ব্যয় আদৌ ছিল না। আজ এই ঘোর মূল্য-বৃদ্ধির দিনে ফুটবল, টেনিস, বেডমিংটনে যত টাকা উড়িয়া যায়, তদ্দ্বারা একটু দুধ বা মাছ খাইলে শরীর ও মন সুস্থ থাকিত। আমাদের মনে হয় শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারি-বর্গ স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষকে এই ক্রীড়াগুলির অধিক প্রবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলে তাঁহারা অন্নসমস্যার দিনে শান্তি-রক্ষার আংশিক সাহায্য করিতে পারিতেন। আমরা সর্ব্বত্র যেন একটা বিশৃঙ্খলাই দেখিতেছি। এই অবস্থা কদাচ ভাল নহে।

বরিশাল-হিতৈষী

৩। উদ্বোধন

ভারতবর্ষ এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু আজ ভারতের গৌরব লুপ্ত। কিন্তু সেই মহিমাময় অতীত গৌরব আমরা ভুলিতে পারিয়াছি কি? পরদুঃখে কাতর দয়াল সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের আত্মত্যাগ, আর্য্যনারী সীতা-সাবিত্রীর পতিপ্রেম, প্রেমিকপ্রবর নিমাই-চাঁদের অহেতুকী দয়া, শচী-কৌশল্যার অপত্য-স্নেহ,—এ সব কি আমরা ভুলিতে পারিয়াছি? আমরা আর কিসে গৌরবান্বিত আছি? বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবত, পুরাণ-তন্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন, কাব্য-মহাকাব্য আমরা সব ভুলিয়াছি, নিত্য ভুলিতেছি। সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির উন্নতির জন্য আমরা এ যাবৎ কিই বা করিলাম আর কিই-বা করিতেছি? নিমাইচাঁদের অমিয়বাণী 'নামে রুচি জীবে দয়া' মহাসাধন। সাধনের মূল জীবে দয়া, আর ভক্তির মূল রুচি, দয়া ভিন্ন প্রেম নাই। আমরা এমন প্রেমের জন্মভূমিতে কেন প্রেমহীন হইতেছি, কেন বিশ্বপ্রেমে আমরা ভাসিয়া যাই না?

গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আর ঘোর নিদ্রায় অচেতন থাকিও না। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই জাগ্রত হও।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,
ক্ষুরস্য ধারা নিশীথা দুরত্যয়া—
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বিদুঃ।

উপনিষৎ।

নগরবাসী, পল্লীবাসী সকলেই জাগ্রত হও, সমগ্র ভারত একতাসূত্রে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হও। দীর্ঘকাল আমরা ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়াছিলাম, ভ্রাতার নিকট পর হইয়াছিলাম। ভ্রাতৃত্ব কি মিষ্ট, ভ্রাতৃত্ব কত পূজ্য, ভ্রাতৃত্ব কি অমিয়-মাখা তাহা একবার উপলব্ধি কর। জাতির সাহিত্যে পুনঃ চেতনা প্রকাশিত হইতেছে। সভ্যতার শিরোভূষণ ভারতে ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হইতেছে। ঐই দেখ, আপনার দৈন্য ঘুচাইবার জন্য পাশ্চাত্য জাতিও নতশিরে ভারতের দান গ্রহণ করিতেছে।

এখন তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা কর, মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের নেতা, তোমাদের চালক আপনি আসিবে। এখন ভারতে মূর্খ উপদেশকের অভাব নাই, ইহারা নিজকে ভুলিয়া অন্যকে ভাল হইবার উপদেশ দেয়। বেদান্তময় ভারতে বৈদান্তিক ভারতবাসীর আজ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব, মহাপথের মহাখেলা। দম্ভী নেতা চায় কেবল আত্মসম্মান, কিন্তু মানব-সমাজ অপাত্রে হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক। রোমের পাদরী শ্রেষ্ঠ পোপ জনসাধারণের ভক্তি পাইলেন না, কিন্তু ত্যাগী ম্যাটসিনির চরণে লক্ষ লোকের হৃদয় প্রণত। রুষের প্রবল সম্রাট প্রজার ভক্তি পাইলেন না, কিন্তু রুষের জনসাধারণ সন্ন্যাসী টলষ্টয়ের চরণে নত হইল। এদেশের অধিকাংশ নেতা ও পাণ্ডাগণ জনসমাজের ভয়ের পাত্র, ভক্তির পাত্র নহেন। নেতৃকুল প্রেমের সাধনায় সিদ্ধ হও, আত্মসাধনে সফল হও, তবে প্রচারে কৃতকার্য্য হইবে। উপনিষদকার বলেন, 'একশাখায় দুই পাখী,—একে অন্যকে দিবানিশি ডাকিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেছে, আত্মসাধনায় সিদ্ধ হইলে কেহ পর থাকে না। সব পর আপনার হয়, তখন বিশ্বজনীন মানব-

প্রেমের উদয় হয়। এইরূপ সাধক গীতোক্ত বিশ্বরূপ দেখিয়া চৈতন্য-কথিত প্রেমে দীক্ষা লাভ করে—তখন ধরায় স্বর্গের আগমন হয়।

ভারতে মহাসাধনার মহা প্রয়োজন। অতএব সকলে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হও। রত্নাকর।

৪। স্বদেশীর আবশ্যকতা

আজকাল অধিকাংশ ভদ্রলোকই যেন বিলাতী দ্রব্যের পক্ষপাতী। তাঁহাদের স্বদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি আদৌ পছন্দ হয় না। আজকাল স্বদেশী বস্ত্র অনেক ভদ্র-পরিবারেই ব্যবহৃত হয় না। লবণ-চিনির ত কথাই নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনেও আমাদের চক্ষু ফুটিল না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা চিরদিন হুজুগপ্রিয় তাই বুঝি হুজুগে মাতিয়া ২।৪ দিন লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছিলাম। দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়াছ, ঘরে ঘরে পুলিশ ঢুকাইয়াছ, তোমরাই তোমাদের বিপদকে বরণ করিয়া আনিয়াছ। এখন আবার কেহ কেহ বলিয়াও থাকে "স্বদেশী" শব্দটা উচ্চারণ করাও দোষ। ঐ শব্দেই পুলিশ চটে। আমার দেশকে আমি স্বদেশ না বলিয়া কি বিদেশ বলিব? আমি আমার দেশের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ফেলিয়া কি বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিব? এ কোনও শাস্ত্রে বা কোনও দেশের রাজার আইন-নজীরে নাই। ইংরেজ ন্যায়বান রাজা, তিনি তাহা কখনও ব্যবস্থা করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট কখনও তোমাদিগকে এ কথা বলিয়া দেন নাই যে, তোমরা ম্যানচেষ্টারের কাপড়, লিবারপুলের লবণ, বীট ও জাবার চিনি এবং বার্ম্মিংহামের সূঁচ হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ-দ্রব্য ছুরি কাঁচি ইত্যাদি বিদেশী দ্রব্য ক্রয় কর, ঘরের পয়সা পরকে দাও। তোমরা নিজের দেশের কলকারখানার উন্নতি কর, ঘরের পয়সা ঘরে রাখিবার চেষ্টা কর, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইবেন না; বরং তিনিও তোমাদের সাহায্য করিবেন, কারণ ভারতবাসী তাঁহার প্রিয় প্রজা।

তাই বলি ভাই সব, এখনও সময় থাকিতে অগ্রসর হও। কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি কর। দেশে কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত দেশকে উন্নত করিতে পারিবে না। তোমরাও উন্নত হইতে পারিবে না, তোমরা জাগ, দেশকে জাগাও, কৃষিকার্য্যকে হেয় জ্ঞান করিও না। উক্ত কার্য্যের ভার নিরক্ষর চাষা লোকের উপর ন্যস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইও না। যাহা প্রতিদিন আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে তাহা নিজে জন্মাইয়া খাওয়াটা হেয় কার্য্য নহে, বরং গৌরবের কার্য্য। দেশকে গৌরবান্বিত করিতে হইলে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও কলকারখানাদি দ্বারা অভাব-অভিযোগ নিবারণ ও প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশের জিনিষ ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা দেশ কখনও জাগিবে না, উন্নতও হইবে না। নিঃস্বার্থ দান ও নিঃস্বার্থ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি চাই। মুখে ও মনে এক হওয়া চাই। মুখে বলিব এক, আর কার্য্যে করিব অন্যরূপ, তাহাতে চলিবে না।

যে দেশ একদিন সভ্যজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সে দেশ আজ কত নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তোমরা যাহাকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে, আজ তাহারাই তোমাদিগকে অসভ্য বলিতে দ্বিধা করে না। ভারতবাসীর ন্যায় আর কোন দেশের লোকই অন্নাভাবে শীর্ণ ও জরাজীর্ণ নহে। অন্ততঃ তাহারা দু'বেলা চারটী পেট পুরিয়া খাইতে পায়। আজ ভারতের অন্নে ভিন্নদেশী লোক উদর পূর্ণ করিতেছে, কিন্তু ভারতবাসী 'হা অন্ন, হা 'অন্ন' করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।

ভাই সব, আবার বলি একবার দেশের পানে চাও, দেশের অর্থ দেশে রাখ। বিদেশী বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্যাদি গ্রহণ কর।

ব্রজরাজ।

পরিশিষ্ট

প্রতি ঘণ্টায় সূক্ষ্ম হিসাবে ৯·৮৫৬৫ সেকেণ্ড পূর্ব্ব দেশান্তরে বিয়োগ ও পশ্চিম দেশান্তরে যোগ করিতে হয়। চেম্বার্স সারিণীর ৪৩৩ পৃষ্ঠায় যে সারিণী আছে তাহার সাহায্যেই এ অঙ্ক গুলি নির্ণয় করা যেতে পারে। এবং মিঃ এলেন লিও প্রণীত, এষ্ট্রলজি ফর অল নামক গ্রন্থের এই সম্বন্ধীয় যে সারিণী আছে তাহার দ্বারাও নির্ণয় ক'রতে পারা যায়। ফলে এ সকল সারিণী নানা আকারে নানা স্থানে পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে দেখেছ ১লা জুলাই গ্রীণীচ মধ্য-মধ্যাহ্নে নাক্ষত্র কাল ৬ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ৪৩ সেকেণ্ড; এখন কলিকাতা যদি ৮৮।৩০ দ্রাঃ পূঃ স্বীকার করি তা'হ'লে এই টেবিল দিয়ে--

৭৫ — ৪৯'২৮
৮° — ৫'২৬
৫° — ৩'২৯
৩০' — '৩৩
৮৮°-৩০' = ৫৮'১৬

এই আটায় সেকেণ্ড বাদ দিলে—

৬ ঘ ৩৫ মি ৪৪ সে
— ৫৮ ,,
— ৬ ,, ৩৪ ,, ৪৬ ,,
+ ২ ,, ৩৫ ,,
+ সংস্কার ২ ঘণ্টায় — ১৯·৭১
৩৫ মিনিটে — ৫·৭
৯ — ১০ — ১১

আমি। এতেও ত লগ্নের পরিমাণের ব্যতিক্রম হ'বে।

গুরুদেব। অতি সামান্য। আগেই ত বলেছি—জন্ম সময় কি সেকেণ্ড পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম? ও কেবল জটিলতা বৃদ্ধি করা। যাই হৌক ইচ্ছা হয় এ সংস্কার দিও। আর গ্রীণীচ জন্মস্থান হ'তে বেশী দূর হ'লে দেওয়া ভাল। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

আমি। পাহাড়ের উপর সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের কাল ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে ব্যতিক্রম কি রূপে নির্ণীত হ'তে পারে?

গুরুদেব। নির্ণয় করবার নিয়ম একটু জটিল। এখন থাক। মোটের উপর সমুদ্রতল থেকে এক শত ফুট উর্দ্ধে উদয়ে ১ মিনিট ১০ সেকেণ্ড বিয়োগ ও অস্তে যোগ করতে হয়, দুই শত ফুট উর্দ্ধে ১ মি ৪৩ সেকেণ্ড, ৩০০ ফুট উর্দ্ধে ২ মি, ৫ সেকেণ্ড ইত্যাদি বেশী উর্দ্ধে শত করা ২০, ১৫ কি ১০ দশ সেকেণ্ড অন্তর হয়। কোষ্ঠী গণনায় সে সংস্কার টুকু না দিলের বেশী তফাৎ হ'বে না।

আমি। দুই তিন মিনিট ও অগ্রাহ্য হ'বে?

গুরুদেব। বাবা, কে তোমায় ভূমিষ্ঠের ঠিক সময় দিতে পারবে বল ত?—প্রথমতঃ ভূমিষ্ঠ-কাল সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে—কেহ বলেন, ভূমিস্পর্শ কালই গ্রাহ্য, কেহ বলেন নাড়ীচ্ছেদ কাল গ্রাহ্য, কেহ বলেন প্রথম-ক্রন্দন কাল গ্রাহ্য, আবার কেহ বা বলেন, গর্ভ হ'তে শিখা দর্শন অর্থাৎ মাথার খুলি দেখার সময়ই গ্রাহ্য। তার পর, ভূমিষ্ঠের সময় লোকে প্রসূতিকে নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকে, এজন্য নিকটে ঘড়ি থাকলেও ঠিক সময়ে দেখা ঘটা সম্ভব মনে করি না। তার পর যদিই দেখা হয়, তা'হ'লে ঘড়ি যে ঠিক ছিল তা'র প্রমাণাভাব, অবশ্য সকলেই নিজ নিজ ঘড়িকে ঠিক ব'লে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তা'ব'লে ঠিক স্থানীয় কাল যে সেই ঘড়ি নির্দ্দেশ করে না, তা' গণিতজ্ঞকে বলে বুঝাবার দরকার কি?

আমি। তবে কি শুদ্ধ লগ্ন হ'বে না।

গুরুদেব। কে ব'ল্লে হ'বে না? আমাদের জ্যোতিষে যখন অনিশ্চিত সময়কে শুদ্ধ কর্‌বার উপায় রয়েছে, তখন ঘড়ির সামান্য অশুদ্ধি সংশোধন করা অসম্ভব নয়। রণবীর জ্যোতির্নিবন্ধে এবং নিত্যানন্দ জাতকাদিতে শুদ্ধ স্থানীয় জন্ম কাল নির্ণয়ের উপায় আছে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত সিফেরিয়েল সেই নিয়মকে পরীক্ষা পূর্ব্বক সূত্রাকারে নিবদ্ধ ক'রেছেন, বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত এলেন লিও সেই সূত্র স্বীকার করে নিজ গ্রন্থে দিয়েছেন, এ সব কথা তোমায় পরে বিশেষ ক'রে বল্‌বো। আগে লগ্ন-নির্ণয় প্রণালীটি ভাল ক'রে আয়ত্ব কর। বরং ব্যবহারের সুবিধার জন্য তোমার খাতায় কলিকাতার পাশ্চাত্য লগ্ন খণ্ডাটিও লিখে নিতে পার। সব চেয়ে র‍্যাফেলের টেব্‌ল্‌স্ অব হাউসেস্ নামক বই একখানা কিন্‌লেই ভাল হয়। দাম এক সিলিং বই নয়।

আমি। আচ্ছা তাই করবো, এখন একটা জিজ্ঞাস্য আছে, মঙ্গলের স্ফুটকে, আর বয়ঃ পরিমাণটাকে কালে পরিণত করে যে যোগ করলেন, তার মানে কি?

গুরুদেব। ও কথাটা বিশেষ ক'রে এখন বোঝান সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি এই বোঝ, যে লগ্নকে মঙ্গলের স্থানে আন্‌তে যত সময় যায় তাই স্থির করা হ'লো; অর্থাৎ পিতৃবিয়োগ সময়ে লগ্নগত মঙ্গল করা হ'লো। এর পর যখন এ গুলি বোঝবার মত জ্ঞান হ'বে, তখন বিবিধ উপায় বুঝিয়ে দিব, তুমিও বুঝ্‌তে পার্‌বে।

আমি। ত'বে ত্রিকোণমিতির সাহায্যেই কস্‌বো, না খণ্ডা দিয়ে করবো?

গুরুদেব। ত্রিকোণমিতি দিয়েই কস। অঙ্ক আয়ত্ব হোক।

আমি। যে আজ্ঞা জন্ম সময় ২টা ২০ মিনিট ৩১ সেকেণ্ড। খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দ ১৭ই অক্টোবরের গ্রীণীচ মধ্য-মাধ্যাহ্নিক নাক্ষত্রকাল=১৩। ৪২। ৪৮ এর্কে স্বদেশীয় মধ্যাহ্নিক করি।

গুরুদেব। তা ক'ত্তে হলে, সে সংস্কারটি যেমন এতে বিয়োগ করবে তেমনি জন্ম সময়ে যোগ করা উচিত। কারণ পূর্ব্ব অঙ্কে গ্রীণীচ মধ্যাহ্নিক নাক্ষত্রকালই লওয়া হ'য়েছিল।

আমি। তবে যা আছে তাই থাক,

গ্রী ম মা নাক্ষত্র কাল = ১৩। ৪২। ৪৮
\+ জন্মকাল অপরাহ্ন = ২। ২০। ৩১
\+ নাক্ষত্র সংস্কার = ০। ০। ২৩
= তাৎকালিক নক্ষত্র কাল = ১৬। ৩। ৪৮

১৬ ঘণ্টা = ২৪০ অংশ
৩ মিঃ = ০। ৪৫ মিঃ
৪৮ সেঃ = ০। ১২ মিঃ

= অংশ ২৪০। ৫৭ মি মধ্যাকাশের সরলোত্থান R. A. M.C.
\+ ৩০
= ২৭০। ৫৭ একাদশের বক্রোত্থান O. A. XI.
\+ ৩০
= ৩০০। ৫৭ দ্বাদশের বক্রোত্থান O. A. XII.
\+ ৩০
= ৩৩০। ৫৭ লগ্নের বক্রোত্থান O. A. Asc.
\+ ৩০
= ০। ৫৭ দ্বিতীয়ের বক্রোত্থান O. A. II.
\+ ৩০
= ৩০। ৫৭ তৃতীয়ের বক্রোত্থান O. A. III.

দশমের সরলোত্থান ২৪০°-৫৭′ − ১৮০ = ৬০ -৫৭′
লগ. কোজ্যা Log. Cos. ২২° − ২৮′ = ৯.৯৬২৫২৬
\+ লগ. কোস্প Log. Cot ৬০ − ৫৭ = ৯.৭৪৪৬৪৫
= কোস্প দশম Log. Cot. ৬২ − ৫৯′ = ৯.৭০৭১৭১

\+ ১৮০

৩০) ২৪২ (৮　　৮। ২। ৫৯
২৪০
২　　অতএব ৮। ২। ৫৯ দশম লগ্ন।

তার পর লগ্ন। লগ্নের বক্রোত্থান = ৩৩০ অংশ ৫৭ কলা অথবা মেষ হইতে

৩৬০ । ০ − ৩৩০ । ৫৭ = ২৯ । ৩

∵ লগ কোজ্যা Log. Cos. ২৯ । ৩ = ৯·৯৪১৬০৯
+ লগ কোস্প Log. Cot. ২৩ । ২৮ = ১০·৩৮১৭০৪
= লগ কোস্প Log. Cot. ∠ ক ২৫ । ২৪ = ১০·৩২৩৩১৩
+ ২৩ । ২৮
= ∠ খ ৪৮ । ৫২

লগ কোজ্যা (পা. প. As. com.) ∠ খ = ১০·১৮১৮৯৭
+ লগ কোজ্যা ∠ ক = ৯·৯৫৫৮৪৯
+ লগ স্প. ২৯ । ৩ = ৯·৭৪৪৬৪৫
= লগ স্প· লগ্ন ৩৭ । ২০ = ৯·৮৮২৩৯১

অতএব ৩৬০ । ০ − ৩৭ । ০ = ৩২২ । ৪০
= ১০ । ২২ । ১০ লগ্ন।

লগ্ন ঠিক তাই হ'লো। দশমও তাই বলা যেতে পারে।

গুরুদেব। হাঁ! তবে টেবিল থেকেই একাদশ দ্বাদশ প্রভৃতি নিয়ে চক্র আঁক্‌না কেন?

আমি। তা' পারি, কিন্তু একটা কথা আছে। একাদশ প্রভৃতির চর নির্ণয়ের পাশ্চাত্য নিয়ম কি? টেবিল থেকে চর ব্যতীতঃ পেতে পারি বটে, কিন্তু নিয়মটা যদি অত্যন্ত জটিল না হয় তা'হ'লে শিখ্‌তে ইচ্ছা করি।

গুরুদেব। ব্যাপারটা যে বিশেষ গুরুতর তা নয়। প্রথম সরলোত্থানও বক্রোত্থানের অন্তর (যা'কে উদয়ান্তর বলে) নির্ণয় ক'ত্তে হ'বে। তারপর তা'র একতৃতীয়াংশ দিয়ে দ্বাদশ ও দ্বিতীয় সুতরাং ষষ্ঠ ও অষ্টমের চর নির্ণীত হ'বে।

আমি। কি রূপে?

গুরুদেব। বর্ত্তমান পরমাপক্রম ২৩ অংশ ২৮ কলার লগ স্পর্শিনীতে স্বদেশীয় অক্ষাংশাদির লগ. স্পর্শিনী যোগ কল্লেই উদয়ান্তরের লগ জ্যা হ'বে। তদ্দারা যে অংশাদি লব্ধ হ'বে তারি এক তৃতীয়াংশের লগ. জ্যা ঐ ক্রমপরমাপক্রমের (২৩ । ২৮) লগ. কো-স্পর্শিনীতে যোগ করলে একাদশাদির এবং দুই তৃতীয়াংশের লগ. কোজ্যা যোগ করলে দ্বাদশাদির লগ. স্পর্শিণী হ'বে। যেমন এ স্থলে অক্ষাংশাদি ২২° − ৩৩′ তা'র লগস্পর্শিনী = ৯·৬১৮২৯৫ এবং পরমপাক্রম ২৩° − ২৮′ লগ স্পর্শিনী = ৯·৬৩৭৪৯৬

∴ লগ. স্প ২৩-২৮ = ৯·৬৩৭৬৯১
+ লগ স্প ২২-৩৩ = ৯·৬১৮২৯৫
= লগ জ্যা ১০-২৩ = ৯·২৫৫৯০৬

এই ১০° − ২৩′ উদয়ান্তর (Asc. diff.)

৩)১০° – ২৩(৩ – ২৭·৬ এক তৃতীয়াংশ সুতরাং ৬ – ৫৫·৩ দুই তৃতীয়াংশ
৯
১ × ৬০ + ২৩ = ৮৩
৮১
২০
১৮

এখন লগ· জ্যা ৩ – ২৮ = ৮·৭৮১৫১
+ লগ. কোস্প ২৩ – ২৮ = ১০·৩৬১৩২
= লগ· স্প ৭° – ৫৬ = ৯·১৭৩৯১
এই ৭° – ৫৬′ একাদশাদির চর

এবং লগ জ্যা ৬ – ৫৫ = ৯·০৮০৭.
+ লগ· কোস্প ২৩ – ২৮ = ১০·৩৬১৩.
= লগ· স্প ১৫° – ৩০ = ৯·৪৪৩১১
এই ১৫° – ৩০′ দ্বাদশাদির চর—সুতরাং

কলিকাতা-(২২° – ৩৩″ উ.) – র চর সারিণী।

লগ্ন	দ্বাদশ ও দ্বিতীয়	একাদশ ও তৃতীয়	দশম
২২° – ৩৩′	৭° – ৫৬′	১৫° ৩০	০ – ০

ব্যাপারটা বুঝলে, কলিকাতার লগ্ন অক্ষাংশের অক্ষে, একাদশ ও তৃতীয় ৭° – ৫৬′ উত্তর অক্ষে, দশম নিরক্ষে, দ্বাদশ ও দ্বিতীয় ১৫° – ৩০ উত্তর অক্ষে, কিন্তু সপ্তম ২২° – ৩৩′ দ. চতুর্থ নিরক্ষে এবং ও নবম ৭° – ৫৬′ দ. এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম ১৫° - ৩০′ দক্ষিণ অক্ষের উপর পড়বে। রাশিচক্র বহু দূরে ব'লে ; ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুভূত হয় ও তদনুসারে চর নির্ণীত হয় মাত্র। এখন দশম কসেছ, লগ্ন ও ক'সেছ, একাদশাদির স্ব স্ব চর নিয়ে কসতে পার।

আমি। দ্বাদশটিও কসি। যদি টেবিলের সঙ্গে বেশী অনৈক্য না হয়, তাহ'লে টেবিল থেকেই লওয়া যাবে।

৩৬০। ০ – ৩০০ । ৫৭ = ৫৯ । ৩ মেষের অগ্রে
∴ লগ কোজ্যা ৫৯ । ৩ = ৯·৭০১২১
+ লগ কোস্প ১৫ । ৩০ = ১০·৫৫৭০১
= লগ কোস্প ∠ ক ২৮ । ৫৩ = ১০·২৫৮২১
+ ২৩ । ২৮
= ∠ খ ৫২ । ২১ কোজ্যা = ৯·৭৮৫৯২
লগ কোজ্যা পা. প. ∠ গ = ১০·২১৪০৮
+ লগ কোজ্যা ∠ ক ৯·৯৪২৩১
+ লগ স্প ৫৯ । ৩ = ১০·২২২০৯
= লগ স্প. দ্বাদশ ৬৭ । ১৮ = ১০·৩৭৮৪৮
∴ ৩৬০ । ০ – ৬৭ । ১৮ = ২২ । ৬১ = ৯ । ২২ । ৪১

তবে দ্বাদশ হ'লো মকরের ২২ অংশ ৪১ কলা বা ২৩ অংশ সুতরাং সারিণী ধ'রেই চক্র করি। অক্ষ ঘরে বসবো।
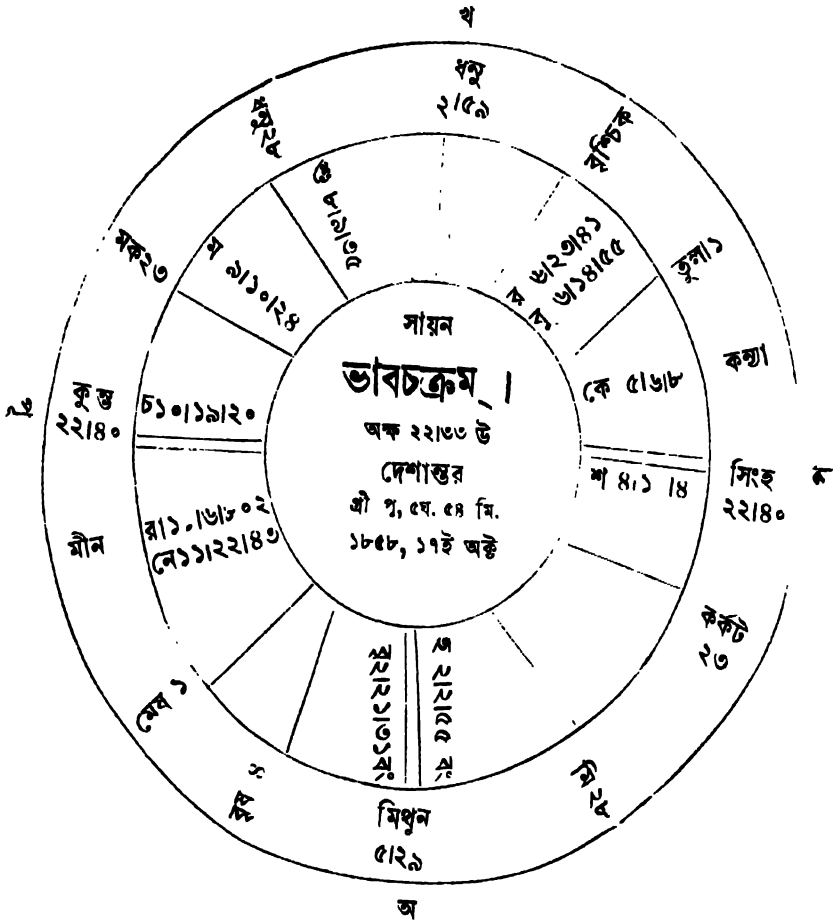
এই ত রাশি চক্র হ'লো, এখন তাৎকালিক গ্রহ নির্ণয় করি।

গুরুদেব। এখন ঐ র‍্যাফেলের পঞ্জিকা অবলম্বন করে গ্রহগুলির তাৎকালিক কর।

আমি। ২ ঘণ্টা ২০ মি. ৩৭ সেকেণ্ডের গতি যোগ করি?

গুরুদেব। তা'হ'লে ত হ'বে না। গ্রীণীচ মধ্য-মধ্যাহ্নের গ্রহ যে আমাদের দেশের ৫টা ৫৩ মি. ৩৫ সেকেণ্ডের তুল্য। আর জন্মকাল আমাদের এখানকার ২।২০।৩৭ সে. সুতরাং গ্রীণীচ মধ্যমাধ্যাহ্নিক গ্রহ হ'তে ৩ ঘণ্টা ৩৩ মিনিটের গতি বাদ দিতে হ'বে।

আমি। বুঝেছি। তাই ক'চ্চি।

১৭ই—সূর্য্য ৬।২৩।৫০
১৬ই— „ ৬।২২।৫০

গতি ১ অংশ = অ.লগ্ P.L. ১·৬৮০২
·৩ ঘ. ৩৩ = অ.লগ্ P.L. .৮২৯৯
অংশ °।০৯ = অ.লগ. P. ২·২১০১

তবেই তাৎকালিক রবি হলো সায়ন ৬।২৩.৫০— ০।০।৯ = ৬।২৩।৪১, তুলার তেইস অংশ উনচল্লিশ কলা। এখন আমি এই সায়ন রবি দিয়ে আমাদের দেশীয় রীতিতে লগ্ন করি।

গুরুদেব। কর।

আমি। সূর্য্যের ক্রান্তি ৯° – ১৫′ দক্ষিণ

স্বদেশীয় অক্ষাংশাদি ২২° – ৩৩′ উত্তর

২২° অক্ষে ৯° ক্রান্তিতে ৬।১৫
„ „ ১০° „ ৬।১৬

অন্তর ১ অংশ „ ০।১′
∴ ১৫′ „ ১৫″
∴ ২২ অক্ষে ৯।১৫ „ ৬।১৫।১৫

এবং ∴ ২৩° „ ৯°— ক্রান্তিতে ৬।১৫
২৩° „ ১০° ক্রান্তিতে ৬·১৭

অন্তর ১° „ ২′
∴ ১৫′ „ ৩০″
∴ ২৩° „ ৯।১৫ „ ৬।১৫।৩০

∴ ২৩° „ ৯।১৫ „ ৬।১৫।৩০
২২ „ „ „ ৬।১৫।১৫

অন্তর ২° „ „ „ ০।০।১৫
∴ ৩৩′ „ ০। ৮
∴ ২২।৩৩ „ ৯।১৫ „ ৬।১৫।২৩
ইহাই — উদয় কাল

১৭ই অক্টোবরের স্থূল কালসমীকরণাঙ্ক — ১৬ মিঃ
∴ ৬।১৫।২৩ — ০।১৬।০ = ৫।৫৯।২৩. উদয় কাল,
১২।০।০ — ৫।৫৯।২৩ + ২।২০।৩৭
= ৮ ঘণ্টা ২১ মি. ১৪ সে, = ২০ দণ্ড ৫৩ পল ৫ বিপল

সুতরাং শকাব্দাদি ১৭৮০।৬।১২০।৫৩ জন্ম শকাদি
২০ দণ্ড ৫৩ পল — ১২৫৩ পল
সায়ন রবি ৬।২৩.৩৯
৬ রাশি — ১৮০০ পল (পৃ. ৯৪ লগ্ন খণ্ডা দেখ)

এবং ৩০ : ২৩।৩৯ : : ৩২৮ : কত ?

২৩।৩৯ × ৩২৮
―――――――― = ২৫৯ পল,
৩০।০

অতএব ১৮০০
২৫৯
১২৫৩
―――――
৩৩১২ পল
১০ মকর ৩১১৩
―――――
বাকী ১৯৯ পল

২৫৯ : ১৯৯ :: ৩০ : কত ?

= ১৯৯ × ৩০ / ২৫৯ = ২৩। ৩

অতএব সায়ন লগ্ন মকর অতীত হয়ে ২৩ অংশ ৩ কলা
ত্রিকোণমিতি মতে ২২ „ ৪০ „
অন্তর ০ „ ২৩ „

গুরুদেব। তা ও রকম অন্তর হবে। মোটের উপর দুই মতেই কুম্ভের ২৩ অংশ বলা যায়। আবার দ্বাদশভাব উভয় মতে গণনা ক'রে তা'তে আরও অন্তর দেখতে পা'বে। এখন অন্যান্য গ্রহ গুলি কসে চক্রে বসাও।

আমি। যে আজ্ঞা।

১৭ই চন্দ্র — ১০ । ২১ । ৮
১৬ই চন্দ্র — ১০ । ৮ । ৫৭
―――――――――
অন্তর — অংশ ১২ । ১১ — অ.লগ. ‧২৯৪৫
ঘণ্টা ৩ । ৩৩ = অ.লগ. ‧৮২৯৯

ঘ ৩ । ৩৩ মিনিটের গতি ১ । ৪৮ = অ.লগ ১‧১২৪৪

∴ ১০ । ২১ । ৮ = ০ । ১ । ৪৮ = ১০ । ১৯। ২০ তাৎকালিক সায়ন চন্দ্র

তার পর নেপচুনের ৩ দিনে ৪ কলা বক্রগতি সুতরাং ১৭ই ১১ । ১২ । ৪৩ তাৎকালিক হ'লো, হর্সেলের গতি ১ দিনে ২ কলা কাজেই তাৎকালিক ২।২।৫৫ বং হ'লো ; শনির একদিনে ৪ কলা গতি সুতরাং তাৎকালিক ৭।১১।৭ হ'লো, বৃহস্পতির একদিনে এক কলা বক্রগতি সুতরাং তাৎকালিক ২।২১।৩১ বং হ'লো।

১৭ই মঙ্গল ৯।১০।৩০
১৬ই „ ৯।৯।৪৮
―――――――――
গতি ০। ০ ।৪২ = অ.লগ.১‧৫৩৬১
ঘণ্টা ৩ ।৩৩ = অ.লগ‧ ৮২৯৯
―――――――――
০ ।৬ = অ.লগ ২‧৩৬৬০

∴ ০।১০।৩০ — ০।০।৬ = ৯।১০।২৪ তাৎকালিক সায়ন মঙ্গল।

১৭ই শুক্র = ৮।৯।৪৩
১৬ই „ „ ৮।৮।৫০
―――――――――
০।০।৫৩ = অ.লগ ১.৪৩৪১
ঘণ্টা ৩।৩৩ = অ.লগ ‧৮২৯৯
―――――――――
০।০।৮ = অ.লগ ২‧২৬৪০

সর্ব্বমাত্মময়ং যস্য সদসজ্জগদীদৃশম্।
গুণাগুণময়ং তস্য কঃ প্রিয়ঃ কো নৃপাপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ
সমস্তভূতেষু সমাং সমাহিতঃ।
স্থানং পরং শাশ্বতমব্যয়ঞ্চ
পরং হি মত্বা ন পুনঃ প্রজায়তে ॥ ২৪ ॥

বেদাৎ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াশ্চ
যজ্ঞাজ্জপ্যং জ্ঞানমার্গশ্চ জপ্যাৎ।
জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন্ প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ ॥ ২৫ ॥

সমাহিতো ব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী
শুচিস্তথৈকান্তরতির্যতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাপ্নুয়াদ্যোগমিমং মহাত্মা
বিমুক্তিমাপ্নোতি ততঃ স্বযোগতঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ালর্কসংবাদে
যোগিচর্য্যানামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্ব আত্মময়		হেরে যেই জন
সদসৎ সমুদয়,
এই বিশ্ব মাঝে		কেবা প্রিয় তা'র
অপ্রিয় বা কেবা হয়। ২৩।
শুদ্ধ-বুদ্ধি হয়,		লোষ্ট্র কাঞ্চনেতে
তুল্য জ্ঞান হয় তা'র,
সর্ব্বভূতে তা'র		সমবুদ্ধি হয়,
ভেদ নাহি রহে আর।
সমাধি মগন		হ'য়ে অনুক্ষণ
করে সেই বিচরণ.
শাশ্বত অব্যয়		পদ লাভ হয়,
নাহি ঘটে আগমন। ২৪।

বেদ হ'তে সর্ব্ব যজ্ঞক্রিয়া শ্রেষ্ঠ হয়;
যজ্ঞকার্য্য হ'তে জপ শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয়,
জপ হ'তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মার্গের আশ্রয়;
জ্ঞান হ'তে ধ্যান শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয়;
সঙ্গরাগরহিত সে ধ্যান সিদ্ধ হ'লে
শাশ্বত সে পদ লাভ হয় অবহেলে। ২৫।
যেই জন সমাহিত, ব্রহ্মপরায়ণ,
অপ্রমাদী, সুপবিত্র, ঐকান্তিক মন,
অনুরাগী, জিতেন্দ্রিয় যোগী সুনিশ্চয়
আত্মযোগযুক্ত হ'য়ে সদা মুক্ত হয়। ২৬।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়-অলর্ক সম্বাদে
যোগিচর্য্যানামক একচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

এবং যো বর্ত্ততে যোগী সম্যগ্‌যোগব্যবস্থিতঃ।
ন স ব্যাবর্ত্তিতুং শক্যো জন্মান্তরশতৈরপি ॥ ১ ॥
দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্ ॥ ২ ॥
তৎপ্রাপ্তয়ে মহৎ পুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ।
তদেবাধ্যয়নং তস্য স্বরূপং শৃণ্বতঃ পরম্ ॥ ৩ ॥
অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্।
এতাস্তিস্রঃস্মৃতা মাত্রাঃ সাত্ত্ব-রাজস-তামসাঃ ॥ ৪
নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।
গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া।
পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধি লক্ষ্যতে ॥ ৫

বলিলেন দত্তাত্রেয় "শুনহ, রাজন,
এরূপে যে যোগী করে যোগ আচরণ,
বিবর্ত্তিত হ'তে শক্ত কভু সেই নয়
শত জন্মান্তর যদি ঘটে সুনিশ্চয়। ১।
বিশ্বরূপ, বিশ্ব-পাদ-শিরোগ্রীব-আর
বিশ্বেশ বিশ্বভাবন বিভু সারাৎসার
পরম-আত্মায় সেই প্রত্যক্ষ করিয়া
মুক্তিভাগী হয় সত্য নিশ্চয় জানিয়া। ২
তাঁহারে পাইতে তা'র পুণ্যময় নাম
"প্রণব" সে একাক্ষর জপে অবিরাম।
অধ্যয়ন তাহা বিনা নাহি কিছু আর,
শুন এবে বলি আমি স্বরূপ তাঁহার। ৩।
অ-কার উ-কার আর ম-কার মিলনে,
প্রণব উৎপন্ন; বিশ্বে জানে সর্ব্ব জনে।
এই তিন সত্ত্ব রজঃ আর তমোময়,
ত্রিমাত্র প্রণব বলি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ৪।
তিনের পরেতে এক অর্দ্ধ মাত্রা আর
নির্গুণ, যোগীর গম্য স্বরূপ তাহার।
সবার উপরে অর্দ্ধ মাত্রা স্থিত হয়,
গান্ধার তাহার স্বর জানিহ নিশ্চয়,
এ হেতু গান্ধারী নামে খ্যাত চরাচরে,
পিপীলিকা গতি স্পর্শে মাথার উপরে। ৫

যথা প্রযুক্ত ওঙ্কারঃ প্রতিনির্যাতি মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরে ভবেৎ ॥ ৬ ॥
প্রাণো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম বেধ্যমনুত্তমম্।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥
ওমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা হরশ্চৈব ঋক্‌সামানি যজূংষি চ ॥ ৮ ॥
মাত্রাঃ সার্দ্ধাশ্চ তিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তস্তু যো যোগী স তল্লয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্প্যতে ॥ ১০ ॥
ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞিতা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্ ॥ ১১
অনেনৈব ক্রমেণৈতা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ।
ওমিত্যুচ্চারণাৎ সর্ব্বং গৃহীতং সদসদ্ভবেৎ ॥ ১২ ॥

যথাযথ প্রযুক্ত প্রণব, সুনিশ্চয়
মূর্দ্ধাস্থানে যে সময় প্রতিগত হয়,
প্রণব স্বরূপ পান যোগী সে সময়,
অক্ষর সহায়ে হন অক্ষর নিশ্চয়। ৬।
প্রাণ ধনু শর আত্মা ব্রহ্ম বেধ্য তা'র
অপ্রমত্ত হয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ অনিবার।
তন্ময় হইয়া কর শরের সন্ধান,
ইষ্ট লাভ হ'বে ইথে কভু নহে আন। ৭।
প্রণবের তিন মাত্রা তিন বেদ হয়
ঋক্ সাম আর যজুঃ জানিহ নিশ্চয়।
তিন অগ্নি, তিন লোক স্বরূপ তাহার
বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব তিন সন্দেহ কি তা'র। ৮

পরমার্থ সার্দ্ধ তিন মাত্রা সে প্রণব;
যাহা হ'তে সমুদ্ভূত এই বিশ্ব সব।
তাহে যুক্ত হন যোগী যিনি সুনিশ্চয়,
অন্তে সেই প্রণবেতে হইবেন লয়। ৯।
অ-কার ভূর্লোক, ভুবর্লোক সে উ-কার
ম-কার সে স্বর্লোক কি সন্দেহ তা'র। ১০।
ব্যক্ত সে প্রথম মাত্রা অব্যক্ত দ্বিতীয়া,
চিচ্ছক্তি তাহাতে হন মাত্রা সে তৃতীয়া,
অর্দ্ধমাত্রা সে পরম পদ সুনিশ্চয়,
মুনিগণ এই তত্ত্ব করিলা নির্ণয়। ১১।
সেই ক্রমে যোগভূমি স্বরূপ ইহার
জানিবে নিশ্চয় ইথে সন্ধ নাহি আর।

হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা।
তৃতীয়া চ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরা ॥ ১৩ ॥
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥ ১৪ ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্তত্রিবিধবন্ধনঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি লয়ং পরমে পরমাত্মনি ॥ ১৫ ॥
অক্ষীণকর্ম্মবন্ধশ্চ জ্ঞাত্বা মৃত্যুমরিষ্টতঃ।
উৎক্রান্তিকালে সংস্মৃত্য পুনর্যোগিত্বমৃচ্ছতি ॥ ১৬ ॥
তস্মাদসিদ্ধযোগেন সিদ্ধযোগেন বা পুনঃ।
জ্ঞেয়ান্যরিষ্টানি সদা যেনোৎক্রান্তৌ ন সীদতি ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ালর্কসম্বাদে যোগশাস্ত্রে ওঙ্কারস্বরূপকথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রণব উচ্চারে সদসৎ সমুদয়
গৃহীত হ'য়েছে, ইহা জানিও নিশ্চয়। ১২।
আদ্য মাত্রা হ্রস্বা জানি, দীর্ঘ সে দ্বিতীয়া,
প্লুতরূপা জানি তাহে মাত্রা সে তৃতীয়া;
অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপ বর্ণিতে সাধ্য কা'র ?
কাহারো গোচর নয় জেনো ইহা সার। ১৩।
ওঙ্কার সংজ্ঞিত এই মহাবর্ণবর
অক্ষর পরম ব্রহ্ম সকলের পর;
যেই নর জানে ইহা সম্যক প্রকারে,
ধ্যান করে নিরন্তর অন্তর মাঝারে। ১৪।
এড়ায়ে সংসার-চক্র সেই মহাজন,
ত্রিবিধ বন্ধনমুক্ত, শাস্ত্রের বচন,
ব্রহ্মে লীন হয়, ইথে নাহিক সংশয়,
সাযুজ্য পরম-পরমাত্মা সনে হয়। ১৫।
কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন নাহি হইতে যাঁহার
অরিষ্টের বশে মৃত্যু হয় একবার,
উৎক্রান্তির কালে, ইহা করিয়া স্মরণ,
যোগী হ'য়ে জন্মিবেন পুনঃ সেই জন। ১৬।
সিদ্ধ বা অসিদ্ধ যোগী এই সে কারণে;
অরিষ্ট জানিবে নিজ উৎক্রান্তি কারণে,
উৎক্রান্তির কালে আর, তা'হ'লে তাঁহার
অবসাদ আসি নাহি রোধিবেক আর। ১৭।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ালর্কসম্বাদে যোগশাস্ত্রে ওঙ্কার স্বরূপ বর্ণন নামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

দত্তাত্রেয় উবাচ ।

অরিষ্টানি মহারাজ শৃণু বক্ষ্যামি তানি তে ।
যেষামালোকনান্মৃত্যুং নিজং জানাতি যোগবিৎ ॥ ১ ॥
দেবমার্গং ধ্রুবং শুক্রং সোমচ্ছায়ামরুন্ধতীম্ ।
যো ন পশ্যেন্ন জীবেৎ স নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥ ২ ॥
অরশ্মি বিম্বং সূর্য্যস্য বহ্নিং চৈবাংশুমালিনম্ ।
দৃষ্ট্বৈকাদশমাসাত্তু নরো-নোর্দ্ধন্তু জীবতি ॥ ৩ ॥
বান্তে মূত্রপুরীষে চ যঃ স্বর্ণং রজতং তথা ।
প্রত্যক্ষং কুরুতে স্বপ্নে জীবেৎ স দশমাসকম্ ॥ ৪ ॥
দৃষ্ট্বা প্রেতপিশাচাদীন্ গন্ধর্ব্বনগরাণি চ ।
সুবর্ণবর্ণান্ বৃক্ষাংশ্চ নব মাসান্ স জীবতি ॥ ৫ ॥
স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলো যোহকস্মাদেব জায়তে ।
প্রকৃতেশ্চ নিবর্ত্তেত তস্যায়ুশ্চাষ্টমাসিকম্ ॥ ৬ ॥

বলিলেন দত্তাত্রেয় "যাহাতে হইবে শ্রেয়ঃ
নরনাথ করহ শ্রবণ,
বলিব অরিষ্টচয় যা'র দর্শনেতে হয়
যোগী জ্ঞাত আপন মরণ। ১।
দেবমার্গ, ধ্রুব আর, শুক্র, সোম গ্রহাকার
নিজ ছায়া, অরুন্ধতী আর,
যেবা না দেখিতে পায় সম্বৎসর আর তা'য়
বাঁচিতে হ'বে না ইহা সার।
সূর্য্যবিম্ব রশ্মিহীন দেখে যেবা কোন দিন
অংশুমালী দেখে যে অনল,
তা'র প্রাণ সুনিশ্চয় অচিরে হইবে ক্ষয়
একাদশ মাস মাত্র বল। ৩।

স্বপ্নে যদি কোন জন করে হেন দরশন
মূত্র, বিষ্ঠা, বমনে তাহার,
আছে স্বর্ণ, রৌপ্য আর, নিশ্চয় জানিহ তা'র
দশ মাস নাহি হ'বে পার। ৪।
যদি দেখে প্রেত আর পিশাচাদি ঘোরাকার
দেখে কিম্বা গন্ধর্ব্বনগর,
স্বর্ণ-বর্ণ বৃক্ষ দেখে তবে সেই দিন থেকে
নয় মাসে জীবন-অন্তর। ৫।
অচেষ্টায় স্থূল জন কৃশ হয় যেইক্ষণ
কিম্বা কৃশ হয় স্থূলকায়
অষ্টমাস অন্তে তা'র মরণ হইবে, আর
সন্দেহ নাহিক কিছু তা'য়।

খণ্ডং যস্য পদং পার্ষ্ণ্যাং পাদস্যাগ্রে চ বা ভবেৎ।
পাংশুকর্দ্দময়োর্মধ্যে সপ্তমাসান্ স জীবতি ॥ ৭ ॥
গৃধ্রঃ কপোতঃ কাকোলো বায়সো বাপি মূর্দ্ধনি।
ক্রব্যাদো বা খগো নীলঃ ষণ্মাসায়ু-প্রদর্শকঃ ॥ ৮ ॥
হন্যতে কাকপঙ্‌ক্তীভিঃ পাংশুবর্ষেণ বা নরঃ।
স্বাং ছায়ামন্যথা দৃষ্ট্বা চতুঃপঞ্চ স জীবতি ॥ ৯ ॥
অনভ্রে বিদ্যুতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাম্।
রাত্রাবিন্দ্রধনুশ্চাপি জীবিতং দিত্রিমাসিকম্ ॥ ১০ ॥
ঘৃতে তৈলে তথাদর্শে তোয়ে বা নাত্মনস্তনুম্।
যঃ পশ্যেদশিরস্কং বা মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ১১ ॥
যস্য বস্তসমো গন্ধো গাত্রে শবসমোঽপি বা।
তস্যার্দ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনো নৃপ জীবিতম্ ॥ ১২ ॥

প্রকৃতির বিপর্য্যয় সহসা যাহার হয়
তা'রো জেনো আসন্ন মরণ,
অষ্টম মাসেতে তা'র এ দেহ না রবে আর
এই দৃঢ় শাস্ত্রের বচন। ৬।
পাংশু বা কর্দ্দমে যদি পদক্ষেপে নিরবধি
পার্ষ্ণি কিম্বা পদ-অগ্র যা'র
খণ্ডিত দেখিতে পা'বে, সেই যমাগারে যা'বে
সাত মাস মাত্র বাকি তা'র। ৭।
গৃধ্র পারাবত আর কাকোল বায়স যা'র
কিম্বা নীল মাংসাশী বিহঙ্গ,
পড়িবে মস্তকে যা'র নিশ্চয় হইবে তা'র
ছয়মাসে ভবলীলা ভঙ্গ। ৮।
উড্ডীন বায়স দল পাংশু বৃষ্টি অবিরল
যেই জনে করয়ে পীড়ন,
বিপরীত হেরে ছায়া, নিশ্চয় তাহার কায়া
অচিরাত হারাবে জীবন,
চারি পাঁচ মাস আর জানিও জীবন তা'র
তা'র বেশী নাহি রবে আর.
শাস্ত্রের বচন এই ইহাতে সন্দেহ নেই
তব কাছে কহিলাম সার। ৯।
অনভ্র অম্বর গায় যদি দক্ষিণ-আশায়
দেখে কেহ বিদ্যুতের রেখা।
অথবা নিশায় হায় ইন্দ্রধনু দেখা পায়
তিন মাস আয়ু তা'র লেখা। ১০।
ঘৃতে, তৈলে কিম্বা জলে অথবা আদর্শতলে
নিজ মূর্ত্তি দেখিতে না পায়,
অথবা মস্তক শূন্য দেহ হেরে--আয়ু পূর্ণ
এক মাসে—কি সন্দেহ তা'য়। ১১।
ছাগগন্ধ দেহে যা'র কিম্বা শবগন্ধ আর
সে যোগীর জেনো সুনিশ্চয়,
অর্দ্ধ মাসে মৃত্যু হ'বে এই দেহ নাহি রবে,
শাস্ত্র বাক্যে না কর সংশয়। ১২।

যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃৎপাদমবশুষ্যতে ।
পিবতশ্চ জলং শোযো দশাহং সোঽপি জীবতি ॥ ১৩ ॥
সম্ভিন্নো মারুতো যস্য মর্ম্মস্থানানি কৃন্ততি ।
হৃষ্যতে নাম্বুসংস্পর্শাৎ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
ঋক্ষ-বানরযানস্থো গায়ন্ যো দক্ষিণাং দিশম্ ।
স্বপ্নে প্রয়াতি তস্যাপি ন মৃত্যুঃ কালমিচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
রক্তকৃষ্ণাম্বরধরা গায়ন্তী হসতী চ যম্
দক্ষিণাশাং নয়েন্নারী স্বপ্নে সোঽপি ন জীবতি ॥ ১৬ ॥
নগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে হসমানং মহাবলম্ ।
একং সংবীক্ষ্য বল্গন্তং বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
আমস্তকতলাদ্‌যস্তু নিমগ্নং পঙ্কসাগরে ।
স্বপ্নে পশ্যত্যথাত্মানং স সদ্যো ম্রিয়তে নরঃ ॥ ১৮ ॥
কেশাঙ্গারাংস্তথা ভস্ম ভুজঙ্গান্ নির্জ্জলাং নদীম্ ।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে দশাহাত্তু মৃত্যুরেকাদশে দিনে ॥ ১৯ ॥

স্নান মাত্রে যে জনার　　হৃদয় চরণ আর
　　জলহীন হ'য়ে শুষ্ক হয়,
জল পানে তৃষ্ণা যা'র　　দূর নাহি হয় তা'র
　　দশাহে জীবন শেষ হয়। ১৩।
মরুৎ হ'য়ে সংভিন্ন　　মর্ম্ম-স্থান করি' ছিন্ন
　　বাহিরেতে করে আগমন,
জলস্পর্শে যেই জন　　তৃপ্ত নহে কদাচন
　　জেনো তা'র নিকট মরণ। ১৪।
স্বপ্নে যদি কোন জন　　করে হেন দরশন
　　চড়ি ঋক্ষ-বানরের যানে,
করিতে করিতে গান　　দাক্ষণে করে প্রয়াণ
　　মৃত্যু তা'র বিলম্ব না মানে। ১৫।
স্বপ্নে যদি কোন জন　　করে নারী দরশন
　　রক্ত কিম্বা কৃষ্ণাম্বরধরা,
হাসিয়া, গাহিয়া গান　　আসি' তা'র সন্নিধান
　　দক্ষিণেতে লয়ে যায় ত্বরা,
সেই জন হয় নিশ্চয়　　অচিরেতে মৃত হয়,
　　দেহ তা'র না রহে নিশ্চয়.
শাস্ত্রের বচন এই　　ইহাতে সন্দেহ নেই
　　মনে রেখো এই সমুদয়। ১৬।
নগ্ন ক্ষপণক একা,　　স্বপ্নে যদি যায় দেখা
　　মহাবল হাসি' হাসি' যায়,
তা'হ'লে নিশ্চয় তা'র　　জীবন নাহিক আর
　　মৃত্যু তা'র হ'বে অচিরায়। ১৭।
যদি স্বপ্নে দেখে কেহ　　আমস্তক নিজ দেহ
　　নিমগ্ন রয়েছে পঙ্কসরে,
সদ্য মৃত্যু হ'বে তা'র　　সন্দেহ নাহিক আর
　　অচিরায় যা'বে যমঘরে। ১৮।
কেশ, কি অঙ্গার আর,　　ভস্ম সর্প ঘোরাকার
　　আর নদী শুষ্ক জলহীন,
স্বপ্নে দেখে যেই জন,　　না র'বে তা'র জীবন;
　　র'বে দশ-একাদশ দিন। ১৯।

করালৈর্বিকটৈঃ কৃষ্ণৈঃ পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সদ্যো মৃত্যুং লভেন্নরঃ ॥ ২০ ॥
সূর্য্যোদয়ে যস্য শিবা ক্রোশন্তী যাতি সম্মুখম্।
বিপরীতং পরীতং বা স সদ্যো মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥ ২১ ॥
যস্য বৈ ভুক্তমাত্রস্য হৃদয়ং বাধতে ক্ষুধা।
জায়তে দন্তঘর্ষশ্চ স গতায়ুর্ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥
দীপগন্ধং ন যো বেত্তি এস্যত্যহ্নি তথা নিশি।
নাত্মানং পরনেত্রস্থং বীক্ষতে ন স জীবতি ॥ ২৩ ॥
শক্রায়ুধঞ্চার্দ্ধরাত্রে দিবা গ্রহগণং তথা।
দৃষ্ট্বা মন্যেত সংক্ষীণমাত্মজীবিতমাত্মবিৎ ॥ ২৪ ॥
নাসিকা বক্রতামেতি কর্ণয়োর্নমনোন্নতী।
নেত্রঞ্চ বামং স্রবতি যস্য তস্যায়ুরুদ্গতম্ ॥ ২৫ ॥

উদ্যতাস্ত্র ল'য়ে করে বিকট করাল নরে
পাষাণে তাড়িত করে তা'য়,
হেন স্বপ্ন দেখে যেই তাহার জীবন নেই
অচিরায় যমঘরে যায়। ২০।

তপন-উদয়-কালে শিবা ডাকি এককালে
সম্মুখেতে পশ্চাতে বা আর,
কিম্বা চারিধারে যা'র, নিশ্চয় জানিও তা'র
যেতে হ'বে শমনের দ্বার। ২১।

ভুক্ত মাত্র ক্ষুধা যা'য় পীড়িত করয়ে হায়!
দন্ত-ঘর্ষ হইবে যাহার,
সে জন গতায়ু হায় ত্বরা যমদ্বারে যায়
তা'র আর নাহিক নিস্তার। ২২।

দীপগন্ধজ্ঞান যা'র নাহি আর, জেনো তা'র
আয়ুঃকাল গেছে ফুরাইয়ে,
দিবানিশি যেইজন সতত সভয় মন
সে জন না রহিবে বাঁচিয়ে,
আত্মদেহ যেইজন পরনেত্রে দরশন
যত্ন করি' করিতে না পায়,
সেই নর অচিরায় যমের আগারে যায়
সন্দেহ নাহিক কিছু তা'য়। ২৩।

ইন্দ্রায়ুধ যেই জন অর্দ্ধ রাত্রে দরশন
করে শূন্যে আকাশের গায়
দিনে দেখে গ্রহগণ আত্মবিৎ সেইজন
জানে প্রাণ ত্যজিবে তাহায়। ২৪।

নাসিকা বাঁকিয়ে যায়, কর্ণ নতোন্নত তায়,
বামনেত্রে বহে অশ্রুধার,
যে জনার এই দশা প্রাণে তা'র নাহি আশা
যায় সেই কৃতান্ত-আগার। ২৫।

সঙ্গীতাচার্য্য

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেটি, সি, আই, ই,

Press P... , Calcutta.

"মনে পড়ে সে বালকে? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রূকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরু ছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতিবিন্দু অনুভব।

* * * * *

* * * * * কত ফিরিলাম,—
কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্বছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ জড়জীবে রন্ধ্র এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?
দৃঢ়বাহু—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু দুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাফল ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা ন'লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে?
—জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।"

৺সতীশচন্দ্র রায়।

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ

আষাঢ়, ১৩২১

নবম সংখ্যা

আলোচনা

১। চরিত্র সংগঠন

আমরা বহুবার বলিয়াছি, "ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। যে লোক ব্যক্তিগতভাবে শঠ, চোর, প্রবঞ্চক, সে লোক সমাজে দুই একটা বাহিরের গুণ দেখাইয়া বড় বেশীদিন নেতৃত্ব করিতে পারে না। এক দিন না একদিন তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িবেই। তাই সমাজের কল্যাণকামনা যাঁহাদের চিত্তে সত্যসত্যই আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে চরিত্রবত্তার পরিচয় দিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের কামনার কোনই মূল্য নাই। আর নেতৃত্বপদ?—তাহার জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন নাই। যিনি

চরিত্রবান্, তিনিই তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। সাধারণ তাঁহাকে আপনিই সে পদে বৃত করিয়া লইবে।

আমরা বহুদিন ধরিয়া রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বহুদিন ধরিয়া কংগ্রেসে resolution পাশ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে দেশের আশানুরূপ মঙ্গল সাধিত হয় নাই কেন? বিজাতীয় ভাষায় কথা কহিয়াছি বলিয়াই যে এরূপ হইয়াছে, তাহা নহে। পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য, মূকমুখে ভাষা দিবার জন্য, শুষ্কহৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবার জন্য, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার জন্য, আমরা যথার্থ সেবার ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি নাই; তাহারি জন্য আমাদের জাতীয় উন্নতি পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম, "জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য আন্দোলন কখনই মিথ্যাবাদী ও কপটের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। কেবল-মাত্র কতকগুলি রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশিষ্ট মতবাদ বুঝিতে পারিলেই হইবে না, আমরা মানুষ চাই, কোন সম্প্রদায় চাই না। কোনও চরিত্রহীন ব্যক্তিকে যেন সমাজে সম্মান দেওয়া না হয়; সে রাষ্ট্রনীতিবিশারদ হইতে পারে, পণ্ডিত বক্তা হইতে পারে এবং কূটনীতিসমূহের মীমাংসা করিতে পারে; কিন্তু চরিত্রহীনের পক্ষে এ সমস্তই বৃথা। আমাদের সেবা-ধর্ম্মের আন্দোলনের মধ্যে যেন কোনরূপ অধর্ম্ম প্রবেশ না করে।"

বাস্তবিকপক্ষে আমরা কেবল এতদিন পাণ্ডিত্যের এবং বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। তাহা দ্বারা যতটুকু কার্য্য হইবার, তাহা হইয়াছে। কিন্তু সেইটুকুই আমাদের যথেষ্ট বলিয়া পরিতৃপ্ত হইলে চলিবে না। আমাদিগকে গভীরভাবে, সত্যভাবে দেশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইবে। সেবাই সেই পথের একমাত্র সহায়। পার্থিব স্বার্থের কণামাত্র ভাব হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিলে একাত্মবোধ কদাচ জাগ্রত হইবে না। বৈরাগ্য, পবিত্রতা এবং উদারতাই সেবাধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রের সাধকই যথার্থ চরিত্রবলের অধিকারী। যিনি এই চরিত্র-বলকে অবলম্বন করিয়া কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, কি সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে, কি সাহিত্যজগতে, কি ব্যবসায়ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তিনিই পদে পদে সফলতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি কোন ক্ষেত্রেই হামবড়া ভাবে অগ্রণী না হইলেও, লোকে তাঁহাকেই নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে। তিনি নেতা থাকিলে, কোন ক্ষেত্রেই "আভিজাত্য" মর্য্যাদা পরিলক্ষিত হইবে না, কারণ সর্ব্বসাধারণ তাঁহার কার্য্যকে নিজের কার্য্যই মনে করিয়া লইবে।

যতদিন আমরা এই ভাবের ভাবুক, এই ভাবের কর্ম্মী না পাইতেছি, ততদিন আমাদের বাহিরের উন্নতি কিছু কিছু সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ভিতর উন্নত হইবে না। কিন্তু আর বৃথা আড়ম্বর—বৃথা বাক্যের তুফান তুলিবার দরকার নাই। এখন প্রত্যেককে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে—যথার্থ মূলের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে।

২। সাহিত্যে জনসমাজ

সভ্যতার বিস্তারে আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম যতই উন্নত হইতে থাকে, আমরা প্রকৃতি হইতে ততই দূরে সরিয়া পড়ি। আমাদের

ওঠা বসা, খাওয়া পরা, চিন্তা, সমস্তই যেন কৃত্রিমতার নিগড় পরিতে থাকে। সরলতা আমাদের নিকটে বুদ্ধিহীনতার নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন এরূপ সভ্যতা সমাজের পক্ষে কিছুতেই মঙ্গলজনক নহে। ইহাতে সমাজের জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। সেইজন্য মাঝে মাঝে একটা রোদন শুনিতে পাই—প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া চল—মানুষের এই নিষ্ঠুর বুদ্ধির খেলা পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের এই রোদনই তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করে।

আজকাল আমাদের সাহিত্যও নানা কারণে কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রকৃত জীবনীশক্তিও লুপ্তপ্রায়। সেইজন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যিকদিগকে জনসাধারণের দিকে —স্বাভাবিকতা ও সরলতার মূল প্রস্রবণের দিকে ফিরিতে বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার কথা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আধুনিক সাহিত্য, জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বলা যায় না। কারণ প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত উকিল ব্যারিষ্টার মাষ্টার কেরাণী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙ্গালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতী, জোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।

ইহাদের ভাব ও চিন্তাই সাহিত্যের মূল প্রস্রবন। এই মূল প্রস্রবনের সঞ্জীবনী অমৃতধারা হইতে সাহিত্য, যদি বহুকাল বঞ্চিত থাকে, তবে সে সাহিত্যে কাহারও পিপাসা মিটিবে না, সে সাহিত্য অস্বাস্থ্য আনিবে, স্বাস্থ্য আনিবে না। আর সে সাহিত্যের জীবনও অধিক কালের নহে। বালুকারাশির মত কৃত্রিমতা সে সাহিত্য-ধারার গতিরোধ করিবেই এবং অচিরে বাক্যবিন্যাস ও হৃদয়হীনতার শুষ্ক মরুভূমিতে সে সাহিত্যধারা জীবন হারাইবে। পক্ষান্তরে জনসমাজ—যাহা সমাজের মর্ম্মস্থল, সাহিত্যে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিলে, জনসমাজের অভাব ও আদর্শ সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করিলে, সাহিত্য অমর হইবে। নদীর স্রোতের মত সে সাহিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমাজক্ষেত্রকে সুশ্যামল ও অনন্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে, এবং সে সাহিত্যই জাতির সমগ্র ভাবরাশিকে বিশ্বসভ্যতারূপ মহাসমুদ্রের দিকে নিশ্চিতই পৌঁছাইয়া দিবে।"

*
* *

৩। আমাদের মেলা

জনসাধারণের সহিত শিল্পাদির পরিচয় করাইবার জন্য আধুনিক উন্নত জগতকে প্রদর্শনীর সাহায্য লইতে হয়। এই প্রদর্শনীর দ্বারায় জাতি, তাহার কোন নবাবিষ্কৃত শিল্পের অথবা কোন একটী শিল্পের ক্রমোন্নতির পরিচয় দিয়া থাকে। ব্যবসা ক্ষেত্রে, শিল্প-প্রদর্শনী যতটা সাহায্য দান করে, আর কোন উপায়ে সেরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না।

সমগ্র শিল্পের একস্থানে সন্নিবেশ দেখিয়া জাতি, তাহার কোন শিল্পের অভাব, কোনটীর বহুল প্রচার, কোনটীর অধিকতর উন্নতির প্রয়োজন ঠিক করিয়া লয়। জাতীয় উন্নতির একটা চিহ্ন, শিল্পাদির উন্নতি ও তাহার বহুল প্রচার, এবং প্রদর্শনীই এ কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা দান করে। আমরাও আজকাল শিল্পাদির উন্নতিকল্পে, উন্নতজাতির নিকট হইতে, এই তথাকথিত নবাবিষ্কৃত পথটী শিক্ষা করিতে সচেষ্ট। তাই আজ আমাদের দেশেও প্রদর্শনীর এত বাহুল্য। প্রতি জেলায়, প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া শিল্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া কংগ্রেসের সহিত সমগ্র ভারত ধরিয়া একটী করিয়া মহাশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়।

এখন কথা হইতেছে প্রদর্শনীর সাহায্যে শিল্পাদির উন্নতি করা—এ পথটী আমাদের নিকট নূতন নহে। আধুনিক একজিবিশন এবং আমাদের মেলার উদ্দেশ্য প্রায় এক। তবে মেলার উদ্দেশ্য বেশী রকম কার্য্যকরী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দেশে এই মেলার সংখ্যাও বড় কম নহে। রথ, রাস, দোল, চড়ক, প্রভৃতি প্রতি পর্ব্বেই মেলার অনুষ্ঠান। এখন মেলাতে অনুষ্ঠানের ত্রুটী কিছুই নাই একমাত্র ইহার উন্নতিরই অভাব। এই মেলার দ্বারায় ব্যবসাদির সাহায্য যে বড় কম হইত বা হয় তাহাও নহে। যাঁহারা মিরাটের নওচন্দির মেলা ও যোনপুরে হরিহরছত্রের মেলার সংবাদ রাখেন তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারেন। এতাবৎ কাল আমাদের দেশে গো মহিষ অশ্ব প্রভৃতির যে ব্যবসা চলিয়াছে তাহা এই এক হরিহর ছত্রের মেলাই রক্ষা করিতেছে। আমরা আজকাল ঘোর জড়বাদী হইয়াছি, ফলে আমাদের কি আছে না আছে দেখিবার সময় পাই না। জড়বাদকেই জীবনের চরমলক্ষ্য করিয়াছি, তাই আজ জড়ের উন্নতি-কল্পে জড়বাদী যে পথ লয়, আমরাও তাহাই লইতেছি। আর আমাদের "কিছু নাই কিছু নাই" করিয়া হট্টগোল করিতেছি। ভারত কোন কালেই জড়বাদী ছিল না, এখনও নহে, তাহার চরমলক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা। তাই আধ্যাত্মিকতাকেই প্রাণস্বরূপ ধরিয়া ভারতের সমগ্র বৈষয়িক উন্নতি অগ্রসর হয়। এই কারণেই আমাদের মেলাদি ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। জড়বাদীর চক্ষে এ তথ্য লুক্কায়িত। পূর্ব্বের মেলার পথ ও অধুনিক একজিবিশন এর পথের মধ্যে কোনটী ভাল তাহাও একটু আলোচনা করিলেই ঠিক হইয়া যায়। আজকালকার একজিবিশন কতকগুলি লোকের চেষ্টা ও উৎসাহের ও অর্থের উপর নির্ভর করে। যতদিন প্রতিষ্ঠাতাগণের এই উৎসাহ ও চেষ্টা থাকে ততদিনই একজিবিশনের অস্তিত্ব। প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্তর্দ্ধানের সহিত আধুনিক একজিবিশনের ও মৃত্যু। আবার যদি কোন নব-প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব হয়, তবেই পুনঃ প্রদর্শনীর সৃষ্টি, নচেৎ সেইখানেই প্রদর্শনীর ইহলীলা শেষ। এ প্রকার অনেক জেলার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের চিরপ্রচলিত মেলার ভাগ্যে তাহা নহে,—কবে প্রতিষ্ঠিত, কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহার কিছুই জানা যায় না—অথচ সেই মেলা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে, যেন কোন একটা যন্ত্র আপনা হইতে (automatically) কাজ চালাইতেছে।—প্রমাণ সোনপুরের হরিহর ছত্র, মিরাটের নওচন্দী, চন্দননগরের গোঁসাই ঘাটের কুস্তির

মেলা, মালদহের রামকেলী ইত্যাদি এরূপ অনেক আছে। ইহাতে আধুনিক একজিবিশনের ন্যায় বড় বড় চাঁদার খাতাও নাই, দর্শকের নিকট হইতে টিকিট করিয়া খরচা তুলিবার ব্যবস্থাও নাই, এত হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারও নাই, অথচ আধুনিক একজিবিশন অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বিজ্ঞাপনের সুবিধাও বড় কম হয় না, যেহেতু দর্শকও বড় কম নহে। এখন এই মেলা গুলির উন্নতি করিয়া ইহার সাহায্যেই শিল্পাদির সহিত জনসাধারণের পরিচয় করান সোজা? না, একজিবিশন নাম দিয়া Electric light fit করিয়া এক প্রদর্শনী করা সোজা?

অবশ্য কতকগুলি শিক্ষিত লোকের পক্ষে একজিবিশনটাই সুবিধা হইতে পারে কিন্তু জনসাধারণ পূর্ব্ব প্রথানুসারে মেলাটাই অধিক বুঝে ইহা সুনিশ্চিত। আমরা এতাবৎ পাশ্চাত্যভাবে যাহা করিতে গিয়াছি, তাহাতেই জনসাধারণকে বাদ দিয়াছি। ফলে আমাদের শক্তি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। স্বাভাবিক ভাবে যাহাতে তাহার বিকাশ হয়, তজ্জন্য দেশে এখন চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। সেইজন্যই এই সময়ে জনসাধারণের সহিত আমাদের বহুদিনকার মিলনস্থলগুলি পর্য্যবেক্ষণ, পরিরক্ষণকরিতে হইবে।

ধর্ম্মের নামে যে সব মেলা এযাবৎ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, সেই গুলিকেই কেন্দ্র করিয়া আধুনিক উন্নত শিল্পের ব্যাখ্যা ও প্রচার যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে অতি শীঘ্র আরব্ধ হয়, তাহার জন্য সমাজ-হিতৈষিগণ সচেষ্ট হইবেন। তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে আমাদের প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে এবং দেশও উপকৃত হইবে।

৪। বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার সম্বন্ধে আমরা বহুদিন হইতেই আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ আমরা সাহিত্যে সংরক্ষণ নীতির অবলম্বন আধুনিক কালে একান্ত আবশ্যক মনে করি। কবিবর রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-লাভে আমরা বলিয়াছিলাম, "যে ভাষার অনুবাদ মাত্র পাইয়া জগৎ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইল, সেই ভাষা আর বেশীদিন সরকারী শিক্ষাবিভাগের বিধানে দেশবাসীর দ্বিতীয় ভাষা মাত্র থাকিবে না। বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় অত্যুচ্চ বিজ্ঞান, অত্যুচ্চ দর্শন, অত্যুচ্চ ইতিহাস রচিত হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে যাঁহারা সন্দেহ করিবেন, তাঁহারা জগতের পণ্ডিত-সমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত হইবেন। সুতরাং অল্পকালের ভিতরই দেশীয় সন্তান-সন্ততির সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। বিদেশীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিক ও জাতীয় পদবাচ্য হইয়া উঠিবে।"

সুকবি শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারী মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি কল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কিরূপে সাহিত্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাই বিস্তৃত ভাবে দেখাইয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

এতদিনে কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষা ভগবানের কৃপায় যে সকল মণিমাণিক্যাদি অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহাতে তিনি যে সহসা রাজরাণীর উজ্জ্বল সাজে সাজিয়া দেশবিদেশে—দিগ্বিদিকে নবালোক বিকসিত আপনার মহিমা-ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছেন এবং দিবালোকে জাগ্রত পাশ্চাত্য জগতে রাজরাণী বলিয়া পূজা পাইয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার অঞ্চল শয্যায় শুইয়া নিশাবসানের জাগরণ-সুখে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে সম্যক্ ধারণাও করিতে পারিতেছি না। মায়ের শ্রীঅঙ্গের নব-

জ্যোতিঃ আমাদের নিদ্রালস নয়নে লজ্জা সঞ্চার করিয়া তাহাকে অর্দ্ধস্তিমিত করিয়া দিতেছে।

আমরা জেলায় জেলায় বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি সত্য; গৌড়-রাজমালা এবং ঢাকার ইতিহাস লিখিয়াছি সত্য; কাব্য এবং সঙ্গীত রচনায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকারে যোগ্য হইয়াছি সত্য; নাট্য-সাহিত্যে এবং উপন্যাস রচনায় সকলের সাথে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অধিকারী হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমরা যা' হইতে পারি, তার তুলনায় তবু কিছুই হইতে পারি নাই ভাবিয়া আজ মন প্রাণ মুহুর্মুহুঃ বিষম বিষাদ-গ্রস্ত হইতেছে

স্বীকার করি, দেশের অনেক গণ্যমান্য এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি আজ বঙ্গভাষার সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। স্বীকার করি, কতিপয় ধনাঢ্য জমীদার অর্থ সাহায্যে মায়ের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় কয়জন? ৮ কোটী লোক যে দেশের অধিবাসী, সে দেশের সাহিত্য এইরূপ মুষ্টিমেয় লোক দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকিলে কি সাংঘাতিক লজ্জার কথা।

সাহিত্যই যে মনুষ্যত্বের লক্ষণ। পশু সমাজের সাহিত্য জ্ঞান নাই—ভাব নাই—ভাষা নাই—কাব্য-দর্শন-ইতিহাস নাই—ধর্ম্ম নাই, তাই তাহারা জীব হইয়াও নিতান্ত হেয়, নিকৃষ্ট, নগণ্য। পরমেশ্বরের সৎ চিৎ এবং আনন্দের বিকাশ এই মর্ত্ত জগতে একমাত্র সাহিত্যেই পরিলক্ষিত হয়। "কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।' অমর অর্থাৎ নিত্য—তাহাই সৎ। বেদের পরে পুরাণাদি, দর্শন উপনিষদাদি এবং রামায়ণ মহাভারতাদি—সাহিত্য। এবং তাহারা নিত্য অর্থাৎ অমর—তাহাদের রচয়িতাগণ অমর। কালিদাস পড়িবার সময় কেনা তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন? তার পরে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি কবি এবং সাহিত্যিকগণ সব সৎ। তাঁহারা যে ভাবে যা' ভাবিয়াছেন, যে ভাষায় যা' লিখিয়াছেন—সব সৎ। ভগবান্ রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদি ভগবানের পূর্ণ অবতার হইয়াও অমরতা লাভ করিতে পারিতেন না, যদি যুগে যুগে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকগণ না জন্মিতেন।

সৎ এর পর চিৎ। চিৎ কি চৈতন্য—চেতনা। যেখানে সৎ, সেখানেই চৈতন্য, অর্থাৎ জীবন—অর্থাৎ কর্ম্ম। প্রস্তর খণ্ডটি পড়িয়া আছে—সে জড়, তাহার নাই—অর্থাৎ কর্ম্ম নাই। * পিপিলিকাটি চলিয়া যাইতেছে, সে জীব—চৈতন্য আছে। কিন্তু সকলের চাইতে বেশী চৈতন্য মানব-জগতে। বিদ্যা ও জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য শক্তিদ্বারা, সাহিত্যের দ্বারা মানব একটা লোককে, অথবা যা'কে ইচ্ছা তা'কেই নিত্য পদার্থ করিয়া রাখিতেছে। কবে সোণার লঙ্কা মরিয়া গিয়াছে—অযোদ্ধাও আর নাই; কিন্তু বলিতে পারিবে, তুমি অযোদ্ধা দেখ নাই—রাবণ রাক্ষসকে কি তার স্বর্ণ লঙ্কাকে দেখ নাই? তুমি সাহিত্যিক, তুমি সব দেখিয়াছ। সেই কদমতলা, সে কুঞ্জবন, সে পঞ্চবটী, সে অশোক বনের চিহ্ন মাত্র নাই, কিন্তু তুমি মানস নেত্রে শত কোটি জন্ম পরেও আজ বসিয়া বসিয়া সে সব প্রত্যক্ষ করিতেছ। এরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছ যে জগতের প্রত্যেককে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্র পটে সুনিপুণ ভাবে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতেছ।—কেমন সুন্দর আঁকিয়াছ ঐ অশোক-বনে সীতা, ঐ শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসা মুনির দারুণ অভিশাপ—কত আঁকিয়াছ—তুলি দিয়া আঁকিয়াছ লেখনি দিয়া আঁকিয়াছ—কত করিয়াছ, কত বলিব।

সাহিত্যে সৎ চিৎ এর কথা প্রমাণ হইয়াছে; বাকী, আনন্দ, সৎ বিশেষতঃ চিৎ যেখানে, সেখানে আনন্দ বাকী থাকে না,—

* বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জড়েরও জীবন আছে। প্রকৃত পক্ষেও বিচার করিয়া দেখিলে—জড় কিছুই নাই—সকলেরই স্বভাবতঃ কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তন আছে। শাস্ত্রেও বলে, 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'। কিন্তু মানবের চিৎশক্তির তুলনায় জড়কে জীব সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। লেখক।

পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়, অতএব সাহিত্যেই মনুষ্যের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ হয়। মনুষ্যের ঈশ্বরত্বকেই নীচে নামিয়া মনুষ্যত্ব ধরিয়া লওয়া যাক্।

যদি প্রশ্ন হয়, সাহিত্য ছাড়া কি মনুষ্যত্ব হইতে পারে না, উত্তরে এক কথায় বলিব, না। ব্যক্তিগত ভাবে হইতে পারে কিন্তু জাতিগত ভাবে না। যোগী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যোগাসনে বসিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিলেন, একটা জাতির তাহাতে মনুষ্যত্ব লাভ হইবে না। তিনি জনসমাজে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাস বাল্মিকী বা কপিলাদির ন্যায় ভাষাদ্বারা আপনার মুক্তি সাধনার অভিজ্ঞতা প্রচার না করিলে সব মিথ্যা। তারপরে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই যোগী যোগাসনে বসিয়া পড়িবেন, তাহা হয় না। তাঁহাকে গভীরভাবে সাহিত্য সাধনা করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভপূর্ব্বক দেবত্ব লাভের জন্য অরণ্যে যাইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

অতএব যদি মনুষ্যত্ব চাও—জাতিকে মানুষের জাতি করিয়া তুলিতে চাও—সাহিত্য সাধনা কর—এই মহাবাক্য সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর জটিলতর সমস্যায় উপনীত হওয়া যাইতেছে।

দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। অতএব আমাদের মনুষ্যত্বের প্রমাণ বাঙ্গালা সাহিত্যেই প্রদর্শিত হইবে। এমনও একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন ইংরেজ আমাদের রাজা—ইংরেজী সাহিত্য রাজভাষা কিন্তু অজ্ঞানের খনি—এদিকে বঙ্গসাহিত্য নিতান্ত শিশু—পরাণুবাদে এবং পরকীয় ভাবেই তাহার সৃষ্টি এবং পুষ্টি—তাহাতে পড়িবার যোগ্য একখানিও নিজস্ব গ্রন্থ নাই, অতএব তদালোচনা ছাড়িয়া দাও, এমন কি তাহার প্রসঙ্গেরই প্রয়োজন নাই। ইংরেজী পড় ইংরেজী লিখ, এমন কি ইংরেজীতেই চিন্তা ও কল্পনা করিতে সুরু কর। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর লোকের প্রতি ক্রোধ না হইয়া বিশেষরূপে দয়ারই উদ্রেক হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব মোহান্ধ ব্যক্তি কখন ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান না যে, ইংরেজগণ এদেশের প্রতি দৃষ্টি করিতেই সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকেই দেখিয়াছেন এবং তাহাদিগকেই 'বাঙ্গালী জাতির শীর্ষস্থানীয় লোক মনে করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই জাতিটাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবার বিশেষ কারণ পাইয়াছেন।

আর একদল লোক আছেন, যাঁহারা আদৌ খবরই রাখেন না বাঙ্গালার একটা সাহিত্য আছে কি না। তাঁহারা আজন্ম ইংরেজী সাহিত্যেরই সেবা করিয়া আসিয়াছেন।

অবশ্য কেহ কেহ কিছু কিছু বঙ্গসাহিত্যের জন্য খাটিতেছেন, কিন্তু পরানুবাদ এবং পরানুকরণই তাঁহাদের জীবনের মূল অবলম্বন। কারণ আজন্ম কেবলি পরকীয় ভাব ও ভাষার সাধনা করিয়া করিয়া তাঁদের মন তৎতৎ ভাবেই গঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের দ্বারাও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লাভ হইবার আশা নাই। বরঞ্চ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী হয়। তাহাদের দ্বারা যে সব পুস্তক এবং মাসিক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পড়িতে বসিলে বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িতেছি—বাঙ্গালীর প্রাণের কথা পড়িতেছি বলিয়া ভুলেও মনে হয় না। কেহ জাপানের কথা—কেহ বিলাতের কথা—বিলাতি গল্প—বিলাতী অপ্রীতিকর ছবি ইত্যাদি; বেশী অনুগ্রহ হইলে কেহ কেহ মেডিকাল্ সাইন্সের বা আষ্ট্রনমির স্থান বিশেষের অনুবাদ অথবা দুইদশজন ইংরেজ বা মুসলমান ঐতিহাসিকের কথা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে করিতে ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ড লিখিয়া ঐ সব মাসিকে ছাপিতে পাঠান এমন কি গ্রন্থাদিও রচনা করিয়া থাকেন। এবং নামের সাথে ৫।৭টি A. B. C. D বসাইয়া উপাধীর নিশান উড়াইয়া দেন, আর খুব বাহবা পাইয়া থাকেন।

বাদ বাকী আর এক দল আছেন, তাঁহারা

বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম ভক্ত ও একনিষ্ঠ সাধক। তাঁহারা ইউনিভারসিটির ডিগ্রীর জন্য প্রাণপাত না করিয়াও বিশ্ব সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনাভাবে তাহা সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষার দরবারে উপস্থিত করিবার কারণ না পাইয়া সগর্ব্বে এবং সলজ্জভাবে যার ধন, মনে মনে তাকেই ফিরাইয়া দিতেছেন। অথবা তাঁহারা ডবল M. A. হইয়াও বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মাতৃভাষায় চিঠিপত্র লিখিতে কুণ্ঠা এবং অপমান বোধ করেন না। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্যই তাঁহারা আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে নিঃস্বার্থভাবে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন; প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার পূর্ব্বক দেশের লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন করিতেছেন —দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতেছেন। দেশের বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, সাগর, পাহাড়ের মধ্যে চিদানন্দময়ী পরমাপ্রকৃতিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাকে উদ্বোধিতা করিয়া কাব্যাদি রচনা করিতেছেন। কেউ চীৎকার করিয়া গাহিতেছেন,—

"সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি" কেউ প্রেমানন্দে মনে মনে গাহিতেছেন, "অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি!" আর নাচিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "আমার যে ভাই, তারা সবাই, তোমার চাষা, তোমার চাষী।" কেউ দেখিতেছেন "নোনা আতার সোণার গায়ে রবির কিরণ পিছলে পড়ে।" কেউ মায়ের রূপে দিশেহারা হইয়া বলিতেছেন, "বাঁশ-বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ।" আর 'শোলক-বলা কাঁজলা দিদির' কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেউ নিমের ফুলের প্রাণমাতান গন্ধ আবিষ্কার করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন—কেউ ঝোপে ঝাড়ের মধ্য হইতে লেবুফুলের গন্ধ পাইয়া পাগলের মত সারারাত জাগিয়া কাটাইতেছেন। কেউ আমের মুকুলের গন্ধে বিধুর হইয়া উঠিয়াছেন—ইত্যাদি, কত বলিব? এঁরাই বঙ্গজননীর বুকের সন্তান—বঙ্গভাষার প্রকৃত সেবক। ইহারা সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী মায়ের অঙ্গের যে দিকেই চাহিয়া দেখিতেছেন, সেই দিকেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকেন, আর বলেন, চাই যে দিকে, চেয়েই থাকি। মায়ের শব্দে, স্পর্শে, রূপে রসে, গন্ধে মাতিয়া যাইয়া মাকেই ইঁহারা প্রাণ-মন-আত্মা, ধন-মান সব সমর্পণ করিয়া ভাবোন্মত্তভাবে গাহিতেছেন, "জননী বঙ্গ ভাষায়ে জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান।" আর বলিতেছেন,—"তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।" ইঁহারা প্রাণে প্রাণে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে বাঙ্গালাভাষা আর কিছুই নয়, ইঁহাদের প্রাণের স্পন্দন, বাঙ্গালার মাটিই ইঁহাদের প্রাণ। ইঁহাদেরই সাধনার ফলে আজ বাঙ্গালাভাষা পৃথিবীর মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

কিন্তু ভাবিলে দুঃখ ও বিস্ময় রাখিবার স্থান নাই যে দেশের শিক্ষিত লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আমরা আজ এই সাহিত্যিকের সংখ্যা বৃদ্ধির দুই চারিটি নির্দ্দেশ করিব। পাঠক দয়া করিয়া আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন।

আমাদের বর্ত্তমান ভাইস্ চেন্সেলর মহোদয় সুধীসমাজের বরেণ্য এবং বাঙ্গালাভাষার একনিষ্ঠ সাধক। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদিগকে ধরিয়া পরিয়া বাঙ্গালাভাষার একটু উন্নতিসাধনের বন্দোবস্ত করিয়া লন, তাহা হইলে আজ না হয়, কাল, অবশ্য আমাদের আশা ফলবতী হইবে। মহাত্মা শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ বাঙ্গালাতে লিখিয়া ইতিহাস পরীক্ষা দিতে পারে। মহামান্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় বি, এ ক্লাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা compulsory হইয়াছে। তাহাতে দেশের লোক শতকরা দশজনের স্থানে বিশজন বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। এবার যদি এম, এ ক্লাসেও সম্ভবপর হইলে বাঙ্গালা compulsory, অন্যথায় সংস্কৃত লইয়া যেরূপ এম্ এ পাশ করা যায়, সেইরূপ বাঙ্গালা লইয়াও এম, এ ডিগ্রীলাভের বন্দোবস্ত,

অথবা অন্য যে প্রকার হওয়া উচিত, তাহাই করিয়া কলেজে ইংরেজী এবং সংস্কৃত প্রফেসরের ন্যায় বাঙ্গালার প্রফেসর নিযুক্ত করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ করান যায়, তবে দেশের একটা মহাকল্যাণের পথ উন্মুক্ত করা হইবে। বাঙ্গালা compulsory করিয়াও প্রফেসরের অভাবে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বাঙ্গালা জ্ঞান লাভ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। রবিবাবুর কবিতা এবং সঙ্গীতাবলী, বঙ্কিমের উপন্যাস ও বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে এমন সব নিগূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, যাহা নিজে নিজে চেষ্টা এবং কষ্ট করিয়া বুঝিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তি শিক্ষার্থীদের নাই, এবং হইতেও পারে না। এম, এ ক্লাসের ছাত্রগণও সে সকল তত্ত্ব, যাহা ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বই নিকৃষ্ট নয়, কিছুতেই প্রকৃতভাবে উপযুক্ত ব্যক্তির বক্তৃতা ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। তারপরে, ইউনিভারসিটির কর্তৃপক্ষ দয়া করিয়া একটা বিধিবন্দোবস্ত না করিলে এম, এ ক্লাসের ছাত্রগণ কখনও বাঙ্গালাভাষা পড়িয়া লিখিয়া সময় নষ্ট করিবে, এরূপ কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। বাঙ্গালাভাষা এবং সাহিত্য প্রচারের আমরা এই এক পথ দেখিতেছি। অন্য পথ হাই স্কুলের বাঙ্গালা শিক্ষকদের মাহিয়ানা উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সুকুমারমতি ছাত্রদিগকে বিশেষরূপে বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী করা। আজকাল উক্ত বিদ্যালয়সমূহে একমাত্র ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না—সংস্কৃত নাম মাত্র—বাঙ্গালা আরো কম—না বলিলেই ঠিক হয়।

এদিকে বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা হইলেও মুখের কথায়ই আয়ত্ত করিবার নহে এবং উক্ত সাহিত্যে যে সব সুদুর্লভ রত্নরাশি বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে নিহিত রহিয়াছে, তাহাও গভীর একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া তবে লাভ করিতে হইবে, আমি একদিন প্রায় ৫০ বৎসর বয়স্ক এক প্রবীন সাহিত্যরথীর নিকট বঙ্গভাষা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালাভাষা কি শিখিবে বাছা, আমি বি, এ পাশ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আশৈশব মাতৃভাষারই ভক্ত ছিলাম ৩০।৪০ বৎসর দলাদলি এবং কোলাহলের আড়ালে বসিয়া একনিষ্ঠ ভাবে বঙ্গভাষার সাধনা করিয়াছি, তবু কূলে পৌঁছিতে পারিলাম না—এ একটা পারাবার! আজো মনে হয় বাঙ্গালা কিছুই জানি না—মনে যা' ভাবি তা' ঠিক করিয়া লিখিতে পারি না।' আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁর রচনাশক্তি অসাধারণ এবং অসীম। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ এত লিখিয়া এত সম্পদ দান করিয়াও সেদিন 'নব্যভারতে' লিখিয়াছেন,—

"মেট্রিকুলেশন ক্লাসে যিনি ইংরেজী পড়াইবেন তাঁহার প্রকৃত বিদ্যাজ্ঞান অপেক্ষা ঐ ক্লাসে যিনি বাঙ্গালা পড়াইবেন, তাঁহার বিদ্যাজ্ঞান কোনও অংশে কম হইয়া থাকে, তাহা আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে পারি না। ভাষা কোনোটাই কম নহে। প্রকৃত ভাবে ভাষা শিক্ষা করিতে কাহারো কম যত্ন, কম কষ্ট করিতে হয় নাই। এমতাবস্থায় বাঙ্গালার শিক্ষক বেচারীর ১৫৲।২০৲ টাকা আর ইংরেজী শিক্ষক মহাশয়ের ২০০৲।২৫০৲ শত পর্য্যন্ত বেতন—এত দিন রাত্রি প্রভেদ কেন হয়? বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসাহিত্যের প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা অবহেলাই কি একমাত্র ইহার কারণ নহে? ছেলেরা শিক্ষক বেচারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া স্বতঃই মনে করে বাঙ্গালারও এমনি দুর্দ্দশা—ওটা কিছুই নয়। শৈশব হইতেই যদি এইরূপে বাঙ্গালার প্রতি অবহেলার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা বাঙ্গালা ভাষার বিদ্বেষ্টা হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি দেশের এই ভাষাটার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া দয়াপূর্ব্বক ইহার উন্নতিবিধানে একটু মনঃসংযোগ করেন এবং উপযুক্ত সাহিত্যিক লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মাহিয়ানা উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি করিবার একটা বিধান করিয়া দেন, তাহা হইলে স্কুল হইতেই বাঙ্গালার প্রতি ছেলেরা যাহাতে অনুরাগী

হইতে পারে তাহার একটা বিশেষ উপায় হইবে।

এদিকে ইংরেজীতে উপাধী পরীক্ষা আছে—সংস্কৃতে আছে—বাঙ্গালাতে কি হইতে পারে না? সেও একটা কম আলোচনার বিষয় নহে। এবং আমাদের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চিন্তা করিতে প্রথমেই শিক্ষকদের উপযোগীতা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আসিয়া পড়িবে। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের বাঙ্গালার শিক্ষক এবং এম্. এ ক্লাসের বাঙ্গালার প্রফেসার গুণের যথেষ্ট তারতম্য থাকিবে। তাহা যাহাতে সহজেই পরিমাপ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য একটা বন্দোবস্ত কি করা উচিত, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা এখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে এম, এ ক্লাসেরও বাঙ্গালার প্রফেসর নিযুক্ত হইতে পারেন এমন অনেক লোক এখনো আমাদের কবি এবং সাহিত্যিকদের মধ্য হইতে সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়।

আমরা আমাদের চেন্সেলর বাহাদুর, বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল এবং ভাইস্ চেন্সেলর বাহাদুরদিগকে সবিনয়ে আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

উপসংহারে আমাদের প্রবন্ধের সারাংশটুকু পুনরুক্তি করিতেছি।

(১) সাহিত্যেই একমাত্র মানবের মনুষ্যত্বের সাধনা হইয়া থাকে। অতএব উন্নতিশীল ব্যক্তিমাত্রকেই সাহিত্যানুরাগী হইতে হইবে।

(২) এবং একটা জাতির বা দেশের উন্নতি করিতে হইলে সেই জাতিকে তাহার সাহিত্য সাধনার সফলতা লাভ করিতে হইবে। দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে। আমরা বাঙ্গালী; বাঙ্গালাভাষা আর কিছুই নয়, আমাদের প্রাণেরি স্পন্দন—বাঙ্গালা ভাষার যত অবনতি, আমাদের তত নির্জ্জীবতা অবধার্য্য। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের যতদূর সম্ভব উন্নতি কামনায় বর্ত্তমান যুগে জীবন উৎসর্গ করিয়া মনুষ্যত্বের সাধনায় নিযুক্ত হওয়া।

(৩) আর তদুদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সফলতা লাভ করিতে হইলে, কলেজ সমূহের এম্, এ ক্লাসেও বঙ্গসাহিত্যের একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করা এবং বিশেষরূপে পাঠ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত বঙ্গ কবি অথবা সাহিত্যিক প্রভৃতিকে বাঙ্গালার প্রফেসর নিযুক্ত করা। আর স্কুল-সমূহের বাঙ্গালা শিক্ষকগণেরও বেতন উপযুক্তরূপে বৃদ্ধিপূর্ব্বক উক্তপদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া ইংরেজীর ন্যায় বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচারের পথ মুক্তকরা এবং তাহার গৌরব ও তৎপ্রতি দেশের ছাত্রদের অনুরাগ বর্দ্ধিত করা। দেশের সাহিত্যরথী মহারথী মহাশয়দের এজন্য আবেদন নিবেদন ও আলোচনা আন্দোলন করা উচিত।"

* *
*

৫। জাতীয় শিক্ষা

বিলাত যাইবার পূর্ব্বে—শ্রীমতী আনি বেসান্ত আমাদের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ সারাংশ নিম্নে প্রদান করিতেছি।—

শিক্ষাকে চারি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ সাহিত্যবিষয়ক, শিক্ষাদান, শাসন, এবং গবর্ণমেন্টের চাকুরীর জন্য ইহার আবশ্যকতা অনুভব হয়। দ্বিতীয়তঃ টেক্নি-ক্যাল; তৃতীয়তঃ—স্ত্রী শিক্ষা, ইহা বর্ত্তমানে অনাদৃত হইলেও ইহার দরকার বড় বেশী। চতুর্থতঃ জনসমাজের শিক্ষা। ইহাতে জন-সাধারণ জাতীয় উন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ বিষয়ে একযোগে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

প্রথমটির সম্বন্ধে বক্তা একটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করেন। ভারতীয় বিষয়গুলিই ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে—অন্য-দেশীয় বিষয়গুলির স্থান এখানে দ্বিতীয়। ভারতসন্তানকে ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দিতে হইবে। পাশ্চাত্য দর্শন তাহাদের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য,

কিন্তু তাহা আজকালকার ন্যায় মুখ্যস্থান পাইতে পারিবে না। আজকাল ভারতে যেরূপভাবে ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার মত শুষ্ক, অমধুর এবং অনুৎসাহকর আর কিছুই হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতীয় সন্তান ভারতের বীরদিগের নিকট হইতে যতখানি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, ইংরাজবীরদিগের নিকট হইতে ততখানি কিছুতেই পারে না। সেই জন্য, ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ইতিহাস তাহাদিগকে নিজেই লিখিতে হইবে। সে সব ব্যক্তি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন—ভারতের মহত্বসৃষ্টির মধ্যে তাঁহাদের বহুল প্রয়াস আছে। ইংলণ্ড যেমন তাহার নিজের ইতিহাস নিজে লিখিয়াছে, তেমনি তাহাদিগকেও তাহাদের নিজের ইতিহাস লিখিতে হইবে। প্রত্যেক হিন্দু আকবরকে ভাল বাসিবেন, প্রত্যেক মুসলমান শিবজীকে ভাল বাসিবেন; তাঁহারা সব সময় মনে রাখিবেন, বৈচিত্র্যের মধ্য হইতেই একটি জাতি সংগঠিত হইয়া আসিতেছিল, এবং সেই জন্য অতীতের কর্ম্মীদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে হইবে।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাসম্বন্ধে বক্তার মত এই যে যদি বালকদিগকে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে কোন কাজ না দেওয়া যায়, তবে এ শিক্ষা দেওয়া ভাল নহে। অনেক ছাত্রই বিদেশে গিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা কোন কাজই পান নাই। ইহাতে মনে হয় দেশের ধনী বা রাজন্যবৃন্দ তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না। তাঁহারা অনেক সময় সমশিক্ষিত দেশভ্রাতার পরিবর্ত্তে বিদেশীয় একজনকে কার্য্য প্রদান করেন, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আশা করা যায়, তাঁহারা এই লজ্জা হইতে দূরে থাকিবেন, তাঁহারা শিক্ষিত স্বদেশবাসীকে কার্য্য দিতে ভুলিবেন না।

স্ত্রীশিক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন, প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ইহা ভারতবর্ষে অনাদৃত হইতেছে। ইহাকে প্রচার করিতে হইলে ভারতবাসীদিগকে সংঘ সংগঠন করিতে হইবে—শিক্ষায় ভারতকে সর্ব্ব প্রথম করিয়া তুলিতে হইবে—ভারতবর্ষকে একটি জাতির ভারতবর্ষ করিয়া গড়িতে হইবে।

জনসমাজের শিক্ষাসম্বন্ধে বক্তার মত এই যে সর্ব্বপ্রথম পঞ্চায়েৎ প্রথাকে আবার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক এবং সমবায় নীতিতে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ছাত্রের জীবনের অন্যান্য সাধারণ জিনিষের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাটাও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এখানে সাহিত্যকে প্রধান স্থান না দিয়া হাতের কাজ, চাষ বাস প্রভৃতিই বেশী শিক্ষা দিতে হইবে।

* *
*

৭। রুশিয়ায় সমবায় সমিতি

অনেকেই বোধ হয় জানেন না রুশিয়ায় সমবায়-সমিতির সংখ্যা বড় কম নহে। পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র জার্ম্মানির নীচেই তাহার স্থান।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম রুশিয়ায় সমবায় আন্দোলন আরব্ধ হয়। তখন কেবল কতকগুলি ঋণ-দান সমিতি, সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপিত হয়। কিন্তু বিগত দশবৎসরের মধ্যেই সমবায়ের সর্ব্ববিধ শাখায় প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে প্রায় ১২,৫০০ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ৭,৫০০ ডিষ্ট্রীবিউটিভ সোসাইটী, ৪৯০০ কৃষি সমিতি, খাদ্য-উৎপাদনের জন্য ৬০০ সমবায় সমিতি, ৫০০ ধর্ম্মগোলা, এবং ২,৫০০ দুগ্ধভাণ্ডার পরিলক্ষিত হয়।

এইরূপ অদ্ভুত উন্নতির বহুবিধ কারণ আছে নিঃসন্দেহে বলা যায়, রুশিয়ার শ্রমজীবিসম্প্রদায়, বিশেষতঃ কৃষক সমূহ তাহাদের নিজেদের কল্যাণ সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে স্বাবলম্বনের মূল্য কি। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত মাথাওয়ালা লোক

আছেন, তাঁহাদের চেষ্টাতেই বিভিন্ন বিভিন্ন সমবায় স্থাপিত হইতে পারিয়াছে। ইহারা না থাকিলে নিম্নশ্রেণীরা এত সহজে উদ্বুদ্ধ হইত কি না সন্দেহ। তারপর শাসক-সম্প্রদায়ও সমবায়ের আবশ্যকতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার উন্নতির জন্য বিগত দশবৎসর যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সাহায্যেও বহুতর সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য সমবায়-সম্বন্ধে তাঁহারা অনেকগুলি নিয়ম-কানুনও সংগঠিত করিয়াছেন।

* *
*

৮। স্বাস্থ্যহীনতার হেতু

"প্রতিনিয়ত নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইতেছে। কলেরা, প্লেগ, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, অম্ল, অজীর্ণ, যক্ষ্মা ও ক্ষয়কাস প্রভৃতির প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দেশ যেন ক্রমেই বিমল স্বাস্থ্যসুখলাভে বঞ্চিত হইতেছে। লোকগুলি যেন ক্রমেই বে'দের ঝাপির বিষধরের ন্যায় বলশূন্য, তেজশূন্য ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িতেছে। শতকরা দশটী লোকও সবল, সতেজ, নীরোগ ও কর্ম্মক্ষম খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? কি পাপে দেশ দিন দিন রসাতলে যাইতেছে? কি দোষে দেশ সুখ শান্তি হারাইতেছে। এই সমস্ত রোগের নিদান নিরূপণ পূর্ব্বক প্রতিকারপরায়ণ না হইলে দেশের সুখশান্তির, জ্ঞানগৌরবের ও স্বাস্থ্যোন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

স্বাস্থ্যই সর্ব্বপ্রকার সুখের ও শ্রেয়ঃসাধনের মূল। শাস্ত্রে আছে—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষণামারোগ্যমূলমুত্তমম্।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কি মোক্ষ যাহাই সাধন কর না কেন, আরোগ্যই সমস্ত সাধনের মূল। রোগযুক্ত, দাসদাসী সমন্বিত, রম্য হর্ম্ম্যতলবাসী রাজাধিরাজ অপেক্ষা রোগমুক্ত পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুকও সমধিক সুখী সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইলে নিম্নলিখিত হেতুগুলিই দেশের সুখ শান্তির অন্তরায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা—

১। কুচিকিৎসা। ২। পেটেণ্ট ঔষধ। ৩। খাদ্যবিষয়ে বিচারাভাব। ৪। বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের অভাব। ৫। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও জল নিঃসরণের বন্দোবস্তের অভাব। ৬। কেরোসিন তৈল ব্যবহার। ৭। টিনের ঘরে বাস। ইত্যাদি।

উল্লিখিত হেতুগুলি যথাক্রমে বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে। ১ম হেতু—কুচিকিৎসা। চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ, ঔষধ প্রস্তুত পটু, মনস্বী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিকিৎসক কর্ত্তৃক রোগ ও ঔষধ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা যে চিকিৎসা তাহারই নাম সুচিকিৎসা, তদ্বিপরীত কুচিকিৎসা।

মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য চিকিৎসকের লক্ষণ করিয়াছেন :—

তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্করভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্ পাদ উচ্যতে॥

যিনি অধ্যাপকের নিকট যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি চিকিৎসাকার্য্য ও ঔষধ প্রস্তুতকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, যিনি পণ্ডিত, লঘুহস্ত, শুচি, বলবান্, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, কার্য্যক্ষম, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক এবং যাঁহার নিকট চিকিৎসোপযোগী ঔষধাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে তিনিই চিকিৎসক।

এখন চিকিৎসক মহলে অনুসন্ধান করিলে উক্ত গুণবিশিষ্ট চিকিৎসক কয়জন মিলিবে, চিন্তা করিয়া দেখুন। অন্য কথা দূরে যা'ক অধ্যাপকের নিকট যথাবিধি অধ্যয়ন পূর্ব্বক, চিকিৎসা ও ঔষধ প্রস্তুত কার্য্য পরিদর্শনান্তে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন তেমন চিকিৎসকও শতকরা পাঁচজন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অথচ সহরে বন্দরে, হাটে বাজারে, গ্রামে গ্রামে কবিভূষণ, কবিরঞ্জন, শাস্ত্রী প্রভৃতির অন্ত নাই।

অশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসককে সুশ্রুতাচার্য্য কি বলেন শুনুন্ :—

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যেতু তস্করাঃ॥

গুরুমহাশয়ের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক বার বার ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়া যিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করেন তিনিই চিকিৎসক। ঐরূপ শিক্ষা ভিন্ন যিনি ব্যবসায় করেন, তিনি তস্কর অর্থাৎ ছদ্মবেশে অর্থ অপহরণ করেন সুতরাং তিনি চোর। মহর্ষি সুশ্রুত যাঁহাদিগকে চিকিৎসক না বলিয়া চোর বলেন, আমি তাঁহাদিগকে কুচিকিৎসক শব্দে অভিহিত করিলাম।

যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, অশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ দেখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাঁহারা যেমন কুচিকিৎসক, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন—জানেন বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র নিজে নিজে পড়িয়া, ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে "শ্বেতমরিচ" শব্দের অর্থ সাদা মরিচ, "গোক্ষুর" শব্দের অর্থ গরুর ক্ষুর এবং "কণ্টকারী" শব্দের অর্থ কাঁটার অরি অর্থাৎ জুতা ব্যাখ্যা পূর্ব্বক তদনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসা করেন এবং সাহিত্য ও নিদানের শ্লোক পাঠ করিয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞের প্রমাণ দেখান—তাঁহারা তেমন কি ততোধিক কুচিকিৎসক। যাঁহারা বরিশালের জারণ বিক্রেতা হইতে তুবড়ীবাজীর তারার অনুপযুক্ত লৌহচূর্ণ খরিদ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা যেমন কুচিকিৎসক, যাঁহারা ভাজা খন্তা, কোদাল, কড়াই প্রভৃতির লৌহকে গোমূত্রে ভিজাইয়া ঘুটের পোড় দিয়া উৎকৃষ্ট লৌহ জারণ দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া বাহাদুরী করেন তাঁহারা তেমন কি ততোধিক কুচিকিৎসক। যাঁহারা শ্যামালতার স্থানে—স্বর্ণলতা, পদ্মকাষ্ঠের স্থানে—স্থলপদ্মের গাছ এবং কটুকীর স্থানে—হাড়গাজার শিকড়ের ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা যেমন কুচিকিৎসক, যাঁহারা গন্ধক স্থানে বাতি গন্ধক, বঙ্গ স্থানে জিরাকী বঙ্গ ও রসসিন্দুরের স্থানে বাজারের মুটকীতে তোলা রসসিন্দুর দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তেমন কি ততোধিক কুচিকিৎসক। চিকিৎসা গ্রন্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিয়া তালিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক যাঁহারা ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা যেমন কুচিকিৎসক, যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্রের ধার না ধারিয়া, অর্থলোভে, বিজ্ঞাপনের জোরে, যাহা তাহা দিয়া মফঃস্বলবাসীকে ঠকাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, তাঁহারা তেমন কি ততোধিক কুচিকিৎসক।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে কুচিকিৎসকের সংখ্যাধিক হইলেও এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমি মতানুযায়ী চিকিৎসকগণের মধ্যেও কুচিকিৎসকের অভাব নাই। প্রায় কম্পাউণ্ডারই পল্লীগ্রামে ডাক্তার। আর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ত অনন্ত বলিলেও হয়। মা গঙ্গা হোমিওপ্যাথি ঔষধরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় পাঁচ পয়সার ঔষধের ব্যবসায়ীর সংখ্যা করে সাধ্য কার? স্কুলের শিক্ষকসমূহ, কেরাণীনিচয়, অল্প বেতনের চাকরীজীবী ভদ্রলোকবৃন্দ, উমেদারগণ প্রায়ই ঐ সূক্ষ্মতত্ত্বের সেবক।

ঐ সকল কুচিকিৎসকের চিকিৎসার দোষে অনেকে দীর্ঘকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে হয়ত কাল কবলে কবলিত হইতেছে, কিংবা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। অনেক সুখসাধ্য রোগ কষ্ট সাধ্যে কি অসাধ্যে পরিণত হইতেছে। নিরুপদ্রব রোগ হইতে বহু উপদ্রব জন্মগ্রহণ করিয়া রোগীর ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে। দৈবাৎ কোনও ভাগ্যবান্ লোক তাহাদের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিলেও অবিশুদ্ধ ঔষধ প্রয়োগহেতু পরে রক্তদুষ্টি, ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি রোগ নিচয় ক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিতে থাকে। পারদাদি কতকগুলি ঔষধ আছে, অবিশুদ্ধ ব্যবহৃত হইলে শুধু ব্যবহারকারীর অনিষ্ট হয় এমন নয়, ঐ ব্যবহারকারীর ঔরসজাত সন্তানকেও ঐ ঔষধের বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়। ফলকথা কুচিকিৎসকগণের চিকিৎসা দোষে দেশে নানা রোগের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থায়িত্বের বৃদ্ধি হইতেছে, সন্দেহ নাই।

২য় হেতু—পেটেণ্ট ঔষধ। যেগুলি বিজ্ঞ-

চিকিৎসক কর্ত্তৃক রোগানুযায়ী যথাবিধি প্রস্তুত ও বহুপরীক্ষিত, বহুল প্রচার জন্য নূতন নামকরণে পেটেণ্ট করা হইয়াছে ঐ গুলি আমার এই পেটেণ্ট শব্দের অন্তর্গত নহে। যেগুলি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রে অজ্ঞ, দোকানদারাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিজ্ঞাপনের জোরে বিক্রীত হইতেছে, যে গুলিতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, ঐ গুলিই প্রাণনাশক বিষ বা পেটেণ্ট ঔষধ। ঐ প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের প্রবর্ত্তক ধূর্ত্তগণ সুদূর মফঃস্বলবাসী, সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে প্রলুব্ধ করিবার মানসে এরূপ সাবধানে, নানাপ্রকার বাক্য-বিন্যাসে বিজ্ঞাপন-কায়া সুশোভিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, ঐ বিজ্ঞাপনখানি যিনি একবার পড়েন, তিনিই তাহাদের কৌশলজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। বাস্তবিক একএকটি ঔষধের অসংখ্য গুণবর্ণনা পাঠ করিয়া ও অসংখ্য প্রশংসা পত্র দেখিয়া বিজ্ঞাপনে অবিশ্বাসী, মনস্বী ব্যক্তিরও মতি টলিয়া যায়। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সুযোগ্য ব্যক্তিও অন্ততঃ একবার ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা করে। রোগী রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির। তিনি যে যে প্রতিকার পাইতে চান, বিজ্ঞাপনে সেগুলিত আছেই, এছাড়া আরো বহু উপকারের বিষয় বিবৃত আছে—যাহা তিনি এই জাতীয় ঔষধের নিকট কল্পনাও করেন নাই। এইরূপ আশাতীত ফলপ্রদ স্বর্গীয় সুধার কথা পাঠ করিয়া প্রচারক—বিজ্ঞ কি অজ্ঞ, সাধু কি চোর, উপকারক কি সংহারক, এই সব বিচার করিবার ক্ষমতা অনেক সময় বিচক্ষণেরও থাকে না। তার পর প্রশংসা পত্র গুলিত তরল বিশ্বাসকে আরও ঘনীভূত করিয়া দেয়, চঞ্চল ধারণাকে সুস্থির করিয়া প্রাণকে শান্তির সুবাতাসে শীতল করিয়া দেয়। রাজা মহারাজের প্রশংসা পত্র ডাক্তার কবিরাজের প্রশংসাপত্র, জজ মুন্সেফের প্রশংসাপত্র, উকীল ব্যারিষ্টারের প্রশংসাপত্র। এ সব প্রশংসাপত্রে অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে কি ?

এই জাতীয় পেটেণ্ট ঔষধগুলির অধিকাংশ ঔষধে কিছুমাত্রও উপকার হয় না। কতক-গুলিতে আশু কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেও সেই উপকার হয় ক্ষণস্থায়ী, না হয় পরিণাম বিষম। ধ্বজভঙ্গ রোগে আশুফলপ্রদ তৈলের বিজ্ঞাপন দিয়া ৫৲ টাকা মূল্যে এক ছটাক তিলাফীভাজা তৈল প্রদানে মফঃস্বল বাসীকে ঠকাইতেছে। ঐ প্রকার একজন ধূর্ত্তের বিজ্ঞাপন এখনও একটি প্রধান বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিরাজ করিতেছে। এ সব দেশের দুর্ভাগ্য বই কি!!

৩য় হেতু—খাদ্যবিষয়ে বিচারাভাব। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের সহিত মনুষ্য-শরীরের এবং মনুষ্য-শরীরের সহিত আহার্য্য শাক, সব্জি, মৎস্য, মাংসাদির পরস্পর নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেইজন্য আর্য্য ঋষিগণ শরীর ও শরীরপোষণোপযোগী দ্রব্য সমূহ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া তিথি-ভেদে দিবারাত্রি-ভেদে ও দ্রব্যের সংযোগ-ভেদে কতকগুলি দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিষেধ বিধিগুলি মানিয়া চলিলে আমাদের অনেক উপকার সাধিত হয়। তিথি-ভেদে নিষেধ যথা—প্রতিপদ তিথিতে চালকুমড়া, দ্বিতীয়াতে বৃহতীফল, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিমপাতা, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কল্মীশাক, একাদশীতে সিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাংস। ঐ ঐ তিথিতে ঐ ঐ দ্রব্য ভক্ষণে শরীরে নানা প্রকার গ্লানি ও রোগের উৎপত্তি হয়। রজোগুণাদি পরিবর্দ্ধিত হইয়া সদ্‌বৃত্তিগুলিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে, সেইজন্য তিথি-ভেদে নিষিদ্ধ দ্রব্য গুলি পরিবর্জ্জন করা নিতান্ত প্রয়োজন। দিবারাত্রি-ভেদে নিষেধ যথা—রাত্রিতে দধি খাইবে না। রাত্র্যুষিত অর্থাৎ বাসি ভাত ব্যঞ্জন খাইবে না। দিবাতে উষ্ণকরা জল রাত্রিতে এবং রাত্রিতে উষ্ণকরা জল দিবাতে

ব্যবহার করিবে না। দ্রব্যের সংযোগভেদে নিষেধ যথা—ক্ষীরা, শশা প্রভৃতি লতাজাত ফল, আমড়া, কামরাঙ্গা, ডেউয়া, পিঠা, অম্ল, লবণ কি কটু দ্রব্য, মৎস্য, মাংস, অঙ্কুরিত ধান্য তণ্ডুল প্রভৃতির সহিত দুগ্ধ সংযোগ বিরুদ্ধ অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যের সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পূর্ব্বে কি পরে দুগ্ধ সেবন করিলে বিষদোষ ঘটিয়া থাকে। সেই প্রকার দুগ্ধের সঙ্গে, দধির সঙ্গে, তক্রের সঙ্গে ও তালের রসের সঙ্গে কলা সংযোগ বিরুদ্ধ। মাংসের সঙ্গে মধু, তিল, গুড়, দুগ্ধ, মাষকলাই, মূলা ও মৃণাল সংযোগ বিরুদ্ধ। সম মাত্রায় মধু ও জল, ঘৃত ও মধু সংযোগ বিরুদ্ধ। সর্ষপ তৈলে ভাজা কবুতর মাংস সংযোগ বিরুদ্ধ। ইত্যাদি ইত্যাদি এ ছাড়া আজ কালকার হোটেলে নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাতে ও সঙ্গে বসিয়া খাওয়ায় এবং নানাজাতীয় বিরুদ্ধ দ্রব্য ও অখাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করায় অনেক নীরোগ দেহে অজ্ঞাতসারে বহুবিধ রোগের সঞ্চার হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য বিচার পূর্ব্বক যাহার হাতে খাইব কি যাহার সঙ্গে বসিয়া খাইব, তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আহার করিলে অনেক প্রকার সংক্রামক ও মারাত্মক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

৪র্থ হেতু—বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের অভাব। এমন সময় পড়িয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও অনেক সময়ে ও অনেক স্থানে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া সুকঠিন। বাজারের সরিষাতৈলে—তিসি, রাই, পোস্তদানা, মূলারদানা, রেড়ি প্রভৃতি ১১।১২ রকম বীজের তৈল মিশানো আছে। বিশুদ্ধ ঘৃত যেমন দুর্ম্মূল্য তেমন দুষ্প্রাপ্য। বাজারের ঘৃতে—সাপের চর্ব্বি, শূকরের চর্ব্বি, পাকা কলা প্রভৃতি ভেজালের অন্ত নাই। নারিকেল তৈলে—হোয়াইট অয়েল কেরোসিন অয়েল ইত্যাদি মিশাইয়া বিক্রী করে। কোচিনের নারিকেল তৈল ত মফঃস্বল হইতে অনেক দিন পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। দুগ্ধে পচাপুকুরের, নালার ও গড়ের জল মিশানো। কোনও কোনও চতুর গোয়ালা জলের ভাগ বেশী মিশাইয়া বাতাসার গুঁড়া সংযোগে মিষ্টতা রক্ষা করিয়া থাকে। ময়রা দোকানের মিঠাইত বিষের লাড়ু বলিলেই হয়। যত বৎসরের দোকান, তৈল ঘৃতের বীজও তত বৎসরের। পুরাতন ঘৃত তৈলের সঙ্গে প্রতিদিন নূতন কিছু মিশাইয়া মিঠাই ভাজা হয়, যেইগুলি অবশেষ থাকে সেইগুলি ঐ আদিভাণ্ডে পুনর্ব্বার ফেলিয়া রাখে। এই প্রণালীতে বরাবর কাজ চলিতে থাকে। সুতরাং সাক্ষাৎ বসিয়া ইচ্ছানুরূপ ঘৃত তৈল দ্বারা প্রস্তুত না করাইলে তাজা তৈল ঘৃতের ভাজা জিনিস পাইবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এইত গেল তৈল ঘৃতের কথা। বাসি মিঠাইর কাণ্ডটা দেখুন। যে মিঠাই গুলি বিক্রয় হইল না, পরদিন নূতন প্রস্তুত করিবার সময় সেইগুলি নূতনের সঙ্গে বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া অভিন্নহৃদয় হইয়া গেল। এখন ভাবিয়া দেখুন এই গুলি মিঠাই না বিষের লাড়ু। তারপর মাছি বোল্‌তার বিষ্ঠা, রাস্তার বালুকারাশি সে সব ত আছেই।

৫ম হেতু—বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও জল নিঃসরণের বন্দোবস্তের অভাব। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয়জলের অত্যন্ত অভাব। অধিকাংশ গ্রামেই ভাল পানীয়জলের পুষ্করিণী নাই। দুই একটী কোনও গ্রামে থাকিলেও নিত্য বহুলোক অবগাহন স্নান করিয়া গাত্রময়লায় ঐ জল পানের অনুপযোগী করিয়া রাখে। বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান, শৌচকর্ম্ম, প্রস্রাব আবর্জ্জনা প্রক্ষালনাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য করা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার জলে স্বাস্থ্যরক্ষা করার সম্ভাবনা কি? পূর্ব্বকালে হিন্দুরা জানিতেন "আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্।" অর্থাৎ জল সাক্ষাৎ নারায়ণ। ফলে ঐ প্রকার দৃঢ়জ্ঞান থাকায় জলে প্রস্রাব করিতে কি থুথু ফেলিতে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ প্রাণে ব্যথা পাইতেন। এখন সেই রামও নাই, আর সেই অযোধ্যাও নাই। ঐ সকল শাস্ত্রবাক্য দেশ হইতে একপ্রকার নির্ব্বাসিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রেলরাস্তা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জল নিকাশের বাধা প্রায় সর্ব্বত্রই পড়িয়াছে। তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য অতি অল্প। রাস্তা ও পোল দেওয়া, খাল খনন করা ইত্যাদি সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণ হইতে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করেন, সেই সকল অর্থের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা হয় না। কাজেই নিরীহ প্রজার ভাগ্যে সুখ সচ্ছন্দতা উপভোগের সুযোগ বড় ঘটিয়া উঠে না। তার উপর স্থানে স্থানে পাট ও শণ ভিজাইয়া জল ও বায়ু দূষিত করাত আছেই। এই সমস্ত কারণে ম্যালেরিয়া জ্বর, কলেরা, পেটের অসুখ প্রভৃতি সহচররূপে সর্ব্বদা দেশে লাগিয়াই আছে।

৬ষ্ঠ হেতু—কেরোসিন তৈল ব্যবহার। না জানি কি পাপের ফলে কি কুক্ষণে ভারতবর্ষে কেরোসিন তৈলের প্রথম আমদানি করা হইয়াছিল। কেরোসিন তৈলের আবির্ভাবে রেড়ির তৈল, ডহরকরঞ্জার (কেঞ্জা) তৈল, পিত্তরাজের তৈল, পুন্নালের তৈল, গর্জ্জন তৈল ইত্যাদির ক্রমে ক্রমে তিরোভাব ঘটিয়াছে। কেরোসিন তৈলকে এখন তৈলরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজা মহারাজের প্রাসাদ হইতে ভিক্ষুকের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কেরোসিন তৈলের অধিকার। নানাভাবে ও নানা আধারে কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেরোসিন তৈলের আলোতে বায়ুবৃদ্ধি করে, মাথা ধরে। আর আলোজাত ধূমে গৃহের সমস্ত দ্রব্য মসীনিভ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এবং ঐ ধূম শ্বাসের সঙ্গে দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয় প্রভৃতি রোগ-নিচয় জন্মাইয়া সত্বর মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। বেশীদিন কেরোসিন তৈলের আলোর নিকট বসিলে, দেহ-শক্তিশূন্য, মন—উৎসাহহীন হইয়া পড়ে এবং স্মরণশক্তি কমিতে থাকে। চিম্‌নী সংযুক্ত আলোতে অপকার অবশ্য অল্প হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে চিম্‌নী ব্যবহার সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কেরোসিন তৈলে প্রতিবৎসর এই দেশে কত গৃহস্থের গৃহ, কত ব্যবসায়ীর কারখানা ও গুদাম ঘর, কত সুরম্য ও সুসজ্জিত দোকানরাশি, কত স্নেহের প্রতিমা পুত্রকন্যা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে। কেরোসিন তৈল এদেশবাসীর স্বাস্থ্যের ও সুখসচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

৭ম হেতু-টিনের ঘরে বাস। টিনের ঘরে বাস অপেক্ষা কারাবাসও বোধ হয় শ্রেয়ঃ। গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে টিনের ঘরে যে অসহনীয় যন্ত্রণা, শিক্ষকের বেত্রাঘাত যন্ত্রণাও ছাত্রের পক্ষে তেমন অসহ্য নহে বলিয়া মনে হয়। উঠানের চতুঃপার্শ্বে টিনের ঘর থাকিলে সেই উঠানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন তপনে দাঁড়ায় সাধ্য কার? টিনের ঘরে না শীতকালে সুখ আছে, না গ্রীষ্মকালে শান্তি আছে। বায়ুর রোগী ত টিনের ঘরে গেলে উন্মাদ হইয়া পড়ে। প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে। পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। টিনের ঘরে বাস করিলে স্মরণ শক্তি ও ধারণাশক্তি হ্রাস পায় এবং মস্তক শূন্য ও গরম বোধ হয়। সর্ব্বদা অশান্তিতে অন্তর উদ্বেগপূর্ণ হইয়া উঠে। প্রাণ উড়ু উড়ু করিতে থাকে। এ হেন টিনের ঘরে বাস করিয়া ষোল আনা স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র নহে কি?"

পূর্ব্বোদ্ধৃত বক্তব্যটি আমরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার যে সব কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সবগুলিই ঠিক। আমাদের বিশ্বাস দেশে যতদিন দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা না হইবে, যতদিন যথার্থভাবে লোকশিক্ষা প্রচারিত না হইবে, ততদিন আমাদিগকে অস্বাস্থ্যের হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া কঠিন।

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর *

চতুর্থ অধ্যায়

হ্যাম্পটনে জীবন-গঠন

দেখিতে দেখিতে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে আমার এক বৎসর কাটিয়া গেল। গরমের ছুটি আসিল। সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাড়ী যাই কি করিয়া? হাতে এক পয়সাও নাই। অথচ তখনকার দিনে ছুটির সময়ে স্কুলে থাকিবারও সুবিধা ছিল না। মহা মুস্কিলে পড়িলাম। ওখান হইতে পড়িতে হইলেও ত কিছু খরচ আবশ্যক।

আমি ইতিমধ্যে একটা পুরাতন জামা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ভাবিলাম ঐটা বেচিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়। আমি অবশ্য কোন লোককে জানিতে দিলাম না যে হাতে পয়সা নাই বলিয়া আমি বাড়ী যাইতে পারিতেছি না। ছেলেবেলায় ওরূপ অহঙ্কার ও লজ্জা সকলেরই থাকে। আমার কোট বেচিবার কারণ এক একজনকে এক একরূপ বুঝাইলাম। একটি নিগ্রো বালক আমার ঘরে জামাটা দেখিতে আসিল। সে ইহার এপীঠ ওপীঠ খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল এবং দাম জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম, "৯৲ টাকার কমে কি ছাড়া যায়?" সেও বোধ হয় বুঝিল—দাম ঐরূপই হইবে। কিন্তু তাহারও অর্থাভাব। কালবিলম্ব না করিয়া সে অতি নির্লজ্জভাবে বলিয়া ফেলিল —"দেখ বাপু, কাজের কথা বলি, শুন। জামাটা ত আমি এখনই লইতেছি, এবং নগদ দশ পয়সা দিতেছি। বাকী দামটা যখন সুবিধা হয়, দিব।" বলা বাহুল্য আমি নিতান্তই হতাশ হইয়া পড়িলাম।

কোন মতে হ্যাম্পটন ছাড়িয়া যাইতে পাইলেই আমি নানাস্থানে কাজ খুঁজিয়া লইতে পারিব বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হ্যাম্পটন হইতে বাহির হওয়াই অসম্ভব। এদিকে ছাত্র, শিক্ষক সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী রহিলাম। আমার দুঃখের আর সীমা থাকিল না।

শেষ পর্য্যন্ত একটা হোটেলে চাকরী পাইলাম। কিন্তু বেতন বড় কম। যাহা হউক লেখা পড়ার সময় অনেক পাইতাম। ফলতঃ গরমের ছুটিটায় আমি বেশ খানিকটা শিখিয়া ফেলিলাম।

গরমের ছুটির সময়ে আমি বিদ্যালয়ের নিকট ৫০৲ ঋণী ছিলাম। ছুটিতে খাটিয়া টাকা পাইলে ঐ ধার শোধ করিব মনে করিয়াছিলাম। ছুটি ফুরাইয়া আসিল—কিন্তু ৫০৲ কোন মতেই জমা হইল না।

একদিন হোটেলের একটা কামরায় টেবিলের নীচে ৩০৲ টাকার একখানা 'নোট' কুড়াইয়া পাইলাম। আমি হোটেলের কর্ত্তার নিকট উহা লইয়া গেলাম। ভাবিয়াছিলাম কিছু অন্ততঃ পাওয়া যাইবে। কিন্তু তিনি বলিলেন "ওখানে আমিই বসিয়া কাজ করি—সুতরাং উহা আমারই প্রাপ্য।" এই

* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের "আত্মজীবন চরিত" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

বলিয়া তিনি ৩০৲ টাকার নোট পকেটস্থ করিলেন। আমি কিছু পাইলাম না।

এত কষ্টে পড়িলে হতাশ হইবারই কথা। কিন্তু উহা কাহাকে বলে আমি তাহা জানিই না। জীবনের কোন অবস্থাতেই আমি এখন পর্য্যন্ত নৈরাশ্য আস্বাদ করি নাই। যখনই যে কাজ ধরিয়াছি, আমার বিশ্বাস থাকিত যে আমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইবই। সুতরাং যাঁহারা বিফলতার আলোচনা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন দিনই মতে মিলে না। কৃতকার্য্য কি উপায়ে হওয়া যায় একথা যিনি বুঝাইতে পারেন আমি তাঁহারই ভক্ত। বিফলতা কেন হয়—একথা যিনি বুঝাইতে আসেন আমি তাঁহার কাছে ঘেঁষি না।

ছুটির শেষে বিদ্যালয়ে গেলাম। কর্ত্তৃপক্ষকে বলিলাম—"ধার শোধ করিবার ক্ষমতা এখনও আমার হয় নাই—স্কুলে প্রবেশ করিতে পারি কি?" খাজাঞ্চি ছিলেন সেনাপতি মার্শ্যাল। তিনি সাহস দিয়া বলিলেন, "তোমাকে এ বৎসর ভর্ত্তি করিয়া লইলাম। তুমি একদিন না একদিন আমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিবে—আমার বিশ্বাস আছে।" দ্বিতীয় বৎসরও পূর্ব্বের ন্যায় আমি খানসামা-গিরি করিতে করিতে এখানে লেখাপড়া শিখিতে থাকিলাম।

হাম্পটন-বিদ্যালয়ে বই পড়ানও হইত বটে, কিন্তু পুস্তক পাঠ অপেক্ষা অন্যান্য অসংখ্য উপায়েই আমি ওখানে বেশী শিক্ষা লাভ করিয়াছি। দ্বিতীয় বৎসরে আমি শিক্ষকগণের স্বার্থত্যাগ ও চরিত্রবত্তা দেখিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তাঁহারা নিজের কথা না ভাবিয়া কেবল মাত্র পরের কথাই ভাবিতেন। তাঁহাদের জাতিমর্য্যাদা ছিল, বংশগৌরব ছিল, বিদ্যার সম্মান ছিল; সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট করিতে পারিতেন—সংসারে নূতন নূতন যশোলাভের সুযোগও তাঁহাদের কম ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না—আমাদের অবনত কৃষ্ণকায় সমাজকে বিদ্যায়, ধনে ও ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মেই তাঁহাদের একমাত্র সুখ ছিল। দ্বিতীয় বৎসরের বসবাসের ফলে আমি শিখিলাম যে পরোপকারী ব্যক্তিই একমাত্র সুখী। যাঁহারা অন্য লোককে নানা উপায়ে সুখী ও কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতেছেন তাঁহাদের অপেক্ষা সুখী লোক সংসারে আর নাই। এই শিক্ষা আমার জীবনে কখনও নষ্ট হইবে না।

হাম্পটনে আমি পশুপক্ষী জীবজন্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব ভাল রকম জ্ঞান লাভ করি। এখানকার কৃষিবিভাগের জন্য অতি উত্তম জাতির পশুপক্ষী আমদানি করা হইত। ঐ গুলিকে পালন করিবার ব্যবস্থাও অতি উন্নত ধরণের ছিল। এই সকল কাজে আমরা অভ্যস্ত হইতাম—তাহাতে কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, জীব-বিদ্যা, প্রাণি-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কার্য্যকরী শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে আজ পর্য্যন্ত আমি জীবজন্তুর ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে সমর্থ। ছেলে বেলা হইতে ভাল ভাল জানোয়ার এবং তাহাদের গতিবিধি অভ্যাস স্বভাব, খাদ্যাখাদ্য, রোগ ঔষধ ইত্যাদি দেখিবার সুযোগ পাইলে প্রত্যেক লোকই ভবিষ্যতে পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিতে পারে।

দ্বিতীয় বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা হইয়াছিল—বাইবেল গ্রন্থের উপকারিতা।

কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবেই নহে, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসাবেও বাইবেল বিশেষরূপেই পাঠ করা উচিত—এই ধারণা জন্মিয়াছিল। ফলতঃ, আজকাল কাজের খুব ভিড় থাকিলেও আমি দুই এক অধ্যায় বাইবেল না পড়িয়া দিন যাইতে দিই না।

বাইবেলের উপকারিতা আমি কুমারী লর্ডের শিক্ষকতায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আমি আর এক কারণেও ঋণী। আজ কাল আমি বক্তৃতা করিতে মন্দ পারি না—এমন কি, সাহিত্যজগতে আমি বাগ্মী বলিয়াই খ্যাত। এই বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা আমাকে কুমারী লর্ডই শিখাইয়াছিলেন। শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ম, উচ্চারণ করিবার রীতি, জোর দিবার ভঙ্গী, দম লইবার কায়দা, ইত্যাদি বক্তৃতা করিবার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি আমি তাঁহার নিকট শিখিয়াছিলাম। এইগুলি শিখিবার জন্য আমি ইঁহার নিকট বিদ্যালয়ের অবকাশকালে একাকী উপদেশ লইতাম।

আমি অবশ্য বক্তৃতা ও বাচালতার একেবারেই পক্ষপাতী নহি। কেবল ওজস্বিতা বা বাক্যযুদ্ধ ও কথার মারপ্যাচ দেখাইবার জন্য আমি বক্তৃতা অভ্যাস করি নাই—এবং কখনও বক্তৃতা দিই নাই। ছেলেবেলা হইতে আমি পরোপকার কর্ম্মে ব্রতী হইব স্থির করিয়াছিলাম। জগতের বিদ্যাভাণ্ডার ও কর্ম্ম-কেন্দ্রগুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। আমি ভাবিতাম, যদি কোন উপায়ে সংসারের উপকার করিতে পারি তাহা হইলে সে সম্বন্ধে লোকজনকে বুঝানও আবশ্যক হইবে। আমি বুঝিয়াছিলাম,—একটা কোন অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া তাহা সফল করিতে পারিলে লোকসমাজে তাহার প্রচারের জন্যও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বুঝিয়া সদনুষ্ঠানের প্রচার, সৎকর্ম্মের বিস্তার এবং সদ্ভাবের প্রসার ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই আমি বাগ্মিতার শিক্ষা লইতেছিলাম—ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বাহবা লইবার জন্য নহে। আমার মতে "কার্য্য আগে করিব—তাহার পরে তাহা জগৎকে জানাইব"—এই আদর্শেই বাগ্মিগণের জীবন গঠন করা কর্ত্তব্য।

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে অনেকগুলি ডিবেটিং ক্লাব বা আলোচনা-সমিতি ছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তাহাদের অধিবেশন হইত। এই অধিবেশনগুলির একটাও কখন বাদ দিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এদিকে এত ঝোঁক ছিল যে আমি এইগুলির অতিরিক্ত একটা নূতন সমিতিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। আমাদের খাওয়া শেষ হইবার পর পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রায় ২০ মিনিট ফাঁক থাকিত। এই সময়টা ছেলেরা সাধারণতঃ গল্প গুজবে কাটাইত। আমার উদ্যোগে ২০।২৫ জন ছাত্র মিলিয়া এই সময়টায় আলোচনা বক্তৃতা ইত্যাদি করিবার জন্য একটা নূতন ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরের গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। এবার আমার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। আমার মাতা ও দাদা কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলেন, একজন শিক্ষকও কিছু দান করিয়াছিলেন। আমি 'স্বদেশে' চলিলাম। ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়ার ম্যাল্‌ডেনে এবার ছুটি কাটিল।

বাড়ীতে আসিয়াই দেখি, নুনের কল বন্ধ, কয়লার খাদে কাজ চলিতেছে না, কুলীরা সব 'ধর্ম্মঘট' করিয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের একটা রহস্য বলিতেছি। প্রায়ই দেখিতাম, যখন

কুলী মহলের পরিবারে পরিবারে দুই তিন মাসের উপযুক্ত খরচের টাকা জমা হইয়া গিয়াছে তখনই তাহারা কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া মহাজনগণকে বিব্রত করিত। যখনই বসিয়া খাইতে খাইতে টাকা ফুরাইয়া আসিত তখনই আবার তাহারা দলে দলে কাজে ঢুকিত। এইরূপে অনেকে যথেষ্ট দেনাও করিয়া ফেলিত। তখন আর তাহারা তাহাদের পুরাতন অভাব অভিযোগ ইত্যাদির কথা তুলিতই না—কোন উপায়ে একটা কাজ পাইলেই খুসী থাকিত। মোটের উপরে দেখিতাম, যে ধর্ম্মঘটের ফলে কুলীদের সর্ব্বাংশেই ক্ষতি হইত। অনেক সময়ে কল ও খাদের কর্ত্তা তাহাদিগকে পুনরায় কাজ দিতে অস্বীকার করিতেন। তখন তাহারা যথেষ্ট ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইত। আমার যতদূর বিশ্বাস, কতকগুলি হুজুগপ্রিয় পাণ্ডাদিগের পাল্লায় পড়িয়া কুলীরা নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিত। ধর্ম্মঘটের আমি আর কোন ব্যাখ্যা ত পাই না।

আমাকে দেখিয়া আমার পরিবারের সকলেই অবশ্য মহা খুসী। তাহার পর আমার নিমন্ত্রণের পালা পড়িল। পাড়ার প্রত্যেকেই আমাকে তাহাদের বাড়ীতে এক এক দিন খাইতে বলিত। আমি তাহাদিগকে হ্যাম্পটনের গল্প করিতাম। তাহা ছাড়া আমাকে ধর্ম্মমন্দিরে রবিবারের বিদ্যালয়ে এবং আরও কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিতেও হইয়াছিল। দিন মন্দ কাটিতেছিল না—কিন্তু ধর্ম্ম ঘটের ফলে আমার স্বগ্রামে কাজ জুটিল না। তাহা হইলে পুনরায় হ্যাম্পটনে যাইব কি করিয়া? একদিন অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেলাম তথাপি কাজ পাইলাম না। ফিরিতে বেশী রাত্রি হইয়া পড়ে—রাস্তায় একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে শুইয়া থাকিলাম। শেষে দেখি ভোর রাত্রি তিনটার সময় আমার দাদা আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ 'পোড়ো' বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে খবর দিলেন যে, রাত্রে মাতার মৃত্যু হইয়াছে।

মাতার মৃত্যুতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তিনি বহু কাল হইতেই ভুগিতেছিলেন জানিতাম—কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে ভাবিতে পারি নাই। আমার সাধ ছিল—অন্তিমকালে আমি তাঁহার সেবা করিব। কিন্তু সে সৌভাগ্যে আমি বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার উৎসাহে ও সাহসেই আমি লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছি। তাঁহার অভাব আমার জীবনে একমাত্র দুঃখের কারণ হইল। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও যথার্থ দুঃখ অনুভব করি নাই। তাহার পরেও আমি কখন অন্যান্য দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করি নাই।

মাতার মৃত্যুর পর আমাদের গৃহস্থালী বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ হইয়া গেল। ভগ্নীটি ছোট—সে সকল দিক দেখিয়া উঠিতে পারিত না। আমাদের কোন দিন খাওয়া জুটিত কোন দিন জুটিত না। তাহার উপর আবার আমার চাকরী নাই। এই দুঃখের দিনে রাফ্নার পত্নী আমাকে একটা কাজ দিলেন। তাহাতে কিছু পয়সা হইল। তাহার দ্বারা হ্যাম্পটনের পথ খরচের ব্যবস্থা হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আমার দাদা একআধটা জামা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন।

স্কুল খুলিতে আরও তিন সপ্তাহ বাকী। এমন সময়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী, কুমারী ম্যাকি আমাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, আমাকে

সপ্তাহ মধ্যেই ফিরিতে হইবে, এবং ফিরিয়া বাড়ীঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। এই পত্র পাইয়া আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ ইহাতে যে বেতন পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা স্কুলের খরচ অগ্রিম কিছু দেওয়া হইয়া থাকিবে। আমি দেরী না করিয়া হ্যাম্পটনে রওনা হইলাম।

পৌঁছিয়াই দেখি ইয়াঙ্কি রমণী নিজেই দরজা জানালা বেঞ্চ টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া আমি দুইটি শিক্ষা লাভ করিলাম। প্রথমতঃ অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এবং উচ্চ শিক্ষিতা রমণীরাও দাসদাসীর ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত নহেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা হওয়া মুখের কথা নয়। তাহার জন্য দায়িত্ব যথেষ্ট। কুমারী ম্যাকির দায়িত্ব জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি জানিতেন যে, ছুটির পর স্কুল খুলিবার সময়ে কোন বিষয়ে শৃঙ্খলা না থাকিলে তিনিই নিন্দিত হইবেন। সুতরাং তিনি সমস্ত ছুটিটা নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করিতে পারেন না। অন্যান্য সকলে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে সকল ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিয়া রাখিতে হইবে। কর্ত্তার ঝুঁকি তিনি বেশ ভালরকম বুঝিয়াছিলেন।

তখন হইতে আমি নেতার কর্ত্তব্য এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। দায়িত্ববোধহীন পরিচালককে আমি কোন সম্মান করি না। তাহা ছাড়া, যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শারীরিক পরিশ্রম শিক্ষা দেওয়া হয় না আমি তাহার প্রশংসা করিতে পারি না। ধনবান্ নির্দ্ধন, উচ্চ, নীচ—সকলেরই হাতে পায়ে খাটিয়া কাজ করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শারীরিক পরিশ্রম অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ম্যাকির দৃষ্টান্তে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

হ্যাম্পটনে এবার আমার শেষ বৎসর। খুব বেশী খাটিয়া লেখা পড়া করিতে হইল। আমি 'অনার'-পাশ করিলাম। এই পাশ বেশী গৌরবসূচক বিবেচিত হইত। ১৮৭৫ সালের জুন মাসে—অর্থাৎ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর বয়সে আমি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিলাম। আমার এই তিন বৎসরের শিক্ষার ফল নিম্নে বিবৃত করিতেছি :—

(১) প্রথমতঃ, আমি একজন প্রকৃত মানুষের মত মানুষের দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রভাবে জীবন গঠন করিতে শিখিয়াছি। তাঁহার নাম সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ। আমি পুনরায় বলিতেছি তিনি আমার চিন্তারাজ্যের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাবীর। তাঁহার ন্যায় সাধুপুরুষ আর আমি দেখি নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমি বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন ধারণা অর্জ্জন করিলাম। লোকে লেখাপড়া শিখে কেন? পূর্ব্বে নিগ্রোসমাজের সাধারণ লোকজনের কথাবার্ত্তা ও চালচলন দেখিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শারীরিক পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। এবং লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাবুগিরি করিয়া কাল কাটাইতে পারে। হ্যাম্পটনে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। ওখানকার আব্-হাওয়াতে হাতে পায়ে কাজ করা, খাটিয়া খাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম করা ইত্যাদি কার্য্য প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইত। নিষ্কর্ম্মা মানুষ কাহাকে বলে সেই বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে জানিতে পারিতাম না।

ছাত্র, শিক্ষক সকলেই পরিশ্রম করিতে ভাল বাসিতেন এবং পরিশ্রমীলোককে সম্মান করিতেন। পরিশ্রম না করাটাই সেখানে একটা নিন্দনীয় ও গর্হিত কার্য্য ছিল এবং অশিক্ষিত লোকের লক্ষণ বিবেচিত হইত। কাজকর্ম্ম করিলে পয়সা পাওয়া যায়, অন্নের ব্যবস্থা হয়, আর্থিক দৈন্য ঘুচে, সংসার পালন নিরুদ্বেগে করা যায়। এ সকল কথা আমাদের ওখানে সকলেই বুঝিত। এই বুঝিয়া আমরা খাটিতাম—সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, আমরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হইবার জন্যই এখানে নিজে খাটিতে শিখিতাম। কোন বিষয়ে পরের অধীন থাকিব না, নিজের সকল অভাব নিজেই মোচন করিয়া লইব—এই আদর্শেই আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে আদর করিতে শিখিয়াছিলাম। ফলতঃ খাটিয়া খাওয়া এবং শিক্ষালাভে কোন বিরোধ নাই—এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

(৩) তৃতীয়তঃ স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের শিক্ষা আমি হ্যাম্পটনেই প্রথম পাই। ওখানেই শিখি, যাঁহারা নিজ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া অপরের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন সংসারে একমাত্র তাঁহারাই সুখী। পরোপকার ও লোকসেবা করিতে পারাই মানব জীবনের একমাত্র সুখ।

আমি হ্যাম্পটনের গ্রাজুয়েট হইলাম সার্টিফিকেটও পাইলাম। ইতিমধ্যে পয়সা ফুরাইয়া আসিয়াছে। কনেক্টিকাট প্রদেশের একটা হোটেলে চাকরী সংগ্রহ করিলাম। একজনের নিকট কিছু ধার করিয়া পথ খরচের ব্যবস্থা করা গেল। যথা সময়ে সেই চাকরী স্থলে উপস্থিত হইলাম।

আমার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া হোটেলের কর্ত্তা আমাকে পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু ও বিষয়ে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কয়েক জন বড়লোক টেবিলে খাইতে বসিয়াছেন। আমি পরিবেষণের নিয়ম জানি না দেখিয়া তাঁহারা আমাকে মারিতে উঠিলেন। আমি ভয়ে কাজ ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহারা খাদ্যদ্রব্য আর পাইলেন না। এই ঘটনার পর আমাকে নিম্ন শ্রেণীর খান্সামার কাজ করিতে হইল। পরে পরিবেষণের কাজ শিখিয়া লইলাম। আবার সেই উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলাম।

যে হোটেলে আমি এই সময়ে খান্সামাগিরি করিতেছিলাম, এই হোটেলেই আমি ভবিষ্যতে পয়সা খরচ করিয়া অতিথিভাবে বাস করিয়া গিয়াছি। সংসারে এইরূপ পরিবর্ত্তন অহরহ ঘটিতেছে।

হোটেলের কাজ ছাড়িয়া আমার স্বদেশ ম্যাল্‌ডেন-নগরে ফিরিয়া গেলাম। তখন হইতে আমি আমাদের সেই নিগ্রো-বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। আমার সুখের দিন আরম্ভ হইল—কারণ এতদিনে আমি নিগ্রোজাতির জন্য কর্ম্ম করিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছি। এতদিন পরে আমার পল্লীবাসীদিগকে উন্নত করিবার সুযোগ পাইলাম।

প্রথম হইতেই বুঝিলাম যে নিগ্রোসমাজে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা প্রচার করিলে আমাদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। কতকগুলি পুস্তক পড়িতে শিখিলেই নিগ্রোরা মানুষ হইবে না। তাহাদের সমস্ত জীবনটা নূতন ভাবে গঠন করা আবশ্যক। আমি সকাল ৮ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত খাটিতে লাগিলাম। স্কুলে পড়ান ছাড়া

পল্লী ভ্রমণ এবং গ্রাম পরিদর্শন আমার কাজের মধ্যে ছিল। আমি ছাত্রদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইতাম। তাহাদিগকে চুল পরিষ্কার রাখিতে শিখাইতাম, দাঁত মাজিতে বলিতাম। তাহারা স্নান করিতে, পোষাক ধুইতে এবং অন্যান্য নানা কাজ করিতেও উপদেশ পাইত। নিজ হাতে তাহাদের অনেক কাজ করিয়া দিতাম। এই সকল কাজের উপকারিতাও বুঝাইয়া দিতাম। নিগ্রো-পল্লীতে এই উপায়ে স্বাস্থ্য-রক্ষার এবং শরীর পালনের সরল উপায় গুলি সহজেই প্রচারিত হইতে লাগিল। স্নান করা ও দাঁত মাজার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি সর্ব্বদাই বক্তৃতা করিতাম। যে দিন হইতে নিগ্রোরা দাঁত মাজা আরম্ভ করিল সেই দিন হইতে তাহারা যথার্থ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিল বলিতে পারি।

গ্রামের অনেক লোকেই স্ত্রী-পুরুষ সকলেই লেখা পড়া শিখিতে চাহিল। কিন্তু তাহারা দিবা ভাগে খাটিয়া অন্ন সংস্থান করে। কাজেই তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খুলিলাম। প্রথম হইতেই নৈশ বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হইত। ৫০ বৎসরের বেশী বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দিগের শিখিবার অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম।

পল্লীসেবার অন্যান্য অনুষ্ঠানও আমি এই সঙ্গে আরম্ভ করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটা গ্রন্থশালা এবং একটা আলোচনা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলাম। রবিবারের জন্য কয়েকটা নূতন কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিলাম। ম্যালডেন-নগরে একটা রবিবারের বিদ্যালয় ছিল—এবং এখান হইতে তিন মাইল দূরে আর একটা রবিবারের বিদ্যালয় ছিল। প্রতি রবিবারে এই দুইটি স্কুলেই আমি পড়াইতাম। এতদ্ব্যতীত, আমি কয়েক জন যুবককে ঘরে পড়াইয়া হ্যাম্পটনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। এই সকল কার্য্যের জন্য আমি অবশ্য বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে সামান্য কিছু বেতন পাইতাম। কিন্তু বেতনের লোভেই আমি ম্যাল্‌ডেনে খাটিতাম না। নিগ্রো সমাজের উন্নতির জন্য আমার আন্তরিক ব্যাকুলতাই আমার এই কর্ম্মতৎপরতার কারণ ছিল।

আমি যত দিন লেখা পড়া শিখিতেছিলাম। ততদিন আমার দাদা 'জন' আমাদের রবিবারের খরচ চালাইবার জন্য কয়লার খাদে কাজ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্যও পাইয়াছি। আমার শিক্ষা লাভের জন্য তিনি নিজের বিদ্যার্জ্জনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাজেই আমি হ্যাম্পটন হইতে ফিরিয়া আসিয়া জনকে হ্যাম্পটনে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তিন বৎসরে তিনিও হ্যাম্পটনের বিদ্যা শেষ করিয়া আসিলেন। পরে তিনি আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ের শিল্প বিভাগের কর্ত্তা হইয়াছেন। জন যখন হ্যাম্পটন হইতে আসিলেন তখন আমরা দুই জনে মিলিয়া আমাদের পোষ্য ভাই জেম্‌স্‌কে হ্যাম্পটনে পাঠাইয়া ছিলাম। জেম্‌স্‌ও লেখা পড়া শিখিয়া আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ের ডাক ঘরের কর্ত্তা হইয়াছে।

১৮৭৬।১৮৭৭ সাল ম্যাল্‌ডেনে একরূপেই কাটিল। স্কুল-পড়ান, পল্লীপর্য্যবেক্ষণ, লোক-শিক্ষা, ইত্যাদি নানাবিধ কাজে আমার সময় ব্যয় হইত। প্রায় এই সময়ে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ মহলে কএকটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা নিগ্রোজাতির রাষ্ট্রীয়

অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই সমিতিগুলির নাম ছিল 'কু ক্লুক্স'। গোলামীর যুগে এইরূপ কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ সমিতি ছিল। তাহারা রাত্রিকালে নিগ্রোদিগের মহলে মহলে ঘুরিয়া পাহারা দিত। নিগ্রোরা কোন গুপ্ত পরামর্শ প্রভৃতি করিতেছে কি না ইহারা তাহার সন্ধান রাখিত। তাহাদের ন্যায় এই "কুক্লুক্স"-সমিতিগুলিও রাত্রিকালে আমাদের উপর ডিটেক্‌টিভের কাজ করিত। তাহারা আমাদের কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় উন্নতির বিরোধী ছিল তাহা নহে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যামন্দিরও টিকিতে পারিত না। তাহারা আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানগৃহ পুড়াইয়া দিয়াছিল। আমাদের কোন কর্ম্ম-কেন্দ্রই ইহাদের আমলে নিরাপদ ছিল না। বহু নিগ্রোর জীবনও নষ্ট হইয়াছিল। এই সূত্রে ম্যাল্‌ডেনে একবার একটা ছোট খাট লড়াই বাধিয়া যায়। সাদা চামড়া এবং কাল চামড়া উভয় পক্ষের লোক সর্ব্বসমেত প্রায় ২০০।২৫০ মিলিয়া মহা দাঙ্গা বাধাইয়া দিল। অনেক ভাল ভাল লোক আহত হইয়া পড়েন। আমার পূর্ব্বতন মনিব জেনারেল রাফ্‌নার নিগ্রোদিগের পক্ষ লইয়া প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলেন। এজন্য শ্বেতাঙ্গ কুক্লুক্স সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে এমন জখম করিয়া দিয়াছিল যে তিনি আর সারিয়া উঠিলেন না। নিগ্রোসমাজের জন্য এই সহৃদয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের প্রাণ গেল।

কুক্লুক্সদিগের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আর দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে সদ্ভাব বাড়িয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ

অধ্যাত্ম-বিদ্যা ও প্রাকৃতিক-বিদ্যার প্রমাণের ধারা ও বিচারের প্রণালী যতই বিভিন্ন থাকুক, উভয় বিদ্যাই সত্যের অখণ্ড প্রতিষ্ঠাভূমিতে সম্মিলিত হইয়াছে। উভয়বিধ তত্ত্বের যাহা চরম প্রমাণ, নিখিল তত্ত্বেরও তাহা চরম প্রমাণ। সেই প্রমাণ—মানবচিত্তের প্রতীতি ও সম্মতি। আমাদের এই "প্রথম পুরুষ" যতক্ষণ না "হাঁ" বলিবেন, ততক্ষণ বিজ্ঞান-মন্দিরের সত্য পরীক্ষা মাত্র, এবং ধর্ম্ম-মন্দিরের সত্য "অচলায়তন"—তাহা সাকারেই হউক কিম্বা নিরাকারেই হউক।

দেখা যায় জড়-বৈজ্ঞানিকগণ জগতের বিরাট প্রাকৃতিক সত্যকে খণ্ডিত ও বিশ্লিষ্ট করিয়া একই অনন্তের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছেন। চক্ষু যাহাকে গোচরে আনিতে অক্ষম, ইন্দ্রিয় যাহাকে আয়ত্ত করিতে অপারক, পরীক্ষায় তাহার মানস-প্রতিপাদ্য বস্তু সিদ্ধ হইতেছে। স্থূলের অন্তরালে যে মহৎ সূক্ষ্ম ছিল বিজ্ঞান তাহাই এক স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষে আছে এই জগৎ ঈশ্বর-অনুজ্ঞায় উৎপন্ন হইয়াছিল। বিজ্ঞান বলেন সে ঐশবচন শুধু আদেশ ও অনুজ্ঞা-বচন মাত্র নহে—

সে মহাবাণীতে বিচার, মীমাংসা ও সামঞ্জস্যের সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা ছিল—এবং তাহাতে যে উহু অমোঘ নিয়ম ছিল তাহারই প্রভাবে তাহার প্রত্যেক এককে দ্বিতীয় এককযুক্ত হইয়া যোগ ফল দুই উৎপন্ন করিয়াছিল। এবং ব্যষ্টিতে অথবা সমষ্টিতে তাহার সেই নিয়মের ও শৃঙ্খলার কুত্রাপি কোন স্খলন ও ব্যাঘাত ঘটে নাই।

তথাপি পরীক্ষা-ও বিজ্ঞান-মন্দিরের বাহিরে এমন অনেক "Things" ছিল যাহা বৈজ্ঞানিকের "Philosophy"তে স্বপ্ন-দৃষ্টও হয় নাই। যাহারা ইচ্ছা করিয়া ভগবানদত্ত দৃষ্টিকে খর্ব্ব করিয়া রাখেন তাঁহারাই তাহা অস্বীকার করিবেন।

দাউদ গাহিয়াছিলেন—জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছে, মীল ব্যঙ্গের ভান করিয়া বলিয়াছেন—জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল নিউটনের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। মীলের বাক্যও নিরর্থক নহে। অবৈজ্ঞানিক যুগ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মহিমার কতটুকুই বা দেখিতে পাইয়াছিল। আজ যে আমরা দেখিতে পাইতেছি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, মনুষ্যের কল্পনা হইতে পরার্দ্ধ যোজন উচ্চে, অনুচ্চারিত অবিজ্ঞেয় গৌরবে—দিক্‌হারা অনন্তের মধ্যে ঘুরিয়া চলিয়াছে—আমাদের এই দর্শনের মাধ্যাকর্ষণ মন্ত্র,—এবং নিউটন ঋষি।

কিন্তু "লীডেন জারের" ভাণ্ডের বাহিরে বজ্রের যে কোন অপর ঐশ্বর্য্য ছিল না কিম্বা নাই—ইহাও বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে। বিদ্যুতের এমন এক সত্বা অতি সুনিশ্চিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—যাহা পরীক্ষাগারের বিদ্যুৎ-মান যন্ত্র কখনই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে সত্বার অস্তিত্ব অন্যত্র উপলব্ধি হইবে। তাহার পরিমাণ-যন্ত্র কবির ছন্দে এবং ঋষির মন্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহাতে বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক কাহারও আক্ষেপের কারণ নাই—ভগবানের ইহাই বিধান—আমরা হাজার ইচ্ছা করিলেও আমাদের মাসিরা মামা হইবে না।

বস্তুতই এই জরা-জীর্ণ ধূলি-পিঙ্গল পৃথিবী অতি অকিঞ্চিৎকর মৃন্ময় জড়পিণ্ডই থাকিয়া যাইত যদি মহাপুরুষগণ ইহাতে অবতীর্ণ হইয়া না বলিয়া দিতেন যে আমাদের এই ঊর্দ্ধতন চারকুড়ি-কয়বৎসরের পান্থশালার ভিতরে এবং বাহিরে অনেক প্রকার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি জাগ্রত থাকিয়া মহা মহত্তম সবিতা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্তকে জাগ্রত ও পরিচালিত করিতেছে। এবং কর্ণবিবরে চাক্ষুষ জ্ঞানের অসদ্ভাব হেতু যদি আপ্তবাক্য এবং কবিবচন অসিদ্ধ ও নিষ্ফল হইয়া যাইত তবে মানবের সহজাত দুর্দ্দশা কি দুরবগাহ পাথারের মধ্যে সহস্রগুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িত!

সৌন্দর্য্য আপনার মৌনবিধুর মাধুর্য্যভার লইয়া বহুকাল যাবৎ লোকচক্ষুকে প্রপীড়িত করিয়াছিল। অবৈজ্ঞানিক যুগ বহুকাল যাবৎ আপনার অন্ধকারভারে চরাচরকে পীড়ন করিয়াছিল। নিউটনাদি মনীষিবর্গের পুতধারায়—মানবের চিরন্তন জিজ্ঞাসানল—যাহা কিম্‌ কিম্‌ শব্দে বহুকাল ধরিয়া বিফলে রোদন করিয়াছিল—তাহা এক পরমা শান্তিলাভ করিয়াছিল। সেইরূপ কোন এক কল্পান্তের অজ্ঞাত শুভদিনে কবি অজ্ঞাত তমসাতীরে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—তাহাতেই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের যুগান্ত-পরিপুষ্ট ফল-পুট ফাটিয়া গিয়া অপূর্ব্ব রস-ধারায় জগৎ অভিষিক্ত হইয়াছিল। সৌন্দর্য্যের

পক্ষেও এক মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম ছিল—কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার কোন বন্ধু ছিল—কবি জগতের সেই বন্ধু।

ইহা হইতেও এক শুভতর তিথিতে ঋষি নিখিলের মহাপ্রাণের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন ওম্—এষঃ—ইদং। তাঁহার সেই মহামন্ত্রে মানব পশুত্ব পরিহার করিয়া অভিনব নূতন জন্মে দীক্ষালাভ করিল।

কিন্তু হায়! এই "ওঁ" এবং "এষঃ"—বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্য হইতে বৃহত্তর হইলেও, কি অপূর্ব্ব ও অবৈজ্ঞানিক ধারায়ই জগতের পরবর্ত্তিযুগসকলের মধ্যে প্রতিপন্ন হইতে চলিলেন। অন্ধকার পরিবৃত সেই অনন্ত আলোক—ছায়াবৃত সেই অপরিসীম জ্যোতিঃ,—তেত্রিশকোটী বিগ্রহেও প্রকটিত হইল না।—অথচ কোন দেবতাতেই তিনি অপ্রকাশমান রহিলেন না। বিরুদ্ধভাবের কোলাহলের মধ্যে তাঁহার অপার চরম সঙ্গতি ঐক্যতানে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত স্বরূপতার অন্তরে অন্তরে তাঁহার বিরাট অরূপতার সাক্ষ্য রহিল। সমস্ত "নেতি"র মধ্যে তাঁহার ইতিত্ব বিরাজমান থাকিল। এইরূপে মহাকবি মিল্টনের ভগবানের সিংহাসন মেঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল—এবং রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকের আভন্ত অন্ধকারেই রহিলেন। এমন কি শ্রুতি এ রাজেশ্বরের পরিচয় স্থলে কদাচিৎ বলিয়াছেন যিনি তাঁহাকে জানিতে চাহিলেন তিনি জানিতে পাইলেন না এবং যিনি জানিতে পাইলেন তিনি জনিতে চাহিলেন না—

অবিজ্ঞাতং বিজনতাং বিজ্ঞাতম বিজনতাম।

বিচিত্র নহে যে হেন এষঃ দার্শনিকের বিচারে ও বৈজ্ঞানিকের যুক্তিতে অপ্রতিপন্ন হইয়াও আর্ষবাণীর সঙ্কেত মধ্যে পরমা সঙ্গতি প্রাপ্ত হইয়া মনীষিবর্গের অন্তরের সমস্ত সম্মতি আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু যিনি তাঁহাকে যুক্তির ক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইলেন, এবং মতবাদের শৃঙ্খলে তাঁহার অপরাহত মুক্তিকে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন তাঁহাকে তিনি বলিলেন—

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি।

কিন্তু সেই "দভ্রম"—অল্প-ও সেই পরিপূর্ণতাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। ভাষার সমস্ত দুর্ব্বলতা, ছন্দের সমস্ত বন্ধন—যুক্তির সমস্ত সীমার মধ্যেই সেই মহাপূর্ণেরই সঙ্কেত রহিয়াছে। যেখানেই ভক্তের কণ্ঠে যে কোন গান ধ্বনিয়া উঠিতেছে, ভাবুক চিত্ত যে কোন ছায়ায় কাঁপিয়া উঠিতেছে এবং বিরোধের চিত্ত যে কোন যুক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাতেই তিনি প্রতিপন্ন ও প্রকাশমান হইতেছেন। কবি সীমার মধ্যে এ অসীমতা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করেন।

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

উপনিষদ-আচার্য্যগণ এই মর্ম্মের বহুশ্লোক স্মরণ করিতে পারিবেন।

ছোট-বড়র এই অপার সমস্যার মধ্যে পড়িয়া, নানা অবস্থায় ও নানা ভাবের তাড়নায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ ব্রহ্মকে খর্ব্ব করিয়া, চিহ্নিত অপরাধী হইয়া পড়িয়া, ঘরে বাহিরে বহু তাড়না লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অতি আশ্চর্য্যময় এই ছোট-বড়র রহস্য, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় "ব্রাহ্ম" ভক্তের মনেও এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়—

আমিও কি আপন হাতে
করবো ছোট বিশ্বনাথে ?
জানাব আর জান্‌বো তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?

তর্কে নহে, অন্তরের স্ফূর্য্যমান দৃষ্টি যাঁহাকে অপার ও অনন্তরূপে দেখিতে পায়, হৃদয়পুটের ভক্তি তাঁহাকে চাহে—

বন্ধু হয়ে, পিতা হয়ে, জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস এ হৃদয়ে।

এই ছোট রূপকেও মিথ্যা বলিতে আমরা কখনই সাহস পাই না।

এইরূপ একটি ছোট হৃদয়-পরিসর রূপের সহিত কবি আমাদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য দীনদুঃখীগণ তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে—কারণ তাহা তাহাদেরই চিরপরিচিত দুঃখেরই রূপ। সেইরূপে ভগবান সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে যাতায়াত করিতেছেন—কিন্তু তাঁহার সেই ভ্রূভঙ্গি-দুষ্প্রেক্ষ্য রুদ্রাননের পানে আমরা সাহস করিয়া চাহিতে পারি নাই। সেই জন্য আজকে তাঁহার পরিচয়ে ভ্রম করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সেই দেবতার শ্রুতিসম্মত পরিচয় দিয়া আমাদিগের পরম উপকার করিয়াছেন।

*　　*　　*

যাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনায় অথবা তীব্র জ্ঞান-প্রভাবে দুঃখপাশ ছিন্ন করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য। কিন্তু জগতের সে সমস্ত সাধারণ দীন হীন তাহাদের জন্য রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ মনীষিগণের সান্ত্বনা ভগবানের দুর্লভ দান।

কাহার না জীবনে এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে দুঃখের তাড়নায় অন্তরাত্মা একেবারে বিদ্রোহী হইয়া জগতের সহিত সমস্ত সখ্য সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে ? "য্যাকেইল" সুন্দরী কাহার না হৃদয়ে সান্ত্বনা-অতীত বেদনায় ক্রন্দন করিয়াছে ? এই করাল মর্ম্মনিষ্পীড়ক দুঃখ, জগতের এক চিরন্তন সমস্যা। এ চিরস্থায়ী প্রহেলিকার শত শত বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে, অথচ ইহার অন্তর্নিবদ্ধ রহস্য চির-অনুদ্ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে। কেহ বলিলেন ইহা পাপের নামান্তর, কাহারো মতে ইহা কর্ম্মবিপাক, জন্মান্তরীন অভিশাপ ও তিরস্কার। কেহ বলেন ইহা প্রকৃতির পরিশোধ। ফলকথা—সমস্ত তত্ত্বালোচনার মধ্যে ইহা কঠিন এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখরূপেই রহিয়া গিয়াছে। এবং সমস্ত তথ্যে প্রকৃত তথ্য অংশতঃমাত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়—সাধারণ দুঃখ, দুঃখই বটে। ইহা মায়া নহে, ছায়া নহে, তিরস্কার নহে, অপঘাত নহে, ইহা দুঃখ—

দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিরূপ
আপনার পানে চাই।

তবে কি ইহা শুধুই দহন এবং জ্বলন এবং তিক্ততা ? না, তাহা নহে—দীনহীনের প্রতি কবির উপদেশ—

হে দুঃখি, দীনহীন ! দীনতা তোমার
তারি হস্ত হতে নিও তব দুঃখভার।

অর্থাৎ ইহা যথার্থপক্ষে ভগবানের তিক্তদান—কিন্তু সর্ব্বথা গ্রহণযোগ্য। এ তিক্ততায় জীবের পক্ষে পরম পথ্যৌষধি রহিয়াছে—ইহাতে জাগরণের বজ্র ও বিদ্যুতানল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাধু চিত্তের পক্ষে দুঃখের এক প্রলোভনও বিদ্যমান। তিনি অকুতোভয়ে দুঃখকে প্রলুব্ধ করিয়া ভগবানকে বলিতেছেন—

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো
আরো কঠিন স্বরে জীবন-
তারে ঝঙ্কারো।

এই জন্ত মৃত্যুর মর্মান্তিক দুঃখের সহিতও তাঁহার কোন বিদ্রোহ নাই—

পাঠাইলে আজ মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি,
শূন্য ভবনে বসি তব পায়
সঁপিব আপনারে।

মৃত্যু যেমন ভগবানের দূত, দুঃখ তেমনি তাঁহার সার্থক দান—

আমি চাই তাই ভরিয়া পরাণ,
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতে বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।

জাগরণের এই তীব্র বজ্রানল তিনি তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছু আলো।

এবং এই জন্তই ভগবানের নিকট তাঁহার নির্ভীক প্রার্থনা—

মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করোনা।
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ
গর্জ্জে উঠুক সকল বাতাস
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো।

এইরূপে দুঃখকে মহৎদান, এবং মৃত্যুকে ভগবানের বিশ্বস্ত দূত বলিয়া কদাচিৎ নির্দ্দেশ করিয়াও আবার কবি দুঃখকে স্বরূপতঃ দেখিয়াছেন যে "দান" দাতারই নামান্তর এবং দূত তাঁহারই আপন ছদ্মবেশ—

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি
ডরিব হে
যেখানে ব্যথা সেখানে তোমা নিবিড় করে
ধরিব হে,
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামি!
তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণ রূপে আসিলে প্রভু চরণ ধরে মরিব হে।

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

দুখের পরে পরম দুখে
তাঁরি চরণ বাজে বুকে।

ইহা দুঃখের বোধের মধ্যে প্রকাশমান বিশ্বরূপ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণের পরম সমীচীন দর্শন, ইহা মৃত্যুর অমৃত-রূপ—

প্রতি বোধবিদিতং মতমমৃতত্বং বিন্দতে।

কারণ এই "অহমের" সমস্ত বোধের মধ্যে পুরাকালে ঋষিদের হৃদয়ে বোধাতীত প্রকাশমান হইতেন—

সৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

রবীন্দ্রনাথও এই বোধপুঞ্জের কেন্দ্রস্থিত "অহম"কে উপলব্ধি করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছেন—

দেহ মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ!

এমতে কবি দেখাইলেন যে অপার রহস্তময় 'আমির' শিখায় দাঁড়াইয়া দুঃখরূপী পরমেশ্বর অহরহ বেদনার অঙ্কুশাঘাতে আমাদিগকে সুখের জড়-শয্যা হইতে সমুত্থিত করিয়া অমৃতের পক্ষে প্রেরণ করিতেছেন।—এবং দুঃখের শুভাগমনে তাঁহার এই শুভ প্রার্থনা—

বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা

বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
দুঃখে তাপে ব্যথিত চিতে
নাহি বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

এবং এই সমুচ্চ ও সুমহৎ প্রার্থনা যে দিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সার্থক হইবে সেই দিন আমাদের দুঃখের পরিত্রাণ সম্পূর্ণ হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

দানপত্রাবলি

(বাক্‌পতিরাজের দ্বিতীয় দানপত্র)

যাঃ স্ফূর্জৎফানভৃদ্বিষানলমিলদ্ধূম্রপ্রভাঃ
প্রোল্লস-
ন্মূর্দ্ধাবদ্ধশশাঙ্ক কোটিঘটিতা যাঃ সৈংহি-
কেয়োপমাঃ।
যাশ্চণ্ডিগিরিজাকপোললুলিতাঃ
কস্তূরিকা বিভ্রমা-
স্তাঃ শ্রীকণ্ঠকঠোরকণ্ঠরুচয়ঃ শ্রেয়াংসি-
পুষ্ণন্তুবঃ।
যল্লক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং যন্নার্দিতং
বারিধে-
র্বারা যন্ন নিজেন নাভিসরসীপদ্মেন শান্তিং
গতম্।
যচ্ছেষাহিফণা সহস্র মধুর শ্বাসৈর্ণ
চাশ্বাসিতং
তদ্রাধা বিরহাতুরং মুররিপোর্বেল্লদ্বপুঃ
পাতুবঃ।

পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজদেব পাদানুধ্যাত—পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর—শ্রীবৈরিসিংহদেব পাদানুধ্যাত—পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীসীয়কদেব পাদানুধ্যাত—পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীমদ-মোঘবর্ষদেবাপরাভিধান—শ্রীমদ্বাক্‌পতি রাজ-দেব পৃথ্বীবল্লভ—শ্রীবল্লভ নরেন্দ্রদেবঃ কুশলী—তিনি সপদ দ্বাদশক সংবদ্ধ মহাসাধনিক—শ্রীমহাইকভুক্ত সেম্বলপুর গ্রামে—সমুপগতান্ সমস্তরাজপুরুষান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ প্রতিবাসি পট্টকিল—জনপদাদীংশ্চ বোধয়তি—অস্তুবঃ সংবিদিতং—"যথা গ্রামোঽয় মস্মাভিঃ ষট্‌ত্রিংশ সংত্রিক সংবৎসরেঽস্মিন্—কার্ত্তিক শুদ্ধ-পৌর্ণমাস্যাং সোমগ্রহণ—পর্ব্বণি শ্রীভগবৎ-পুরাবাসিতৈ রস্মাভির্মহা সাধনিক শ্রীমহা-ইকপত্নী আসিনী—প্রার্থনয়োপরিলিখিতগ্রামঃ স্বসীমা তৃণযূতিগোচর পর্য্যন্তঃ সহিরণ্য-ভোগভাগঃ সোপরিকরঃ সর্ব্বাদায় সমেতঃ শ্রীমদুজ্জয়িন্যাং ভট্টারিকা শ্রীমত্তট্টেশ্বরীদেব্যৈ স্নান বিলেপনপুষ্প গন্ধনৈবেদ্য-প্রেক্ষণিকাদি নিমিত্তং চ, তথা খণ্ডস্ফুটিত দেব গৃহ জগতী-সমারচনার্থং চ মাতা পিত্রোরাত্মন শ্চ পুণ্য যশোঽভিবৃদ্ধয়েঽদৃষ্টফল-মঙ্গীকৃত্যাচন্দ্রার্কা-র্ণবক্ষিতি সমকালং পরয়া ভক্ত্যা শাসনেনোদক-পূর্ব্বকং প্রতিপাদিত ইতি মত্বা তন্নিবাসি-পট্টকিল জনপদৈর্যথাদীয়মান—ভাগভোগঃ করহিরণ্যাদিকং সর্ব্বমাজ্ঞাশ্রবণ বিধেয়ৈর্ভূত্বা সর্ব্বথা সর্ব্বমস্যাঃ সমুপনেতব্যং।

সামান্যং চৈতৎ পুণ্য ফলং বুদ্ধাস্মদ্বংশ-জৈরন্যৈরপি ভাবিভোক্তৃভিরস্মৎপ্রদত্ত ধর্ম্ম-দায়োঽয়মনুমন্তব্যঃ পালনীয়শ্চ। উক্তঞ্চ।

বহুর্ভিবসুধাভুক্তা রাজভিঃসগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্যতস্য তদাফলং।
যানীহদত্তানি পুরানরেন্দ্রৈর্দানানি ধর্ম্মার্থ
যশস্করাণি।
নির্ম্মাল্যবান্ত প্রতিমানি তানি কো নাম
সাধুঃপুনরাদদীত॥
অস্মৎকুল ক্রমমুদারমুদাহরদ্ভিরন্যৈশ্চ
দানমিদমভ্যনুমোদনীয়ম্।
লক্ষ্যাস্তড়িৎ সলিলবুদ্বুদ চঞ্চলায়া দানং
ফলং পরযশঃ প্রতিপালনং চ॥
সর্ব্বানেতান্ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়ো
ভূয়ো যাচতে রামভদ্রঃ।
সামান্যোহয়ং ধর্ম্মসেতুর্নৃপাণাং কালে
কালে পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য
মনুষ্য জীবিতং চ।
সকল মিদমুদাহৃতং চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ
পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥
ইতি। সংবৎ ১০৩৬ চৈত্র বদি ৯।
গুণপুরাবাসিতে শ্রীমন্মহাবিজয়স্কন্ধাবারে
স্বয়মাজ্ঞা দায়কশ্চাত্র শ্রীরুদ্রাদিত্যঃ।
স্বহস্তোহয়ং শ্রীবাক্পতিরাজদেবস্য॥

আমরা ইতঃপূর্ব্বে অমোঘবর্ষ দেবের একখানি দান পত্রের বিবরণ "গৃহস্থে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। উক্ত পত্রখানির "সংক্ষিপ্ত সার অনুবাদ" মাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। মূল-পত্র প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এবার এই পত্রের মূল প্রকাশ করিলাম। এই সকল পত্র অতি প্রাচীন, সেজন্য ইহার সংস্কৃত বড়ই চমৎকার। এরূপ প্রাঞ্জল গম্ভীর সংস্কৃত ইদানীং অতি অল্পই নয়নগোচর হইয়া থাকে, মঙ্গলাচরণের শ্লোক দুইটী অনুধাবন করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এই সকল পত্রে অনেক ইদানীং অপ্রচলিত ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ আছে; এবং রচনাভঙ্গীরও কিছু বৈলক্ষণ্য আছে; সূক্ষ্মদর্শি পাঠকগণ এ বি . . . করিলে সুফলের আশা করা যায়।

এই দানপত্রের দ্বারা মহারাজ বাক্পতি ১০৩৬ সংবৎসরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে "মহাসাধনিক শ্রীমহাইক পত্নী আসিনী" প্রার্থণানুসারে শ্রীউজ্জয়িনীতে ভট্টারিকা শ্রীভট্টেশ্ব . দেবীকে সমস্ত আদায়, উপরিকর, স্বর্ণস্থান, তৃণযুতি গোচর ইত্যাদি সহকারে সেম্বলপুর নামক গ্রাম "স্নান বিলেপন পুষ্পগন্ধ ধূপ নৈবেদ্য প্রেক্ষণিকাদি নিমিত্ত" ও "খণ্ডস্ফুটিত দেবগৃহ জগতী সমারচনার্থ" প্রদান করিতেছেন।

মহারাজ বাক্পতি পূর্ব্বপত্র ও এই দ্বিতীয় পত্র উজ্জয়িনীতেই দিতেছেন। মহারাজ ভোজের রাজধানী ছিল ধারানগরী, কিন্তু উল্লিখিত দানপত্রদ্বয় হইতে, এবং—

অবন্তিকিত্যাবুজ্জয়িনীতি নাম্না
পুরী বিহায় স্তমমরাবতীব!
ববন্ধযস্যাং পদমিন্দ্রকল্পো
মহীপতির্বাক্পতিরাজ দেবঃ॥

এই "পরিমল কবি" প্রণীত নব-সাহসাঙ্ক চরিত লিখিত শ্লোকদ্বারা বাক্পতি রাজের রাজধানী যে উজ্জয়িনী ছিল, ইহা অসংশয়ে জানা যাইতেছে। ধারানগরীতে রাজধানী স্থাপন স্বয়ং ভোজই করিয়াছিলেন। সিন্ধু-রাজের রাজধানীও উজ্জয়িনীই ছিল।

রাজাবন্তিস্যাং * সকুলাচলেন্দ্র নিকুঞ্জ
বিশ্রান্ত যশস্তরঙ্গঃ।
ভাস্বান্ গ্রহাণামিব ভূপতি নামবাপ্ত
সৌখ্যো ধুরি সিন্ধুরাজঃ

* উজ্জয়িন্যাং

তদা...নোকহমাপ্য যস্য সমুল্লসৎ-
সান্দ্রযশঃ প্রসূনা।
গতাতিবৃদ্ধিং নবনীতবেব নিবদ্ধমূলা-
পরমার লক্ষ্মীঃ॥

উজ্জয়িনী বর্ণ...র অনন্তর লিখিত এই শ্লোক দুইটী তাহার প্রমাণ।

মঙ্গলাচরণ বংশপরিচয় প্রভৃতি পূর্ব্ব দানপত্র ও এই দানপত্রের একইরূপ। এই পত্র পূর্ব্বপত্রের পাঁচবৎসর পরে লিখিত।

পূর্ব্বপত্রের আজ্ঞাদায়ক শ্রীকইঘৈক এই দানপত্রের আজ্ঞাদায়ক শ্রীরুদ্রাদিত্য। উভয় পত্রেরই হস্তাক্ষর বাক্‌পতি রাজের।

পূর্ব্বপত্রে "যস্য আঘাটাঃ বলিয়া প্রদত্ত-গ্রামের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সীমা উল্লিখিত হইয়াছে, এ দানপত্রে তাহা নাই। "বাতাভ্রবিভ্রম মিদং" ইত্যাদি শ্লোক দুইটী পূর্ব্বপত্রে আছে, এ পত্রে নাই। "বহুভির্বসুধাভুক্তা"—ইত্যাদি পাঁচটী শ্লোক উভয় পত্রেই আছে।

আমরা মহারাজ বাক্‌পতিরাজের দানপত্রের আলোচনা করিলাম; সম্প্রতি আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট দানবীর ভোজ-দেবের একখানি দানপত্র উপস্থিত করিব। সুতরাং তৎপূর্ব্বে ভোজদেবের রাজ্যপ্রাপ্তির পর হইতে অন্যান্য বিবরণ আমরা যাহা কিছু জানি সে সমস্তই উল্লেখ করিতেছি।

মুঞ্জ ভোজদেবকে রাজ্য অর্পণ করিয়া বনে গমন করিলে, বুদ্ধিসাগরকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করিয়া ভোজরাজ রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা মহারাজ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে উদ্যানে গমনকালে দেখিলেন, কোন একজন ধারানগরবাসী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আসিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিজ, ত্বং মাং দৃষ্ট্বা ন স্বস্তি ইতি জল্পসি, বিশেষেণ লোচনে নিমীলয়সি, তত্র কো হেতুঃ"? ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণের কোন বিঘ্ন করেন না কিন্তু আপনি কাহাকে কিছু দান করেন না, সুতরাং আপনাকে আশীর্ব্বাদ করা নিরর্থক। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে কৃপণের মুখ দেখিলে আরও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

আরও শুনুন—

প্রসাদো নিষ্ফলো যস্য কোপশ্চাপি নিরর্থকঃ।
ন তং রাজান মিচ্ছন্তি প্রজাঃ ষণ্ডমিব স্ত্রিয়ঃ॥

যাঁহার অনুগ্রহ কোনরূপ শুভ ফল প্রসব করেনা; এবং কোপ ও কোনরূপ অনিষ্টের কারণ হয় না; সেইরূপ রাজাকে প্রজারা প্রার্থনা করেন।

অপ্রগল্ভস্য যা বিদ্যা কৃপণস্য চ যদ্ধনং।
যচ্চবাহুবলং ভীরোঃ ব্যর্থমেতৎ ত্রয়ং ভুবি॥

"অপ্রগল্ভের" বিদ্যা, কৃপণের ধন এবং ভীরুর বাহুবল এই তিনই জগতে নিরর্থক।

মহারাজ আরও শুনুন,—

আমার পিতৃদেব বৃদ্ধাবস্থায় কাশী গমনে প্রস্তুত হইলে আমি তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলাম। পুত্রমঙ্গলকামী পিতৃদেব উপদেশ করিলেন।—

যদি তব হৃদয়ং বিদ্বন্ সুনয়ং স্বপ্নেঽপি
মাস্ম সেবিষ্ঠাঃ।
সচিবজিতং ষণ্ডজিতং যুবতিজিতং চৈব
রাজানম্॥

হে সুধী; যদি তোমার হৃদয়কে সৎনীতি যুক্ত করিতে চাও তাহা হইলে "সচিব জিত" "ষণ্ডজিত" এবং "যুবতি জিত" রাজাকে স্বপ্নেও ভজনা করিওনা।

পাতকানাং সমস্তানাং দ্বেপরে তাত পাতকে।
একং দুঃসচিবো রাজা দ্বিতীয়ং চণ্ডাশ্রয়ঃ॥

সমস্ত পাতকের মধ্যে দুইটী পাতক সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। প্রথম—"দুঃসচিবরাজা", দ্বিতীয়—সেই রাজার আশ্রিত—গণ।

অবিবেকমর্ত্তিনৃপর্ত্তিমন্ত্রীগুণবৎসু বক্রিতগ্রীবঃ।
যত্র খলাশ্চ প্রবলাস্তত্রকথং সজ্জনাবসরঃ॥

যেখানে নৃপতি বিবেকরহিত; মন্ত্রী গুণবানকে আদর করেন না; এবং যেখানে খলেরাই প্রবল, সেখানে সাধুলোকেরা কিরূপে অবসর লাভ করিবেন।

রাজা সম্পত্তি হীনোঽপি সেব্যঃ
সেব্য গুণাশ্রয়ঃ।
ভবত্যাজীবনং তস্মাৎ ফলং কালান্তরাদপি॥

সম্পদ্‌হীন হইয়াও ভজনীয় গুণালয় নৃপতি সেবার যোগ্য। কালান্তরেও তাঁহার নিকট হইতে আজীবন ফললাভ করা যায়।

হে দেব, কর্ণ, শিবি, দধিচী, বিক্রম প্রভৃতি ক্ষিতীশ্বরগণ যেরূপ পরলোক অলঙ্কৃত করিয়া ও নিজ নিজ দানোৎপন্ন "দিব্যনবগুণের" দ্বারা পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, সেইরূপ কি কোন রাজা পৃথিবীতে আছেন?

দেহে পাতিনি কারক্ষা যশোরক্ষ্যমপাতবৎ।
নরঃ পতিতকায়োঽপি যশঃ কায়েন জীবতি॥

অবশ্যপতনশীল দেহের রক্ষা কিরূপে হইতে পারে, সুতরাং অবিনাশীযশকে রক্ষা করিতে হইবে। মানব ভৌতিক দেহ নষ্ট হইলেও যশঃ স্বরূপ দেহের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে।

পণ্ডিতে চৈব মূর্খেচ বলবত্যপি দুর্ব্বলে।
ঈশ্বরেচ দরিদ্রেচ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা॥

কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি দরিদ্র, মৃত্যু সর্ব্বত্রই সমান।

নিমেষমাত্রমপিতেবয়ো গচ্ছন্ন তিষ্ঠতি।
তস্মাদ্দেহেষ্বনিত্যেষু কীর্ত্তিমেকা মুপার্জ্জয়েৎ॥

গমনশীল তোমার বয়স "নিমেষমাত্র" ত থাকিতেছে না, সুতরাং দেহত অনিত্যই; কেবল মাত্র কীর্ত্তিই উপার্জ্জনীয়।

জীবিতং তদপি জীবিত মধ্যে
গণ্যতে সুকৃতিভিঃ কিমুপুংসাম্।
জ্ঞান বিক্রম কলাকুল লজ্জা
ত্যাগ ভোগ রহিতং বিফলং যৎ॥

পুরুষের সেই জীবন সুকৃতিদিগের কর্ত্তৃক জীবন মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে কি? যে জীবন জ্ঞান, বিক্রম, কলা, কুললজ্জা, ত্যাগ এবং ভোগরহিত, সুতরাং নিষ্ফল।"

রাজা ভোজ ব্রাহ্মণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন অমৃত স্রোতে স্নান করিয়া উঠিলেন। (পীযূষপূরস্নাত ইব)। যেন পরমব্রহ্মে লীন হইয়া গেলেন। তাঁহার কপোল দেশ হর্ষাশ্রুতে অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

মহারাজ বলিলেন—"হে দ্বিজবর, শ্রবণ করুন—

সুলভাঃ পুরুষালোকো সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥

সতত প্রিয়বাদী পুরুষ জগতে সুলভ। কিন্তু অপ্রিয়হিতের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।

'হিতংমনোহারি চ দুর্লভংবচঃ'।
মনীষিণঃ সন্তিনতে হিতৈষিণো
হিতৈষিণঃ সন্তিনতে মনীষিণঃ।
সুহৃচ্চ বিদ্বানপি দুর্লভোনৃণাং
যথৌষধং স্বাদুহিতঞ্চ দুর্লভং॥

যাঁহারা মনীষী তাঁহারা প্রায়শঃ—হিতৈষী হন না; যাঁহারা হিতৈষী তাঁহারা মনীষী নন। সুস্বাদু অথচ উপকারী ঔষধের মত সুহৃদ্ অথচ বিদ্বান্, জগতে মানবের পক্ষে বিরল।"

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন, এবং নাম জিজ্ঞাসা

করিলেন। ব্রাহ্মণ ভূমিতে নাম লিখিলেন—গোবিন্দ। মহারাজ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ আপনি প্রতিদিন রাজ সভায় পদধূলি প্রদান করিবেন। বিদ্বান্ এবং কবিদিগকে সভায় আনয়ন করিবেন, এবং আপনি আমার এই অধিকার পালন করুন, যেন বিদ্বান্ কেহ দুঃখভাক্ না থাকে।"

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শিন্টো উৎসব *

প্রাচ্য গৌরবভূমি জাপানে যতপ্রকার উৎসব বা আমোদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শিন্টো উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে যেরূপ জাতীয় ভাবোদ্দীপন এবং ধর্ম্মানুরাগের অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, তাহা অন্য কুত্রাপি সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। ইজের (Ise) সার্ব্বভৌমিক দৈবত বস্তুর শুদ্ধাধারগুলি বিগ্রহ সমেত যখন নব নির্ম্মিত দেবালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়, তখনই এ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন্ এক অজ্ঞাত সময় হইতে বিংশতিবর্ষ পরে পরে আবহমান-কাল পর্য্যন্ত যে এই মহৎকার্য্য সংঘটিত হইয়া আসিতেছে, তাহা জনসাধারণের অপরিজ্ঞাত। কেহ কেহ অনুমান দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৬৯০ অব্দের বহু পূর্ব্ব হইতে নিয়মিতভাবে শিন্টো উৎসব চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে যেটি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, সেটি সপ্তপঞ্চাশৎ অনুষ্ঠান বলিয়া খ্যাত।

প্রত্যেক একবিংশতি বর্ষে এই সকল আধারগুলি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার একমাত্র কারণ এই যে, ঐ সকল নির্ম্মিত হওয়ার পর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের জাতীয় বিগ্রহ তাহাদের অধিকার গ্রহণ করেন এবং তৎপরে মরজগতের কোনও মানব কর্ত্তৃক উহাদের পুনঃসংস্কার জাপানে ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং কোনও একটি কালগ্রাসে কবলিত প্রায় বলিয়া অনুমিত হইলে নূতন বেদী ও আধার গঠনকার্য্য সূচিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নব-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যও আরম্ভ হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইজের ধর্ম্মমন্দিরাভ্যন্তরস্থ বেদীগুলি কিংবা দৈবিক বস্তুর পবিত্র আধার সমূহ সাধারণতঃ বিংশ বর্ষের অধিক সর্ব্বধ্বংসী কালকবল হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিখুঁত ভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাই প্রাচীন বিজ্ঞব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এবংবিধ নিয়মের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ফলকথা যাহাই হউক শুনা যায় এই প্রাচীন রীতির এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কোনওরূপ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই।

মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য রাজক্ষমতা-প্রাপ্ত কতিপয় অভিজ্ঞ ও উদ্যমশীল ব্যক্তির উপর সংন্যস্ত হইয়া থাকে। উদ্যোগ হইতে উত্থাপন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বহুল আড়ম্বর পরিপূর্ণ। নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণরূপে

* The Journal পত্রিকা হইতে মূল অংশ গৃহীত। লেখক—

পরিসমাপ্তি হইলে, কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়া কলাপ দ্বারা তাহা জনসাধারণ ও রাজন্তবর্গকে জ্ঞাপন করা হয়। তখন রাজনিয়োজিত ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে সদ্যনির্ম্মিত মঠ সমূহের তত্ত্বাবধান ভার নির্ব্বাচিত ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

এইরূপ মঠ সম্প্রদানের পর হইতেই শিন্‌টো উৎসবের সূচনা হয়। প্রকৃত উৎসব রজনীতে সংঘটিত হয়। তাহার তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে নানাবিধ আয়োজন হইতে থাকে; কিন্তু উৎসব দিবস ও রজনীর ক্রিয়াকলাপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও কৌতূহলপ্রদ।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ মনোনীত পূতচরিত্রা ও সু-মধ্যমা জাপকুমারী নব-প্রতিষ্ঠিত দেবভবনগুলির সম্মুখদেশে একটি মৃণ্ময় পাত্রে নানারূপ অর্ঘ্যপুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত করে। বসুমতী পৃষ্ঠে দেবালয়গুলি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হওয়াতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনস্বরূপ ধরিত্রী দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করাই উক্তরূপ অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, বিশেষ ঘটা ও বহ্বাড়ম্বরের সহিত এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অপরাহ্নে শোভাযাত্রা বাহির হয়। সে এক মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব দৃশ্য! নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণের বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিশোভিত ধর্ম্মযাজকগণ সুরতানলয়ে প্রাণস্পর্শী মঙ্গল সূত্র ও উপাসনা মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে রাজবর্ত্ম দিয়া ধীরে ধীরে পুরাতন মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। সম্মুখে পশ্চাতে বহুল জন সমাবেশ হইয়া থাকে; তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০০০০ হাজারের ন্যূন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়।

মরীচিমালীর রশ্মিরাশি সংযত করিয়া অস্তাচল গমনের সহিত প্রকৃত উৎসব ক্রিয়া আরম্ভ হয়। একদল পুরোহিত রাজবংশ্য কোনও ভদ্র ব্যক্তির পরিচালনে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তথাকার অচির পরিত্যক্ত আধার সমূহ নিহিত দেবকীয় রত্নাভরণ পরীক্ষা ও অনিন্দ্যকারুকার্য্যবিশিষ্ট আচ্ছাদন বসন সমূহের পরিমাণ পরিগ্রহণ করেন। জনশ্রুতি শেষোক্ত সামগ্রী দৈর্ঘ্যে ইংরাজী ৩৩০০০ ফিটেরও অধিক—সুতরাং তাহা সামান্য নহে! এই পরীক্ষা কার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই সকল পবিত্র সামগ্রী নবনির্ম্মিত দেবালয়ে যাইবার নিমিত্ত নূতন আধার গুলিতে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষিত হয়। তখন অনাড়ম্বরপূর্ণ অথচ উজ্জ্বল প্রাচ্য দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত অপর একদল ঋত্বিক্ কতকগুলি দেব-সেবক লইয়া মন্দিরদ্বার সম্মুখে উপস্থিত হ'ন—এবং বিবিধ প্রকার ক্রিয়াকলাপদ্বারা চিত্তমন শুদ্ধিকরণান্তর বিগ্রহের বেদী সম্মুখে উপনীত হইয়া থাকেন।

সমাগত জনমণ্ডলী বাহিরে মন্দির দ্বারে উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণে অপেক্ষা করিতে থাকে। মন্দির মধ্যে একটি অতি ক্ষীণস্বর শ্রুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমবেত সম্প্রদায় মধ্যে এক অপূর্ব্ব গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে দেখা যায়। ঠিক সেই সময় দামামা নির্ঘোষ শব্দ বিগ্রহের শুভ আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে। তখন সকলের চঞ্চল আকুল নয়ন মন্দিরাভ্যন্তরের চতুর্দ্দিকে দেখিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়—কখন কোন শুভ মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে তাহাদের পবিত্র হইতে পবিত্রতম আরাধ্য সামগ্রীর নির্গমন হয়।

"কো—কো—কো—"একজন পুরোহিত বায়সানুরূপ ধ্বনি করিতে করিতে মন্দিরা-

ভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসেন; উদ্দেশ্য বলিবার—যেন সুপ্রভাত হইয়াছে—দেবতা জাগিয়াছেন। তখন সেই সার্ব্বভৌমিক বিগ্রহ ও দৈবত বস্তুরাশি ভক্তিভাবে স্কন্ধোপরি লইয়া কয়েকজন ধর্ম্মযাজক বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের পরিধানে শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ—শুভ্রাবরণে মুখদেশ আচ্ছাদিত, পাছে, তাঁহাদের কলুষিত শ্বাসপ্রশ্বাস স্পর্শে পবিত্র বস্তুরাশি মলিন হইয়া যায়! অপিচ জনসাধারণের পাপদুষ্ট নয়নদৃষ্টি হইতে সেই সকলকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে পটক-সদৃশ বিচিত্র যবনিকাদ্বারা বেষ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবংবিধ আয়োজনের আবশ্যক হয় না। কারণ যখন প্রজ্জ্বলিত মশালের দীপ্ত আলোকে পরিত্যক্ত পুরাতন মন্দির হইতে উক্তরূপে জাতীয় বিগ্রহ তথা দৈবত সামগ্রী সমূহকে নব-দেবালয়ে লইয়া যাওয়া হয়—তখন সকলেই ভক্তিপ্রণতান্তকরণে বিনীত মস্তকে সেই সঙ্গে সঙ্গে গমন করে—কাহারও খরদৃষ্টি বিগ্রহের দিকে সম্বদ্ধ থাকে না। শুনা যায়, এই কথিত বিগ্রহ একখানি দর্পণ বিশেষ—যাহা জাপানের সর্ব্বপ্রথম শাসনকর্ত্তাকে তদীয় বংশদেবতাকর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, এই মহদ্ব্যাপারে সমগ্র জাপ-জাতি স্বতঃপরতঃ যোগদান করে। এমন কি এই স্মরণীয় উৎসবরাত্রে টোকীয়োর রাজকীয় ধর্ম্মমন্দিরে জাপরাজ ও তদীয় মহিষীকে দেবতার বেদী সম্মুখে উপাসনাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে বিগ্রহসমেত পুরোহিতদল, নব-মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলে, তথায় কোনও যাজক আসিয়া গৃহ-প্রবেশ মন্ত্রাদি পাঠ সমাপ্ত করেন—তখন অপর একজন ঋত্বিক্ পবিত্র সামগ্রীরাশিকে ভক্তিযুতচিতে নূতন বেদীতে স্থাপনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, মন্দির দ্বার সহসা উন্মুক্ত হইয়া যায়—সেই সময় দৃষ্টিগোচর হয় যে, মন্দিরগাত্র ও চন্দ্রাতপ অননুকরণীয় অনিন্দ্য জরি-কার্য্য-বিশিষ্ট দুর্লভ বয়নবস্ত্রে সুশোভিত। ঋত্বিক্ যথাস্থানে সমস্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার উদ্দেশে অষ্টবার প্রণতিপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সহসা সমস্ত আলোকমালা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়—এবং দূর হইতে জাপানের বীরভাবপ্রসূ সৈনিকবাদ্য প্রাণোন্মাদন স্বরে সকলকে জানাইয়া দেয় যে, উৎসব ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তখন সকলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তিরস পরিপ্লুত হৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

কৃষি-প্রসঙ্গ

সুজলা সুফলা শ্যামা জন্মভূমি এই আমাদের ভারতভূমি কৃষিপ্রধান দেশ। আবহমানকাল হইতে এখানে কৃষির মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। বাণিজ্য ও কৃষিই যে সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবনধারণ করিবার প্রধান উপায় এবং ধনাগমের নিশ্চিত সাধন ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশীয় লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব-ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে এতদুভয়েরই অবনতির অবস্থা।

দেশের শস্যসম্পদ আজও কম নহে কিন্তু তাহাতে নানা কারণে দেশের লোকের অভাব পূরণ হইতেছে না। অবাধ রপ্তানির ফলে দেশে আজকাল টাকা সস্তা হইয়াছে বটে কিন্তু দ্রব্যের মূল্য অসম্ভবরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও লোকে পূর্ব্বের মত স্বাচ্ছন্দ্য লাভে বঞ্চিত।

এই সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক বিলাস-বাসনাও দেশে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে আমাদের অনর্থক অর্থব্যয় হইতেছে, অন্য দেশীয়েরা ধনী হইতেছে। রপ্তানী ও আমদানীর মধ্যে এইটাই আমাদের দেশে প্রধান অনুধাতব্য যে আমাদের জীবনীশক্তির উপাদান চাউল, গম, ডাল, কলাই, তিসি, সরিসা প্রভৃতি বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। তদ্বিনিময়ে আমরা অর্থ পাইতেছি তাহা সত্য কিন্তু সে অর্থে আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না।

আর ঐ সব জিনিসের পরিবর্ত্তে আমদানী হইতেছে, কাচ ও লোহার নানারূপ বাসন, চুড়ী, মালা, কৌটায় দুধ, সহস্র প্রকারের ফুড্, ইত্যাদি জিনিস। এ সব জিনিস না থাকিলেও আমাদের কোন ক্ষতি নাই কিন্তু তথাপি লক্ষ লক্ষ টাকার এই সব জিনিস এই দেশেই কাটিতেছে।

ইহার প্রতীকার বর্ত্তমানক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

অথচ বাঁচিতে তো হইবে! এ জন্য দেশের অনেকেরই এই অভিমত যে দেশের কৃষির উন্নতিবিধানে আমাদের যত্নপর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দেশের নিরক্ষর কৃষককুল উৎকৃষ্ট শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহারা কুল ক্রমাগত নিয়ম পদ্ধতি অনুসারেই স্বীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তজ্জন্য তাহাদিগকে দোষী করা যাইতে পারে না।

শিক্ষিতগণ এই সব 'চাষা'দিগকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়া, তাহাদিগকে লইয়া এ বিষয়ে কোন আলোচনা করাও অপমানের বিষয় মনে করেন। সুতরাং তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

আমাদের কৃষককুল তাহাদের জাতীয়-ব্যবসায়ে অপটু নহে। অনেক ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ ইহাদের কৃষিপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

অতএব ক্ষেত্র মন্দ নহে, ইহাতে উপযুক্ত বীজ রোপণ করিতে পারিলে ভাল ফলের আশা নিশ্চিতই আমরা করিতে পারি।

যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা যদি কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অনেক উন্নতির আশা করা যায়। কারণ তাঁহারা কৃষি সম্বন্ধে ভাল ভাল পুস্তক-পত্রিকাদি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া, তদুপদিষ্ট প্রণালীর প্রবর্ত্তন দ্বারা সমধিক ফললাভ করিতে পারেন। তবে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির অলস, শ্রমবিমুখ, বিলাসপরায়ণ হইলে চলিবে না। তাঁহাকে ক্ষেত্রে যাইয়া কোদাল ধরিতে হইবে ইহা আমরা বলিতেছি না; তবে তাঁহাকে জনমজুর দ্বারা কাজ করাইতে হইবে, ক্ষেত্রসমূহের তদ্বির করিতে হইবে। তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি।"

ইত্যাদি বচনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। আর একটি কথা এই যে সকল কার্য্যেই 'গুরুকরণে'র আবশ্যকতা আছে।

কৃষিতেও তাহার প্রয়োজন বিশেষরূপই আছে। যাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহারা সাহিত্য অঙ্কাদি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু কৃষি বিষয়ে তাঁহারা অজ্ঞ। শুধু কৃষিবিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে অর্জ্জিত-জ্ঞানের সাহায্যে কার্য্য আরম্ভ করিলে অনেক সময় সাধারণ নিয়মাবলীর অজ্ঞতা নিবন্ধন অনর্থই উৎপন্ন হইতে পারে এবং বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গবাসীপত্রে প্রকাশিত বিদুষী পাক-রাজেশ্বরী শ্রীমতী চঞ্চলার দশাও অনেকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সুতরাং যাহারা কৃষিকার্য্য বহুকাল হইতে করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কৃষি বিদ্যায় বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করা নব শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সমুদয় আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে সকল স্থানেও শিক্ষা-নবিশী করিলে উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ করিতে পারে। মোটকথা যেরূপেই হউক কৃষিতত্ত্ব-বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া তার পর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা বিধেয়। যাঁহারা ১৫।২০৲ টাকার চাকরীর জন্য দ্বারে দ্বারে তোষামোদ করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহারা তদপেক্ষা সুযোগ ও সুবিধা করিয়া উপযুক্ত স্থানে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে, নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে অধিক ফললাভে সমর্থ হইবেন এ বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি না।

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামের কৃষক-কুলকে উন্নত প্রণালীর কৃষির বিষয়ে 'হাতে হেতেড়ে' উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

আজকাল দেশের অনেক সহরেই নানারূপ কৃষি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে এবং তাহাতে বৎসর বৎসর অনেক গুলি করিয়া অর্থব্যয় হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইতেছে সেটা বিবেচ্য বিষয়। এইরূপ সব প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ ব্যাপারেও আসল উদ্দেশ্যের বিপরীত ব্যবস্থা সময় সময় দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। কোনও বাবুর বাগানে ১০।৫ টা বাঁধা কপির চাস হয়, তাহা ভাল বাঁধে নাই, ক্রমে ফুল হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল যে বাঁধা কপির বীজ উৎপাদনের চেষ্টা সহরে করা হইতেছে অমনি তাহার উপর একটা পুরস্কারের আদেশ হইয়া গেল!

একজনের গাছে হঠাৎ একটা পেঁপে খুব বড় হইয়া গিয়াছিল; তাহা প্রদর্শনীতে দেওয়া হইল যে খুব বড় পেঁপে ফলানের চেষ্টা হইতেছে—অমনি তাহার উপর একটা পুরস্কার দেওয়া হইল! এ সব আমার নিজের জানা ঘটনা।

ইহাতে কি প্রদর্শনীর কার্য্য সিদ্ধ হয়? প্রদর্শনীর উপকারিতা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু উপযুক্তভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

কৃষকবহুল গ্রামসমূহে যদি ছোটখাট ভাবে এক একটা প্রদর্শনী খুলিয়া তাহাতে উন্নত প্রণালীর চাষ, সার প্রভৃতির পদ্ধতি হাতে কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয় এবং কৃষকগণকে বলা যায় যে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফসল হইবে তাহাকে ২৫৲ কি ৩০৲ কি ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় কৃষককুল বেশী আগ্রহ সহকারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। তারপর প্রত্যেক প্রজাহিতৈষী জমিদার যদি কৃষিবিদ্যা পারদর্শী এক একজন লোক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহা-দিগকে পালাক্রমে নিজ নিজ জমিদারীর

অন্তর্গত গ্রামসমূহে প্রেরণ পূর্ব্বক, কৃষকদিগকে হাতে কলমে উন্নত প্রণালী অবলম্বনে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা খুব অধিক ফল লাভ হইতে পারে।

কৃষক-কুল একে অজ্ঞ, তাহাতে বড়ই রক্ষণশীল; সহজে তাহারা স্বীয় পুরুষানুক্রমিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া একটা 'নূতন কিছু' করিতে চাহে না! তাহাদিগকে বলিলে তাহারা বলে "বাবুজি, ওসব আপনাদের বইএর কথা—ও কি কাজে করা যায়?" কিন্তু যদি তাহারা স্বচক্ষে দেখিতে পায় যে তাহাদেরই সমক্ষে একজন একইরূপ জমিতে ভিন্ন প্রকারে চাষ করিয়া, তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ফল পাইতেছে, তবে তাহাদের নিশ্চয় চৈতন্য হইবে। এবং তাহারা নিজ নিজ জমিতেও সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে, ফসল উৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইবে।

আমরা জানি যে কোনও গ্রামের চাষীদিগকে আলু রোপণের পরামর্শ পুনঃ পুনঃ দিয়াও, একজন বন্ধু কোন ফল পান নাই। তারপরে তিনি নিজের ১০ কাঠা জমিতে আলু রোপণ করাইয়া ভগবদিচ্ছায় বেশ ফসল পান। তাহা দেখিয়া অন্য চাষারাও আলুর চাষ করা আরম্ভ করিয়াছিল।

বড় বড় জমিদারগণ প্রজার কল্যাণের জন্য কৃষির উন্নতির বিষয়ে এইরূপে মনোযোগী হইলে, অতি শীঘ্রই ইহার সুফল পাওয়ার আশা করা যায়। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, কাশীমবাজার, উত্তরপাড়া, নড়াইল, নাটোর, দিঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা, সন্তোষ, ঢাকা, প্রভৃতি স্থানের মহারাজা, রাজা, জমিদার ও নবাব সাহেবগণ যদি স্বীয় স্বীয় মফঃসল জমিদারীর গ্রাম্য প্রজাগণের শিক্ষার জন্য, এইরূপ কৃষি বিত্তায় শিক্ষিত লোক নিযুক্ত করিয়া, পালাক্রমে জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কৃষির অনেক উন্নতি হইবে। তার পর মধ্যে মধ্যে এই সব পল্লীগ্রামে ছোটখাট কৃষি-প্রদর্শনী খুলিয়া, কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষ প্রদর্শন করাইয়া সেইরূপ উৎকর্ষ দেখাইতে পারিলে, বেশ ভালমত পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলেও সুফলের আশা করা যায়।

নতুবা সামান্য ২।১৲ টাকা পুরস্কারের দ্বারা কোন কাজ হয় না। মেডেল আদি প্রদান সম্পূর্ণই নিষ্ফল।

লেখাপড়া জানা লোকে কৃষি ব্যবসা আরম্ভ করিয়া তাহার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, সুন্দরবন, নেপাল, আসাম, গোয়ালিয়র, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচন করিয়া বাবুগিরি ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া, যদি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে সফলতার সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ নাই।

কৃষি কার্য্যেরও অনেক বিঘ্ন আছে সত্য, কিন্তু বিঘ্ন বিনাশনের উপায়ও আছে। তাহাতে অভিজ্ঞ না হইলে চলিবে কেন? তারপর ধৈর্য্য সহকারে স্বীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

কারবার করিলেই তাহার লাভ লোকসান আছে। কৃষিরও হাজা শুকা আছে। বন্য জন্তুর উপদ্রব আছে, পঙ্গপাল আছে, পক্ষীপাল আছে, চোর ডাকাতও আছে কিন্তু তা বলে "ভাবনা করা চল্‌বে না।"

যদিই বা কখন কখন এই সব উপদ্রবের

জন্য ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তাহাতে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে না। পূর্ণ উদ্যমে স্বীয় কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে হয়ত দুই এক বৎসর মধ্যেই আগের লোকসান ঘুচিয়া গিয়া লাভই দাঁড়াইয়া যাইবে। স্বীয় স্বীয় কৃষিক্ষেত্রের জন্য কূপাদি খননের প্রয়োজন উপেক্ষা করা উচিত নহে। উপযুক্ত সংখ্যক কূপ কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে থাকিলে অনাবৃষ্টির সময়ে শস্যহানির আশঙ্কা নিজের চেষ্টায় কতকটা পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

আমরা অদ্য সাধারণ ভাবেই এই কৃষি প্রসঙ্গে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বলিলাম। কৃষির উন্নতিকল্পে যাহা আমাদের বিবেচনায় সহজ ও নিশ্চিত ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস, অদ্য তাহারই দু একটি কথা নিবেদন করিলাম মাত্র।

আশাকরি আমাদের দেশের সুসন্তানগণ এবং মহারাজা, রাজা, জমিদার মহোদয়গণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিবেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে এইরূপ সব প্রদর্শনীর জন্য সংগৃহীত অর্থ দ্বারাই, ঐরূপ কৃষিবিৎ উপদেশকের কতকটা সংস্থান হইতে পারে এবং প্রদর্শনীর আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের সাহিত্য-সেবা ও শিক্ষা বিস্তার

সৈয়দবংশ

প্রথম দুইজন সৈয়দ বাদশাহ খিজর খাঁ ও মবারিক, তোগলক বংশের প্রথম তিনজন সম্রাটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। নগরের প্রাসাদ মালা নির্ম্মাণে তাঁহারা সে পরিচয় দিয়াছেন। খিজর খাঁ একস্থানে স্বীয় বাসনার অনুরূপ হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করাইয়া উহার নাম রাখেন খিজরাবাদ, কিন্তু মবারিকের মোবারকাবাদ সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বেই ঘাতকের হস্তে জীবনান্ত হয়। এই দুইজন সুলতানের সংক্ষিপ্ত রাজত্বের ন্যায় তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের শাসনকর্ত্তৃ-দ্বয়ের রাষ্ট্রীয় অবস্থাও সেইরূপ ছিল। শেষ সৈয়দ বাদশাহ আলাউদ্দিন ৩০ বৎসর কাল বুদায়ুনে বাস করেন, এই সময়েই বহ্‌লুল্ তাঁহার হস্ত হইতে দিল্লী গ্রহণ করেন। হিন্দুস্থানের এই প্রাচীনতম নগর বুদায়ুনে, পাঠান বংশের যুবরাজগণ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে দরবার প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কুটাইরের অনেক স্থানে কারু-কার্য্য-খচিত অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ, কোথাও বা রাজোদ্যান, মসজিদ, কলেজ এবং স্মৃতিমন্দির সমূহের ধ্বংসাবশেষ পতিত থাকিয়া, দর্শকের মনে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী ১০০ শত মাইলের ভিতর একটী শিক্ষাকেন্দ্র অথবা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষা

বিস্তারের সহায়তা করিতেছিল। উহার অধীনে অনেকগুলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দিল্লী ও ফিরোজাবাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য ঐ শিক্ষা কেন্দ্রেই নির্ব্বাহিত হইত।

লোদীবংশ

সৈয়দবংশের পর দিল্লীর সিংহাসন লোদী-বংশীয় বহ্‌লুলের হস্তগত হয়। তাঁহার রাজত্ব সময়ে যে অভাবিতপূর্ব্ব নগরী আবিষ্কৃত হয়, উত্তরকালে ভারতের ভাবী মুসলমান রাজগণের রাষ্ট্রনীতি ও পুণ্যস্মৃতি উহারই সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। নানা-প্রকার রাজকীয় উৎসাহের ফলে এই নগরী ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে উন্নত হইয়া প্রাচীন নগরী সমূহের সমকক্ষ হইয়া পড়ে।

সুলতান নিজে পণ্ডিত না হইলেও, পণ্ডিত সঙ্গ ভাল বাসিতেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে পুরস্কৃত করিতেন। বহ্‌লুলের রাজত্বে শান্তি-স্বস্তি ফিরিয়া আসে, এবং এই সময়ে বিশেষ ভাবে সাহিত্যানুশীলন হইতে থাকে। সুলতান স্বয়ং এই বিষয়ের উৎসাহ দাতা ছিলেন। মাহিরি রহিমি হইতে জানা যায়, এই সময়ে অনেকগুলি কলেজ প্রস্তুত হইয়াছিল।

বহ্‌লুল বিশেষ আলোচনার সহিত ইস্‌লামীয় আইনগ্রন্থ পাঠ করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তিনি কতকগুলি আইন প্রস্তুত করেন। এই সম্রাট্ তাঁহার অপক্ষপাত বিচারের জন্য যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন উহা কেবলমাত্র তাঁহার আইনগ্রন্থ পাঠ ও সুশাসনেরই ফল নয়, উহাতে অন্তর্নিহিত একটা শক্তির বিকাশ হইয়াছে।

সুলতান বহ্‌লুলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর বাদশাহ হন। দিল্লী হইতে আগ্রায় রাজধানী পরিবর্ত্তন সিকন্দরের রাজত্বকালের একটী বিশেষ ঘটনা, কারণ পৃথ্বীরাজ হইতে বহ্‌লুল্ পর্য্যন্ত রাজগণের রঙ্গভূমি দিল্লীতেই ছিল। সিকন্দরের রাজত্বকালে আগ্রা সর্ব্বতো-ভাবে প্রধান হইল। দিল্লী ও ফিরোজাবাদ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আগ্রাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। সুলতান স্বয়ং একজন কবি ছিলেন, সাহিত্যিকদিগকে উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। সিকন্দর সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করিয়া গুল্‌রুখ্ নাম দিয়া প্রকাশ করিতেন। কবিতাবলী বিচার করিয়া মতামতের জন্য কবি সেখ জামালকে অর্পণ করিতেন। তদ্‌রচিত একখানি পুস্তকের নাম সিয়ারুল আরিফিন্। তাঁহার সভায় দ্বিচরণ রচয়িতা ৮।৯ হাজার কবি বাস করিতেন। সুলতান সৈনিক বিভাগেরও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় রাজগণের মধ্যে তিনি এ বিষয়ের প্রথম প্রবর্ত্তক। আজকালও দুই একটী সভ্য দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে রাজতন্ত্রের দ্বারা এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

সুলতান এই সকল বিষয়ে উদার হইলেও স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি খুব গোঁড়া ছিলেন। তিনি যখন মারওয়ারে ছিলেন, হিন্দুর মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া মসজিদ্ তুলিয়াছেন এবং ঐ স্থানে একটী কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সকল স্থানে অনেক সাধুপুরুষ ও পণ্ডিতমণ্ডলী অবস্থান করিতেন। সিকন্দর মথুরার দেবালয় সমূহ এবং প্রধান প্রধান তীর্থস্থান সমূহ ধ্বংস করিয়া উহাদের স্থানে হোটেল ও উচ্চবিদ্যালয় তৈয়ারী করেন।

সুলতান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক শুনিতে ভাল বাসিতেন; উহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগদান করিতেন। কোন এক সময়ে একটী বিচার স্থলে সুলতান সমধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এবং নিজ ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া এরূপ একটা নিষ্ঠুর ও চরমপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, তৎকর্ত্তৃক একজন হিন্দু-প্রতিনিধির জীবনান্ত হয়। এই হিন্দু-প্রতিনিধির নাম বুর্বুন, তিনি কবীরের ন্যায় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন—হিন্দু এবং মুসলমান পবিত্রতা দ্বারা চালিত হইলে উভয়েই সমভাবে ভগবানের নিকট গৃহীত হয়। সম্রাট্ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণকে সমবেত করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত তর্ক করিতে আদেশ দেন। নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ বিচার স্থানে উপনীত হইলেন, সম্রাট্ স্বয়ং বিচার স্থানে উপস্থিত ছিলেন—

টুলাম বারের	মিয়া কাদির বিন সেখ রজু, মিয়া আব্দুল এলিয়াছ এবং মিয়া আহ্লাদাদ।
দিল্লীর——	সৈয়দ মহম্মদ বিন সৈয়দ খাঁ।
সিরহিন্দের	মোল্লা কুতুবুদ্দিন এবং মোল্লা আহ্লাদাদ সঙ্গে সৈয়দ আলম।
কণৌজের	সৈয়দ বুর্‌হন এবং সৈয়দ আনসুম।

এই সকল পণ্ডিতগণ ব্যতীত সুলতানের সভার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কণৌজের সৈয়দ সাদ্রুদ্দিন, সিকোর মিয়া, আব্দুল রহমান্ এবং সম্বলের মিয়া আজিজুল্লা প্রধান।

হিন্দু তার্কিক সাহসের সহিত তর্ক করিলেন। প্রতিবাদীরা সুলতানের নিকট নিবেদন করিল আমরা আর তর্ক করিতে চাহি না, এই খানেই বিচারের নিস্পত্তি হউক; ব্রাহ্মণকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলায় তিনি অস্বীকৃত হন—।

সিকন্দরের রাজত্বে হিন্দুগণ পার্শিভাষা এবং মৌলিক উর্দ্দু সাহিত্য অথবা হিন্দীভাষা শিক্ষার আবেদন করেন ইহাও একটী বিশেষ ঘটনা। কারণ হিন্দীভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই চলিত। আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, এইরূপ সম্বন্ধ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং হিন্দুগণ সময়ে সময়ে ইসলামীয়ভাষা পাঠে আপত্তিও করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বে যাহার সূচনা মাত্র হইয়াছিল এই সময়ে তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। ফেরিস্তার বিবরণ হইতে আরো জানা যায়—যে সকল হিন্দু এই সময় পর্য্যন্তও পার্শিভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারাও এখন পার্শি শিক্ষা করিতে থাকেন।

ঐতিহাসিক আব্দুল্লার বিবরণ হইতে সুলতান সিকন্দরের চরিত্রের কয়েকটী বিশেষত্ব অবগত হওয়া যায়—সতের জন খ্যাতনামা এবং গুণশালী পণ্ডিত সর্ব্বদাই তাঁহার বাসগৃহে অবস্থান করিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের কালে সুলতান আহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিতেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীও হস্তপদ প্রক্ষালনের পর সুলতানের সম্মুখে উপবেশন করিতেন। আহারের পূর্ব্বে একখানি বড় চেয়ার শয্যার পার্শ্বে আনয়ন করা হইত এবং উহাতে বিভিন্ন প্রকার আহারীয় দ্রব্য সাজান হইলে সুলতান আহার করিতেন। সুলতানের সমক্ষে পণ্ডিতগণের আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ; সুতরাং সুলতানের আহারের পর তাঁহারা ঐ সকল

খানা লইয়া নিজ নিজ গৃহে ভোজন করিতেন। সিকন্দরের শুভানুগ্রহে ও উৎসাহে অনেক নূতন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়; পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ ও ভাষ্য রচিত হয়। আগর মহাবেদক (অথবা ভেষজবিজ্ঞান এবং নিদান) অনূদিত হয়, এবং তিব্বি সিকন্দরী আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আবদুল্লা বলেন—ইহা হাইণ্ডের চিকিৎসকগণের শিক্ষার প্রথম সোপান এবং বিশেষ বিশেষ রোগেও ব্যবহৃত হয়।"

ওয়াকিয়াতি মুস্তাকি বলেন,—মিয়া ভুধ মৃত খাওয়াজ খাঁর পদ প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হন। তিনি উত্তম লেখক ও কতকজন পণ্ডিতকে, বিজ্ঞানের প্রতিশাখায় গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত নিয়োজিত করেন। সুলতান খোরাসান হইতে পুস্তক আনাইয়া পণ্ডিত-গণকে ও সৎব্যক্তিদিগকে পড়িতে দেন। লেখকগণ এই সকল গ্রন্থ রচনা কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সুলতান হাইণ্ড খোরাসানের চিকিৎসকদিগকে সমবেত করেন এবং ভেষজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী সংগ্রহ করিয়া একটী নির্ব্বাচন করেন। গ্রন্থখানি এরূপভাবে সাজান হইয়াছে যে, তিব্বি সিকন্দরী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে তদপেক্ষা প্রাধান্য অন্য কোন গ্রন্থেরই ছিল না।

সিকন্দরের রাজত্বে আরব, পারস্য, বোখারা এবং ভারতের পণ্ডিতগণও সুলতানের অনুগ্রহে ও উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া নূতন রাজধানী আগ্রাতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সুলতানের দরবারের সহিত, রাজ্যের যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহারা সুলতানের আদেশে সম্পত্তি ও অন্যান্য প্রকারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া আগ্রায় গমন করেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনায় সুলতান উৎসাহ দিতেন।

যে সময় সম্রাটের সহায়তায় সাহিত্য উন্নত হইতেছিল, সে সময়ের একজন বিশিষ্ট মনস্বী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। মসুয়াদ আলি হোসেন খাঁ একজন প্রধান দানবীর—তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়, যদি কোন লোক তাঁহার নিকট হইতে টাকা গ্রহণের পর মারা যাইত, তাহা হইলে ঐ টাকা মৃতব্যক্তির কোন আত্মীয়কে দান করিতেন। এবং যদি কোনস্থলে একমাত্র স্ত্রীই জীবিত থাকিত,—তবে তাঁহার দত্তক পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা ও অশ্বারোহণ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন।

সিকন্দরের রাজত্বে অন্য আর একজন মহদ্ব্যক্তির নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার দৈনিক কার্য্যের তালিকা হইতে জানা যায়, তিনি প্রত্যহ কোরাণের ১৭ অধ্যায় পাঠ করিতেন, ঐ কার্য্য সমাপ্ত না হইলে তিনি অন্যত্র পদক্ষেপ করিতেন না। ঘাউস্-উস্-সাকলা'র ১টী তকমিল এবং হাসন-ই—হাসের সমস্ত পাঠ করা তাঁহার দৈনিক তালিকার অন্তর্গত ছিল।

ইব্রাহিম লোদী আদৌ তাঁহার পিতা সিকন্দরের পথাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, কিন্তু যে সুলতানের বংশ উন্নতির উর্দ্ধস্তরে ক্রমে উঠিতেছিল, সুলতানদিগের বংশধর থাকিলে হয়তঃ উন্নতির পূর্ণমাত্রা বিকাশ পাইত।

কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

খাদ্যে শ্বেতসার

পূর্ব্বে আমরা খাদ্যে অম্লসার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অম্লসার প্রবন্ধে আমরা শ্বেতসার সম্বন্ধে দু'একটি কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। শ্বেতসারে অঙ্গারসার, অম্লজান, উদজান বর্ত্তমান আছে। শেষোক্ত দুইটি জলে যে পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে সেই পরিমাণে শ্বেতসারে আছে।

খাদ্যে শ্বেতসারের কার্য্যকারিতাঃ—

খাদ্য রূপে আমরা যে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকি মোটামুটি তাহার চারিটা কার্য্যকারিতা দেখিতে পাই।

১। দৈহিক কোষগুলির বিশেষতঃ মাংসপেশী সমূহের কার্য্য-পরিচালনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হইতে উৎপন্ন। নানা প্রকার পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মাংসপেশী যে পরিমাণে কার্য্য করিতে থাকে সেই পরিমাণে ইহার জৈবিক শ্বেতসার (Glycogen) লোপ পাইয়া থাকে। উপবাসকালীন অত্যন্ত দৈহিক পরিশ্রম করিলে সময়ে সময়ে দেহের তন্তু (tissue) ও যকৃৎ (liver) হইতে এই জৈবিক শ্বেতসার একেবারে লোপ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্বেতসার হইতেই মাংসপেশী ও দেহতন্তুর কার্য্যকারী শক্তির উৎপত্তি।

২। শ্বেতসার হইতে দৈহিক তাপের উৎপত্তি। প্রতি গ্রাম্ শর্করা হইতে আমরা প্রায় চার 'কেলরি' * (Calorie) উত্তাপ পাইয়া থাকি। আমাদের খাদ্যে অধিকমাত্রায় শ্বেতসার বর্ত্তমান থাকায় আমরা অতি সহজে ইহা হইতে দৈহিক উত্তাপ পাইয়া থাকি। শ্বেতসার হইতে লব্ধ উত্তাপের অধিকাংশই দৈহিক পরিশ্রম কালে অধিক মাত্রায় ব্যয়িত হইয়া থাকে; তবে বিশ্রাম কালেও ইহা যে ব্যয়িত হয় না এমন নহে। মাংসপেশীর স্বভাব সঙ্কোচনেও (muscular tone) ইহার কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে।

৩। অম্লসার প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহা অম্লসার—রক্ষক (protien sparer)। শ্বেতসারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিলে অম্লসারের মাত্রা হ্রাস করা যাইতে পারে; তবে ইহার একটা সীমা আছে। আমরা জানি যে একমাত্র অম্লসার ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যে সোরাজান নাই। কিন্তু দেহের উন্নতি বৃদ্ধির জন্য সোরাজান অত্যন্ত আবশ্যক। কাজেই কোন জীব কেবল মাত্র শ্বেতসার খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সে খাদ্যের মধ্যে থাকিয়া পেট পুরিয়া শ্বেতসার খাইয়া অবশেষে অনশনে মারা পড়িবে। ফলতঃ শ্বেতসার কেন অন্য কোন খাদ্যই অম্লসারের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে না এবং এই হিসাবে কোন খাদ্যই

* এক Cubic centimeter পরিমিত জলকে ৪:—৫: Centigrade এ আনিতে হইলে যে উত্তাপের প্রয়োজন তাহাকে এক কেলরি বলা হয়। বিজ্ঞান-জগতে এই হিসাবে উত্তাপ মাপা হইয়া থাকে।

লেখক।

অন্নসার রক্ষক নহে। তবে অন্নসারের যে অংশ হইতে তাপাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে কেবল সেই অংশের পরিবর্ত্তেই শ্বেতসার বা স্নেহ ব্যবহার করিয়া অন্নসার রক্ষা করা যাইতে পারে। নূতন তন্তু নির্ম্মাণের জন্য ও পুরাতন তন্তু সংস্কারের জন্য—অন্নসার একান্ত আবশ্যক একথা যেন কোন ক্রমেই ভুল না হয়। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে স্নেহ ও শ্বেতসারের মধ্যে অন্নসার-রক্ষক হিসাবে শ্বেতসারই বিশেষ উপযোগী। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে অন্নসার-বিবর্জ্জিত খাদ্য ব্যবহারের সময় স্নেহ অপেক্ষা শ্বেতসার (অবশ্য শক্তি হিসাবে তুল্য মাত্রায় ব্যবহার করিলে) কার্য্যকারী। আর মিশ্রন-খাদ্য (mixed diet) ব্যবহারের সময় অধিক পরিমাণে শ্বেতসার ব্যবহার করিলে যে পরিমাণ অন্নসারের দ্বারা 'সোরাজান-সাম্যাবস্থা' পাওয়া যায় স্নেহের সহিত অন্নসারের ব্যবহারে তত অল্প মাত্রায় 'সাম্যাবস্থা' পাওয়া যায় না। দেহের পুষ্টির জন্য শর্করা অপরিহার্য্য। ইহার অভাব ঘটিলে অন্নসারের বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে; এবং তাহা হইতে শর্করা উৎপন্ন হয়। এই কারণেই অনেক সময় বহুমূত্র রোগে (diabetes) অনশনেও মূত্রের শর্করার ভাগের হ্রাস হয় না।

(৩) শ্বেতসার দেহের মধ্যে জৈবিক-শ্বেতসাররূপে (Glycogen) থাকে। এই জৈবিক শ্বেতসারের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যদি অপরিমিত শ্বেতসার ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ ইহা স্নেহরূপে দেহের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হয়। আবার অনেক সময়ে ইহা হইতে নানাপ্রকার বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করিব।

দৈহিক শ্বেতসারের উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যকৃতে (শতকরা এক হইতে চারি ভাগ) ও দেহের মাংস তন্তুও পেশীর মধ্যে (শতকরা ·৫ ভাগ) জৈবিক শ্বেতসার বর্ত্তমান আছে; আর ·১—·১৫ ভাগ শর্করা রক্তের স্রোতের মধ্যে আছে। অনশনকালে অন্নসার হইতে এই জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন দৈহিক স্নেহ হইতেও ইহা উৎপন্ন হইতে পারে; তবে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাহাই হউক সাধারণতঃ শ্বেতসারই জৈবিক শ্বেতসারের মূল উৎপত্তির কারণ।

আমরা যে শ্বেতসার খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে নানাপ্রকার বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে এবং পরিশেষে তাহাই জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত হয়: অন্ত্র হইতে শ্বেতসার মনো-স্যাকারাইড্স্ (mono-saccharides) রূপে শোষিত হয়। পাকস্থলী হইতে অতি অল্পই শর্করা শোষিত হইয়া থাকে। ইনভার্টেজ্ (Invertase) নামক কিণের (fermait) সাহায্যে ইক্ষু-শর্করার (cane-sugar) কতক দ্রাক্ষাশর্করায় (Grape-sugar) আর কতক মধু-শর্করায় (lavulose) পরিণত হয়। আর দুগ্ধ-শর্করা হইতে দুগ্ধ কিণের (lactase) সাহায্যে দ্রাক্ষা শর্করা ও গ্যালাক্টোজ্ (galactose) এ পরিণত হয়। এই সকল দ্রব্য অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে মূত্রের সহিত দেহ ত্যক্ত হইয়া থাকে।

আমাদের খাদ্যের অধিকাংশ শ্বেতসারই শালিজাতীয় দ্রব্য (Starch) হইতে গৃহীত হয়। এ কারণে শোষণ কার্য্যের অনেক

সুবিধা ঘটে। এই শালী জাতীয় খাদ্য হইতে শ্বেতশর্করা (maltose) ও 'প্রাথমিক দ্রাক্ষা-শর্করা' (Dextrine) হয়। পরে ইহা হইতে দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত হইতে সময় লাগে; ফলে শোষণ বেশ অল্প অল্প করিয়া চলিতে থাকে। ইহাতে ৫০০ গ্র্যাম বা ততোধিক (প্রায় এক সের) শালি জাতীয় দ্রব্য অনায়াসে দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত হইয়া রক্তমধ্যে শোষিত হইতে পারে। এই দ্রাক্ষা-শর্করা পোর্ট্যাল ভেন্ (portal vein) দিয়া যকৃতে গিয়া উপস্থিত হয়। যকৃতের একটি প্রধান কার্য্য এই যে রক্তের মধ্যে শোষিত প্রয়োজনাধিক শর্করাকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করে। এইরূপে রক্তে কেবলমাত্র শতকরা ০·১৫ শর্করা নির্দ্দিষ্ট থাকে। সময়ে সময়ে এমনও ঘটিয়া থাকে যে অধিক মাত্রায় শ্বেতসার ব্যবহারে যকৃৎ সমস্ত শ্বেতসারকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করিতে পারে না; তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে রক্তে শর্করা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। এইরূপ অবস্থার নাম হাইপারগ্লিসেমিয়া (hyper-glycemia) বা 'শর্করাধিক্য' এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক শর্করার অংশ মূত্রের সহিত দেহ ত্যক্ত হয়; ইহাকে এলিমেণ্টারি-গ্লাইকোসুরিয়া (alimentary-glycosuria) বলা হয়। যকৃৎ যে পরিমাণ শ্বেতশর্করাকে জৈবিক শ্বেত শর্করায় পরিণত করিতে পারে তাহাকে 'শ্বেত-সার-মাত্রা' (assimilation limit of carbo-hydrate) বলা হয়। মাত্রাধিক্য হইলে শর্করা মূত্রের সহিত দেহত্যক্ত হয়। এই 'শ্বেতসার-মাত্রার' বিভিন্ন প্রকারের শ্বেতসার বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসারের জন্য তারতম্য ঘটিয়া থাকে; এই হিসাবে দুগ্ধ-শর্করার মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ও শালি জাতীয় খাদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শালি জাতীয় খাদ্য রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া অবাধে বহুপরিমাণে শোষিত হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে শালি জাতীয় খাদ্য প্রথমে লালাস্থিত টাইলাইন (ptyline) নামক কিণের সাহায্যে ম্যাল্টোজ (maltose) এ পরিণত হয়। পরে অন্ত্রস্থিত প্যাঙ্ক্রিয়াস (pancreas) এর ম্যাল্টেজ (maltase) নামক কিণের সাহায্যে ডেক্সট্রোজ (dex-trose) বা দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত হয়। এতগুলি বিশ্লেষণ সময় সাপেক্ষ; কাজেই যকৃৎ অতি সহজেই অল্প শোষিত দ্রাক্ষা-শর্করাকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় ইহাতে চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু দ্রাক্ষা-শর্করা ব্যবহার করিলে ইহা প্রথম হইতেই শোষিত হইতে থাকে, এবং ইক্ষু-শর্করাও অতি সহজে দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত হয়। কাজেই সময়াভাবে যকৃৎ স্বীয় কার্য্যসাধনে অক্ষম হয়। খাদ্যের যে অংশ শোষিত হয় না তাহা গাঁজিয়া উঠে (fermented) এবং তাহা হইতে ধান্যাম্ল (acitic acid) দুগ্ধাম্ল (lactic acid) অঙ্গারাম্ল (carbon dioxide), সুরাসার (alcohol) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সময়ে সময়ে এই সমস্ত অম্লের পরিমাণ এত অধিক হয় যে পেটের অসুখ হইয়া থাকে।

জৈবিক শ্বেতসার (GLYCOGEN.)

একস্থলে বলা হইয়াছে যে যকৃতের প্রধান কার্য্য জৈবিক শ্বেতসার করণ। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ক্লড বার্ণার্ড (Claude Bernard) প্রথমে যকৃতে ইহার অস্তিত্ব প্রচার করেন। ইহার অনেক স্বধর্ম্ম শালি জাতীয় দ্রব্যের ন্যায়; এই কারণ ইহার জৈবিক শ্বেতসার নামকরণ

করা হইল। লালাস্থিত টাইলাইন (ptyline) এর সাহায্যে ও অন্ত্রস্থিত ম্যাণ্টেজ (maltase) এর সাহায্যে ইহাও দ্রাক্ষা শর্করাতে পরিণত হয়। যকৃতে সাধারণতঃ শতকরা ১·৫২—৪ জৈবিক শ্বেতসার থাকিতে পারে। দৈহিক তাপ, পরিশ্রম, খাদ্য, ঔষধের উপর ইহার পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অধিক মাত্রায় শ্বেতসার ব্যবহারে এমন কি অন্ততঃ শতকরা দশভাগ পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যকৃতের মধ্যে এই জৈবিক শর্করার অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে ইহার অন্য কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে না আবার কেহ কেহ বলেন যে ইহা একপ্রকার রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এ কারণ যকৃৎ হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার কালে গরম জল ব্যবহার করিতে হয়।

জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি।

(ক) খাদ্যের শ্বেতসার হইতে :—

খাদ্যে শ্বেতসারের মাত্রা অনুসারে যকৃতে জৈবিক শ্বেতসারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অধিক মাত্রায় শ্বেতসার ব্যবহারে ইহার মাত্রা স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রধানতঃ দ্রাক্ষা-শর্করা (dextrose), মধুশর্করা (lavulose), ইক্ষুশর্করা হইতে ইহার উৎপত্তি। খাদ্যের শ্বেতসার রক্তের স্রোতে দ্রাক্ষা-শর্করা রূপে আসিয়া যকৃতে পৌছে এবং সেখানে এক অণু (molecule) জল ত্যাগ করতঃ জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত হয়। $C_6H_{12}O_6 - H_2O = C_6H_{10}O_5$

(খ) খাদ্যের অন্নসার হইতে :—

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে * অন্নসারের কিয়দংশমাত্র শরীরের নূতন তন্তু প্রভৃতি গঠন করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্টাংশের নানা প্রকার বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে এই বিশ্লেষণের ফলে সোরাজান অংশটুকু যকৃতে ইউরিয়া (Urea) হইয়া মূত্রের সহিত দেহ-ত্যক্ত হয় এবং সোরাজান বিবর্জ্জিত অংশ নানা প্রকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পর শর্করারূপে রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হয়, পরে ইহা হইতে জৈবিক শ্বেত শর্করার উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে গ্লাইসাইন (Glycine) য়্যাসপেরেটিক এসিড (asparatic acid,) য়্যালানিন (alanin) প্রভৃতি হইতে দেহের মধ্যে শর্করার উৎপত্তি হইতে পারে। ইহাতে আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেসেইনোজেন (Caseinogen) বা ছানা যাহাতে শ্বেতসারের কোন অস্তিত্ব নাই তাহা হইতেও গ্লাইকোজেন (Glycogen) বা জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি হয়। আরও অনেক সময় কঠিন বহুমূত্র রোগে (diabetes) খাদ্যের শ্বেতসার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র অন্নসার জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করিলেও মূত্রে শর্করার হ্রাস হয় না। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এ ক্ষেত্রে অন্নসারই শর্করার একমাত্র উৎপত্তির কারণ। লাস্ক (Lusk) এর মতে শতকরা ৫৮·৪ ভাগ অন্নসার শর্করায় পরিণত হইতে পারে। আরও দেখা যায় যে বহুকাল ধরিয়া উপবাস করিলেও রক্তে শর্করার ভাগ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে (constant) থাকে এই শর্করার উৎপত্তি

* মৎ লিখিত খাদ্যে অন্নসার শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

লেখক।

অম্লসার বা স্নেহ হইতেই সম্ভব কিন্তু কতকগুলি কারণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার অধিকাংশই দৈহিক অম্লসার হইতে উৎপন্ন। দেহের স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ ঘটে কিনা তাহা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না।

(গ) স্নেহ হইতে :—

স্নেহ হইতে জৈবিক শ্বেতসার উৎপন্ন হইতে পারে কি না সেই সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ক্রেমার (Cremer) বলেন যে, গ্লিসারিন (Glycerine) হইতে শর্করার উৎপত্তি হইতে পারে। বহুমূত্র রোগে গ্লিসারিন (Glycerine) খাইলে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্নেহ দেহ মধ্যে গ্লিসারিন ও স্নেহাম্লাদিতে (fatty acids) বিশ্লিষ্ট হয়। কাজেই গ্লিসারিন হইতে শর্করা এবং তাহা হইতে জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব নহে।

জৈবিক শ্বেতসারের স্বধর্ম্ম :—

জৈবিক শ্বেতসার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। বার্ণার্ডের মতে দৈহিক ব্যবহারের জন্য যকৃতে এই শ্বেতসার অস্থায়ীভাবে রক্ষিত হয়। পরিপাক কালে পোর্ট্যাল ভেন (portal vein) দিয়া যকৃতের মধ্যে দ্রাক্ষা শর্করা আসিতে থাকে। যদি এই শর্করাকে কোনপ্রকারে রক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে মূত্রাশয় দিয়া মূত্রের সহিত দেহ-ত্যক্ত হইবে। কিন্তু যকৃৎ দিয়া যাইবার কালে যকৃতের কোষগুলি এই শর্করা হইতে জল বাহির করিয়া লইয়া (de hydrating) ইহাকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করিয়া নিজের কোষের মধ্যে অস্থায়ী ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে। পেভি (Pavy) বলেন, যদি কোন কারণে সমস্ত শ্বেতসার এইরূপে পরিবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে হাইপার গ্লাইসেমিয়া (hyper glycemia) ঘটা সম্ভব। যথার্থই অনেক সময়ে অধিক মাত্রায় শ্বেতসার ব্যবহারের জন্য মূত্রে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

আবার আবশ্যক মত যকৃৎ হইতে এই জৈবিক শ্বেতসার রক্তের স্রোতে দ্রাক্ষা শর্করারূপে মিলিত হইতে থাকে কাজেই রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক (·১—·২) থাকে।

বাস্তবিক যকৃতে যে জৈবিক শ্বেতসার হইতে পুনর্ব্বার দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয় তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। দেহ হইতে যকৃৎ পৃথক্ করিলে ক্রমশঃ জৈবিক শ্বেতসারের হ্রাস ও দ্রাক্ষা-শর্করার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে জৈবিক শ্বেতসারের লোপ হয়। তখন কেবলমাত্র দ্রাক্ষাশর্করার অস্তিত্ব থাকে। কি কারণে জৈবিক শ্বেতসার হইতে পুনরায় দ্রাক্ষাশর্করার আবির্ভাব হয় তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহাতে এক প্রকার কিণ্ (Enzyme) আছে। এই জৈবিক শ্বেত-সার হইতে দৈহিক স্নেহের উৎপত্তিও ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্বেতসারের পরিণতি :—

দেহে শ্বেতসারের শেষ পরিণাম অঙ্গারাম্ল ও জল। কিরূপে এই পরিণতি ঘটে তৎসম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে শ্বেতসারের উপর প্যাঙ্ক্রিয়াস (pancreas) এর রসের কার্য্য-কারিতা আছে। ইহাতে একপ্রকার কিণ্ আছে, তাহার শর্করা বিশ্লেষণের ক্ষমতা

আছে। ইহার অভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কোহিউহেম (Cohu-heim) বলেন যে দেহতন্তর সার (Expressed juices of muscles) ও প্যাঙ্ক্রিয়াস (pancreas) এর নির্য্যাস শর্করার সহিত মিশ্রিত করিলে শর্করার লোপ হইয়া থাকে (Glycosis)। কেহ কেহ বলেন জৈবিক শ্বেতসার প্রথমে দুগ্ধাম্লে পরিণত হয় পরে সুরাসার (alcohol) ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প হয়; পরে সুরাসার হইতে ধান্যাম্ল (acitic acid), ফর্ম্মিক এসিড (formic acid) এবং শেষে অঙ্গারাম্লও বাষ্পে পরিণত হয়। আবার কাহারও মতে গ্লাইকিউরোণিক এসিড (Glycuronic acid) বেত্তাসাম্ল (oxalic acid) হয় এবং শেষে অঙ্গারম্ল ও জলীয় বাষ্প হয়।

খাদ্যে শ্বেতসারের পরিমাণ :—

মোলেসচট্	(Moleschott)	৫৫০	গ্র্যাম্
র‍্যাঙ্কে	(Ranke)	২৪০	"
ভয়েট	(Voit)	৫০০	"
ফর্ষ্টার	(Forster)	৪৯৪	"
য়্যাটওয়াটার	(Atwater)	৪৪০	"

অন্নসার সম্বন্ধে আলোচনার কালে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে এ ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। *

যাহাদের অধিক দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের অধিক মাত্রায় শ্বেতসার গ্রহণ করা বিধেয়।

শ্বেতসার সম্বন্ধে আর দু একটি কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। শ্বেতসারের একটি বিভাগকে কোষাত্বক বা সেলুলোজ (Cellulose) বলা হয়। সাধারণতঃ মনুষ্য সেলুলোজ হজম করিতে পারে না কিন্তু কোন কোন স্থলে (কপি, গাজর, মূলা ইত্যাদি) ইহা বেশ পরিপাক হইয়া যায়। খাদ্যে ইহার অস্তিত্ব অন্ত্রের পরিচালন (peristalsis) অধিক মাত্রায় ঘটাইয়া থাকে এ কারণে কোষ্ঠ কাঠিন্য ঘটে না। যাঁহাদের এই রোগ আছে তাঁহারা 'মিলের আটার' পরিবর্ত্তে যাঁতায় ভাঙ্গা আটা বা লাল আটা ব্যবহার করিলে অনেক উপকার পাইতে পারেন। কাঁচা ফলে যথেষ্ট পরিমাণে সেলুলোজ থাকে সেই জন্য ফল ব্যবহারেও অনেক সময়ে যথেষ্ট উপকার হয়।

বিভিন্ন খাদ্যে শ্বেতসারের পরিমাণ

খাদ্যের নাম	পরিপাক যোগ্য শ্বেতসার	সেলুলোজ বা কোষাত্বক
মাংস	০'৩	নাই—
পনীর বা ছানা	৩—৭	নাই—
গো দুগ্ধ	৪'৮	নাই—
মনুষ্য দুগ্ধ	৫'০	নাই—
ময়দা	৭৪'৮	০'৩
চাউল	৭৭'৪	০'৬
ডাল (ছোলা, মটর ইত্যাদি)	৪৯—৫৪	৪—৭
আলু	২০'৬	০'৭
গাজর	৯'৩	১'৪
বাঁধা কপি	৪—৬	১—২
ফল	১০	৪

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* খাদ্যে অন্নসার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—লেখক

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন *

জলের মধ্যে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করা কিছুতেই সাজে না—মর জগতে বাস করিয়াও মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমাদের অলক্ষিতে মৃত্যু তাহার অদৃশ্য রাজ্য বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে—আমরা প্রতিনিয়ত 'মরণের' সঙ্গেই ঘর করিয়া থাকি। কিন্তু মৃত্যু জিনিষটা এমন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও—দুই একজনের বিরহে প্রাণ স্বতঃই করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—"হে মৃত্যু, তোমার কি এ জীবনটী না লইলে চলিত না? পথের পার্শ্বে ঐ যে অন্ধ রোগশীর্ণ ভিখারি একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে—তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে তবে সেও জুড়াইত—ধরণীর দুঃখের ভারেরও কিয়ৎ-পরিমাণে লাঘব হইত; কিন্তু তুমি তাহাকে না লইয়া লইলে এমন একটী প্রাণ যাহা নীল আকাশে সুনির্ম্মল জ্যোতিষ্কের মত অন্ধকার রজনীতে স্নিগ্ধ আলোকধারা বিকিরণ করিতেছিল—যাহা নয়নাভিরাম শ্যামল তরু শাখায় মাধুর্য্য মণ্ডিত সুগন্ধি পুষ্পের মত ফুটিয়া পবনে তাহার সুধা গন্ধ বিতরণ করিতেছিল—যাহা গিরি নিঃসৃত স্বচ্ছ জলধারার ন্যায়, প্রবাহিত হইয়া উষর ক্ষেত্রে উর্ব্বরতা, ও তৃষিতকে সুপেয় প্রদান করিয়া কত তরণীকে অভীষ্টের পথে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। যাহার অভাবে সংসার নিরানন্দ হয়, সহস্র লোক বন্ধুহারা হয়—জীবনের আকর্ষণ কমিয়া যায়—তুমি বাছিয়া বাছিয়া সেই প্রাণ গুলিকে এমন নির্ম্মম ভাবে হরণ করিয়া লও কেন?"

আজ যে প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সে প্রাণ এমনি করিয়া অকালে মৃত্যু কর্ত্তৃক সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছে। আজ এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে এই আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তির নিদর্শন শূন্য লোকাচার বা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র নহে—এ পূজা হৃদয়ের পূজা—অকৃত্রিম ভক্তির ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি—; কারণ যে ব্যক্তি একবারও এই মহাত্মার মন্ত্রঃপূত জীবনের কল্যাণ সীমার মধ্যে পদার্পণ করিয়াছেন—তিনিই এই মহৎ চরিত্রের শুদ্ধ পূত দেব প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার ভক্ত সেবক হইয়াছেন। স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র নাথের মধুর চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে—অথচ তাঁহাকে ভালবাসে নাই এমন লোক আমি একটীও দেখি নাই, যে তাঁহার সহিত একবার মিশিয়াছে সেই বলিয়াছে একটী পবিত্র পুণ্য শিখার সন্নিধানে বাস করিলে মনে যে নির্ম্মল ভাবের উদয় হয় বিনয়েন্দ্রনাথের সহবাসে তাহাই হইত। হায়! এমন জীবনকে আমরা অকালে হারাইয়াছি। বঙ্গ মাতার অঙ্কে এতাদৃশ

* স্বর্গীয় অধ্যাপকের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে একটি স্মৃতি সভায় পঠিত।

সুসন্তানের সমাগম বড় অধিক হয় না। জননী এ সন্তানকে হারাইয়া প্রকৃতই দীনা হইয়াছেন।

বিনয়েন্দ্রনাথের বিয়োগে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সুকঠিন। সেই সরল বিনয়ী, সুকোমল সুধী সন্তানের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারে যে নিদারুণ শোকের ছায়া নিপতিত হইয়াছে—জানি না তাহা আবার কখনও আলোকে উজ্জ্বল হইবে কি না। পরিজনের গভীর শোকের কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে না যাওয়াই ভাল তাঁহাদের যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কিনা জানি না—তাঁহাদের শোক অন্তর্যামী ভিন্ন অন্যে কেহ বুঝিবেন না—আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা দুঃখাপহারী হরি তাঁহাদের হৃদয় ব্যথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করুন—মানব এ শোকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম। আত্মীয় স্বজন—যাহাদের সঙ্গে বিনয়েন্দ্রনাথের রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল—তাঁহারা তাঁহার অদর্শনে শোকে নিয়তিশয় মুহ্যমান হইলেও, তাঁহার অদর্শনে তাঁহার পরিবারের বহির্ভূত যে সকল ব্যক্তি আজ হাহাকার করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যাও স্বল্প নহে। বিনয়েন্দ্রনাথ একটী নির্দ্দিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও সমগ্র দেশের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। মানুষ শুধু দেহ ও রক্তের সম্বন্ধেই আপনার হয় না—সুপবিত্র ভাবযোগের সম্বন্ধে একটী হৃদয় যে আর একটী হৃদয়ের সহিত শুভ মিলনে সম্মিলিত হয় সেই মিলন দেহ ও রক্তের মিলন হইতেও নিবিড় এবং সাধু চরিত্রের ভিতর দিয়া ভগবান যখন সুহৃদ্ মূর্ত্তিতে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া মানবের মন হরণ করেন, তখন মানুষ যে ঘনিষ্ঠ স্নেহ বন্ধন উপলব্ধি করে তাহার সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধই তুলিত হইতে পারে না। বিনয়েন্দ্রনাথের প্রেমপূর্ণ হৃদয় প্রেমময়েরই মঙ্গল পীযুষে পরিপূর্ণ ছিল—তাঁহার সুকোমল আহ্বানের পশ্চাতে বিশ্বদেবতার আহ্বানই ধ্বনিত হইত—সেইজন্য তাহা এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী ছিল—সেইজন্যই সে আহ্বানে মানবহৃদয় শাড়া না দিয়া থাকিতে পারিত না—সেইজন্যই তাঁহার মৃত্যুতে আজ তাঁহার পরিবার বহির্ভূত বহুব্যক্তি আত্মীয়বিচ্ছেদজনিত শোক অনুভব করিতেছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের একটী সম্প্রদায় একটী মহান্ আশ্রয়তরুর স্নিগ্ধ ছায়া হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছে—সেটী দেশের ছাত্র সম্প্রদায়। এমন মহীয়ান্ ও চরিত্রবান শিক্ষক, এমন হিতকারী উপদেষ্টা ও সুকোমল বন্ধু—এমন আত্মত্যাগী সেবক ও সংযমী নেতা—আর কখনও তাঁহারা লাভ করিবেন কি না সন্দেহ। যখনই যেখানে তাঁহার কোন ছাত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই তাহার মুখে বিনয়েন্দ্রনাথের অবিমিশ্র প্রশংসার কথা শ্রবণ করিয়াছি, এবং সেই প্রশংসার মধ্যে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের প্রশংসাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার অধ্যাপনার সম্বন্ধেও সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়া থাকেন—কিন্তু তাহারই সঙ্গে সকলেই বলিয়া থাকেন এমন সুমিষ্ট চরিত্র কখনও দেখি নাই। অঙ্গ সৌষ্ঠবে তিনি রূপবান পুরুষ ছিলেন এ কথা বলা চলে না—কিন্তু সুনির্ম্মল আত্মার পুণ্য প্রভা তাঁহার দেহকে যে কি এক অপূর্ব্ব দিব্যশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত

করা যায় না—যে তাহা দেখিয়াছে—সেই হৃদয়ে সে রূপ উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ছাত্র সম্প্রদায় চিরদিন তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের গুণে মুগ্ধ ছিল—তাঁহাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে আদর্শ অধ্যাপক নামে অভিহিত করিতে পারি।

বিনয়েন্দ্রনাথের এই অধ্যাপনা ও পরিচালনা সাফল্যের মূলে একটি বস্তু ছিল—সেটী তাঁহার ভগবানে আত্মসমর্পণ। যে সরল অন্তঃকরণে ভগবানের হস্তে আপনার সকল ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে, যে প্রাণপণে সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কর্ম্মফল সর্ব্বময়ে নিবেদন করিতে পারে—তাহার জয় জগতে অনিবার্য্য। যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুজনকে গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ করেন—বামনকে চাঁদ ধরান—তাঁহাতে সকলই সম্ভব। "আমি কি বলিব জানি না—হে অঘটন ঘটন-পটু বিধাতঃ তুমি আমার মুখে বাণী দাও"—বিশ্বাসের সহিত এই প্রার্থনা করিয়া যিনি জগতে কোন বাণী উচ্চারণ করেন তাঁহার সে বাণী অমর অজেয় হইবেই হইবে। বিনয়েন্দ্রনাথ বিশ্বরূপ অনন্ত দেবের ভক্ত উপাসক ছিলেন—সেই অসীমের চরণোপ্রান্তে সরল শিশুর মত দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারই আঁখিতে আঁখি রাখিয়া তিনি আপনার জীবনে শক্তি সঞ্চয় করিতেন—এবং অন্তর্নিহিত এই দিব্যশক্তির বলে বলীয়ান হইয়া, যখন তিনি ছাত্রগণের সম্মুখে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তখন মর্ত্তের জিহ্বায় স্বর্গের বাণী ধ্বনিত হইত—তখন মাংসের নয়নে আত্মার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত—তাই ছাত্র-হৃদয় এমন আগ্রহ ভরে তাঁহার উপদেশসুধা পান করিতে ব্যাকুল হইত। বাহির তাঁহার অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি ছিল—ভিতরে ও বাহিরে কোন ব্যবধান ছিল না। চরিত্রের এই স্বচ্ছতাই তাঁহার কল্যাণ-প্রভাবের নিগূঢ় ভিত্তি ছিল।

বিনয়েন্দ্রনাথ মানবাত্মার অপরিসীম মহত্ত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন। তিনি মানবকে ক্ষুদ্র চক্ষুতে দেখেন নাই—মানব অনন্তের সন্তান—তাহার মধ্যে ভূমার মহীয়সী শক্তি কণিকা সুপ্ত আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহা তিনি বিশ্বাসনেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু মানবের প্রাত্যহিক জীবন যে কিরূপ মলিন ও পাপপঙ্কিল তাহার ধারণাও তাঁহার চিত্তে সুস্পষ্ট ছিল। নরজাতি আপনার উচ্চ মহিমা বিস্মৃত হইয়া আসক্তি মায়া ও মোহের কুহকে কিরূপ দীন জীবন যাপন করিতেছে ইহা ভাবিয়া তিনি ব্যথিত হইতেন—কিন্তু তাঁহার এ বিশ্বাস চিরদিনই অটল ছিল যে মানবের এই মলিনতা কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ব্রহ্মাগ্নি কিছুদিনের জন্ত ভস্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে—সে অগ্নি কখনও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না—ভগবৎ কৃপার পবনে জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে যেদিন এই ভস্ম উড়িয়া যাইবে সেই দিন প্রচ্ছন্ন দৈবীশিখা সংসারের শত আবর্জ্জনা রাশির ঊর্দ্ধে আপনার উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিয়া দেবলোকের অভিমুখে উত্থিত হইবে। মানুষ ভুলিয়াছে কি উচ্চকুলে তাহার জন্ম—সে যদি বুঝিতে পারে যে সে স্বর্গস্থ পিতার সন্তান—যদি বুঝিতে পারে তাহার নিয়তি কি মহান্—তাহা হইলে সংসারের কোন নীচতা আর দেবলোকবাসী আত্মাকে আপনার মোহজালে জড়াইয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না—তখন তীর্থযাত্রী প্রাণপণে নিজ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া সকল দুঃখ ক্লেশ প্রফুল্ল চিত্তে বহন করিয়া সেই ভুবনেশ্বরের মন্দির উদ্দেশে যাত্রা করিবে।

কি উপায়ে মানুষকে এই আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যায়? কেমন করিয়া বুঝাইতে পারা যায় যে এই সংসার মানব আত্মার চির আবাস ভূমি নহে—ইহা তাহার চরিত্র বিকাশের অনুকূল বিধাতৃপ্রদত্ত সাধনক্ষেত্র মাত্র—এই পবিত্র সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে সদা সাবধানে ও সংযত থাকিয়া তাহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে—এবং যেদিন প্রভু ডাকিবেন সে দিন বিশ্বাসী ভক্তের মত আনন্দিত মনে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে! বিনয়েন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন—শিক্ষাই ইহার একমাত্র পন্থা—নীরস শুষ্ক জ্ঞানের শিক্ষা নহে, প্রেমপূর্ণ সুকোমল হৃদয়ের শিক্ষা দ্বারাই মানব দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে। ভগবানের ভক্ত সন্তান বিনয়েন্দ্রনাথ ভগবানের নিজমুখ হইতেই এই বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন—সেই জন্যই তিনি শিক্ষকতা কার্য্যকে এমন পবিত্র ও গম্ভীর ভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে জীবিকার্জ্জনের ৫টী উপায়ের মধ্যে একটী ছিল না—ইহা তাঁহার পক্ষে হতাশ্বাসের শেষ অবলম্বন স্বরূপ ছিল না—ইহা তাঁহার পক্ষে ভগবানের আদেশ ও জীবনের পবিত্র ব্রত ছিল। এই জন্য এই ব্রতসাধনে তিনি এরূপ অনাশক্তভাবে দেহমনোপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া সংযমী সাধকের ন্যায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কি অক্লান্ত প্রাণপণ যত্নে তিনি ইহার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন!—জ্ঞানের সমুদ্র হইতে তিনি সযত্নে মণি সংগ্রহ করিয়া মন্দির সাজাইয়াছিলেন—জগতের সাধু ভক্ত দিগের অমৃত উৎস হইতে তিনি রসধারা আহরণ করিয়া প্রাণকে সরস ও সতেজ রাখিয়াছিলেন—জীবনব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি আয়োজনের কোন ত্রুটি করেন নাই। জর্ম্মাণ দেশীয় আদর্শ শিক্ষক Froebel জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন না—সেই সময় একবার তিনি Frank fortএ স্থপতিবিদ্যা শিখিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন কৃষক বন্ধুর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া যান। বন্ধুর বিদায়কালে কৃষক Froebelকে তাঁহার নিজের Albumএ রক্ষার জন্য একটী 'স্মারকলিপি' লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ফ্রোবেল বন্ধুর জন্য এই কথাগুলি লিখিয়া ছিলেন—"মানুষকে জীবিকা প্রদান তোমার লক্ষ্য হউক, আর মানুষকে স্বরূপ দান করা আমার ব্রত হউক। Be it yours to give men bread; mine to give them—themselves" এ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য তখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই—তিনি অজ্ঞাতসারে এই দৈববাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—এবং পরবর্ত্তী জীবনে ইহারই পূরণার্থ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথ এরূপ কোন কথা কখনও বলিয়াছিলেন কি না জানি না—কিন্তু এরূপ বাণী উচ্চারণ না করিলেও তাঁহার জীবনব্যাপী উদ্যমের মধ্যে আমরা এই বাণীই ধ্বনিত শুনিতে পাই—মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে ফিরাইয়া আনিতে হইবে—মানব সন্তানকে প্রকৃত আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। মানুষকে মনুষ্যত্বে ফুটাইয়া তোলা—এই কার্য্যেই তিনি হৃদয়ের তৃপ্তি জীবনের আরাম লাভ করিয়াছিলেন—তাই শিক্ষকতা কার্য্যে তিনি এমন আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ফ্রোবেল যখন নানা কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পর শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইলেন তখন তিনি এই কার্য্য সম্বন্ধে একজন বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—"শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আজ আমি

সেই অনুপম স্বাভাবিক আনন্দ লাভ করিলাম যাহা বিহঙ্গ উন্মুক্ত বাতাসে পক্ষ বিস্তার করিয়া লাভ করে, যাহা মৎস্য প্রবহমান সলিলে সন্তরণ করিয়া লাভ করিয়া থাকে।” আমাদের এই আদর্শ অধ্যাপক সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য—সত্যই বিনয়েন্দ্রনাথ অধ্যাপনা কার্য্যে জলবিহারী মীনের ও গগন-বিহারী বিহঙ্গমের মুক্ত অনাবিল ও স্বাভাবিক আনন্দ লাভ করিতেন। জীবন-দেবতার নিকটে জীবনের ব্রত লাভ করিয়া সকল ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্ব্বক, কর্ত্তব্যের বেদিকাতলে আত্মবলিদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কার্য্য কল্যাণপ্রসূ হইয়াছিল। তিনি নিজের শক্তির উপর নির্ভর করেন নাই—সকল শক্তির আধার সেই ভগবান হইতেই তিনি সকল শক্তি সংগ্রহ করিতেন—তাই তাঁহার প্রভাব অজেয় হইয়াছিল। অনন্ত উৎসের সহিত প্রাণের এই যে নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন যোগ—ইহাই তাঁহাকে চিরদিন সরসতায় পূর্ণ রাখিয়াছিল—আশা বল উৎসাহ সকলই তিনি এই চিরন্তন মূল উৎস হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এই স্বর্গ-সংস্পর্শই তাঁহাকে সংসারের আবিলতা হইতে প্রমুক্ত রাখিয়াছিল।

তিনি জানিতেন শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনা মানুষের নিকট স্বর্গের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে না—কিন্তু দেবাশ্রিত প্রাণ তাহা সাধন করিতে পারে। কলের জল ছিটাইয়া তৃষিত মৃত্তিকাকে সম্পূর্ণ সরস করা সম্ভবপর নহে—কিন্তু আষাঢ়ের নবঘন হইতে যখন নিবিড় বর্ষার বারিধারা ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হয় তখন ধরণীর সকল শুষ্কতা নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়—খাল বিল নদী নালা—সকলই পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—ধরণী নব-জীবনের শ্যাম-শোভায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। মর্ত্ত্য মর্ত্ত্যকে স্বর্গে উন্নীত করিতে পারে না—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে মহান্ করিতে পারে না—সত্য শিব সুন্দরের প্রেরণা না থাকিলে মোহের সুপ্তি কে ভাঙ্গিতে পারে? বিনয়েন্দ্রনাথ ব্রহ্মগত প্রাণ ছিলেন—তিনি হৃদয়কে অহং-জ্ঞান হইতে সর্ব্বথা পরিশূন্য রাখিয়াছিলেন—সেইজন্য দেবফুৎকারে তাঁহার জীবনের বাঁশী এমন মনোমোহন সুরে বাজিয়াছিল। বাস্তবিক সে বাঁশীর ধ্বনিতে এমন মোহ ছিল যাহাতে যমুনা উজান বহিত—সংসারাভিমুখী চিত্ত পুণ্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবলোকের দিকে প্রধাবিত হইত। বাল্যকালে আমরা একটী খেলা খেলিতাম—তাহার নাম ছিল বুড়ি ছোঁওয়া খেলা। একটী বালক চোর হইয়া অন্যান্য বালকদের ছুঁইতে চেষ্টা করিত—যাহাকে সে ছুঁইত সে “চোর” হইত। অপর একটী বালক বুড়ি হইয়া বসিয়া থাকিত—চোর সম্বন্ধে এই বুড়ির চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া বালকদিগকে ছুঁইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু যদি ইহার মধ্যে কেহ কোন উপায়ে একবার বুড়ি ছুঁইতে পারিত—তবে সে নিরাপদ; কারণ যে বুড়ি ছুঁইয়াছে তাহার উপরে চোরের আর কোন অধিকার থাকে না—চোর তখন তাহাকে ছুঁইলেও সে মরে না। আমার মনে হয় অধ্যাত্ম জগতেও এই বুড়ি ছোঁয়া খেলা সর্ব্বদাই চলিতেছে—অন্ধকারের দূত সয়তানের সঙ্গী আসক্তি প্রলোভন সর্ব্বদাই মানুষকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে—কিন্তু যে মানুষ ভগবানকে ছুঁইয়া লইতে পারে তাহার জন্য ইহাদের কোন বিভীষিকা থাকে না। সে মৃত্যু সমাচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্যে অমর হইয়া বিচরণ করে। আমাদের দেশে প্রাচীন-

কালের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বোধ হয় ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল—সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের সহিত পরিচয় স্থাপন ও ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ—ইহাই এই আশ্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা সম্পন্ন হইলে তবে মানব সংসারে প্রবেশ করিবে—বুড়িকে ছুঁইয়া লইয়া তবে প্রলোভনের মধ্যে বাস করিবে—নচেৎ কে মানব আত্মাকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারে?—এখন কালক্রমে দেশে আর সে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই—আর মনে হয় সেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এখন আবশ্যকতাও নাই। কিন্তু ইহার কল্যাণকর শিক্ষা কিছুতেই পরিহার করা চলে না। এখন সংসারের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেই মানুষকে বাস করিতে হইবে—নির্জ্জন গুরুকুলে বাস এ যুগের আদর্শ নহে। কিন্তু সংসারে নিরাপদ হইবার জন্য ব্রহ্মের সহিত পরিচয়—ইহা একান্ত আবশ্যক। এই কোলাহল-মুখরিত সজনতার মধ্যেই আশ্রমের নির্জ্জনতা রচনা করিয়া মানুষকে প্রতিদিন একবার বিশ্বদেবতার চরণতলে বসিতে হইবে—সেই জীবন-উৎস হইতে জীবনী-রস সংগ্রহ করিয়া সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইবে—নচেৎ কর্ম্ম কেবল "ভূতের বেগার" মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে এবং সে কর্ম্মে জগতের কখনও শুভ হইতে পারিবে না।

পরমাত্মার সহিত জীবনের এই নিগূঢ় যোগ বিনয়েন্দ্রনাথের সকল মাধুর্য্যের কারণ—এবং ইহাই তাঁহার সকল সাফল্যের প্রকৃত হেতু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার বিয়োগে দেশের ছাত্রকুল নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।—এ কথা বলার অভিপ্রায় ইহা নহে,—যে বিনয়েন্দ্রনাথের ন্যায় পাণ্ডিত্যশালী শিক্ষক ছাত্র সম্প্রদায় আর পাইবেন না। তাঁহার পাণ্ডিত্য যে অতিশয় গভীর ছিল—যে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে সেই তাহা বলিবে—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাহা হইলেও জ্ঞানের হিসাবে তাঁহার অপেক্ষাও যে উন্নততর ব্যক্তি নাই তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—যে জ্ঞানের বিষয়ে তাঁহার ন্যায় গভীর প্রবেশ অতি অল্প লোকেরই আছে। তিনি কাহারও ধার করা কথা লইয়া কোন বিষয়ের আলোচনা করেন নাই—যদি কাহারও নিকট ধার করিয়া থাকেন তবে সে তাঁহার জীবন-দেবতার নিকট। এ ধার তিনি উচ্চকণ্ঠে জগতের নিকট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন বিষয়ের আলোচনায় একজন যে ভাবে তাহা দেখিয়াছেন তিনিও সেই ভাবেই তাহা দেখিবেন—এ প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। সেই জন্য তাঁহার সকল আলোচনাতেই মৌলিকত্বের পরিচয় সূচিত থাকিত। দেবতা তাঁহার জীবনবেদে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব লিখিয়া দিতেন—তিনি জগতের নিকট সেই তত্ত্ব প্রচার করিতেন। সেইজন্যই তাঁহার আলোচনা সরস ও প্রাণস্পর্শী হইত। একবার তিনি যুবকদের এক সভায় নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যম বলিলেন—"নচিকেতা, তোমার মত এমন শ্রোতা আর আমি কখনও পাই নাই।" নচিকেতা বলিলেন—"আপনার মত এমন বক্তাও আমি কোথাও পাইব না।" বিনয়েন্দ্রনাথ বলিলেন—প্রকৃতই যমের মত এমন বক্তা আর কোথায় আছে। যাও শ্মশান ঘাটে—দাঁড়াও চিতার সম্মুখে—কত কথা তোমার মনে জাগিবে—জীবনের কত

অনালোচিতপূর্ব্ব ঘটনাবলী নিমেষে তোমার স্মৃতির পথে উদিত হইবে—একটির পর একটি—আর একটি—আর একটি—কথার আর অন্ত নাই—চিন্তার বিরাম নাই। যম শ্মশানক্ষেত্রে তোমাকে কত কথা বলিবেন—এত কথা এমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে আর কে বলিতে পারে? যাও আগ্রায় সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন সেই মমতাজমহলের গম্ভীর সমাধিমন্দিরের সম্মুখে—সেই রূপের ছবি তাজের সম্মুখে দাঁড়াইলে দেখিবে যম সেখানে নীরব ভাষায় তোমাকে কত কথা বলিবেন—তোমার মানস-নেত্রে যুগান্তের ইতিহাস সুস্পষ্ট রেখায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে—মোগল ইতিহাসের সেই অতীত কাহিনী—সাজাহানের সেই চির-সুমধুর পত্নীপ্রীতি। হৃদয়ের বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া স্মৃতির অনন্ত প্লাবন অনন্ত ধারায় ছুটিয়া চলিবে। যমের মত বক্তা কে? আর নচিকেতার ন্যায় শ্রোতাই বা কে?—কে উপদেশ শুনে?—যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা আছে তাহারই নিকট উপদেশ ফলপ্রদ। ব্যাকুলতা ও আগ্রহ ভিন্ন কখনও কোন জ্ঞানলাভ হয় না। শ্রদ্ধা-বিহীন চিত্তে উপদেশ দান উষর ক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায়—তাহাতে ফল প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। শ্রদ্ধাবান হৃদয়ই উপদেশ লাভ করিবার যথার্থ অধিকারী।

কোন অধ্যাপক সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ে ছাত্রকে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করিবেন—এ প্রত্যাশা আশা করি, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই হৃদয়ে পোষণ করেন না। কিন্তু যে অধ্যাপক অধ্যাপনার দ্বারা ছাত্রের অন্তরে জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ করিতে পারেন, ছাত্রকে নির্ম্মল চরিত্র গঠনের অনুকূল জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারেন—তাঁহার অধ্যাপনাই সার্থক হয়। এই মানদণ্ডে পরিমাপ করিয়া দেখিলে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, বিনয়েন্দ্রনাথের অধ্যাপনা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল—এবং এরূপ ফল বড় অধিক শিক্ষক হইতে লাভ করা যায় না—সেই জন্যই বিনয়েন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ছাত্র সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যখন ইতিহাস পড়াইতেন তখন প্রকৃতই ইতিহাসের শুষ্ক অস্থি জীবনের সরসতায় সজীব হইয়া উঠিত। তিনি কেবল নীরস ঘটনাবলির—পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতেন না—কিন্তু বিষয়ের আলোচনায় নিজের পরিপূর্ণ জীবনীরস ঢালিয়া দিয়া তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলীকে বিধাতার লীলার নিদর্শনে পরিণত করিয়া তুলিতেন। সমাজের ও জাতির ইতিহাসে সেই বিশ্বপতি, নেতা হইয়া কিরূপে ধীরে ধীরে জাতীয়-জীবনকে ক্রমবিকশিত করিয়া তুলিতে-ছেন—জীবনের ইতিহাসে কোন ঘটনাই যে নিরর্থক নয় প্রত্যুত বিধাতারই অভিপ্রায় প্রসূত—এ সত্য যেন দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। তাঁহার ইতিহাসের ছাত্রসম্প্রদায় ইতিহাস পাঠের জন্য একটা ব্যাকুলতাপূর্ণ আবেগ লইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিত। এমনই, তিনি যখন ছাত্রদিগের নিকট কোন কাব্যালোচনা করিতেন তখন কাব্য তাঁহার প্রাণপূর্ণ ভাবমাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া নূতন অর্থ ও নূতন সৌন্দর্য্য লাভ করিত। তিনি Tennysonএর Holy Grailএ, যে অভিনব তাৎপর্য্য দান করিয়াছেন তাহাতে কাব্যের মহিমা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা জ্ঞানী তার্কিকের নীরস সমালোচনা নহে—ইহা পরিপূর্ণ উপভোগের নির্ম্মল মধুর উচ্ছ্বাস। একদিন তিনি Tennysonএর আর একটী

কবিতা Sir Gallahadএর আলোচনা কালে—যখন এই ছত্রগুলি সমবেদনাপূর্ণ মর্ম্মস্থল হইতে উচ্চারণ করিলেন—

My strength is as the strength of ten,
Because my heart is pure :

সুনির্ম্মল কাচখণ্ডে স্বর্গীয় সূর্য্যালোক পতিত হইলে যেমন তাহা দীপ্তপ্রভায় চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইয়া পড়ে, বিনয়েন্দ্রনাথের শুদ্ধপূত স্বচ্ছ হৃদয়ে এই ছত্রগুলির ভাব পতিত হইয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে তেমনি দীপ্ত প্রভায় প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। পূর্ব্বেও অনেকে ঐ কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার মধ্যে এমন অলৌকিক প্রভাব আছে তাহা কেহই অনুভব করিতে পারেন নাই। শুদ্ধতার তেজে তেজীয়ান হৃদয় যখন আপনার মর্ম্মস্থল হইতে এই বাণীর পুনরুচ্চারণ করিল তখন সত্যই যেন সকল হৃদয় আলোড়িত করিয়া আকাশে ও বাতাসে এই বাক্যের প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

কিসে দেশের যুবকবৃন্দের হৃদয়ে মহত্বের ভাব জাগ্রৎ হইয়া উঠে—বিনয়েন্দ্রনাথের হৃদয় সর্ব্বদা সেইজন্ত ব্যাকুল ছিল। আপনার হৃদয়ে তিনি যে অমৃত রসের আস্বাদন লাভ করিয়াছিলেন সেই অমৃত প্রতিজনকে প্রদান করিবার জন্ত তাঁহার প্রেমিক হৃদয় সদা লালায়িত ছিল। তিনি নারীর কোমল হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেবাতেই তাঁহার আত্মার তৃপ্তি ছিল। প্রেমমন্ত্রের এমন নিষ্ঠাবান সাধক অতি অল্পই দেখা যায় বিশ্বাসের চক্ষে ভগবানকে বিশ্বপিতারূপে দর্শন করিয়াছিলেন্ বলিয়াই অতি স্বাভাবিক ভাবে তিনি বিশ্বজনকে আপনার করিতে পারিয়াছিলেন—এ বিষয়ে তাঁহাকে দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় নাই। একটী গান তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল—"তুমি আমি নরজাতি, এক বিশ্ব প্রেমে মাতি, ধরিব অখণ্ড চিদাকার।" ভগবানকে বিশ্বপিতা বলিয়া ডাকি—অথচ নরনারীর প্রতি প্রেমের ভাব পোষণ করি না,—ইহা কিরূপে সম্ভবপর তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। যখন কর্ত্তব্যের আহ্বানে তাঁহাকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল—তখন সেই বিদেশে তিনি যেরূপে লোকের হৃদয়ের প্রেম ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—তাহাতেই বুঝা যায় তাঁহার হৃদয় কিরূপ উদার ছিল। অকৃত্রিম ভালবাসা দান না করিলে অকৃত্রিম ভালবাসা কেহই লাভ করিতে পারে না। প্রেমের মন্ত্র ঘোষণা করিবার জন্তই যেন বিধাতা তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবং এ মন্ত্র প্রচারে তিনি কখনও ক্লান্ত বা কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা অনেকেই উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকি যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের মিলনেই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। আমাদের দেশে এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি দেশের নিজস্ব সম্পত্তির দিকেও আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রয়াগের সেই আকাঙ্ক্ষিত পুণ্যতীর্থ যে এখনও কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। "মহামানবের সাগর তীরের" একটী ক্ষীণ কল্লোলধ্বনিও যে এখনও শ্রুত হইতেছে না। প্রতিভাবান্ কবি ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—

"হেথা একদিন বিরাম বিহীন
মহা ওঙ্কার ধ্বনি।

হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি
তপস্যার বলে, একের অনলে,
বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল,
একটী বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার, সে আরাধনার
যজ্ঞ শালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে　হবে মিলিবারে,
আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

কিন্তু এই বাণী কি শুধু কবির স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হইবে? হে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়, তোমরা জীবনে কল্যাণকর শিক্ষা-লাভ করিয়া আবার কি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে চাহিবে? ঊর্দ্ধে তোমাদের অমরচুম্বিত উন্নত হিমালয়, নিম্নে তোমাদের দিগন্তবিস্তৃত সুনীল সিন্ধু—এই উদারতা ও প্রমুক্তির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তোমরা কি হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা পোষণ করিতে পার? মায়ের সুসন্তান হইয়া মায়ের পূজা করিতে চাও?—মা যে বলিতেছেন, ডাক আমার সকল সন্তানকে—একটীকে ছাড়িয়া আসিলেও তোমরা আমার পূজার মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে না। মায়ের একটী সন্তানের প্রতিও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া মায়ের পূজা করিতেছি মনে করিলে মায়েরই অপমান করা হয়। বিনয়েন্দ্র-নাথ ভারতের ঋষি প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ভক্ত উপাসক ছিলেন—আবার তিনি পাশ্চাত্য দর্শন জ্ঞানেও সুপণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু উভয় দেশের জ্ঞানের গভীরতা যতই তাঁহার জীবনে বর্দ্ধিত হইতেছিল ততই তিনি—মানব পরিবারকে "অখণ্ড চিদাকার" দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন;—ততই তাঁহার হৃদয় সম্প্রসারিত হইয়া সকল মানবকে প্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে ব্যাকুল হইতেছিল। বিনয়েন্দ্রনাথের জীবনে আমরা সেই চির-বাঞ্ছিত প্রয়াগ তীর্থের—সেই মহামানবের সাগরতীরের আভাস লাভ করিয়াছিলাম। তিনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে প্রাণপণে সকলকে আহ্বান করিতেছিলেন—

"মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

বিনয়েন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কবিহৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি প্রকৃতির রস-মাধুর্য্যে এমন একান্তভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন যে জড়ে ও চেতনে তাঁহার নিকট কোন পার্থক্য থাকিত না। সত্যসুন্দরের উপাসনায় যতই প্রাণের সুবর্ণকোষ সৌন্দর্য্য-মধুতে পরিপূর্ণ হইতেছিল, ততই তিনি বিশ্বে সেই সুন্দরের মোহন প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাইতেছিলেন। Emerson বলিয়াছেন যদি বাহিরে আমরা দেবতা দেখিতে না পাই, তবে বুঝিতে হইবে যে অন্তরেও আমাদের দেবদর্শন ঘটে নাই—অন্তরে সৌন্দর্য্যের ও রসের উৎস বিদ্যমান না থাকিলে বাহিরে কেবল মরুময় শুষ্কতাই দেখিতে হয়। আর হৃদয় যখন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে—তখন প্রকৃতির মুখমণ্ডলে অনাবিল সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল তরঙ্গরাশি লীলায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি তখন প্রকৃতিনাথের পরিচয়-সূত্র হইয়া পিপাসু মানবাত্মাকে স্বর্গ-সম্ভোগের অধিকারী করে। প্রকৃতির রম্য নিকেতনে সুইট-জার-ল্যাণ্ডের নিসর্গসুন্দর হ্রদরাজির স্বচ্ছসলিলে বিনয়েন্দ্রনাথ

অনন্তের মূর্ত্তি রূপ দেখিয়া বিমোহিত ও তন্ময় হইয়াছিলেন—লোকবিশ্রুত নায়েগ্রার ভীষণ-কান্ত রূপরাশি বিলোকনে ভগবানের মহীয়সী মহিমা তাঁহার হৃদয়ে কি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। শারদ যামিনীর প্রসন্ন নির্ম্মল আকাশে কমনীয় জ্যোৎস্না রাশির অপূর্ব্ব লীলায় মুগ্ধ হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য-পিপাসু হৃদয়-বিহঙ্গম উধাও হইয়া কোন্ সুদূর আনন্দলোকে গিয়া উপনীত হইত। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ সেই রসস্বরূপ তৃপ্তি-হেতুর মঙ্গলবারতা বহন করিয়া তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিত। যখন কোন দিন কোন নদী তীরে নির্জ্জন প্রশান্তির মধ্যে উন্মুক্ত আকাশতলে বসিয়া তিনি হৃদয়ারাধ্যের উপাসনা করিতেন—তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর ভাবাবেশে কেমন গম্ভীর ও কোমল হইয়া আসিত—মুখে তাঁহার কি অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটিয়া উঠিত—আর ভাষা যেন তরঙ্গিনীর অবিরামগতি তরঙ্গের ন্যায়ই মধুর নৃত্যে ছুটীয়া চলিত। গীতার বিশ্ব রূপ দর্শন অধ্যায়ে তাঁহার প্রাণ যে কি আনন্দ রসের আস্বাদন পাইয়াছিল তাহা সংসার-কঠোর আমাদের হৃদয় উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তবে গীতার সেই শ্লোকগুলি যখন তিনি ভাব-বিমুগ্ধ-হৃদয়ে উচ্চারণ করিতেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইত যে তাঁহার মন তখন বাক্যের ও ছন্দের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া এমন এক আনন্দলোকে উপনীত হইয়াছে—যেখানে "অসীম তাহার মধ্যে আপন সুর বাজাইতেছেন" এবং সেই জন্যই মর্ত্তের ভাষা তখন যথার্থ ই দেবভাষায় পরিণত হইত। যখন অকূল বারিধিবক্ষে পোতা-রোহণে তিনি আমেরিকায় যাইতেছিলেন, তখন দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতির সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে তাঁহার চিত্ত স্বতঃই গাহিয়া উঠিয়াছিল—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব-দেহে
সর্ব্বাং স্তথা ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্—
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বামুরগাংশ্চ দিব্যান্।
অনেক বাহূদরবক্ত্র নেত্রং,
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্।

এইবার তাঁহার পীড়িতাবস্থার সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

যখন আটলাণ্টিক গর্ভে বিশালকায় টিটানিক্ বুদ্বুদের মত কোথায় মিলাইয়া গেল, যখন তাহার যাত্রীদিগের শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইল—তখন জানিতে পারা গেল যাত্রীরা মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া, সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে সঙ্কটহারীর নাম গাহিতে গাহিতে বিশ্বাসী বীরের ন্যায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত পীড়িত হইল—তাঁহার অতীত কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, এই ঘটনায় তাঁহার সহানুভূতি আরো অধিক করিয়া জাগ্রৎ হইল—তিনিও একদিন ঐ সমুদ্রের উপর দিয়া অর্ণবপোতে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। সে যাত্রায় তিনি আটলাণ্টিকের রুদ্রমূর্ত্তির কোন পরিচয় পান নাই বলিয়া, যেন তাঁহার হৃদয়ে একটু ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছিল—আর আজ একি নিদারুণ সংবাদ! তিনি ঐ জাহাজ ডুবি সম্বন্ধে এই মন্দিরে দাঁড়াইয়াই একটী গভীর সহানুভূতিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইদিন প্রাতঃকালের একখানি ইংরাজী দৈনিকে

একজন পত্রপ্রেরক ঐ ঘটনা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে লেখক আরোহী-দিগের অন্তিম মুহূর্ত্তের সংগীতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন—ভীষণ মৃত্যু যখন করাল মুখব্যাদান করিয়া প্রাণকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তখন এই সংগীত গাহিবার সাহস কাহারও থাকে কিনা সন্দেহ। ঐরূপ মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য—তখন ভয় ব্যতীত আর কোন উচ্চ ভাব থাকা সম্ভবপর নহে—সুতরাং ওরূপ মুহূর্ত্তে ঐরূপ সংগীত নিরাশা ও ভীতির আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিনয়েন্দ্রনাথের বিশ্বাসী হৃদয় লেখকের এই কটাক্ষে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিয়াছিল—তিনি প্রবন্ধ পাঠ-কালীন সেই সংগীতটী এমন আন্তরিক সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে পাঠ করিলেন, যে তাঁহার সেই আবৃত্তি শুনিয়া মনে হইল যে টিটানিকের আরোহীরা এ সংগীতে কি ভাবে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা না জানিলেও ইহা সত্য যে বিশ্বাসী হৃদয় মৃত্যুর বিভীষিকাকেও অতিক্রম করিয়া প্রাণের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে—

তোমারই নিকট বন্ধু তোমারই নিকট
ক্রমশঃ নিকটতর হইতেছি আমি—
যদিও ভীষণ ক্রশ করে উত্তোলন
আমারে তোমার পানে হে জীবনস্বামী;
সমস্ত পরাণ ভরি উঠিবে সংগীত
অনুদিন এই সুরে কখন না আমি—
তোমারি নিকট বন্ধু তোমারি নিকট
তোমারি নিকটতর হইতেছি আমি।

কিন্তু বিনয়েন্দ্রনাথের তখনও ভক্তির পরীক্ষা হয় নাই—তখনও তিনি ভক্তের মূল্য প্রদান করেন নাই—সুতরাং তাঁহার মুখে মৃত্যুর উপরে বিশ্বাসের জয় ঘোষণার পূর্ণ মর্য্যাদা—তখনও সংসার বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাকে ভীষণ অগ্নির পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল—এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চিরদিনের জন্য জগতের ভক্তবৃন্দের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছেন।

যখন তিনি টিটানিকের আরোহীদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন যে অলক্ষিতে তাঁহার নিজের জীবন-তরণী এক ভীষণ বরফস্তূপের সম্মুখীন হইতেছিল, সে কথা কেহই ভাবেন নাই। তার পর—তাঁহার জীবনেও সেই জাহাজডুবির অভিনয় আরম্ভ হইল। ভীষণ ব্যাধি তাঁহার সুকুমার দেহকে আক্রমণ করিয়া তিলে তিলে তাহা ক্ষয় করিতে লাগিল। বিনয়েন্দ্রনাথ বুঝিলেন তাঁহার দেহতরী ভগ্ন হইয়াছে—তাহাতে কাল সমুদ্রের জল প্রবেশ করিতেছে—অচিরেই তাহা মৃত্যুর সাগরে নিমজ্জিত হইবে। চিকিৎসকেরা নানারূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন—কিন্তু তিনি মনে মনে বুঝিলেন ইহা ক্রশের শেষ পরীক্ষা—বিশ্বাসী-হৃদয় নীরবে ব্যাধির ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। সক্রেটিশকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন—যুগান্তের সেই মহাপুরুষ বুঝি তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার কর্ণে অভয় বাণী উচ্চারণ করিলেন—"ভয় নাই, পান পাত্র হইতে তিক্তরস প্রফুল্ল চিত্তে পান কর—এ মৃত্যুতে নবজীবন লাভ হইবে।" দেব-শিশু ঈশা তাঁহার প্রাণের প্রিয় আরাধ্য ছিলেন—তাঁহার রোগ শয্যার সম্মুখস্থ দেওয়ালে সেই ক্রশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল—ভীষণ ক্রশের আঘাতে দেহ রুধির রঞ্জিত—কিন্তু শিরোপরি স্বর্গীয় জ্যোতির

কি মহিমাময় আবেষ্টন! দেবনন্দন যীশু বুঝি নীরব ভাষায় তাঁহার ভক্ত অনুচরকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, ক্রশকে স্কন্ধে লইয়া আমার অনুসরণ কর—বিনয়েন্দ্রনাথের হৃদয়ে স্বর্গীয় বল উপচিত হইল। ভক্তের অগ্নি পরীক্ষায় জগতের সকল সাধু-হৃদয়ের সঞ্চিত শক্তি ভক্ত হৃদয়ে সংক্রমিত হয়—বিনয়েন্দ্রনাথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইলেন না—ভীষণ ক্রশের ভিতর দিয়া তিনি জীবন-স্বামীর নিকটতর হইতেছেন এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইলেন। পথ বড়ই কঠোর বড়ই নির্ম্মম কিন্তু তিনি হৃদয়ের উপাস্যকে নিবেদন করিলেন—

পথ যেন মনে হয় হে পরাণপ্রিয়
স্বর্গে যাইবার তব সুন্দর সোপান,
যাহা কিছু নিজ হাতে দিতেছ আমায়,
প্রেমময় সে তোমার করুণার দান।

শেষে জীবনদেবতা এই সুনির্ম্মল প্রাণ পুষ্পটীকে দেহতরু হইতে নিজহস্তে তুলিয়া লইলেন।

বিনয়েন্দ্রনাথ বলিতেন—ক্রশের শিক্ষাই খৃষ্ট ধর্ম্মের চরম শিক্ষা নহে—কিন্তু Resurrection বা নবজীবনের শিক্ষাই চরম শিক্ষা। বাস্তবিক ক্রশের শিক্ষাই যদি চরম শিক্ষা হইত, তবে ধর্ম্মের প্রতি মানুষের কি আকর্ষণ থাকিত? ভাবিয়া দেখ তরু-জীবনের ইতিহাস—মৃত্যু ভিন্ন কখনও নবজীবনের আবির্ভাব হয় না। বীজকে মরিতে হয় কাণ্ডের জন্য—যতদিন বীজ অক্ষত থাকিবে ততদিন কাণ্ডের আবির্ভাব অসম্ভব। আবার এমন যে নয়নাভিরাম সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প তাহাকেও মরিতে হয় ফলের জন্য। পরিশেষে আবার ফলকেও আত্মবলিদান দিতে হয়—কারণ তাহা না হইলে এক হইতে বহুজীবনের উদ্ভব হইতে পারে না। বিনয়েন্দ্রনাথ সংসার তরুর একটী বাঞ্ছিত ফল—সে ফলটী খসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ আমরা চিরদিনই ইহার জন্য শোক করিব—কিন্তু ভগবান এই জীবনের সাহায্যে আরও বহুজীবন গড়িয়া তুলিবেন বলিয়াই বুঝি তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। বিধাতার লীলা মানুষ কখনও বুঝিবে না—সে প্রয়াস বৃথা। আমরা আজ শ্রাদ্ধবাসরে বিনীতহৃদয়ে কেবল এই প্রার্থনা করি—"হে বিধাতঃ তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক; তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর যেন জগতের প্রতি গৃহে বিনয়েন্দ্রনাথের স্থায় দেবসন্তানের আবির্ভাব হয়।"

"যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ, সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ, জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ।"

ভূত ভবিষ্যৎ এবং সমুদায়ে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, স্বর্গলোক কেবল যাঁহারই, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

হিন্দু ট্র্যাক্ট

ঈশ্বর নিজ জন

তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা নিজ জন যাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।

আরাধ্যকে যদি যথার্থতঃ আমা হইতে পৃথক্ বলে মনে করি তবে তাঁহাকে যতই নিজ জন বলে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করি না কেন,

তাঁহাকে ঠিক নিজ জন বলা সাজে না। যে মুহূর্ত্তে তিনি ও আমি অভিন্ন বলে ধারণা হবে, তখনই প্রকৃত ভক্তির সম্ভাবনা, কারণ তখনই তিনি সর্ব্বাবস্থায় নিজ হতে নিজ জন, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘুচিবার নহে, তাঁহাকে আর হারাইবার ভয় নাই। তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে নিজ জন বলা আর উপর পড়া হয়ে পরকে আপন বলা একই কথা। যে বস্তুতঃ পর তাহাকে আপনার লোক বলা একটা গাজুরি কথা ছাড়া আর কি? "জন জামাই ভাগ্না তিন নহে আপনা"—তা যতই আপনার আপনার বলে মাথা খুঁড়ে মর; এও যেন সেইরূপ। সেইজন্য যে ভক্ত সোঽহংবাদ অস্বীকার করেন বা সোঽহং-বাদের নামেই শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাকে ভক্তের আদর্শ বলিতে একটু যেন কুণ্ঠা আসে। অথবা মনে হয় তাঁহার ঐ অস্বীকার ও শিহরিয়া উঠার মর্ম্ম আমরা বোধ হয় বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যেমন একই ব্যঞ্জনে সকল রসনার সমভাবে তৃপ্তি হয় না, কেহ ঝাল ভাল বাসেন কাহারও বা ঝাল খেলে চোখ দিয়ে জল ঝরে, বাঙ্গালীর পরম উপাদেয় মিষ্টান্ন ইংরাজের রসনায় যেমন অতৃপ্তিকর, পরমান্নে কেহ যেমন অধিক মিষ্ট কেহ বা অল্প মিষ্ট পসন্দ করেন, সেইরূপ অভেদ ভাবনায় সকলে হয়ত সকল সময় সুখী হন না। প্রকৃত ভক্ত কখনও অদ্বৈতবাদের বিরোধী হইতে পারেন না।

অদ্বৈতবাদের সোঽহং মহাবাণী আমা-দিগকে অভয় ও আশ্বাস দিয়া এই সুসমাচার প্রচার করছে যে হে ভগবৎপ্রেমিক ভক্ত তোমার ভয় কি, ভাবনা কি, কেন বৃথা উদ্বিগ্ন হচ্ছ? তোমার আরাধ্য যিনি তিনি যে তোমা হ'তে অভিন্ন, সর্ব্বাবস্থায় তোমার নিজ হ'তে নিজ জন, তাহাকে কিছুতেই হারাইবার ভয় নাই, তাঁহার ও তোমার মধ্যে কিছু ব্যবধানও নাই। তাঁহাকে পাইয়া সুখী ও শান্ত হও, যে ভাবে ইচ্ছা যে পরিমাণে ইচ্ছা রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ কর, রসসমুদ্রে তলাইয়া যাও, রসের ক্ষীরোদ সাগরেই তাঁহার অবস্থান এবং তিনিই রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। দর্পণে নানাবেশে আপনাকে হেরে সুন্দরীর সুখানুভব করার মত তাঁহার সঙ্গে পিতামাতা পতি সখা প্রভৃতি যে কোন সম্বন্ধ সাধ যায় স্থাপন কর। কোন সম্বন্ধ স্থাপনেই বাধা নাই কারণ সবগুলিই কল্পনা বা ভাবের খেলা মাত্র, রসানুভবটা শুধু সত্য আর সত্য হইতেছে সকল সম্বন্ধের অন্তর্লীন এই সার সম্বন্ধ বোধ যে তুমি তাঁর এবং তিনি তোমারই, তোমা হ'তে তিনি অভিন্ন, তত্ত্ব-মসি, সোঽহম্, অহং সঃ। যে মনে জ্ঞানে ইহা জেনেছে, সেই সে নীর ছেড়ে ক্ষীরপায়ী, ক্ষীরোদসাগরে বিচরণকারী পরমহংস।

আমাদের মনে হয় ভক্তিমার্গের ও অদ্বৈত-মার্গের এইরূপ একই গন্তব্যস্থল, উভয়েই মিলনান্ত নাটক এবং উভয় নাটকেরই নায়ক ও নায়িকা অভিন্ন।

তিনিই প্রকৃত নিজ জন পদবাচ্য যিনি আমার এবং আমি যাঁর প্রিয়। কেন সময়ে সময়ে আপনার লোকও পর এবং পরও আপনার লোক বলে বিবেচিত হয়? প্রিয়া-প্রিয় বোধই ইহার কারণ। মুখে কাহাকেও নিজ জন বলে প্রচারে ফল কি, যদি সেই নিজ জন আমার প্রিয় বা আমাকে উৎকৃষ্ট আনন্দ দানে সমর্থ না হয়? ভক্তিমার্গ এইরূপ শুষ্ক জ্ঞানমার্গের বিরোধী। ভক্তির যেমন ভাণ আছে সেইরূপ জ্ঞানের ভাণ, আনন্দের ভাণ এবং নিজ জন বলে প্রচারেরও

ভাণ আছে। সত্যের সাক্ষাৎ পেলে ভাণ চলে যায় এবং অধিক আনন্দের পরিচয় পেলে অল্প আনন্দে আর মন মজে না। আমাদের সন্দেহ হয়, ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রকৃত বিরোধী নহেন, নববলে উহাতে বল দিয়া প্রচারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন মাত্র। বুঝিবার বা বুঝাইবার দোষে ক্রমশঃ দুটা প্রতিপক্ষ দলের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রসাদে এখন আবার উভয়ে উভয়কে চিনিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হবার কাল এসেছে। অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দের পরাজয়ের এইরূপ একটা গূঢ় অর্থ যে নাই কে বলিতে পারে? অদ্বৈতমত পরিত্যাগ না করেও যে ভক্ত হওয়া যায় বা ভক্ত হয়েও যে অদ্বৈতমার্গে অগ্রসর হওয়া যায়, যাঁহারা দল বাঁধিতে সমুৎসুক এ তত্ত্বটি তাঁহাদের তেমন মুখ রোচক মনে হয় না, আর এই জন্যই এ বিষয়ে দলাদলিও ঘুচে না। কিন্তু এ বিষয়ে একবার একটু ভেবে দেখ, কি দেখিবে? শুদ্ধজ্ঞানে সিদ্ধান্ত হল, এই জগৎ থেকে তুমি স্বতন্ত্র নহ, এই জগতেরই তুমি অংশীভূত; অংশজ্ঞানটা নিতান্তই কাল্পনিক, সমষ্টিজ্ঞানটাই সত্য; আজ একটা স্থলের নাম ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বর্ষ পরে মানচিত্রে ভারতবর্ষের সীমা নির্দ্দেশ হয়ত অন্যরূপ দেখিবে—চোখের উপর বঙ্গদেশটার আকার কেমন বেমালুম বদলে যাচ্ছে—কিন্তু সমষ্টীভূত জগৎ পূর্ব্বেও যা ছিল পরেও তাই থাকিবে। এইরূপে অংশজ্ঞানটা কাল্পনিক বিভাগমাত্র সিদ্ধান্ত হলে বুঝা যায় জগৎ ও আমি যথার্থতঃ বিভিন্ন নহি, জ্ঞেয়কে ছেড়ে জ্ঞাতার বা জ্ঞাতাকে ছেঁটে ফেলে জ্ঞেয়ের পৃথক্ সত্তা নাই এবং সান্ত ও অনন্তের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ব্যবধান নাই। কিন্তু এই যে শুষ্ক জ্ঞান ইহাতে ফল কি? যদি ঐরূপ জ্ঞানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে না পার? সমগ্র জগৎটাকে মুখে আপনার বলিলেই সেটা আপনার হয় না। শত্রু মিত্র উদাসীন, জ্ঞেয় জগৎ এই ত্রিধা বিভক্ত। শত্রুস্থলীয় জগদংশটা বিলুপ্ত হইলেই আমি সুখী হই। আমার ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেখানেই দুঃখ বোধ, দুঃখ হ'তে মুক্তিলাভই পুরুষার্থ, ইহাই জীবনমাত্রেরই জীবনব্যাপী একটা সাধনা। আমাদের সাধ্য থাকিলে বিপক্ষরূপে প্রকাশিত জগদংশগুলি আমরা বিলুপ্ত করিয়া দিতাম। উদাসীন জগৎ সম্বন্ধে আমিও উদাসীন। বেল পাকলে কাকের কি? কামস্কাট্কাবাসীর ক্ষতি বৃদ্ধিতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি মনে করি কি? যেদিন এবং যে পরিমাণে কামস্কাট্কাবাসী আমার নিকট নিজ জন বিবেচিত হবেন, সেইদিন হইতে এবং সেই পরিমাণে কামস্কাট্কাবাসীর সুখ দুঃখে আমিও উল্লাস বা বেদনা বোধ করিব।

আবার, শুধু আমার প্রিয় হলেই চলিবে না। ভালবাসা দুদিক থেকে না হলে জমাট বাঁধে না। পজিটিভ্ নিগেটিভ্ দুটা তাড়িত স্রোতের সমাবেশ না হলে তাড়িৎশক্তি জাগে না, নিভে যায়। "ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিনা" কথাটার ভিতরে একটা বিষাদের একটা বৈরাগ্যের ভাব প্রচ্ছন্ন নাই কি? ভালবাসার প্রতিদান পেলে প্রেমিক তাহা উপেক্ষা করে কি? আমি গুণহীনই হই বা গুণবান্ হই আর একজনের অত্যজ্য ও চির প্রিয় এ ভাবটি অভেদভাবে ভাবনা ছাড়া বোধ হয় আসিতে পারে না। ভক্তির চরম হইতেছে এই অদ্বৈতজ্ঞান।

বুঝিলাম বোধ হয় তিনিই আমার নিজ জন

যিনি আমার এবং আমি যাঁর প্রিয়। ঈশ্বর এই প্রিয়বস্তু না হয়ে অন্য কোন বিষয় যদি আমার প্রিয় হয় তবে সেই অন্য বিষয়টিই আমার নিজ জন। মুখে যতই ঈশ্বর নিজ-জন বলি না কেন, সেটা শুধু মুখের কথা ও শুষ্ক জ্ঞান। ভক্ত এই শুষ্ক জ্ঞানের বিরোধী।

আবার দেখ যাহার সম্বন্ধে কিছু জানি না তাহাকে ভালবাসা অসম্ভব কি না এবং ভালবাসা অনুভবটা জ্ঞানেরই প্রকারভেদ কি না? ভক্তি এইরূপ কখন জ্ঞানের বিরোধী হইতে পারেন না কারণ জ্ঞান ছেড়ে ভক্তি অসম্ভব।

সগুণ ঈশ্বরে সর্ব্বগুণের সমষ্টি। যোগ বিয়োগ মিলে শূন্য হয়ে যাবার মত বিরুদ্ধ প্রকৃতির গুণরাশির সমবায়ে সগুণ ঈশ্বর নির্গুণ রূপেই প্রতিভাত হইবেন। ঈশ্বরে সৌম্য রুদ্র, সুন্দর অসুন্দর, সৃজন সংহার ইত্যাদি যাবতীয় গুণরাশির সমবায়। যত কিছু আছে তিনিই সব—"যো কুচ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।"

বাল্যকালে ঘুঘুর বা ঐরূপ কি এক পাখীর গম্ভীর বেদনা কাতর ধ্বনি মনকে বড় আকৃষ্ট করিত। জননী দেবী বুঝাইতেন পাখী তাহার হারাণ পুত্রটিকে ডাকিতেছে; জলের ধারে বাসা ছিল, একদিন বান এসে কোথায় তারে ভাসিয়ে লয়ে গেছে, পাখী তাই করুণস্বরে দিনরাত তাহার পুত্রকে ডাকে "উঠ চিতি পুত পুত।" বিশ্ব-জননী, এইরূপ স্নেহমাখা উদ্বোধন গীতি গেয়ে আমাদিগকে ডাক্‌ছেন, জাগাবার চেষ্টা পাচ্ছেন, অসাড় আমরা সে স্বর শুনতে পাই না, মা হারিয়ে কালস্রোতে কোথায় ভেসে চলেছি। নৈনিতালের পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থান কালেও এক রকম পাখীর ডাক শত গোলমালের ভিতর থেকেও মাঝে মাঝে কাণে যেত। পাখী ঠিক যেন বলে "সব তুঁহি" "সব তুঁহি" সবই তুই, সবই তুই। এ ডাকও প্রায় নিস্ফল হয়েই বায়ুস্রোতে ভেসে যায়, কাণে এসেও মরমে পশে না, ক্ষণেকের তরে গা'টা শুধু কাঁটা দিয়ে উঠে মাত্র। ঈশ্বর কোথায় বলে কত না খুঁজে মরি, তিনি যে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে, মহৎ হতেও মহত্তর হয়ে নিখিল জুড়িয়া সকলের জন্য সর্ব্বত্র বিরাজমান। জ্যামিতির বিন্দু এবং গণিতের অনন্ত উভয়ই কি এই নির্গুণ শূন্যবৎ পদার্থ নহে? কিছু নহে অথচ সমস্তই। ব্রহ্ম ও জগৎ সেইরূপ "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে।" ব্রহ্ম পূর্ণ, মায়াও পূর্ণ, সে পূর্ণ হ'তে এ পূর্ণের উৎপত্তি এবং পূর্ণ থেকে পূর্ণ বেরিয়ে এসেও পূর্ণই অবশিষ্ট রহে যায়। ইহা ঠিক গণিতের শূন্য নহে কি? শূন্য সহ শূন্য যোগ কর ফল হবে শূন্য, শূন্য হ'তে শূন্য বাদ দাও, ফল পাবে শূন্য। একভাবে শূন্যের অর্থ কিছুই নহে কিন্তু প্রকৃতই কিছু নহে কি? শূন্যই পূর্ণ দশ সংখ্যা। জ্ঞাপক-প্রমাণ একে শূন্য দিলে দশ দুয়ে শূন্য কুড়ি ইত্যাদি। ব্রহ্মে যাবতীয় বিরুদ্ধ গুণরাজির সমবায়, তাই তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ। কেহ যদি কখন বুদ্ধিমত্তা কখন বা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয় তাহার প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমরা করি কি? নিরুত্তর থাকি না কি? কেহ যদি কখন সদয় কখন বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরিচয় দেয়, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমরা কি উত্তর দিব? ব্রহ্মেও এইভাবে কোন গুণ নাই অথবা সব গুণই আছে। ব্রহ্মে যাবতীয় গুণরাশির সমবায়

তাই তিনি গণিতের শূন্যের ন্যায় সগুণ নির্গুণ উভয় লক্ষণান্বিত। মায়া পিশাচীও নহেন, পরিত্যজ্যাও নহেন এবং ব্রহ্ম হ'তেও ভিন্ন নহেন, তিনিই ব্রহ্ম। "যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ বিভুঃ।" প্রলয়কালে সগুণ ভগবান্ যখন যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে অনন্তে বিলীন হয়ে অবস্থান করেন, তখন তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে, সঃ আত্মা সঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইত্যাদি শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট নির্গুণ তুরীয় ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হন এবং এই অনন্ত গুণরাশির আধার হ'তেই শক্তি স্ফূর্ত্ত হয়ে জাগ্রত বিভু সগুণ ভগবান্‌রূপে জগতের দুঃখভার লাঘব ও দেবকার্য্য সাধন জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। নিদ্রা জাগরণ একই জীবের দুই অবস্থা, ইহাদের একটি সত্য অপরটি মিথ্যা বলি কি? Hypnotised বা মুগ্ধ অবস্থার মত যখন যে ভাব প্রবল হয়, তদনুসারে কখন যুক্তি দেখাই যেহেতু নিদ্রা জাগরণ উভয় অবস্থাতেই নির্গুণ অহং ভাবটা বিদ্যমান থাকে; অতএব ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবটাই সত্য, আবার কখন বা শবের সহিত জীবের সম্পর্ক কি, বলে সগুণ ভাবটাই সত্য বলে বিঘোষিত এবং চিনি হ'তে চাই নারে মন, চিনি খেতে চাই বলে পুরুষার্থ অর্থাৎ জীবের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করি। এই সব গোলমালের ভিতর সার কথাটি হচ্ছে "যার যেই ভাব সেই সে উত্তম, তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তার তল।" সবই ভাবের খেলা, মায়ার হাত এড়াবার যো নাই তিনি প্রসন্না হলেই ভূমানন্দ ভোগ সম্ভাবনা, সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ই মহামায়ার দুই ভিন্ন মূর্ত্তি বা ভাব মাত্র, যার যে ভাবে বিশ্বাস ও মন আকৃষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সেইটাই সত্য ভাব।

নেতি নেতি করেই হউক বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" চিন্তার পরিণামেই হউক, নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবে ভাবুক হ'তে যদি কেহ সমর্থ না হন কিংবা ঐ ভাবটি যদি কাহারও যথেষ্টরূপ চিত্তাকর্ষক না হয়, তবে কি তিনি অদ্বৈতবাদের শরণ লইবার ছলে একটা ভাণের আশ্রয় লইয়াই সন্তুষ্ট রহিবেন? সুন্দরের উপসনাতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, শুষ্ক জ্ঞানের মূল্য নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জ্ঞানদৃষ্টিতে বসুধা ও আমি অভিন্ন হলেও উহার মধ্যে আমার প্রিয় বা মিত্র জগদংশটুকুই প্রকৃতপক্ষে আমার আপনার অংশ বা নিজ জন বলে মনে হয়। এই শ্রেণীর সাধকগণের উদ্ধার সাধনেই ভক্তিবাদের সফলতা। ভক্তিবাদের ফলে, অনধিকার চর্চ্চার হাত থেকে অদ্বৈতবাদটা বহু পরিমাণে রক্ষা পেয়েছে। পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তিপাত্রগণ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহা লইয়াই উঁহাদিগকে ভক্তি করা চলে, ভক্তি করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় না, বরং ভাল করে জানিলাম না বলে ভক্তি বিরত রহিলে সেটা দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় দেওয়া হয়। নৈনিতাল থেকে ফিরে এসে কেহ যদি বলে নৈনিতালের আর সব দেখেছি কেবল যাহার জন্য নৈনিতালের নৈনিতাল নাম পাহাড়ের উপর নয়নীমায়ের সেই হ্রদটি দেখা হয় নাই, কিংবা কলিকাতা থেকে পল্লীগ্রামে নিজ বাসভবনে ফিরে গিয়ে কেহ যদি পরিচয় দেয় কলিকাতার ভাল ভাল জিনিসগুলাই শুধু দেখা হয় নাই, তা হলে আমরা তাহাকে কি বলি? সেইরূপ ভবে এসে যে ঈশ্বর ভক্তির কি আনন্দ বুঝিল না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিল না তাহার ভবে আসা প্রায় বিফল হল বলিব না কি? ভক্তি জ্ঞানের বা জ্ঞান ভক্তির অন্তরায় নহে।

ভক্তিপাত্রগণ সম্বন্ধে জ্ঞান যে পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে ভক্তিও সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিবে এবং আমরা দেখিয়াছি ভক্তির চরম এই অদ্বৈতজ্ঞান। সোহহং ভাবে উপনীত হলে ভক্তি শান্ত এবং জ্ঞানও তদবস্থা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর শান্ত দাস্ত বাৎসল্য সখ্য ইত্যাদি রূপে যে ভক্তির বিভাগ আমাদের পরিচিত, আনন্দরূপে বিদ্যমান ভক্তির এই মহারাস ভাব উহা হইতে একটু স্বতন্ত্র বটে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই প্রকৃত শান্ত ভক্তি নামে অভিধেয়। যতদিন এই পরমাভক্তি বা পরম-জ্ঞান উদয় না হয় ততদিন আত্মপ্রবঞ্চনা না করে উপাস্যসহ সম্বন্ধটা বজায় রাখিতে ভক্তিই একমাত্র উপায় এবং আমাদের ভরসাস্থল। যতদিন সঙ্কীর্ণজ্ঞান থাকে ততদিন কেহ অদ্বৈতজ্ঞানী বলে পরিচয় দিতে পারেন না, বড় জোর বলিতে পারেন অদ্বৈতমার্গে বিচরণ করছেন কিন্তু ক্ষুদ্রভক্তও নির্ভয়ে ভক্তবলে পরিচয় দিতে পারে। আমাদের মনে হয় ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই ভাবেই প্রকাশানন্দকে স্বদলভুক্ত করে লয়ে জগতের হিত সাধন করে গেছেন, প্রেম বিলাইতে এসে জ্ঞান ও ভক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে যান নাই. প্রত্যুত শিখাইয়াছিলেন ভক্তিই জ্ঞান এবং জ্ঞানই ভক্তি, কিন্তু কালই বলবান্ দু দিন না যেতে যেতেই জ্ঞানমার্গী ও ভক্তিমার্গী প্রেমের চেয়ে দ্বন্দ্বের আনন্দটাই বড় করে বুঝে তাহাতেই মেতে গেল। মা মহামায়া চিরকালই রণোন্মত্তা, সন্তানগণও তাই কোমর বেঁধে ঝগড়া করে আনন্দ পেতে যায়, শেষে হেলে ধরিতে শক্তি নাই কেউটে ধরিতে গিয়ে জর্জ্জরিত ও কাতর হয়ে পড়লে ঐ মাকেই আবার নানা সাজে অবতীর্ণা হয়ে মহাপুরুষগণের হাত দিয়ে সকলকে শান্ত করিতে হয়। জয় মা জগদীশ্বরী!

"চিনি হতে চাইনা রে মন চিনি খেতে চাই।" জ্ঞানে ও আনন্দে কি অহিনকুল সম্বন্ধ? কেহ জ্ঞানে, কেহ কর্ম্মে, কেহ বা ভক্তিপথে আনন্দ পান। একটু ভাবিলেই আমরা সকলেই ইহা বুঝিতে পারি কিন্তু তথাপি ভাবের বশে মুগ্ধ হয়ে উহাদের একটাই সার অন্য পথে কিছুই নাই বলে বড়াই করিতেও ছাড়ি না। এই জাগতিক ব্যাপারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানেই কত আনন্দ। চরম ও পরম জ্ঞানে না জানি কতই আনন্দ নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত রহিবার যে সচ্চিদানন্দ তাহা চিনি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে উপমিত হওয়া আমরা অসঙ্গত মনে করি, কারণ চিনি নিজে মিষ্টরস অনুভব করে না কিন্তু সচ্চিদানন্দ অবস্থায় পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ যে মিলিত হইয়া বিরাজ করে।

জ্ঞান যখন আনন্দ দানে সমর্থ হয় তখন আর তাহা শুষ্ক জ্ঞান নামে অভিধেয় নহে। ভক্তের ভাবে রসাস্বাদন না হলেও জ্ঞানীও আনন্দরস বঞ্চিত নহেন। বিশ্বরূপ ভগবানের অনন্ত মূর্ত্তি ভুলে গিয়ে এইরূপ স্থলে জ্ঞানী ও ভক্তের দলে বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু দুদলের কোন দলেই না ভিড়ে বাহির হ'তে উভয়ের ঝগড়ার প্রকৃতি ও পরিণাম পর্য্যা-লোচনা করিলে চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বাহির হবে। মনে হবে, দুই ভাই নিজের নিজের কোঁচড়ে ভাল ভাল খাবার পেয়ে পরস্পর পরস্পরকে নিজের সেই ভাল খাবারটির আস্বাদ দেওয়াবার জন্য চেষ্টা পেয়ে শেষে তাই লয়ে তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে বসেছে। জ্ঞানী ও ভক্তে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, আস্তিক ও নাস্তিকে তাই এত বিবাদ।

হে জ্ঞানী ও ভক্ত মহাজন বৃন্দ আপনারা আপনাদের ঐ উৎকৃষ্ট খাবারগুলি প্রসাদ স্বরূপ অকৃতি আমাদিগকে কিছু কিছু দান করে কৃতার্থ করুন। ইহাই ঠিক আধ্যাত্মিক হরির লুট।

নামের হরির লুট বিলিয়ে ঐ নিজ হ'তে নিজ জনকে চিনিয়ে ও মিলিয়ে দিবার জন্ম নিতাই গৌর অবতীর্ণ। ভক্ত বলেই সাধারণতঃ ইহাঁরা প্রসিদ্ধ কিন্তু ইহাঁরা কি জ্ঞানের বিরোধী? ভক্তিপাত্রকে চিনিতে ও পাইয়া ভক্তের মনের ভাবে প্রাণ পূরে আনন্দ অনুভব করিতে ইহাঁদের কি নিষেধ আছে? জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তও কি বিষয় বিমুখ নহেন? শ্রীগৌরাঙ্গের এবং তাঁহার কোন কোন পারিষদের পাণ্ডিত্য জন্য প্রসিদ্ধিও কি কম ছিল? লৌকিক ভাব উপেক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলেও নিত্যানন্দ যে নিত্য আনন্দময় এবং শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রিয় ও সুন্দর। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েরই যিনি আরাধ্য ও নিজজন তিনিও কি এইরূপ সুন্দর প্রিয় ও আনন্দ মূর্ত্তি নহেন?

আমাদের আশঙ্কা হয় গৌর নিতায়ের এইরূপ আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি সকল বৈষ্ণবের হয়ত সমান প্রীতিপ্রদ হবে না, কারণ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। তথাপি কোন কোন আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থে এ ভাবের সমর্থক কথাও দৃষ্ট হয়। "জগতে যত সুন্দর অসুন্দর পদার্থ আছে সকলই তাঁর রূপ; তিনি সকলরূপের আশ্রয়, তাঁর রূপই জগৎকে রূপবান্ করিয়া রাখিয়াছে।" (পাগল হরনাথ ৪র্থ ভাগ ৮৭ পত্র)। ইহা সেই শ্রুতিকথিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবে জগদ্দর্শন ব্যতীত আর কি?

নামমাহাত্ম্যে বৈষ্ণবের অগাধ বিশ্বাস। ঈশ্বরকে নিজজন রূপে চিনিতে ও পাইতে নাম জপ একটি অতি সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ইহাঁরা নির্দ্দেশ করেন। নাম জপের কত ফল যাঁরা করে দেখেছেন তাঁরাই জোর করে সেটা বল্‌তে পারেন কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে ভেবে দেখিলেও নাম মাহাত্ম্য আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারি। অনন্তমূর্ত্তি ভগবানের নানাভাবের অন্ত নাই, নামেই শুধু সেই সব ভাবের সমন্বয়। ঘনশ্যাম যাঁহার নাম তিনি কখন পুত্র কখন পিতা কখন আনন্দিত কখন বা বিরক্ত, কখন একবেশে কখন বা অন্যবেশে নানাভাবে বিদ্যমান কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁর ঐ ঘনশ্যাম নাম। নামে এইরূপ নানাভাবের সমন্বয়।

নাম যেন বাঁশী, ভাবগুলি যেন রাগরাগিনী বা সুর। বাঁশী ঠিক থাকিলে সব রকম সুরই বাহির করা যায়। কোন কোন সমঝদার যাত্রার গানের কথা শুনার চেয়ে সুরটাকেই বড় বলে মনে করেন; সুরে যদি ভাব আসে ভাষার আর প্রয়োজন কি? সুর, ভাষার শত ত্রুটি শুধরে দেয়। দেবতাকে ডাকিবার বেলায়ও সেইরূপ রূপবর্ণনাপূর্ণ বন্দনাগীতি সবার রুচিকর হয় না; যিনি পীতাম্বরের প্রেমে মুগ্ধ, শুভ্রকান্তি দিগম্বরের ভাবনা কিংবা নীরদ বরণী শ্যামা তাঁহাকে হয়ত তৃপ্তি দেয় না। নব্যরুচি অনুসারে এইজন্য দেবতার বন্দনাদিতে আজ কাল রূপবর্ণনাটা আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন দৃষ্ট হয় না, তৎপরিবর্ত্তে গুণব্যঞ্জক বিশেষণ রাশিরই সমাদর দৃষ্ট হয়। গুণবর্ণনাটাও কিন্তু একেবারে নিরাপদ নহে। যিনি একবিধ গুণ ভালবাসেন অন্যবিধ গুণব্যঞ্জক বিশেষণ তাঁহার হয়ত ভাল লাগিবে না, যিনি প্রেমের হরি চাহেন, বিভু হরিতে তাঁহার মন মজিবে না। নামে এ সব বালাই

নাই কারণ নামে যে সর্ব্বভাবের সমন্বয়। হৃদয় যখন ব্যথিত, কাতর প্রাণে শুধু হরিবল, দয়াময় বিশেষণ নাই বা যোগ করিলে। আবার হৃদয় যখন উল্লসিত শুধু হরি বলেই সে উল্লাস কি প্রকাশ করা যায় না? রাগ করে যখন কাহাকেও ডাকি এবং আদর করে যখন কাহাকেও ডাকি শব্দেই যে সেই রাগের বা আদরের ভাব বাহির হয়ে পড়ে, ভাষার অপেক্ষা রাখে কি! এস্‌রাজের তারে যখন রাগ রাগিণী খেলিতে থাকে, তখন কি ভাষার অভাবে স্বর ছুটা বন্ধ হয়? ঐ স্বরের ভিতরই যে ভাষা ও ভাব বাঁধা আছে। নাম এইরূপ ভাষা ও ভাবের উর্দ্ধে তাই নামের এত মান—হরি হতেও হরিনামের অধিক মাহাত্ম্য। নামে যেন সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাব মিলে গেছে, কোন একরূপ বিশেষ ভাবহীন অথচ সর্ব্ববিধ ভাবের বীজ স্বরূপ।

নাম লয়েও অনেক সময় গোল বাঁধে। যিনি কালী বলেন কৃষ্ণনাম মুখে আনিতে তিনি হয়ত সঙ্কুচিত হন। শব্দব্রহ্ম প্রণবে তাই সর্ব্বনামের সমন্বয়। কিন্তু যে কারণেই হউক প্রণব জপে সকলের অধিকার স্বীকৃত হয় না, গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র জপে শিষ্যেরই শুধু অধিকার। মহাজনগণ তাই আচণ্ডাল জনসাধারণের নির্ভয়ে ব্যবহার জন্ম নাম মহামন্ত্র প্রচার করেন ও সকলকে নামাশ্রয় করিতে উপদেশ দেন।

নামলয়ে গোল বাঁধান উচিত নহে, তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা ডাকিতে বাধা নাই, পুরুষ প্রকৃতি ব্রহ্ম কালী কৃষ্ণ শিব সবই তিনি (পাগল হরনাথ ৪র্থ ভাগ, ১১৭ পত্রে) এত নামের ভিতর যাঁর যে নামে হৃদয় গলে তিনি সেই নামই আশ্রয় করুন, অথবা, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। যাঁর যাঁহাকে মহাজন বলে শ্রদ্ধা হয় তিনি তাঁহারই প্রদর্শিত মার্গে অগ্রসর হউন।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

নাট্যসাহিত্য ও দীনবন্ধু *

আলোক ও ছায়ার বিচিত্র বর্ণসম্পাতে লীলাচঞ্চল প্রকৃতি নানা অভিনব শোভা ধারণ করে, মানবহৃদয়ে সেইরূপ সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে অবিরাম ভাবের লহরী খেলিতে থাকে। মানবের ভাব প্রকাশ করিবার জন্ম ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু শুধু ভাষা ভাব প্রকাশ করিবার জন্ম পর্য্যাপ্ত নহে, হাব, ভাব, আকার, ইঙ্গিত, লীলা, ভঙ্গী এ সকল ভাষার সহিত যুক্ত না হইলে, মনোভাব কতটা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা বুঝিবার সুন্দর উপায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটক পাঠ এবং তৎপরে রঙ্গালয়ে গিয়া তাহার অভিনয় দর্শন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যে কতদূর, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। নিখুঁৎ ভাবে মানবের ভাবতরঙ্গের স্পষ্ট চিত্র তুলিবার জন্ম নাটকের জন্ম। নাটক এই জন্ম দৃশ্যকাব্য; ইহার মধ্যে প্রাণ আছে, চেতনা আছে, ক্রিয়া আছে। সুতরাং মানবরাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ইহা অদ্বিতীয় শক্তিশালী।

* ভবানীপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

মানবের এই মনোভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা এতই স্বাভাবিক ও সহজসত্য যে ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না। মানব শিশুর অনুকরণস্পৃহা ইহার মূলে বিদ্যমান আছে। গ্রীক দার্শনিক Aristotle বলিয়া গিয়াছেন,—"To imitate", says Aristotle "is instinctive in man from his infancy; and from imitation all men naturally receive pleasure. Gesture and voice are means to imitation common to all human beings; and the aid of some sort of dress or decoration is generally within the reach of children and of childhood of nations. The assumption of character, whether real or fictitious is therefore the earliest step towards the drama. But it is only a preliminary step; nor is the drama itself reached till imitation extends to action."

কার্য্য বা গতিই নাটকের প্রাণ। একটি বা বিভিন্ন চরিত্র প্রথম উন্মেষ হইতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কিরূপে পরিণতি লাভ করে, বা যে চরিত্র যেরূপ বিকশিত হওয়া সঙ্গত, তাহাই নাটকে প্রদর্শিত হয়। অসভ্যজাতির মধ্যেও নাট্যসাহিত্য না থাকুক, নাটকের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম তাহাদিগের প্রমোদ উৎসবে সুগভীর দুঃখ শোকে প্রকাশ পায়। কোন জাতির মধ্যে সভ্যতা বিস্তৃত না হইলে, নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। সেই জন্যই সকল দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, নাটক কাব্যসাহিত্যের অনুগামী। আমাদের দেশে, রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বে কোন নাটক ছিল না থাকিতেও পারে না।

এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য লেখক ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য বিধিমতে প্রয়াসী কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারাও ভারতীয় নাট্যকলার প্রাচীনত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে নাট্য-সাহিত্য ভারতবর্ষের নিজস্ব এবং এমন কি পুরাকালে এক গ্রীক দেশ ভিন্ন আর কোন দেশ এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রাচীন যুগে সকল নাটক সংস্কৃতভাষায় রচিত হইয়াছিল, বাঙ্গলা-ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বাঙ্গলাভাষা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। বাঙ্গলাভাষা কাব্য-সাহিত্যে আশাতিরিক্ত ফল দিয়াছে, নাটকে এখনও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই এ কথা সত্য। কিন্তু উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইবার পক্ষে যে শুভ মুহূর্ত্তের আবশ্যক, সে সুদিন অদ্যাপি সমুদিত হয় নাই। জাতীয় জীবনে যখন কার্য্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়, উৎকৃষ্ট নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ সেই সময়ে সম্ভব। কালিদাস ভবভূতি বা Shakespear কর্ত্তৃক রচিত-সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকাবলীর সহিত বঙ্গভাষায় অত্যুত্তম নাটকের সমান আসন দিতে না পারি-লেও বঙ্গের প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে অঙ্কিত নরনারীচিত্র কোন ক্রমে অগৌরবের-নহে। বরং এইরূপ অবস্থায় আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার মধ্যে কোন চরিত্রচিত্র শ্রেষ্ঠ নাট্যকার-সৃষ্ট চরিত্রের সহিত তুলনীয় এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকৃত হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যসাহিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। একে আমরা পরাধীন জাতি, তাহার উপর যদি এ বিষয়ে রাজার নিকট হইতে কোনরূপ উৎসাহ বা সুশিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে যে এরূপ ফলোদয় হইবে ইহাত একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। ইংরাজাধিকারে পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের অসাড় জড়বৎ জাতীয়-জীবনে নব জাগরণের সূচনা করিয়াছে, সঞ্জীবতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে বহুকালের পর বঙ্গদেশে জাতীয়-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত জাতীয় নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে এক্ষণে এক বাঙ্গলা দেশ হইতে যে সকল নাটক প্রহসনাদি বাহির হয়, ভাল হউক মন্দ হউক তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বাঙ্গলাভাষায় নাটক রচনা করিয়া প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্র স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁহার কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটক এই হিসাবে সকল নাটকের অগ্রগামী। তাঁহার এই নাটকখানি প্রকাশিত হইবার পরেই, বাঙ্গালার অমর কবি অদ্ভুত প্রতিভাশালী মাইকেল মধুসূদন নাটক প্রহসনাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং অল্প কাল মধ্যে 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়াশালিকের ঘাড়ে রোঁওা' দুইখানি অতুল্য প্রহসন রচনা করেন। প্রতিভার লক্ষণ এই যে সে পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি এই জন্য স্বকীয় উদ্ভাবনীশক্তি বলে পুরাতনের মধ্যে নূতনের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মধুসূদনের কাব্যে অমৃতাক্ষরছন্দ প্রচলনে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে যেরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, নাটক ও সংস্কৃত নাটকের চিরপ্রচলিত নটনটীর সূত্রধরের সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কৃত্রিমতার কুহকজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছে।

দীনবন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক কবি ও নাট্যকার। ফলতঃ এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশে যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর একত্রসমাবেশ হইয়াছিল, রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এক ইংলণ্ড ভিন্ন আর কোথায়ও এইরূপ সম্মিলন হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র শতদল বিস্তার করিয়া বঙ্গবাণীর চরণ-যুগল ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই চারিপার্শ্বে অন্যান্য সাহিত্যসেবী সুরভিত পুষ্পের মত বিকাশ লাভ করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক বুঝিতে হইলে, এই সময়ের ইতিহাস জানা আবশ্যক। কিরূপ শিক্ষা দীক্ষার, কিরূপ পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যে গ্রন্থকারের মতামত, রুচি প্রবৃত্তি, ঈপ্সিত আদর্শ সহজে প্রতিফলিত হয়, ইহার মূলান্বেষণ করিলে নাটক বুঝিবার পক্ষে আমাদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

মাইকেলের ন্যায় দীনবন্ধু মিত্রও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তৎকালে হিন্দু কলেজে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। ডিরোজিয়ো ও Captain

Richardson হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণ সুলেখক যোগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সুবিখ্যাত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিতে" প্রকাশ করিয়াছেন।

রিচার্ডসন সাহেব যখন Shakespearএর কোন নাটক পড়িতেন তখন মনে হইত যে কোন উৎকৃষ্ট অভিনেতা আবৃত্তি করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ মেকলে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

'I can forget everything in India but your reading Shakespear'

অভিনয় ক্রিয়া তাঁহার এতই প্রিয় ছিল, যে কোন ছাত্র সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি তাঁহাকে থিয়েটারের টিকিট দিয়া বিদায়ের সময় বলিতেন 'I hope you are going to the Theatre to-day.' ছাত্রেরা অনেক স্থলেই শিক্ষকের অনুকরণ করে Richerdsonএর উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের হৃদয়ে নাট্যানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যসাহিত্যের প্রতি অনুরাগের বীজ এই হিন্দুকলেজ হইতেই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষার পূর্ব্বেই দীনবন্ধু বাঙ্গলা রচনা আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে যিনি প্রথম উৎসাহ দান করিয়াছিলেন কেবল দীনবন্ধু নহে, তৎকালে তরুণবয়স্ক লেখক মাত্রই যাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল রহস্য-রচনায় দীনবন্ধু যাহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী সেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম কে না জানেন? ঈশ্বরচন্দ্রের নাম অনেকে জানেন বটে, কিন্তু এককালে বঙ্গ-সাহিত্যের উপর তাঁহার কিরূপ একাধিপত্য ছিল তাহা বর্ত্তমান কালে অনেকে ধারণা করিতে পারিবেন না। "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত চরাচর যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।" এইরূপ বিজয় ঘোষণাবাণী জয়পতাকার ন্যায় তাঁহার পত্রের শীর্ষদেশে সন্নিবিষ্ট থাকিত। তখন সাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনে তিনি একছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা বা পুরস্কার লাভ তখনকার তরুণ সাহিত্যরথীদের শ্লাঘার বস্তু ছিল। আমাদের দেশের অনেক বড় বড় লেখক এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম অবস্থায় গুপ্তকবির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু কবিত্বে হাস্যরসের অবতারণায় দীনবন্ধু ভিন্ন আর কেহ গুরুর ন্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। তাঁহার নাটকের অনেক রহস্য-চিত্রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে।

যে সকল গুণের অধিকারী হইলে প্রসিদ্ধ নাট্যকার হওয়া যায় বিধাতার কৃপায় দীনবন্ধুর হৃদয়ে তাহার কোন অভাব ছিল না। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল ও ভাবপ্রবণ ছিল। তাঁহার আনন্দের উৎস সহস্র লোককে তৃপ্তি দিত, তাঁহার কৌতুহল শত শত লোককে আকৃষ্ট করিত, এবং সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিবার তাঁহার এমন একটি সহজ ও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, যে কেহ তাঁহার সহিত একবার পরিচয় করিত, সে তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িত।

সৌভাগ্যক্রমে দীনবন্ধু পঠদ্দশার শেষে অল্পকাল পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিবার পরে ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যেই তাঁহার নানা লোকের সহিত মিশিবার ও নানাবিধ অভিজ্ঞতা লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটে। তখন এই কার্য্যের নিয়ম ছিল সম্বৎসরই ভ্রমণ করিতে হইবে, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন

এইরূপ ভাবে দার্জিলিং হইতে বরিশাল, কাছাড় হইতে পঞ্জাব সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে হইত। ইহার ফলে দীনবন্ধুর নাটকে যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় ও বিচিত্র চরিত্রচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, বঙ্গভাষায় আর কোন নাটকে সেরূপ লক্ষিত হয় না। কিন্তু কেবল নানাস্থানে বেড়াইলেই হয় না দেখিবার চক্ষু ও মিশিবার শক্তি থাকা চাই। দীনবন্ধু লোকের সহিত কিরূপ সহজে মিশিতে পারিতেন তাহার একটি সত্য আখ্যায়িকা বর্ণনা করিব। ইহাতে তাঁহার কৌশলের অভিনবত্ব এবং আমোদ করিবার স্পৃহা একাধারে বিরাজিত হইয়াছে। একদিন তিনি পাল্কী করিয়া এক গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলেন, অদূরে এক ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকখানায় কতিপয় ভদ্রলোক সমবেত দেখিয়া বেহারাকে তথায় পাল্কী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পাল্কী তথায় পৌছিলে তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, বেহারা তাঁহার বাক্স তাঁহার সমীপে রাখিয়া দিল। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া একটি দরকারী রিপোর্ট নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে এমন সময় সংবাদ আসিল পাত হইয়াছে। সকলে গাত্রোত্থান করিলেন, দীনবন্ধুও সেই সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া একটি পাতা দখল করিলেন।

তাঁহার এই আমোদপ্রিয়তা ও রহস্যপটুতার আরও দুই একটি নিদর্শন দিব। দীনবন্ধু কাছাড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বঙ্কিম বাবুকে একজোড়া কাছাড়ের নির্ম্মিত বস্ত্রের জুতা পাঠাইয়া দেন এবং তৎসঙ্গে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে কেবল এই দুইটী কথা লেখা ছিল। "কেমন জুতা"।

এমন কি দীনবন্ধু যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও তাঁহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, অনেকেই জানেন যে তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাদ্‌ভাগে হইল। তাহার পর শেষে একটি বামপদে হইল। এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধু কার্য্যস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্ত্তীমেঘের ক্ষীণবিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ফোড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।' আমি কিছু বিস্তারিত ভাবেই দীনবন্ধুর রহস্যপ্রিয়তার উল্লেখ করিলাম, তাহার কারণ তাঁহার এই প্রবৃত্তি আমৃত্যু সহজাত সংস্কারের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, এবং এক নীলদর্পণ ভিন্ন অন্য সকল নাটক ও প্রহসন ব্যঙ্গ কৌতুকে অভিষিক্ত হইয়াছে। আমার আশঙ্কা হয় কেহ কেহ ভাবিতে পারেন দীনবন্ধু কেবল সরস বিষয়ের বর্ণনায় সুনিপুণ ছিলেন, গভীর বিষয়ের অবতারণা কিম্বা সুখ দুঃখের চিত্র প্রস্ফুট করিতে তাঁহার শক্তি সেরূপ কার্য্যকরী হইত না। কিন্তু এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক নীলদর্পণ হইতেই তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হয়। বঙ্গীয় কৃষকের নিদারুণ মর্ম্মবেদনা যখন দীনবন্ধুর হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল, তখন সদা প্রফুল্ল হাস্যোজ্জ্বল দীনবন্ধু আর নাই। নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচারের ঝড়ে সিন্ধুর ন্যায় সহসা তাঁহার হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ফলে, দীনবন্ধু জ্বালাময়ী ভাষায় সেই অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিতে পারিয়াছেন

এবং তদানীন্তন কালের নিপীড়িত ব্যক্তির সকরুণ চিত্র সহানুভূতির তুলিকায় রঞ্জিত হইয়াছিল বলিয়া এমন স্বাভাবিক উজ্জ্বল বর্ণে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে ছিল না, বঙ্কিমবাবু যথার্থই লিখিয়াছেন, "সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলের সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি, আদুরীর বাউটি পৈছার সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলানাথ যে শুভ কারণবশতঃ শ্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। * * * * * তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে। তিনিই সহানুভূতির অধীন। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ও নির্ম্মল চরিত্র তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। * * * তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামী আর নিমচাঁদের মাতলামীর মত থাকে না। সবটুকু দিতে হইবে। তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।" দীনবন্ধুর রুচির মুখ রক্ষা প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। এক্ষেত্রে, তখনকার বঙ্গীয় সমাজের এবং গুপ্তকবির প্রভাব দীনবন্ধু অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনে কোথাও কোথাও এমন ভাষার প্রয়োগ আছে যাহা কোন ক্রমে সুরুচির অনুমোদিত নহে এবং সর্ব্বাংশে বর্জ্জিত হইবার যোগ্য। ঘৃণিত চরিত্রের চিত্র করিতে করিতে কখন কখন নগ্নমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে দীনবন্ধুর এ সম্বন্ধে যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। কোন নাটকে নায়ক নায়িকার কথোপকথন সুদীর্ঘ কবিতায়, কোন নাটকে গৃহস্থ বধূর অতিরিক্ত সাধু-ভাষার বচনবিন্যাসে, কোথাও বা পিতার সরল প্রশ্নের উত্তরে পুত্রের শব্দালঙ্কারপূর্ণ ভাষার উচ্ছ্বাসে, কর্ণ নিপীড়িত এবং স্বাভাবিকতা পদদলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধুর নাটকে এ সকল দোষ আছে তৎপরবর্ত্তী অনেক নাটকে হয়ত এ সকল দোষ নাই, তথাপি দীনবন্ধুর নাটকাদিতে এমন একটি বিশেষ গুণ আছে যাহার জন্য দীনবন্ধুর নাটক স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান্ এবং বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সে গুণটী আর কিছু নহে দীন-বন্ধুর আন্তরিকতা। একশ্রেণীর সমালোচক দীনবন্ধুর নাটকাদির উচ্চ প্রশংসা করিতে পরাঙ্মুখ, যেহেতু ইহার মূল প্রাচীন উপন্যাস, ইংরাজী গ্রন্থ বা প্রচলিত গল্প হইতে গৃহীত। তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে তাহা হইলে কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তরচরিত এবং Shakespeareএর সকল নাটক, এক কথায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি গৌরবের আসনে স্থান পাইতে পারে না এবং দীনবন্ধুর ন্যায় কালিদাস ভবভূতি ও Shakespeare এক অপরাধে অপরাধী। লোক চক্ষুর অন্তরালে যখন খনির মধ্যে রত্ন থাকে তখন তাহার গৌরব কোথায়? বহুযত্নে যখন তাহার মলিনত্ব দূর করিয়া তাহাকে ব্যবহারো-পযোগী করা হয়, তখনই তাহার সার্থকতা।

আখ্যায়িকার কঙ্কাল যখন যথাযোগ্য উপাদান সংযোগে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তখন কাহার গৌরব প্রকাশ পায়? দীনবন্ধুর নাটকের না প্রাচীন আখ্যায়িকার?

দীনবন্ধুর প্রথম রচনা নীলদর্পণ। ১২৬৭ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর 'নবীন তপস্বিনী' কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। নবীন তপস্বিনীর পর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। 'সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা তৎপূর্ব্বে লিখিত। পরবর্ত্তী নাটক 'লীলাবতী' প্রনয়ণের কিছুকাল পরে 'জামাই বারিক' এবং মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে 'কমলে কামিনী' তাঁহার শেষ নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত এই সাতখানি নাটক ও প্রহসন।

এক 'কমলেকামিনী' নাটক ভিন্ন আর সকল নাটক প্রহসন দেশের দুর্দ্দশা, সামাজিক দোষ, দুর্নীতি দূর করিবার অভিপ্রায়ে লিখিত হয়। যে নাটকে দেশের একটা স্থায়ী মহা অমঙ্গল বিনাশ করিয়াছে, তাহার কাব্য-সৌন্দর্য্য সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি? শুধু এই কারণে নীলদর্পণ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নীলদর্পণ বিশেষভাবে দীনবন্ধুর নাম সার্থক করিয়াছে। নবীন তপস্বিনীতে কাব্যের চিত্র অপেক্ষা রঙ্গ চিত্র অধিক ফুটিয়াছে, তজ্জন্য বিজয় ও কামিনী অপেক্ষা ব্যাধের জগদম্বা অধিকতর জাগ্রত। মল্লিকা ফুল তাও বেশ ফুটিয়াছে, নবীন তপস্বিনীর হোঁদল কুতকুতের প্রহসন ভাগ এবং কাব্যাংশ একত্র যুক্ত না করিয়া যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে এক খানি সুমধুর নাটক ও উৎকৃষ্ট প্রহসন হইতে পারিত কিন্তু দীনবন্ধু তাহা করেন নাই। সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক এই তিন খানি প্রহসনের মধ্যে সধবার একাদশী নামে ও গুণে শ্রেষ্ঠ এবং ইহার বিশেষ গুণ এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাট্যোপযোগী ভাষা সচ্ছল প্রবাহে চলিয়াছে, কোথাও এতটুকু পদস্খলন হয় নাই, সর্ব্বত্র সজীবতা ও সরসতায় মণ্ডিত এবং এই হিসাবে বোধ হয় সধবার একাদশীর স্থান সর্ব্বাগ্রে। এই সকল রহস্যচিত্র এমন সুসঙ্গত, স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য যে মনে হয় রহস্য চিত্রশালার চাবী দীনবন্ধুর হস্তে ছিল, এবং তাঁহার ইচ্ছামাত্রই দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইত, এবং তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে রাজীব, নশীরাম, রতা নাপিত, জামাই বারিকের জামাইবৃন্দ, নিমচাঁদ, ভোলানাথ, রামমাণিক্য প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইত। সমাজ সংস্কারে নাট্যকারের ক্ষমতা অপরিসীম। একটি বিদ্রূপে যে দোষ সংশোধন হয় সহস্র উপদেশেও তাহা হয় না। আমরা দীনবন্ধুর নাটক হইতে কেবল দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিব। এক শ্রেণীর মূর্খ জমীদার সভ্যতার কোন ধার ধারে না জামাই বারিকে পদ্মলোচন তাহাদের মুখপাত্র বিজয়বল্লভকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 'আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় লাঙ্গুল পাকিয়ে বসে রইলেন আর আমি নলডাঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেশ দিচ্ছি।' সধবার একাদশীতে ঘটিরাম ডেপুটির আরদালির সহিত অটলের মজলিসে প্রবেশকালে নিমচাঁদ জিজ্ঞাসা করেন,

ইনি কি তোমার মোসাহেব?

কেনারাম—ও আমার আরদালি।

নিমচাঁদ—তবে ওকে লেজে বেঁধে এনেছেন কেন? এরূপ তীব্র কশাঘাতে অনেক বিজয়বল্লভের ও অনেক ঘটিরামের চৈতন্য হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের পণগ্রহণ

প্রথাও দীনবন্ধুর চক্ষু এড়ায় নাই। কমলে কামিনীর একস্থলে আছে 'এখন মেয়েরত বিয়ে নয় সত্যভামার ব্রত করা, বরের ওজনে স্বর্ণদান। পরিণয়ের হাটে আজকাল ছেলে বিক্রী হয়।'

দীনবন্ধুর নাটকগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার, স্বভাব সঙ্গত মূর্ত্তিগঠন ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে ঘটনাসহ স্থান করিবার এবং ঈপ্সিত রস উদ্রেক করিবার শক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়। ১৩১০ সালের সাহিত্যে 'দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা'র লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশের প্রায় সকল নাটকের পাত্র পাত্রী দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া অভিনয় করে, কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকের পাত্র পাত্রী যেরূপ প্রয়োজন দাঁড়াইয়া শুইয়া, বা কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত অবস্থায় দর্শক সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইহাতে নাটকের স্বাভাবিকতা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

নীলদর্পণের ১ম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে সৈরিন্ধ্রী যদি চুলের দড়ী না বিনাইয়া কেবল বসিয়া বসিয়া "ছোট বউ বড় পয়মন্ত" ইত্যাদির পরিচয় দিত, দর্শকের আপত্তির কোন কারণ থাকিত না, রস বোধেরও কোন ব্যাঘাত ঘটিত না, কিন্তু দড়ী বিনাইতে বিনাইতে ঐ কথাগুলি বলায়, যে একটু সূক্ষ্ম মধুর রসের উদ্ভব হইয়াছে, সে স্বাভাবিকতার ছবি আমরা দেখিতে পাইতাম না। এই স্বাভাবিকতার ছবি দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকেও আছে। বাহুল্যভয়ে তাহার পরিচয় দিতে বিরত রহিলাম। দীনবন্ধুর নাটকে ও প্রহসনে অনেক প্রকৃত ঘটনার সন্নিবেশ এবং তাৎকালিক অনেক জীবিত চরিত্রের প্রতিকৃতি আছে। তজ্জন্য সেই সময়ে দর্শকদের চক্ষে ইহার একটি বিশেষ মূল্য ছিল।

আজকাল সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরে একটু বিদ্বেষের ভাব একটু সংকীর্ণতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধুর সময়ে ইহার কোন চিহ্ন ছিল না। তাঁহার সধবার একাদশী ও লীলাবতী নাটকে বঙ্কিম ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের উচ্চ প্রশংসা আছে। নবীন তপস্বিনী ও জামাই বারিকে প্রচ্ছন্নভাবে বন্ধু-প্রীতির ছায়া রহিয়াছে। হিন্দুর মনোরঞ্জনের জন্য পরবর্ত্তী অনেক নাটকে ও প্রহসনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ আছে, কোথাও একটু দুর্ব্বলতার ছিদ্র পাইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শরধারা বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধু এইরূপ সাম্প্রদায়িক গণ্ডির উর্দ্ধে ছিলেন। হিন্দু হইয়া দীনবন্ধু লীলাবতী নাটকে যেরূপ ব্রাহ্ম পরিবারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ইহা তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয়। দীনবন্ধুর নাটকে বাঙ্গালা দেশের প্রবাদ প্রবচন মেয়েলি শ্লোক ও ছড়ার যেরূপ সু-প্রচুর ভাবে বিদ্যমান আছে অন্য কোন নাটকে সেরূপ নাই এবং সর্ব্বত্রই তাহাদের সুপ্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে দীনবন্ধুর জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং দেশের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের দেশে বৎসরে মাসের সংখ্যা অপেক্ষা পার্ব্বণের সংখ্যা অধিক ছিল। আমোদ আহ্লাদ হাস্য কৌতুক পূজা পার্ব্বণের নিত্য সহচর ছিল। কিন্তু কালবশে আজ সে দিন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন প্রাণ খুলিয়া কেহ হাসে না কেন না লোকে অসভ্য বলিবে। রঙ্গরসের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, শিশুও এখন মহা বিজ্ঞভাবে ঘাড়

নাড়ে, এই দুর্দ্দিনে দীনবন্ধুর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ হয় এবং তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে আমরা অনুভব করি।

তাঁহার এমন একখানি নাটক বা প্রহসন নাই যাহাতে আনন্দ কৌতুকের ও রঙ্গরসের স্নিগ্ধ ধারা প্রবাহিত না হইয়াছে। বহুকাল অধীনতার নিগড়ে আসিলে জাতীয় অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। দীনবন্ধুর নাটকাদিতে এমন একটি প্রফুল্ল ভাব আছে, এমন একটি সরসতা আছে, এমন একটি বৈচিত্র্য আছে, যাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি এবং নীরসপ্রাণও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাই আজ নববর্ষের প্রথম উৎসবে দীনবন্ধুর স্মৃতিপূজার আয়োজন হইয়াছে এবং তাঁহার সান্নিধ্যে আজিকার উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, আজিকার সভা চরিতার্থতা লাভ করুক।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গে-সর্পভীতি

সর্প সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। এদেশে ইহার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সর্প হিমে নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এই নিমিত্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহাদের অধিকতর প্রাদুর্ভাব। শীতকালে এদেশেও নিস্তেজ হয় এবং অচৈতন্য-প্রায় বিবর-মধ্যে শয়ান থাকে। এই সময়ে ইহাদের ক্ষুধাও থাকে না।

সর্প নানাবিধ; তন্মধ্যে গোক্ষুর, কেউটে, শঙ্খচূড় (১), করাত, বেতআচড়া (২), কালনাগিনী (৩), চন্দ্রবোড়া, উলুবোড়া ও রাজসাপ প্রভৃতি প্রধান ও বিষযুক্ত। দাঁড়াস, হেলে, ডুণ্ডুভ (৪), ও মেটে গিরগিটি আদি সর্পের বিষ নাই। কেউটে, গোক্ষুর ও শঙ্খচূড় ইহারা মস্তক স্ফীত করিলে, ফণার উপরিভাগে বিচিত্র চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ফণাধারী সর্পকুল আশিবিষ (৫) নামে অভিহিত।

করাত এবং রাজসাপের ফণা নাই বটে, কিন্তু বিষ অত্যন্ত তীব্র; তবে ইহারা সহজে কাহাকেও দংশন করে না। রাজসাপে ডুণ্ডুভ প্রভৃতি নির্ব্বিষ সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ফণাধারী সর্পমধ্যে গোক্ষুরই ভয়াবহ এবং কোপন স্বভাব। ইহাদের সংখ্যাও বহুল। এদেশে পদ্ম, খরিস, তেঁতুলে ও কৃষ্ণ প্রভৃতি গোক্ষুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। শঙ্খচূড়ও গোক্ষুর জাতীয়। ইহার সম্মুখ-ভাগে মানব অথবা অন্য কোন প্রাণী পতিত হইলে, সুবিশাল ফণা বিস্তারপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয় এবং বজ্র-সদৃশ ছোঁ মারিয়া অস্থিভগ্ন করিয়া ফেলে।

ফণাধারী সর্প ফণা বিস্তার না করিয়া দংশন করে না। ইহাদের ক্রোধ বা বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, ফণা বিস্তার করে। এমন সময়, নেত্রদ্বয় অগ্নিসদৃশ তেজবিশিষ্ট হয় এবং

(১) ইহারা ছোঁ মারিলে মানবের শঙ্খাস্থি চূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে শঙ্খচূড় বলা হয়। শঙ্খচূড় ধূসরবর্ণ, দৈর্ঘ্যে ৭।৮ ফুট। শঙ্খচূড় লোকালয়ে প্রায় দেখা যায় না; নিবিড় জঙ্গলে বাস করে।

(২) দেখিতে ঠিক বেতের মত, ইহারা গাছে থাকে।

(৩) কালনাগিনীও ফণাধারী; ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ নানাবর্ণে চিত্রিত, চক্ষু রক্তবর্ণ।

(৪) ঢোঁড়া।

(৫) যে সকল সর্পের দন্তে বিষ আছে।

নাসিকা হইতে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইতে থাকে। ক্রোধের সময় ইহাদের সম্মুখ-ভাগে যাহা কিছু পতিত হয়, তাহাতেই ভীষণরূপে ছোঁ মারে।

ফণাবিহীন সর্পমধ্যে বোড়া সর্প সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর। বোড়া অজগর জাতীয় (১)। ইহারা প্রকাণ্ড দেহ-ভার বহনে অসমর্থ হইয়া, প্রায় একস্থানেই শয়ন করিয়া থাকে। বোড়ার কলেবর দর্শনে, সহসা সর্প বলিয়া অনুভব করা যায় না। মেষ, ছাগ, গোবৎস অথবা অন্য প্রাণী নিকটবর্ত্তী স্থানে বিচরণ করিতে আসিলে, ইহারা তাহাদিগকে বেষ্টন-পূর্ব্বক প্রভূত বলে পঞ্জর ভগ্ন করিয়া ফেলে, তৎপরে ধীরে ধীরে কবলিত করে। উদরস্থ শিকার পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের চলচ্ছক্তি থাকে না, শয়ন করিয়া থাকে। বোড়া এত বলশালী যে, প্রকাণ্ড গো অথবা মহিষকেও বেষ্টন করিয়া পঞ্জর ভগ্ন করিতে পারে।

আশিবিষ সর্পের উপরের চোয়ালে দুইটী বক্রদন্ত থাকে; এই দন্ত অতীব তীক্ষ্ণ, ফাঁপা ও চলনশীল অর্থাৎ ইচ্ছামত সঞ্চালিত হয়। মুখ বন্ধ করিলে উহা দৃষ্ট হয় না, তখন মাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ইহাই সর্পের "বিষদন্ত" বলিয়া কথিত হয়; কারণ, এই দন্তের পশ্চাদ্‌ভাগে মাড়ীর অভ্যন্তরে বিষ-কোষ; উহাতে তরল বিষ সঞ্চিত থাকে। ইহাদের ক্রোধের কারণ হইলেই, এই শূন্য-গর্ভ দন্ত বিষপূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। কাহারও দেহে দংশন করিলে, দংশিত-স্থানে বিষ নিপতিত হইয়া শোণিত-মিশ্রিত হইলেই প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। সর্প-বিষ শোণিত-মিশ্রিত হইবা মাত্রই যে আহতের প্রাণ বিয়োগ ঘটে, তাহা নহে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা হৃৎকোষে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ জীবের মৃত্যু হয় না। এই বিষ হৃৎকোষে উপস্থিত না হইতেই নিষ্কাসিত করিতে পারিলে, কোন ভয় থাকে না। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পরেই ক্ষত-স্থানের উপরিভাগ রজ্জু দ্বারা দৃঢ় রূপে বন্ধন-পূর্ব্বক, কোন অস্ত্র দ্বারা আহত স্থান বিদীর্ণ করিতে হয়; তৎপরে অত্যুষ্ণ লৌহ দ্বারা উক্ত বিদীর্ণস্থান দগ্ধ করিলেই, শোণিত-সঙ্গেই বিষ নিঃসৃত হইয়া যাইতে পারে (২)। আশিবিষ সর্পপ্রধান দেশবাসীর সর্ব্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক। অসতর্কতা নিবন্ধন, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অন্যূন বিংশতি সহস্রাধিক লোক, সর্পদংশনে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে।

যে সকল জন্তুর শোণিত স্বভাবতঃ শীতল, তাহাদিগের সর্প-বিষে কোন অপকার হয় না। অনেকানেক আশিবিষ সর্প, ভেক কবলিত করিয়া উদরস্থ করিতে না পারিলে উহা উদ্‌গীরণ করিয়া ফেলে। সেই বিক্ষতাঙ্গ

(১) অজ অর্থাৎ ছাগকে গ্রাস করিতে পারে বলিয়া অজগর জাতীয় বলা হয়। ইহারা শিকার লাঙ্গুলে বেষ্টনপূর্ব্বক লালাদ্বারা ভিজাইতে থাকে। সমস্ত প্রাণীর লালাতেই খাদ্যবস্তু নরম হয়। ইহাদের প্রচুর লালায় শিকার নরম হইয়া গেলে মুচড়াইয়া অস্থি ভগ্ন করে; তৎপরে গ্রাস করে। ইহাদের মুখ-বিবরও খুব বড়। দুই চোয়ালের অস্থি মস্তকের সঙ্গে যুক্ত, এই নিমিত্ত হাঁ খুব বিস্তৃত। বোড়ার দৈর্ঘ্য ৩০।৪০ ফুট এবং বেড় তিন ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

(২) ক্ষতস্থানে কপিং গ্লাস লাগাইয়া রক্ত টানিয়া লইতে পারিলে অথবা মুখ দিয়া রক্ত চুষিয়া লইলেও নির্ব্বিষ হয়। কিন্তু যাহাদের দন্ত-মূলে ঘা থাকে, কিংবা সহজে মাড়ী হইতে রক্ত বাহির হয়, তাহারা চুষিলে ঐ বিষ মাড়ীর রক্তের সহিত মিশিয়া প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। সর্প-বিষ উদরস্থ করিলেও মৃত্যু হয় না; কিন্তু রক্তের সঙ্গে এক বিন্দু বিষ মিশ্রিত হইয়া হৃদ্‌কোষে উপস্থিত হইলেই মৃত্যু ঘটে।

ভেক, অনায়াসে চলিয়া গিয়া সুস্থ-শরীরে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে—ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে,—এইরূপ শীতল রক্ত বিশিষ্ট অনেক প্রাণীই, বিষাক্ত সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইয়াও বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। আশিবিষ সর্প এক প্রাণীকে দংশন করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই অন্যকে দংশন করিলে, সে বিষাক্ত হয় না। কারণ, সর্পের বিষ-কোষে প্রচুর বিষ সঞ্চিত থাকে না; যাহা থাকে, প্রথম-দংশনেই নিঃশেষ হইয়া যায়। পুনরায় কোষ বিষপূর্ণ হওয়া সময় সাপেক্ষ এই সময়ে, আশিবিষ সর্পের বিষ-দন্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিলেও, বিষ-কোষের বিষ নিঃসৃত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন,—"সর্পের বিষ-দন্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, উহা এক সপ্তাহের পর উদ্গত হইয়া থাকে।" তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। বিষ-দন্তের নিকটবর্ত্তী যে দুইটী ক্ষুদ্র দন্ত থাকে, তাহা শূন্য-গর্ত্ত হইয়া যায়; তদ্দ্বারাই বিষ-দন্তের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

সর্প মাংসাশী প্রাণী বটে, কিন্তু মাংস চর্ব্বণ বা ছিন্ন করিবার উপযুক্ত দন্ত নাই। উহারা ভেক, ইন্দুর ও পক্ষী প্রভৃতি শিকার একেবারে কবলিত করিয়া ফেলে, সুতরাং চর্ব্বণ বা শ্বা-দন্তের প্রয়োজন হয় না। সর্পের উভয় চোয়ালের দন্তই ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণতম এবং গলদেশাভিমুখে বক্র। ইহারা শিকার গ্রাস করিবার নিমিত্ত, এক চোয়ালের দন্ত দ্বারা অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে, আবার অন্য চোয়ালের দন্তে উহা ধারণ করে। এইরূপে শিকারটীকে উদরস্থ করিয়া ফেলে।

সর্পের অস্থিগুলি এরূপভাবে সজ্জীভূত থাকে যে সহজেই সঞ্চালিত হইতে পারে। আহার উদরস্থ করিবার সময়, পঞ্জর ও পৃষ্ঠদেশের অস্থি সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া, উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া লয়। এই নিমিত্তই, সর্প আপন অপেক্ষা স্থূল প্রাণীকেও অনায়াসে উদর-গহ্বরে স্থান দিতে পারে। ইহাদের মুখ-গহ্বর মস্তক অপেক্ষাও বৃহত্তর।

সর্প পদবিহীন। ইহারা শল্কের সাহায্যে দ্রুত গমন করিতে পারে। প্রথমে পঞ্জর অগ্রসর করে, পরে শল্ক দ্বারা ভূমি অথবা বৃক্ষ দৃঢ়রূপে ধারণ করে। বৃক্ষের শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফ প্রদান কালেও, শল্ক দ্বারা শাখা আকৃষ্ট হয়। ইহাদের শল্ক কণ্টক সদৃশ। গমন সময়ে উহা উন্নত হইয়া থাকে। সর্প বিবরমধ্যে প্রবেশ করিলে উহার লাঙ্গুল সমধিক বলে আকর্ষণ করিলেও বহির্গত হয় না। কারণ শল্কগুলি উন্নত হইলেই, তদ্দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে।

সর্প জল, স্থল, তরু ও লতা সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে পারে। কতকগুলি সর্প সর্ব্বদা বৃক্ষোপরি অবস্থান করে। ইহারা পক্ষী, কাষ্ঠ-বিড়ালী বা অন্যবিধ বৃক্ষারোহী প্রাণী ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ডুণ্ডুভ, মেটে গিরগিটি এবং পাণীয় কেউটা প্রভৃতি সর্প সলিল-বাসী। পাণীয় কেউটার দংশনে, প্রাণিগণকে প্রায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়। ডুণ্ডুভ ও গিরগিটি বিষধর সর্প নহে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও ভেক আহার করিয়া থাকে। মেটে-গিরগিটি যেমন নির্ব্বিষ, তেমনই নিরীহ; ইহাদিগকে উত্যক্ত করিলেও উত্তেজিত হয় না।

সর্পের জিহ্বা চঞ্চল ও দুইভাগে বিভক্ত; নেত্র পলকবিহীন। ইহাদের নেত্রে পল্লব নাই;

এই নিমিত্ত, উহা মুদ্রিত করিতে পারে না। চক্ষে ধূলা কিংবা বালুকা নিক্ষেপ করিলে সর্প অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। ইহারা নিভৃত স্থানে থাকিতেই ভালবাসে; এই নিমিত্ত, কলিকাতার ন্যায় বহু-জনাকীর্ণ স্থানে প্রায়ই সর্প দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ সর্পই নিবিড় বনভূমি ও ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করিয়া থাকে। সর্প স্বয়ং বিবর খনন করিতে পারে না। ইহারা ইন্দুর বা অন্য জীব-কৃত গর্ত্ত অধিকার করিয়া লয়।

সর্প দূর হইতে বাঁশী অথবা অনুরূপ মধুর স্বর শ্রবণ করিলে উল্লাসে নিকটবর্ত্তী হয়। এই নিমিত্ত, সর্প-ব্যবসায়িগণ বংশীধ্বনি দ্বারা বিবর হইতে সর্প বাহির করে। উহারা সর্প-ক্রীড়া দেখাইবার সময়ও ডম্বরু-ধ্বনি করিয়া থাকে।

সর্পজাতি অতি হিংস্রক, ইহাদের স্বজাতি-প্রীতি একেবারেই নাই। প্রবল সর্প দুর্ব্বলকে ভক্ষণ করে, এমন কি, কোন কোন সর্প স্বীয় সন্তানকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা এতাদৃশ হিংসা-রত বলিয়াই পণ্ডিতগণ সর্পকে "খল" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোন হিংসাপরায়ণ মানবের উল্লেখ করিতে হইলে, সর্পের সহিত উহার তুলনা করা হয়।

নানা কারণে বোধ হয় যে, সর্পজাতি কেবল অনিষ্ট সাধন নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; বাস্তবিক তাহা নহে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর জগতে কোন বস্তুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। সর্প দ্বারা জগতে যে কত মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। ইহারা দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া প্রাণিগণের জীবন রক্ষার সহায়তা করে; চিকিৎসকগণ সর্পবিষ হইতে বিবিধ উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কত কত উৎকট ব্যাধির শান্তি করিয়া থাকেন (১)। সর্পবিষ না থাকিলে জগতে যে কত অনিষ্ট ঘটিত, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীউমাচরণ দাস

ইউরোপে ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রকলা

সম্প্রতি একজন ওলন্দাজ চিত্রকর ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। এদেশে চারিমাস কাল কাটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

লঙ্কাদ্বীপ, মাদুরা, ত্রিচিনপলি, গোয়ালিয়র, আগ্রা এবং কাশী এই কয়েকস্থানের দৃশ্যসমূহ ইনি দেখিয়া গিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাচীন স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন?" ইনি বলিলেন, "না। আমি পুরাতন প্রাণ-হীন বস্তু ভালবাসি না। আমি জীবন্ত জিনিষ দেখিতে চাহি। মরা শরীর দেখিতে যেমন মানুষের কষ্ট বোধ হয়, তাহার দুর্গন্ধ যেমন কাহারও ভাল লাগে না

(১) সর্প-বিষ, বিকার গ্রস্ত রোগীর উত্তম ঔষধ।

তেমনি পুরাতন, ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা, মন্দির বা মূর্ত্তিরাশি আমার চিত্তে বেদনা দেয়। সেগুলি দেখিয়া বা তাহাদের কাছে যাইয়া আমি আনন্দ পাই না। আমি জীবন্ত মানুষ দেখিতে ইচ্ছা করি। নগরের কোলাহল, জনগণের যাতায়াত, পাখীর গান, জানোয়ারের শব্দ, নৌকার গতি এই সবই আমার বেশী ভাল লাগে।"

ইনি তিনচারিটা বড় বড় পোর্টফোলিও দেখাইলেন। সে গুলিতে সিংহল ও ভারতবর্ষের নানা দৃশ্য এবং ঘটনা চিত্রিত রহিয়াছে। মন্দির, সন্ন্যাসী, দেবতা, ভিক্ষুক, ছাগল, গাভী, হাতী, নৌকা, গঙ্গাঘাট, শ্মশান, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নানা বিষয়ের 'পেন্সিল-স্কেচ্' দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি সম্পূর্ণ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে? না, এই সমুদয়ের উপর আরও কাজ করিতে হইবে?" তিনি হাঁসিয়া বলিলেন "এগুলি কিছুই নয়। লেখকেরা যেমন ডায়েরীতে সঙ্কেত ও 'নোট' মাত্র লিখিয়া রাখেন আমিও সেইরূপ নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি মাত্র। এক একটা চিত্রের জন্য প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা খাটিয়াছি। প্রত্যেকটা লইয়া ১৫।২০ দিন কাজ করিলে তবে চিত্র সম্পূর্ণ হইবে।"

দেখিলাম এ যাত্রায় তিনি প্রায় ৬০ খানা হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান দৃশ্যের নোট বা সঙ্কেত সংগ্রহ করিয়াছেন। এ গুলিকে পূর্ণতা দান করিতে ইঁহার দুই বৎসর লাগিবে বলিলেন। চিত্রগুলি পরে ছাপাইয়া বিক্রয় করিবেন। এক একখানা চিত্রের ২৫।৩০টা নকল ছাপা হইবে। প্রত্যেক নকল-চিত্র ১৫০।২০০৲ টাকায় বিক্রয় হইবে। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের মিউজিয়াম, চিত্রশালা, ধনী ব্যক্তি, চিত্রকর এবং সৌখীন লোকেরা এই সমুদয় চিত্রের ক্রেতা।

আমি বলিলাম—"দেখিতেছি, আপনার এই সকল চিত্রের সাহায্যে ওলন্দাজেরা হিন্দুসমাজের এবং ভারতবর্ষের অনেক কথাই সহজে বুঝিতে পারে।" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়, আপনি যদি কোন ভাষায় পুস্তক লিখেন, তাহার পাঠক ও বোদ্ধা কেবল মাত্র সেই ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু চিত্র দেখিয়া মানুষ মাত্রেই চিত্রের পরিকল্পিত বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান হল্যাণ্ডে সুপ্রচারিত। লাইডেন-নগরের অনেক অধ্যাপকই ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদির চর্চ্চা করেন। প্রসিদ্ধ কার্ণ সাহেব আমাদেরই স্বদেশীয়, কাজেই ভারতবর্ষের বহু পদার্থ হল্যাণ্ডের নগরে নগরে উচ্চপদস্থ লোকজনের গৃহে সুরক্ষিত আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি আপনার চিত্রগুলি ওলন্দাজ জাতির সকলেই বেশ আদর করে?" তিনি উত্তর করিলেন, "না। বহুলোকই এগুলি বুঝিতে পারে না। তাহারা আমার এসব চিত্র আদৌ পছন্দ করে না। তাহারা হিন্দুস্থানের বিশেষ বিশেষ জীবনযাত্রাপ্রণালী, চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদি জানে না। এজন্য আমার চিত্রাবলী তাহাদের ভাল লাগে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ভারতবর্ষের সাহিত্য কিছু আলোচনা করিয়াছেন কি? ভারতের সংস্কৃত, প্রাকৃত বা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য আপনার জানা আছে কি? তাহা না হইলে আপনি নিজেই বা হিন্দুস্থানের দৃশ্য, ঘটনা, সমাজ বা কাজকর্ম্ম

বুঝেন কি করিয়া? আর এগুলি না বুঝিলে চিত্রাঙ্কন করা কি সম্ভবপর?” চিত্রকর বলিলেন, “বালিদ্বীপে আমাদের রাজ্য এখনও আছে। সেখানে অনেক হিন্দুর বাস। আমি সেদেশে তিনবার গিয়াছি। তিনবারে তিন বৎসর কাটাইয়াছি। তাহা ছাড়া আরও দুই বৎসর বালিদ্বীপের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ঐ দ্বীপের ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়াছি। ওখানকার হিন্দু কারিগর ও শিল্পীদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম ও সভ্যতার অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি। পরে আমার অভিজ্ঞতাসমূহ একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে প্রায় ২৫০ খানা চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রচার কার্য্যে আমাদের গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি। হিন্দুত্ব, হিন্দুর দেবদেবী, হিন্দুর আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। বালিদ্বীপে বাস করিয়া আমি ভারতবর্ষের আব্‌হাওয়া খানিকটা বুঝিতে পারিয়াছি।”

প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে ওলন্দাজ মত

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ইনি বেশ উচ্চ ধারণাই পোষণ করেন দেখিতেছি। মাদুরা মন্দিরের গাত্রস্থিত একটী রমণী মূর্ত্তি সম্বন্ধে ইনি বলিলেন “গ্রীকদিগের রচনা-কৌশল অপেক্ষা ইহাতে কম শিল্প-নৈপুণ্য নাই। সমস্ত মূর্ত্তিটির মধ্যে সৌসাদৃশ্য এবং গঠন-লাবণ্য অতি দক্ষতার সহিতই পুষ্ট করা হইয়াছে।”

মাদুরা কিম্বা কলম্বোর কোন চিত্রশালায় তিনি নটরাজ শিবের কাংস্যময় মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। ইহার প্রশংসাও তাঁহার নিকট শুনিলাম। শিবের চরণ-বিন্যাস এবং গোলাকার আবেষ্টনের মধ্যে মূর্ত্তির অবস্থিতি শিল্পীর সামঞ্জস্য জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যবোধের সাক্ষ্য দিতেছে।

ইনি ভারতের আধুনিক চিত্রকরগণের কোন সংবাদ রাখেন না। রবি বর্ম্মা, কুমারস্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির নাম এখনও শুনেন নাই। কিন্তু হ্যাভেলের গ্রন্থসমূহ ইহার নিকট দেখিলাম। আমার নিকট একখানা “মডার্ণ রিভিউ” ছিল। তাহাতে শৈলেন্দ্রনাথ দেবের জগদ্ধাত্রী প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখিতে পাইলাম। এইটা ওলন্দাজ শিল্পীকে দেখান গেল। ইনি বলিলেন “ধর্ম্ম হিসাবে,—দেবতা হিসাবে আমি ইহার আদর পূর্ণমাত্রায় করিতে পারি কি না সন্দেহ। কিন্তু চিত্র-কলাহিসাবে ইহা অতিশয় সুশ্রী। সিংহের উপর যে মূর্ত্তি উপবিষ্ট তাহাতে সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য, অনুপাত ইত্যাদির মাত্রা বেশ রক্ষিত হইয়াছে। রং ফলাইবার ক্ষমতাও শিল্পীর যথেষ্ট। সমগ্র চিত্রের ভিতর অংশে অংশে বেশ একটা মিল পাইতেছি। তবে মুখমণ্ডলটা আরও সুন্দর এবং সতেজ হইতে পারিত।”

এই সংখ্যায়ই, অবনীন্দ্রনাথের একটি চিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ইংরাজী নাম “In the dark night.” এইটা দেখাইলাম। চিত্রকর এই অভি-সারিকার চিত্র দেখিয়া বলিলেন—“নকলেও মন্দ দেখাইতেছে না—বেশ ভাবপূর্ণই বোধ হইতেছে। এত ছোট প্রতিলিপিতে বেশী বুঝা যায় না।”

এই ওলন্দাজ শিল্পীর মতে গ্রীক রচনার সঙ্গে তুলনায় মাদুরা তাঞ্জোর ইত্যাদি স্থানের শিল্প কর্ম্ম নিন্দনীয় নয়। অনেকগুলি সমান অবশ্য কোন কোনটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাচীন মিশরের ভাস্কর্য্য ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে আদর করিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি সেগুলির সৌন্দর্য্যও ইউরোপের চিত্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাঁর বিশ্বাস—অল্পকালের ভিতরই ভারতবর্ষের প্রাচীন মূর্ত্তিগঠন, খোদাই কার্য্য, মন্দির নির্ম্মাণ ইত্যাদির যথোচিত আদর পাশ্চাত্য জগতে আরব্ধ হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভারতবর্ষের মূর্ত্তিগুলির চারি হাত ও তিন চোখ, এবং সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদির উপর অবস্থান—এগুলি কি পাশ্চাত্যেরা কোন দিন বুঝিতে ও আদর করিতে পারিবে? আপনাদের চোখে এতদিন ত এই সব অতি অস্বাভাবিক, অসত্য, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে। কেহ কেহ ত আমাদের দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি জঘন্য, বিশ্রী, বীভৎস, কদাকার বলিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন শিল্পীদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান আদৌ ছিল না—এইরূপই অনেক চিত্র-ও-মূর্ত্তি সমালোচকগণের বিশ্বাস।"

ইনি হাঁসিয়া বলিলেন, "অস্বাভাবিক পরিকল্পনায় কি আসে যায়? প্রকৃতি বিরুদ্ধ হস্ত পদ মস্তক নেত্র থাকিলেই বা! তাহার ভিতর ও কি সৌন্দর্য্য ফুটান যায় না? সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, অনুপাত, লাবণ্য, খোদাই-কার্য্য ইত্যাদির জ্ঞান কি এই তথাকথিত অপ্রাকৃত রচনাসমূহে লক্ষ্য করিতে পারি না? আমার ত বিশ্বাস—অতি উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ক্ষমতা ভারতীয় কারিগরগণের ছিল। আমি সম্প্রতি বাহ্য সৌন্দর্য্য ও স্থূল আকৃতি সৌষ্ঠবের কথাই বলিতেছি—অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না। পাশ্চাত্যেরা ভারতীয় মূর্ত্তির বহির্ভাগ মাত্র দেখিয়া থাকেন। হিন্দু দেবদেবী বা বাহনাদির ভিতরকার কথা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নিকট আশা করা যায় না। কিন্তু তথাপি আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এইরূপ বাহ্যলাবণ্যের দর্শক এবং বোদ্ধারাও হিন্দু মূর্ত্তিগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট কলা-নৈপুণ্য দেখিতে পাইবেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তিগুলি সত্যসত্যই উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা গ্রীক ও মিশরীয় প্রকৃতি-সঙ্গত মূর্ত্তির আদর করেন তাঁহাদেরও ভবিষ্যতে এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কারুকার্য্যের মধ্যে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আদর করিতে শিখিবেন।"

তার পর চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের ভিতরকার কথা এবং অন্তর্নিহিত আদর্শ ও ভাবরাশি সম্বন্ধে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, "প্রকৃতির নকল করাই ত সুকুমার শিল্প ও কলার কার্য্য নয়। শিল্পি অনেক নূতন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া থাকেন। তাঁহার কল্পনাশক্তির পরিচয় না পাইলে তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর কারিগর বলিতে পার কি?

গ্রীকদিগের দেবদেবী সমূহ—সেগুলিও কি কল্পনার সৃষ্টি নয়? সেগুলি কি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতিবিম্ব বা নকল মাত্র? কখনই নয়—সে গুলির মধ্যেও ভাবুকতা যথেষ্টই আছে।

প্রত্যেক জাতির চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে নিজস্ব চিন্তারাশির প্রভাব থাকিবেই। সেই চিন্তারাশি নানা আকারে, নানা মূর্ত্তিতে হয়ত

প্রকাশিত হয় কিন্তু মূর্ত্তিগুলির পরিকল্পনার সামঞ্জস্য জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, অনুপাতের ধারণা দুনিয়ার লোকই বেশ বুঝিতে পারে। ভিতরকার কথা, ভাবুকতা, চিত্তের ক্রিয়া ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু সেই ভাবনারাশি যে আকারে আমাদের চোখের সম্মুখে ইন্দ্রিয়-গোচর হয় সেগুলি বুঝা ত বেশী কঠিন নয়। এই কারণে আজ পাশ্চাত্যজগৎ মিশরের শিল্প আদর করিতে পারিয়াছে। মিশরীয় ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ও বাহনতত্ত্ব, আধুনিক খ্রীষ্টানজাতি এখনও সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই সত্য। কিন্তু তাহাদের শিল্পের বাহ্য অঙ্গগুলি ক্রমশঃই বোধগম্য হইতেছে। আমরা দিন দিন সেই প্রাচীনতম জাতির কলাজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। শীঘ্রই ভারতের প্রাচীন কলানৈপুণ্যও জগতে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবে। ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।”

ভারতের নব্য চিত্র-শিল্প এবং রুশ সমালোচক

লণ্ডনের “ভিক্টোরিয়া এবং য়্যাল্‌বার্ট-মিউজিয়ামে”র এক অংশের নাম ভারতীয় সংগ্রহালয়। কলিকাতা মিউজিয়ামের শিল্প ও ঐতিহাসিক বিভাগে যে সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে এখানেও সেই জাতীয় দ্রব্য রক্ষিত হইয়া থাকে। এই ভবনে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নমুনাই বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম। এতগুলি ভারতীয় চিত্র পূর্ব্বে এক সঙ্গে কখনও দেখি নাই। প্রায়ই মুসলমানী যুগের রচনা। রাজপুত, পাহাড়ী, মোগল এবং কাশ্মীরি এই সকল ধরণের চিত্রাবলীতে এই ভবনের কিয়দংশ ভরিয়া গিয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলার এরূপ সুন্দর সংগ্রহালয় ভারতবর্ষের কুত্রাপি দেখি নাই।

এতদ্ব্যতীত, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কতকগুলি নিদর্শন এই গৃহের কয়েকটা প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই গুলি প্যারি নগরের প্রদর্শণীতে দেখান হইয়াছিল। ফরাসীরা এই সমুদয় শিল্প-কর্ম্মের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাহা শুনিয়াই ইংরাজেরা এইগুলিকে লণ্ডনের প্রদর্শনীতে স্থান দিয়াছেন. এই চিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক খানা পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ইংরাজ সমালোচক লিখিয়া-ছিলেন যে এগুলিকে একটা promise বা ভবিষ্যতের সূচনামাত্ররূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। Fulfilment বা সিদ্ধিলাভের পরিচয় এই সকল নমুনায় নাই। অর্থাৎ ভারতশিল্পীরা এখন চিত্র বিদ্যায় হাতে খড়ি দিতেছেন মাত্র। এখন ইঁহাদের সাধনার যুগ চলিতেছে— ভবিষ্যতে নব্য ভারতীয় চিত্র কলা কি দাঁড়াইবে এখনও বলিবার সময় আসে নাই।

আধুনিক চিত্রগুলি প্রাচীন চিত্রাবলীর পার্শ্বেই রক্ষিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতীয় কারিগরীর দুই যুগ তুলনা করা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন দর্শকই এক-সঙ্গে প্রাচীন এবং অবনীন্দ্র-নাথপ্রবর্ত্তিত নব্য কলার পরিচয় পাইবেন। মোটের উপর, এই ঘরে প্রবেশ করিলে চিত্র শিল্পে ভারত-বাসীর ক্রমবিকাশ বুঝিতে কাহারও কষ্ট পাইতে হয় না।

দেখিতে পাইলাম একব্যক্তি অতি মনোযোগ সহকারে নোটবুকে মন্তব্য লিখিতেছেন। আলাপে জানিলাম ইনি রুস। কবিতারচনায়, কাব্যসমালোচনায় এবং চিত্র-সমালোচনায় ইঁহার খুব ঝোঁক। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক—স্পেনদেশীয় মুসলমান সমাজবিষয়ক কাহিনী ইঁহার রচনায়

বিশেষ বিবৃত হয়। ইনি বলিলেন "আমি এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে রুশভাষায় একটা প্রবন্ধ লিখিব, এইজন্য নোট সংগ্রহ করিতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ভারতের আধুনিক চিত্রসম্পদ্ বিষয়ে রুশিয়ার লোকেরা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবে কি?" ইনি উত্তর করিলেন, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমার স্বদেশবাসীরা বিশেষ ব্যগ্র। আজ কাল রবীন্দ্র-নাথের কাব্য রুশিয়ায় বিশেষ সমাদৃত। ইতি মধ্যে "গীতাঞ্জলির" রুশ অনুবাদের তিন সংস্করণ বিক্রী হইয়া গিয়াছে। অনুবাদক আমার বন্ধু। ইনি লিথুনিয়া প্রদেশের অধিবাসী। ইঁহার মাতৃভাষা অনেকটা সংস্কৃতের মত এবং চিন্তাপ্রণালীও কথঞ্চিৎ ভারতীয় ধরণের। এই জন্য আমি ইঁহাকে গীতাঞ্জলি অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমি নিজেই "গার্ডেনার" গ্রন্থের অন্তর্গত কোন কোন কবিতার রুশ অনুবাদ করিয়াছি তাহার আদরও কম নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "Gardener"এর কোন্ কবিতাটি আপনার ভাল লাগে?" উত্তরে বুঝা গেল—

"ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সম্মুখ পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহ কাজ লয়ে রহিব
বল কি মতে?"—

ইত্যাদি কবিতাটি ইঁহার প্রিয়।

ইনি প্রথমেই বলিলেন "মহাশয়, যদি দুঃখিত না হন, তাহা হইলে বলি যে, আপনাদের চিত্রশিল্পীরা বিদেশীয় কায়দাসমূহ নকল করিতেছেন কেন? জাপানী ও ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব আপনাদের এই নব্য চিত্রকলায় অত্যধিক দেখিতে পাইতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলিতে চাহেন যে, আমাদের শিল্প চিরকাল এক-ভাবেই থাকিবে? যুগে যুগে নূতন নূতন রীতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতশিল্পের নূতন নূতন আকার ফুটিয়া উঠিবে না? আজকাল ভারতবর্ষে বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভারতবাসীর জীবন কি এই শক্তিসমূহ অস্বীকার করিয়া বিকশিত হইতে পারে? কাজেই আধুনিক ভারতীয় শিল্পে বিশ্বের সম্পদই সঞ্চিত হইতে থাকিবে তাহার আশ্চর্য্য কি?"

তিনি বলিলেন. "বিদেশীয় রীতি অনুকরণ করা ভারতবাসীর পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নয়। অবশ্য জগতের সকল প্রকার রীতিই আপনারা আলোচনা করুন ও শিক্ষা করুন। আপনাদের শিল্পীরা জগতের নানাপ্রকার কায়দার পরিচয় গ্রহণ করুন। তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। শিক্ষার জন্য এই সমুদয়েরই প্রয়োজন আছে। নানা জিনিষ না দেখিলে চোখ ফুটে না। কিন্তু যখন আপনার ছবি আঁকিতে বসিবেন তখন এই সকল পরকীয় জিনিষ মনে রাখিবেন না। সকলগুলি ভুলিয়া গিয়া নিজ কল্পনা শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবেন। স্বকীয় সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং শিল্পবোধ এত দিনকার শিক্ষার ফলে যেরূপ পুষ্ট হইয়াছে তদনুসারেই কার্য্য করিবেন। যাহা কিছু দেখিতেছেন, শিখিতেছেন ও বুঝিতেছেন সকলই আপনাদের নিজস্ব হইয়া যাওয়া আবশ্যক। যথার্থ রূপে হজম ও মজ্জাগত হইয়া গেলে পরকীয় শিল্পের প্রভাবে কোন শিল্পীর ক্ষতি হয় না। কিন্তু দেখিতেছি আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা বিদেশীয় প্রভাব এখনও পূর্ণরূপে হজম করিতে পারেন নাই। পরকীয় রীতি-

গুলি এই শিল্পচর্চ্চার অঙ্গীভূত হইয়া গেলে ভারতের আধুনিক চিত্রকরগণ জগতে একটা নূতন রীতির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার পূর্ব্বাভাষ এই কারুকার্য্যের মধ্যে যথেষ্টই দেখিতে পাইতেছি।"

এই বলিয়া রুস সমালোচক ও ঔপন্যাসিক আমাকে মোগল, রাজপুত, পাহাড়ী এবং কাশ্মীরি চিত্র-গুলি দেখাইলেন। তাঁহার মতে "ঐ সমুদয় অতি উচ্চ অঙ্গের শিল্পকর্ম্ম। ঐ সকল চিত্রে perspective বা পারিপ্রেক্ষিকের পরিচয় নাই সত্য। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। প্রত্যেক চিত্রেই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা যত্ন সহকারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রত্যেক কার্য্যেই চিত্তের ভাব পরিষ্কার রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ণ সমাবেশ ও নিখুঁত। পাশ্চাত্য চিত্রকরগণও ঐরূপ রং ফলাইতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিবেন।"

এই উপলক্ষে তিনি আরও বলিলেন, "এই প্রাচীন চিত্র সম্পদের পারম্পর্য্য রক্ষা করাই আধুনিক ভারতশিল্পিগণের কর্ত্তব্য। এরূপ উচ্চ শ্রেণীর কারুকার্য্য যে দেশে তাহার সন্তানগণ বিদেশ হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবেন কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি রুস ভাষায় যে প্রবন্ধ লিখিবেন তাহার সারমর্ম্ম আমাকে বলিতে পারেন কি?" তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে চিত্রগুলির সম্মুখে লইয়া গেলেন। প্রত্যেক চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই জনে নানা আলোচনা হইল।

মুকুল চন্দ্র দের রং ফলাইবার ক্ষমতা আছে। 'অপ্সরার নৃত্য'-চিত্রে নর্ত্তন অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক রেখা সার্থক—একটীও বাজে লাইন বা দাগ নাই। ইহাতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কারিগরি বুঝিতে পারা যায়।

ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার এক একটা ছবির মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয় সুচিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সকলগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। মেঘের চিত্রে তিনটি পদার্থ আছে—রমণী, ময়ূর ও মেঘ। এই তিনটির ভিতর যে কোন দুইটি থাকিলেই সৌন্দর্য্য বাড়িত।

অসিত হালদারের পেন্সিল-স্কেচ্ ও নক্সাগুলি অতি মনোরম। কিন্তু কোন কোন রেখায় ও কল্পনায় জাপানী প্রভাব পরিস্ফুট। অথচ তাহা অন্য কায়দার সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় নাই।

নন্দলালের কার্য্য দেখিয়া ইনি বিশেষ প্রীত। ইঁহার মতে নন্দলাল ছবি আঁকিতে যেরূপ দক্ষ রং সমাবেশে সেরূপ পটু নন। নীল, সবুজ ইত্যাদি বর্ণের সামঞ্জস্য বিধান করিতে ইনি পারেন নাই। রাজপুতরীতির বর্ণ-সমাবেশ গভীরভাবে বুঝিলে নন্দলালের দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। "হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-জীবন" চিত্রটি দেখিয়া রুশসমালোচক যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। রামায়ণের দৃশ্য সমূহও ইঁহার ভাল লাগিল।

গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি রচনাই এখানে প্রদর্শিত। রুশ সমালোচক এগুলি বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না। ইঁহার মতে গগণেন্দ্রনাথের শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যধিক।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কার্য্যগুলি ইনি প্রায়ই নিখুঁত বলিলেন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন "অবনীন্দ্রনাথের বয়স কত?" আমি বলিলাম "ইনিই নব্য শিল্পের প্রবর্ত্তক। অন্যান্য যে সকল শিল্পীর কার্য্য এখানে প্রদর্শিত

হইয়াছে তাঁহারা সকলেই ইঁহার ছাত্র।” তিনি বলিলেন “আমি ভাবিয়াছিলাম ইনি অল্পবয়স্ক যুবক।”

রুশ বন্ধুটি পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথের নামও শুনেন নাই এবং ভারতীয় চিত্রের কোন সংবাদও রাখেন নাই। তিনি বলিলেন “এই সমুদয় চিত্র যদি ইউরোপের নানা প্রদর্শনীতে প্রচারিত হইতে থাকে তাহা হইলে অত্যধিক মূল্যে এগুলি বিক্রীত হইবে। কেবল তাহাই নহে। সমস্ত জগতের চিত্র-শিল্পীরা ও এই ভারতীয় কলা হইতে নূতন শিক্ষা পাইবেন। আমার বিশ্বাস, আপনাদের চিত্রকরেরা বর্ণসমাবেশের ক্ষমতা লাভ করিলেই ভারতীয় শিল্প-চিত্রজগতে এক অভিনব রীতির প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে। ইঁহাদের “ডিজাইন” করিবার ক্ষমতা এবং চিত্রাঙ্কণের দক্ষতা এখনই নিরপেক্ষ সমালোচকেরা প্রশংসা করিতে বাধ্য।”

অবনীন্দ্রনাথের ‘মডার্ণ-রিভিউ’-প্রসিদ্ধ উষ্ট্র-চিত্র সম্বন্ধে রুশ সমালোচক বলিলেন “সবই ভাল হইয়াছে। কিন্তু বর্ণ-বিন্যাস পাকা হাতের নয়।” যে চিত্রে সখী নায়িকাকে নায়কের মূর্ত্তি দেখাইতেছেন তাহাও ইনি যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। সখী, রাধা এবং মূর্ত্তি—তিনটি বস্তুই অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। সমস্ত চিত্রের ভিতর দিয়া একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ভাবময় চিত্রের মূল্য অত্যধিক। নায়িকার উরু অত্যন্ত বৃহদাকার ও কদর্য্য দেখাইতেছে সত্য। কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি ঐদিকে যাইবে না। মুখশ্রী ও চিত্রের সামঞ্জস্যই সকলের চোখে আগে পড়িবে। কাজেই ঐ খুঁতে চিত্রের অঙ্গহানি হয় নাই।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতে রংফলান প্রায়ই সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। ওমার খাইয়ামের আলোচ্য বিষয়গুলি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু ছবির নীচে কবিতার পদগুলি না লিখিলেই ভাল হইত। কারণ কবিতা পাঠ করিয়া ছবির অর্থ বিশেষ বুঝা যায় না। বরং ছবিগুলি দেখিয়াই উচ্চ অঙ্গের শিল্পকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘নির্ব্বাসিত যক্ষের পত্নী’-চিত্রটি দেখিলেও যে-কোন দেশের যে-কোন দর্শক বিরহের দৃশ্য বুঝিতে পারেন। ইহার নীচে কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। বর্ষা ঋতু বুঝাইবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ একটি অন্ধকারময় বনভূমিতে তিনটি নর্ত্তকীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বর্ণ, অঙ্কন, রেখাপাত, মনোভাব গতি, ভঙ্গী ইত্যাদি সবই এই চিত্রে সুষ্ঠু হইয়াছে। রমণী-ত্রয়ের আকার কিছু দীর্ঘ সত্য। কিন্তু নৃত্যের অবস্থায় ইহাদিগকে যেরূপ সাজান হইয়াছে তাহাতে সেদিকে দর্শকের চোখ পড়িবে না। সকলেই নৃত্যের চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবেন।

ভারতীয় সংগ্রহালয়ের চিত্র-প্রকোষ্ঠে থাকিতে থাকিতেই রুশ সাহিত্য সেবীর সঙ্গে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “আমাদের আধুনিক শিল্পীরা অতি ক্ষুদ্রাকার চিত্র আঁকিয়া থাকেন মনে হইল না কি? ইঁহারা বড় বড় ছবি আঁকিতেছেন না কেন? আপনি কি বিবেচনা করেন যে ইঁহাদের সে ক্ষমতা নাই?” তিনি বলিলেন “না, ক্ষুদ্র ছবি আঁকিতেই বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। বড় ছবি অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ভারতবাসীর সেজন্য দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শিল্প ক্ষমতা আপনাদের আছে—জগতের লোক এ কথা বলিবে। আমি

আপনার স্বদেশকে বৃথা বাড়াইতেছি না।"

তিনি আবার বলিলেন "আপনাদের চিত্র কার্য্যগুলি জগতের সকল প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে প্রদর্শিত করুন। শীঘ্রই আধুনিক ভারত পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ সম্মানের যোগ্য হইবে। সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা আপনারা জগতে যত প্রসিদ্ধ হইতে পারিবেন শিল্প চর্চ্চা দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ হইতে পারিবেন। কারণ আপনাদের সাহিত্য সত্য ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা বিদেশীয়গণের পক্ষে অসম্ভব। আপনাদের মাতৃভাষায় সুপণ্ডিত না হইলে কেহ সাহিত্যরস উপভোগ করিতে পারিবেন না। অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া সাহিত্যের মর্ম্মকথা গ্রহণ করা বড়ই কঠিন।"

"বিশেষতঃ ২।৪।১০ খানা গ্রন্থের অনুবাদ হইলেই বা কি হইবে? কোন সাহিত্যের একখানা গ্রন্থ বুঝিতে হইলে সেই সাহিত্যের প্রাচীন নবীন অসংখ্য গ্রন্থের সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু চিত্র বুঝিবার জন্য কোন ভাষায় পণ্ডিত হইবার প্রয়োজন নাই। চিত্র সমূহ মানবজাতির সাধারণ ভাষায় শিল্পীর মনোভাব প্রকাশ করে। চিত্রের ভাষা জাতিহিসাবে ভিন্ন ভিন্ন নয়। জগতের সকল জাতি এবং সকল জাতির সকল লোকই এক চিত্রভাষা ব্যবহার করে। এখানে অনুবাদের প্রয়োজন নাই—ব্যাখ্যা সমালোচনারও প্রয়োজন নাই। ভাষান্তরিত করিয়া মৌলিক চিত্রের রহস্য বুঝাইবারও আবশ্যক হয় না। মানুষ মাত্রই যে কোন চিত্র দেখিয়া সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী জাতির হৃদয়-কথা অনায়াসে বুঝিতে পারে। এজন্য ভারতবর্ষকে আধুনিক জগতে প্রচারিত করিতে হইলে চিত্র শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করাই অত্যাবশ্যক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে শিল্পের উপর জাতীয় চরিত্রের কোন প্রভাব নাই? যে কোন হিন্দুই কি খৃষ্টান শিল্পীদিগের যে কোন কার্য্য সহজে উপভোগ করিতে পারেন? যে কোন খ্রীষ্টানই কি হিন্দু কারিগরের যে কোন শিল্প-কার্য্যে সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারেন? ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি না জানিলে কি ভারতীয় চিত্রকলা অন্য দেশের লোকেরা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন? আমরাই কি পাশ্চাত্য জগতের পূর্ব্বাপর ইতিহাস-কথা না জানিয়া পাশ্চাত্য শিল্প বুঝিতে পারি?" রুশ সমালোচক বলিলেন—"বাস্তবিকই চিত্র শিল্প সার্ব্বদেশিক, সার্ব্ব-কালিক এবং সার্ব্বজনীন। সকল যুগের সকল লোকই যে কোন চিত্র বুঝিতে সমর্থ। অবশ্য কোন কোন জিনিষ বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বিত হয়। তাহাতে ক্ষতি কি? ঐ বৈচিত্র্যে জনগণের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিত্রের নীচে বিবরণ স্বরূপ কোন কবিতার পদ লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ছবির নীচে কিছু না লিখিলেও সকলেই বিষয়টা সহজে বুঝিতে পারে।

ইংরাজ শিল্পীরা সাধারণতঃ চিত্রের নীচে বর্ণনা লিখিয়া রাখেন। কিন্তু ফরাসী ও রুশ চিত্রকরেরা ইহা পছন্দ করেন না। মনে করুণ, রেফেলের প্রসিদ্ধ 'ম্যাডোনা' চিত্রের নীচে 'ম্যাডোনা' শব্দ পর্য্যন্ত লেখা নাই। তথাপি জগতে এমন কোন লোক আছে কি যে এই চিত্র দেখিয়া মাতৃভাব বা ধাত্রীভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে?

দেবদেবী, জনগণ, তরুলতা, জীবজন্তু

ইত্যাদির কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরগণ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মেই করিয়া থাকেন। ভারতীয় দেবদেবীগণের রং ও মূর্ত্তি দেখিতেছি কতকগুলি বাঁধা নিয়মের অধীন। সেগুলি আমরা জানি না—বুঝিও না। কিন্তু সেগুলির সৌন্দর্য্য ও উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝিতেছি না? দেবদেবীসমূহের শাস্ত্রীয় রূপ রক্ষা করিয়াও আপনাদের চিত্রকরগণ যথোচিত ব্যাকগ্রাউণ্ড এবং পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিকের সাহায্যে উত্তম কারুকার্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন। আপনাদের প্রাচীন চিত্রগুলি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। কোন কোন মূর্ত্তির একাধিক হস্তপদ মুখ চোখ দেখিতেছি বটে—কিন্তু তাহাতে শিল্পীরা মূর্ত্তিকে বিসদৃশ বা বীভৎস করিয়া তুলেন নাই। বরং সমস্ত চিত্রের মধ্যে ঐ গুলি বেশ সামঞ্জস্যের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিল্পীর অভিপ্রায়ও দক্ষতার সহিত প্রচারিত হইয়াছে।”

ইতি শ্রীশিক্ষার্থী।

পথ কোথায় ?

জগতে আসিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কোন্ পথে যাইব? কোন্ পথে যাইলে দুর্লভ সুলভ হইবে, কণ্টক কুসুম হইবে, গরল অমৃতময় হইবে? কে বলিয়া দিবে?

মানব জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল সুখের অন্বেষণে প্রধাবিত হয়। কেবল আনন্দই তাহার উৎপত্তির হেতু। যথা শাস্ত্র বাক্য “আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতাতি জায়ন্তে,” ইত্যাদি। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যতদিন জ্ঞানোদয় না হয়, ততদিন চিন্তাশক্তি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা থাকে না। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে, জ্ঞানোদয় হইলে, বিচার বুদ্ধি আইসে ও আপন স্বার্থ পূর্ণ মাত্রায় কিরূপে সাধন হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হয়। আপনার প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় স্থির করিতে গিয়া জড়বুদ্ধির সাহায্যে আনন্দলাভই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলিয়া নির্ণীত হয়। তখন কিসে আনন্দ লাভ হইবে এই চেষ্টায় কেবল জগতময় ঘুরিয়া বেড়ায়, আনন্দ যে কি পদার্থ, আনন্দ যে কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টাও করে না, যাহা কিছু তাহার আনন্দ বলিয়া মনে হয়, তাহাতেই মগ্ন হইতে যায়। এইরূপ ক্রমাগত আনন্দানুসরণ করিতে করিতে সে দেখে যে আনন্দবোধে প্রাণপণে যাহাকে চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিলাম, কৈ তাহাত মনমত আনন্দ দিল না। তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য বস্তুর সন্ধানে যায়, তাহাতেও নিরাশ হয়। এইরূপে বার বার যখন দেখে যে মরিচীকার ন্যায় মিথ্যা আশা উদ্দীপনকারী দৃশ্যতঃ এই আনন্দ সম্ভার তাহার হস্তচ্যুত হইতেছে, বিনিময়ে কেবল নিরাশা ও পরিতাপ। এইরূপে নিরাশ ও পরিতপ্ত হৃদয়ে আনন্দ হইতে আনন্দান্তরে পরিভ্রমণের পর যখন অতৃপ্ত আকাঙ্খা লইয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা পায়, তখন বুঝিতে পারে এই সতত পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য জগতে আনন্দের লেশ মাত্র নাই। তখন দৃষ্টি অন্য দিকে পড়ে। এ জগতে বাহ্য বস্তুতে কোন আনন্দ নাই,

আর কোথাও কি কিছু আছে? আমার বাহিরে কিছু নাই, অন্তরেও কি কিছু নাই? এই বিরাট যবনিকার অন্তরালে, আর কোথাও কি কিছু আছে?

যাহারা ভাগ্যবান, পূর্ব সুকৃতির দ্বারা, যাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার শীঘ্র দূরীভূত হয়, তাঁহাদের এইরূপ চিন্তা স্বতঃই উদিত হয়। আর যাহারা একেবারে "বদ্ধজীব" তাহারা "তেজে বারিভ্রমের" ন্যায় এই আপাতঃ মনোমুগ্ধকর আনন্দের আশায় আত্মবিস্মৃত হইয়া চিরকাল কাটায় ও শেষে এই আনন্দের বাসনা লইয়া দেহ-ত্যাগ করিলে ইহা দ্বারা নূতন কর্ম্ম সূত্র সৃষ্ট হয় ও বার বার জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে আসে। অন্ধবৎ সুপথ, কুপথ, বুঝিতে পারে না। কেবল অনিত্য নিমেষমাত্র আয়ুষ্মান এই জড় জগতে আনন্দের আশায় প্রধাবিত হইয়া বার বার নিরাশ হয় ও অশেষবিধ কষ্ট পায়।

যাঁহারা ভাগ্যবলে প্রবুদ্ধ হন, তাঁহারা বাহ্যজগতে আনন্দের লেশ মাত্র না পাইয়া অন্য কোথাও কিছু আছে কি না অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে অন্তর্জগতে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। ক্রমে তাঁহাদের মনে হয়, বাহিরে কিছু নাই, অন্তরেই সব; তখন অন্তর্যামীর অন্বেষণের চেষ্টা হয়। তখন স্বতঃই মনে হয় "হায়, এ জগতে আসিয়া এ কি করিলাম? মিথ্যা আশার আশায় আজীবন কাটাইলাম, এখন কোন্ পথে যাইব? কোন্ পথে যাইলে আনন্দময়ের সন্ধান পাইব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোপভোগে সংসারের কলুষ বিধৌত করিতে পারিব?"

তখন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই আনন্দের আভাস যিনি দেখাইয়া দেন, তিনিই গুরু। তখন মনে মনে বুঝিতে পারে, আনন্দময়ের সন্নিধানে যাইতে হইলে শিক্ষকের প্রয়োজন। তখন উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণ করে। কোন্ পথে, কিরূপে অগ্রসর হইলে, অন্তরের লুক্কায়িত আনন্দ ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে, ও অবিরত বিমল আনন্দ ও শান্তি সুখ ভোগ সংসারের পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, মোহ প্রভৃতিকে পরাস্থিত করিতে পারিবে, এই চেষ্টায় সদ্গুরুর অন্বেষণ করে। সদ্গুরু কৃপা করিয়া আনন্দ সম্ভোগের গুপ্ত দ্বার দেখাইয়া দেন। তখন জীব সেই দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দময়কে আহ্বান করিতে থাকে। মনে মুখে এক করিয়া, সকল বাসনা বর্জ্জিত হইয়া একবার কাতর প্রাণে সেই হৃদয়-বিহারী সচ্চিদানন্দময় বাসুদেবকে ডাকিতে পারিলেই, তিনি দেখা দেন ও চিরদিনের জন্য আনন্দভাণ্ডার খুলিয়া দেন। জীব স্বয়ং প্রয়োজনের অধিক আনন্দ ভোগ করে ও অন্যান্য জীবকেও সে আনন্দ ভোগের আস্বাদে কৃতকৃতার্থ করে।

পরমহংসদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন "যেমন বড় বড় জাহাজ, আপনিও পারে যায় এবং অনেক জীব জন্তুকেও পারে লইয়া যায়।" সেইরূপ যে জীব ভিতরের আনন্দের সন্ধান পায়, সেত জীবন্মুক্ত এবং সে অনায়াসে অপরকেও সেই আনন্দের সন্ধান দিয়া রক্ষা করিতে পারে।

বদ্ধজীবের অবস্থা ঠিক কস্তুরিমৃগের ন্যায়। আপন নাভিগন্ধে উন্মত্ত হইয়া যেরূপ মৃগ সেই সদ্গন্ধের অন্বেষণে বনভূমি তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বদ্ধজীব সেইরূপ আপন অন্তরের আনন্দ উৎসের সন্ধান না পাইয়া জগৎময় ঘুরিয়া মরে ও অবশেষে হতাশ হইয়া অশেষ কষ্ট

পায়। পরে সাধু-সঙ্গের দ্বারা চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীন্ হইলে, সদ্গুরু মিলে ও সেই আনন্দ সন্ধান পাইয়া তদাস্বাদনে জীবন কৃতার্থ ও বার বার গতায়ত নিবারিত করে।

সদ্গুরু অন্তরের অন্তরতম দেশে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে অহরহঃ বিরাজিত থাকেন ও ধীরে ধীরে শিষ্যকে আনন্দময়ের সদনে পহঁছাইয়া দেন বা স্বয়ং আনন্দময়ের স্থান অধিকার করিয়া শিষ্যের হৃদয়ে অবিরল আনন্দধারা বর্ষণ করিয়া তাহাকে জীবন্মুক্ত করিয়া দেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে "কঃ পন্থাঃ ?" কোন্‌টি পথ ? কোন্ পথ আশ্রয় করিলে শ্রীগুরুদেবের প্রসাদলাভে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ হয় ?

জগৎ সংসারের ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে দুইটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি আলোক, অপরটি অন্ধকার, এক সৎ অপর অসৎ, একটি আকর্ষণ অপরটি প্রতিক্ষেপ। এইরূপে দেখা যায় যে বিশ্ব সৃষ্টির মূলীভূত কারণ যে মায়াশক্তি তাহাও পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ।

পরা বা বিদ্যাশক্তি জীবকে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভে উদ্‌যুক্ত করে এবং অপরা বা অবিদ্যা শক্তি তাঁহা হইতে জীবকে দূরে লইয়া এই সংসারকূপে মগ্ন রাখে। জীব মাত্রেই প্রায় এই অবিদ্যা মায়ার আশ্রয়ে জগতে বাস করিতে চায়। রোগী যেরূপ সুপথ্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা স্বাদু কুপথ্যই প্রার্থনা করে, তাহাতে রোগ বৃদ্ধি করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে, সেদিকে দৃক্‌পাতও করে না, সেইরূপ অবিদ্যা-ভ্রান্ত জীব বিদ্যাশক্তি ত্যাগ করিয়া অবিদ্যাতেই মত্ত থাকে ও বিষয়কীট হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পায়।

এই পরা ও অপরা মায়া অতীব দুস্তর। ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব।

অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্য, যিনি সাক্ষাৎ নরনারায়ণ রূপী, তাঁহাকেই উপদেশচ্ছলে দয়াময় গীতায় বলিয়াছেন—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

"দেবসম্বন্ধীয়, ত্রিগুণময়ী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী আমার মায়া দুরত্যয়া। কেহই ইহার পারে যাইতে পারে না। ইহা পার হইবার একমাত্র উপায় আমার শরণাগতি। আমাতে যে প্রপন্ন হয় সেই কেবল এই মায়ার হাত এড়াইতে পারে।"

অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

"অর্জ্জুন সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। অর্থাৎ সকল রকম কাম্য ও নিষিদ্ধ ধর্ম্ম এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি বর্ণাশ্রমপ্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।"

ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই ভগবৎ বাক্যের তাৎপর্য্য কিন্তু এই সমস্ত বাহ্য ব্যাপার হইতে কেবল নিবৃত্ত হইলেই হইল না। বেদ ও শ্রুতির ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, দেহধর্ম্ম অর্থাৎ বাতাতপ আদি, ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম দর্শন ও শ্রবণাদি, মনোধর্ম্ম অর্থাৎ কামনাদি, বুদ্ধি-ধর্ম্ম অর্থাৎ বিচার ও অহঙ্কার এই সমস্ত পরিত্যাগ করিলে হৃদয়ে নিশ্চলা ভক্তির উদয় হয়। তখন যথার্থ শরণ লওয়া হয়, ও ভক্তের প্রাণ শীতল করিতে ভক্তপ্রাণ আসিয়া উদয় হ'ন।

মায়ার খেলাঘর এই জটিল সংসারে, কি সৎ কি অসৎ কোন্‌টি বিদ্যা কোন্‌টি অবিদ্যা বিচার বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবের পক্ষে অতীব কঠিন ব্যাপার তাই প্রয়োজন হইলেই উপদেষ্টা আসিয়া উপস্থিত হ'ন। গীতার সিদ্ধবাক্য—

"কিং কর্ম্ম কিম কর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।"

তাই গুরুরূপী ভগবান পথ না দেখাইলে, জীবের সাধ্য কি যে এই মায়াবরণ ভেদ

করিয়া, অবিদ্যার আকর্ষণ ব্যর্থ করিয়া সচ্চিদানন্দ-মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করে?

জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে মানব ভিন্ন অন্য সব প্রাণী আপন পশ্বাদি জ্ঞান (Instinct) দ্বারা কার্য্য করে। তাহাদের কার্য্যগুলি সীমাবদ্ধ। মানবের ন্যায় তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিশাল নহে। আহারের জন্য শিকার, ও সন্তানোৎপাদনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাত্র তাহাদের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু দয়াময়, মানবকে বিভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে আত্মস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া বিচার বুদ্ধি দিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন। অবিদ্যার প্রভাবে এই বিচারবুদ্ধি হইতে অহংবুদ্ধি বা অহঙ্কারের উদয় হইয়া মানবকে আত্মহারা করিয়া ফেলে। তাহার স্বরূপ ভুলাইয়া দেয়। সে, সকল কার্য্যে "আমি কর্ত্তা" এই অহঙ্কার বশে আত্মনাশ করে। গীতায় ভগবদ্বাক্য—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণাণি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

প্রকৃতির গুণে সব কার্য্য সমাধা হইলেও অহঙ্কারে হতবুদ্ধি দুর্ভাগা মানব স্বয়ং সব করিতেছি ইহাই মনে করে। "আমি কর্ত্তা" এই অহঙ্কার বশে কায করিতে গিয়া সব পণ্ড করে। অহঙ্কারান্ধ মানব আপন কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সকলি অবিদ্যামায়া বশে। অহঙ্কারে বিদ্যাশক্তির অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। কাচের চাকচিক্যময়ী উজ্জ্বলতা দর্শনে হীরকের ভষ্মাবৃত লাবণ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। এই বিরূপ জ্ঞানই আমাদিগকে বিপথে চালিত করে। পথভ্রান্ত করিয়া দেয়।

সকল বিসর্জ্জন দিয়া, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া জীব যদি একবার দীনহৃদয়ে দীননাথের শরণ লয়, তাঁহাকে সর্ব্বভারার্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাবশে আর পথ ভ্রান্ত হইতে হয় না। জীব ইচ্ছা করিয়া তাঁহার দিকে এক পদ অগ্রসর হইলে, দয়াময় আপনার বিশ্বভরা প্রেমবলে তাহাকে দশ পদ আপনার দিকে টানিয়া লয়েন।

এই ভক্তি সাধন করিতে করিতে যদি ভোগেচ্ছা জাগরুক হয় বা মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে "যোগভ্রষ্টের কি গতি হয়" এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন—

"পার্থ, নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে
নহি কল্যাণ কৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥"

শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন "পার্থ, কি এই লোকে, কি পরলোকেও তাদৃশ লোকের বিনাশ নাই। শুভানুষ্ঠানকারী কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হ'ন্ না। অচিরাৎ যোগ হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীগণের স্থান সকল প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল স্থানে বহু বৎসর বাসের পর পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে পবিত্র ধনবন্ত ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিঘ্নবশতঃ সাধন বিষয়ে যত্ন রহিত হইলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশে আকৃষ্ট হয়েন। কোন নীচ যোনিতে আর তাঁহার জন্ম হয় না। কারণ ভক্তির কখন হ্রাস নাই। স্বল্প পরিমাণ ভক্তি হৃদয়ে জাগরুক হইলেই, ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমেই সেই ভক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

কিন্তু আমরা সে পথে যাই না। যেখানে যেখানে যাইলে অবিচ্ছেদ সুখ, শান্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া রোগীর ন্যায় কুপথের সেবা করি ও অবশেষে এই ভবব্যাধিতে চিকিৎসার অভাবে অশেষবিধ যন্ত্রণার পর মৃত্যু হয় ও বার বার এই কর্ম্মক্ষেত্রে আপন পূর্ব্বসংস্কার বশে সুখ দুঃখ ভোগে রত থাকি।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"অনন্যোশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নি আভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

যাঁহারা অনন্তচিত্ত হইয়া বিশেষরূপে আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যরত সেই সকল ভক্তগণের ভার আমি বহন করি।

ইহাপেক্ষা আশাপ্রদ বাক্য আর কি

হইতে পারে? সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়া, সকল বাসনা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া আনন্দময়ের প্রতি সর্ব্বভারার্পণ করিলে তিনিই ভক্তের সব কার্য্য করিয়া দেন।

মহারাজ বলী আত্মনিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান তাঁহার দ্বারে চিরকালের মত দ্বারী হইয়া রহিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র রণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যলাভ মানসে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুর্যোধন মদান্ধ, নারায়ণী সেনা লইয়াই তুষ্ট হইল কিন্তু অর্জ্জুন ভগবান বাসুদেব কি পদার্থ বিলক্ষণ জানিতেন, তাই নারায়ণতুল্য তেজোশালী নারায়ণী সেনা উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভগবানেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এবং কুরুক্ষেত্র রণে জয়শ্রীকে আপন করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ সস্ত্রীক ভগবানের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া অবলীলাক্রমে কুরুক্ষেত্র সমররূপ মহাসাগর পার হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের প্রথমেই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীপাদ শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "প্রভু, আপনি সোম ও সূর্য্য বংশের বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু যাঁহার শ্রীচরণরূপ "প্লব" তরণী সাহায্যে আমার পূজ্যপাদ পিতামহগণ কুরুক্ষেত্র রণরূপ মহাসাগর পার হইয়াছিলেন, আপনি সেই উত্তম শ্লোক ভগবান বাসুদেবের লীলা বর্ণন করুন।"

এই পথ! আপন কর্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া ভগবানে নির্ভর! পরমহংসদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন "ভগবানকে বকল্‌মা দেওয়া!" সব ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে, সংসারে আর উদ্বিগ্নতা থাকে না। এ সংসার তাঁহার, এই স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি দিয়া সাজান ঘর তাঁহার, আমি মাত্র তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারী। এই ধারণা করিয়া মানব যদি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে সে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ! সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।" কি দুঃখ, কি সুখ উভয়েই নির্লিপ্ত হইয়া, সুখ দুঃখ সমজ্ঞানে সে সংসার করিতে পারে।

মায়া মোহান্ধকারে নিমজ্জিত জ্ঞান-চক্ষুহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব ইহা বুঝিতে পারে না, তাই "আমি কর্ত্তা, আমার সব" এই মনে করিয়া স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরার্থে কষ্ট পায়। প্রভুর সংসারে ভৃত্য কর্ত্তৃত্ব করিতে চাইলে যেরূপ পদে পদে লাঞ্ছিত হয়, সেইরূপ আমরা পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও ভুলিয়া যাই। তাই এত কষ্ট, এত উদ্বেগ, এত মনোবেদনা! সব ভুলিয়া, সরল প্রাণে মনে মুখে এক করিয়া একবার বল দেখি "ঠাকুর, এ সংসারে যাহা কিছু সম্ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছ, এ সকলি তোমার। আমি তোমার আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী. আমি রথ তুমি সারথী, যেমন—বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন করাও তেমনি করি। আর কিছু চাহিনা দেব, যেন এই নির্ভরতা করিতে পারি, যেন এই আত্মনিবেদনে প্রাণের অশান্তি ও উদ্বেগ বিদূরিত করিয়া যেমন শান্তি উপভোগে প্রতপ্ত প্রাণ শীতল করিতে পারি।" দেখিবে সব কার্য্য সুসার হইবে। তোমার কিসে ভাল হইবে, তোমাপেক্ষা তোমার পিতামাতা তাহা ভাল জানেন। তুমি স্ব-শক্তিতে কার্য্য করিতে যাইলেই বিফল হইবে। কারণ তোমার শক্তি কতটুকু! আর তাঁহার উপর নির্ভর করিলে, তাঁহাকে ভার দিলে, তাঁহাকে "বকল্‌ম" দিলে সব কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন পথ নাই। ইহাতেই আনন্দ, সুখ, শান্তি সকলি। তাই বলি ভাই একবার বল দেখি

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

মফঃস্বলের বাণী

কাটোয়া মুমূর্ষু আশ্রম ও তৎসংলগ্ন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা

সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি॥

এই শাস্ত্র-বচন হিন্দু-সন্তানগণের প্রত্যেক অস্থিমজ্জায়, প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুতে বিমিশ্রিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যখন এই নশ্বর জগতের সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন হিন্দু-সন্তানের আকাঙ্ক্ষার আর কিছু-মাত্র থাকে না, কেবলমাত্র পুণ্যতোয়া গঙ্গা দর্শন ও তাঁহার পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" স্মরণ পূর্ব্বক অনন্ত ব্রহ্মে লীন হইবার বলবতী ইচ্ছা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাঁহাদের চিত্তে প্রবাহিত হইয়া থাকে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-দেবীর মহিমায় এবং শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ স্থান বলিয়া প্রাচীন কাটোয়া নগরী হিন্দুগণের একটী পুণ্য তীর্থ। জীবনের অন্তিমকালের শেষ দুইটি দিনও এই স্থানের গঙ্গা-পুলিনে বাস করিতে এবং গঙ্গা-সীকরবাহী পবিত্র সমীরণে রোগ-যাতনা-ক্লিষ্ট শরীর স্নিগ্ধ করিতে অনেকেরই ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে; কিন্তু এ অঞ্চলের হিন্দুসন্তান-গণের এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পক্ষে বিলক্ষণ অন্তরায় বিদ্যমান রহিয়াছে। কাটোয়ার গঙ্গা পুলিনে এমন স্থান বা আশ্রয় নাই, যেখানে মুমূর্ষুগণ আনীত হইয়া দুইটি দিনও অবস্থিতি করিতে পারেন। অনেকে পিতা মাতার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়া আশ্রয় ও লোকাভাবে এবং তৎ-কালোপযোগী সাহায্যাভাবে অত্যধিক কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। শববাহকগণও গুরুতর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের জন্য স্থান প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় কষ্টভোগ করিয়া থাকেন।

এই কাটোয়া নগরীতে গঙ্গাপূজা, কার্ত্তিক সংক্রান্তি, দোল, ঝুলন প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে এবং স্থানটি বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া নানাবিধ দ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয়ার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, ভিন্ন স্থানের লোক এখানে আসিয়া পীড়িত হইয়া আশ্রয়াভাবে বিনা চিকিৎসায়, বিনা সুশ্রূষায় প্রাণ হারাইয়াছেন। করাল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহায়শূন্য, আশ্রয়শূন্য অবস্থায় যখন তাঁহারা রোগ যাতনা ভোগ করেন, তখন সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। ইতিপূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও দুইটি শিশু পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন জন্য এখানে আগমন করেন। এখানে আসার পর তাঁহার শিশু পুত্র কন্যা দুইটী ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়। যে গৃহে তিনি বাসা লইয়াছিলেন, শিশু দুইটী রোগাক্রান্ত হওয়ার পর গৃহস্বামী সেখান হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। একটী জঘন্য গৃহে তিনি আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশু দুইটী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রাণ পুতলী দুইটিকে হারাইয়া কিরূপ দুঃখে পতিত হইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সহায়-শূন্য ও আশ্রয়শূন্য ব্রাহ্মণটি যদি ভাল আশ্রয় পাইতেন, শিশুদের সুশ্রূষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদের অঞ্চলের নিধি দুটীকে হারাইতে হইত না। গোয়ালপাড়া মহল্লায় আরও একটী লোক ঐরূপ ভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া বিনা আশ্রয়ে, বিনা সুশ্রূষায় পথি-পার্শ্বে মারা গিয়াছে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। নিত্যই চক্ষুর সম্মুখে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই অভাব দূর করিবার জন্য কাটোয়াতে একটি মুমূর্ষু আশ্রম ও তৎসংলগ্ন একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আশ্রমে মুমূর্ষুগণ ও বিপন্ন পীড়িত ব্যক্তিগণ স্থান পাইবেন এবং বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবেন। এই সকল আগন্তুক লোকদিগের পরিচর্য্যা জন্য আশ্রমে পরিচারক নিযুক্ত থাকিবে। সেবা-

শ্রমে রোগীর পথ্য এবং উপযুক্ত ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রামিকে আশ্রমস্থিত রোগীর চিকিৎসা করিবেন। বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক উভয় আশ্রমস্থিত লোকের পরিচর্য্যায় ব্রতী থাকিবেন।

এই সদনুষ্ঠান যাহাতে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। স্থানীয় বহু ভদ্র ব্যক্তি এ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। মুমূর্ষু ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে অনূ্যন ২০।২২ হাজার টাকার প্রয়োজন। জনসাধারণের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই শুভ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করা হইয়াছে। আমাদের দেশে হৃদয়বান্ ব্যক্তির অভাব নাই। মুমূর্ষুগণের শেষ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এবং বিপন্ন পীড়িতের সেবা সুশ্রূষার সুবিধা করিবার জন্য সকলে এ কার্য্যে সহায় হউন, মুক্তহস্তে দান করিয়া এই শুভানুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করুন.—ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া কাটোয়ায় একটী আশ্রম-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সাধু-সংকল্পে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া স্থানীয় "প্রসূন" পত্রে স্বীকৃত হইবে। সাহায্যের টাকা সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিতব্য।

এতদুদ্দেশ্য সাধনার্থ বিগত ৬ই বৈশাখ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সভাস্থলে ভদ্র সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলে সকলেই এইরূপ একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অত্রত্য স্বর্গগত সবরেজিষ্ট্রার বাবু ভগবতিচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী মহোদয়া দেড় হাজার টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে একশত টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ ব্যয়ে এক একটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। ইহা দ্বারা পল্লীর অধিবাসিগণ অধিকতর উপকৃত হইবেন। সকল স্থানের অধিবাসিগণই এ কার্য্যে সহায় হইলে এই শুভ অনুষ্ঠান সত্বরে সুসিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

প্রসূন।

২। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার

অধুনা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে কেবলমাত্র পুরুষদিগকে শিক্ষিত করিলেই চলিবে না, স্ত্রীলোকদিগকেও রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে জাতীয় গঠন কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই অর্পিত রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি ও চরিত্রের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পতিপ্রাণা, বীরা, শিক্ষিতা রাজপুত রমণীর হস্তেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজপুত জাতি গঠিত হইয়াছিল। রাজপুত রমণী স্বহস্তে পতি-পুত্রকে বীর সাজে সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেন, তাই একদিন রাজপুত বীরের নামে ভারতবর্ষ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাই একদিন সে জাতি উন্নতির উচ্চশিরে আরোহণ করিয়াছিল। বিদেশীয়েরা বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষে স্ত্রী জাতি কোন দিনই মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি যে একমাত্র ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতি প্রকৃত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের দেবীপূজা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতবাসী ধারণাতীত-কাল হইতে শক্তি মাত্রকেই রমণী-রূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। স্ত্রীজাতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকিলে শক্তি মাত্রই কখনও স্ত্রীরূপে কল্পিত হইত না।

এজাতির পতন হইল কেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে এজাতির স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যে পতন হইয়াছে তাহা আর স্বীকার না করিয়া উপায়

নাই। এই পতনের জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমভাবে দায়ী ; তবে পার্থক্য এই যে পুরুষেরা প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী, স্ত্রীলোকেরা পরোক্ষ ভাবে ; আবার একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে স্ত্রীজাতির পতনের কারণও আমরা। কিন্তু যাহা ছিল, যাহা গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা বৃথা ; এখন সময় বুঝিয়া, কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করাই উচিত। এখন ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ভারতবাসী আবার পূর্ব্ব জাতীয়তা লাভে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, এখন এই উদ্দীপনার কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়কে সমভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষার পূর্ণ বিস্তার ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। এই শিক্ষার ফলে ভারতীয় মহিলা সম্প্রদায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাই আলোচ্য।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার মহিলা বিদ্যালয় ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ১২৪৪০ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৬০৭৩ দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৯২ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে বিদ্যার্থিনী বালিকার সংখ্যা ৩৩৯০৩১ হইতে ৪৪৫৪৭০ হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে উক্তসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৭৪৫২৪৬ এবং ১৯১২ সালে ৯৫২৯১১ হইয়াছিল। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯০৭ সালে ৪৩ ছিল, ছাত্রীর সংখ্যা ৪৯৪৫। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৬ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৯০৪৫। প্রতি মাইলে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা ৭ হইতে ১০ হইয়াছিল। যে দিক দিয়াই দেখিনা কেন, স্ত্রী শিক্ষা ভারতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

তবে মহিলারা যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা প্রকৃত শিক্ষা কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই শিক্ষা বিস্তারে আশানুরূপ সুফল লাভ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাংশ বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে কেবলমাত্র পুঁথি পড়ান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল পুঁথি পড়িতে শিখিলেই শিক্ষিতা বলা যাইতে পারে না, পুঁথি পাঠে ক্ষমতা জন্মিলে নাটক নভেল পড়িয়া সময় কাটাইবার সুবিধা হয় বটে কিন্তু তাহা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয় না, জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। এই সকল বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। ভারতের লুপ্ত শিল্প বিদ্যা ফিরাইয়া আনিতে হইলে স্ত্রী-জাতিকে প্রধান সহায় রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। মহিলাদিগকে শিল্পবিদ্যা-শিক্ষা দিয়া গৃহে গৃহে শিল্পজাত দ্রব্য-উৎপন্ন করিতে পারিলে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠা সম্ভবপর, নতুবা দুই চারিটা কল কারখানায় তাহা হইবে না।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

৩। আমাদের স্বাস্থ্য

বৈদেশিক অনুকরণে, দারিদ্র্যের কশাঘাতে ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উদাসীন জীবন যাপনে আমরা ক্রমশঃ শক্তিহীন স্বাস্থ্যহীন চিররোগী জীববিশেষে পরিণত হইতেছি। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া নানাপ্রকার মারাত্মক রোগ-বীজাণু আমাদের দেহ আক্রমণ করিতেছে। আমাদের দুর্ব্বল দেহ সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। ফলে, একদিকে কলেরা প্রভৃতি জনপদধ্বংসকারী প্রচণ্ড সংক্রামক রোগ, অন্যদিকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সুদীর্ঘ যন্ত্রণাপ্রদ ও পরিণামে অন্তঃসারশোধক রোগ, আমাদিগকে বেশ কাবু করিয়া বসিতেছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের এই শারীরিক দুর্দ্দশার দিকে আজকাল দেশের সুধী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সহৃদয় ভারত গবর্ণমেণ্টও নানা প্রকারে লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসর সেনিটারী কন্‌ফারেন্সে ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত চিকিৎসক মণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট এ দেশের স্বাস্থ্য সংস্কারের অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের জন সাধারণেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে।

আমরাও চেষ্টা করিলে গ্রাম সমূহ হইতে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সম্পূর্ণ রূপে না হউক অন্ততঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করিতে বা উপস্থিত ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিবে কে? আমাদের তো সে বিষয়ে চৈতন্য নাই! আমরা এমনই অপদার্থ যে আমাদের নিজের অভাবই নিজে বুঝি না। অথবা, বুঝিলেও তাহার প্রতীকারের জন্য কিছুই করি না। গ্রামে বাস করিয়া আমরা দলাদলি নিয়া ব্যস্ত—স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আমাদের সময় নাই বা প্রবৃত্তি নাই। গ্রামে দূষিত গ্যাসের আধার স্বরূপ বহুকালের পুরাণ পুকুর আছে। থাকে থাকুক্। উহা ভরাট না হইলে আমার কি? অনেকেরই এই ভাব। কিন্তু ক্রমে এই পুষ্করিণী হইতে যে রোগের বীজাণু গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িবে এবং অন্য দশজনের সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিবে, সে বিষয় ধারণাই আসে না। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে পুষ্করিণী বা ইন্দারা খনন করাইবার অনুমতি কিংবা সাহায্য লাভের জন্য যদি কেহ চেষ্টা করে তবে আমরা গ্রামের অপর দশজনে যৎপরোনাস্তি বাধা দিয়া থাকি। উহাতে যে আমাদের দশজনেরই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ঘুচিবে তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। আমাদের কার্য্যই দলাদলী করা, পরনিন্দা করা, পরের অনিষ্ট সাধন করা। আমরা আপনাদের লাভ লোকসান খতাইয়াও দেখি না—অন্যের একটা অহিত সাধন করিতে পারিলেই আমরা পরম কৃতার্থ! তাহাতে আমাদের ক্ষতিই হউক আর লাভই হউক। এই প্রকার আচরণের ফলও আমরা হাতে হাতেই পাই—বেশী দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। বৎসরের বার মাসই যমরাজ আমাদিগকে অযাচিত কৃপা করিয়া থাকেন। কখন কলেরারূপে কখন বসন্তরূপে আবার কখন বা ম্যালেরিয়া আমাশয় ইত্যাদি নানারূপে তাঁহার আগমন। তাঁহার কৃপায় দেশ যে ক্রমে শূন্য হইতে চলিল। এখনও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? এখনও কি পরমুখাপেক্ষীতা ত্যাগ করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিব না? এখনও কি ব্যক্তিগত হিংসা দ্বেষ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবে না? এখনও কি তুচ্ছ দলাদলি ভুলিয়া আমরা সকলে সমবেত হইয়া পল্লী গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে অগ্রসর হইব না?

প্রান্তবাসী।

৪। ধূমপানের অপকারিতা

বহুকাল পূর্ব্বে এদেশে তামাকের ব্যবহার ছিল না। মুসলমানদিগের আমল হইতে আরম্ভ হইয়া, এক্ষণে চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেও অবাধে ইহার ব্যবহার করিতেছে। ইহার এত বাড়াবাড়ী হইয়াছে—যেন নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মত হইয়াছে। সামাজিক অভ্যর্থনায় প্রধান উপকরণ হইয়াছে যে অবস্থারই লোক যেখানেই যান না কেন, অগ্রে তামাক দিয়া অভ্যর্থনা করিতে হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, যে তামাক সেবনে আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইহার ব্যবহার যতই উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

আজকাল পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে দেশের শিক্ষিত সকলেই প্রায় "সিগারেটের" ধূমপান করিয়া থাকেন—তামাক সাজিয়া, আগুন ধরাইয়া, ধূমপান করিতে কিছু সময় যায়—কিন্তু "সিগারেটে" তাহা হয় না, ইচ্ছা হইলেই মিনিটে মিনিটে ধূমপান করা যায়। অজাতশ্মশ্রু, সুকুমার বালক হইতে বৃদ্ধদেরও পথে, ঘাটে, মাঠে "সিগারেটের" ধূম উড়াইতে দেখা যায়।

তামাকের ধূমপান করিতে হইলে, হুঁকা বা গুড়গুড়িতে জল দিয়া টানিতে হয়, তাহাতে তামাকের ধূম জলে সিক্ত হইয়া, পরে মুখে প্রবিষ্ট হওয়ার দরুণ, উহার উগ্রতা অনেকটা কম হয়। কিন্তু "সিগারেট" টানিবার সময়, উহার তীব্র ধূম মুখের ভিতর

দিয়া একেবারে ফুসফুসে লাগে, মধ্যবর্ত্তী কোন সামগ্রী না থাকায়, ফুসফুসে তীব্র ধূমের উগ্র ক্রিয়া দর্শে। "সিগারেট" সেবনে দেহের লাবণ্য নষ্ট হয়, মুখশ্রী পাকাটে হইয়া যায়, দেহের বৃদ্ধি পায় না, সর্ব্ব শেষে নানাপ্রকার কাশরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। সুতরাং ইহা যে তামাক অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক ধূমপানেও বর্ণের উজ্জলতা নষ্ট হয়; শিরোঘূর্ণন, স্মৃতি-শক্তির বৈলক্ষণ, পেশীস্পন্দন, বুক ধড়ফড়ানি, ও চক্ষুরোগ হইয়া থাকে। ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে নানা লোকের নানা প্রকার মত হইলেও, সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে "তামাক বা সিগারেটের" ধূমে দৃষ্টিশক্তি বিধায়ক স্নায়ুতে "এট্রপি" হইয়া দৃষ্টিশক্তির হানি হয়, ওষ্ঠে ক্যান্সার পর্য্যন্ত হয়। সর্দ্দি কাশি নিত্য সহচর হয়। দাঁতগুলি শীঘ্র ক্ষরিয়া যায়—কিন্তু দেশের লোকের ধারণা অন্যরূপ। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে "তামাক চুরোট ও সিগারেট" সেবনে দাঁত শক্ত হয়—তাঁহাদের ভুল।

অধিক পরিমাণে ধূমপানের সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়ার এতই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, যে আজ কালিকার ডাক্তারেরা ঐ পীড়াকে Tobacco Heart বলিয়া থাকেন। সকল রকম মাদক দ্রব্যেরই উত্তেজনা ও অবসাদ-জনকতা এই দুইটী গুণ আছে, কিন্তু "তামাক ও সিগারেটের" উত্তেজনা গুণ অধিক থাকায়, নিদ্রার বিঘ্ন হয়, এবং তাহা হইতেই অনিদ্রা উৎপন্ন হয়—মধ্যে মধ্যে স্নায়ুশূল বেদনা, স্কন্ধে, পৃষ্ঠে, কখনও বা বক্ষের বামভাগে, হৃদপিণ্ডের উপর হইয়া থাকে।

এই ধূমপান হইতে আর একটি সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়—উচ্ছিষ্ট দোষ। পূর্ব্বে প্রথা ছিল, সকলেরই বাড়ীতে আলাদা আলাদা হুঁকা বা গুড়গুড়ি থাকিত। তাঁহারা নিজ নিজ হুঁকা, বা গুড়গুড়িতে অপরকে ধূমপান করিতে দিতেন না। অধুনা দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্ব প্রথাটী লোপ পাইতেছে। হুঁকার মুখে বা গুড়গুড়ির নলের মুখে, এক ব্যক্তি ধূমপান করিয়া ছাড়িয়া দিতে না দিতে, অন্য ব্যক্তি আগ্রহের সহিত সেই পরমুখের লালার উপর মুখ দিয়া, আয়াস মিটাইয়া থাকেন।

বালক ও যুবকেরা একটী সিগারেট লইয়া ৩।৪ জনে মিলিয়া খাইয়া থাকে। এই রোগ-প্রবণ কালে এতদ্দারা অন্যের রোগ সংক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই কুপ্রথার নিবারণ হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যদি কোন ধূমপায়ী লোক পূর্ব্ব বর্ণিত লক্ষণগুলির একটী মাত্র লক্ষণও অনুভব করেন, তাহা হইলে তিনি কিছু দিন ধূমপান বন্ধ করিবেন। এই সকল উপসর্গ প্রকৃতপক্ষে ধূমপানের ফল কি না তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন। ধূমপান একেবারে পরিত্যাগ করিতে না পাইলে, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কমাইয়া লইবেন। আর সিগারেট —বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

পল্লীবার্ত্তা।

পরিশিষ্ট

কেন্দ্র কোণোপচয়েষু দ্বয়ো মৈত্রী। ২০।
রিপু রোগ চিন্তাসু বৈরং ॥২১॥

লগ্নপদাৎ সপ্তমপদে কেন্দ্র কোণোপচয়েষু ষষ্ঠস্থান ব্যতিরিক্তেষ্বিতি পর সূত্রবিরোধাৎ স্থিতে সতি দ্বয়োঃ ভার্য্যাভর্ত্রো মৈত্রী ভবতি। তথৈব রিপু (১২) রোগ (৮) চিন্তাসু (৬) ষষ্ঠাষ্টম দ্বাদশগে সতি পত্ন্যা সহ জাতস্য বৈরং ভবতি। এবং ক্রমেণ লগ্নপদাৎ পুত্রাদি ভাবপদে কেন্দ্রাদি স্থানগে সতি তয়োস্তয়ো মৈত্রী, দুস্থানগে তথৈব বৈরতা চ জ্ঞেয়া ॥ ২০।২১ ॥

পদাচ্চ সপ্তমারূঢ়ে　　কেন্দ্র কোণ চয় স্থিতে।
সুবীর্য্যসংস্থিতে খেটে　　ভার্য্যাভর্ত্তৃ সুখপ্রদঃ॥
এবং লগ্নপদাদ্‌ বিপ্র　　পুত্র ভাবাদি চিন্তয়েৎ ॥

সপ্তমারূঢ় পদ লগ্ন পদের কেন্দ্র কোণ কিম্বা (ষষ্ঠব্যতিরিক্ত) উপচয় স্থান গত হইলে দম্পতীর মধ্যে বিশেষ মৈত্রী এবং দুঃস্থান গত হইলে বৈরতা সংঘটিত হয়। উক্ত প্রকারে পুত্রাদিরও সহিত জাতকের মিত্রামিত্রাদি চিন্তা করিবে। যথা পুত্র ভাব পদ লগ্নপদের কেন্দ্রাদি গত হইলে, পুত্রসহ, ভ্রাতৃ ভাব পদ কেন্দ্রাদিস্থ হইলে ভ্রাতৃ সহ জাতকের মিত্রতা ঘটে এবং তদ্রূপ দুঃস্থান গত হইলে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা সংঘটিত হয়। এই অষ্টাদশাদি সূত্র চতুষ্টয় সম্বন্ধে বৃদ্ধ কারিকায় লিখিত আছে যে—

লগ্নারূঢ়ং দারপদং　　মিথঃ কেন্দ্র গতং যদি।
ত্রিলাভে বা ত্রিকোণে বা　　তথা রাজাঽন্যথাঽধমঃ ॥
আরূঢ়ৌ পুত্র পিত্রোস্তু　　ত্রিলাভ কেন্দ্রগৌ যদি।
দ্বয়ো মৈত্রী ত্রিকোণেতু　　সাম্যং দ্বেষ্যোঽন্যথা ভবেৎ ॥
এবং দারাদি ভাবানা　　মপি পত্যাদি মিত্রতা।
জাতক দ্বয় মালোক্য　　চিন্তনীয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥

এতন্মতানুসারে দেখা যাইতেছে যে আরূঢ় পদদ্বয় পরস্পর ত্রিলাভস্থ বা কেন্দ্র গত হইলে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা, কোণগত হইলে সমতা এবং তদ্ভিন্ন স্থান গত হইলেই শত্রুতা সংঘটিত হয় ॥ ২০।২১ ॥

পত্নী লাভয়োর্দিষ্ট্যা নিরাভাসার্গলয়া। ২২।

পত্নী (০১=১) লগ্নপদ লাভয়োঃ (৪৩=৭) জায়া পদয়োঃ নিরাভাসা র্গলয়া বাধক রহিতার্গলয়া জাতকো দিষ্ট্যা ভাগ্যবান্ ভবতি॥ ২২

তনু পদ এবং জায়াপদ বাধক বিবর্জ্জিত অর্গলা সংযুক্ত থাকিলে মনুষ্য (দিষ্ট্যা) ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। এস্থলে তনু কিম্বা জায়া পদ অর্গলা সমন্বিত হইলে স্বল্প ফল এবং উভয়ত্র অর্গলার সংযোগ থাকিলে পূর্ণফল জ্ঞাতব্য। যেমন মেষলগ্নে মঙ্গল মিথুনে থাকায় সিংহ-রাশি তনু পদ। দ্বাদশে গ্রহ বর্জ্জিত তনুপদ দ্রষ্টা তুলাস্থ শনির দ্বিতীয় স্থানস্থ বুধ, তনু পদের অর্গলা কারক হইয়াছে। পুনশ্চ জায়াভাব তুলা রাশির পঞ্চমে তদধিপতি শুক্রের অবস্থিতি নিবন্ধন মিথুন রাশি জায়াপদ, এবং দশমে গ্রহ বর্জ্জিত জায়াপদ দ্রষ্টা ধনু রাশিস্থ রবির চতুর্থস্থ, মীনরাশি গত বৃহস্পতি, জায়াপদের অর্গলা কারক। এখানে লগ্নপদ এবং জায়াপদ উভয়ই শুভার্গলা সংযুক্ত হওয়ায় দিষ্ট্যা ভাগ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। দিষ্ট্যা ভাগ্য সম্বন্ধে পারাশরী গ্রন্থে লিখিত আছে—

ধন ধান্য পুত্র পশু দারা বন্ধু কুলৈর্যুতঃ।
শরীরারোগ্য মৈশ্বর্য্য ভৃত্য বাহন সংযুতঃ।
হরভক্ত সুধর্ম্মজ্ঞো দিষ্ট্যা ভাগ্যস্য লক্ষণং॥

জ্যোতির্ব্বিদ নীলকণ্ঠ স্বকৃত টীকায় উক্ত সূত্রের "লগ্ন পদ তৎ সপ্তময়োঃ" ইত্যাদি রূপ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ মূলে পত্নী (লগ্ন) এবং লাভ (জায়া) এই দুইটী শব্দ আছে মাত্র। বর্ত্তমান অধ্যায়ে লগ্নাদি আরূঢ় স্থান হইতে ফল বিচার হইতেছে বলিয়া পত্নী শব্দে লগ্নারূঢ় পদ বিবেচ্য কিন্তু লাভ শব্দে জায়াপদ ভিন্ন উক্ত লগ্নারূঢ় পদের সপ্তম স্থান বিবেচনা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

এই স্থান সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উক্ত আছে যে—

যস্য পাপঃ শুভো বাপি গ্রহস্তিষ্ঠেৎ শুভার্গলে।
তেন দ্রষ্ট্রেক্ষিতং লগ্নং প্রাবল্যায়োপকল্পতে॥
যদি পশ্যেদ্ গ্রহ স্তম্ন বিপরীতার্গল স্থিতঃ।
প্রথমাং তু বিজানীয়াদ্ বিপরীতার্গলাং দ্বিজ॥

কোন ভাব বা গ্রহদ্রষ্টা গ্রহের শুভার্গলে অর্থাৎ চতুর্থ দ্বিতীয় বা একাদশ স্থানে কোন গ্রহ থাকিয়া অর্গলাকারক হইলে যদি উক্ত দ্রষ্টা গ্রহের পুনরপি লগ্নেও দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে উক্ত ভাব বা গ্রহোত্থ ফলের প্রাবল্য কল্পনেয়। কিন্তু লগ্নোপরি উক্ত দ্রষ্টা গ্রহের বিপরীতার্গলস্থিত কোন গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে তদুপরি উক্ত দ্রষ্টা গ্রহের দৃষ্টি কোন কার্য্যকরী হয় না। এ স্থলে বলা বাহুল্য মাত্র যে দ্রষ্টা গ্রহের দশম স্থান স্থিত চরাদি এক রাশি গত গ্রহ ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ দ্রষ্টা সহ লগ্নকে দৃষ্টি করিতে পারে না। সূত্রে অর্গলা সংজ্ঞায় দারভাগ্য এবং রিপফ নীচ বলিয়া প্রথমেই চতুর্থ ও দশম স্থানের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "প্রথমাংতু বিজানীয়াৎ" বলিয়া তৎ তৎ স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেহ কেহ লগ্নোপরি অর্গলা কারক গ্রহের দৃষ্টি অর্থ করেন কিন্তু দ্রষ্টা শব্দে অর্গলা কারক গ্রহকে লক্ষ্য করা অনুচিত ॥ ২২ ॥

শুভার্গলে ধন সমৃদ্ধিঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র তনুপদ জায়াপদয়োঃ শুভার্গলে শুভগ্রহ কৃতার্গলে ধনসমৃদ্ধিঃ ধনবৃদ্ধিঃ স্যাৎ। পাপগ্রহ কৃতার্গলে ধনবত্বমাত্র মভিহিত মিত্যবগম্যতে। অতঃ শুভপাপগ্রহ কৃতার্গলে কদাচিৎ ধনবৃদ্ধিঃ কদাচিৎ ধনবত্ব মাত্রং সূচিতং। তথাচ পারাশরায়ে—

শুভগ্রহার্গলে বিপ্র বহু দ্রব্য প্রদায়কঃ।
পাপেন স্বল্প বিত্তঃ স্যা ন্নির্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম॥
উভার্গলা ভবেৎ তত্র কদাচিৎ ধনবান্ ভবেৎ।
কদাচিদ্ বিত্ত চিন্তার্ত্তি জায়তে দ্বিজ সত্তম॥

তনুপদ এবং জায়াপদ উভয় স্থানেই শুভগ্রহ কৃত অর্গলা সংযুক্ত হইলে ধন সমৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ব সূত্রে শুভ বা পাপ, যে কোন গ্রহ কর্ত্তৃক উক্ত স্থান দ্বয় অর্গলা সংযুক্ত হইলে ভাগ্যবত্তা যোগ উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু এস্থলে কেবল শুভগ্রহ কৃত অর্গলা হইতেই ধন সমৃদ্ধি যোগ বলা হইল। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে শুভগ্রহে যে পরিমাণ ধন সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, পাপ গ্রহে ততদূর হয় না, এবং শুভগ্রহে যে রূপ নিয়তই ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে পাপ গ্রহে সে রূপ ঘটে না। মিশ্র গ্রহে মিশ্র ফল জ্ঞাতব্য। এই সূত্রে পদ সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইল ॥ ২৩ ॥

জন্ম কাল ঘটিকাস্বেকদৃষ্টাসু রাজানঃ ॥ ২৪ ॥

জন্ম লগ্নং প্রসিদ্ধং কাল লগ্নং হোরালগ্নং ঘটিকা ঘটিকালগ্নং এতেষু ত্রিস্বপি কেন চিদেকেনৈব গ্রহেণ দৃষ্টেষু রাজানো ভবন্তি।

এক্ষণে রাজযোগাদি আরম্ভ হইল। কুণ্ডলী মধ্যে জন্ম লগ্ন হোরালগ্ন এবং ঘটিকা লগ্ন এই তিন স্থানে একই গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে রাজযোগ চিন্তা করিবে। একই গ্রহ শব্দে জন্মলগ্নে যে গ্রহের দৃষ্টি থাকিবে অপর লগ্নদ্বয়ও সেই গ্রহ দ্বারা পরিদৃষ্ট হইবে ইহাই বিবেচ্য। পরাশর বলেন "জন্মাঙ্গে চাপি হোরাঙ্গে লিপ্তাঙ্গে খেচরেক্ষিতে। রব্যাদয় স্ত্রয় স্থানে রাজযোগ প্রদায়কা।" অর্থাৎ জন্মাদি তিনটি লগ্নই যদি কোন না কোন গ্রহ বীক্ষিত থাকে তাহা হইলে রাজযোগ জ্ঞাতব্য। তাহা হইলেও সূত্রোক্ত যোগ হইতে পারাশরী যোগ যে স্বল্প ফল প্রদ ইহা সহজেই অনুভব সিদ্ধ। ২৪।

এবমংশতো দৃকাণতশ্চ। ২৫ ॥

এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ অংশতো নবাংশ কুণ্ডল্যাং দৃকাণতশ্চ দৃকাণ কুণ্ডল্যামপি রাজযোগবিচারঃ কার্য্যঃ ॥ অতঃ ক্ষেত্রলগ্ন কাল ঘটিকাসু, দৃকাণ লগ্ন কাল ঘটিকাসু তথা নবাংশ লগ্ন কাল ঘটিকাসু চৈক দৃষ্টাসু রাজানো ভবন্তীতি রাজযোগ এয়ং সিধ্যতি। ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রে ক্ষেত্র কুণ্ডলী হইতে যে প্রকার রাজযোগ বিচার করা হইয়াছে, দৃকাণ কুণ্ডলী এবং নবাংশ কুণ্ডলী হইতেও তদ্রূপ বিচার্য্য। অর্থাৎ উক্ত লগ্নত্রয় যে যে রাশির দৃকাণে বা নবাংশে অবস্থিত তৎতৎ রাশি ত্রয় একগ্রহ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে রাজ যোগ জ্ঞাতব্য। অতএব ক্ষেত্রাদি কুণ্ডলী ত্রয়ে, জন্ম হোরা ও ঘটিকা লগ্নের প্রতি রব্যাদি কোন এক গ্রহের দৃষ্টি বশতঃ তিনটি রাজযোগ বর্ণিত হইল ॥ ২৫ ॥

পত্নী লাভয়োশ্চ রাশ্যংশক দৃকাণৈর্ব্বা ॥ ২৬

ক্ষেত্র বর্গে নবাংশে বা দৃকাণে ভানুজাদয়ঃ।
লগ্নং চ সপ্তমং বিপ্র পশ্যন্তি রাজযোগকৃৎ ॥

রাশ্যংশক দৃকাণৈর্বা রাশি (ক্ষেত্র) কুণ্ডল্যাং নবাংশ কুণ্ডল্যাং দৃকাণ কুণ্ডল্যাং বা পত্নীলাভয়োশ্চ লগ্ন সপ্তময়োশ্চ, যানি লগ্নানি যানি তৎসপ্তমানি চ তানি যদ্যেকগ্রহ দৃষ্টানি তদা পুর্ব্ব সূত্রান্বয়েন রাজানো ভবন্তি। এবং ষট্‌স্বপি দৃষ্টেসু পূর্ণযোগঃ ॥ ২৬ ॥

রাশি অর্থাৎ ক্ষেত্র কুণ্ডলী দৃকাণকুণ্ডলী এবং নবাংশ কুণ্ডলী এই তিন কুণ্ডলীতেই লগ্ন এবং সপ্তম স্থান একই গ্রহ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে। কুণ্ডলী ত্রয়ে ছয়টি স্থানই একগ্রহ দৃষ্ট হইলে পূর্ণ রাজ যোগ জ্ঞাতব্য ॥ ২৬ ॥

তেষ্বেকস্মিন্ ন্যূনে ন্যূনং ॥ ২৭ ॥

তেষু জন্মকাল ঘটিকাস্ত রাশ্যংশক দৃকাণাদিকেষু রাজযোগ চতুষ্টয়েঽপি একস্মিন্ ন্যূনে চৈকগ্রহ দৃষ্ট্যা ন্যূনেষু ন্যূনং রাজত্ব মিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্র ত্রয়ে লগ্নাদিতে একই গ্রহ দৃষ্টি জনিত যে কয়টি রাজযোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎতৎ যোগে এক গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট স্থানের ন্যূনাতিরেকে রাজ যোগের ও ন্যূনাতিরেক জ্ঞাতব্য। প্রথমোক্ত যোগে কুণ্ডলী ভেদে তিনটি করিয়া নয়টি এবং দ্বিতীয় যোগে দুইটি করিয়া ছয়টি দৃশ্য স্থান আছে। একগ্রহ কর্ত্তৃক প্রতি যোগে যত অধিক স্থান পরিদৃষ্ট হইবে ততই যোগের প্রাবল্য বিনিশ্চিত। উক্ত যোগাদিতে পুনর্ব্বার দ্রষ্টা গ্রহের বলাবল এবং শুভাশুভত্ব বিচার করাও আবশ্যক। নীচগ্রহ পরিদৃষ্ট ভাবাদি কখনই উচ্চগ্রহ পরিলক্ষিত ভাবাদির সহ সম ফল দাতা হইতে পারে না। এতৎস্থল সম্বন্ধে বৃদ্ধ করিকায় লিখিত আছে—

বিলগ্ন ঘটিকা লগ্ন হোরা লগ্নানি পশ্যতি।
লগ্নং চ সপ্তমং বিপ্র পশ্যতি রাজযোগ কৃৎ ॥
পূর্ণ দৃষ্ট্যা পূর্ণ যোগো ন্যূনে ন্যূনং যথাক্রমং।
এবং নবাংশ কুণ্ডল্যাং দৃকাণেঽপি বিচিন্তয়েৎ ॥
লগ্ন সপ্তময়ো খেটো রাজযোগপ্রদায়কঃ।
উচ্চগ্রহে রাজযোগো লগ্নদ্বয় মথাপিবা ॥
রাশে দৃকাণতোঽংশাচ্চ রাশে রংশাদথাপিবা।
যদ্বা রাশি দৃকাণাভ্যাং লগ্নং দ্রষ্টা তু যোগদঃ।
জন্মকাল ঘটীলগ্ন একেনৈব নিরীক্ষিতে।
উচ্চারূঢ়ে তু সম্প্রাপ্তে চন্দ্রাকান্তে বিশেষতঃ
ক্রান্তে বা গুরু শুক্রাভ্যাং কেনাপ্যুচ্চগ্রহেণ বা।
দুষ্টার্গল গ্রহাভাবে রাজযোগো ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

শুক্র চন্দ্রয়ো র্মিথো দৃষ্টয়োঃ সিংহস্থয়ো র্বা যানবন্তঃ ॥ ২৮ ॥

শুক্র চন্দ্রয়োঃ যত্র তত্র স্থিতয়ো র্যদি মিথঃ পরস্পরং দৃষ্টয়োঃ দৃষ্টি ভাজোঽথবা সিংহস্থয়োঃ (সিংহ = ৭৮ = ৩) তৃতীয়স্থয়ো স্তহি জাতকো যানবন্তো ভবতি ॥ তদুক্তং বৃদ্ধৈঃ = চন্দ্রঃ কবিং কবিশ্চন্দ্রং পশ্যত্যপি তৃতীয়গে। শুক্রাচ্চন্দ্রে ততঃ শুক্রে তৃতীয়ে বাহনার্থবান্ ॥ ২৮ ॥

যত্র তত্রাবস্থিত চন্দ্র শুক্রের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি থাকিলে অথবা পরস্পর তৃতীয়ৈকাদশস্থ হইলে জাতক বাহনার্থবান্ হইবে। দেখা গিয়াছে জাতক শাস্ত্রোক্ত সাধারণ দৃষ্টিও এই সূত্রগ্রন্থে ফল বিচারে অনেক স্থলে অগ্রাহ্য নহে ॥২৮॥

শুক্র কুজ কেতুষু বৈতানিকাঃ ॥ ২৯ ॥

শুক্র কুজ কেতুষু যত্র কুত্রাবস্থিতেষু পরস্পারং দৃষ্টিমৎসু তৃতীয়স্থেষু বা বৈতানিকা বিতানাদি রাজ চিহ্ন ধারকা ভবন্তি ॥২৯॥

শুক্র মঙ্গল এবং কেতু এই গ্রহত্রয় যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া পরস্পরকে দৃষ্টি করিলে অথবা পরস্পর তৃতীয়স্থ অর্থাৎ এক এক রাশি অন্তরস্থ থাকিলে জাতক বিতানাদি রাজ চিহ্ন ধারণ করে॥ এ স্থলে জানা আবশ্যক রাশি দৃষ্টিতে কেতুগ্রহ চক্ষুহীন নহে ॥২৯॥

স্ব ভাগ্য দার মাতৃভাব সমেষু শুভেষু রাজানঃ ॥ ৩০ ॥

স্ব স্বাৎ আত্মকারকাৎ ভাগ্য (২) দ্বিতীয় দার (৪) চতুর্থ মাতৃ (৫) পঞ্চম এতেষু ভাবত্রয়েষু ভাব সমেষু ভাবস্ফুট তুল্যেষু শুভেষু শুভগ্রহেষু স্থিতেষু রাজানো ভবন্তি। এবং ত্তৎ কারকবশাৎ তেষামপি রাজ-যোগং কল্পনীয়ং। অথাৎ পুত্রাদি কারকাৎ দ্বিতীয়াদি স্থানত্রয়েষু ভাবসমেষু শুভেষু পুত্রাদীনামপি রাজযোগো বাচ্যঃ তথাচ পারাশরায়ে—কারকাৎ দ্বি চতুর্থে চ পঞ্চমে ভাবগো দ্বিজ। শুভ খেটো ন সন্দেহো রাজযোগং দদাতি চ ॥৩০॥

আত্ম কারক গ্রহ হইতে দ্বিতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে ভাবতুল্য অর্থাৎ তত্তৎ ভাবের স্ফুটাংশাদি তুল্য শুভগ্রহ থাকিলে জাতক রাজা হইয়া থাকে। এ স্থলে গ্রহ এবং ভাব উভয়ের স্ফুটাংশাদি সমান না হইলেও অন্ততঃ গ্রহগণের ভাবস্থিত বল ত্রিপাদাধিক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বর্ত্তমানে কোন টীকাকার তাঁহার সূত্রার্থ প্রকাশিকায় ভাব শব্দে অষ্টম স্থান ধরিয়া বড়ই ভ্রম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কেন যে পুনঃ, সম শব্দ হইতে নবম স্থানকে যোগ মধ্যে গণ্য করেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত পরাশরোক্ত শ্লোকে ৮ম বা ৯ম স্থানের উল্লেখ নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমান সূত্রে আত্মকারক গ্রহ হইতে যে প্রকারে রাজ যোগ বিচার করা হইয়াছে, পুত্র কারকাদি হইতেও তদ্রূপ বিচার কার্য্য। অর্থাৎ পুত্রাদি কারক গ্রহ হইতে দ্বিতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে ভাবসম শুভ গ্রহ থাকিলে তত্তৎ ব্যক্তির রাজ যোগ বক্তব্য ॥৩০॥

কর্ম্ম দাসায়োঃ পাপয়োশ্চ ॥ ৩১ ॥

কারকাৎ তৃতীয়ে ষষ্ঠে রাশ্যোরুভয় পাপযুক্ ।
রাজবংশোদ্ভবো বালো রাজা ভবতি নিশ্চিতং ॥

আত্মকারকাদিতি পূর্ব্ব সূত্রেণান্বয়ঃ কর্ম্ম (৫১=৩) দাসয়োঃ (৭৮=৬) তৃতীয় ষষ্ঠয়োঃ ভাবসময়োঃ পাপয়োশ্চ রাজানো ভবন্তি ॥৩১॥

আত্মকারক গ্রহ হইতে তৃতীয় এবং ষষ্ঠ স্থানে ভাব তুল্য পাপ গ্রহ থাকিলে (রাজ বংশোদ্ভব) ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। এখানেও পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ন্যায় পুত্রাদি কারক হইতেও এই যোগ বিচার্য্য। তদ্বৎ লগ্নাদি হইতেও উক্ত যোগাদি বিচার নিরর্থক নহে ॥৩১॥

পিতৃ লাভাধিপাচ্চেবং ॥ ৩২ ॥

লগ্নাধীশাৎ দ্যূননাথাৎ ধনে তুর্য্যে চ পঞ্চমে ।
শুভখেট যুতে বিপ্র রাজা চ ভবতি ধ্রুবং ।
তৃতীয়ে ষষ্ঠভে পাপে তদ্বদেব বিচিন্তয়েৎ

পিতৃলাভাধিপাচ্চ লগ্নাধিপাৎ সপ্তমাধিপাচ্চ এবং পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়বৎ বিচারঃ কার্য্যঃ। অর্থাৎ তত্তদধিপাৎ দ্বিতীয় চতুর্থ পঞ্চম ভাবেষু ভাব সমেষু শুভেষু তথা তৃতীয় ষষ্ঠ ভাবয়ো ভাবতুল্যয়োঃ পাপয়োশ্চ রাজানো ভবন্তীত্যর্থঃ। অত্র লগ্ন শব্দেন জন্মলগ্ন পদলগ্নস্যাপি গ্রহণমিতি ॥ ৩২

পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে কারক গ্রহ হইতে যেরূপে রাজযোগ বিচার করা হইয়াছে, লগ্নাধিপতি এবং সপ্তমাধিপতি হইতেও তদ্রূপ ফলবিচার কার্য্য। অর্থাৎ লগ্নাধিপতি কিম্বা জায়াপতি হইতে ধন সুখ এবং সুতস্থানে ভাবসম শুভগ্রহ তথা সহজ ও শত্রুভাবে পাপগ্রহ থাকিলে রাজযোগ চিন্তনীয়। এই স্থলে লগ্ন শব্দে পদ লগ্নও গ্রাহ্য ॥ ৩২ ॥

মিশ্রে সমাঃ ॥ ৩৩ ॥

উপরোক্ত যোগদ্বয়ে মিশ্রে শুভপাপ মিশ্রণে সমাঃ মধ্যবিধাভবন্তি। তথাচ পারাশরীয়ে—ন দরিদ্রো ভবেজ্জীবো ন রাজা জায়তে দ্বিজ। সমান কুলজং প্রাজ্ঞং প্রতিষ্ঠা গৌরবান্বিত মিতি ॥ ৩৩ ॥

উপরোক্ত যোগদ্বয়ে দ্বিতীয়াদি তৃতীয়াদি স্থানে শুভ এবং পাপ উভয় বিধ মিশ্রিত গ্রহ অবস্থিত থাকিলে মনুষ্যকে মধ্যবিধ গৃহস্থ বলিয়া জ্ঞান করিবে ॥ ৩৩

দরিদ্রা বিপরীতে॥ ৩৪॥

পূর্ব্বোক্ত যোগদ্বয়ে বিপরীতে শুভগ্রহ স্থানে পাপাঃ পাপগ্রহ স্থানে শুভাশ্চেৎ তদা দরিদ্রা ভবন্তি ॥ ৩৪

পূর্ব্বোক্ত যোগদ্বয়ে শুভ গ্রহ স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি স্থানত্রয়ে পাপগ্রহ এবং পাপগ্রহ স্থানে অর্থাৎ তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মনুষ্যকে দরিদ্র বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৪ ॥

মাতরি গুরৌ শুক্রে চন্দ্রে বা রাজকীয়াঃ॥ ৩৫॥

আত্মকারকাৎ লগ্নাধিপাৎ সপ্তমাধিপাদ্বা মাতরি পঞ্চম স্থানে গুরৌ শুক্রে চন্দ্রে বা গুর্ব্বদীনা মন্যতমে স্থিতে সতি রাজকীয়া রাজাধিকারিণো ভবন্তি ॥ ৫ ॥

আত্মকারক লগ্নাধিপতি কিম্বা সপ্তমাধিপতি হইতে পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি শুক্র কিম্বা চন্দ্রের অবস্থিতি দেখিলে জাতব্যক্তিকে কোন না কোন রাজকার্য্যের অধিকারী বলিয়া চিন্তা করিবে ॥ ৩৫ ॥

কর্ম্মণি দাসে বা পাপে সেনান্যঃ॥ ৩৬॥

আত্মকারকাৎ লগ্নেশা জ্জায়াপভের্ব্বা কর্ম্মণি তৃতীয়ে দাসে ষষ্ঠে বা পাপে পাপগ্রহে সতি সেনান্যঃ সেনাপতয়ো ভবন্তি ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত আত্মকারকাদি স্থানত্রয় হইতে তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানে কোন পাপগ্রহ থাকিলে মনুষ্য সেনাপতিত্ব লাভ করে ॥ ৩৬

স্বপিতৃভ্যাং কর্ম্মদাসস্থ দৃষ্ট্যা তদীশ দৃষ্ট্যা।
মাতৃনাথ দৃষ্ট্যাচ ধীমন্তঃ॥ ৩৭॥

স্বপিতৃভ্যাং আত্মকারকাৎ জন্মলগ্নাদ্বা কর্ম্ম দাসস্থ দৃষ্ট্যা তৃতীয় ষষ্ঠ স্থানস্থ গ্রহদৃষ্ট্যা কারকে লগ্নে চ ইত্যর্থঃ বা তদীশ দৃষ্ট্যা তৃতীয় পতি দৃষ্ট্যা ষষ্ঠেশ দৃষ্ট্যা বা তথা মাতৃনাথ দৃষ্ট্যা পঞ্চমেশ দৃষ্ট্যা কারক লগ্নয়োঃ ধীমন্তঃ নরা স্তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না ভবন্তি। পিতৃশব্দাৎ পদলগ্নমপ্যত্র গ্রাহ্যং ॥ ৩৭ ॥

আত্মকারক গ্রহ, জন্ম লগ্ন কিম্বা পদ লগ্ন এই স্থান হইতে তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানস্থ গ্রহ অথবা তত্তৎস্থান হইতে তৃতীয় ষষ্ঠ কিম্বা পঞ্চম স্থানপতি উক্ত আত্মকারকাদিকে দৃষ্টি করিলে জাতক বিচক্ষণ এবং তীব্র বুদ্ধি সম্পন্ন হয় ॥ এস্থলে পিতৃ শব্দে জন্মলগ্ন হইলেও পদ লগ্ন অগ্রাহ্য নহে ॥ বর্ত্তমান সূত্রে যোগ সংখ্যা সমুদায়ে পঞ্চদশ। যোগবাহুল্যে ফল বাহুল্যই বিচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

আরক্ততামেতি মুখং জিহ্বা বা শ্যামতাং যদা।
তদা প্রাজ্ঞো বিজানিয়ান্মৃত্যুমাসন্নমাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
উষ্ট্র-রাসভযানেন যঃ স্বপ্নে দক্ষিণং দিশম্।
প্রয়াতি তঞ্চ জানীয়াৎ সদ্যোমৃত্যুং ন সংশয় ॥ ২৭ ॥
পিধায় কর্ণৌ নির্ঘোষং ন শৃণোত্যাত্মসম্ভবম্।
নশ্যতে চক্ষুষোর্জ্যোতির্যস্য সোঽপি ন জীবতি ॥ ২৮ ॥
পততো যস্য বৈ গর্ত্তে স্বপ্নে দ্বারং পিধিয়তে।
ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শ্বভ্রাৎ তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ২৯ ॥

ঊর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা
রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্ত্তমানা।
মুখস্য চোষ্মা শিশিরা চ নাভিঃ
শংসন্তি পুংসামপরং শরীরম্ ॥ ৩০ ॥

স্বপ্নেঽগ্নিং প্রবিশেদ্যস্তু ন চ নিষ্ক্রমতে পুনঃ।
জলপ্রবেশাদপি বা তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ৩১ ॥
যশ্চাভিহন্যতে দুষ্টৈর্ভূতৈ রাত্রাবথো দিবা।
স মৃত্যুং সপ্তরাত্রান্তু নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩২ ॥

আরক্ত বদন যা'র জিহ্বা যদি শ্যামাকার
হেরি তা'রে, তবে প্রাজ্ঞজন,
বুঝিবেন মনে মনে যা'বে শমন-সদনে ;
অচিরায় ত্যজিবে জীবন। ২৬।
উষ্ট্র কি রাসভ যানে স্বপ্নে যে দক্ষিণ পানে
চলিয়াছে করে দরশন,
সদ্য মৃত্যু হ'বে তা'র সন্দেহ নাহিক আর
কেশে তা'রে ধরেছে শমন। ২৭।
কর্ণ রুদ্ধ হ'লে যা'র নির্ঘোষ না হয় আর
চক্ষুর্জ্যোতি যা'র লুপ্ত হয়,
স্থির জেনো সেই জন হ'য়েছে হতজীবন
অচিরে যাইবে যমালয়। ২৮।
স্বপ্নে দেখে যেইজন গর্ত্তেতে হ'য়ে পতন,
উঠিবার পথ নাহি পায়,
জীবন তাহার শেষ জেনে রেখো সবিশেষ
বাঁচাইতে কেবা পারে তায়। ২৯।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি হৈল যা'র সুলোহিত আঁখি-তার
ঘূর্ণমান হয় অনিবার,
মুখে উষ্মা বর্ত্তমান নাভি শিশির সমান
দেহান্তর হ'লো জেনো তা'র। ৩০।
স্বপ্নে দেখে যেই জন করে অগ্নি-প্রবেশন
নিষ্ক্রমের না পায় উপায়,
কিম্বা জলে সেই মত ; সে জন হইল হত
সন্দেহ নাহিক কিছু তা'য়। ৩১।
যেই জন ভূত-ভয়ে রহে অভিভূত হ'য়ে
কিবা দিবা কিবা সে নিশায়,
সপ্তরাত্রি পরে তা'র জীবন না র'বে আর
সন্দেহ নাহিক কিছু তা'য়। ৩২।

স্ববস্ত্রমমলং শুক্লং রক্তং পশ্যত্যথাসিতম্।
যঃ পুমান্ মৃত্যুমাসন্নং তস্যাপি হি বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৩ ॥
স্বভাববৈপরীত্যন্তু প্রকৃতেশ্চ বিপর্য্যয়ঃ।
কথয়ন্তি মনুষ্যাণাং সদাসন্নৌ যমান্তকৌ ॥ ৩৪ ॥
যেষাং বিনীতঃ সততং যেঽস্য পূজ্যতমা মতাঃ।
তানেব চাবজানাতি তানেব চ বিনিন্দতি ॥ ৩৫ ॥
দেবান্ নার্চ্চয়তে বৃদ্ধান্ গুরূন্ বিপ্রাংশ্চ নিন্দতি।
মাতাপিত্রোর্ন সৎকারং জামাতৃণাং করোতি চ ॥ ৩৬ ॥
যোগিনাং জ্ঞানবিদুষামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
প্রাপ্তে তু কালে পুরুষস্তদ্বিজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩৭ ॥
যোগিনাং সততং যত্নাদরিষ্টান্যবনীপতে।
সংবৎসরান্তে তজ্জ্ঞেয়ং ফলদানি দিবানিশম্ ॥ ৩৮ ॥
বিলোক্য বিশদা চৈষাং ফলপংক্তিঃ সুভীষণা।
বিজ্ঞায় কার্য্যো মনসি স চ কালো নরেশ্বর ॥ ৩৯ ॥

অমল শুভ্র বসন করে যেবা দরশন
রক্ত কিম্বা অসিত বরণ,
আসন্ন মরণ তা'র সন্দেহ নাহিক আর
যাবে সেই শমন-ভবন। ৩৩।
স্বভাবের বিপর্য্যয় প্রকৃতি পর্য্যস্ত হয়
কোন নরে, হের যে সময়,
নিশ্চয় জানিও মনে সন্দেহ তা'র জীবনে;
অচিরে যাইবে যমালয়। ৩৪।
বিনয়ে যাঁ'দের পায় লুটান উচিত, হায়
হেন পূজ্য জনে যেই জন,
করে কভু অপমান, তাহার নাহিক প্রাণ
বিশেষে জানেন বিজ্ঞগণ। ৩৫।
বিমুখ যে দেবার্চায়, ব্রাহ্মণের নিন্দা গায়
বৃদ্ধজনে নিন্দা করে আর,
গুরুজনে নিন্দে যেই পিতৃজনে নতি নেই
মাতারে না করে নমস্কার,

জামাতার অনাদর করে সদা যেই নর
যোগী জ্ঞানী জনে নিন্দা করে
বিদ্বানে মহাত্মজনে সদা তুচ্ছ করে মনে
অচিরে সে যায় যম ঘরে। ৩৬-৩৭।
শুন ওহে মহারাজ, এ সব জানিয়া কাজ
করা চাই যোগীর সতত;
যত্নে যদি যোগিগণ সতত করে সাধন
বৎসরান্তে ফলিবে নিয়ত। ৩৮।
ভীষণ ফল নিচয় যাহে যেই মত হয়
তা'র প্রতি দৃষ্টি থাকা চাই,
দৃষ্টি যেবা রাখে তায় সেই ত দেখিতে পায়
ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।
যে কালে যে ফল হ'বে তাহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রবে
হ'বে তাহে সর্ব্বশুভোদয়,
হৃদয়ে না রবে ভয়, দূরেতে যাবে সংশয়
মরণ না হবে ভয়ময়। ৩৯।

জ্ঞাত্বা কালঞ্চ তং সম্যগভয়স্থানমাশ্রিতঃ।
যুঞ্জীত যোগী কালোঽসৌ যথা নাস্যাফলো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥
দৃষ্ট্বারিষ্টং তথা যোগী ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্।
তৎস্বভাবং তদালোক্য কালে যাবত্যুপাগতম্ ॥ ৪১ ॥
তস্য ভাগে তথৈবাহ্নে যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ।
পূর্ব্বাহ্লে চাপরাহ্লে চ মধ্যাহ্নে চাপি তদ্দিনে ॥ ৪২ ॥
যত্র বা রজনীভাগে তদরিষ্টং নিরীক্ষিতম্।
তত্রৈব তাবদ্‌যুঞ্জীত যাবৎ প্রাপ্তং হি তদ্দিনম্ ॥ ৪৩ ॥
ততস্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্ব্বং জিত্বা তং কালমাত্মবান্।
তত্রৈবাবসথে স্থিত্বা যত্র বা স্থৈর্য্যমাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
যুঞ্জীত যোগং নির্জ্জিত্য ত্রীন্ গুণান্ পরমাত্মনি।
তন্ময়শ্চাত্মনা ভূত্বা চিদ্‌বৃত্তিমপি সন্ত্যজেৎ ॥ ৪৫ ॥
ততঃ পরমনির্ব্বাণমতীন্দ্রিয়মগোচরম্।
যদ্‌বুদ্ধের্যন্ন চাখ্যাতুং শক্যতে তৎ সমশ্নুতে ॥ ৪৬ ॥

কাল জ্ঞাত হ'লে পরে নির্ভয় হয়ে অন্তরে
যোগযুক্ত হইবে নিশ্চয়,
হবে তাহে শুভোদয় নিষ্ফল কভু না হয়
যোগ চেষ্টা না কর সংশয়। ৪০।
অরিষ্ট হইলে দৃষ্ট মনেতে ধরিবে ইষ্ট
ত্যজি' বৃথা, মরণের ভয়,
যে কালে হইবে কাল, ঘুচাতে সব জঞ্জাল
যোগযুক্ত হ'বে সে সময়। ৪১।
সেই দিনে সে সময় পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন হয়
কিম্বা হয় অপরাহ্ন কাল
বিচার না করি তার যোগে রত আপনার
হইবেন ঘুচাতে জঞ্জাল। ৪২।
সেই দৃষ্ট কাল হ'তে যোগরত বিধি মতে
রহিবেন অনন্ত অন্তরে,
যত দিন সেইক্ষণ, গত নহে কদাচন,
অন্য চিন্তা না আন অন্তরে। ৪৩।
সর্ব্বভয় পরিহরি' আত্মায় অন্তরে ধরি'
আত্মবান্ আত্মরত হ'বে
সেই স্থানে যোগ্য হয়, কিম্বা যোগ্য সুনিশ্চয়
মন প্রাণ যথা স্থির রবে। ৪৪।
জয় করি তিন গুণ, তৎকার্য্যে যেবা নিপুণ
আত্মসংস্থ হইবে নিশ্চয়,
তাঁহে যোগযুক্ত হ'লে সতত সুফল ফলে
চিত্তবৃত্তি তাহে রুদ্ধ হয়। ৪৫।
পরম নির্ব্বাণ তায় অনায়াসে পাওয়া যায়
ইন্দ্রিয়গণের অগোচর,
বুদ্ধি অগোচর যাহা বাক্যে কে বলিবে তাহা
তাহা লাভ হইবে সত্বর। ৪৬।

এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং তবালর্ক যথার্থবৎ।
প্রাপ্স্যসে যেন তদ্‌ব্রহ্ম সংক্ষেপাৎ তন্নিবোধ মে ॥ ৪৭ ॥
শশাঙ্করশ্মিসংযোগাচ্চন্দ্রকান্তমণিঃ পয়ঃ।
সমুৎসৃজতি নাযুক্তঃ সোপমা যোগিনঃ স্মৃতা ॥ ৪৮ ॥
যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি নৈকঃসন্নুপমা সাপি যোগিনঃ ॥ ৪৯ ॥
পিপীলিকাখু-নকুল-গৃহগোধা-কপিঞ্জলাঃ।
বসন্তি স্বামিবদ্‌গেহে ধ্বস্তে যান্তি ততোঽন্যতঃ ॥ ৫০ ॥
দুঃখন্তু স্বামিনো ধ্বংসে তস্য তেষাং ন কিঞ্চিন।
বেশ্মনো যত্র রাজেন্দ্র সোঽপমা যোগসিদ্ধয়ে ॥ ৫১ ॥
মৃদ্দেহিকাল্পদেহাপি মুখাগ্রেণাপ্যণীয়সা।
করোতি মৃত্তারচয়মুপদেশঃ স যোগিনঃ ॥ ৫২ ॥
পশু-পক্ষি-মনুষ্যাদৈঃ পত্র-পুষ্প-ফলান্বিতম্।
বৃক্ষং বিলুপ্যমানন্তু দৃষ্ট্বা সিধ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৫৩ ॥

এই ত বলিনু রায় যাহা বাক্যে বলা যায়
যথাযথ তোমার গোচরে,
যাহে ব্রহ্ম লাভ হয় এবে সেই সমুদয়
সংক্ষেপে বলিব তব তরে। ৪৭।
শশাঙ্কের রশ্মি পেলে চন্দ্রকান্ত অবহেলে
নির্ম্মল সলিল ত্যাগ করে,
না পেলে সে সিত-কর অশক্ত সে নিরন্তর
সেই কথা মিলে যোগী তরে। ৪৮।
অর্করশ্মি পেলে পর সূর্য্যকান্ত নিরন্তর
অনল করয়ে উদ্গীরণ,
রশ্মি বিনা নাহি পারে যোগী যে, জানিও তাঁরে
সেই মত শুনহে রাজন্। ৪৯।
পিপীলিকা, আখু আর, গৃহ গোধা নির্ব্বিকার
কপিঞ্জল নকুল সে আর,
গৃহে গৃহী সহ রয় গৃহ গেলে সুনিশ্চয়
অন্য স্থানে গমন তাহার। ৫০।
দেহ ধ্বংসে দেহী আর না সহে সে দুঃখ ভার
দেহে যত হয় সংঘটন,
গেহ সম জেনো দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হ'লে সেহ
কিছুই না ভুঞ্জে যোগিজন। ৫১।
মৃদ্দেহিকা ক্ষুদ্রকায় কিন্তু তার মুখে হায়
রাশি রাশি মৃত্তিকা উদয়,
যোগী সেই উপদেশে ধীরে সাধি পায় শেষে;
পরম সে ব্রহ্ম লব্ধ হয়। ৫২।
পশু পক্ষী আর নরে ফলান্বিত তরুবরে
ধীরে ধীরে করয়ে বিনাশ
যোগী দেখি সেই কার্য্য করেন আপন কার্য্য
ধীর-যত্নে সদা পুরে আশ। ৫৩।

রুরুশাববিষাণাগ্রমালক্ষ্য তিলকাকৃতিম্।
সহ তেন বিবর্দ্ধন্তং যোগী সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪ ॥
দ্রবপূর্ণমুপদায় পাত্রমারোহতো ভুবঃ।
তুঙ্গমঙ্গং বিলোক্যোচ্চৈর্বিজ্ঞাতং কিং ন যোগিনা ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বস্বে জীবনায়ালং নিখাতে পুরুষস্য যা।
চেষ্টাং তাং তত্বতো জ্ঞাত্বা যোগিনঃ কৃতকৃত্যতা ॥ ৫৬ ॥
তদ্‌গৃহং যত্র বসতিস্তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি।
যেন সম্পদ্যতে চার্থস্তৎ সুখং মমতাত্র কা ॥ ৫৭ ॥
অভ্যর্থিতোঽপি তৈঃ কার্য্যং করোতি করণৈর্যথা।
তথা বুদ্ধ্যাদিভির্যোগী পারক্যৈঃ সাধয়েৎ পরম্ ॥ ৫৮ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

ততঃ প্রণম্যাত্রিপুত্রমলর্কঃ স মহীপতিঃ।
প্রশ্রয়াবনতো বাক্যমুমাচাতিমুদান্বিতঃ ॥ ৫৯ ॥

অলর্ক উবাচ।

দিষ্ট্যা দৈবৈরিদং ব্রহ্মন্ পরাভিভবসম্ভবম্।
উপপাদিতমত্যুগ্রং প্রাণসন্দেহদং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥

রুরুশাব-শিরে হায় তিলাকার দেখা যায়
শৃঙ্গ তার—ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
ক্ষুদ্র বীজ গুরুদত্ত তাহাতে রহিলে মত্ত
যোগী সিদ্ধি লাভ করে তায়। ৫৪।
দ্রবপূর্ণ পাত্র করে উচ্চে আরোহণ করে
ধীরে, ধীরে নর যে সময়,
যোগী অঙ্গ দেখি তা'র বুঝে কার্য্য আপনার
সাধনেতে বিরত না হয়। ৫৫।
জীবনের তরে নরে সর্ব্বস্ব নিখাত করে
তাহা দেখি, সদা যোগীগণ
ত্যজিয়া সকল ভয়, যোগযুক্ত হয়ে রয়
কৃতকৃত্য হবার কারণ। ৫৬।
যেই স্থানে থাকা যায় গৃহ বলি জান তায়
তাই ভোজ্য যাহে দেহ রয়,
যাহা অর্থযুক্ত হয় সুখ তাই সুনিশ্চয়
এ সব মমতা যোগ্য নয়। ৫৭।
অভ্যর্থিত যেই মত করণেতে কার্য্য শত
সাধিত হইছে নিরন্তর,
পারক্য বুদ্ধির বলে সেইরূপ যোগিদলে
ব্রহ্মের সাধনে সুতৎপর। ৫৮।"
দ্বিজপুত্র বলে "পিতা করহ শ্রবণ,
নরেন্দ্র অলর্ক বন্দি' মুনির চরণ,
প্রশ্রয়াবনত হয়ে হর্ষযুত মনে
করিলেন নিবেদন মুনির চরণে। ৫৯।
দৈবের ইচ্ছায় হলো সৌভাগ্য উদয়
তেঁই এই পরাভব ঘটিল নিশ্চয়।
জীবনসংশয়কর এই ভীতি ফলে,
আসি' মিলিলাম তব চরণ-কমলে। ৬০।

দিষ্ট্যা কাশিপতের্ভূরি-বলসম্পৎপরাক্রমঃ।
যদুচ্ছেদাদিহায়াতঃ স যুস্মৎসঙ্গদো মম ॥ ৬১ ॥
দিষ্ট্যা মন্দবলশ্চাহং দিষ্ট্যা ভৃত্যাশ্চ মে হতাঃ।
দিষ্ট্যা কোষঃ ক্ষয়ং যাতো দিষ্টাহং ভীতিমাগতঃ ॥ ৬২ ॥
দিষ্ট্যা ত্বৎপাদযুগলং মম স্মৃতিপথং গতম্।
দিষ্ট্যা ত্বদুক্তয়ঃ সর্ব্বা মম চেতসি সংস্থিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
দিষ্ট্যা জ্ঞানং মমোৎপন্নং ভবতশ্চ সমাগমাৎ।
ভবতা চৈব কারুণ্যং দিষ্ট্যা ব্রহ্মন্ কৃতং মম ॥ ৬৪ ॥
অনর্থোঽপ্যর্থতাং যাতি পুরুষস্য শুভোদয়ে।
যথেদমুপকারায় ব্যসনং সঙ্গমাৎ তব ॥ ৬৫ ॥
সুবাহুরুপকারী মে স চ কাশিপতিঃ প্রভো।
তয়োঃ কৃতোঽহং সম্প্রাপ্তো যোগীশ ভবতোঽন্তিকম্ ॥ ৬৬ ॥
সোঽহং তব প্রসাদাগ্নি-নির্দ্দগ্ধাজ্ঞানকিল্বিষঃ।
তথা যতিষ্যে যেনেদৃঙন ভূয়াং দুঃখভাজনম্ ॥ ৬৭ ॥

কাশিপতি সৈন্য সনে কৈলা আগমন,
সৌভাগ্যের ফলে মোর হেন সংঘটন।
নাশিতে সে সৈন্য আমি আইনু হেথায়,
তাহ'তে ঘটিল সঙ্গ তোমায় আমায়। ৬১।
ভাগ্য ফলে হয়েছিনু আমি হতবল
ভৃত্যগণ হত হলো সেও ভাগ্য ফল।
সৌভাগ্যের ফলে হ'ল কোষক্ষয় মোর,
সৌভাগ্যের ফলে হৃদে এল ভীতি ঘোর।৬২।
সৌভাগ্যের ফলে তব যুগল চরণ
স্মৃতিপথে আসি' দুঃখ করিল হরণ।
সৌভাগ্যের বলে বাক্য মধুর তোমার,
হৃদয়েতে আমি বদ্ধ হয়েছে আমার। ৬৩।
ভাগ্যবলে সমাগম ঘটি আপনার
হৃদিমাঝে জ্ঞান আজি উদয় আমার।
ভাগ্যবলে, আপনার করুণা লভিয়া
অমৃত সাগরে আজি যেতেছি ভাসিয়া।
শুভ ভাগ্যোদয় যবে ঘটয়ে যাহার
অনর্থেতে অর্থলাভ ঘটে ভাগ্যে তার।
ব্যসনের বশে আমি পেয়ে তব সঙ্গ
পূর্ণামৃতরসে হলো সুশীতল অঙ্গ। ৬৫।
সুবাহু হইল আজ মহা উপকারী
উপকারী কাশিপতি শক্রবেশধারী।
তাদের কার্য্যের ফলে এই শুভোদয়,
তব পদ পেয়ে হলো শীতল হৃদয়। ৬৬
তোমার প্রসাদ অগ্নি দহিল আমার
অজ্ঞান-কিল্বিষ-রাশি কি সন্দেহ তা'র।
এবে আমি সেইরূপ করিব যতন,
যাহে আর নাহি হয় দুঃখের ঘটন। ৬৭।

পরিত্যক্ষ্যে গার্হস্থ্যমার্ত্তিপাদপকাননম্।
ত্বত্তোঽনুজ্ঞাং সমাসাদ্য জ্ঞানদাতুর্মহাত্মনঃ॥ ৬৮॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

গচ্ছ রাজেন্দ্র ভদ্রং তে যথা তে কথিতং ময়া।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারস্তথা চর বিমুক্তয়ে॥ ৬৯॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রণম্যৈনমাজগাম ত্বরান্বিতঃ।
যত্রকাশিপতি ভ্রাতা সুবাহুশ্চাস্য সোঽগ্রজঃ॥ ৭০॥
সমুপেত্য মহাবাহুং সোঽলর্কঃ কাশিভূপতিম্।
সুবাহোরগ্রতো বীরমুবাচ প্রহসন্নিব॥ ৭১॥
রাজ্যকামুক কাশীশ ভুজ্যতাং রাজ্যমূর্জ্জিতম্।
যথা বা রোচতে তদ্বৎ সুবাহোঃ সম্প্রযচ্ছ বা॥ ৭২॥

কাশিরাজ উবাচ।

কিমলর্ক পরিত্যক্তং রাজ্যং তে সংযুগং বিনা।
ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্ম্মোঽয়ং ভবাংশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ॥ ৭৩॥

আর্ত্তি পাদপেতে ভরা গার্হস্থ্য কানন.
ত্যজি সুখে শান্তিপথে করিব গমন।
ওহে জ্ঞানদাতা আজ্ঞা করহ আমায়
যাই তথা যাহে লোক চির শান্তি পায়।"৬৮।
বলিলেন দত্তাত্রেয় "যাও হে রাজন,
শুভাশ্রয় করি কর সকল জীবন।
মমতা বিহীন হ'য়ে ত্যজি অহঙ্কার
যত্ন কর মুক্তিলাভ হইবে তোমার"।৬৯।
দ্বিজপুত্র বলে "পিতা করহ শ্রবণ
দত্তাত্রেয় মুখে শুনি এ হেন বচন,
প্রণমি তাঁহার পদে, সেই নররায়
ত্বরান্বিত হ'য়ে তবে ফুল্ল মনে ধায়,
যেইখানে কাশিপতি সনেতে তাঁহার
অগ্রজ সুবাহু গেলা নিকটেতে তা'র।৭০।
সুবাহুর সম্মুখেতে করিয়া গমন
মহাবাহু কাশিরাজে বলেন বচন।৭১।
হে কাশীনরেশ রাজ্যকামনাকাতর,
ভোগ কর সুখে মোর রাজ্য নিরন্তর,
কিম্বা যদি হয় তব বাসনা অন্তরে
সুবাহুরে দেহ রাজ্য—যেবা মনে ধরে"।৭২।
কাশিরাজ বলে "এ কি শুনি হে রাজন,
বিনা যুদ্ধে রাজ্য ত্যাগ কর কি কারণ?
ক্ষত্রিয়ের এই মত ধর্ম্ম কভু নয়,
ক্ষত্র ধর্ম্ম জান তুমি ওহে ধর্ম্মময়।৭৩।

নির্জ্জিতামাত্যবর্গস্তু ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্ ।
সন্দধীত শরং রাজা লক্ষ্যমুদ্দিশ্য বৈরিণম্ ॥ ৭৪ ॥
তং জিত্বা নৃপতির্ভোগান্ যথাভিলষিতান্ বরান্ ।
ভুঞ্জীত পরমং সিদ্ধ্যৈ যজেত চ মহামখৈঃ ॥ ৭৫ ॥

অলর্ক উবাচ ।

এবমীদৃশকং বীর মমাপ্যাসীন্মনঃ পুরা ।
সাম্প্রতং বিপরীতার্থং শৃণু চাপ্যত্র কারণম্ ॥ ৭৬ ॥
যথায়ং ভৌতিকঃ সঙ্ঘস্তথান্তঃকরণং নৃণাম্ ।
গুণাস্তু সকলাস্তদ্বদশেষেষ্বেব জন্তুষু ॥ ৭৭ ॥
চিচ্ছক্তিরেক এবায়ং যদা নান্যোঽস্তি কশ্চন ।
তদা কা নৃপতেঽজ্ঞানান্মিত্রারি-প্রভু-ভৃত্যতা ॥ ৭৮ ॥
তন্ময়া দুঃখমাসাদ্য ত্বদ্ভয়োদ্ভবমুত্তমম্ ।
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন জ্ঞানং প্রাপ্তং নরেশ্বর ॥ ৭৯ ॥
নির্জ্জিতেন্দ্রিয়বর্গস্তু ত্যক্ত্বা সঙ্গমশেষতঃ ।
মনো ব্রহ্মণি সন্ধাস্যে তজ্জয়ে পরমো জয়ঃ ॥ ৮০ ॥

আপন অমাত্যগণে আয়ত্ত করিয়া
যুদ্ধ করিবেক সদা ভয় তেয়াগিয়া।
বৈরিদলে লক্ষ্য করি' করিবে সন্ধান,
শর আদি অস্ত্র সদা বধিতে পরান। ৭৪।
শত্রু জয় করি-করি রাজ্যের রক্ষণ
নরপতি ইষ্টলাভ করে অগণন,
পরে মহাযজ্ঞ যত করিবে সাধন
লভিবে পরম সিদ্ধি শাস্ত্রের বচন। ৭৫।
বলেন অলর্ক "রাজা কি বলিব আর
এই মত মত আগে ছিল হে আমার।
কিন্তু এবে বিপরীত বোধ করি তায়
যেরূপে হইল হেন বলি ছে তোমায়। ৭৬।
যা কিছু দেখিছ ভবে সেই সমুদয়
পঞ্চভূত-সমুৎপন্ন নাহিক সংশয়।
মানবের এ অন্তঃকরণ গুণ আর
অশেষ জন্তুর সবি সমষ্টি তাহার। ৭৭।
চিচ্ছক্তি সে সবে রাজা একমাত্র হয়
এই হেতু ভবে কভু পর কেহ নয়।
অজ্ঞানের ফলে ভাবে শত্রু এ আমার
এই মিত্র—প্রভু এই—এই ভৃত্য আর। ৭৮।
তব ভয়ে ভীত হ'য়ে মিছা দুঃখ সয়ে
দত্তাত্রেয় প্রসাদেতে জ্ঞানযুক্ত হ'য়ে
জিনিয়া ইন্দ্রিয় প্রাণ—আসক্তি ত্যজিয়া
ব্রহ্মে মন দিছি আমি প্রফুল্ল হইয়া। ৭৯।
এই জয় শ্রেষ্ঠ জয় জেনেছি নিশ্চয়;
তা বিনা অপর সিদ্ধি কার্য্যকরী নয়।
ইন্দ্রিয় সংযম করি এ সিদ্ধি ঘটিলে,
সকলি এ ভবে সিদ্ধ হবে অবলীলে। ৮০।

বৈষ্ণব-কুল-চূড়ামণি

মহাত্মা কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"মনে পড়ে সে বালকে ? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রুকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরু ছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতিবিন্দু অনুভব ;

* * * * *

* * * * * কত ফিরিলাম,—

কোথা লোক ? প্রাণ যার মুক্ত ? পৃথিবীর
সমস্তছাপ পড়ে যেথা ? লঘু কি গভীর—
প্রতিক্ষণ জড়জীবে বন্ধু এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
দৃঢ়বাহু—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজের সহসা, বহু ডুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে কলাখস্ত ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা না'লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে ?
—জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।"

৺সতীশচন্দ্র রায়।

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩২১

দশম সংখ্যা

আলোচনা

১। ইউরোপে গ্রন্থ প্রকাশ

আজকাল বঙ্গদেশে পুস্তক লেখক ও পুস্তক প্রকাশকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের লেখক ব্যতীত বাঙ্গালীর মধ্যে বেশী কেহ গ্রন্থ লিখিয়া পয়সা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। ঐরূপ পুস্তকের প্রকাশক ব্যতীত আর কেহ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পয়সা করিয়াছেন বলিয়াও শুনি নাই। অন্য কোনরূপ গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক উভয়ই দুঃখের সহিত বলিয়া থাকেন "টেক্সটবুক লিখিলে পয়সা করা যাইত। এই সকল গ্রন্থে কেবল কালী খরচ হইয়াছে মাত্র। খরচ উঠিবে কিনা সন্দেহ।"

বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশে পুস্তক-রচনা ব্যবসায় এখনও অন্নসংস্থানের উপায় স্বরূপ হয় নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার তাঁহারা জীবনধারণের জন্য পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। গ্রন্থলিখন তাঁহাদের জীবিকা নয়—একটা উপরি মাত্র। পয়সা করিবার উদ্দেশ্যেও বোধ হয় অনেকে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন না। প্রকাশকগণের মধ্যেও এমন কেহ নাই যাঁহারা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ছাড়া অন্যান্য পুস্তক প্রকাশকেই ব্যবসায়রূপে গণ্য করিয়াছেন। তাহা করিতে গেলে ইঁহাদের আগাগোড়া লোক্‌সানই হইবে।

ইউরোপে অবশ্য একদল লেখক আছেন যাঁহারা পাঠ্যপুস্তক লিখেন না কিন্তু অন্য-প্রকার পুস্তক রচনা করিয়া জীবন ধারণ করেন। ওখানে প্রকাশকও আছেন যাঁহারা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ না করিয়াও অন্যান্য পুস্তক প্রকাশের দ্বারা লাভবান্ হন। অর্থাৎ সদ্‌গ্রন্থের লিখন এবং প্রকাশ উভয়ই ঐ সকল দেশে লাভজনক ব্যবসায়। একমাত্র পুস্তক রচনার উপর নির্ভর করিয়াই ঐ সকল দেশে কেহ কেহ ঘরে হাঁড়ী চড়াইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদরপূর্ত্তিও হয়

* *
*

২। বিলাতের লেখক ও প্রকাশক

বাহির হইতে ইউরোপের উড়্‌ খবর পাইয়া আমরা নিজেদের অবস্থায় হতাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু ইউরোপীয় গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ প্রকাশকগণের যথার্থ অবস্থা আলোচনা করিলে আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সদ্‌গ্রন্থ রচনায়ই জীবিকা অর্জ্জন হয় এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য সমাজে বিরল। এখানকার মত ওদেশেও বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতারাই পয়সা করেন। অন্য লেখকদের অবস্থা আমাদেরই মত শোচনীয়—হয়ত কিছু উন্নত। অবশ্য সুখী দুঃখী ধনী নির্ধন পাশ্চাত্য মাপেই বুঝিতে হইবে।

বিলাতের কথাই ধরা যাউক। কিছুদিন হইল "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি" পত্রিকায় একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি নিজে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ৬০ খানা গ্রন্থের লেখক। তিনি বিলাতের ৮।১০টি প্রকাশকের সঙ্গে কারবার করিয়াছেন। দু এক ক্ষেত্রে তিনি গ্রন্থের কপিরাইট বা স্বত্বাধিকার বিষয়ক আইন রচনায়ও সাহায্য করিয়াছেন। কাজেই গ্রন্থের ক্রয় বিক্রয় এবং গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় ইত্যাদি বিষয় তাঁহার বেশ জানা আছে। তিনি বিলাতের কথা যাহা বলেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আর বুঝিয়াছি—একমাত্র গ্রন্থ রচনাকেই বিলাতেও জীবিকার উপায় বিবেচনা করা চলে না।

এমন অনেক গ্রন্থ বিলাতে প্রকাশিত হয় যাহার ক্রেতা একজনও নাই। লেখক বড় লোক না হইলে ওরূপ গ্রন্থ বাজারে বাহিরই হয় না। প্রকাশকও লেখকের নিকট মুদ্রণ ও প্রকাশের সমস্ত ব্যয় লইয়া গ্রন্থ প্রকাশে রাজী হন। কাজেই প্রকাশক ওসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর প্রবন্ধ লেখক বলেন "এইরূপ গ্রন্থের মধ্যে অনেক সময়ে ভাল ভাল লেখাও থাকে। আমি একখানা কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তাহা প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ কোন বিখ্যাত মাসিকে পাঠাইয়া-ছিলাম। কয়েক মাস পরে প্রকাশককে

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মাত্র ৭ খানা পুস্তক বিক্রী হইয়াছে !"

সকল দেশেই গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থ বেশী বেশী প্রকাশিত হয়। বিলাতেও প্রতি সপ্তাহে যত গ্রন্থ বাহির হয় তাহার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা অত্যধিক। কোন সপ্তাহে দশখানা, কখনও কখনও বিশ খানা নভেল ইংরাজী সাহিত্যকে প্লাবিত করে। অধিকাংশ উপন্যাসই অপাঠ্য, কুরুচিপূর্ণ, চরিত্রহানিকর। ক্বচিৎ কখনও সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য নভেল বিলাতে দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থ ১০০০ এর বেশী কখনও বিক্রী হয় না। সাধারণতঃ পাঠাগার, লাইব্রেরী ইত্যাদিতেই এই গুলির কাট্‌তি। নভেল পাঠকেরা প্রায়ই পুস্তক কিনিয়া পড়েন না। তবে নিতান্ত ভাল উপন্যাসের কথা স্বতন্ত্র। এই সকল পুস্তক বৎসরে ৩।৪ খানা বাহির হয় কিনা সন্দেহ।

তবে বিলাতী ভদ্রতার নিয়মে পুস্তক দানের ব্যবস্থা আছে। এজন্য ইংরাজেরা মাঝে মাঝে উপহার দিবার জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। প্রবন্ধ লেখক বলেন, "পুস্তক ছাড়া সস্তায় উপহার দিবার আর কোন জিনিষ নাই। কাজেই উপহার পুস্তক ইংরাজেরা কিনিয়া থাকেন। অন্য কোন পুস্তক তাঁহারা কিনিতে জানেন না।"

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে জেলার ইতিহাস, পরগণার ভৌগোলিক বিবরণ, ব্রাহ্মণের ইতিহাস, তিলীর সমাজকথা ইত্যাদি নানা প্রকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিলাতেও এই প্রকার অনেক গ্রন্থ বাহির হয়। কোন পল্লীর গির্জ্জা সম্বন্ধে হয়ত কেহ লিখিলেন। কোন ব্যক্তি হয়ত তাঁহার বংশের কথা প্রচার করিলেন। কোন জমিদার তাঁহার জমিদারীর ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিলেন। এই সকল গ্রন্থ ওদেশে কখনও বিক্রী হয় কি ? গ্রন্থকারের বন্ধুগণ ব্যতীত আর কেহ এ সকল বই কিনেন বলিয়া জানা যায় না। পুস্তক প্রকাশের খরচ প্রায়ই উঠে না।

চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, বিশেষজ্ঞদিগের রচনা, পারিভাষিকশব্দবহুল বিজ্ঞান-গ্রন্থ এরূপ নানা প্রকার উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ সাধারণতঃ বিক্রী হয় না বলিলেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই সকল পুস্তক কিনিয়া থাকে। কাজেই এগুলিকে পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে। পরীক্ষার্থী ছাত্রমহল ভিন্ন অন্যত্র এই সকল গ্রন্থের কাট্‌তি আদৌ নাই। কাজেই এই সকল গ্রন্থের মূল্য কিছু বেশী রাখা হয়। কিন্তু মোটের উপর বিক্রী এত কম হয় যে, কোন মতে খরচ উঠিয়া যায়। লেখক ও প্রকাশকের লাভ অল্পমাত্র থাকে। কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ লিখিয়া কেহ অন্ন-সংস্থান করিতে পারেন না ইহা স্থির।

তারপর ধর্ম্ম গ্রন্থ। এই সকল পুস্তকও যথেষ্টই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লোকেরা বক্তৃতা শুনিতে পাইলে আর পুস্তক ক্রয় করিতে চাহে না। সস্তায় পাইলেও পুস্তক ক্রয় করা ইংরাজদিগের অভ্যাস নয়। বিলাতে অসংখ্য ধনী পরিবার আছেন যাঁহারা পুস্তক ক্রয়ের জন্য বৎসরে এক পয়সাও খরচ করেন না। মদের খরচে যত ব্যয় হয় ইংরাজাতির সহস্র লোকের মধ্যে একজনও পুস্তকের জন্য তত ব্যয় করেন না।

নাইন্‌টিন্থ্‌ সেঞ্চুরির প্রবন্ধ লেখক বিলাতী সমাজে গ্রন্থের ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে এইরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কথায় আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতবাসী বা

বাঙ্গালীই এসম্বন্ধে একমাত্র পাপী নয়। জগতের বড় বড় জাতিরাও এই হতভাগ্য-দিগের অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নয়।

*
* *

৩। গ্রন্থ-ব্যবসায়ে সংরক্ষণ-নীতি

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের গ্রন্থকারেরা ধনী বন্ধুগণের অর্থ সাহায্যে পুস্তক প্রকাশ করিতেন। সাধারণ পাঠক-সমাজের উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদের জীবন ধারণ চলিত না। লেখকগণ গ্রন্থ রচনা দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেন না। পাঠকসংখ্যা তখনও বেশী ছিল না। কাজেই বিদ্যোৎসাহী মুরুব্বিদিগের সৎপ্রবৃত্তিই তখনকার গ্রন্থকারদিগের আশাস্থল ছিল। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় গ্রন্থ-ব্যবসায়ও "সংরক্ষণ-নীতির" প্রভাবে পরিচালিত হইত।

আজকাল ইংলণ্ডে পাঠক সংখ্যা বাড়িয়াছে। গ্রন্থক্রয়ের রুচি জনগণের মধ্যে দেখা দিয়াছে। কাজেই লেখকেরা এখন মুরুব্বিদিগের অর্থ সাহায্য বা সংরক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। পাঠক-সমাজের বিদ্যা-চর্চ্চাই আজকাল ধনীদিগের কৃপার স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রন্থকারেরা এক্ষণে স্বাধীন হইয়াছেন।

কিন্তু এখনও বিলাতে ধনীগণের অর্থ সাহায্য ও কৃপা ব্যতীত বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রচারিত হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট পুস্তক মাত্রেরই ওদেশে কটতি আছে একথা বলা যায় না। একমাত্র পাঠক-সমাজের জ্ঞানলিপ্সার উপর নির্ভর করিলে অনেক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থও প্রকাশ করা অসম্ভব হয়। কাজেই লাভবান্ হইবার আশা ত্যাগ করিয়া প্রকাশের জন্য অর্থ ব্যয় করিলে ইংরাজী সাহিত্যে ভাল ভাল গ্রন্থ বাহির হইতে পারে না। সুতরাং সংরক্ষণ-নীতি এখনও বিলাতে চলিতেছে আমরা বলিতে বাধ্য।

পাশ্চাত্যদেশে অসংখ্য য়্যাক্যাডেমী, অনুসন্ধান-সমিতি, সাহিত্য-পরিষৎ, বিজ্ঞান-সঙ্ঘ, শিল্প-সম্মিলনী ইত্যাদির কথা আমরা শুনিতে পাই। এই সকল পরিষৎ প্রধানতঃ ধনবান্ ব্যক্তিগণের অর্থসাহায্যে গঠিত। সভ্যগণের চাঁদাও এই সমুদয়ের আয়ের এক পন্থা। এতদ্ব্যতীত, রাষ্ট্র হইতেও মাসিক বা বার্ষিক সাহায্য ইহাঁরা পাইয়া থাকেন।

এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে যে সকল গবেষণা প্রকাশিত হয় তাহা সাধারণ্যে প্রায়ই বিক্রী হয় না। এইগুলি অধিকাংশ-স্থলেই নিতান্ত বিশেষজ্ঞগণের উপযোগী। এই সমুদয়ের প্রকাশ যদি পাঠক-সমাজের রুচির উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে এই-গুলি জগতে প্রচারিত হইতই না। যে সকল গ্রন্থের দ্বারা জগতের এবং মানবজাতির স্থায়ী উপকার হয় সেরূপ গ্রন্থ প্রকাশের জন্যই বাজারের কাটতির উপর নির্ভর করা চলে না। কারণ সেই সকল গ্রন্থের যথার্থ উপকারিতা বুঝিয়া উঠা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এই প্রকার গ্রন্থের জন্য স্বার্থত্যাগী মুরুব্বি নিতান্ত আবশ্যক।

কিছুদিন হইল প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য, সভ্যতা, ধর্ম্ম, সুকুমার-শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে এক খানা বিরাট গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ ছয় ভাগে সম্পূর্ণ—পৃষ্ঠা ৩১২৯—সর্ব্বসমেত ২৩১ খানা ছবি, ও মানব-চিত্র আছে। এই গ্রন্থের কিরূপ কাটতি হইয়াছিল? বড় বড় গ্রন্থশালা, রীডিংরুম এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা ৫৮ খানা লইয়া-ছিলেন। সাধারণ পাঠকগণ ৫৮ খানা কিনিয়াছিলেন। বড় বড় দোকানদারেরা

১৫৫ খানা রাখিয়াছিলেন। মোটের উপর ২৭০ খানা মাত্র পুস্তক বিক্রী হইয়াছিল। ভাল ভাল পুস্তকের বিক্রী ইহা অপেক্ষা বেশী হয় না। অবশ্য যে সকল পুস্তক বা পুস্তিকায় সাময়িক উত্তেজনা বা নূতন কোন হুজুগের আলোচনা থাকে তাহার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থাবলীর ভাগ্য বিলাতে সাধারণতঃ এইরূপ।

২৫০।২৭৫ জন ক্রেতার সাহায্যে কি এই গ্রীক সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল? কখনই না। মুরুব্বি না থাকিলে এই গ্রন্থের উৎপত্তি হইত না। এখানে মুরুব্বি ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ। গ্রন্থকারের অন্ন বস্ত্র জোগাইয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব নিশ্চিন্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রন্থকার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর পুস্তক সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তাহাতেও বিচলিত না হইয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা দুইবার সময় বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং চুক্তি অপেক্ষা তিনগুণ বেশী সময়ও খরচ হইয়াছিল। গ্রন্থ লিখাইবার খরচই এত। তাহা ছাড়া মুদ্রণ ও প্রকাশেরত কথাই নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধনবান্ অথচ স্বার্থত্যাগী মুরুব্বির "সংরক্ষণ" বা অর্থ-সাহায্য না পাইলে উন্নত বিলাতেও উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থাবলীর প্রকাশ অসম্ভব। ভারতবর্ষেও গ্রন্থপ্রচারের জন্য ধনিগণের দান আবশ্যক হইতেছে দেখিয়া লেখক বা পাঠকগণের দুঃখিত হইবার কারণ নাই। বরং স্বদেশ-সেবক ও সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেরই এই সংরক্ষণ-নীতি প্রচার করা কর্ত্তব্য।

৪। প্যান্-ইস্লাম

জাপান, চীন, হিন্দুস্থান ও মুসলমানজগৎ উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান সমাজের আধিপত্যে পরিচালিত হইয়াছে। তাহার শেষ ফল দেখা যাইতেছে বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র এশিয়ার জাগরণ। পাশ্চাত্যেরা এই জাগরণে নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান ভয় দুইটি—এ জন্য দুইটি নূতন নাম রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে সৃষ্টি হইয়াছে। একটির নাম "Yellow Peril" বা পীত জাতির বিস্তারে ইউরোপের আশঙ্কা। তাঁহাদের দ্বিতীয় পারিভাষিক শব্দ Pan-Islam বা মুসলমানী-বিশ্বে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় খ্রীষ্টানের আশঙ্কা।

পাশ্চাত্যেরা স্বীয় সমাজে রটাইতেছেন যে, চীন ও জাপানের পীত-জাতি সমবেত হইয়া ইউরোপীয় সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এমন কি, এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানেরাও পাশ্চাত্য জগতের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতেছে। প্রয়োজন হইলে এশিয়ার সকল জাতি মিলিত হইয়া ইউরোপের সকল জাতির সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ যেমন প্রাচ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ন্যূনাধিক ক্ষমতা, আবিষ্কার, রাজ্য, সাম্রাজ্য, আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এসিয়ার জাতিগুলিও সেইরূপ বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ভিতর আধিপত্য, প্রভাব, রাজ্য, সাম্রাজ্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রাচ্যবাসীরা ক্ষমতা লাভ করিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ প্রাচ্য জগতের সকল

স্থান হইতেই ইউরোপীয়দিগকে হঠাইয়া দিবার জন্য তাহারা তৈয়ারী হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'এসিয়ার' 'জাগরণ' 'ইয়েলোপেরিল', এবং 'প্যান্-ইস্লাম' ইত্যাদি শব্দে এইরূপই বুঝিয়া থাকেন।

৫। বিংশ শতাব্দীর মুসলমান

পাশ্চাত্য জাতিগণ প্রাচ্য জনগণকে চির-কাল নিজ আওতায় রাখিতে চাহেন। এই জন্যই তাঁহারা এসিয়ার জাগরণ সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা প্রচার করিতেছেন।

ধর্ম্মের দোহাই দিলে লোকেরা যত শীঘ্র ক্ষেপে অত আর কিছুতেই না। সকল দেশেই এই নিয়ম। কাজেই খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান সমাজ, খ্রীষ্টান সভ্যতা ইত্যাদির বিপৎকাল আগত প্রায় এইভাবে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীকে উত্তেজিত করিবার জন্য শিক্ষিত খ্রীষ্টানেরা পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। প্রাচ্য জগতের কোন স্থানে সামান্য মাত্র নড়ন চড়ন বা গোলযোগ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা প্রচার করিতে থাকেন—খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে চীনারা ক্ষেপিয়াছে, খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা দাঁড়াইতেছে ইত্যাদি! জাপানকে ইউরোপ কাবু করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের ভয় প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এসিয়ার বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আন্দোলনও খানিকটা প্রসার লাভ করিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম বা সভ্যতার বিরুদ্ধে এসিয়ার কোন জাতিই ব্রতবদ্ধ হন নাই। আধুনিক মুসলমানের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমানের জাগরণে হিন্দুগণের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিরোধের আকার ধারণ করিতেছিল। তাহার যথেষ্ট কারণও ছিল। সুখের কথা চিন্তাশীল মুসলমানেরা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া এক্ষণে আর হিন্দু-বিরোধে প্রশ্রয় দেন না। মুসলমানী জাগরণের প্রকৃত অর্থ ভারতীয় এবং অন্য স্থানের মুসলমানেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে মুসলমান সমাজ মানবজাতির সভ্যতা ভাণ্ডারকে অশেষ উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুকালের জন্য তাঁহারা জগতের গুরুপদ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। আর কি তাঁহারা সেই বরনীয় স্থানে উঠিতে পারিবেন না? এজন্য কি তাঁহাদের এক্ষণে চেষ্টিত ও দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া কর্ত্তব্য নয়? বিংশ শতাব্দীর মুসলমান এইরূপই চিন্তা করিয়া থাকেন। তুরস্ক, মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন সকল স্থানের মুসলমান-চিত্তেই এই আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যপালনের আকাঙ্ক্ষা সমবেত হইয়া এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার চিন্তাশীল মুসলমানগণকে বর্ত্তমানের দুরবস্থা নিবারণ করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। "মা, আমায় মানুষ কর"—জগতের ইস্লাম-সন্তান এই প্রার্থনাই জগজ্জননীর নিকট সর্ব্বদা করিতেছেন। নবযুগোপযোগী মনুষ্যত্বের বিকাশ মুসলমানসমাজের কুত্রাপি নাই—সুতরাং সেই মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের অর্জ্জনই বিংশ শতাব্দীর মুসলমানগণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই মনুষ্যত্ব অর্জ্জিত হইলে অন্যান্য জাতীয় জনগণের ন্যায় মুসলমানেরাও জগতে নব নব উপায়ে কাব্য, শিল্প, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও নীতি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন।

মানবজাতির উৎকর্ষবিধানে সাহায্য করিতে যোগ্যতা লাভ করিবার জন্যই মুসলমানেরা জাগিতেছেন। বিংশ শতাব্দীর মুসলমানগণের ইহাই চরম আদর্শ ও লক্ষ্য।

এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সকল মুসলমান সমাজ একীকৃত হইয়া যাইবে ইহা কোন চিন্তাশীল মুসলমানই ভাবেন না। দুনিয়ার মুসলমান নরনারী এক অখণ্ড মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রজা হইয়া পড়িবে—এই চিন্তা কোন পাগলের মনেও স্থান পাইতে পারে না। ধর্ম্মের ঐক্য থাকিলেই যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যও সৃষ্ট হইবে জগতে তাহার দৃষ্টান্ত একেবারে নাই। তাহা হইলে আধুনিক ইউরোপের সকল খ্রীষ্টান সমাজে রাষ্ট্রীয় ঐক্য থাকিত। তাহা হইলে লড়াই, মারামারি, কামড়া কামড়ি পাশ্চাত্য ইতিহাসে দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে ক্ষুদ্র ইউরোপ একটি মাত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিত। প্রাচীন হিন্দুস্থানেও স্বাধীনতার যুগে অখণ্ড মহাভারত অধিক কাল ব্যাপী ছিল না। ইউরোপের ন্যায় ভারতেও ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য রাজ্য এক সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবে বিরাজ করিত। খ্রীষ্টান এবং হিন্দু সমাজদ্বয়ের অবস্থা মুসলমান সমাজেও দেখা গিয়াছে। মুসলমানেরা কোন কালেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করেন নাই। তাঁহাদের গৌরব-যুগেও ভারতবর্ষ, আফ্গানিস্থান, পারশ্য, আরব, তুরস্ক, মিসর, মরক্কো, স্পেন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান-রাষ্ট্র বর্ত্তমান ছিল। বৃহদাকার মুসলমান সাম্রাজ্য অল্পকালের জন্য স্থায়ী হইত। এই সকল মুসলমান-রাজ্যে পরস্পর সংগ্রাম প্রায়ই চলিত। অধিকন্তু প্রত্যেক মুসলমান-রাষ্ট্রেই বিপ্লব, গৃহ-বিবাদ, রাজবংশের উত্থানপতন, সেনাপতিগণের অভ্যুত্থান নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা স্বরূপ ছিল। রাষ্ট্রীয়-জগতে নানাপ্রকার অনৈক্যই চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি।

প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য কোন ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মকর্ম্মের উপর নির্ভর করে না। ধর্ম্মের অনৈক্য থাকিলেও জনগনের ভিতর রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আবার ধর্ম্মের ঐক্য সত্ত্বেও জনগণ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিতে পারে।

সুতরাং চিন্তাশীল মুসলমানেরা সমগ্র মুসলমান সমাজের জন্য এক অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেন না। মুসলমানেরা যে যেখানে আছে সে সেই খানেই স্থানীয় অবস্থার উপযোগী মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মুসলমানের আদর্শ, মুসলমানের গৌরব, মুসলমানের সভ্যতা বিস্তার করুক—ইহাই মুসলমান জাগরণের অর্থ। এই জন্যই মুসলমানেরা প্রাচীন শিল্প, কারুকার্য্য ইত্যাদির প্রতি অনুরাগী হইতেছেন। আরবের সাহিত্য আলোচনায় তাঁহারা উৎসাহী হইতেছেন। প্রাচীন উৎকর্ষের পরিচয় পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায়ও যত্ন লইতেছেন। মুসলমানদিগের "জাতীয় শিক্ষা" প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ইস্লামের জন-নায়কগণ সর্ব্বত্র চেষ্টিত হইয়াছেন। মক্কা হইতে প্রাচীন আদর্শ এবং সংস্কার আমদানী করিবার জন্যও তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

যাঁহারা আধুনিক জগতে হিন্দু সভ্যতার প্রচার কল্পে চেষ্টিত হইয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে প্যান্-ইস্লাম আন্দোলনকারিদিগের সকল বিষয়েই ঐক্য ও সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি।

৬। প্যানামা-খালে ভারত প্রদর্শনী

আর সাত আট মাসের ভিতর প্যানামা-খালে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইবে। দুনিয়ার লোক এই প্রদর্শনীতে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য ও মহত্ত্বের পরিচয় স্বরূপ নানা বস্তু পাঠাইবেন। আধুনিক বিশ্বের সকল প্রকার শিল্প, কারুকার্য্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসায় এই কেন্দ্রে প্রদর্শিত হইবে। জগতের প্রাচীন নবীন সকল জাতিই এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে নিজ নিজ কৃতিত্বের নিদর্শন পাঠাইবেন। নানা-শ্রেণীর নানা পণ্ডিতগণের সম্মিলনও এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

আমরা ইতি পূর্ব্বে প্যানামা-খালের উল্লেখ দুই চারিবার করিয়াছি। ভারতবর্ষে এই খালের কথা শীঘ্রই বিশেষরূপে আলোচিত হইতে থাকিবে। প্যানামা-খালের প্রভাবে জগতের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। জগদ্বাসী সকলেই ইহার তথ্য জানিতে ব্যগ্র—ভারতবাসীও এ-সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন না।

সুখের কথা, আমাদের আমেরিকা-প্রবাসী বাঙ্গালী মারাঠী ও পঞ্জাবী ছাত্রগণও প্যানামা প্রদর্শনীতে ভারত-তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। এই বিরাট বিশ্বসভায় যাহাতে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের শিল্প, শিক্ষা ও সভ্যতার বিবরণ প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা ইঁহারা করিতেছেন। একটা ক্ষুদ্র ভারতীয় প্রদর্শনী এই জগৎ-সম্মিলনীর এক অংশে খোলা হইবে। এতদ্ব্যতীত, পুস্তিকা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, সম্মিলন ইত্যাদির দ্বারাও আমেরিকার এই বিশ্বসভায় ভারতবর্ষকে প্রচার করা হইবে। এই কার্য্যে প্রায় ১৫,০০০৲ টাকা খরচ হইবে। ভারত-বাসী জনগণ কি তাঁহাদের প্রবাসী কর্ম্মীদিগকে যথোচিত অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিবেন না? জগতের সভামণ্ডপে ভারত-বর্ষের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য আমাদের সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা যে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহারা সেই সেই বিষয়ে দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। ভারতের শিল্পী, শিক্ষক ও গ্রন্থকার-গণ তাঁহাদের নিজ নিজ কৃতিত্বের নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্য উদ্যোগী হউন। কলিকাতার "নব্য-চিত্র-কলা-সমিতি"কে আমরা বিশেষ ভাবে এ সম্বন্ধে উৎসাহী হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত চিত্রাবলী এবৎসর প্যারি-নগরের প্রদর্শনীতে সবিশেষ আদৃত হইয়াছে। তাহার পর লণ্ডনের "ভারতীয় সংগ্রহালয়" বিভাগে এই সমুদয় দেখান হওয়ায় বর্ত্তমান ভারতের প্রতি পাশ্চাত্যগণের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। আমেরিকার বিশ্ব-প্রদর্শনীতে এই গুলি পাঠান নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি!—

The Secretary.
"The Panama Pacific Exposition
Commission of India"
1844, Jackson Boulevard
Chicago, Illinois
(U. S. A.)

৭। ফরাসী কবি মিষ্ট্রাল

আর্লনগর মার্সেলের অতি সন্নিকটে। ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি মিষ্ট্রাল এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মারা

গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইনি ফরাসী দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের উপভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

এই অঞ্চল মধ্যযুগের ফরাসী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। প্রোভেন্স্যাল-রীতির রচনা কৌশল সমগ্র ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করিত। ইংরাজী সাহিত্যেও এই কাব্য-শিল্পের প্রভাব পড়িয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে, ইউরোপের মধ্যযুগে প্রেমসঙ্গীত, হৃদয়োচ্ছ্বাস, গীতিকাব্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি কাব্যের কয়েক বিভাগ প্রোভেন্স্যাল-রীতির নিয়মেই অনুপ্রাণিত হইত। ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলের নাম প্রোভেন্স। কবিগণ ট্রুবেডোর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রেম-দরবার, প্রেমের বিচারালয়, প্রেমের রাজা ইত্যাদি বিষয় এই ট্রুবেডোর গণের সাহিত্যে বিশেষ আলোচিত হইত।

অবশ্য সাহিত্যের সেই যুগ এবং সমাজের সেই অবস্থা ফ্রান্স ও ইউরোপ হইতে আজকাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবি মিষ্ট্রাল সেই রচনা-রীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের ভাষায় কাব্য না লিখিয়া এই জনপদের স্থানীয় ভাষাতেই গীতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি সুইডেনের বিদ্বৎ-পরিষৎ ইহাকে পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে। তিনি সেই প্রাচীন সাহিত্যাদর্শ দেশের ভিতর সংক্রামিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ স্থানীয় লোক-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য তিনি তাঁহার নোবেল পুরস্কারলব্ধ সমস্ত টাকা দান করিয়াছেন।

সেই অর্থে সম্প্রতি একটি মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই মিউজিয়ামে প্রাচীন প্রোভেন্স্যাল-রীতির সাহিত্য-বিষয়ক নানা পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথি, প্রাচীন লেখকগণের চিত্র, প্রাচীন প্রোভেন্স প্রদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিল্পব্যবসায়, প্রবাদ জনশ্রুতি ইত্যাদি এখানে এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজের অবস্থা বুঝিবার পক্ষে মিষ্ট্রাল-প্রবর্ত্তিত এই মিউজিয়াম সাহায্য করিবে।

মিষ্ট্রালের প্রোভেন্স্যাল-মিউজিয়ামের আদর্শের প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষেও স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন, পদ, বাউল ইত্যাদির প্রতি আজকাল সাহিত্যসেবিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, দেশের পুরাতন ধর্ম্মভাব, সামাজিক অবস্থা, শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদি বুঝিবার জন্য এই সমুদয় অত্যাবশ্যক।

সম্প্রতি একমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ হইতেই এইগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাস-কথাই এই সমুদয় লোক-সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপকরণহিসাবে এই সকল পদার্থ আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সম্মিলন, জাতীয় শিক্ষা-সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পদাবলী, বিয়ের গান, বাউল সঙ্গীত, গম্ভীরার গান, ভাটিয়াল গান, সারিগান, পল্লীপ্রবাদ, গাজন, জনগণের সংস্কার, মেয়েলি ছড়া ইত্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। সেইগুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিলে উচ্চ অঙ্গের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যও রচিত হইতে

পারে। প্রাচীন কাব্যের আলোচিত বিষয় এবং লোকমত ও ধর্ম্মবিশ্বাসগুলিকে বর্ত্তমান যুগের অবস্থানুসারে নূতন আকার দান করা যাইতে পারে। সুদক্ষ কবি, চিত্রকর ও ভাস্করেরা এই সমুদয় বস্তুর সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন নূতন আদর্শ সঞ্চারিত করিবার সুযোগ পাইবেন।

এই সকল কারণে আমাদের প্রাচীন 'লোক-সাহিত্য'-বিষয়ক স্বতন্ত্র সংগ্রহালয় এবং স্বতন্ত্র পরিষৎ দেশের নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮। স্থানীয় মিউজিয়াম

আজকালকার ফরাসীরা প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বস্তুসমূহ প্রায় প্রত্যেক নগরেই সংগৃহীত করেন। এজন্য প্রত্যেক নাতিক্ষুদ্র জনপদেই এক বা ততোধিক মিউজিয়াম নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহ বেশী দূরে চালান করা হয় না।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশে একটি মাত্র মিউজিয়াম আছে। প্রদেশবাসী জনসাধারণ এই সকল মিউজিয়াম দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রায়ই পায় না। বড় সহরের বিলাসভবনে প্রবেশ করিয়া কয়জন পল্লীবাসী কৌতূহল নিবারণ করিতে সাহস পায়? কিন্তু প্রত্যেক জেলায় ছোটখাট সংগ্রহালয় থাকিলে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, কেরাণী, হাকিম সকলের চোখের সম্মুখে দর্শনীয় বস্তুগুলি বিরাজ করে। মিউজিয়ামের আবহাওয়া জেলার মধ্যে জ্ঞানলাভের একটা নূতন উপায়স্বরূপ হয়। কথায় কথায়, বিশেষ কষ্ট কল্পনা না করিয়াও জনসাধারণ এই সকল মিউজিয়ামের অন্তর্গত দ্রব্যসমূহের সহিত পরিচিত হইয়া পড়ে। দেশবাসীকে স্বদেশের মূর্ত্তি বুঝাইবার পক্ষে আর কোন সহজ পথ অবলম্বন করা অসম্ভব।

তারপর যাঁহারা পাণ্ডিত্যের জন্য এই সকল বস্তু দর্শন করিতে চাহেন তাঁহারা জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্রদেশের বড় সংগ্রহালয়ে আসিলেই তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ সুযোগ পাইতে পারেন। সুতরাং অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে স্বদেশের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য ভারতবর্ষের ভিতর ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সংগ্রহালয়ের প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যত স্থানে যত বেশী কেন্দ্র স্থাপিত হয় সমস্ত জাতির ভিতর জ্ঞানবিস্তার করিবার সুবিধা তত বেশী সৃষ্ট হয়। দেশের মধ্যে কোন এক কেন্দ্র স্থানে একটা বিশাল কেন্দ্র স্থাপন করিলে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত উপকার লাভ করে না।

বিশেষতঃ বিশাল সংগ্রহ-কেন্দ্রে নানা-জেলার, নানাপ্রদেশের, নানাজাতির তথ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেগুলি দেখিয়া জনগণ বিশেষ উপকৃত হয় না। সে সমুদয় পদার্থ তাহার নিকট নিতান্তই অপরিচিত। কিন্তু যে জেলায় বা যে জনপদে লোকেরা বাস করে সেই স্থানের স্মরণযোগ্য পদার্থ নিকটবর্ত্তী কোন কেন্দ্রে জমা থাকিলে লোকেরা সহজেই সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিচিত সামগ্রীগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে ক্রমশঃ অপরিচিত ও দূরদেশীয় বস্তুসমূহ জানিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ জন্মে।

ফরাসীজাতি এই নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতেছেন এই জন্য তাঁহারা নগরে নগরে

মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ফলতঃ মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় ফরাসী জনগণের নিকট 'আজব খানা' বা যাদুঘর মাত্র নয়। তাহারা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়-জীবনের উৎসস্বরূপ বিবেচনা করে।

* *
*

৯। জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা

বিগত এপ্রিল-মে মাসে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-মণ্ডলে বিশেষ কতকগুলি স্মরণযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ফ্রান্সে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। প্যারিির জনগণ পঞ্চম জর্জ্জকে যৎপরোনাস্তি আদর করিয়াছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে বিলাতের বন্ধুত্ব বিগত দশ বৎসর হইতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ঘটনায় বন্ধুত্বের জের আরও চলিবে।

ইহার প্রায় ১৫।২০ দিনের ভিতরেই ডেন্মার্কের রাজা ও রাণী লণ্ডনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে ডেন্মার্কের বন্ধুতা বৃদ্ধিই ইহার উদ্দেশ্য। উভয় পক্ষের রাজবক্তৃতাতে এই সুর উঠিয়াছিল। সংবাদপত্রগুলিও একস্বরে এই বন্ধুত্বের কথা প্রচার করিতেছে। এখন জার্ম্মাণি ডেন্মার্ককে কাবু করিতে শীঘ্র পারিবেন না।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই লণ্ডনে আর একটা ধূম পড়িয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরাজ জাতির সন্ধি স্থাপিত হয়। বিগত মে মাসে তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই ঘটনা জগতে বিশেষরূপে প্রচার করিবার জন্য মহা সমারোহের সহিত একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তাহাতে আমেরিকান এবং ইংরাজ জাতীয় জনগণ কৃষি, শিল্প, চিত্র, ব্যবসায়, শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজ নিজ কৃতিত্বের নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুই জাতির মধ্যে সখ্যভাব স্থায়ী করিবার পক্ষে এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে। ইংরাজ সম্পাদকগণের এইরূপ মত।

এদিকে রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের আনাগোনা বেশ চলিতেছে। গত দুই তিন বৎসরের ভিতর দুই জাতির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লোকেরা পরস্পর পরস্পরের সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি দেখিয়া আসিয়াছেন। পারস্য-বিভ্রাট লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটা কমিতেছে। রুশিয়ার লোকেরা বিলাতী নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চ্চা করিতেছেন। বিলাতের লোকেরা ও রুশ অধ্যাপকগণ এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় একখানা ত্রৈমাসিক পত্রও বাহির করিয়াছেন। নাম Russian Review প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভিনগ্রেডফ Vinogradof এই পত্রিকার একজন ধুরন্ধর। ইনি বঙ্গদেশে পরিচিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

দেখিতেছি জগতের বড় বড় জাতিরা শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এখন গোলমাল আমেরিকার শিশুসভ্যতাকে লইয়া বাধিতেছে। মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি নবীন দেশেই অশান্তির কারণ বিরাজমান।

জগতে নূতন কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে না দেওয়াই ইংরাজ জাতি পছন্দ করিতেছেন। ইঁহারা সর্ব্বত্র শান্তি চাহেন—নূতন কোন প্রকার শক্তির উদ্ভব ইঁহারা জগতের পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচনা করিতেছেন। বিলাতের সংবাদপত্রগুলি সবই স্থিতি ও শান্তির প্রচারক।

***

১০। দিনাজপুরের ঐতিহাসিক পল্লী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত দিনাজপুর জেলার শিব-বাড়ী গ্রামের কাহিনী প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"দৈত্যকুলোজ্জ্বলকারী হরিভক্ত প্রহ্লাদের পুত্র বলি ও তদ্‌পুত্র দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী শিব-ভক্ত সহস্রবাহু বাণের রাজধানী শোণিতপুর অধুনা শিব-বাড়ী নামে খ্যাত।

শিববাড়ী দিনাজপুরের ১৪ মাইল দক্ষিণে নওবাজার দম্‌দমা গ্রামের নিকটবর্ত্তী। অদ্যাপি এই স্থানে বাণের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভগ্নাবশেষগুলি, অত্যুন্নত ও সৌন্দর্য্যশালী হইয়া অমরাবতীকে উপহাস করিতেছিল, ইদানিং নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্রক পশুগণের আবাস ভূমি হইয়াছে। কেবল মন্দির মধ্যে অনাদিনাথের বাণলিঙ্গ মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখনও যথা বিধানে পূজা অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন।

ধ্যান।

"প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসার দহন ক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং॥

প্রণাম।

বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধরায় দারিদ্রদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥

গায়ত্রী।

তৎপুরুষায়বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রপ্রচোদয়াৎ॥"

এই শিববাড়ীর অনতিদূরে গড় পরিমাণ ফল ৪ বর্গ মাইল; গড়ের প্রাচীর ভগ্নাবস্থায় ৫।৬ ফিট উচ্চ রহিয়াছে। গড়ের বহির্ভাগ ৬০ ফিট বিস্তৃত পরিখায় পরিবেষ্টিত। কোন কোন স্থানে অগাধ জল, কোন কোন স্থানে ১ হাঁটু, আবার কোন কোন স্থান একেবারে শুষ্ক অবস্থায় আছে। গড়ের মধ্য স্থান বংশ বনে পরিপূর্ণ, পরিখাটী জলদ উদ্ভিদে আচ্ছন্ন। এই স্থানে এক কালে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, শুনিলে হৃদয় কম্পিত হয়। যে বাণ শিবের বর প্রভাবে অমরত্ব লাভ করতঃ ত্রিজগৎ কম্পিত করিয়াছিলেন, যে বাণের প্রতাপে দেব, দৈত্য, যক্ষঃ, রক্ষঃ, নর, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই সশঙ্কিত, যে বান নিজ ভক্তি বলে অসংখ্য অসংখ্য যোদ্ধৃবর্গের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, যে বাণপুরী অসংখ্য সেনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিত, আজ সেই বাণপুরীর অবস্থা এইরূপ,—অতীত ঘটনা স্মরণ করিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ না হয়।

দৈত্যপতি বাণ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি সঙ্গীত দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া অমরত্ব ও পুত্রত্বলাভ করিয়াছিলেন, দেবাদিদেব শঙ্কর ইঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, বাণ শিবের অনুমত্যানুসারে শোণিত পুরে (বর্ত্তমান শিববাড়ী) রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বাণ ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, দেবগণ ইঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে বাণের কন্যা উষা স্বপ্নে কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎ প্রতি আসক্তা হইয়া প্রিয় সখী চিত্রলেখার সহায়তায় অনিরুদ্ধকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সহিত গন্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হয়। ক্রমে বাণ

সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি অনিরুদ্ধের প্রাণ বিনাশের আদেশ প্রদান করিলেন, অনিরুদ্ধ সমস্ত দৈত্য সেনা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন বাণ স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হওতঃ মায়া যুদ্ধে অনিরুদ্ধকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন। অনন্তর বাণ তাঁহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইলে, স্বয়ং ভগবতী অনিরুদ্ধকে মশানে ক্রোড়ে লইয়া জীবন রক্ষা করিলেন, এবং ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড, বাণকে তৎকার্য্যে নিবারণ করিলেন, বাণ মন্ত্রীর বাক্য রক্ষা করিয়া, অনিরুদ্ধকে কারাগারে বন্দী রাখিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নারদ প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া বলরাম ও প্রদ্যুম্নাদি সমভিব্যাহারে শোনিতপুরে সমাগত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, স্বয়ং মহাদেব, শিবজ্বর, নন্দীও ভূত প্রেত সহ বাণের সাহায্যার্থে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, তথাপি বাণ স্বদলবলে পরাজিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের অনুরোধে বাণের প্রাণ বিনাশ না করিয়া, সহস্র বাহুমধ্যে ৯৯৮ বাহু রাখিয়া বাণরূপ সর্পকে বিষ হীন ভুজঙ্গ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, বাণ জীবিতাবস্থাতেই মহাকাল নামে খ্যাত হইয়া, শিবের পারিষদ্ মধ্যে পরিগণিত হইলেন, শোনিতপুর সহ দৈত্য রাজ্য ধার্ম্মিক প্রবর কুম্ভাণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব ও মন্ত্রী সকলে একত্র হইয়া শোনিতপুরের অনতিদূরে, বাণের ৯৯৮ বাহু দাহন করিলেন। অদ্যাপি সেই স্থানটী "করদাহ" নামে খ্যাত।

এই শিববাড়ীতে বহুদিন হইল একটী ঘটনা হইয়াছিল। জনৈক বিক্রমপুর নিবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া, রাস্তা ধরিয়া দিনাজপুরাভিমুখে যাইতেছিলেন, পথি-মধ্যে রাত্রি হওয়ায় শিববাড়ীতে জনশূন্য বাণপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অধিক রাত্রি হইলে, নির্জ্জন বাণপুরী জন কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল তন্মধ্যে কেহ দ্বারবান, কেহ কর্ম্মচারী, কেহ মন্ত্রী এবং কতকগুলি পদাতিক দল; ব্রাহ্মণ সহসা এইরূপ ব্যাপার দৃষ্টে ভয়ে স্তম্ভিত হইলেন, এবং বাকশূন্য হইয়া তাহাদের কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্ত্রী স্বয়ং আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ সহসা দণ্ডায়মান হইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নিবাস কোথায়? তুমি কি জাতি এবং কি জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ? তোমার কোন ভয় নাই, আমি মন্ত্রী নিঃশঙ্কচিত্তে, তোমার মনভাব প্রকাশ কর। মন্ত্রীর আশ্বাসবাণী শ্রবণে ব্রাহ্মণের ভয় কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইল এবং আপনার অবস্থাও জাতির বিষয় যথাযথরূপে বলিলেন, পরে মন্ত্রীর নিকট কন্যাদায়গ্রস্ত বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। মন্ত্রী বলিল, দেখ, ব্রাহ্মণ এসব সম্পত্তি আমাদের নহে, ইহার এক কপর্দ্দকও কাহাকে দান করিতে পারিব না, ইহা দিনাজপুরনিবাসী বর্ত্তমান রাজা গোবিন্দনাথের সম্পত্তি। তিনি বাণ রাজার বংশধর গোবিন্দনাথরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কেবল সম্পত্তি রক্ষক। তিনিই যদ্যপি আপনাকে দান করিতে পারেন তবেই পাইতে পারেন নচেৎ আমাদের ক্ষমতা নাই, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দিনাজপুরের মহারাজার নিকট যান। আর তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন যে আপনার অজস্র সম্পত্তি আছে আপনি রাত্রিযোগে শোণিতপুরে বাণরাজার গড়ের ভিতর গেলেই ধনরত্ন এবং সমস্ত বিবরণ অবগত হইবেন।

আর ইহাও বলিয়া দিবেন যে আপনার সম্পত্তি রক্ষকেরা বহুদিন যাবৎ সম্পত্তি রক্ষা করিল, এখন তাহারা সম্পত্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহে। এমন কি যদ্যপি আপনিই অনুগ্রহ করিয়া এইস্থানে মহারাজকে লইয়া আসেন তবে সর্ব্বোত্তম, ইহাতে আপনারও লভ্য হইবে এবং মহারাজ ও আপন সম্পত্তি বুঝিয়া পাইবেন। কিন্তু নিশা ভিন্ন দিবসে আমাদের সাক্ষাৎ পাইবেন না, অতএব রাত্রিতেই তাঁহাকে আসিতে বলিবেন।

এতদ্‌শ্রবণে ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সমস্ত রাত্রি বাণপুরীতেই কাটাইলেন। প্রাতঃকালে আবার বাণপুরী জন শূন্য হইল। রাত্রির ঘটনাগুলি স্বপ্নবৎ মনে ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ দিনাজপুরাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি দিনাজপুর পৌছিয়া মহারাজ গোবিন্দনাথের সহিত সাক্ষাৎ লাভকরতঃ বাণপুরীর সমস্ত ঘটনাগুলি যথাযথভাবে বর্ণনা করিলেন। রাজা অত্যাশ্চর্য্য হইয়া ব্রাহ্মণের যথারীতি সেবা শুশ্রূষান্তে বহুশকট ও হস্তি-সহ ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন। নিশাযোগে বাণ পুরীতে প্রবেশ করতঃ—ব্রাহ্মণের কথানুযায়ী সমস্ত ঘটনাই প্রকৃত জানিতে পারিলেন। মহারাজ ঐ বাণ-পুরীস্থ মন্ত্রী ও আর আর যোদ্ধৃবর্গ কর্ত্তৃক সম্মান ও সম্পত্তি লাভ করতঃ দিনাজপুর যাইতে উদ্যত হইলে মন্ত্রী করযোড়ে রাজাকে বলিল, মহারাজ আজ হইতে আমরা নিষ্কৃতি-লাভ করিলাম, এইজন মানবশূন্য বাণপুরীতে, এক মাত্র অনাদিনাথ বাণলিঙ্গ মুর্ত্তিটীই মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিল, অদ্য হইতে আপনার হস্তে ইঁহার যথারীতি পূজার্চ্চনার ভার অর্পিত হইল, আশা করি যথা বিধানেই পূজার্চ্চনা হইতে থাকিবে। ইহা আপনারই বংশধর মহারাজ বাণের স্থাপিত সাধনের ধন, এই কথা বলিয়া মন্ত্রী, যাবতীয় বাণপুরী রক্ষক সহ কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল। মহারাজ ধনাদি ও ব্রাহ্মণসহ দিনাজপুরে আগমন করত ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট মুদ্রা প্রদান করিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ গোবিন্দনাথ প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। এই কাহিনীগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা, আশা করি, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিবেন।"

১১। বিলাত যাত্রা

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'গৃহস্থে' পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিত 'বিলাত-যাত্রা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ বাঙ্গালার মনীষি ও চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্তঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উহার উপযোগীতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সার্থক আমি মাঘের 'গৃহস্থে' 'সমুদ্র-যাত্রা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ 'ব্রাহ্মণ-সমাজে' প্রকাশ করেন, সেই প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসী'তে এবং চৈত্রের 'গৃহস্থে' পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে স্বয়ং পঞ্চানন বক্তা—বেদব্যাস, আর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ গজানন—সে কথা যাউক। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'গৃহস্থে' পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় 'বিলাত-যাত্রা শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,

তাহা তাঁহারই উপযুক্ত এবং সময়ের উপযোগী।

এমন সতেজ, সুন্দর, সহজ ভাষায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ লিখিলে আমাদের বঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তাঁহার লেখার ভঙ্গীও বড় সুন্দর আর শ্লেষগুলিও বেশ পরিস্ফুট। এইরূপ করিয়া আমাদের সামাজিক কথার যদি বিচার চলে, তাহা হইলে অচিরাৎ অনেক সমস্যার মীমাংসা হইবে। আমরা ব্রাহ্মণ-সমবায় বা ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী বুঝি না, সম্মিলনী বা সমবায় একেবারে ইউরোপীয় জিনিষ—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হাজার ধুরন্ধর হইলেও সমবায়ের বোঝা স্কন্ধে লইতে পারিবেন না; কেবল হাস্যাস্পদ হইবেন। সাময়িক পত্রে লেখাও কতকটা ইউরোপীয় জিনিষ বটে, কিন্তু তাহা আমরা ভারতীয় করিয়া লইয়াছি।

আমরা পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করি, তিনি "অদ্য এইখানেই শেষ" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। কল্য যেন আমরা কিছু পাই। কেন না, তিনি যে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আরও অনেক কথা তাঁহার বলিবার আছে নিশ্চয়। আমরা কথাটা উত্থাপন করিয়া "সার্থক" হইয়াছি বলিয়াছি; এখন তিনি উত্থাপিত কথার সমগ্র আলোচনা শেষ করিয়া আমাদের কৃত-কৃতার্থ করুন ইহাই ভিক্ষা।"

* *

১২। বৈষ্ণব সমাজের কেদারনাথ

বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি মহাত্মা কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গত। তাঁহার অভাবে বৈষ্ণব সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এক সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

"নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর উলা নামক গ্রামে ১৭৬০ শকাব্দে ১৮ই ভাদ্র তারিখে কলিকাতা হাটখোলার দত্ত বংশীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক কলিকাতায় তদীয় মাতৃস্বসাপতি বিখ্যাত ইংরাজী লেখক ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়া তদানিন্তন হিন্দু কলেজে সিনিয়র প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তাহার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত টি, পালিত ও ৺কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি।

* * * *

তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত. ইংরাজী, পার্শী, বাঙ্গালা, উর্দ্দু ও উড়িয়া ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার ছিল। এই সকল ভাষায় তদীয় বর্ণিত গ্রন্থাবলীই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাঁহার উচ্চতম আদর্শজীবন বাস্তবিকই অতুলনীয়। নৈতিক ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি, বিচারপূর্ণ দর্শনশাস্ত্রসমূহ ও পরিশেষে শ্রীচৈতন্যদেব প্রদর্শিত ভক্তিমার্গ তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজের উন্নতিবিধানকল্পে তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী উদ্যম পরিলক্ষিত হয়।

১৮৯১ খৃঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে ভারতব্যাপী বিশেষতঃ বঙ্গদেশের নানা স্থানে

প্রচার কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শণ কল্পে স্বয়ং ব্রতী হন।

বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রশস্তিকল্পে তিনি ১৮৮০ খৃঃ প্রথম সাময়িক বৈষ্ণব পত্র "সজ্জন তোষনী" প্রচার আরম্ভ করেন। অমৃত বাজার পত্রিকার ৺শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি তাঁহারই উৎসাহ বলে শ্রীগৌর কথা দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া তাঁহার উদ্দেশের আংশিক সহায়তা করেন। বস্তুতঃ এই মহাত্মার আন্তরিক চেষ্টা ফলে বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আদর করিতে শিখিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালের নবদ্বীপ নগর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ায় নবদ্বীপের অপর পারস্থিত কুলিয়া গ্রামকে অনেকেই ভ্রম বশতঃ নবদ্বীপ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু এই মহাত্মার অধ্যবসায়বলে বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ ও শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজ শ্রীধাম মায়াপুরকেই প্রকৃত প্রাচীন নবদ্বীপ নগর বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। ইঁহারই অনির্ব্বচনীয় চেষ্টায় তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটায় তদীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও দৈনন্দিন সেবা সাধিত হইতেছে।

তাঁহার অলৌকিক সরলতা, ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রীতি, ভগবদ্বিষয়ক সূক্ষ্ম দার্শনিক অনুভূতি, শ্রীগৌর পার্ষদবর্গের অকৃত্রিম দাস্য, নিজ প্রতিষ্ঠায় ঔদাসীন্য, কৃষ্ণ সেবা বিষয়ে স্বতঃ পরতঃ পূর্ণ বিশ্বাস, কৃষ্ণেতর অনুশীলনের অকর্ম্মণ্যতা ও কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত অপর সঙ্গ রাহিত্য তাঁহার জীবনের প্রতি অনুষ্ঠানেই জাজ্জ্বল্যমান ছিল।

এই মহাত্মার দ্বারা গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব জগৎ যে কি পরিমাণ প্রকৃত লাভবান হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকটই গভীর গবেষণার বিষয়।"

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর *

পঞ্চম অধ্যায়

'যুক্ত-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার যুগ

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আমার ৮৯ বৎসর বয়সে আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে সন্ধি হয়। তাহার ফলে গোলামের জাতিকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত দুই প্রান্তের শ্বেতকায় মহলে নানা বিষয়ে বুঝাপড়া চলিতে লাগিল। রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে দুই অঞ্চলের লোকেরা মিলিয়া একটা রফা করিয়া লইলেন। যথার্থ ঐক্যবিশিষ্ট যুক্ত-রাষ্ট্র এই সময়ের মধ্যেই গড়িয়া উঠে। এই ১০।১১ বৎসর আমার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষেও অতি মূল্যবান্ সময়। কারণ এই সময়ের মধ্যে আমি আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া মানুষ হইবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। গোলামাবাদের আবহাওয়া ছাড়িয়া নব নব দুঃখ দারিদ্র্যের সংসারে বাড়িয়া উঠিয়াছি। হাম্পটনে লেখা পড়া শিখিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাহার পরে ম্যালডেনে পরোপকার ও শিক্ষাপ্রচার কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি।

এই যুগ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোজাতির ইতিহাসেও স্মরণীয় কাল। ইহাকে তাহাদের নবজীবনের শৈশব কাল বলিতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ে নব নব আশা জাগিয়াছে তাহারা নূতন চোখে পৃথিবী দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের চিত্তে প্রথম হইতেই দুইটি ইচ্ছা স্থায়ী ঘর করিয়া বসিল। প্রথমতঃ গ্রীক ও ল্যাটিন শিখিবার জন্য তাহারা অত্যধিক লালায়িত হইল। দ্বিতীয়তঃ লেখাপড়া শিখিয়া সরকারের চাকরী পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলাই বাহুল্য, যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহারা গোলামী করিয়াছে তাহাদের পক্ষে বিদ্যালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা সহজ নয়। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামেই অবশ্য অসংখ্য পাঠশালা খোলা হইতে লাগিল। দিবা-বিদ্যালয়, নৈশ-বিদ্যালয়, রবিবারের বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যালয়ে নিগ্রোসমাজ ভরিয়া গেল। স্কুলগুলি ছাত্র ছাত্রীতে পূর্ণ থাকিত। ৬০।৭০।৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধেরাও লেখাপড়া শিখিতে ছাড়িল না। শিক্ষা লাভের জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে নিগ্রোমাত্রেই ভাবিতে লাগিল যে, আর তাহাদের হাতে পায়ে খাটিতে হইবে না, লেখা পড়া শিখিয়া তাহারা আফিসের কেরাণী অথবা বড় সাহেব হইতে পারিবে। মাথায় তাহাদের আর একটা খেয়াল ঢুকিল যে, গ্রীক ল্যাটিন ভাষায় দুই চারিটা বুক্‌নি না দিতে পারিলে পণ্ডিত হওয়া যায় না। এই সকল ভাষায় যাহারা কথা বলিতে পারে, তাহারা না জানি কোন্ অপূর্ব্ব জগতের লোক! এমন কি, আমারও এইরূপই অনেক সময়ে মনে হইত।

* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের 'আত্মজীবনচরিত' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

লেখা পড়া শিখিয়া আমার স্বজাতিরা কেহ শিক্ষক কেহ ধর্ম্মপ্রচারক হইতে লাগিলেন। কৃষিকর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসায়, পশুপালন ইত্যাদি কার্য্যে মজুরের ন্যায় খাটিতে হয়। সুতরাং যথাসম্ভব সকলেই এই সকল কার্য্য বর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইল। বিদ্যাদানকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে অবশ্য খুব কম লোকই পারিত। প্রকৃত ভক্তভাবে ধর্ম্মগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহারা সহজে বিনা পরিশ্রমে বাবুগিরি করিয়া জীবন কাটাইবার জন্যই এই দুই দিকে ঝুঁকিয়া ছিল। যাহারা পণ্ডিতী করিতে চাহিত তাহাদের পেটে অনেক সময়ে তিল মাত্র বিদ্যা থাকিত কি না সন্দেহ। কেহ কেহ কোন উপায়ে নাম সহি করিতে শিখিয়াই মাষ্টারী খুঁজিত। আমার মনে আছে একবার এক ব্যক্তি একটা পাঠশালার চাকরী চাহিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "বল ত পৃথিবীর আকার কিরূপ? তুমি ছেলেদিগকে এ বিষয় কিরূপে বুঝাইবে?" সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "কেন মহাশয়, পৃথিবী গোলাকার বা চ্যাপ্টা এ সব জানিয়া আমার প্রয়োজন কি? স্কুলের কর্ত্তাদের ও সম্বন্ধে যাহা মত আমি তাহাই ছাত্রদিগকে শিখাইতে প্রস্তুত আছি।"

এই গেল গুরুমহাশয়দিগের অবস্থা। ধর্ম্মপ্রচারকগণের অবস্থা আরও শোচনীয়। অত নিরেট মূর্খ ও কুসংস্কারপূর্ণ এবং চরিত্রহীন লোক বোধ হয় অন্য কোন ব্যবসায়ে দেখা যায় না। যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক সকলেই মনে করিত, "আমি ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।" ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে "আদেশ" বহু লোকেই পাইতে লাগিল! দুই তিন দিন স্কুলে আসিবার পর দেখিতাম ছাত্রেরা চলিয়া যাইতেছে। অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইত—তাহারা 'আদেশ' পাইয়া ধর্ম্মগুরুর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। এই 'আদেশ' পাওয়া ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক। গির্জাঘরে লোকজন বসিয়া আছে এমন সময়ে একব্যক্তি হঠাৎ মেজের উপর পড়িয়া যাইত। বহুক্ষণ নিস্পন্দ অসাড় ও বাকৃশক্তিহীন অবস্থায় থাকিত। অমনি পাড়ায় সাড়া পড়িয়া যাইত, অমুক ব্যক্তির 'আদেশ' হইয়াছে। তাহার পর হইতেই সে ধর্ম্মগুরু! এইরূপ 'দশায়' পড়া প্রায় প্রত্যেক নিগ্রো-পল্লীতে প্রতি সপ্তাহেই দুই চারিটা ঘটিত। আমি এই 'দশায়' পড়া ব্যাপারটাকে বুজরুকি মনে করিতাম। আমার ভয় হইত পাছে আমিও বা কোন দিন দশায় পড়িয়া ভগবানের আদেশ পাইয়া বসি। আমার সৌভাগ্য আমি সেরূপ আদেশ পাইবার অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছি।

সমাজে ধর্ম্মগুরুর সংখ্যা যারপর নাই বাড়িতে থাকিল। একটা ধর্ম্মমন্দিরের কথা আমার মনে আছে—তাহার অন্তর্গত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক সংখ্যাই ছিল সর্ব্বসমেত ২০০ জন মাত্র। অথচ তাহার ধর্ম্মপ্রচারক সংখ্যাই প্রায় ২০। আজকাল নিগ্রো সমাজে ধর্ম্মের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ জাতি যথেষ্ট নৈতিক শক্তি লাভ করিতেছে। দশায় পড়া এবং আদেশ পাওয়ার হুজুগ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আর ৩০।৪০ বৎসর পরে আমাদের আরও উন্নতি হইবে আশা করিতেছি।

এখন ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবসায়ে না লাগিয়া কৃষিকার্য্যে শিল্পকর্ম্মে ও পশুপালনে নিগ্রোরা মনোনিবেশ করিতে উৎসাহী হইতেছে। ইহা

সুলক্ষণ। প্রকৃত চরিত্রবান্ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শিক্ষক-সমাজেও যোগ্য শিক্ষাপ্রচারকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৬৭ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত উত্তরে দক্ষিণে এক হইয়া জমাট বাঁধিতেছিল—প্রকৃত যুক্ত-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিচার-বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নাম "ফেডারেল সরকার" বা 'যুক্ত দরবার'। এই যুক্ত দরবারের নায়কতায়ই আমেরিকার গৃহবিবাদ শীঘ্র শীঘ্র ঘুচিয়া গিয়াছে। এই ফেডারেল সরকারের চেষ্টায়ই গোলামের জাতি স্বাধীনতা পাইয়াছে। এই ফেডারেল সরকারই এখন যুক্ত-রাষ্ট্রের নূতন শাসন-প্রণালী, নূতন বিচারপ্রণালী, ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া নবীন রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ উদ্যোগী।

সুতরাং নিগ্রোরা এই যুক্ত দরবারের নিকট সকল অভাব-অভিযোগের মীমাংসা আশা করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিত যে, ২০০ বৎসর নিগ্রোজাতি গোলামী করিয়া আমেরিকার ধনসম্পদবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। গোলামগণের রক্তেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় বল সকলই পরিপুষ্ট হইয়াছে। নিগ্রোজাতিই যুক্তরাজ্যের সকল-প্রকার ঐশ্বর্য্য, সকলপ্রকার সুখভোগ, সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠা লাভের মূল কারণ। নিগ্রোজাতিকে কেনা গোলাম করিয়া না রাখিলে আমেরিকার সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারিত না। আজ তাহারা নিগ্রোজাতিকে স্বাধীনতা দিয়াছে সত্য। কিন্তু ইহা নিগ্রো-জাতির দুইশতবর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রম স্বীকারের মূল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এখনও তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনেক দাবী করিতে অধিকারী। কেবল আব্দার মাত্র নয়, জননীর নিকট বালকের ক্রন্দন ও প্রার্থনা মাত্র নয়, প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাওয়া নয়, নিগ্রোজাতি যুক্তদরবারের নিকট তাহাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী করিতেছে—তাহারা এইরূপই ভাবিত। আমিও অনেক সময়ে ভাবিয়াছি—যুক্তদরবার আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন? আমাদের প্রতি এই দরবারের কর্ত্তব্য, ইয়াঙ্কিজাতির কর্ত্তব্য, সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের কর্ত্তব্য এই টুকতেই কি শেষ হইয়া গেল—এই সামান্য কর্ম্মেই কি তাহারা আমাদের ঋণ শোধ করিয়া ফেলিল? আমি ভাবিতাম, যুক্তদরবারের আমাদিগকে স্বাধীন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এজন্য আমাদিগের সমাজে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করাও তাহার কর্ত্তব্য ছিল।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিচারাদি কার্য্য দুই দরবারে নিষ্পন্ন হয়। কতকগুলি কার্য্য প্রত্যেক প্রদেশের দরবারেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রের দরবারগুলি ঐ সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। আর কতকগুলি কার্য্য আছে যাহার উপর প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাত নাই, সে গুলিকে প্রাদেশিক দরবার নিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী। এই সব কার্য্য-গুলিকে আমেরিকায় 'জাতীয়' বা 'সার্ব্ব-প্রাদেশিক' নামে চিহ্নিত করা আছে। এই সমুদয় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার 'ফেডারেল সরকার' বা যুক্তদরবারের উপর ন্যস্ত। যুক্ত-দরবার প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলির মত লইয়া

একটা নূতন বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ব্যবস্থাকে "জাতীয়" বিধান বলা হইয়া থাকে।

আমি বলিতে চাহি নিগ্রোসমস্যা আমেরিকার অন্যতম "জাতীয়" সমস্যা—প্রাদেশিক-সমস্যা মাত্র নহে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাতে নিগ্রোজাতির ভাগ্য রাখিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিগ্রোজাতি এত দিন যে পরিশ্রম করিয়াছে তাহার ফলে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতিই লাভবান্ হইয়াছেন--আমেরিকার সকল প্রদেশেই তাহার সুফল ফলিয়াছে। সুতরাং নিগ্রোজাতিকে মানুষ করিবার জন্য প্রাদেশিক দরবারগুলিকে উপদেশ দিয়াই যুক্তদরবারের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় নাই। প্রাদেশিক দরবার গুলি আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন করুন। কিন্তু আমেরিকার 'জাতীয় বিধান' হইতেও আমরা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অনেক আশা করিতে পারি।

যুক্তদরবার আমাদিগের স্থাবর সম্পত্তি লাভ সম্বন্ধে সাহায্য করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদের শিক্ষার জন্য "জাতীয়" কোষাগার হইতে বার্ষিক কিছু প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকারভোগের জন্য যথাবিধি উপযুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার সাদা কাল চামড়ার প্রভেদ ধীরে ধীরে তুলিয়া দিবার জন্য অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবার পরক্ষণ হইতেই এই সকল সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রে উঠিবে তাহা ফেডারেল সরকারের জানা উচিত ছিল। তাহা জানিয়া প্রথম হইতেই আমাদিগের ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু কর্ম্ম করাও উচিত ছিল। কিন্তু যুক্ত দরবার বেশী কিছু করিলেন না।

আমার স্বজাতিরা অবশ্য আশা করিতে ছাড়িল না। আমরা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট যাহাই পাই না কেন, যুক্ত-দরবারের নিকটও আমরা সকল বিষয়েই সুবিচার এবং ন্যায়সঙ্গত অনুশাসন আশা করিতে লাগিলাম। আমার বয়স তখন বেশী নয়—প্রায় ২০।২১ বৎসর হইয়াছে। তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে যে নূতন "জাতীয় বিধান" প্রস্তুত করা হইতেছে তাহাতে নিগ্রোজাতি সম্বন্ধে ন্যায্য বিচার করা হয় নাই। নিগ্রোসমস্যা কর্ত্তৃপক্ষেরা যথাযথ বুঝিতে পারেন নাই অথবা পারিয়াও তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নাই।

সহজে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমরা অশিক্ষিত এই আপত্তি তুলিয়া তাঁহারা সকল কাজকর্ম্মে আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতেন। দ্বিতীয়তঃ উত্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গেরা দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গদিগকে অপমান ও যন্ত্রণা দিবার জন্য তাহাদের উপর 'কাল আদমী' চাপাইতে চেষ্টা করিত। আমি দেখিলাম দুই দিকেই অন্যায় হইতেছে। আমি বুঝিলাম এ ব্যবস্থা বেশীদিন টিকিবে না। শীঘ্রই উহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

জোর করিয়া আমাদিগকে দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গমহলে কর্ত্তামি করিতে দিলে আমাদের বর্ত্তমান অহঙ্কার বাড়িতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে আমাদের সমূহ ক্ষতি। কারণ এই লোভে পড়িয়া আমরা আমাদের যথার্থ উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে পারি আশঙ্কা আছে।

কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে লাভবান্ হইয়া সম্পত্তির মালিক না হইলে কখনও কি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করা যায়? না রাষ্ট্রজীবনে

প্রভাব বিস্তার করা যায়? টাকা পয়সা গৃহ-সম্পত্তি ইত্যাদির অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করাই তখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল। অধিকন্তু লেখা পড়া না শিখিলেই বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিব কি করিয়া? রাষ্ট্রজীবনের জন্য দায়িত্ববোধ পুষ্ট করিবার পক্ষে বিদ্যালাভই প্রধান সহায়। সুতরাং শিক্ষালাভ ও সম্পত্তিলাভ এই দুই দিকে মন না দিয়া আমরা যদি হুজুগে পড়িয়া দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গসমাজে বড় বড় চাকরী করিতে থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হইত আমি ইহা বেশ বুঝিতাম। এই জন্যই উত্তর অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদিগের মেজাজ দেখিয়া আমি একেবারেই খুসী হই নাই। আর আমার মনে বেশ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিগ্রো-জাতিকে যে অস্বাভাবিক ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা কোনমতেই টিকিতে পারে না।

তাহার উপর, আমাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার দোহাই দিয়া যুক্তরাষ্ট্র আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাই কি চিরকাল টিকিতে পারে? আমি বুঝিয়াছিলাম তাঁহাদের এই 'অছিলা' শীঘ্রই ঘুচিয়া যাইবে। আমরা বেশী দিন অজ্ঞ থাকিব না। আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া লইতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন।

আমি ত আমাদের ভবিষ্যতের স্থায়ী মঙ্গলের কথাই ভাবিতাম। কিন্তু নিগ্রো সমাজের সাধারণজনগণ ত অত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। তাহারা শিল্প, শিক্ষা, কৃষি সম্পত্তি ইত্যাদি ভুলিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকেই বেশী ঝুঁকিল। অতি সামান্য মাত্র বিদ্যা লইয়াই নিগ্রোরা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের পাণ্ডা হইতে লাগিলেন। কত নিগ্রোই যে এইরূপে প্রাদেশিক দরবারের মন্ত্রণাসভায় ঢুকিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও একবার এই হুজুগে পড়িবার মত হইয়াছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া সামলাইয়া লইয়াছি।

রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সমাজে বেশ সাময়িক নাম করা যায়। কিছুকাল হৈচৈ গণ্ডগোল হুজুগ আন্দোলন লাফালাফি ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করা যায়। দলপতি, জননায়ক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৌরব ও অহঙ্কার করা চলে। কিন্তু দেশের মাটির ভিতর জাতীয় উন্নতির বীজ বপন করিবার জন্য ওরূপ হুজুগে মাতিলে চলে না। স্থিরভাবে, সহিষ্ণুভাবে, দৃঢ়ভাবে লোকচরিত্র ও লোকমত, গঠন করা আবশ্যক। জনগণের বিদ্যাবুদ্ধি মার্জ্জিত করা প্রয়োজন—তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন—তাহাদিগকে স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ দিয়া নানা উপায়ে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। তাহার উপর স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের ভিত্তি স্বরূপ কৃষিবাণিজ্য ইত্যাদি সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে নীরবে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কঠিন সাধনায় ব্রতী না হইয়া লোকেরা তরলমতি শিশুর ন্যায় রাষ্ট্র-নৈতিক হুজুগে যোগ দিতেই বেশী ভালবাসে। আমার নিগ্রোসমাজেও প্রথম প্রথম এইরূপ ঘটিয়াছে

আমার স্বজাতিরা দলে দলে রাষ্ট্র-জীবনে প্রবেশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবশ্য বেশ যোগ্যতার সহিতই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম

করিতে পারিলেন। মন্ত্রণা সভায়, বিচারালয়ে, শাসনকর্ম্মে নিগ্রোরা অনেকেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গলদই বেশী বাহির হইত। অনেক ত্রুটি, অনেক অসম্পূর্ণতা আমাদের নিগ্রো কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দেখা যাইত। আজকাল সে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন আমরা নিতান্তই অজ্ঞ ও মূর্খের ন্যায় কার্য্য করি না। বিগত ৩০ বৎসরের শিক্ষার ফলে, অভ্যাসের ফলে এবং অভিজ্ঞতার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ রাষ্ট্রকর্ম্মে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যই অর্জ্জন করিয়াছে একথা বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করি না।

আজ আমি বলিতে পারি যে সাদা ও কাল চামড়ার প্রভেদ এখন পূর্ব্বের ন্যায় রক্ষিত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। যোগ্যতানুসারে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যে কর্ত্তব্য বিভাগ করা হউক, এবং সম্মান লাভের সুযোগগুলিও বিকিরণ করা হউক। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে সকল কর্ম্মের অধিকার প্রদান করা হউক। নিগ্রোকে আর সকল বিষয়ে চাপিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রাদেশিক রাষ্ট্রেই যথার্থ ন্যায়সঙ্গত আইন প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। যদি শীঘ্র শীঘ্রই নূতন যুক্তিসঙ্গত বিধান প্রস্তুত করা না হয় নিগ্রোদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলা হইবে। আমি বলিতেছি—নিগ্রোরা আর সহ্য করিবে না শ্বেতাঙ্গ সমাজেরও অমঙ্গল হইবে—যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে দাসত্ব প্রথা যেমন আমেরিকার প্রধান পাপ ছিল, আজ অবিচার, অন্যায় আইন, সাদাকাল চামড়াভেদে রাষ্ট্রীয় অধিকার-বিতরণ ইত্যাদিও আমেরিকার রাষ্ট্র-জীবনের ঠিক সেইরূপ গর্হিত ও পাপপূর্ণ লক্ষণ। পক্ষপাতশূন্য অনুশাসন প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক এই পাপ দূর করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত আমি ম্যাল্‌ডেনে শিক্ষকতার কর্ম্ম করিলাম। এই দুই বৎসরে আমি আমার দুই ভাইকে এবং আরও কয়েকজন বালক ও বালিকাকে অনেকটা তৈয়ারী করিয়া লইলাম। ইহারা ইতিমধ্যে হ্যাম্পটনে উচ্চ শিক্ষালাভের উপযুক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি নিজে কলম্বিয়া প্রদেশের ওয়াশিংটন নগরে আট মাস লেখা পড়া শিখিতে যাই। এই বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়েই গ্রন্থ পাঠ এখানে বেশী হইত। কিন্তু হ্যাম্পটনে কৃষি, পশুপালন, শিল্প ইত্যাদির দিকেই বেশী দৃষ্টি থাকিত।

আমি ওয়াশিংটনে থাকিতে থাকিতে এই দুই প্রকার শিক্ষালয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। ওয়াশিংটনের ছাত্রদের বেশ দুপয়সা আছে। তাহারা কিছু 'বাবু'—তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ উচ্চ ধরণের—বিলাসের মাত্রাও যথেষ্ট। বোধ হয় ইহারা লেখাপড়া হিসাবেও মন্দ নয়। নিতান্ত গণ্ডমূর্খ আসিয়া ওয়াশিংটনে ঢুকিতে পায় না। কিন্তু হ্যাম্পটনের আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ওখানকার চালচলন ভিন্ন রকমের। দাতারা ছাত্রদের বেতন দান করিতেন—সুতরাং উহা অবৈতনিক বিদ্যালয়। কিন্তু কাপড় চোপড়, কাগজ পত্র, পুস্তক সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং খাওয়া পরার খরচ ছাত্রদিগকেই দিতে হইত। এই টাকা ছাত্রেরা খাটিয়া সংগ্রহ করিত। কেহ কেহ বাড়ী হইতেও কিছু আনিত।

ওয়াশিংটনের ছাত্রেরা একবারেই স্বাবলম্বী নহে—তাহাদের খরচপত্র সম্বন্ধে তাহারা

নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইত। কিন্তু হ্যাম্পটনে স্বাবলম্বন এবং নিজের খরচ নিজে চালানই ছাত্রদিগের বিশেষ লক্ষণ। ওয়াশিংটনের ছেলেরা বাহিরের 'চটকে' বেশ দৃষ্টি রাখিত। জীবনের প্রকৃত ভিত্তি আত্ম-সম্মান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর ছিল না। জীবনের লক্ষ্য, মানবের কর্ত্তব্য, ভবিষ্যতের আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাহারা বেশীকিছু শিখিত বলিয়া মনে হয় না। তাহারা গ্রীকল্যাটিন ইত্যাদি কত বিষয়ই শিখিত। কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন। লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা যে সমাজে বাস করিবে তাহার উপযুক্ত কাজকর্ম্ম, চালচলন তাহারা আদৌ শিখিত না। বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের ক্ষতিই হইত। কয়েক বৎসর বেশ ভাল বাড়ীতে বাস, ভাল খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি করিয়া তাহারা অনেকটা অকর্ম্মণ্য, অসহিষ্ণু হইয়া পড়িত। পল্লীতে আসিয়া বাস করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইত। শারীরিক পরিশ্রমে তাহারা নারাজ হইত। গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য, চাষবাস, পশুপালন ইত্যাদি তাহারা একেবারেই ভুলিয়া যাইত। আফিসের কেরাণী, পরিবারের ম্যানেজার, হোটেলের বাবুরচি, অথবা খান্সামা, দ্বারবান্ ইত্যাদি হইয়া জীবন কাটাইতে তাহারা ভাল-বাসিত। কিন্তু মাঠে যাইয়া কষ্ট-স্বীকার পূর্ব্বক জমি চষিতে তাহারা অসমর্থ হইয়া পড়িত।

আমি যে কয়মাস ওয়াশিংটনে ছিলাম তখন ওখানে অনেক নিগ্রো বাস করিত। সকলেই পল্লীত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছে। গ্রামের কষ্ট তাহাদের সহ্য হয় না। সহরের বিলাস ছাড়িয়া তাহারা অন্যত্র বাস করিতে অসমর্থ। কেহ কেহ প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিম্ন-পদস্থ কর্ম্মকারী, কেহ বা যুক্তদরবারের বড় চাকরী পাইবার আশায় কাল কাটাইতেছে। কেহ কেহ মন্ত্রণা সভার এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে সদস্যগিরিও করিত। ফলতঃ কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের একটা বড় টোলা কলম্বিয়া প্রদেশের এই নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। নিগ্রোদিগের জন্য তখন এখানে কতকগুলি বিদ্যালয়ও খোলা হইতেছিল। সকল বিষয়ে আমি এই নগরটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমাদের সমাজের গতিবিধি ও নৈতিক অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

বড় সহরের সুফল কুফল সবই আমার স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোকের আড্ডা অনেক স্থানেই দেখিতে পাইতাম। বিলাসের স্রোত প্রবল বেগেই বাড়িতেছিল। ৩৫৲ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম করিয়া কত নিগ্রো যুবক জুড়ি-গাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন—আমি নিজ চোখে এসব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতাম। পেটে তাহাদের অন্ন জুটিত না কিন্তু সংসারকে তাহারা দেখাইতে চাহিত যে তাহারা নিতান্তই গরিব ও নগণ্য নয়। আরও কত নিগ্রোকে দেখিয়াছি যাহারা ২৫০।৩০০৲ মাসিক বেতনে সরকারের চাকরী করিত—অথচ প্রতি মাসেই তাহাকে ধার করিয়া সংসার চালাইতে হইত। অত টাকা পাইয়াও তাহারা স্বপরিবারের খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিত না! আরও অনেক নিগ্রোর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা কয়েক মাস পূর্ব্বে 'জাতীয়' মহাসমিতি কংগ্রেসে যাইয়া কর্ত্তামী ও দেশ-নায়কতা করিয়া আসিয়া-

ছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাদের অর্থাভাব ও দুর্দ্দশার সীমা নাই। অধিকন্তু বহুলোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। নিজে খাটিয়া অন্নের ব্যবস্থা করিতে তাহাদের চেষ্টা ছিল না। সরকারের একটা চাকরীর আশায় বসিয়া থাকিয়া জীবন নিরানন্দময় করিতে থাকিত। তাহাদের বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের খোসামোদ করিলে দুএকটা চাকরী তাহাদের কপালে জুটিবে।

বড় সহরের নিগ্রোসমাজ দেখিয়া আমি সুখী হইতে পারি নাই। তাহারা নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া সাময়িক উত্তেজনায় এবং অনর্থক বিলাসভোগে দিন অতিবাহিত করিতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে, কোন যাদুমন্ত্রে তাহাদের ঐ মোহ কাটাইয়া দিই। আমার সাধ হইত যে, তাহাদিগকে সম্মোহন-মন্ত্রে ভুলাইয়া জীবনের যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিই। আমি ভাবিতাম যে, আমার ক্ষমতা থাকিলে, আমি তাহাদিগকে সহর ছাড়াইয়া পল্লীগ্রামে বসাইতাম। সেখানে প্রকৃতি জননীর সুকোমল ক্রোড়ে বাস করিয়া তাহারা জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। দেশের মাটিতে তাহারা একবার বসিতে পারিলে প্রকৃত সুখভোগের উপায় গুলি তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিবে। কৃষি-ক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য কাঁচা মাল তৈয়ারী হইয়া থাকে—পল্লীজীবনেই সকল জাতির যথার্থ সভ্যতার প্রধান উপাদান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে কৃষিকর্ম্ম করিয়াই সকল দেশের জনসমাজ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিয়াছে। এই স্তরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহারা শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যা, ধর্ম্ম, ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গের পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করা বড় কষ্ট-কল্পনা-সাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার ঐ কার্য্য হইয়া গেলে ভবিষ্যতের সকল উন্নতিই সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি আমি আমার 'সহুরে' নিগ্রোদিগকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিতাম। কিন্তু তখন আমার সুযোগ ছিল না। ভবিষ্যতে এই সকল কথা আমি নানা ভাবে নানা স্থানে প্রচার করিয়া আসিয়াছি।

ওয়াশিংটনের নিগ্রোরমণীদিগের অবস্থা কিছু বলিতেছি। অনেকে ধোপার কার্য্য করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। পারিবারিক ভাবে এই ব্যবসায় গুলি চলিত। মায়ে ঝিয়ে সকলে মিলিয়া কাপড় চোপড় পরিষ্কার করিত এইরূপে সমস্ত পরিবারই কর্ম্ম করিয়া যৌথভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিত। ইহার ফলে মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই দেখিয়া দেখিয়া এবং কাজ করিয়া বস্ত্রধৌতি কর্ম্মে পটুত্ব অর্জ্জন করিত। কিন্তু ক্রমশঃ মেয়েরা স্কুলে ভর্ত্তি হইল। ওখানে ৭।৮ বৎসর কাল লেখা পড়া শিখিত। যখন বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়া যাইত তাহারা ভাল ভাল পোষাক চাহিত। তাহাদের খরচ পত্র বাড়িয়া গেল—অথচ উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা কমিতে থাকিল। কারণ ইতিমধ্যে তাহারা গৃহস্থালী ভুলিয়া গিয়াছে ধোপার কর্ম্ম করিতেও অপারগ হইয়া পড়িয়াছে। পুঁথিবিদ্যার ফলে তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। মা মাসীরা যে কাজ করিতে পারিত সে কাজে তাহাদের এখন লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। পারিবারিক সুখ আর থাকিল না। মেয়েরা দুশ্চরিত্র হইতে লাগিল। সহরে বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের রমণী সমাজ ক্রমশঃ অধনত হইতে থাকিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত জাতি

আমি যখন ওয়াশিংটনে পড়িতেছিলাম তখন ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়াপ্রদেশে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একটা নূতন স্থানে প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছিল। ঐ জন্য দুই তিনটি স্থানও নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সেই স্থানগুলির অধিবাসীরা নিজ নিজ নগরের জন্য প্রদেশময় আন্দোলন সৃষ্টি করিতে লাগিল। আমার ম্যাল্‌ডেন-পল্লীর পাঁচ মাইল দূরেই চার্লষ্টন-নগর অবস্থিত। এই নগরবাসীরাও রাষ্ট্র-কেন্দ্রের মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। আমি ওয়াশিংটনের ছুটির পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, এমন সময়ে দেখি আমার নিকট চার্লষ্টনের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা দলবদ্ধভাবে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। আমাকে তাঁহারা তাঁহাদের জন্য ভোট সংগ্রহ কার্য্যে আহ্বান করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। আমি তাঁহাদের হইয়া প্রদেশের নানা স্থানে 'ক্যান্‌ভ্যাস' করিয়া বেড়াইতাম। তিনমাস কাল পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা দিয়া চার্লষ্টনের দিকে জনগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিলাম। ফলতঃ শেষ পর্য্যন্ত চার্লষ্টনের অধিবাসিগণই জয়ী হইল। সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত চার্লষ্টন নগরই ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র এবং প্রধান নগর রহিয়াছে।

এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমি বেশ একটু নাম করিয়া ফেলিলাম। অনেক স্থান হইতেই আমাকে লোকেরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিল। কত দলপতি ও জন-নায়ক আমাকে তাঁহাদের দলে ঢুকিতে আহ্বান করিলেন। আমি কিন্তু হুজুগে মাতিলাম না—সাময়িক যশোলাভের মোহে পড়িলাম না। বরং সেই প্রলোভন কাটাইয়া উঠিয়া আমার জাতির স্থায়ী উন্নতিবিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়ই চিত্ত সমর্পণ করিলাম। আমি জানিতাম, যে রাষ্ট্রীয়-জীবনে যোগদান করিলে আমি কৃতকার্য্য হইয়া নামজাদা লোকই হইতে পারি। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা, প্রবৃত্তি ও উৎসাহ সবই আমার ছিল। কিন্তু উহাতে লাগিয়া গেলে আমার স্বার্থপরতাই প্রমাণিত হইত। আমার নিজ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইত বটে, কিন্তু আমার সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া উঠিতে পারতাম না।

আমি বুঝিয়াছিলাম সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে তিনটি কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ আমাদের কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় পুষ্ট করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ আমেরিকার সমাজে নিগ্রোদিগের জন্য সম্পত্তি গৃহ জমিদারী ইত্যাদি সঞ্চিত করা আবশ্যক। এই তিনটির কোনটিই তখন আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে ছিল না বলিলেই চলে। সুতরাং সমাজের এই তিনটি প্রাথমিক অভাব মোচন করাই আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাহা না করিয়া আমি যদি প্রথমেই নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মাতিয়া যাই তাহা হইলে আমাকে স্বার্থপর এবং আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কাজেই আমার নিজের সুযোগ সুবিধা ক্ষমতা যোগ্যতা পাণ্ডিত্য যশোলাভ ইত্যাদি সকল কথা ভুলিয়া গেলাম। নিগ্রোসমাজকেই আমার জননী-স্থানীয় বিবেচনা করিয়া একমাত্র তাহারই সুখবিধানে নিজকে নিযুক্ত করিলাম। আমার জীবনব্যাপিণী সাধনার কেন্দ্রস্থলে নিগ্রো-সমাজকে রাখিয়া আমার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিলাম। এই সমাজ-সেবা ব্রত হইতে কোনরূপ প্রলোভনই আমাকে টলাইতে পারে নাই।

নিগ্রোজাতির অনেকেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন। অনেকেই যুক্ত দরবারের 'জাতীয়' মহাসমিতি কংগ্রেসের সভ্য পদপ্রার্থী হইলেন। অনেকেই উকিল হইয়া আইন ব্যবসায় ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ ছোট বড় চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকেই সঙ্গীত-শিক্ষকতার কর্ম্ম করিতে থাকিলেন। আমি বুঝিলাম নিগ্রোসমাজের উন্নতি এই কংগ্রেসওয়ালা উকিল কেরাণী বা সঙ্গীত-শিক্ষকগণের দ্বারা সাধিত হইবে না। তাহার জন্য অন্যরূপ তপস্যা আবশ্যক। এমন কি কংগ্রেসের কার্য্য, উকিলী ব্যবসায় এবং সঙ্গীত-শিক্ষকতার কর্ম্মের জন্যও নিগ্রোদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যই কঠোর সাধনা আবশ্যক। সেই তপস্যায় ও সেই সাধনায় ব্রতী না হইয়া কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ অভিলাষ পোষণ করিলে কি হইবে?

আমার স্বজাতিদিগের এই সময়কার হাব ভাব দেখিয়া আমাদের গোলামীযুগের একটা ঘটনা মনে পড়িত। এক নিগ্রো সেতার বাজান শিখিতে চাহিয়াছিল। তাহার একজন যুবক প্রভু সেতার বাজাইতে পারিতেন। তাঁহারই নিকট সে মনোবাঞ্ছা জানাইল। প্রভু বুঝিলেন, নিগ্রোর ইহা সাধ্য নয়। মজা দেখিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা, জ্যাক্ দাদা, তোমাকে আমি সেতার শিখাইতে রাজী আছি। কিন্তু দাদা একটা কথা বলি। এজন্য কত করিয়া আমাকে দিবে? আমার দস্তুর এই—প্রথম গৎ শিখাইবার জন্য আমি ৯৲ লইয়া থাকি, দ্বিতীয় শিক্ষার জন্য ৬৲ লইয়া থাকি এবং তৃতীয়টার জন্য আমি মাত্র ৩৲ লই। আর যেদিন তোমাকে ওস্তাদ করিয়া ছাড়িয়া দিব অর্থাৎ শেষ দিন মাত্র ৸১০ লইব। রাজী আছ কি?" নিগ্রো দাদা উত্তর করিল, "ছোট কর্ত্তা, কড়ারটা ত ভালই দেখিতেছি। তোমাকে আমি এইরূপই দিয়া যাইব। কিন্তু কর্ত্তা আমার একটা অনুরোধ রাখিতে হইবে। তুমি শেষ গৎটাই আমাকে প্রথমে শিখাও না কেন?"

আমি আমাদের স্বজাতিদিগের জন-নায়ক ও বড় বড় কর্ম্মচারী ইত্যাদি হইবার আকাঙ্ক্ষাকে এই গোলামের শেষ গৎটাই আগে শিখিবার ইচ্ছার ন্যায় সর্ব্বদা মনে করিয়া আসিয়াছি। এজন্য আমি ওসব 'বড় কাজে' না যাইয়া নীরব শিক্ষাপ্রচার কর্ম্মেই থাকিয়া গেলাম।

চার্লষ্টনে রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি ম্যাল্‌ডেনে শিক্ষকতা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে একখানা হ্যাম্পটনের পত্র পাইলাম। সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ আমাকে হ্যাম্পটনে একটা বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হ্যাম্পটনের পুরাতন গ্রাজুয়েটদের মধ্যে দুএকজন বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এবার আমার উপর এই

ভার পড়িল। আর্মষ্ট্রঙ্গের পত্র পাইয়া এক সঙ্গে লজ্জিত ও আনন্দিত হইলাম। আমি এই সম্মানলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতও হইলাম। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। আমার আলোচ্য বিষয় হইল "বিজয়লাভের সদুপায়।"

পাঁচ বৎসরের মধ্যে নূতন রেলপথ অনেক খোলা হইয়াছে। হ্যাম্পটনে যাইবার সময়ে এবার সমস্ত রাস্তা রেলপথেই গেলাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কি কষ্টে আমি কত পথ হাঁটিয়া কত দিন না খাইয়া সেই একই রাস্তায় হ্যাম্পটনের বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম! আজ আমি সেই খানে সম্মানজনক পদলাভ করিয়া বক্তৃতা দিতে চলিয়াছি। অতীত ও বর্ত্তমান তুলনা করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন লোকের এরূপ ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না আমার জানা নাই।

হ্যাম্পটনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ আমাকে খুবই আদর আপ্যায়িত করিলেন। আমি অনেক দিন পরে আসিয়াছি বহুবিষয়ে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি লক্ষ্য করিলাম। আমাদের সমাজের যে যে বিষয়ে অসম্পূর্ণতা ও অভাব রহিয়াছে বিদ্যালয়ে ঠিক সেই গুলি পূরণ করিবার জন্যই আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় এবং হ্যাম্পটনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ চেষ্টিত ছিলেন।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষাপ্রচারকেরা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেন না। অবনত ও দরিদ্র লোকসমাজে শিক্ষাবিস্তার করিতে যাইয়া বহু সৎপ্রয়াসী কর্ম্মিগণ এজন্য সুফল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অন্য এক সমাজে যে অনুষ্ঠানে সুফল লাভ হইয়াছে তাহাই অবনত সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া তাঁহারা বিফল হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, এক সমাজের যাহা শুভ, অন্য সমাজের তাহা অশুভও হইতে পারে। শ্বেতকায় সমাজে যাহাকে উন্নত শিক্ষাপ্রণালী বলি তাহাই যে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সমাজেও সুফল প্রসব করিবে কে বলিতে পারে? এমন কি, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগে হয়ত একটা অনুষ্ঠানের দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারাই যে এখনও উপকার হইবে এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি? কিন্তু শিক্ষাপ্রচারকেরা দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখিতে পাই। ১০০০ মাইল দূরে কোন দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই অন্ধের ন্যায় ইহারা হয়ত কোন সমাজে প্রচার করিতে থাকেন। অথবা ১০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যা কার্য্যকরী ছিল এতদিন পরেও তাঁহারা তাহাই চালাইতেছেন। হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা এরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা রহিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতেন যে, নিগ্রোজাতির জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেছেন। আর তাঁহারা মনে রাখিতেন যে, যুক্তরাজ্যের একটি প্রদেশের মধ্যেই তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে আর একটা দোষও অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। শিক্ষকেরা মনে করেন যে, ছাত্রেরা সকলেই একরূপ, সকলকেই একই প্রণালীতে, একই আদর্শে, একই জীবনযাপন প্রথার ভিতর দিয়া মানুষ করা যায়। এজন্য সকলের উপর একটা

'পেটেণ্ট' ছাপ মারিয়া দিবার জন্য শিক্ষকেরা সাধারণতঃ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মানুষ বিচিত্র, ছাত্রগণের স্বভাব বিভিন্ন, এক একজনের এক এক প্রকার মেজাজ, প্রবৃত্তি ও ধারণা। সুতরাং প্রত্যেকের অভাব বুঝিয়া শিক্ষা দিলেই সুফল ফলিতে পারে। সুখের কথা হ্যাম্পটনে ছাত্রদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা বিষয়ে বেশ লক্ষ্য রাখা হইত। এক এক জনকে এক এক প্রকার শিল্প, কৃষি ও পুঁথি শিখান হইত। ফলতঃ ছাত্রেরা সজীবভাবে মনের আনন্দে বাড়িয়া উঠিত। যাহার যে বিষয়ে অভাব তাহার ঠিক সেই বিষয়েই শিক্ষা হইত। লেখা পড়া শিখিয়া যে তাহাদের উপকার হইতেছে প্রতিদিন তাহারা ইহা নিজেই বুঝিতে পারিত।

হ্যাম্পটনে আমার বক্তৃতা দেওয়া হইয়া গেল। সকলে খুসী হইলেন। আমি ম্যাল্‌ডেনে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে শিক্ষকতার জন্য পুনরায় ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময়ে আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয়ের আর একখানা পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে হ্যাম্পটনে একটা শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমি আমার দুইটি ভাই ও আমার পল্লীর অপর চারিজন সর্ব্বসমেত ছয় জন ছাত্রকে ম্যাল্‌ডেন হইতে হ্যাম্পটনে পাঠাইয়াছি। তাহাদিগকে আমি ঘরেই এতদূর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলাম যে তাহারা হ্যাম্পটনে যাইয়া সকল বিষয়েই উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহাদের লেখাপড়া এবং স্বভাব চরিত্র দেখিয়া আর্মষ্ট্রঙ্গ আমার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন, আমার দ্বারা বেশ ভালই শিক্ষকতার কার্য্য চলিতে পারে। এজন্যই তিনি উৎসুক হইয়া আমাকে হ্যাম্পটনে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি যে সকল ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন আজ কাল বোষ্টন নগরে প্রসিদ্ধ চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি ঐ নগরে শিক্ষাপরিষদেরও একজন সদস্য।

এই সময়ে আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় লোহিত জাতিকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। তখনকার দিনে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না, যে, লোহিতবর্ণ ইণ্ডিয়ান জাতির লোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইতে পারিবে। আর্মষ্ট্রঙ্গ কিন্তু পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প। তিনি ফেডারেল দরবারের সাহায্যে প্রায় ১০০ লোহিত শিশু ও যুবক হ্যাম্পটনে লইয়া আসিলেন। তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যেই রাখিলেন। আমি তাহাদিগের ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার প্রাপ্ত হইলাম। এই কার্য্য আমায় খুব ভালই লাগিত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আমার স্বজাতির জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নূতন এক লোকসম্প্রদায়ের সেবায় নিযুক্ত হইতে ততবেশী উৎসাহী ছিলাম না। কিন্তু আর্মষ্ট্রঙ্গের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

প্রায় ৭৫ জন লোহিত ইণ্ডিয়ান্ আমার রক্ষণাবেক্ষণে থাকিল। আমি ছাড়া তাহাদিগের নিকট আমাদের স্বজাতীয় আর কেহ ছিল না। কাজেই দায়িত্ব আমার যথেষ্ট। একে ত ইণ্ডিয়ানেরা শ্বেতকায়দিগকেই সম্মান করে না। তাহারা শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য এইরূপই তাহাদের বিশ্বাস। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোরা তাহাদিগের কাছে উল্লেখযোগ্য জাতিই নয়। তাহার উপর আমরা এত কাল গোলামী করিয়াছি। ইণ্ডিয়ানেরা "যায় প্রাণ থাকে মান" ভাবিয়া

কোন দিনই গোলাম হয় নাই। এমন কি তাহারাই তাহাদের দেশে অনেক ক্রীতদাস রাখিত। সুতরাং জাতিসমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য আমাকে প্রথম প্রথম বড় বেশী ভাবিতে হইয়াছিল।

অধিকন্তু সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছিল, আর্মষ্ট্রঙ্গের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না। তিনি একটা অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যেই আমি ইণ্ডিয়ান্‌দিগের বন্ধু হইয়া পড়িলাম। আমি তাহাদের তাহারা আমার এই ভাব বেশ জমিয়া গেল। আমাদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ও প্রীতি এবং ভালবাসার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি দেখিলাম, লোহিত ইণ্ডিয়ানেরাও মানুষ—তাহাদেরও হৃদয় আছে—তাহারাও ভালবাসিতে জানে—তাহারাও সদসৎ বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে পারে। ক্রমেই দেখিলাম তাহারা আমাকে সুখী করিবার জন্য কত কি করিতে চাহিত।

তাহাদের একটা 'গোঁ' ছিল। তাহারা তাহাদের স্বজাতির চিহ্ন স্বরূপ চুলগুলি কাটিতে দিত না। কম্বল মুড়ি দিয়া বেড়াইতেও তাহারা ভাল বাসিত—এ অভ্যাস তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। ধূমপানের অভ্যাসও তাহাদের একটা জাতীয় চরিত্রের অন্তর্গত ছিল। তাহাদিগকে কোন মতে ইহা বন্ধ করান যাইত না। কিন্তু দোষ কি? সকল জাতিরই কতকগুলি 'গোঁ' থাকে। শ্বেতাঙ্গ জাতিদেরই কি কতকগুলি খেয়াল নাই? তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতিকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের পোষাক, তাঁহাদের খানা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পীড়াপীড়ি করেন। যেন সাদা চামড়াওয়ালা লোকেরা যাহা যাহা করে অন্যান্য জাতির লোকেরা ঠিক সেইরূপ অনুকরণ না করিলে তাহারা সভ্য হইতে পারে না। সুতরাং লোহিত শিশু ও যুবকদিগের স্বাভাবিক অভ্যাস গুলিতে আমি বিশেষ বিরক্ত হইতাম না।

আমার বিশ্বাস—কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত ছাত্রদিগের মস্তিষ্কে কোন প্রভেদ নাই। তাহারা বোধ হয় ইংরাজী শিখিতে কিছু বেশী সময় লইত। অন্যান্য সকল বিষয়ে দুইএরই প্রতিভা এক প্রকার। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় অথবা ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ান দুই জাতিরই একপ্রকার যোগ্যতা ও অযোগ্যতাই ছিল।

হাম্পটন বিদ্যালয়ের নিগ্রো ছাত্রেরা নানা উপায়ে ইণ্ডিয়ানদিগকে সাহায্য করিত। ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্টই হইতাম। নিগ্রোরা অনেক সময়ে লোহিতদিগকে নিজ ঘরে থাকিতে দিত। ইণ্ডিয়ানেরা এইরূপে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নিগ্রোদিগের সহবাসে থাকিয়া ইংরাজী ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত।

হাম্পটনের কাল ছেলেরা এই লাল ছাত্রদিগকে যেরূপ বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেছিল, যুক্তরাজ্যের কোন অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ সন্তানেরা অন্য কোন জাতির ১০০ ছাত্রকে সেইরূপ হৃদ্যতার সহিত গ্রহণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি কতবার শ্বেতাঙ্গ যুবকদিগকে বলিয়াছি "যতই তোমরা অবনত জাতিকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে ততই তোমরা নিজেই উন্নত হইবে। সেই অবনত জাতি যেই পরিমাণে অবনত ছিল তোমাদের উন্নতি ও সভ্যতা ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে।"

এই উপলক্ষ্যে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। মাননীয় শ্রীযুক্ত ফ্রেড্রিক্ ডগলাস এক সময়ে পেনসিল ভেনিয়া প্রদেশে রেলে বেড়াইতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো। রেল কোম্পানীকে তিনি পয়সা সমানই দিয়াছেন—কিন্তু তিনি শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসিতে পাইলেন না। তাঁহাকে মাল গাড়ীতে অন্যান্য নিগ্রোর সঙ্গে বসিয়া যাইতে হইল। একজন শ্বেতাঙ্গ বন্ধু সেই মালগাড়ীতে যাইয়া ডাগলাসকে বলিলেন "মহাশয়, আমরা আপনার এই অপমান দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।" ডাগলাস সোজা হইয়া বসিলেন এবং সদর্পে উত্তর করিলেন "ডাগলাসকে অপমান কে করিতে পারে? আমার আত্মাকে কোন বাহিরের লোক স্পর্শ করিতে পারে কি? আমি বলিতেছি, এই ব্যবহারে আমার বিন্দুমাত্র অসম্মান বা নিন্দা হয় নাই। যাহারা এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে তাহারাই যথার্থ নীচাশয় এবং নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের হৃদয়েই কালিমা জমা হইতেছে।"

আমি রেলপথের আর একটা নিগ্রোসমস্যার ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একজন নিগ্রোর সমস্ত শরীর অতিশয় সাদা ছিল। তাহাকে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদিগের সঙ্গে তুলনা করিয়া কেহই তাহার জাতি স্থির করিতে পারিত না। সে এক সময়ে কৃষ্ণাঙ্গদিগের গাড়ীতে বসিয়া যাইতেছে। টিকেট-সংগ্রাহক তাহাকে সেই-খানে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। সে কি নিগ্রো না ইয়াঙ্কি; তাহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদি সে নিগ্রো হয়, ভালই। কিন্তু যদি সে শ্বেতাঙ্গ হয় তাহা হইলে তাহাকে কি করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় যে সে নিগ্রো কিনা? ইহাতে শ্বেতাঙ্গের অপমান হইবারই সম্ভাবনা। টিকেট-সংগ্রাহক সেই ব্যক্তির আপাদ মস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিল। তাহার চুল, চোখ, নাক, হাত, কান কিছুই বাকী রাখিল না। কোনমতেই বুঝাগেল না যে ঐ লোক নিগ্রো কি সত্য সত্যই শ্বেতাঙ্গ। শেষে উপায় না দেখিয়া লোকটা মাথা হেঁট করিয়া তাহার পায়ের দিকে দেখিতে থাকিল। আমি সেই গাড়ীতে বসিয়াছিলাম এবং রেলের কেরাণীর ঐ পরীক্ষা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম "যাহাহউক" এইবার সন্ধান পাওয়া যাইবে।" সত্যই তাহার পা দেখিয়া সে বুঝিল যে ঐ ব্যক্তি নিগ্রোই বটে এবং তাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি সুখী হইলাম যে গোলমালে আমার একজন স্বজাতি কমিয়া গেল না!

আমি ভদ্রতা সম্বন্ধে একটা নিয়ম স্থির করিয়াছি। কোন লোক সভ্য ও ভদ্র কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য আমি কোন নীচ জাতির লোকের সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে গোলামীর যুগে দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাহাদের ক্রীতদাসগণের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করিতেন তাহাতে তাঁহাদের মধ্য হইতে ভদ্র ও অভদ্র, সভ্য ও অসভ্য খুঁজিয়া বাছা সহজ ছিল। এখনও পুরাতন মনিবের সন্তানেরা পুরাতন গোলামবংশীয়দিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাই ভদ্রতা বিচারের প্রকৃষ্ট মাপকাঠি।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন একদিন রাস্তায় হাঁটিতে ছিলেন এমন সময়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো তাঁহাকে টুপি তুলিয়া নমস্কার করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিগ্রোকে তাঁহার টুপি খুলিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা এজন্য তাঁহাকে পরে নিন্দা করিতেন। তিনি

উত্তর দিতেন:—"তোমরা কি বলিতে চাহ যে, একটা অশিক্ষিত অসভ্য নিগ্রো আমাকে ভদ্রতায় হারাইয়া দিবে?"

আমেরিকায় জাতি ভেদের দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি যখন হ্যাম্পটনে লোহিত ছাত্রদিগের অভিভাবকতা করিতে-ছিলাম সেই সময়ে আমার অধীনস্থ একজন ছাত্রের অসুখ হয়। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া "ফেড্‌রাল দরবারে"র কর্ম্মচারীর নিকট ওয়াশিংটনে যাইতেছিলাম। তিনি ইহাকে যথা স্থানে তাহার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন। ওয়াশিংটনে যাইবার পথে খানিকটা একটা ষ্টীমারে যাইতে হয়। উহাতে হোটেল ছিল। সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া যাইবার পর আমি সেখানে খাইতে গেলাম। আমার লোহিত ছাত্রও আমার সঙ্গে ছিল। ষ্টীমারের হোটেলওয়ালা বলিল "লোহিত যুবক খানা পাইবে, তুমি পাইবে না।" আমি অবশ্য বিস্মিত হইলাম—কারণ আমাদের দুইজনের রঙ্গে বড় বেশী তফাৎ ছিল না। কিন্তু সে এত ওস্তাদ যে দেখিবামাত্রই কৃষ্ণ লোহিত সহজেই চিনিয়া ফেলিয়াছে!

তাহার পর আর একটা হোটেলেও এইরূপ ঘটিল। আমি হ্যাম্পটন হইতে আসিবার সময় সেই হোটেলে থাকিতে আদিষ্ট হইয়া ছিলাম। কিন্তু তাহারাও আমাকে জায়গা দিল না।

জাতিভেদের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার একটা সহরে মহাগোলযোগ পড়িয়া যায়। একজন লোককে "লিঞ্চ" বা সজ্ঞানে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় হইয়া উঠিল। ব্যাপার কি অনুসন্ধানে জানা গেল যে কাল চামড়ার একটা লোক স্থানীয় হোটেলে খাইতে গিয়াছে। কিন্তু সে নিগ্রো নয় সে মরক্কো দেশের একজন অধিবাসী, আমেরিকায় বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহার রং কাল এবং ইংরাজীতে সে কথা বলিতে পারিত। কাজেই লোকেরা তাহাকে নিগ্রো ভাবিয়া লইয়াছিল। যখন রটিয়া গেল যে, সে নিগ্রো নয় আর কোন গোলযোগ থাকিল না। তাহার পর হইতে মরক্কোবাসী ব্যক্তিটি ইংরাজীতে কথা না বলাই শ্রেয়জ্ঞান করিয়াছিল।

লোহিত ছাত্রদের লইয়া হ্যাম্পটনে এক বৎসর কাটাইলাম। এই সময়ে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আর একটা সুযোগ জুটিল। তাহার ফলে আমার টাস্কেজির কর্ম্মে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। আর্মষ্ট্রঙ্গ দেখিলেন, নূতন নূতন নিগ্রো পুরুষ ও রমণীরা দলে দলে শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিতেছে। কিন্তু তাহাদের বড়ই দুরবস্থা। পয়সা দিয়া স্কুলে থাকা কঠিন, এমন কি, দুই চারি খানা কেতাব কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। সেনাপতি মহাশয় ইহা-দিগের জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন করিলেন।

ব্যবস্থা হইল যে তাহারা দিনে ১০ ঘণ্টা করিয়া খাটিবে এবং রাত্রে ২ ঘণ্টা মাত্র স্কুলে পড়িবে। এই কাজের জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে খোরাক দেওয়া হইবে। তাহাছাড়া নগদও কিছু তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে। এই নগদ টাকাটা সম্প্রতি তাহারা বিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডারে জমা রাখিবে। ভবিষ্যতে তাহাদিগকে দিবাভাগের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া যাইবে। তখন ঐ পুঁজি হইতে তাহাদের খোরাক পোষাক চলিতে পারিবে। অবশ্য এইরূপে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল নৈশ-বিদ্যালয়ে না থাকিলে তাহারা দিবা-বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না—এবং

দিবা-বিদ্যালয়ের জন্য নিজ নিজ অভাবমোচনোপযোগী টাকাও জমা হইয়া উঠিবে না। অধিকন্তু এই দুই বৎসরব্যাপী জীবনযাপনের ফলে তাহারা কতকগুলি শিল্প ও কৃষিকর্ম্ম শিখিয়া ফেলিবে। তাহাদের পুঁথিবিদ্যাও কিছু কিছু হইয়া থাকিবে। এদিকে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের ও কৃষিবিভাগ এবং শিল্পবিভাগ সবিশেষ পুষ্টিলাভ করিবে। সুতরাং এই নৈশবিদ্যালয়ের দ্বারা অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় তাঁহার এই নব প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ভার আমায় দিলেন। প্রায় ১২ জন উৎসাহী ও কর্ম্মঠ ছাত্র ও ছাত্রী লইয়া নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করা গেল। দিবাভাগে পুরুষেরা বিদ্যালয়ের করাতখানায় কাজ করিত এবং মেয়েরা ধোপার কর্ম্ম করিত। দুই কাজই অত্যধিক কঠিন ছিল। কিন্তু তাহারা বেশ ভাল করিয়া করিত। এদিকে নৈশবিদ্যালয়ের জন্য পড়া প্রস্তুতও তাহারা মনোযোগের সহিত করিত। লেখা-পড়া শেষ করিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেলেও তাহারা উহাতে লাগিয়া থাকিত। ঘুমাইতে যাইবার সময় হইয়া যাইবার পরেও তাহারা আমাকে তাহাদিগের পড়া বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিত।

ইহাদিগের দিনের ও রাত্রের কাজ দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাদের পরিশ্রম স্বীকার এবং বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগের জন্য ইহাদিগকে আমি একটা নূতন নাম দিয়াছিলাম। তাহাদিগকে "কর্ম্মঠ সমিতির" সদস্য বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাদের সুনাম ছড়াইয়া পড়িল—হ্যাম্পটনের বাহিরেও এই নামের আদর হইতে লাগিল। নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আমি ছাপান সার্টিফিকেটও দিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা থাকিত—

"হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের 'কর্ম্মঠ-সমিতি'র 'অমুক'…'অত'বৎসর নিয়মিতরূপে কার্য্য করিয়া এই প্রশংসা পত্রের অধিকারী হইয়াছে।" সমাজে এই প্রশংসা পত্রগুলির আদর বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাম্পটনের নামও সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া গেল। আজ সেই নৈশবিদ্যালয়ে ৩০০।৪০০ ছাত্র লেখা পড়া শিখিয়া থাকে। ইহার ছাত্রেরা ইতিমধ্যে দেশের নানা সৎকর্ম্মে উচ্চ-স্থানও অধিকার করিয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ *

পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে যখন অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হই, যেন এই সভার সহস্রের অন্তর্গত জনৈক সভ্যরূপে উপস্থিত বিষয়ের উপযোগী সাক্ষ্য আনন্দমাত্র প্রকাশ করিয়া যাইব বলিয়াই আশা করিয়াছিলাম, আপনারা উহা সহজে ঘটিতে দিলেন না, আপনারা আমাকে আক্রমণপূর্ব্বক অদ্যকার সভাপতিপদে

বসাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং আমি নিজকে কিঞ্চিৎ বিপন্ন মনে করিতেছি। সভাপতিকে গম্ভীরভাবে আসন দখল করিয়া বসিতে হয়; কোন দিকে অতিরিক্ত উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অবৈধ; তাহাকে সভার যাবতীয় আলোচনার মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিতে হয়—ইত্যাদি, আধুনিক সভাপতিবিষয়ক নানা অলিখিত ব্যবস্থাবিধি মানসপথে প্রবলভাবে উদিত হইয়া আমাকে এককালে দমাইয়া ফেলিয়াছে! আমার উচ্ছ্বাসের উৎসাহমুখে আপনারা একেবারে জগদ্দল চাপাইয়া দিয়াছেন এবং এই সভার আলোচনাও সময় সময় এত বিভিন্ন পথে ছুটিয়া গিয়াছে যে, সমস্তের সামঞ্জস্য করিয়া সভায় উপসংহার করিতে হইলে দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর বাক্য বচসার আবশ্যক; উহা চিন্তা করিয়াও আমার মন যে কিঞ্চিৎ উৎপীড়িত হইতেছে না, তাহা নহে।

আপনারা জানিয়া শুনিয়াই একজন সাহিত্য-সেবীকে অদ্যকার সুধীসমাগমের অধ্যক্ষপদে বসাইয়া দিয়াছেন, এই কার্য্যের কিঞ্চিৎ ফল আপনাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সবিশেষ, ইহা প্রধানতঃ সাহিত্যিক সমাগম বলিয়া, অনিচ্ছুকগণকেও কিঞ্চিৎ সাহিত্য-বক্তৃতা শুনিতেই হইবে। তৎপূর্ব্বে, আপনাদের সমক্ষে এই সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি; আশা করি, আমার বক্তব্যের উপসংহারে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিমতে গ্রহণ-পূর্ব্বক, আপনারা অদ্যকার সম্মিলন এবং যাবতীয় আলোচনার উদ্দেশ্য সফল করিবেন, প্রস্তাব এই :—

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ কবিপ্রতিভার ফল প্রদর্শনপূর্ব্বক বিলাতের সাহিত্যিকমণ্ডলীর সম্মান লাভ করিয়াছেন, এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবার সমক্ষে ১৯১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালীকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন; উহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক চট্টগ্রাম সাহিত্যপরিষদ কবিবরকে আন্তরিক আনন্দ এবং প্রীতি বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

মহোদয়গণ, আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন। এই আনন্দের পরিমাণ এত অধিক যে স্বয়ং বাঙ্গালা এবং বঙ্গসাহিত্যের সেবক আমি তাহা কোনরূপে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেও পারি না। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, এবং রাজকীয় বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালীর শিক্ষাসাধনার পক্ষে অপরিহার্য্য পরিগণিত হইয়া আমাদের বঙ্গ-ভাষা স্বীকৃত পদবী লাভ করে, এবং বাঙ্গালা গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'তোতার কাহিনী' লিখিত হয়, অথবা পরে যখন বাঙ্গালাশিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য প্রবোধ-চন্দ্রিকা রচিত হইয়া পাঠ্যগ্রন্থের স্থান গ্রহণ করে, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, যে শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই বাঙ্গালী তাহার সাহিত্য-হৃদয়কে বিশ্বদরবারে উপস্থিত করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করিবে, উহার পর, ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে, যখন বাঙ্গালীর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়, কিংবা ৪১ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গদর্শন প্রথম প্রচারিত হয়, তখনো কেহ আশা করিতে পারে নাই, যে বাঙ্গালীর হৃদয় এত অল্প-কালের মধ্যে ব্রহ্মতালে বাজিয়া উঠিয়া বিশ্বসাহিত্যমণ্ডলীর বিস্ময়স্থলী হইতে পারিবে, কিন্তু, বিধাতার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে, অদ্য আমাদের সমবেত হৃদয় ঐক্যতানে উহা অনুভব করিতে পারিতেছে

বলিয়াই আনন্দ! বিধাতা বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন পূর্ব্বক অচিন্তনীয় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন! তাই আমাদের অন্তকার আনন্দ যেমন আশীর্ব্বাদ এবং কৃতজ্ঞতারূপে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিতেছে, তেমনি চিন্ময় জগতের উপাসনারূপে সেই অঘটনঘটনপটু বিশ্বনিয়ন্তার চরণ উদ্দেশেও উত্থিত হইতেছে!

পরিষদের সভ্যগণ এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এই সভায় একরূপ অতর্কিতে নানা কথার অবতারণা ঘটিয়াছে। কোন বক্তা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের এই গৌরব এবং সাহিত্যিক উপার্জ্জনের সঙ্গে ইংরাজ আমলের আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বা ভাষার ইতিহাস কোন অংশে সম্পর্কিত নহে—তিনি প্রাচীন মহিমামণ্ডিত বৈষ্ণব কবিগণের কিঞ্চিৎ ভাবতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াই ইয়োরোপের বিস্ময় অর্জ্জন করিয়াছেন! কোন বক্তা (নিতান্ত অসাময়িকভাবে) পূর্ব্বগত মধুসূদন এবং হেম নবীনের সহিত তুলনা পাড়িতে এবং কেহ কেহ বা ভাল-মন্দবিচারে রবীন্দ্রনাথের দোষগুণ সঙ্কেত করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। আপনারা জানেন আমিও বঙ্গসাহিত্যের একজন দুরাকাঙ্খ অপিচ অকৃতীসেবক, কিন্তু, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যসেবী হইতে হয়, তবে, অন্ততঃ নিজের ভাষা ও সাহিত্য কি-ছিল কি-হইয়াছে, এখন কোন্ দিকে চলিয়াছে, কোন্ কবি বা লেখক উহাকে কোন্ সম্পদ্ দান করিয়াছেন প্রভৃতি বিষয়ের পূর্ব্বাপর জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত সাহিত্যসেবার ভূমিকা পরিগ্রহ করাও যে অসম্ভব, তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। সাহিত্যের বহুমুখী ধারা এবং চরমের অখণ্ড একত্ব ও সাগরসঙ্গমের তত্ত্ব কিঞ্চিন্মাত্রও ধারণা না করায় সাহিত্যসেবী হওয়াটা যেমন অসম্ভব, তেমন এই সাহিত্যসেবীর পক্ষে প্রকৃত কবিগণের মধ্যে ছোটবড় বা দুয়োস্থয়ো বিভাগ করাটাও যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাও সাহিত্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এতদ্ভিন্ন সাহিত্যসেবী মাত্রকেই আর একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই যে, বর্ত্তমানে সাহিত্যের এতরূপ দেশকালভেদে তাহার এত পন্থা এত বিভাগ পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে যে, 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি' 'অদ্বিতীয় কবি' প্রভৃতি অতিশয়োক্তিমূলক শব্দবিন্যাস সাহিত্যসমালোচনার রাজ্য হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই নির্ব্বাসিত! এমন যে সেক্ষপীয়র, যাঁহাকে কাব্যসাহিত্যের বিভাগ বিশেষে অতুলনীয় কৃতিত্বশালী বলিয়া রায় প্রকাশ করিতে অনেক পণ্ডিতেই ইতস্ততঃ করেন না। তাঁহাকেও 'শ্রেষ্ঠকবি' আখ্যায় বিশেষিত করা যায় না। একেত কোন মৃত কবির সঙ্গে জীবিতের তুলনায় সমালোচনা সাহিত্যের শিষ্টাচার বহির্ভূত বলিলেই চলে; কেন না, সাহিত্যের মৃতগণ পিতৃলোকের, অমর লোকের অধিবাসী! বিভিন্ন ক্ষেত্রকোটির অধিবাসীর সঙ্গে তাঁহাদিগকে একই সমতলে স্থাপন করা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তাহার পর, যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কবি, যাঁহারা কোন-না-কোন গুণ প্রকাশে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে নিজের করমুদ্রা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, দেশের রুদ্ধহৃদয়কে কোন-না-কোন দিকে আঘাতপূর্ব্বক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আলোকের গবাক্ষ খুলিয়া দিয়া যাঁহারা কবি পদবী অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ স্থির করাও সহজ নহে। এই

ক্ষেত্রে পদে পদে ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কারণ, অনুকরণকারী বা অপরের প্রতিধ্বনিকারিগণ যেমন কবি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না, কবিসংঘের চিরকালীয় খাতায় যেমন তাঁহাদের নাম উঠে না, তেমনি, প্রত্যেক প্রকৃত কবি নিজের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য এবং অননুকরণীয় বিশেষত্বের গুণেই কবি! কবিগণের অন্তরঙ্গীয় এই বিশেষত্বটুকু নিরূপণ করাই সাহিত্যসমালোচকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং অদ্যকার সভায় তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোনরূপ আলোচনা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বলিয়াই মনে করি। মধুসূদন, হেম, নবীন বা বর্ত্তমানের রবীন্দ্রনাথ যেমন পরস্পরে স্থান বিনিময় করিতে পারেন না, মধুসূদন যেমন হেম নবীন রবি হইতে পারিতেন না, তেমনি রবীন্দ্রও মধু-হেম-নবীনের কৃতিত্ব-কোটি লাভ করিতে পারিতেন না—চেষ্টাও করেন নাই। তিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিশক্তি এবং কবিত্ব-শক্তির ফল উপাহরণপূর্ব্বক কবি-পদবী অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্ট চরিত্রমুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই কথাটার অর্থবত্তা সকল দিক হইতে হৃদয়ঙ্গম করাই প্রধান কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইবে।

সাহিত্যবন্ধুগণ, অনুমান ১০ বৎসর পূর্ব্বে, 'সাহিত্য' পত্রিকায় বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কতিপয় কবিতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, বঙ্গসাহিত্য সগৌরবে উহাদিগকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রেরণ করিতে পারে। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারেও এই মর্ম্মে বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালী অন্তু হৃদয়ের উত্তরাধিকার-সূত্রে নানাদিক দিয়া অতর্কিতভাবে নিজের জীবনপথে সত্যশিব-সুন্দরের যেই সাধনা করিয়া চলিয়াছে, তাহা এখন সতর্ক এবং সমুচিতভাবে সে নিজের সাহিত্যের মধ্যে প্রকটিত করিতে পারে নাই; উহা ঘটাইতে পারিলে বাঙ্গালী বিশ্বসাহিত্যমণ্ডলীর বিস্ময়-স্থলী হইতে পারিবে—আমার সেই স্বপ্নানুভূতি সফল হইতেছে; কি ভাবে কোন্ দিকে সফল হইতেছে তাহার নিরূপণ এবং অদ্যকার সভাপতির কর্ত্তব্যটুকু নানাদিকে অভিন্ন বলিয়াই আমার ধারণা জন্মিয়াছে; সুতরাং অদ্যকার কর্ত্তব্যসম্পাদনে আমার পুরাণ কথাটাই পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

জার্ম্মান দার্শনিক হেগেল সাহিত্যের তিনটি বিশেষ অবস্থা এবং গতি-তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রাণভূত ভাব পদার্থকে অবলম্বন করিয়া, ভাষা সম্বন্ধে উহার বিষম সম এবং অতিরিক্ত—এই তিন অবস্থা নির্ণয়পূর্ব্বক হেগেল উহাদের নামকরণ করিয়াছেন। 'বিষম' অবস্থায় সাহিত্যের বস্তু কিংবা ভাবের মধ্যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য থাকে না; উহারা অসংযত এবং এলোমেলো ভাবে স্ফূর্ত্তি-লাভ করে, সামঞ্জস্যের আদর্শকে অতিক্রম-পূর্ব্বক নানাপ্রকার আগন্তুক উদ্দেশ্যে বিক্ষিপ্ত-ভাবে স্ফুরিত এবং স্ফীত হইতে থাকে। আমাদের পুরাণাদির মধ্যে—বিশেষতঃ, প্রাচ্য প্রভাব-নির্জ্জিত ইয়োরোপের মধ্যযুগে সাহিত্যের এই লক্ষণ প্রবল দেখিয়া হেগেল উহার নাম দিয়াছেন—ওরিয়েণ্টাল্। 'সম' অবস্থায় এই ভাব কিংবা বস্তুর সামঞ্জস্যকে কোনদিকে অতিক্রম না করিয়া, বরঞ্চ উভয়কে ন্যূনাধিক সঙ্গতির আদর্শেই পরিচালিত করিয়া সাহিত্যের শিল্পকলা স্ফূর্ত্তি-

লাভ করে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই অবস্থার প্রচলিত নাম, Classic. প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক জাতির মধ্যে সাহিত্যের এই লক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকটিত বলিয়া ক্লাসিক বলিলে সাধারণতঃ গ্রীক এবং রোমক সাহিত্যকেই বুঝায়, গ্রীকজাতি সাহিত্যে শিল্পে এবং সমাজ-জীবনে এই ক্লাসিক আদর্শের সাধক ও শিক্ষক। গ্রীকজাতির সভ্যতা এবং ইহপরকালের আদর্শ সকলদিকে দেহ এবং মনের মধ্যে এই সঙ্গতির অনুশীলনে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, এই জাতি দেহ এবং মনের সমঞ্জসিত বিকাশের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিতেন বলিয়া, তাঁহাদের সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিত কলার মধ্যেও সত্য-শিব-সুন্দরের এই স্থির সঙ্গতির আদর্শ মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাদিগকে এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর শিক্ষকরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে! প্রাচীন এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর সমস্ত ইয়োরোপের সভ্যতা 'মধ্যযুগের অন্ধকারে' আচ্ছন্ন হইয়া যায়, কিন্তু এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রলয় সমুদ্রের বক্ষঃস্থল হইতেই বিশ্বদেবতা ইয়োরোপীয় আধুনিক সভ্যতার কমল-কামিনীর মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন, এই মধ্যযুগ হইতেই ইয়োরোপে নব আর্য্যজাতির অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ হয়। উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া দেবতা ক্রমে অভিনব বিজ্ঞান দর্শনের সৃষ্টিপূর্ব্বক ইয়োরোপীয় শিল্পসাহিত্যের যে অভিনব ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছেন, তাহা গ্রীসের হৃদয়-সরস্বতীজাত এফোডাইটস বা বিনস হইতে একটা বিশেষ দিকে অগ্রসর। তিনি শতদল-বাসিনী; এবং এই শতদল মনুষ্য-সভ্যতার হৃদয়রূপে ঊর্দ্ধদিকে—দেহ-মনের অতীত লোকের দিকে বিকশিত হইয়াই ললিত-কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ধারণ করিতেছে! মনুষ্যের ভাব ইচ্ছা এবং জ্ঞান তাহার দেহবস্তুর সামর্থ্যকে অতিক্রম করিয়া পরম প্রাচুর্য্যবিলাসে উল্লসিত হইতেছে বলিয়া, শিল্পসাহিত্যের এই ভাব-অতিরেক অবস্থার নামকরণ হইয়াছে—রোমান্টিক! উহা ইয়োরোপীয় সভ্যতার Renais Cance বা নবজীবন হইতে উপজাত হইয়া ইয়োরোপ-খণ্ডে আধুনিক সাহিত্য এবং ললিত কলার প্রধান লক্ষণামূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে! ঐ দেশের আধুনিক সাহিত্য এখন নানাদিকে নানামুখে অগ্রসর—কিন্তু মোটামুটি উহাকে এই 'রোমান্টিক' নামে সঙ্কেত করা যায়! উহা সময় সময় এই ভাব-অতিরেকের অবস্থা হইতে আরও অগ্রগামী হইয়া, ভাষার শক্তি ও সামর্থ্যকে একেবারে উল্লঙ্ঘন করিয়াও—সঙ্গীত এবং চিত্রকলা প্রভৃতির রাজ্যে সাধিকার এবঞ্চ অনধিকার প্রবেশ করিয়াও অগ্রসর হইতেছে!

এখন, আমাদের সাহিত্যের পূর্ব্বশূরিগণের কবিকাব্য পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে দেখিব, তাঁহারাও সাহিত্যের ত্রিধারার লক্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রাচীন মুকুন্দরাম ঘনরাম প্রভৃতি মনসার পুঁথির কবিগণ কিংবা ভারতচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখিব, তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যের 'ওরিয়াণ্টেল' আদর্শই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহাদের পর, নব ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিশেষ পরিচয়ে বাঙ্গালীর মন মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে বেশীভাগে ক্লাসিক আদর্শেই উল্লসিত! ইহারা নব্য বঙ্গের ভাবগঙ্গাকে ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া সাহিত্যজগতের সমুন্নত ভাব এবং বস্তু-

সম্ভারকে ভারতীয় মনের দ্বারা আয়ত্ব করিয়াই বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্বের ক্লাসিক-সাহিত্য-সমতলে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকের মধ্য দিয়া বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী অপূর্ব্বকে লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালীর মনোজীবন অভাবনীয় রূপেই প্রসারিত হইয়াছে! ইঁহাদের প্রতিভা-সঙ্গম না ঘটিলে, বাঙ্গালী হয়ত প্রাচীন বৈষ্ণব কবিপন্থার গীতকলায় অগ্রসর হইতে পারিত, কিন্তু আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের কৌলিন্য-দরবারে বসিবার উপযোগী ভাব ও ভাষার সামর্থ্য এবং বস্তুভিত্তি কখন লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। ইঁহাদের পর, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব 'চরিত' কবিগণের পদানুবর্ত্তনে ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আদর্শকে যেমন নবভাবে অনুসরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শক্তি এবং প্রসার বর্দ্ধিত করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও তেমনি বৈষ্ণব 'গীতি' কবিগণের দীক্ষালাভ পূর্ব্বক খণ্ডকাব্য গীতিকবিতা এবং সঙ্গীতকবিতার ক্ষেত্রে আত্মানুসরণ করিয়া নব নব ভাবাতিরেকের রাজ্যে বিলসিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার মধ্যে হয়ত মধুসূদনের শক্তি, হেমচন্দ্রের বিশিষ্ট গৌরব কিংবা নবীনচন্দ্রের জ্বালাতরঙ্গময়ী ভাবপ্রবণতা নাই, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বঙ্গভাষার যৌবনোপযোগী এমন একটা তরলোজ্জ্বল লাস্যলীলা এবং অসীমসঙ্কেতী নর্ম্মচমক আছে, সর্ব্বোপরি মনুষ্যজীবনের ক্ষুদ্র সরল বস্তুবিষয়গুলিকে অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের দিকে—অপ্রাপ্ত এবং অজ্ঞাতের উদ্দেশে এমন একটা অনির্ব্বচনীয় সঙ্কেত বা ঈশারা স্ফুরিত হইয়াছে যে, উহাই আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে প্রাচ্য-সাহিত্যের তরফ হইতে নব মাহাত্ম্য-অধিকার সপ্রমাণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছে; এবং উহাই ১৩১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন পূর্ব্বক আমাদের বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

আমাদের কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর কবি-সম্পর্কে যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা যে নিতান্ত সত্যকথা, উহা বঙ্গসাহিত্যের পরিদর্শক মাত্রেই স্বীকার করিবেন, ইঁহাদের একজন যাহা দিয়াছেন, অন্যজনে তাহা পারিতেন না। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ করিতে যাওয়া অনেকস্থলে একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া বই নহে। এই প্রকার বিচারের দ্বারা আমরা কেবল নিজের অজ্ঞতা এবং সঙ্কীর্ণ রুচির পরিচয় দিতে থাকিব—উহা প্রকৃত সাহিত্যিকের বিচার হইবে না। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, আমাদের সাহিত্যে এমন কবি জন্মেন নাই—বলিতে কি কোন সাহিত্যেই জন্মেন নাই—যাঁহার মধ্যে সাহিত্যের সাকুল্য শক্তি সঞ্চারিত হইয়া এবং কবিত্ব লাভ করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যের সর্ব্ববাদীসম্মত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে তুলিয়া ধরিতে পারে।

বন্ধুগণ, এখন অদ্যকার সময় উপযোগী বিষয় বিচারে অবহিত হইব। আমাদের রবীন্দ্রনাথ কোন গুণের দৃষ্টান্ত সমুপস্থিত করিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের সাধুবাদ অর্জ্জন করিলেন; এবং এই পরাধীন দেশের উদীয়মান সাহিত্যের জন্য ইয়োরোপের মূল্যবান্ স্বীকারগৌরব অর্জ্জন করিলেন? ইহা সাহিত্য-পরিষদ্ কর্ত্তৃক আহূত সভা বলিয়া, এবং সভার আলোচনাও কোন কোন দিকে বিসম্বাদ পন্থায় অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে বলিয়া, বিশেষতঃ আপনারাও এ

ক্ষেত্রে আমাদের অভিমতটুকু জানিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন দেখিয়া, আমরা উত্থাপিত প্রশ্নের মোটামুটি ধারণা এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আপনারা হয়ত ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ কবির জীবনব্যাপী রচনাসমূহ হইতে বিশেষতঃ 'ক্ষণিকা' 'নৈবেদ্য' এবং 'খেয়া' হইতে, (প্রচলিত কথায়) কেবল 'ধর্ম্ম-ভাবের' লক্ষণযুক্ত সঙ্গীত এবং সঙ্গীত-জাতীয় কবিতার অনুবাদ সমষ্টি। সুতরাং প্রৌঢ় জীবনের একটা বিশেষ ভাবযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একটা বিশেষ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই কবি ইংরাজী গীতাঞ্জলি চয়ন করিয়াছেন; এবং ন্যূনাধিক স্বাধীনভাবে উহাদের ইংরাজী অনুবাদ সমাধা করিয়াই তাহা ইয়োরোপের পরীক্ষাধীন করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ স্তবকের প্রকাশরীতি এবং ভাবসম্পত্তির মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট অথচ মনোমদ সৌরভ বিজাতীয়ভাষার আস্তরণ ভেদ করিয়াও পরিস্ফুট হইতেছে যে, ইয়োরোপীয় বিচারক মণ্ডলী কবিকে একজন প্রথমশ্রেণীর কবি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন; এবং ১৯১৩ সালের নোবেল পুরস্কার তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

এখন, যাঁহারা অভিনিবিষ্ট সাহিত্যিক নহেন, কিংবা যাঁহারা তুলনামূলক অধ্যয়নের রীতি অবলম্বনে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করেন না, অথবা যাঁহারা সম্যক্‌দর্শনের কোনরূপ ধার না ধারিয়া কেবল উপস্থিতের অনুভব সাহায্যেই 'ভালমন্দের' স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের চক্ষে বিলাতী পণ্ডিতমণ্ডলীর এই বিচার-ব্যাপার একটা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। এইরূপ প্রতীতির যথেষ্ট দৃষ্টান্ত অদ্যকার সভামধ্যেই পাইয়াছি। কবি রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতামূলে আমাদের অনেকের নিকট পরিচিত, কিংবা যে সকল কবিতা তাঁহাকে এই সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন, উহাদের অধিকাংশই হয়ত ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে পাইবেন না; এমন কি, অনুবাদিত কবিতা-গুলিও হয়ত বাঙ্গালার যেই সমস্ত অংশমূলে আপনাদের সমক্ষে মাহাত্ম্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মৃতিমুদ্রা লাভ করিয়া আছে, অনেক সময় তাহাও অনুবাদের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইবেন! বন্ধুগণ, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া এই সমস্যার এক-মাত্র প্রত্যুত্তর এই হইতে পারে যে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের অন্বীক্ষা রুচি এবং বিচারপ্রণালী আমাদের হইতে নানাদিকে স্বতন্ত্র; অপিচ, রবীন্দ্রনাথও বিলাতী রুচির সমুচিত নির্দ্ধারণ এবং প্রয়োগের প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহাদের সাধুবাদ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গীতাঞ্জলি প্রথম অবস্থায় ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবার পর বিলাতী সংবাদপত্রে উহার যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিলে একটা বিষয় বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তাহা এই যে, সমালোচকগণ—অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্যের নামজাদা সমালোচক কেহ আছেন কিনা জানি না—কেহই তাঁহাদের প্রাচীন কবিগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তুলনায় সমালোচনা' করিতে চেষ্টা করেন নাই। কবি ঈয়েট্‌স্ কেবল ভূমিকায় গীতাঞ্জলির ভাবজগৎকে 'স্বপ্নাবেশের জগৎ' উল্লেখে রসেটির 'willow wood'এর

সঙ্গে তুলনা পাড়িয়াছেন; ম্যানচেষ্টর গার্ডিয়ান উহাকে প্রাচীন পারস্য কবিগণের ধর্ম্ম-ভাবুকতা এবং অধ্যাত্মরাজ্যের সহিত উপমিত করিয়াছেন; টাইম্‌স উহার প্রকাশ-রীতিকে দায়ুদের গীতসংহিতার সমপ্রকৃতিক বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের নব্য কবিগণ এইভাবে সরল অথচ আন্তরিক অভিনিবেশ সাহায্যে ইংরাজ জীবনের দিকে তীক্ষ্ণ তরল দৃষ্টি পরিচালিত করিতে জানিলে, ইংলণ্ডেও যে বর্ত্তমানকালে এই প্রকার কবিতার একটা সাহিত্য দাঁড়াইতে পারে, গীতাঞ্জলির দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া টাইম্‌স এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং বস্তু-বিষয়কে প্রতিমারূপে অবলম্বন করিয়া, এইরূপে যে একশ্রেণীর মীষ্টিক বা আধ্যাত্মিক মধুররসের তরল কবিতা রচিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিলাতী বিচারকগণ অনেকেই এক মত হইয়াছেন, মনে করি। এ স্থলেই বিলাতের চক্ষে রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য নিহিত বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতীত হইতেছে। রবীন্দ্রকে সর্ব্বপ্রথম সাগ্রহে পরিচিত করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডের কবিগণ। আয়র্লণ্ডে সম্প্রতি প্রাচীন কেল্‌টিক সাহিত্যের ভাবগত আদর্শের সমসূত্রে এক নব সাহিত্যের প্রচেষ্টা প্রতীয়মান; উহা নানাদিকে পারস্যের স্ফী এবং বঙ্গের বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শ এবং রীতির সহোদর। বর্ত্তমানে ঈয়েট্‌স্ এই নব সাহিত্যচেষ্টার নেতা। আমি অন্যত্র কেলটিক্ সাহিত্যযতির সহিত প্রাচীন প্রাচ্য বিশেষতঃ পারসীক ও বৈষ্ণব কবিগণের রীতি-সামঞ্জস্য উল্লেখ করিয়াছি। এই আইরিষজাতির সহিত আর্য্যতার ক্ষেত্রে ভারতীয় আর্য্যের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সাধর্ম্ম্য নানাদিকে পরি-লক্ষিত হইবে। কেলটিক সাহিত্যরীতিই যে অভিনব ভাবুকতার প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া খ্রীষ্টোত্তর দশ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপে রোমাণ্টিক সাহিত্য সৃজনের সহায়তা করিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞগণ জানেন। বর্ত্তমানের আইরিষ কবিসংঘ একপ্রকার 'এক-রোখা' হইয়াই আধুনিক বিলাতে এই সাহিত্যিক দল গঠন করিতেছেন। বিলাতী সাহিত্যে এক একজন মীষ্টিক কবি বলিয়া পরিগণিত, ঈয়েটস বিস্তারিত ভূমিকাসহকারে তাঁহার রচনাসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন; এবং প্রবলভাবে মাহাত্ম্য ঘোষণাপূর্ব্বক ব্লেককে প্রথমশ্রেণীর কবি প্রতিপত্তি দানের চেষ্টা করিয়াছেন মীষ্টিক বলিতে দার্শনিকতার তরফ হইতে যাহা বুঝায়, কবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রস্তাবে সেই শ্রেণীস্থ না হইলেও, কোন কোন বিলাতী সমালোচক গীতাঞ্জলির ধর্ম্মভাবুকতা এবং অস্পষ্ট সংকেতের প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেও মীষ্টিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আইরিষ কবিগণের প্রাথমিক সহানুভূতি এবং সাধুবাদ হইতেই যে বিলাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের সহায়তা ঘটিয়াছিল, অপিচ ইয়োরোপের—বিশেষতঃ ফ্রান্স এবং জর্ম্মণীর 'সিম্বোলিষ্ট' নামক প্রসিদ্ধ কবি সংপ্রদায়ের কাব্য প্রচেষ্টা হইতেও যে ওই পরিচয়ের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়-টুকু অপনীত হইয়া উহার ভূমি বিলাতের মনোজগতে আগে হইতে নানামতে পরিষ্কৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই শেষোক্ত বিষয়ে পরে দৃষ্টি করিতে পারিব। গীতাঞ্জলির প্রকাশ রীতিটাই (manner of style) যে সর্ব্বাগ্রে বিলাতের চক্ষে চমৎকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা বিচারকমাত্রকেই স্বীকার

করিতে হয়, উহার অর্থ বস্তুবিষয়ে প্রকট জ্ঞান কিংবা সুস্থির সহানুভূতি জন্মিতে না পারিলেও, উহার ভাবগত ঈশারাগুলি তাহাদের প্রাচ্য দুরত্ব অপিচ আপাতিক তারল্য গতিকেই সর্ব্বপ্রথমে বিলাতী পাঠকের হৃদয়মধ্যে একটা অনন্যচিত্ততা এবং আবেশ জাগাইতে পারিতেছে। আমরা জানি, ইয়োরোপীয় সাহিত্য এখন কত ব্যাপকভাবে সুদৃঢ় অর্থ সাধনায় এবং বস্তুনিষ্ঠ ভাবসাধনায় অবস্থিত! কোনরূপ অস্পষ্টতার প্রণালী অলখ-লোকের ভূমিবিষয় অবলম্বন ব্যতীত 'ধর্ম্ম' লক্ষণের ন্যূনাধিক সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত, বিলাতী সাহিত্য কাব্য দেখিতে কিংবা দাঁড়াইতেও পরিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং, দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ পরম নৈপুণ্যসহকারেই বর্ত্তমান গীতাঞ্জলি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিলাতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

এখন, এই গীতাঞ্জলি পাঠ করিতে বসিলে যে আনন্দ লাভ হয়, উহাকে পাঠক হয়ত দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারে না, কোন ভাবকে অল্প কথায়, বা স্মরণীয় বাক্যের অর্থ কিংবা ব্যঞ্জনাশক্তির অধিকারে আনিয়া ধরিতে পারিলেই উহা পাঠকের মুষ্টিবদ্ধ হইল স্থির করিতে হইবে—উহা পাঠকের প্রকৃত প্রাপ্তির অধিকারে আসিল। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবিগণ মনুষ্যের এই প্রাপ্তি অধিকার বর্দ্ধিত করিয়াই সম্পূজিত হন। কিন্তু, যেই কবি বাক্যশক্তির সীমা-অধিকার উলঙ্ঘন করিয়া, কোনরূপ কাহিনী কিংবা অবস্থাকে অবলম্বন-পূর্ব্বক, চিত্রকলা অধিকারের রেখা বা আভাস-প্রণালীর সাহায্যে কিংবা সঙ্গীত-অধিকারের অনির্ব্বচনীয় স্বর-বাগিনী অন্তরা-আভোগ বা ছন্দের ফাঁকতালের সাহায্যে, অথবা উভয় প্রণালীকেই নির্ব্বিশেষে এবং ওতপ্রোত ভাবে অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা পূর্ব্বক পাঠককে আনন্দ দান করেন, তিনি পাঠককে ওই আনন্দটুকু স্তোকবাক্যে নিজের প্রাপ্তি ভাণ্ডারের অন্তর্ভূক্ত করিবার পক্ষে কোন সাহায্যই করেন না। তিনি স্বয়ং যে আনন্দকে বাণী সীমার মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক লাভ করেন নাই, পাঠককে তাহা ধরাইয়া দিবেন কি করিয়া? সুতরাং, পাঠকও যে আনন্দ লাভ করে তাহা স্বপ্ন-অধিকারের আনন্দের ন্যায় পরমুহূর্ত্তেই মুষ্টিচ্যুত হয়। সমস্ত কবিতাটি কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত, পাঠকের পক্ষে ঐ স্বপ্নাবেশ বা উহার ঈশারা টুকুও ইচ্ছায়ত্ত করার কোন সুবিধাই থাকে না, পাঠককে ঐরূপ সুবিধা দেওয়ার পক্ষে কবির কোন ইচ্ছা নাই—অপিচ, নিজের-প্রণালীবশাৎ ক্ষমতাও নাই; তাঁহার কাব্য-ভূমি এবং আদর্শই উহার বিরোধী। সুতরাং, ঐ প্রাপ্তিটুকু বাস্তবিক পক্ষে লাভ কিনা—ঐ আনন্দটা কবির কৃতিত্ব না পাঠকের কল্পনাকৃতিত্ব-গতিকেই লব্ধ হইতেছে, এইরূপ একটা সংশয়-প্রশ্নে জিজ্ঞাসু পাঠকের চিত্ত চিরকাল আন্দোলিত হইতে থাকে। এই কারণে, একই কবিতা পাঠান্তর যেমন কাহারও পরম আনন্দ তেমন কাহারও পরম বেদনা উদ্রিক্ত হওয়াটাও অসম্ভব নহে। ইংরাজী গীতাঞ্জলির প্রায় সমস্ত কবিতাই এই জাতীয় —এইরূপে সঙ্গীত এবং চিত্রশিল্পের মধ্যপথে—মধ্যভূমিতে রেখা এবং সুরের আভাষময়ী মায়াপুরীর সৃষ্টি! উহারা যেন স্বপ্নদৃষ্ট বাস্তব সত্যের আভাষ বই নহে! ত্রিকোণাকৃতি অথচ স্বচ্ছ কাচখণ্ডের মধ্যদিয়া মনুষ্য জীবনের এবং জগতের দিকে দৃষ্টি! কবি রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন গদ্যেপদ্যে এইরূপ

দার্শনিকতার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন! তাঁহার প্রতিভা একদিকে যেমন সঙ্গীতের প্রতিভা, তেমন অন্যদিকে এই দার্শনিকতার প্রতিভা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। চিত্র-কলার পরিভাষায়, তাঁহার কবিতা অনেকস্থলে স্থূলতঃ, চারিদিকের আবেষ্টন-বিস্মৃত—কেবল একাভিনিবিষ্ট ছবি—জলছবি (water colour painting). এই প্রতিভা অনেক সময় বরং প্রকৃত সত্যকে প্রকৃতনেত্রে দর্শন না করিয়াও কেবল একটা বিশেষ চক্ষে এবং পথে দর্শন করার প্রতিভা! তাঁহার মেজাজের এই বিশেষত্বকে ইংরাজীতে genius of temparament বলিতে পারি। এই মর্জ্জির সহিত—কবির দর্শন প্রণালী অপিচ প্রকাশ-আদর্শের সহিত সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে না পারিলে, এই সমস্ত কবিতার প্রাণভূত ঈশারা বা সঙ্কেতের স্পর্শ-সমক্ষে পাঠকের হৃদয় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলে, উহারা বেদনাদায়ক হইয়া পড়াও বিচিত্র নহে! ইংরাজী গীতাঞ্জলির কবি এদেশের বাস্তবজীবনের ছোট ছোট কাহিনী এবং ঘটনাবিষয়কে ঈশারামাত্রে ধরিয়া ধরিয়া নিজের অজ্ঞাত এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের ক্ষণিক আভাসমাত্র উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, উহা 'ধর্ম্ম' তরফের বা জগতের অব্যক্ত-সম্বন্ধীয় আভাস! অধিকাংশ কবিতাই নিতান্ত 'খাদের পর্দ্দায়' রাগিনী বিনাইয়া সাধারণ শ্রুতির অগম্যালোকে লঘুচঞ্চল রেখা টানিয়াই নিজকে চরিতার্থ মনে করিতেছে! সুতরাং, উহাদের মধ্যে অনেক স্থলেই ভাষা-অধিকারের কিংবা পরিস্ফুট সাহিত্য-অধিকারের কোন বিশেষ প্রাপ্তি নাই বলিয়াও অনেকে নিঃসঙ্কোচে রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন; কেহই ধরাইয়া দিতে পারিবে না—কি পাইলে! পারিলেও, উহার মাহাত্ম্য হয়ত অনেক সময় খুব বেশী বলিয়া ঠেকিবে না! কিন্তু, যাঁহারা ভাষার অধিকার ডিঙ্গাইয়াও তাল-মান-রাগিনীর বা নহবৎরোশনচৌকীর অমূর্ত্ত-অধৃত আনন্দস্পন্দনকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বসিয়া ধমনীর স্পন্দনমধ্যে অনুভব করিতে চায়, পরিস্ফুট লাভালাভ হিসাবের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আনন্দ-আবেশ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চায়, সাহিত্যের তরফে বসিয়াও তানসেনের হস্তস্থিত একতারার একটি তার হইতে একোদ্দিষ্ট অথচ বিভিন্ন রাগিনীর সঙ্গত উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চায়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের এই জন্মসিদ্ধ গায়ককবি রবীন্দ্রনাথের চরমকণ্ঠপরিণতির কুহুকাকলীকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা উদার উপার্জ্জন বলিয়া মনে করিতে পারিবে। উহাকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে গেলে অনেক স্থলে বেদনা ভিন্ন অন্য কোন প্রাপ্তির সুবিধা যেমন কম, তেমনি হৃদয় দিয়া কিংবা স্নায়ুর পথে বুঝিতে গেলেও অনেক সময় অমৃত বলিয়াই অনুভব হইতে থাকিবে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক বা খণ্ড কবিতা মাত্রের মধ্যেও এই সঙ্গীত এবং চিত্র জাতীয় এবঞ্চ অনির্ব্বচনীয় একটা প্রাপ্তি না থাকিয়া পারে না। উহা শ্রেষ্ঠ কলা শিল্প মাত্রেরই সমস্ত ভাবার্থ সঙ্গতি এবং পরিস্ফুট প্রাপ্তির উপরি-পাওনা! কেন না, সৌন্দর্য্য বা আনন্দরসের অনির্ব্বচনীয়তাই শ্রেষ্ঠ শিল্প-মাত্রের অপরিহার্য্য লক্ষণ। বলিতে গেলে, উহা শিল্পাত্মার—প্রকৃত প্রস্তাবে কবির অন্তরাত্মার সহিত সংসর্গ জনিত; উহা কবির ভাষা ভাব প্রকাশরীতি বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যের সমূহ এবং আবেষ্টন হইতে উপজাত

হইয়া শিল্পের অপিচ কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচিহ্নক একটা অনির্ব্বচনীয় প্রাপ্তিরূপেই পাঠকের চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া যায়—জাগ্রত ভাষা-বুদ্ধি কিংবা অর্থ-বুদ্ধির তরফে আসিয়া কোন মতে ধরা দেয় না। বিস্তারিত রামায়ণ মহাভারত মেঘদূত শকুন্তলা বা কপালকুণ্ডলা ইহাদের প্রত্যেকের অন্তরঙ্গীয় সমষ্টি-সুরের মধ্যেই কবির হৃদয়-সঞ্জাত এইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সৌরভ আছে—উহাদের ভাষা-রীতি ঘটনাচক্র এবং অর্থ-অভিব্যক্তির মধ্য হইতে এইরূপ একটা ব্যামিশ্র অথচ অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীত এবং চিত্র-জাতীয় আনন্দের ইঙ্গিত আছে। গীতাঞ্জলির ক্ষুদ্র কবিতা সমুহ সময় সময় জাগ্রতভাবে স্পষ্ট বাক্যের অর্থমাহাত্ম্য সাধন না করিয়াও—এমন কি সময় সময় তাহাকে অমান্য করিয়াও, এই অনির্ব্বচনীয়তার ক্ষেত্রে কেবল দূর-দূরগামিনী ক্ষণপ্রভা প্রসারিত করিতে চাহিয়াছে! এই স্থলেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব! সাহস করিয়া, সুদূর অর্থভিত্তিকে উদ্দেশ্যতঃ পরিহার পূর্ব্বক, হৃদয়কে লঘু তরল কাগজের ঘুড়ীর ন্যায় অধ্যাত্ম-ভাবের শূন্যবিশূন্যে ঘুরিবার জন্য পরিচালিত করায়, একদিকে উহার সাহিত্যলক্ষণ টুকু কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়াছে সত্য; কিন্তু অন্যদিকে দূর-দূরান্তরিত অনুরণন দ্যুতি দৃপ্তি এবং চমক চমৎকারভাবে বাড়িয়া গিয়াছে! ইয়োরোপীয় বিচারকগণ গীতাঞ্জলির এই প্রতিপত্তিকে মৌলিকতা বলিয়া অনুভব করিতে, অপিচ রবীন্দ্রনাথকেও একজন পরম অধ্যাত্ম-অধিকার-শালী কবি বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারিয়াছেন।

এখন, এই গীতাঞ্জলির সমজাতীয় বিলাতী সাহিত্যের দিকে একবার দৃষ্টি পরিচালিত করুন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

গেটের নাটকশিল্পে অধ্যাত্মবাদ

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল—প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব মূর্ত্তিধারণ এই জগতের জীবন। প্রভাতের শিশিরসিক্ত সৌরকর-ভ্রমরের প্রস্ফুট কুসুমের সঙ্গে রহস্যালাপ—জগতের শৈশব-জীবনের ছবি কত সুন্দর! আবার কতিপয় মুহূর্ত্তের পর রঙ্গময়ী প্রকৃতি সৌর-কিরণজালের সহিত মিলিত হইয়া যে দারুণ লীলা জুড়িয়া দেন তাহা কি দুর্ব্বিসহ! তার পর ক্রমশঃ সব লীলা সংহার করিয়া সান্ধ্য-সমীরণ মৃদুল-হিল্লোল-পরশে সংসার-ক্রীড়াশ্রান্ত দেহকে বিস্মৃতির গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে আনিয়া জানাইয়া দেয়—দেখ সবই ক্ষণিক; চক্রবৎ-পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ”—অতএব এ সব আপাত মনোরম বিষয়ে আসক্ত হইও না—আপাত দারুণ বিষয়েও বিরক্ত হইও না—সুখে দুঃখে সমভাব অবলম্বন করিয়া চল। এই করুণ সুরের আশ্বাস প্রকৃতির মুখর বীণার তন্ত্রীতে আলাপিত হইতেছে।

মানবজীবন এই জাগতিক প্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়া কখন সুখে—কখন দুঃখে—কখন আশ্বাসে—কখন নৈরাশ্যে—কখন আসক্তিতে—কখন বিরক্তিতে আবার কখন ঔদাসীন্যে—দিন গণিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে কে বলিবে? কেন এই প্রবাহ—এই বিপুল আবর্ত্তসংকুল মহাম্ভোধি তরঙ্গায়িত কে জানে? ইহার উদ্দেশ্য—ইহার পরিণতির

কথা কেহ জানে বা না জানে—তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া এই জগৎ ও জীবন-সমষ্টি ও ব্যষ্টি—বিরাট বিশ্ব প্রকৃতিরও খণ্ড খণ্ড শক্তি-সমন্বিতদেহ—পরস্পরের দিকে চাহিয়া—উভয়েই সমান স্রোতে সমান তালে সমান কল্লোল তুলিয়া ছুটিয়াছে। অনাদিকাল হইতে ছুটিয়াছে—বিশাল ও বিপুল আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—ভৈরব নাদ তুলিয়া চলিয়াছে—এবং অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে—এই আশ্বাসে চলিয়াছে।

মানবজীবন পরিবর্ত্তনের রঙ্গভূমি। রঙ্গভূমে মুহুর্মুহুঃ পট পরিবর্ত্তন হইতেছে—প্রত্যেক পটেই নব নব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সম্ভার বিস্তৃত রহিয়াছে—মানব সেই সকল মাধুর্য্যরসে প্রলোভিত হইয়া ছুটিতেছে কিন্তু উপভোগ-বাসনা শান্ত হইবার পূর্ব্বেই আশ্চর্য্য কৌশলে পুনরায় পট পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নূতন পদার্থ নূতন আসক্তি আনিয়া দিল--আবার তাহাতেই মত্ত হইয়া মানবজীবন ছুটাছুটি করিতে চলিল। ক্রমশঃ যাহার জন্য ছুটাছুটি করিতেছিল তাহা হারাইল। যাহার শক্তিতে ক্রীড়া করিতেছিল তাহা হীন হইল। দেহ মন প্রাণ—সমস্ত বিফল হইল,—ভবের হাটে আসিয়া কারবার জমাইতে জমাইতে লাভে মূলে বিনষ্ট হইল। সমস্ত ফুরাইল—আশা ভরসা সমস্ত নিঃশেষ হইল—জীবনপ্রদীপ ম্লান হইল—চিতাধূমে চারিদিক ব্যাপ্ত হইল। ক্রীড়া করিতে আসিয়া ইহার সহিত এখন এক সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিল—যে ক্রীড়ার সামর্থ্য নাই—তথাপি ক্রীড়ার শেষ নাই—ক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়াছি—তথাপি ক্রীড়া এমন করিয়া পাইয়া বসিয়াছে যে ইহা হইতে নিস্তার পাইতেছি না—নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। দেহ ছাই হইল—রহিল অঙ্গার। মনের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য গেল, রহিল—অবসাদ। দেহের বল গেল,—রহিল কঙ্কাল; জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য—সমস্ত বিলুপ্ত হইল—রহিল অতৃপ্ত বাসনা। বাসনার প্রজ্জ্বলিত বহ্নি দারুণ হুঙ্কার রবে প্রমত্ত হইয়াছে—ইন্ধন দিতে দিতে ক্লান্ত হইলেও যোগাইতেছি। ভর্ত্তৃহরি সত্যই বলিয়াছেন—

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ।
কালো ন গতঃ বয়মেব গতাঃ।
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ।

—তাই তৃষ্ণা আমাদিগকে জীর্ণ করিতেছে। মানবজীবন—ইহা কি সুধু অবহেলার? ইহা কি সুধু ক্রীড়নকের হস্তের কন্দুক? ইহার কি এইখানেই ও এইরূপেই পরিণতি ও অবসান? সত্যই মানব-ভ্রান্ত! তাই তাহার ঈপ্সিত পথে চলিতে পারে না। মানবের ভ্রম কি? কিসে ভ্রম দূর হয়? ঈপ্সিত কি? কিসে তাহা পাওয়া যায়? ইহাই মানব-জীবনের অন্তরের বাণী। যিনি সমাজকে পথ দেখাইয়া দেন—যিনি দৃষ্টিহীন বিবেক ও বুদ্ধিকে চক্ষুষ্মান করিয়া দেন—তিনিই বন্ধু—তিনিই দেবতা—তিনি অবতার! তাই খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, শঙ্কর আমাদের আদরের। তাই যুগে যুগে মহাপুরুষগণের বাণী শ্রবণের জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য গেটে উনবিংশ শতাব্দীর লেখক, দার্শনিক ও অবতার।

তাঁহার নাট্যকাব্য 'ফষ্ট' আমাদের অনেক আশার কথা বলিয়াছে। পথভ্রষ্ট মানব-সমাজের—মানবজীবনের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, তাই আমরা এমার্সনের ভাষায় বলিলাম যে, গেটে উনবিংশ শতাব্দীর ঋষি (the soul of his century).

(২)

জগতে ও জীবনে অনাদিকাল হইতে যে খেলা চলিয়াছে,—জড়ে ও জীবে—অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতে যে ক্রীড়া প্রসারিত হইয়া সর্ব্বত্র এক উদাসীন গানের সৃজন করিয়াছে ইহাই নাটকের মূল। মানবজীবনে—যে করুণসুরের উদাসীন গান মর্ম্মের-বীণায় আলাপিত হইতেছে—তাহাই সম্পূর্ণরূপে বিচিত্রভাবে রঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করাই নাটকের কার্য্য। উদাসীন গীতস্রোতের মধ্যে যে আকার ও বন্ধনবিহীন ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছে—তাহাই সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করিতে হইলে—নাটককারের মোহন তুলিকার প্রয়োজন। সেইজন্য গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য—একই তরঙ্গের দ্বিবিধ স্রোত। বৈজ্ঞানিকদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—সমুদ্রের উপরে যে মুখর ও উত্তাল তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইতেছে তদপেক্ষাও ভীষণতর স্রোত জলধির অন্তঃস্থলে প্রবাহিত হইতেছে। তদ্রূপ নাটকের আলাপন মুখর ও নানাবর্ণে রঞ্জিত ও নানা সুরে ও তানের ঝঙ্কারে মাধুর্য্যপূর্ণ হইলেও মানব মনের অন্তঃস্থলে যে মৌনবীণার আলাপন হইতেছে তাহার ঝঙ্কার আরও গভীর ও বিপুল। সেইজন্য হেগেল বলিয়াছেন নাটক পদ্যসাহিত্যের পরাকাষ্ঠা। তদপেক্ষাও উচ্চস্থান গীতিকাব্যমূলক পদ্যসাহিত্যের।

প্রাণ অপেক্ষা দর্শনের শক্তি অধিক। প্রাণের দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে কিন্তু দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল। বালকের শিক্ষা দর্শন ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ হয়। আজীবন দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমধিক। প্রাণ আমাদিগকে কতকগুলি জ্ঞানের সংবাদ দেয় কিন্তু তাহা আমাদিগের চিত্তকে তাদৃশ আকর্ষণ করিতে পারে না। উহা দ্বারা চিত্তে ঈষৎ ছাপ পড়ে মাত্র—কিন্তু তাহা ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ততোধিক। কিন্তু দর্শনে সমস্ত মনোবৃত্তিচয় রসে সিক্ত হইয়া দৃশ্যবিষয়ে আবদ্ধ থাকে। তদ্দ্বারা মানব মনোভাণ্ডারের সমধিক বৃদ্ধি ও উপচয় হইয়া থাকে।

এই কারণে শ্রব্য-কাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য আমাদের সমধিক আদরের জিনিস। বালকের গানের সুরে শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করে—কিন্তু যাত্রার কল্পবেশভূষিত অভিনীত বিষয়ের প্রত্যেক স্পন্দন আমাদের হৃদয়ের কথাগুলিকে পূর্ণ করে। রঙ্গালয়ের দৃশ্যাবলীসংযুক্ত কল্পবেশভূষিত অভিনয় আমাদের মনপ্রাণ আলোড়ন ও মন্থন করিয়া জীবনের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। অতএব দৃশ্য অভিনয়ের সঙ্গে জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতন সমধিক নির্ভর করে। সাহিত্যে নৈতিক আদর্শ যেমন প্রয়োজনীয়—তেমনি দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়বিধ অভিনয়েও নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন।

সাহিত্যের সহিত সমাজের ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সাহিত্যে তরলতা, অশ্লীলতা, কুরুচির প্রাদুর্ভাব—তৎকালীন জাতীয়চরিত্রের জড়তা ও হীনতার প্রতিবিম্ব বিশেষ। সাহিত্যে সমালোচনা—নৈতিক ও সমাজিক পরিবর্ত্তনের জন্য বক্তৃতা, সংবাদ পত্র, মাসিক পত্রের প্রাদুর্ভাব—ইহা তৎকালীন সমাজের উন্নতির চেষ্টা ও উৎকর্ষের জন্য ব্যাকুলতার প্রতিবিম্ব। শান্তি ও জ্ঞানের নির্ম্মল প্রবাহ দর্শন ও ধর্ম্মের চর্চ্চা, বিজ্ঞান, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা—এক কথায় নব নব জ্ঞানের নব নব উৎসের ধারা—জীবনের চারিদিক—রাষ্ট্র, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যবসায়,

বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, —আলোকিত করিয়া সংসারকে স্বর্গক্ষেত্রে পরিণত করে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিক্রমাদিতের যুগ রাষ্ট্রীয় শান্তি ও মানসিক উন্নতির বিশালতা ও গভীরতার জন্য আমাদের আদরের জিনিস। ইংরাজী সাহিত্যে এলিজাবেথ-যুগ সেইরূপ আদরনীয়। ভারতীয় সাহিত্যের বুদ্ধদেবের যুগ যেমন, পাশ্চাত্য সাহিত্যের মার্টিন লুথার, নক্স (Knox), ওয়াইক্লিপ (Wyclif) মিল্টন (Milton) প্রমুখ নব খৃষ্ট সম্প্রদায়ের সাহিত্য তেমনি বিশ্বসাহিতের অমূল্য রত্নরাজি। এই সকল পরিবর্ত্তন যুগের (Transition Period) সাহিত্য মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্লেটো, মিল্টন, অ্যাডিসন, ভিক্টর হিউগো, গেটে, সিলার এক এক যুগের সাহিত্যের ও জীবনের পথ প্রদর্শক ধ্রুবতারা। তাহাদের বিমল কিরণ ভবিষ্যৎ সমাজকে আলোক দান করিবার জন্য অক্ষুন্ন প্রতাপে সাহিত্যের নির্ম্মল আকাশে প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

(৩)

আমাদের আলোচ্য গেটে জার্ম্মাণিতে সাহিত্যে রুচিগত বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে অক্লান্তভাবে লেখণী চালনা করিয়া গিয়াছেন। গেটে (Johann Wolfy-ang Goethe) ১৭৪৯ সালে ২৮শে আগষ্ট ফ্রাঙ্কফর্ট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া ১৭৬৫ সালে লিপ্‌জিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহার সমালোচনীয় প্রতিভার বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভালবাসা, সহানুভূতি, কর্ম্মে পরস্পরের সাহচর্য্য এই স্থানেই আরব্ধ হয়। লিপ্‌জিক্ হইতে ষ্ট্রাসবর্গ সহরে রসায়ন (chemistry), শারীর-বিদ্যা (anatomy), সাহিত্য, পুরাতত্ব ও ব্যবহার-নীতি অধ্যয়ন করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত জার্ম্মাণ সাহিত্যবীর হার্ডার (Herder) এর মিলন হয়। হার্ডার তাঁহার দৃষ্টি চারনের গীতি, হোমারের মহাকাব্য ও শেক্সপীয়রের নাটকের প্রতি আকর্ষণ করেন। ১৭৭২ সালে ব্যবহার-নীতিজ্ঞ হইয়া উপাধি লাভ করেন এবং রাজকীয় প্রধান বিচারালয় অলঙ্কৃত করেন। ১৭৭৬ সালে প্রিভিকাউন্‌সেলর হন। সততার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য ১৭৮২ সালে 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৮৫ সালে বৈজ্ঞানিক তত্ব উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হন। এবং নিউটনের আলোকতত্বের খণ্ডন করিবার জন্য ঐ বিষয়ের আলোচনা করেন। ১৭৯৪—১৮০৫ প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ নাট্যকার সিলারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়নের সহিত মিলন হয়। ১৮১৬ সালে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৮৩২ সালে ২২শে মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সিলারের পার্শ্বে তাঁহার দেহ পৃথিবীর ক্রোড়ে স্থাপিত হয়।

আমেরিকান সাহিত্যবীর এমার্সন 'গেটে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—যে গেটে উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক ছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণ স্বরূপ (Soul of his century) ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর জীবনে—কাব্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতিতে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধর্ম্ম বৈচিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহার অদ্ভূতপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তাহাদের সমন্বয় করিয়া সকলকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। * এই সময়ে জার্ম্মাণ র

* He was the soul of his century. * * He was the philosopher of this multipliciting * * able & happy to cope with this rotting miscellaney of facts and science, and by his own versatility to dispose of them with ease.

শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। জাতীয় জীবনে এক অবসাদ আসিয়াছিল; সাহিত্যে অশ্লীলতা ও কুরুচির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সময়ে (১৭৮০-১৮২০) জার্ম্মাণ-সাহিত্য জাগতিক সাহিত্যের অগ্রণী হইয়া জগতকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল।* সাহিত্যে চিন্তায় নূতন স্রোতপ্রবাহের মূল—গেটে, হার্ডার এবং সিলার। এই তিনজনই সমসাময়িক। ইঁহাদের জীবন সমসূত্রে গ্রথিত—একই উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া জগতে যে অভাবনীয় সাহিত্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য সমগ্র মানব সমাজ ঋণী থাকিবে।†

এই সময়ে দার্শনিক কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) "আধুনিক দার্শনিক" সাহিত্যে অভাবনীয় উদ্ভাবন করিয়া দর্শনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বেকন ভূয়ো-দর্শন (Observation), প্রক্রিয়া (Experiment) ও অনুমান সাধন চারিটী প্রণালীর দ্বারা জ্ঞানের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন ও দার্শনিক জ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। দার্শনিক কাণ্ট বলেন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রত্যাক্ষাদি ভূয়োদর্শনের মূল। অনুমান সাধন ভূয়োদর্শনাদি প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষের মূলীভূত ইন্দ্রিয়ের উপর মনের অধিকার বাহ্যজগত অপেক্ষা অধিক; অতএব ভূয়োদর্শন অপেক্ষা মানসিক ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এই সত্যের উদ্ভাবন করিয়া তাহার উপর সমগ্র দর্শন শাস্ত্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। কাণ্ট এর এই আবিষ্কার পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষতঃ দর্শনে—সমগ্র চিন্তার বিষয়কে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। কাণ্টের দর্শন, গেটের মানব মনস্তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটননিপুণ নাটক, হার্ডারের সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ, সিলারের নাটক জার্ম্মাণ সাহিত্যকে এক অভিনব শক্তি প্রদান করিয়াছে।

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজশক্তির লোপ ও প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানের সূত্রপাত করেন। তেমনি গেটে প্রমুখ সাহিত্যবীরগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ধর্ম্ম, নীতি, মনুষ্যত্ব, ত্যাগ, প্রেম, ভগবানের অস্তিত্ব, এই সকল সত্যের অবতারণা করিয়া সুরুচির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া যান। সেইজন্য এমার্সন বলিতেছেন—

"Bonaparte is the representative of the popular external life and aims of the nineteenth century: its other half, its poet, is Goethe."

(৪)

মধ্যযুগ ইউরোপীয় সাহিত্য ও জীবনের নিকট আদরনীয়। এই যুগে এক নবভাবের প্রবাহ সর্ব্বদেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র উন্নতির জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন দেখা দিয়াছিল।

* What is strange, too, he lived in a time when Germany played no such leading part in the world's affair. * * He is not a debtor to his position, but was born with a free and controlling genius.—Emerson.

When it lay politically powerless, it created its world-conquering thinkers and poets—a process that has no equal in history.—Windelband's History of Philosophy.

† With Herder and Goethe begins, what we call, after them world-literature, the conscious working out of true culture from the appropriation of all the great thought-creations of all human history.—Windelband.

ইহার পূর্ব্বে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ, তদীয় প্রজাপুঞ্জ, দেশবাসী চিন্তাবীরগণ—ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যবীর—নিজ নিজ দেশের প্রচলিত অভ্যস্তমার্গে আপন মনে গৌরবের ছবি অঙ্কিত করিয়া চলিতেন। জগতে জ্ঞাতব্য জিনিস আছে—জগৎ যে এক নিরবচ্ছিন্ন একতান প্রবাহ নহে—প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টিও রক্ষা করা তাহার মুখ্য কর্ম্ম,—বৈচিত্র্যের যথাযথ স্থানে সন্নিবেশ সৌন্দর্য্য ও সুষমার অবতারণা করে—তাহা 'আমনো তেমনঃ পবন্' জ্ঞাত হইলেও এবং লেখনীচালন সময়ে ইহার ভূয়োবর্ণন ও প্রশংসা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিলেও—তাহা ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য ও নীরস হইয়া আসিতেছিল—যেখানে মন নীরবতা ও জড়তার স্রোতে গাত্রাবগাহন করিয়া সুষুপ্তির ও মৃত্যুর আস্বাদনের নিবিড়তা উপভোগে শ্রান্ত হইতেছিল সেই সময়ে রেঁনাসেসের দুন্দুভিনাদ চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া দিল। স্বপ্ন হইতে জাগরুক হইয়া জগতকে নূতন চক্ষে দেখিল—নূতন করিয়া দেখিবার পিপাসা বাড়িল—তামসিক জাড্য-দোষ-দুষ্ট নিরবচ্ছিন্ন একতান প্রবাহের বাধা পড়িল। জীবনকে জীবন বলিয়া চিনিল। জীবনের অমৃতসিঞ্চণী মৃতসঞ্জীবনীবাণী সর্ব্বত্র এক আশার উদ্রেক করিয়া দিল। তাহারা সম্মুখে দেখিল—নিখিল মানবের কর্ম্ম-প্রবাহ দশদিকে আবর্ত্তন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সকলে জীবনে বৈচিত্র্যের স্থান—বৈচিত্র্যের বিচিত্র পরশ—মরণের হিমময় কোল হইতে তাহার পার্থক্য এবং জীবনের বিপুলতা, অসীমতা হৃদয়ঙ্গম করিল। অঞ্জনের দ্বারা দৃষ্টিশক্তির স্ফুরণের ন্যায় নব আলোকের নব আবাহন—নব উন্মাদনা—নবীন আশা ও ভরসা বক্ষে লইয়া আবার কর্ম্মপ্রবাহের বিপুল আবর্ত্ত সংকুল মহাম্ভোধির মধ্যে জীবনতরীকে ভাসমান করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল। সর্ব্বদেশে কর্ম্মের স্রোত ও তজ্জন্য সর্ব্বত্র এক বিপুল উদ্যোগের সাড়া পাওয়া গেল। হৃদয়-গুহাশায়ী দেবতা একদিন সুষুপ্তির ও মৃত্যুর হিমময় প্লাবনে স্নাত হইয়া অসাড়তা ও নির্জ্জীবতার মধ্যে নিমজ্জমান ছিলেন—তিনি সহসা জাগ্রত হইয়া বর ও অভয় হস্তে লইয়া বলিলেন—"এই বর তোমারই প্রাপ্য, আমি তোমাকে অভয় দিতেছি—তোমার বিঘ্ন ও বিপদ রাশ দূর করিবার জন্য শক্তিমান হও—আলস্য, জড়তা, অনিচ্ছা, আশঙ্কা, সম্ভোগ—ইত্যাদি প্রবৃত্তি নিচয়কে সম্যক্‌রূপে আমার অভয়ে ও আশীর্ব্বাদে সমূলে নাশ কর,—করিয়া মনুষ্যত্ব মহারত্ন উত্তোলন কর; ত্যাগের অভ্রভেদী শুভ্র হিমালয়ের কনক-কিরীটী শিখায় যে প্রেমকমল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে তাহার বিমল পরিমল তোমার সকল শ্রম, ঝঞ্ঝাবাত দূরীভূত করিয়া আনন্দ সাগরে প্লাবিত করিবে। এস আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সহচর আছি—তোমার শুভানুধ্যায়ন করিয়া চলিয়াছি চলিতেছি ও চলিব। শুধু কর্ম্ম কর—করিয়া বরের উপযুক্ত হও 'নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচীন্!'।" রেনাসেসের পর (১৪৫৩) ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্র জাগিয়াছিল। রাষ্ট্রে, নীতিতে, ধর্ম্মে, ধর্ম্ম-যাজনব্যাপারে, শিক্ষা, দীক্ষা—সর্ব্বব্যাপারে—এক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। দেশীয় প্রচলিত আচার ব্যবহারের প্রতি লোকের আস্থা হ্রাস হইতেছিল এবং নবীন আচার ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ

তাদৃশ ছিল না। সর্ব্বত্রই এক আকাঙ্ক্ষা জাগরুক কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপায় নাই। সর্ব্বত্র অশান্তি—মানবের হৃদয়ের মধ্যে অশান্তির বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। নবীন ও প্রবীণে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সমাজ কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় তরঙ্গমালা-কুল সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। প্রবীন দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতে চাহে না—নবীন—নূতন পথ আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে চলিতে লাগিল। এইজন্য সমস্তদেশের চিন্তাবীরগণ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা পথ আবিষ্কার করিয়া নবীন সমাজের আকাঙ্ক্ষাকে সম্যক পরিচালনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ফরাসী বিপ্লব ও তৎসংক্রান্ত বিপ্লববাদীগণ সকলেই উদার ও স্বাধীন মতাবলম্বী। ইঁহারাই উদীয়মান নবীনভাবের নেতা। তাঁহাদের সাহিত্যের মধ্যে এক গভীর উন্মাদনা এক মর্ম্ম ছিল হিংসার অজগর সর্প রাষ্ট্রনীতির পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া সমুজ্জিত হইতেছিল। ইহার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, পরস্পর দ্বন্দ্বদ্বেষ হিংসার প্রজ্বলিত বহ্নি, ঘোর অরাজকতা, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের করালগ্রাস, রক্ত স্রোতের ভৈরব কল্লোল জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার আতঙ্ক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তাহা নির্ব্বাপনের জন্য সর্ব্বদেশবাসী চিন্তাবীরগণ বিশেষ সযত্ন ছিলেন। তন্মধ্যে গেটে, ভিক্টর হিউগো উল্লেখ যোগ্য।

রাষ্ট্রনীতিতে বিশৃঙ্খলা, সমাজে আদর্শের অভাব, প্রচলিত ভাবের প্রতি বিরাগ, সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী যে বিশৃঙ্খল পরাভিমর্শন প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র নিদারুণ বৈষম্য ও ভেদবাদের সূচনা করিয়াছিল তাহা দূরীভূত করিয়া শান্তি ও মঙ্গলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে গেটে তাঁহার অমরলেখনী ধারণ করিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। সেই লেখনীর অমৃত সুধাধারা নাট্যকবিতা ফষ্ট (Faust). গেটে 'ফষ্ট' অভিনয় রচনায়—জাতীয়, সমাজ-সম্বন্ধীয় এবং মানবীয় (ব্যক্তিগত) সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে সুদক্ষ নাবিকের মত তাঁহার কাব্যের সোণার তরীকে ধ্রুবতারার দিকে মৃদু মন্দ কোমল কর পল্লব বিতাড়ণে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়াছেন।

শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র।

সুবর্ণবিহার

নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরের তিন মাইল পশ্চিমে নবদ্বীপের পথে সুবর্ণবিহার একটী প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত পল্লী। গ্রামের কিছু দক্ষিণে সুবর্ণরাজার গৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্তূপের চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডে ব্যাপ্ত। গ্রামের মধ্যে কার্য্যোপলক্ষে খনন করিতে করিতে একটী প্রোথিত প্রাচীর পাওয়া গিয়াছিল, শুনিলাম। বৃদ্ধ গ্রাম্য জমিদার বলেন যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্তূপের নিকটবর্ত্তী ভূমির কর্ষণের সময় কতকগুলি ভাঁজ করা জীর্ণ বস্ত্র পাওয়া যায়। কাপড়-গুলি তুলিবার চেষ্টা হইলে সেগুলি চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার মতে সেগুলি সুবর্ণরাজার সময়ের রেশমী বা তসরের কাপড়। মধ্যে এই স্তূপ হইতে যে তিনখানি ক্ষুদ্র স্তম্ভের

মত প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটী সুবর্ণবিহার গ্রামের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাহার উপরে উৎকীর্ণ চিত্রলিপি কালে নিরতিশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। স্তূপে পুরাতন মৃৎপাত্রের কয়েকটী ভগ্নাংশ ও পুষ্পাঙ্কিত বা শৃগালের পদলাঞ্ছিত একটী ইষ্টকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

এই সুবর্ণ রাজার সম্বন্ধে কেহই এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন নাই বা পারেন নাই।

৺নরহরি চক্রবর্ত্তীর "নবদ্বীপ পরিক্রমা"র একস্থলে লিখিত আছে।

"সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস!
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে জে বিলাস॥"

প্রাচীন কবি চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রামের নামের উৎপত্তির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

রাজা "সেইক্ষণে দেখে তাঁরে সুবর্ণবরণ।
সুবর্ণ বিগ্রহের বিচার হইল ধ্যান।
এই হেতু সুবর্ণ বিহার নাম স্থান॥"

কিন্তু তদঞ্চলের লোকের ধারণা যে সুবর্ণ রাজার নামনুসারেই গ্রামের নাম সুবর্ণবিহার হইয়াছে।

গ্রামের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে সবুজ তৃণগুল্মে বিমণ্ডিত যে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত-প্রমাণ মৃত্তিকাস্তূপ বিদ্যমান আছে তাহাই সুবর্ণরাজার গৃহের ভগ্নাবশেষ। স্তূপের দক্ষিণভাগে একটী শিমুলগাছের পাদমূলে একটী পুষ্করিণীর জীর্ণাবশেষ আছে। গর্ত্তটীর তলদেশে একটী প্রোথিত প্রস্তর স্তম্ভের অগ্রভাগ দৃষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে স্তম্ভটীর চতুর্দ্দিকের ভূমি খনন করা হইয়াছিল। কিন্তু অর্থ ও উৎসাহের অভাবে খনন কার্য্য বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

কিংবদন্তী এইরূপ, "উপরিস্থ প্রাসাদের নিম্নে সুবর্ণরাজার পাতালপুরী ছিল। তাহার মধ্যে ছয়মাসের উপযোগী আহার্য্য সংগৃহীত থাকিত। প্রস্তর স্তম্ভটী পুরী প্রবেশের সুরঙ্গমুখে স্থাপিত ছিল। স্তম্ভটী সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিবার কৌশল রাজার কোন বিশ্বস্ত ভৃত্যের পরিজ্ঞাত ছিল।" এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পুষ্করিণীটীতে এখন অত্যধিক বারিপাতেও জল জমিতে দেখা যায় না। প্রস্তর স্তম্ভের উপরিভাগে বিলুপ্ত খোদিত চিত্রাদির অস্পষ্ট চিহ্ন আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে যে, "দুর্জ্জয় মারাঠা দস্যুর আগমনে অনন্যোপায় রাজা পাতালপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। উপরিস্থিত ভৃত্য মূঢ়তা-বশতঃ মারাঠা অসির করাল কবলে নিপতিত হইল। আর রাজা সেই পাতালভবনে চিরসমাধি লাভ করিলেন।" কিন্তু এইরূপ কাহিনী নিতান্ত সাধারণ। অনেক পুরাতন বংশের অধঃপতনের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। তাই এই সামান্য জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই।

স্থান বিশেষের খনন ব্যতীত এখন এই সুবর্ণরাজার তথ্য নির্ণয় করা অতি দুরূহ। খনন কার্য্যও ব্যয়সাধ্য। সেজন্য আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্যোৎ-সাহিগণের ঐকান্তিক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

গ্রামের নামে 'বিহার' কথাটী থাকাতে অনেকে অনুমান করেন যে সুবর্ণরাজা বৌদ্ধ নরপতি ছিলেন এবং সুবর্ণবিহার একটী প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মঠ ছিল। এক সময়ে বঙ্গ-ভূমি যে বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোতে প্লাবিত হইয়া-ছিল তাহার নিদর্শনও বিরল নহে। গত পূর্ব্ব বৎসরে আমরা জলঙ্গী নদীর বালুকায় যে একটী অভিনব প্রস্তরমূর্ত্তি পাইয়াছিলাম

তাহা কেহ কেহ "সদাশিবের" মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিলেও তাহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত। সেরূপ মূর্ত্তি এখন কেহ পূজা করে না। বঙ্গদেশে সুবর্ণবিহারের ন্যায় অন্য কোন বিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি না জানি না। সেন রাজাগণের সময় হইতে বঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে বলিয়া অনুমান হয়। নরহরি চক্রবর্ত্তীর "কহিব পশ্চাৎ এ গ্রামে জে বিলাস" (গৌরাঙ্গের) হইতে উপলব্ধি হয় যে সুবর্ণ-বিহার কোন সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী কেন্দ্র হইয়াছিল। তবে নরহরি চক্রবর্ত্তী গ্রামের নামের উৎপত্তির সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা কাল্পনিক; অত্যধিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এই বিবরণের মূলীভূত কারণ বলিয়া অনুভূত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও সুবর্ণরাজার সম্বন্ধে মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্তূপটীর বর্ত্তমান অবস্থা হইতে তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহার কয়েক মাইল উত্তরে জলঙ্গী নদীর অপর পারে 'বলালঢিপি' প্রায় সমবস্থাপন্ন, কেবল অপেক্ষাকৃত উন্নত।

সম্প্রতি অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় যে সুবর্ণচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সহিত সুবর্ণবিহারের কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস-গগনে নূতন আলোকপাত হইবে। বসাক মহাশয়ের আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বর্ণিত সুবর্ণচন্দ্রের রাজ্য বিস্তারের কথা এইরূপ আছে—

"১০। যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতিঃদ্বীপে দীলিপোপমঃ॥"

তাম্রশাসন বর্ণিত সুবর্ণচন্দ্র প্রবল প্রতাপান্বিত বৌদ্ধ নরপতি ছিলেন তাহা লিপি হইতে জানা যায়। তাম্রশাসনে সুবর্ণচন্দ্রের রাজধানী বা রাজত্বকাল উল্লিখিত নাই।

আবার দুর্লভমল্লিক কৃত "গোবিন্দচন্দ্র গীত" নামক প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে;

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধারিশ্চন্দ্র পিতা।
তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র শুন তার কথা॥"

মহারাজা সুবর্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র রাজার পিতা মাণিকচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজা সুবর্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী।

আমরা জানি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পাল বংশীয় রাজাগণ ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের অধীশ্বর হন। পশ্চিম বঙ্গ তখনও কর্ণসুবর্ণ নামে অভিহিত হইত। জানি না কর্ণসুবর্ণের সহিত সুবর্ণচন্দ্র নামের কোন সম্পর্ক আছে কি না। আমাদের আলোচ্য সুবর্ণবিহার বর্ত্তমান ভাগীরথীর তীরের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ভাগী-রথীর গতি চিরপরিবর্ত্তনশীল। এই সুবর্ণবিহার পালরাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী ছিল। এই সীমান্তের রক্ষার জন্য বোধ হয় সুবর্ণবিহারে সীমান্তদুর্গ বা রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজন হয়। সম্ভবতঃ সুবর্ণবিহার পূর্ব্বদেশস্থ পালরাজ্যের রাজধানী ছিল। অতঃপর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সেন রাজাদিগের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে 'বলালঢিপি'তে সেন রাজধানী স্থাপিত হয়। উক্ত রাজধানী সুবর্ণবিহারের অনতিদূরবর্ত্তী। সম্ভবতঃ সেন রাজাদিগের অভ্যুদয়ে সুবর্ণবিহার হইতে পালদিগের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

ভাষা ও জাতি

[ভাষার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারা জাতির প্রকৃতি স্থির করিবার একটা রীতি আছে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা খুব কম লোকেই অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য এই পদ্ধতি দ্বারা সব সময় যে অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যায়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা না করিলেও পদ্ধতিটা যে একেবারে অবৈজ্ঞানিক, তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হই। সেই জন্যই লেখকের অবলম্বিত পন্থাটা আমরা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।]

'জাতির উপরে ভাষার প্রভাব আছে' ইহা একটা মৌলিক কথা। যত প্রকারে এই প্রভাবের প্রকাশ হইতে পারে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় বা বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব।

বাংলা ভাষাতে কোন কথা যে প্রকারে লিখিত হয়, পড়িবার সময় সাধারণতঃ আমরা সে প্রকার পড়ি না। লেখা থাকে যদি "নবীন," পড়িবার সময়পড়ি "নবীন্", লিখিত ভাষায় শেষোক্ত 'ন' টী স্বরযুক্ত; কিন্তু পঠিত ভাষায় হসন্ত। যে জাতির কথিত ভাষায় এবম্বিধ হসন্ত শব্দ বা অক্ষরের প্রাচুর্য্য থাকে, সে জাতি বিশেষ তেজবীর্য্যশালী ও শক্তিমান্। ইংরেজীর সহিত বাঙ্গালা সামান্য তুলনা করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। ইংরেজীতে যদি বলি come (কাম্), বাঙ্গালায় বলিব, 'এস'। ইংরেজীতে যদি বলি love (লাভ্), বাঙ্গালায় বলিব 'ভালবাসা'। ইংরেজীতে যদি বলি 'here' (হিয়ার্), বাঙ্গালায় বলিব 'এখানে'। এই প্রকার comparison (কম্পেরিজন্), তুলনা। Food (ফুড্) খাদ্য; night (নাইট্) রাত্রি; word (ওয়ার্ড্) বাক্য। ইংরেজীতে যে প্রকার হসন্ত শব্দের বাহুল্য, বাঙ্গালায় তেমনটী নাই; ফলে দেখা যায়, যে ইংরেজ জাতি বাঙ্গালী জাতি অপেক্ষা তেজবীর্য্যে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

হিন্দির সম্বন্ধেও ঐ কথা। বলদৃপ্ত পাঞ্জাবী যাহাকে বলে হাম্, তুম্ ক্ষীণ-প্রাণ বাঙ্গালী তাহাকে বলে 'আমি' 'তুমি'—ষষ্ঠ হস্ত পরিমিত পাঠান যদি বলে 'দেখ্‌নে', 'কর্‌নে', শক্তিহীন আমরা বলিব 'দেখিতে' 'করিতে'। ভাষা যে প্রকার মোলায়েম হইয়া আসে, তেজবীর্য্যও তত হ্রস্ব হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত উদাহরণ ব্যতীত আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। পাঠক নিজে নিজেই বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

গুর্খালী হিন্দির রূপান্তর মাত্র। তিব্বতীয় ও বাঙ্গালা ভাষার সামান্য ভেঁজাল টুকু বাদ দিলে ইহা খাঁটি হিন্দি বই আর কিছুই নহে। সুতরাং হিন্দির সম্বন্ধেও যে কথা গুর্খালি সম্বন্ধেও সেই কথা। গুর্খা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা শৌর্য্যবীর্য্যশালী তাহার প্রমাণ তাহার ভাষাতেই বিদ্যমান। গুর্খাদের কথিত ভাষায় বিস্বর অক্ষরের প্রাদুর্ভাবেই তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের নিদর্শন। দুই একটী উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। গুর্খারা বলে যেমন—কা কুরা গর-

দাইছ, আলিক্ পানি দিমু পর্হ—আমরা এই ভাবব্যঞ্জক কথা স্বরযুক্ত করিয়া বলি 'কি কথা কহিতেছ'; 'কিছু জল দিতে হইবে বাঙ্গালা অপেক্ষা গুর্খালীতে হসন্তের ব্যবহার অধিক দেখা যায়, ফলে বল বিক্রমে গুর্খা বাঙ্গালীর আদর্শস্থানীয়।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন বাঙ্গালা ভাষায় হসন্ত শব্দ বা অক্ষরের আদৌ প্রয়োগ নাই, এবং বাঙ্গালী মেরুদণ্ড বিহীন। বাঙ্গালায় হস্ন্ত শব্দ আছে—কিন্তু ইংরেজী ও হিন্দির তুলনায় তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; তাই ইংরেজ ও হিন্দুস্থানী অপেক্ষা বাঙ্গালী তেজবীর্য্যে খাটো।

বাঙ্গালা ভাষায় স্বরহীন শব্দ আছে, শুধু তাহা নহে; এমন ভাষা আছে যাহাতে সাধারণতঃ বাংলা ভাষা অপেক্ষাও অল্প সংখ্যক হসন্ত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সাঁওতালদের ভাষা তাহার একটা প্রমাণ। যেমন—আমরা যদি বলি 'তোরা কোথায় যাচ্ছিস্', সাঁওতাল বলিবে 'ওকাতে চলাকানা হো'; আমরা যদি বলি 'তোরা এদিক্ আয়্'—সাঁওতাল বলিবে 'মা হিজুনে হো'। বাঙ্গালা অপেক্ষা সাঁওতালীতে সচরাচর হসন্ত শব্দের সংজ্ঞা কম দৃষ্ট হইলেও, সাঁওতালীতে যে হসন্ত শব্দের একেবারে প্রয়োগ নাই, এমত নহে; এবং যদিও সাঁওতাল জাতিকে সাধারণ দৃষ্টিতে নির্জীব বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে তাহারাও বলবিক্রম দেখাইয়া থাকে। ১৮৫৮ সনের সাঁওতাল বিদ্রোহই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু এমন একটী জাতি আছে, যাহাতে হসন্ত শব্দের প্রয়োগ এত অল্প, যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা যেখানে কথিত ভাষায় হসন্ত উচ্চারণ না করিয়াই পারি না সেখানেও তাহারা স্বরান্ত উচ্চারণ করিবে। তাহাদের মেরুদণ্ডের অবস্থাও তাহাদের ভাষার সদৃশ। এমন দুর্ব্বল ভাষা ও এমন দুর্ব্বল জাতি জগতে আছে কি না সন্দেহ।

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে আমি উড়িয়া ভাষা ও উড়িষ্যাবাসীদের কথা বলিতেছি। উড়েদের ভাষা শুনিলেই মনে হয়, যে তাহাদের শরীরের সন্ধিস্থলের সমস্ত সংযোগ একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। একটী গল্প বলিয়া এ কথার সত্যতা দেখাইতে চাই।

কোন সাহেবের এক উড়ে বেয়ারা ছিল—সে একবার ছুটী নিয়া দেশে যাইবার সময় অন্য একজন উড়েকে তাহার স্থলে রাখিয়া যায় এবং উপদেশচ্ছলে তাহাকে বলিয়া যায় যে 'যখনো সাহেবো বলিবে 'বরং দি ওয়াটার' ধাই করি জলো পাকাইবা—আর যখনো সাহেবো বলিবে 'ডেমো,' 'রাজকেলো,' তখনো বুঝলো যে কপালো ভাঙ্গলো। ইহার মানে এই যে যখন সাহেব বল্বে Bring the water তাড়াতাড়ি জল নিয়া দিবে; আর যখন সাহেব বলিবে dam, rascal তখন বুঝ্বে যে কপাল ভেঙ্গেছে।

ইংরেজী তেজের ভাষা—সে তেজের ভাষাতেও dam, rascalএর মত তেজী কথা আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেই dam, rascal উড়ের হাতে পড়িয়া ডেমো, রাজ-কেলো তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। dam, rascal কথা দুটা ইংরেজীতে শুনিলেই সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় লাল ডগ্‌ডগে দুটা চোখ, হস্তস্থিত যষ্টির অস্বাভাবিক আন্দোলন, এবং সবুট পদযুগলের আইনদুষ্ট ব্যবহারের কথাই মনে হয়; আর সেই কথাই উড়ের মুখে

শুনিলে বোধ হয় যেন অন্নপ্রাসনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত সাগু ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য উড়ের পাকোদর পবিত্র করে নাই।

Bring the waterও উড়ের মুখে তাহার 'বরং দি ওয়াটারো' রূপদুর্গতির সম্বন্ধেও ঐ কথা।

জাতির উপর ভাষার অন্য যে কোন প্রভাব থাকুক না কেন, ভাষার স্বরান্ত ও হসন্ত শব্দের ন্যূনাধিক্যে যে জাতির তেজ-বীর্য্যের ন্যূনাধিক্য হয়, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। স্বর যোজনা করিলেই যেন অক্ষরের স্বাধীন তেজে আঘাত লাগে—এবম্বিধ সংমিশ্রণই যেন ভাষার উদ্দামশক্তির প্রতিবোধক। অল্প স্বরযুক্ত ইংরেজী ভাষা এ বিষয়ে স্বরবর্ণ বহুল সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার একটী বন্ধু বলিয়া থাকেন যে রাগ হইলেই তাঁহার হিন্দি বা ইংরাজীতে কথা আসে। বাঙ্গালা ভাষা রাগের ভার সহিতে পারে না—ক্রোধের সময় যে তেজের বিকাশ হয়, ক্ষীণপ্রাণ বঙ্গ-ভাষায় তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় ত আজ কাল পদ্যের অভাব নাই, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের—

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে—
জাগিয়া উঠিল শিক্

নির্ম্মল্ নির্ভীক্ এর মত কয় লাইন পদ্য আছে? মেঘনাদ বধ, বৃত্র সংহার ও পলাশীর যুদ্ধের ভেরী নিনাদের পর আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই ছেলেখেলা বাঁশীর টুন্‌টুনে ও ঘুমন্ত (sophorific) আওয়াজই শ্রুতিগোচর হয়। ইহাতে কবির ক্ষমতাহীনতা থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষা যে একেবারে দায়ী নহে, একথা বলা যাইতে পারে না।

ভাষার সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—ভাষা দিয়াই সচরাচর জাতি বিভাগ হইয়া থাকে; সুতরাং ভাষার পক্ষে যাহা তেজোব্যঞ্জক, জাতির পক্ষেও তাহা তেজোব্যঞ্জক না হইয়া পারে না। স্বর যোজনা দ্বারা ভাষার উন্মুক্ত শক্তির লাঘব হইলে, জাতির উপরও যে সে লাঘবতার প্রভাব আসিয়া পড়িবে না, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই।

শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

লৌকিক ধর্ম্ম

স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে এক অমর কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই লোকবিশ্রুত গ্রন্থ খানিতে তাঁহার অপূর্ব্ব অনুসন্ধিৎসা, অসামান্য মনীষা, চমৎকার লিখন-ভঙ্গী, এবং আমাদের ধারণার অতীত আরো অজস্র বিষয়ের অবতারণা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। এহেন গ্রন্থ বিশদরূপে আলোচনা করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া তৎসম্বন্ধে দুই কথা কহিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনা। কথাটা বোধ হয় না বলিলেও চলিত। কিন্তু তবুও বলিতে হইতেছে এই জন্যে যে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পাঠ করিয়া কোন কোন বিষয়ে আমাদের মনের মধ্যে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে

খানিকটা ক্ষোভ আসিয়া জুটিয়াছে। পল্লীবাস-জনিত কুসংস্কার বশতই হউক বা শিক্ষাভাব নিবন্ধন অজ্ঞতা বশতই হউক কতকগুলি অসার প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটা অনাবশ্যক ব্যাকুলতা জাগিয়াছে।

প্রায়ই শুনিতে পাই আমাদের অধিকাংশ গ্রাম্যদেবতার পূজা 'বুদ্ধ' দেবেরই পূজা মাত্র। অনেকানেক পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছি "একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াই গেছে যে 'ধর্ম্মরাজের' পূজা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহিত।" 'শীতলা'ও এইরূপ, এবং আরও যে কত "এইরূপ" আছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। কুসংস্কারান্ধ আমরা বুঝিতে পারি না কিরূপে কাহার কর্ত্তৃক 'বৌদ্ধ' দেবমূর্ত্তিগুলি হিন্দুর প্রচ্ছদ পটে পরিশোভিত হইয়া এইরূপে পরিণত হইয়াছেন। সিদ্ধান্ত শুনিয়াছি, কিন্তু অনুশীলনী পাঠের সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশ্য এমন কথাও বলা চলে না যে দীর্ঘ নিদ্রার পর গাত্রোত্থান করিয়া কেহ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিযা বসিবে, অমনি "মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়" তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন। তবে দুঃখ হয় যে, আধুনিক যুগের স্বনামধন্য মহাপুরুষগণ 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'রবিন্দ্রনাথ' প্রভৃতি কি কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, কোন্ মহা মন্ত্রের প্রচার করিলেন পল্লীবাসী হাজার হাজার নরনারী তাহার কিছুই বুঝিল না। কিন্তু যাউক সে কথা, আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়টী বলিয়া যাই।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' গৌড়িয় যুগ নামক অধ্যায়ে "লৌকিক ধর্ম্ম শাখা" নাম দিয়া লিখিয়াছেন "লৌকিক দেবতাগণের পূজা প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেই খানেই একটী দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিতা মাতা কি মাতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে 'ষষ্ঠী' কল্পিত হইলেন।" 'মঙ্গল চণ্ডী' বিপদ নিবারণের জন্য, 'সত্য-নারায়ণ' আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য, ব্যাঘ্রের দেবতা 'দক্ষিণের রায়' ও সর্পের দেবতা 'মনসা' যথাক্রমে ব্যাঘ্র ও সর্পভীতি নিবারণের জন্য কল্পিত হওয়ার কারণ দর্শাইয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন "ইহা ছাড়া বৌদ্ধগণের 'হারিতী' দেবীও 'স্কন্দপুরাণ' এবং 'পিচ্ছিলা' তন্ত্রোক্ত কয়েকটী শ্লোক হইতে নব শক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক জ্বর পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। ডোমাচার্য্যগণের পূজিত সিন্দূর মণ্ডিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখ বিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণালতন্তু সদৃশী মার্জ্জনী কলসোপেতা সুর্পালঙ্কৃত মস্তকা শীতলা দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন।" আমরা ক্ষুব্ধ হই এই ভাবিয়া যে এই সমস্ত ব্যাপার খামখা ঘটিল কিরূপে। রায় সাহেব মহাশয় তো লিখিলেন 'কঠিন নহে'। কিন্তু আমরা যে বিষম সমস্যায় পড়িলাম। এতদিন ধরিয়া যাহাকে পূজা ধ্যানে আপনার করিয়া আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছি এক ফুৎকারে তাহার সবই উড়িয়া গেল! এত ক্ষণভঙ্গুর ভিত্তিতে তাহার প্রতিষ্ঠা! মাতামহী ঠাকুরাণীর উর্ব্বর মস্তিষ্কে যাই 'ষষ্ঠীর' প্রসঙ্গ গজাইয়া উঠিল, পত্নীবৎসল মাতামহ মহাশয় অমনি ধাঁ করিয়া তাহার এক মঙ্গল গাথা রচনা করিয়া ফেলিলেন। হারিতী দেবী শীতলারূপে ডোম পুরোহিতগণের হাত ছিনাইয়া হিন্দু ব্রাহ্মণের বাড়ী হাজির হইলেন, আর নির্ব্বিবাদে ব্রাহ্মণে তাহাকে অভ্যর্থনা

করিয়া লইলেন। ব্যাপারগুলি এতই সহজ কিনা চিন্তা করিবার বিষয়। রায় সাহেব মহাশয় 'পুরাণের' দোহাইও দিয়াছেন আবার "ধর্ম্ম কলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধিশীর্ষক অধ্যায়ের" একস্থানে লিখিয়াছেন "সংস্কৃত বচন স্পর্শমণির তুল্য, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্রও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এইজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে 'মনসা-মাহাত্ম্য' সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়া এবং 'বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে কালকেতু ও শালবাহনের' উল্লেখদ্বারা বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি দৃঢ় করা হইয়াছিল," এই সব যে করিল কে এবং কোথা হইতে কি হইল তাহার কোনোই মীমাংসা হইল না। না হউক, আমাদের কিন্তু ধারণা অন্যরূপ। আমাদের মনে হয় বেদোপনিষদের পরমোদার ভাবাবলী পুরাণের অমৃতময়ী ছন্দে প্রচারিত হইয়া ভারতের মহোপকার সাধন করিয়াছিল। তাই ভারতের মানুষ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া পার্থিব সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিল। তাই আমাদের সমাজের হাড়ি ডোম চাঁড়ালকেও রাম লক্ষ্মণ বা সীতা সাবিত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ইউরোপীয় কুলীদের মত 'লম্বোর' জিজ্ঞাসা করিয়া বসে না। সাধনার নিভৃত প্রকোষ্ঠ স্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুনিয়ন্ত্রিত জাতিভেদের গণ্ডীমধ্যে এই পৌরাণিক শিক্ষারই অমৃত-দীধিতী মুচিরাম দাস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর পরম আদরের ধন এহেন পুরাণে যে অধিকারী-ভেদে সাধনার বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তখনকার উচ্চ-সম্প্রদায় শিক্ষার বলে হৃদয়ের বলে বলীয়ান্ ছিলেন। তাঁহারা কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, ব্রহ্মানন্দের অমৃত প্রস্রবণ ইঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত হইত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ইতর সাধারণ, যাহারা সামান্য আঘাতেই কাতর হইয়া পড়ে, বিপদের ভীতি অল্পেই যাহাদিগকে বিহ্বল করিয়া তুলে, তাহাদের তো একটা অবলম্বন চাই, বুক পাতিয়া পড়িয়া থাকিবার স্থান, কাঁদিবার তো একটা আশ্রয় চাই। লোকহিতরত ত্রিকাল-দর্শী ঋষিগণ তাহারই জন্য এই লৌকিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অথচ লোক সংগ্রহের জন্য সমাজের আদর্শ শ্রেষ্ঠ সম্প্র-দায়েরও এসব অনুষ্ঠানে নিষেধ নাই, বরং বিধি আছে। গীতা যে বলিয়া গিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনাং
যোজয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিদ্বানযুক্তঃ সমাচরন্"

তাই বলিতেছিলাম "দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক" কথাটা ঠিক, কিন্তু 'দুর্ব্বলগণের' দেবতা কল্পিত হয় নাই। কালজয়ী ঋষিগণের দুর্ব্বলের প্রতি অপার অনুকম্পাই ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

মানুষ যতই বড় লোক হৌক তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার সীমা স্বভাবতঃ ক্বচিৎ হইতে দেখা যায়; তাই ভারতবর্ষ আপনার দৈনন্দিন জীবনটীকেও ধর্ম্মের অনুশাসনে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। "ভোগ সংযমের সাথে বাঁধা" পড়িয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে 'ডাক্তারের নিকট আয়ু ভিক্ষা না করিয়া' 'সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে যশের ঢাক না বাজাইয়া' 'গোলামীতে উপার্জ্জনের পন্থা না দেখিয়া' ভগবদ্‌বিভূতি দেবশক্তিরই নিকটে যদি সমস্ত প্রার্থনা করা যায়, তাহাতে এমন কি দোষ ঘটিতে পারে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝা গেল না। ভারতীয় সাধনার মূল মন্ত্রই হইতেছে—

"দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম বাপ্স্যথ"

উদরের চিন্তা যখন ভুলিবার নয়, কর্ম্ম

করিতেই হইবে, অথচ ধর্ম্মছাড়া কিছুই হইবে না, তখন, ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের এই উৎকৃষ্টতর সমন্বয় যে সর্ব্বথা সুসঙ্গত হইয়াছে চিন্তাশীল মাত্রেই এ কথা স্বীকার করিবেন। তুমি মাংস খাইবে, শাস্ত্র বলেন বৃথা মাংস খাইও না। দরিদ্র তুমি, দেবোদ্দেশ্যে অনিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিবে না, তোমার জন্যও ব্যবস্থা রহিয়াছে—'যদন্নো পুরুষো রাজা তদন্নঃ পিতৃদেবতা'। এই অধিকারভেদ লইয়াই স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে অনুষ্ঠেয় লৌকিক ধর্ম্মের প্রচার, ইহা 'দুর্ব্বলতাসূত্রে' অসার কল্পনা নহে।

লৌকিক-ধর্ম্মের দ্বিতীয় কথা 'দেবতার প্রাধান্য' লইয়া অনেকেরই মত "সম্প্রদায়-ভেদে ধর্ম্ম কলহ আমাদের লৌকিক ধর্ম্ম-সাহিত্যে বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।" এক ধর্ম্মের প্রতি অন্য ধর্ম্মের আক্রমণ অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রভৃতির তথাকথিত সমালোচনায় যতটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ততটা হয়তো নাও হইতে পারে। সুখ দুঃখে বিপদে সম্পদে জড়িত করিয়া আপন আপন কুলধর্ম্মানুযায়ী 'গৃহস্থের' কুল-দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই কুলধর্ম্ম যে অবশ্য পালনীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের মুখে তাহা স্পষ্টতঃ পরিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণ এই কুল-দেবতাকে যদি আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহাতে ক্ষতি কাহার? আপন আরাধ্য দেবতাকে যদি আমি আমার স্বরচিত গ্রন্থে প্রাধান্য দান করি তাহাতে নিষেধ করিবেই বা কে? হিন্দুধর্ম্মে কস্মিন কালে গোঁড়া পাতী বলিয়া কোন কথা নাই। তবে নৈষ্ঠিক ভক্ত চিরকালই বলিয়া আসিতেছেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমল লোচনঃ"

এই জন্য পুরাণে দেখিতে পাই যেখানে যে দেবতার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে তাঁহাকেই 'তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর' বলিয়া ভক্তি কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করা হইয়াছে। "রুচি বৈচিত্রে ঋজুকুটীল নানা-পথাবলম্বী" মানব সাধারণের পক্ষে ইহার উপকারিতা সম্ভবতঃ ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। 'সাহিত্য' হিসাবে ইহার কোনও মূল্য পুরাণকার অবগত ছিলেন কিনা জানি না, আধুনিক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার 'সাহিত্যে' 'বিশ্ব সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"আরো একটা কারণ আছে। সংসারে যাহাকে আমরা দেখি তাহাকে ছড়াইয়া দেখি—তাহাকে এখন একটু, তখন একটু, এখানে একটু, সেখানে একটু দেখি—তাহাকে আরো দশটার সঙ্গে মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই সকল ফাঁক সেই সকল মিশাল থাকে না। সেখানে যাহাকে প্রকাশ করা হয় তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়, তখনকার মত আর কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না। তাহার জন্য নানা কৌশলে এমন একটী স্থান তৈরি করিয়া দেওয়া হয়, যেখানে সে-ই কেবল দীপ্যমান।" একথা সত্য হইলে 'প্রাচীন বঙ্গ কবি'গণকেও অন্ততঃ ক্ষমা করা উচিত।

ক্রমবিকাশ বলিয়া কথাটার আজকাল বড়ই বাহুল্য প্রচার। সাধনার রাজ্যেও ইহার যাতায়াত আছে বলিয়া মনে হয়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটী প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করিতেছি। "বরুণের পুত্র ভৃগু একদিন পিতাকে বলিলেন ভগবন আমাকে 'ব্রহ্ম' উপদেশ করুন। পিতা সংক্ষেপতঃ সজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন—বৎস 'যাহা হইতে প্রাণী সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা জীবনধারণ

করে এবং সময়ে যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয় তাহাই ব্রহ্ম' শ্রবণ মননাদি দ্বারা তাঁহারই স্বরূপ জানিতে চেষ্টা কর। ভৃগু পিতৃ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তপস্যায় স্থির করিলেন 'অন্নই ব্রহ্ম' কিন্তু তৃপ্তিলাভ হইল না, পুনরায় পিতৃসকাশে গিয়া উপদেশ চাহিলেন, বরুণ পূর্ব্ববৎ তপস্যার উপদেশ দিলেন। ভৃগুও সাধনার ক্রমোৎকর্ষের ফলে অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মন, প্রাণ, বিজ্ঞান, শেষে 'আনন্দকেই ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন"। কথায় আছে—"সাধিলে ঢেঁকিও সিদ্ধ হয়" কিন্তু তাই বলিয়া "আঙ্গুল ফুলিয়া তো আর কদলী বৃক্ষ হয় না" কাজেই অধিকারভেদ না মানিয়া উল্লম্ফনে শীর্ষারোহণের চেষ্টা করিলে লোকে অকাল পক্কতা বলিয়াই ব্যাখ্যান করিবে। পুণ্যবান তুমি, জন্ম জন্ম সাধনার ফলে যদি তোমার সৌভাগ্যোদয় হয়, পার্থিব ধনজনের মোহ আর তোমায় ভুলাইয়া রাখিতে না পারে, "যং লব্ধা চাপরং লাভ মন্যতে নাধিকং ততম্" তাঁহার জন্য যদি তোমার ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই জাগে, তখন তুমিও আনন্দময়ের স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে। যতদিন তাহা না হইতেছে ধনের জন্য ব্যাকুল হইতেছ, তুমি অন্য দেবতার উপাসনা কর, 'করুণা পারাবারের' কূলে বসিয়া তুচ্ছ বিষয় মদিরার কামনা করিও না। পুরাণের তো ইহাই উপদেশ, লৌকিক ধর্ম্মের নিম্নতম স্তরেও এই উপদেশই তো অনুস্যূত রহিয়াছে।

লৌকিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তৃতীয় কথা 'হিন্দুর ঠাকুর এত পূজা কাঙ্গালে কেন'? এই দেবতাগুলির মধ্যে পূজা গ্রহণের এত চেষ্টা এত হুড়াহুড়ি কেন? দেবতায় যদি বলে "আয় ভ্রমান্ধ জীব আমার কাছে আয়—কেন মরীচিকা মায়ায় ঘুরিয়া মরিতেছিস্, এখানে আসিলে তোর সকল আশাই পূর্ণ হইবে, সকল জ্বালারই অবসান হইবে।" দোষ হয়? কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"প্রথমেই চোখে পড়ে দেবী চণ্ডী নিজের পূজা স্থাপনের জন্য অস্থির, যেমন করিয়া হউক ছলে বলে কৌশলে মর্ত্তে পূজা প্রচার করিতে হইবেই"। আমাদের মনে হয় এই ভাবের উৎপত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে। শ্রীভগবান যখন বলিতেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ যাজী মাং নমস্কুরু"

ইত্যাদি, কই তখন তো শ্রীভগবানের স্বার্থ-পরতার আরোপ করিয়া কেহ কোন কথা কহে না। আর গ্রাম্য কবিগণ যখন এই কথাই একটু সংকীর্ণভাবে একটু রং ফলাইয়া পরিবর্ত্তিত আকারে বলিতেছেন—

"আমি সত্যনারায়ণ শুন দ্বিজবর
আমারে ভজিলে ধন হইবে বিস্তর"

তখনি তাহা দোষের কথা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ মুখে যাহাই বলুক অন্ততঃ অন্তরের মাঝেও অনেকেরই দারাসুত ধন দৌলত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে টান থাকে। এ অবস্থায় শুধু 'পাপ মুক্তির' কথা শুনিলেই যে সকলে অর্জ্জুনের মত আশ্বস্ত হইবে সে আশা করা বৃথা, সুতরাং 'ভোগের মধ্যেই ত্যাগের শক্তি সঞ্চয়ের' জন্য বিষয় বিভবেরও আবশ্যকতা আছে বৈ কি। তাই বলিতেছিলাম 'দুর্ব্বলতায় ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় না। শাস্ত্র বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" সেই জন্যই বলিয়াছি নিম্নতম অধিকারীর জন্য বলহীনের বলাধান জন্য'ই লৌকিক-ধর্ম্মের প্রচার। ইহা ত্রিকালদর্শী ঋষিগণেরই ব্যবস্থাপিত সনাতন পদ্ধতি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মেদহ্রাস

আজকাল অনেক বিলাতী মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনীতে মেদহ্রাস করিবার ঔষধাদির নাম দেখা যায়। সকল "সভ্য" লোকেই বলিয়া থাকেন দেহে মেদবৃদ্ধি হইলে লোককে কুৎসিত দেখায়। বাস্তবিক কুৎসিত দেখাক বা না দেখাক মেদবৃদ্ধির যে অনেক অসুবিধা তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। মোটা হইলে আলস্য দিন দিন বেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও মেদযুক্ত ব্যক্তির অনেক নিন্দা করিয়াছেন। চরকের মতে "অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় হ্রস্ব, অতিশয় লোমযুক্ত, একেবারে লোম রহিত, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত গৌরবর্ণ অতি স্থূল ও অতি কৃশ এই আট প্রকারের শরীরী অতিশয় নিন্দিত; তন্মধ্যে অতি দীর্ঘ ও অতি হ্রস্ব বা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বভাবতঃ ঐরূপেই জন্মগ্রহণ করে সুতরাং তাহাদের দোষ অপরিহার্য্য। পরন্তু অতি স্থূল ও অতি কৃশের নিন্দা উপায় অবলম্বনে পরিহার করা যাইতে পারে আবার এই প্রকার নিন্দিতের মধ্যে অতি স্থূল ও অতি কৃশ বিশেষরূপে নিন্দিত।" ঋষি আবার একস্থলে বলিয়াছেন "অতি স্থূল ও অতি কৃশ ব্যক্তি সততই রোগগ্রস্থ হয়, একারণ পুষ্টিকর ঔষধের দ্বারা অতি কৃশের ও কর্ষণ বা কৃশকারক ঔষধ দ্বারা অতি স্থূলের উপচর্য্যা করিবে। স্থূল ও কৃশ উভয়ে-সমান হইলেও এই দুই এর মধ্যে বরং কৃশ ব্যক্তিকে ভাল বলা যাইতে পারে কেন না পীড়া হইলে কৃশ অপেক্ষা স্থূলব্যক্তি অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।"

ফ্যাসানের জ্বালায়ই হউক আর অন্য যে কোনও কারণেই হউক অনেকেই আজকাল এই ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে চান। মেদবৃদ্ধিকে একটা ব্যাধি বলিলাম বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, আমি ভুল বলিয়াছি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে গলদেশে যে Thyroid নামক একটি গ্রন্থি আছে তাহার যথাযুক্ত কার্য্যকারিতা না ঘটিলেই মেদবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে বংশপরম্পরায় পিতা হইতে পুত্রে চলিতে থাকে। এই সকল লোক অধিকমাত্র শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বা স্নেহ ব্যবহার করিলে দিন দিন স্থূলকায় হইয়া শেষে জড়বৎ মাংসপিণ্ড হইতে থাকে। আমাদের দেশের বড় লোকদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের অধিকেরই আছে। স্নেহজাতীয় খাদ্যই ত তাঁহাদের প্রধান খাদ্য, তাহার উপর আবার কায়িক পরিশ্রমের নাম নাই। যাহাই হউক বাজে কথা ছাড়িয়া কাজের কথার অবতারণা করা যাউক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শরীরের আভ্যন্তরিক কোনও প্রকার ক্ষতি না করিয়া কি করিয়া মেদের হ্রাস করা যাইতে পারে আমি সেই সম্বন্ধেই দুই চারিটি কথা বলিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে আমি স্বয়ং যে উপায় অবলম্বন করিয়া মেদহ্রাস করিয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কৃতকার্য্য হইলে বা অন্য কোন উপায় জানা থাকিলে আমাকে জানাইলে বিশেষ

বাধিত হইব। মেদহ্রাস করিতে হইলে দৈনিক জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। সদাসর্ব্বদাই কার্য্যে লিপ্ত থাকার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যত কম বিশ্রাম লওয়া যায় ততই ভাল। বিশ্রাম বলিলে অনেকে নিদ্রার কথা যেন না মনে করেন। দিবা নিদ্রা একেবারে পরিত্যজ্য। ইহা ছাড়া নিয়মিত উপযুক্ত ব্যায়ামের আবশ্যকতা। সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান খাদ্যবিচার। নিম্নে এইগুলির সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে সাধারণ লোকের ওজন ১মন ২৫ সের হইতে ১মন ৩০ সের হওয়া উচিত। কিন্তু জলবায়ুর জন্য ইহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সাধারণ বাঙ্গালীর ওজন একমণ দশ সের হইতে দেড়মন। একমণ ২৫ সের ওজনের লোক প্রায় অল্প। এক্ষেত্রে সমকায় অর্থাৎ দেহের যেথায় যেরূপ আবশ্যক সেখানে সেই পরিমাণে মাংস-পেশীযুক্ত ব্যক্তির কথা বলা যাইতেছে। পেশীযুক্ত লোকের ওজন একমণ ৩০ বা ৩৫ সের পর্য্যন্তও হইতে পারে কিন্তু সচরাচর এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল শতকরা এক বা দেড় জন মাত্র। মেদহ্রাস করিবার পূর্ব্বে দেহের ওজন কত জানা উচিত এবং প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার ওজন হইয়া দেখা আবশ্যক যে কত পরিমাণ কমিতেছে। ওজন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। যে "কাঁটায়" বা দাঁড়িতে ওজন হইতে হইবে তাহাতে যেন ১ পোয়ার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আর একটি বিশেষ কথা যে ওজন হইবার সময় প্রত্যেক বারই যেন পরিচ্ছদের সমতা থাকে অর্থাৎ এক প্রকারের পোষাক পরিয়া প্রত্যেকবার ওজন হওয়া আবশ্যক।

ছয়মাস পূর্ব্বে আমার ওজন ছিল ২মণ ৫ সের। এখন আমার ওজন ১মণ ২৯ সের অর্থাৎ ১৬ সের কমিয়াছে গড়ে প্রতি মাসে ২॥০ সের কমিয়াছে। এরূপ ২॥০ সের ওজন কমাতে আমাকে ক্ষীণ বা অন্য প্রকার শারীরিক বা মানসিক দৌর্ব্বল্য ভোগ করিতে হয় নাই বরং অনেক সময় স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি। দৈহিক ওজন কমাইবার সময় বিশেষভাবে এ বিষয়ে নজর রাখা উচিত, যেন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক দৌর্ব্বল্য না ঘটে। সেরূপ ঘটিলে আরও লঘু পথ্য অবলম্বনীয়।

মেদহ্রাসের সময় সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য খাদ্যের প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখা একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেক সময় আমরা যাহাকে পেটপুরা খাওয়া বলি, দৈহিক গঠনের ও ক্ষয় পূরণের জন্য সচরাচর তত খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। তখন বিনা কারণে আমাদের দেহের কোষগুলির কার্য্যকারিতা বাড়াইয়া দিই। বাঙ্গালা দেশে আমরা সচরাচর শ্বেতসার খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। শ্বেতসার খাদ্যের কার্য্যকারী শক্তি অধিক *। শ্বেতসার দেহের মধ্যে নানা প্রকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পর জৈবিকশর্করা (glycogen) রূপে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য এই জৈবিকশর্করা আবার স্নেহরূপে পরিণত হয়। আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা যে কেবল "দুধ ঘি" বা স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতেই মেদ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহা একেবারে

* উল্লিখিত খাদ্যে শ্বেতসার শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লেখক।

সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতে যে স্নেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়াও শ্বেতসার এমন কি অন্নসার হইতেও যথেষ্ট স্নেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখানে আরও বলা আবশ্যক যে এইরূপে উৎপন্ন স্নেহ সহজে দৈহিক কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে মেদহ্রাস করিতে হইলে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। শ্বেতসার কত পরিমাণে খাওয়া কর্ত্তব্য তাহা বলা বাস্তবিক অত্যন্ত কঠিন। কেন না খাদ্যের পরিমাণ কাহারও ঠিক নহে। কেহ বা দুই বেলায় ৩ পোয়া চাউল খাইয়া থাকেন, কেহ বা আধসের খাইয়া থাকেন, মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে, চালের পরিমাণ অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়াই ভাল তবে ইহাতে নিতান্ত কষ্ট হইলে ⅔ ভাগ খাওয়া উচিত। আলু যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। আলুর পরিবর্ত্তে শাক সবজী— যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহাতে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ অতি সহজে দূর হয়। অন্যান্য শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে চিনি বা গুড় একেবারে না খাওয়াই ভাল। অনেকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে চিনি বা গুড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বা অন্যান্য মিষ্টান্ন ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধাজনক। যাঁহারা চা পান করেন তাহারা যেন অল্প চিনিই ব্যবহার করেন।

আমরা বাঙ্গালী এত অধিক শ্বেতসার ব্যবহার করি কেন? আমার বোধ হয় ইহার কারণ যে আমাদের প্রত্যেক খাদ্যেই অন্নসারের পরিমাণ অতি অল্প। দেহ রক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অন্নসার পাইবার জন্যই আমরা এত অধিক মাত্রায় শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের অনেক সময় পেট পুরিয়া খাওয়া হয় বটে, তবে পুষ্টির অনুপাতে তাহাতে অন্নসার না থাকায়, অনেক সময় উপবাসের সমান হয়। সেই কারণে শ্বেতসারের পরিমাণ কমাইতে হইলে অন্নসার-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। দৈহিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানিকদের মতে এক পোয়া অন্নসার জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালীর কয়জনের অদৃষ্টে ইহা জুটিয়া উঠে? এই অন্নসারের অভাবই আমাদের জাতীয় দৈহিক অবনতির প্রধান কারণ। আমি এমন অনেক লোক দেখিয়াছি যাঁহারা তর্কের খাতিরে দুই একজন বাঙ্গালীর অদ্ভুত শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন হিসাব করিয়া দেখেন, শতকরা কত লোক এরূপ দেখিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যদেশীয় লোকদের অনুপাতে কত দাঁড়ায়। European বা Eurasians যুবকগণ সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা যে অনেক পরিমাণে দৈহিক উন্নতি করিয়া থাকে তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে খাদ্য যে প্রধান তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ম্যাকে সাহেব এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ লোকের যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক মেদহ্রাসকারীর তাহার অর্দ্ধেক জুটিলেই যথেষ্ট বুঝিতে হইবে। অন্নসারের মধ্যে সাধারণতঃ আমরা ডাল ছোলা, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব এবং ছানা ধরিয়া থাকি।

তবে ভৈষজ অন্নসার অধিকাংশ স্থলে পরিপাক ও শোষিত হয় না। এই কারণে মৎস্য মাংস ও ডিম্ব এই তিনটী প্রধান অন্নসার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ধরিয়া থাকি।

মৎস্য—একছটাক বা ডিম্ব একটা হইলেই যথেষ্ট, অবশ্য আমি সাধারণ লোকের জন্য পরিমাণ দিতেছি না। মাংস অনেকের পক্ষে জুটিয়া উঠা দুষ্কর—আবার অনেকের রুচি-বিরুদ্ধ। যাঁহারা ডিম্ব ব্যবহার করিবেন তাঁহাদের পক্ষে কাঁচা ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় কারণ পরিপাক হিসাবে ইহা শ্রেষ্ঠ। যাঁহাদের কাঁচা রুচে না তাঁহাদের পক্ষে ৫ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া লবণের সাহায্যে গ্রহণ করা শ্রেয়। অন্নসার খাদ্যের মধ্যে ডিম্বগ্রহণ অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক। আর ছানা মুখরোচক ও উৎকৃষ্ট হইলেও ইহাতে স্নেহের পরিমাণ যথেষ্ট আছে, তাহা ছাড়া উহা সকলের পক্ষে কি জুটিয়া উঠা সম্ভব?

স্নেহ-জাতীয় খাদ্য বিষবৎ ত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হয়। বাঙ্গালীর যাহা কিছু "ভাল খাবার" তাহাতে স্নেহের পরিমাণ এত অধিক যে মেদযুক্ত ব্যক্তির তাহা গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত। স্ত্রীলোকেরা যেমন ব্রত করেন বা "বাবা বিশ্বেশ্বরকে যে দ্রব্য দিয়া আসেন" তাহা আর জীবনে গ্রহণ করেন না। মেদযুক্ত ব্যক্তির সেইরূপ স্নেহ-জাতীয় খাদ্য বাবা বিশ্বেশ্বরের নামে উৎসর্গ করা উচিত। বাঙ্গালীর স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, মাখমই প্রধান। আমি অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি যে "তরকারিতে" এত বেশী তৈল ও ঘৃত দেওয়া হয়, যে খাইবার পর উত্তমরূপে মাটি বা সাবান দিয়া না ঘষিলে হাতে লাগিয়া থাকে। আজকাল বাঙ্গালায় ঘৃত ও তৈল কি উপাদানে প্রস্তুত তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালীর অম্লরোগের বোধ হয় ইহা একটি অন্যতম কারণ। এই সকল কারণে মেদযুক্ত ব্যক্তির কোথায়ও নিমন্ত্রণ না গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকের খাদ্যে এক ছটাক স্নেহ থাকিলেই যথেষ্ট। সমস্ত খাদ্যেই কিছু কিছু স্নেহ থাকে কাজেই স্নেহের জন্য কোন প্রকার স্নেহ-জাতীয় খাদ্য মেদযুক্ত ব্যক্তির আবশ্যক হয় না।

প্রধান তিন প্রকার খাদ্যের কথা বলা গেল। এক্ষণে জল ও লবণের কথা বলা যাউক। লবণ যতই কম গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল। অধিক মাত্রায় লবণ খাইলে রক্তের গাঢ়ত্ব বাড়িয়া উঠে এবং উহাকে যথারীতি তরল অবস্থায় রাখিবার জন্য রক্তে জলের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কাজেই দৈহিক ওজনও বাড়িয়া যাইতে থাকে। Forster প্রমাণ করিয়াছেন যে যদি কোনও জন্তুকে খাদ্যের সহিত কোনও প্রকার লবণ না দেওয়া যায় তাহা হইলে অতি অল্পদিনেই সেই জীবের দেহত্যাগ ঘটিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া কাহারও দেহত্যাগ ঘটিবার ভয়ের কারণ নাই, কেন না খাদ্যের প্রত্যেক উপকরণেই যথেষ্ট পরিমাণে লবণ আছে। আমরা সাধারণতঃ ৪ তোলা আন্দাজ লবণ গ্রহণ করিয়া থাকি। ২ তোলা আন্দাজ ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হইবে। সম্প্রতি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মেজর ডি, ম্যাকে এ সম্বন্ধে একজন Asst. Surgeon এর উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনি লবণের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া যথেষ্ট দৈহিক ওজনে কমিয়াছিলেন। বিশেষ আবশ্যক বোধ না হইলে লবণ ব্যবহার না করাই উচিত। জলের পরিমাণ সম্বন্ধে এই

বলা যাইতে পারে যে, আমরা অনেক সময়ে অকারণ অনেক জলপান করিয়া থাকি তাহা না করাই শ্রেয়ঃ। খাদ্যের সম্বন্ধে মোটামুটী ভাবে বলা গেল। এক্ষেত্রে আমার খাদ্যের তালিকা উদ্ধৃত করা গেল।

প্রাতে
- চাল—আধ পোয়া
- ডাল—এক ছটাক
- আলু—একটা মাত্র প্রায় এক ছটাক

বৈকালে
- আটা—আধপোয়া
- ডিম্ব—একটা
- আলু—একছটাক
- বা ছোলা সিদ্ধ—অর্দ্ধছটাক

১০।১৫ দিন অন্তর "পূরা পেটা" ফল খাইলে অনেক উপকার দর্শে। অবশ্য সেই দিন ফল ছাড়া আর কিছু খাইতে নাই। যাহারা উপবাস করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে এই প্রথা অবলম্বন করিলে ভাল হয়। তবে আমি বড় উপবাসের পক্ষপাতী নহি, কেন না ইহাতে শরীর অনেক পরিমাণে লঘু হয় বটে কিন্তু অতি অল্পেই দুর্ব্বল হইয়া পড়া হয় ইহা বড় বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য যাঁহাদের উপবাস করিলে কোনও কষ্ট হয় না তাঁহারা মাসে ২বার উপবাস করিতে পারেন। তবে অনেকে লুচি খাইয়া "একাদশীর উপবাস" করিয়া থাকেন অবশ্য এইরূপ উপবাস না করাই যুক্তিযুক্ত। কলিকাতার ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারীত ফল খাওয়ার সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছিল; এ সম্বন্ধে মন্তব্য "স্বাস্থ্য সমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছিল। রোজ কিছু ফল খাইতে পারিলে ভাল হয় কিন্তু গৃহস্থের ঘরে জুটিবে কি?

এতক্ষণ খাদ্যের বিচার হইল। এইবার ব্যায়াম সম্বন্ধে বলা যাউক। আজকাল অনেক প্রকার ব্যায়াম দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। ডাম্বল, মুদ্গার, বৈঠক, ডন ইত্যাদি ত আছেই। তাহা ছাড়া ফুটবল আজকাল গ্রামের অভ্যন্তরে দেখা দিয়াছে। ইহাকে বাঙ্গালী একেবারে জাতীয় ক্রীড়া করিয়া লইয়াছে। আমার মতে মেদযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ফুটবল' ব্যায়াম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা সেখানে পাঁচজনের সহিত দৌড়াদৌড়ি খেলাও আমোদ আছে। আমি নিজে বাঙ্গালী কাজেই বাঙ্গালীর স্বধর্ম্ম জানি, একলা কোন ব্যায়ামই ভাল লাগে না। প্রথম প্রথম হয়ত দুই দশদিন বেশ ডম্বল বৈঠক ডন দিলাম কিন্তু কিছুদিন পরে আর ভাল লাগে না। তবে পাঁচজনের সঙ্গে হইলে চলিতে পারে। সেখানে "competition" চলে তাহাতে বাস্তবিকই ব্যায়ামকে আমোদজনক করিয়া তুলে। তবে ফুটবলে অনেকের পক্ষে অত্যধিক ব্যায়াম "over exercise" হইয়া পড়ে।

সেই জন্য দৌড়ানই প্রশস্ত। ইহাও পাঁচ সাত জনের সহিত বেশ ভাল লাগে নচেৎ নহে। আমি যখন প্রথম দৌড়াইতাম তখন সকলের শেষে এবং অনেকক্ষণ পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতাম। কিসে একটু আগে পৌঁছিতে পারি সে বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকিত। যখন Fort Williamএর চারিধার দৌড়াইয়াছিলাম তখন যিনি প্রথম হইয়াছিলেন তাঁহার লাগিয়াছিল ১৭½ মিনিট আমার লাগিয়াছিল ৩৭¼ মিনিট। তবে আমি সবটা দৌড়াইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে হাঁটিয়াছিলাম। অবশ্য এখন আরও অল্প সময়ে কেল্লা ঘুরিতে পারি। একটা "রেসা রেসি" না থাকিলে ব্যায়ামে সুখ নাই। যাহাতে সুখ নাই তাহা কে করিতে চাহে? মধ্যে মধ্যে খুব বেশী হাঁটা ভাল। সপ্তাহে

অন্ততঃ একদিন ৭।৮ মাইল হাঁটিলে বেশ ভাল হয়। ইহাও দুই চারিজন একসঙ্গে করা উচিত, অশ্বারোহণ, নৌকাবাহন ইত্যাদি খুব ভাল হইলেও সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

দৈনিক জীবনকে এমনভাবে ভাগ করা উচিত যাহাতে আলস্যের জন্য যেন এক মুহূর্ত্ত না থাকে। সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত থাকাই ভাল। দিবানিদ্রা একেবারে পরিত্যজ্য, কোনও কারণে ইহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৩ মাইল বেড়াইতে পারিলে ভাল হয়। রাত্রি ১১টা বা ১১॥ টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবার প্রশস্ত সময়।

অনেকে ঔষধাদি দিয়া মেদহ্রাস করিতে ইচ্ছুক কিন্তু আমি ঔষধ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অনেকে বলেন Potassium বা Sodium এর কতকগুলি লবণের মেদ হ্রাসের শক্তি আছে। একথা সত্য কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই হৃৎপিণ্ডের অবসাদক (depressant) আবার অনেকের দ্বারা fatty degeneration of heart হইতে পারে। অনেকে বলেন অধিক পরিমাণে অম্ল খাইলে বিশেষতঃ Vinegar খাইলে উপকার দর্শে। ইহার কারণ এই যে অম্লের দ্বারা gastritis নামক রোগের উৎপত্তি হয় তাহাতে শোষণ ও পরিপাক কার্য্য ঠিক হয় না কাজেই মেদ-হ্রাস হইয়া থাকে।

অনেকে আবার Thyroid Extract ব্যবহার করেন। ইহাতে দৈহিক দাহন-কার্য্য অধিকমাত্রায় হইতে থাকে। কাজেই প্রস্রাবের সহিত urea, uric acid, phosphate xanthine bases ও প্রশ্বাসের সহিত অধিকমাত্রায় আঙ্গারাম্ল বাষ্প বাহির হইতে থাকে। ইহার ⅓ ভাগ স্নেহের দহন হইতে এবং ⅔ ভাগ অন্নসার দহন হইতে উৎপন্ন। যাহাদের কোনও প্রকার হৃদ্‌রোগ আছে তাঁহারা যেন কোনও কারণে এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার না করেন। আজ কাল আবার Iodothyrine নামক একটা নূতন ঔষধ বাজারে আমদানী হইয়াছে—

"কার্শ্যার্থঃ স্থূলদেহানামাম্বুশস্তং মধুদকং"-চরক

মধুর সহিত জলপান করিলে কৃশ হওয়া যায় কিনা আমি জানি না, কাহারও এ সম্বন্ধে জানা থাকিলে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লী-সংস্কার

"সংস্কার" শব্দে কি বুঝি? "সংস্কার" শব্দে বুঝি যাহা একদিন ছিল, আজ তাহার অভাব হইয়াছে এবং সেই অভাব দূরীকরণ-জন্য বিশিষ্ট উদ্যোগের নামই সংস্কার-সাধন। সংস্কার অর্থ কোনও কিছুর অভাব হইয়াছে, তাহার সেই অভাব দূর করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করা। যাহা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে, তাহারও দেশ-কাল-পাত্র-দোষে দুষ্ট ভাগটুকু বর্জ্জন করিয়া নবীনের মৃত-সঞ্জীবনীসুধায় সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতঃ পুরাতনের পুনর্জীবন

দান করা। ইংরেজ কবিচূড়ামণি টেনিসন বলিয়াছেন—

"The old order changeth yielding
place to new."

তবে এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে পল্লীর কি ছিল এবং এখনই বা তাহার কিসের অভাব হইয়াছে এবং সেই অভাবের দূরীকরণার্থ কিরূপ উদ্যমেরই বা দরকার?

নিত্য উৎসবমুখর অগণ্যবদনসমূহ পরিবেষ্টিত ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত নগর সমূহ হইতে দূরে থাকিয়া শান্তিপ্রিয় মানবমণ্ডলী দলবদ্ধ হইয়া চিরশোভনা চির-আনন্দদায়িনী প্রাণময়ী নিসর্গ মাতার স্নেহাঞ্চলছায়ে যে জায়গায় স্ব স্ব পুত্র কলত্রাদি লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত তাহারই নাম ছিল পল্লী। ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, প্রভুত্বের লালসা, বিলাসের সুতীব্র জ্বালা, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন, হিংসা, অসূয়া প্রভৃতি সেই শান্তিনিকেতনের চতুঃসীমায়ও পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না। স্নেহ, মমতা, প্রীতি প্রফুল্লতা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লীলাভূমি সুদূরাবস্থিত পল্লীসমূহ লোকমাত্রেরই বড় লোভনীয় বস্তু ছিল। সেই জন্যই শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে "আ পঞ্চাসং বনং ব্রজেৎ।" বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ় অবস্থা পর্য্যন্ত মানুষ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; সংসারের শত কামনা, শত উদ্যম এবং শত লালসায় পরিবেষ্টিত থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার পর বৃদ্ধ বয়সে শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য বনে গমন করিবে। যদি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষ লালসার তাড়নায় বাতাহত কদলীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে, তবে আর তাহার জীবনে তৃপ্তি রহিল কই?—তাহার জীবন ত কেবল লালসার জ্বালামাত্রই রহিয়া গেল। অশান্তি, উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষাই তাহার চিরসঙ্গী হইল; সে বুঝিল না তাহার প্রাণ বাস্তবিক কি চায়।

অনাদি অনন্তকাল প্রবাহের এক অন্ধকারময় কুক্ষি হইতে কোন্ এক অজানিত শক্তির বলে উত্থিত একটী তরঙ্গফুৎকারের মত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি দেখিতে পাইল?—জগৎ তাহার প্রথম নয়নোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ অজানিত অননুভূত সৌন্দর্য্যরাশি তার সদ্যবিকশিত চক্ষু দুইটীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল?—নিঃসহায় নিঃসম্বল মানব-শিশু জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্কেই কোন্ অপার্থিব স্নেহরসপানে মুগ্ধ হইয়াছিল?—তার অস্ফুট মনোবৃত্তিগুলি কোন্ লোভনীয় সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে ক্রমবিকাশলাভ করিবার অবকাশ পাইয়াছিল?—মানবজীবনের মধুরতা তার প্রাণে কেইবা প্রথম অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল?—অনন্ত নক্ষত্রখচিত, চন্দ্রসূর্য্যালোকিত, অসীম, উদার গগনমণ্ডল, করুণাময় পিতার অনাবিল করুণানিষিক্ত চিরশ্যামল প্রকৃতি মাতার অক্ষয় সৌন্দর্য্যভাণ্ডার, স্বভাবচঞ্চল, স্বৈরগতি বিহগবৃন্দের ললিত মধুর সঙ্গীত, দিগন্তবিস্তৃত সুখশীতল মলয়ানিলপরিবাহিত গন্ধসম্ভার, বেলাতটচুম্বিত ফেনপুষ্পহার অনন্ত পারাবারের মনোমুগ্ধকর অনন্ত নৃত্য কে তাহার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল? কোন্ পুণ্যভূমিতে, কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে মানুষ প্রাণে প্রাণে ধরা পড়িয়াছিল? আত্মীয়তা এবং সৌহার্দ্দবিকাশচ্ছলে কোন্ পুণ্যজননী তাহার নিরাশ্রয় মানবশিশুকে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল? সংসারের শত কুটিলতাজালের বাহিরে রাখিয়া যে স্নেহময়ী জননী তাহার অপোগণ্ড মানবশিশুকে আপন স্নেহাঞ্চলছায়ে

পুরুষ পুরুষানুক্রমে পালন করিয়া আসিতেছেন, আমরা কি তাহার খোঁজ করিয়া থাকি? যিনি আপনার প্রাণের সমস্ত ভালবাসা, আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য, আপনার অক্ষয় ভাণ্ডার এবং আপনার স্নেহকরুণ হৃদয়খানি লইয়া চিরদিনই সমানভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত রহিয়াছেন, আমরা ভুলক্রমেও কি একবার আমাদের ভক্তিকৃতজ্ঞতার একবিন্দু অশ্রু তাঁহার পুণ্য চরণে উপহার দিয়া থাকি? সুখ সুখ করিয়া মানুষ পাগলের মত জগৎ সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—সে জানে না প্রকৃত সুখনিকেতন কোথায়। দেব আশীর্ব্বাদ পায়ে ঠেলিয়া সে রাক্ষসী-সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে, অহো! কি দৈব বিড়ম্বনা।

অনন্ত করুণাসিন্ধুর একটী অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র মানুষ আনন্দরাজ্যের সুখ-সংবাদ প্রাণে বহন করিয়া এক অজানা শুভক্ষণে একটী আনন্দ বিন্দুর মত সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিল সে অসীম স্নেহশীলা পুণ্যমাধুরী জননীর স্নেহ-অঙ্কে সুখে সমাসীন। জগৎ তাহার কাছে অভিনব অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া জননীর সুখশীতল স্নেহছায়ার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে বিহগসমাজ তাহার শুভ আগমন ঘোষণা করিয়াছিল, প্রকৃতির অগণিত কুসুম-রাজি তাহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য লইয়া তাহারই চক্ষুর সম্মুখে বিশ্বসৌন্দর্য্যের আভাস জ্ঞাপন করিয়াছিল, সমীরণ মাতোয়ারা হইয়া মনোহর গন্ধগীতে তাহার শিশু-হৃদয়খানি ভরিয়া দিয়াছিল। প্রথম নয়নোন্মেষেই স্নেহার্দ্রহৃদয়া প্রীতিপবিত্রতাময়ী জননীর কান্তোজ্জল মুখচ্ছবি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। মায়ের স্নেহকরুণ চক্ষু হইতে অনন্ত প্রেমধারা নির্গত হইয়া সেই পুণ্যদিনে দেব আশীর্ব্বাদী অক্ষয় কবচের মত তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিল, তাহার শিশুপ্রাণ বুঝিয়া লইল কি মধুর স্বর্গেই তাহার নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখিতে পাইল যে তাহাকে আদর করিবার জন্য তাহার সমশ্রেণীর আরও কতগুলি প্রাণ তাহারই পার্শ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ ভাই, কেহ বোন, কেহ আত্মীয়, কেহ বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। স্নেহরাজ্যের কি মধুর লীলাক্ষেত্র! পিতামাতার স্নেহ, ভাই বোনের আদর এবং আত্মীয় স্বজনের প্রীতি সোহাগ প্রাণে লইয়া বালক তাহার অজানিত জীবন-পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, সে প্রথমেই দেখিল তাহার বাড়ীর প্রাঙ্গণখানি; সে দেখিল তাহার পূজার ঘর, সে দেখিল তাহার মৎস্যপরিপূর্ণ নির্ম্মল জল পুষ্করিণী, সে দেখিল তাহার খেলিবার জায়গাখানি, দেখিল আর মজিল, শত দিকের শত আকর্ষণ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কোমলমতি বালক নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইল, অমনি খাঁচার সারী বলিয়া উঠিল।

"টুক্ টুকে তোর ঠোঁট দু'খানি
দেখ্‌তে বড় বেশ,
ফুট ফুটে তোর চক্ষু দুইটী
নাইকো চিন্তা লেশ;
ওহে নধরগঠন নিটোল চরণ
শোন, গো সবিশেষ,
প্রেমের রাজ্যে ধরা প'ড়েছ,
বাঃ রে মজা বেশ।"

বাগানের ফল, পুকুরের জল, পক্ষীর গান, হাস্যমুখর পল্লীময়দান, খেলার সাথীগণের অমায়িক আত্মীয়তা, অপরিণতবয়স্ক মানব-শিশুর নিকট নিত্য নূতন নূতন উৎসবের সামগ্রী যোগাইতে লাগিল। পেটভরা খাওয়া,

অটুট শারীরিক স্বাস্থ্য, দেহের অপরূপ লাবণ্য এবং প্রাণের আশ্চর্য্য সজীবতা এই সকল গুলিই প্রথম হইতে তাহার পল্লীজীবনকে মধুময় করিয়া দিয়াছিল। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুপর্য্যায়ে প্রকৃতি মাতার বিভিন্ন সাজসজ্জা তাহার শিশুপ্রাণকে মাতাইয়া তুলিল। গ্রীষ্মকালের সুপক্ক আম্রপনসের অমৃত আস্বাদ, নিদাঘ সায়াহ্নের মরি-মনোহর শোভা, বর্ষাকালের কাণেকাণভরা আবিল জলোচ্ছ্বাস, সততপতনশীল বারিদদলের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন, চমকচকিতা তড়িৎলতার চঞ্চল চরণ-বিক্ষেপ, ভেককুলের দিনরাতভরা আনন্দধ্বনি, মধুর-দর্শনা শরৎ-রাণীর মুক্তাশুভ্র শিশিরাশ্রু, শারদ-পৌর্ণমাসীর অনাবিল সুপরিস্ফুট জ্যোছনাবিকাশ, কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম কুরুবক ইত্যাদি কুসুমগণের অমিয় মধুর হাস্যচ্ছটা, হরিদ্বর্ণ পরিশোভিত দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, বিদেশাগত শত শত প্রাণের বাৎসরিক মিলনানন্দ; প্রৌঢ় হেমন্তের তুহিন সম্পাত, স্বর্ণশস্যপরিপূর্ণ গ্রাম্য মাঠ, কর্দ্দমশূন্য পথ, শীত ঋতুর তুষারধারা, কোয়াসাসমাবৃত উদীয়মান সূর্য্যদেবের মনোমোহকারিণী শোভা, সংক্ষিপ্ত দিনমান এবং বসন্ত কালের অনন্ত কুসুমশোভা, কোকিলের প্রাণমন পাগলকরা কুহুতান, প্রিয়মিলনসুখসংবাহক ধীরপ্রবাহিত মলয়ানিল, সুবর্ণরাগরঞ্জিত প্রাতঃকালীন বাসন্তসূর্য্যের অলোকসৌন্দর্য্যমহিমাবিকাশে সংসারের নবীন অতিথি আপনার মনে মনে চির বিস্ময় মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সেই এক দিন গিয়াছে যখন নিরীহ সুখ-শান্ত পল্লীজীবনই মানব মাত্রের একমাত্র লোভনীয় বস্তু ছিল, যখন নগরের কলকোলাহলে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া মানুষ জীবনের শেষ ভাগে পল্লীজীবনের নির্ম্মল সুখ এবং অনাবিল শান্তির মধ্যে সংসারের নিকট চির বিদায় লইবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। যেমন শিশু আপন মায়ের কোল পাইলে জগতের আর কিছুই চাহে না, সেইরূপ ধনের আশায় কামনার প্রেরণায় জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে দিগন্তবিক্ষিপ্ত দুর্ভাগা মানব হতাশ-প্রাণে লুব্ধমনে সেই সর্ব্বসুখভূষিতা, সকল সৌন্দর্য্যশালিনী, মনোন্মাদিনী আপন জন্মভূমির অলোকসামান্যা পল্লীশোভার দিকেই সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া থাকে। ভাষা তাহার তৎকালীন অবসন্ন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এবং অতৃপ্তি, যাতনা ও নৈরাশ্য সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতে অক্ষম, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পল্লীগ্রামে তখন কিসের অভাব ছিল? ধনধান্য, স্বাস্থ্য-সজীবতা, ভালবাসা আত্মীয়তা, সৌহার্দ্দ সহানুভূতি, পরোপকার এবং আতিথেয়তা পল্লীতে ইহার কোনটীরই অভাব ছিল না। তখন পল্লীসমাজ খাঁটি মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। ছায়াশীতল পল্লীকুটীরেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিত।

যে পল্লীকুটীরের দীনজন সুলভ অনাবিল শান্তিময় জীবন একদিন অট্টালিকানিবাসী বিলাস-পরিবেষ্টিত লক্ষপতিরও বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল, যার নৈসর্গিক রমণীয়ত্ব, প্রীতিপ্রফুল্লতা এই ধ্বংসস্বভাব মরজগতেও নিত্য নূতন স্বর্গের সন্দেশ বহন করিয়া আনিত, যাহার স্বাভাবিক সরলতা দেবজনেরও অতীব বাঞ্ছনীয় ছিল, সেই প্রকৃতিপালিত, সুষমাজড়িত, চিরপ্রফুল্ল পল্লীজীবনের আজ কি অবস্থা দেখিতে পাই?—এক দিন যেখানে শত শত প্রাণের হাস্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ থাকিত, আজ সেইখানে, সেই আনন্দলীলানিকেতনে গুটিকতক রুগ্ন

শীর্ণ আর্ত্ত মানবের রোগযন্ত্রণার মর্ম্মবিদারক ক্রন্দনধ্বনিমুখর, ম্লানজ্যোতিঃ, সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত হেয়, অতি ক্ষুদ্র পাড়াগাঁ খানির শোক করুণ চিত্রই মানসপটে জাগিয়া উঠে। যেখানে এক দিন সৌহার্দ্দ, আত্মীয়তা, নির্লোভ এবং স্বল্প-সন্তুষ্টি সমানভাবে নির্ব্বিরোধে বিরাজ করিত, আজ সেখানে ঈর্ষা-হিংসা, বিবাদবিদ্বেষ, পরস্পরে মারামারি কাটাকাটির সর্ব্বগ্রাসী ভাবেরই অখণ্ড রাজত্ব দেখিতে পাই। মিথ্যা প্রবঞ্চনা এখন একরকম পল্লী-জীবনের অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে বলিলেই চলে।

বর্ত্তমানের পল্লীজীবন এখন আর তত্ত সহজ এবং সরল নহে। অভাব-দারিদ্র্যের নিত্য-বিবাদবিসম্বাদ-জড়িত কুটিলতা এবং দাম্ভিকতাপরিপূর্ণ সুদূরাবস্থিত পল্লীনিবাস-সমূহ এখন কতকগুলি প্রেতভবন বলিয়াই মনে সতত ভ্রম জন্মিয়া থাকে। এখন না আছে তার সেই কল্যাণশ্রী, না আছে তার সর্ব্বজনপ্রসাদিনী সজীবতা; না আছে স্বাস্থ্য, না আছে প্রফুল্লতা; আগেকার দিনের আদর্শ পল্লীজীবন এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে প্রতীতি জন্মে। পাপের উষ্ণ নিঃশ্বাসে সরস মধুর পল্লীপ্রাণ অনেক আগেই ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। শিক্ষালোক-উদ্ভাসিত জনগণ এখন পল্লীর অজ্ঞানাবরণ দূরে ফেলিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছেন। দূষিত জল, কদর্য্য আহার, সুদুষ্ট বায়ু, কুশিক্ষা এবং কুসঙ্গ, দারুণ দুশ্চিন্তা এবং হিংসার সুতীব্র জ্বালায় পরিবেষ্টিত থাকিয়া বিবাদ-বিদ্বেষের অখণ্ড শাসনে পড়িয়া পল্লীবাসী সর্ব্বদাই ত্রাহি ত্রাহি রবে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অলসমন্থরগতি, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনিচ্ছা, আহার নিদ্রার প্রাচুর্য্য, দলাদলির বৈঠক, মামলা মোকদ্দমার জটিলতা সৃষ্টিকরণ এবং পরের কুৎসা রটনা ইত্যাদিতেই তাহারা চির অভ্যস্ত এবং চির সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের একঘেয়ে জীবন এই সমস্ত কুৎসিত বিষয় সমূহের ভিতরেই নিত্য নূতনত্ব খুঁজিয়া লইয়া আরাম উপভোগের ব্যবস্থা করিতেছে। নিত্যনূতনসৌন্দর্য্যস্ফুরিতা প্রকৃতি মাতার সে সাজানো বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। সেথায় এখন আর আগের মত কোকিল ডাকে না, দয়েল নাচে না, ভ্রমর গুঞ্জে না, পুঞ্জে পুঞ্জে কুসুমও ফুটে না, কোন্ ছলে যে সাধের বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্যামচন্দ্র মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? কৃষক পল্লীবাসিনীর আজ সে রূপশ্রী কোথায়? আর কি তেমন কলসীর প্রাণভরা উল্লাসনৃত্য দেখা যায়? হায়! কালের কি কঠোর শাসন! আজ শুধু অন্নাভাবে শীর্ণ, চিরজ্বরে জীর্ণ কতকগুলি কঙ্কালসার প্রেত-চেহারাই পল্লীপ্রান্তরে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কি ভীষণ পরিবর্ত্তন!

মানুষ মরিলেও তার সংস্কারের ধ্বংস হয় না। ইহজীবনে মানুষ যে ভাবে পরিপুষ্ট হয়, যে ভাবে শিক্ষিত হয় এবং যে ধ্যান ধারণা লইয়া সংসারক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে, পর জীবনেও তাহারই অভিব্যক্তি-সাধন তাহার পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, এই অতীতের শত দুঃখকষ্টও বর্ত্তমানের চিরনূতনত্বের মধ্যে আপন মাধুর্য্য-বিকাশের যথেষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই, অতীত স্মৃতি এতই আরামপ্রদ, এতই মনোহারিণী, এতই কি-জানি-কি সুখ-বিধায়িনী। বিলাস-বেষ্টিত, আচারসম্বদ্ধ, সভ্যতা-শৃঙ্খলিত নগরে থাকিয়াও মানুষ সময়ে সময়ে আপনার আদিবাসভূমি স্বভাব-

সুন্দর নগ্নসুষমা পল্লীমাতার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া দেখিতে ব্যস্ত হয়, তাঁর সেই স্নেহাঞ্চলছায়ে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই যেন তাহার সমস্ত ক্লেশের অবসান হয়, সমস্ত যন্ত্রণার লাঘব হয়। স্নেহের কি মধুর আকর্ষণ, প্রাণের কি আশ্চর্য্য টান। কৃত্রিম-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ থাকিয়াও কপটতায় অভ্যস্ত হইয়াও মানুষ নগরে থাকিয়া পল্লীসৌন্দর্য্য এবং পল্লীসুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হয়। তাই, নগরে মানবকৌশলরচিত বাগান-বাড়ীর সৃষ্টি, তাই, কৃত্রিম ফোয়ারার আবির্ভাব, তাই, সুযত্নরক্ষিত শষ্পগুল্মসমাকীর্ণ বিস্তৃত তৃণভূমির অবস্থান, দীর্ঘ বক্র ঝিল এবং মানববিস্ময়কর যাদুঘর ইত্যাদিতে নগর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পল্লীরাণী এখন নগণ্য পাড়াগাঁতেই পরিণত হইয়াছে, এবং নগর তাহার ধ্বংসশ্রী আপনবক্ষে টানিয়া লইতেছে। যদিও নগর আপনার ধনবলে, বুদ্ধির কৌশলে, উৎসাহে এবং নিপুণতায় পল্লীর গতসুখের, ভ্রষ্টশ্রীর এবং নষ্ট গৌরবের সর্ব্বাঙ্গীন সফল অনুকরণ করিতেছে, তথাপি পল্লীর সেই সুখ, পল্লীর সেই স্বাচ্ছন্দ ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে কি? এই নশ্বর জগতে যাহা একবার যায়, তাহা আর কখনও ফিরিয়া আসে না। সৌন্দর্য্য-ললিত চিত্তপ্রসাদক পল্লীপ্রাণ বহুদিন হয় মরিয়া গিয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া পাইবার যো আছে?—আর কি এ দেশে মার্কণ্ডেয় আছে, যে একবার মরিয়া আরবার বাঁচিয়া আসিবে, আর কি দেশে সাবিত্রী আছে, যে আপনার অমানুষিক পুণ্যপ্রভাবে মৃত জীবনের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে! মৃতের পুনর্জীবন দানের কথাটা অনেকে হয়ত হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে, কিন্তু প্রকৃত যত্নচেষ্টায়, একাগ্র নিষ্ঠাসাধনার বলে যে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে একথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানালোকিত যুগেও বহু প্রমাণিত হইয়াছে। তবেই এখন কথা হইল, কি করিয়া পল্লীর প্রনষ্ট জীবনের পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, কি সংস্কারদ্বারা নগণ্য পাড়াগাঁ আবার পল্লীবাসীর শোভা-সম্পদের অধিকারী হইতে পারে।

পল্লীর প্রনষ্ট-গৌরবের পুনরুদ্ধার করাই পল্লীসংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তবেই এখন দেখা যাইতে পারে যে পল্লীর সেই বিগতশ্রীর, অতীতস্মৃতির, এবং আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মূলভিত্তি কোথায়। পল্লীগৌরবের মূলভিত্তি এবং প্রকৃত আধার হইয়াছে তাহার অকপট বিশ্বাসী সরল প্রাণ, তেমন রকমের প্রাণ তৈয়ার করাই সকলের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। প্রাণভরা ভালবাসা, সর্ব্বসাধারণে অমায়িক ভাব, পরার্থে স্বার্থত্যাগ ইত্যাদিই পল্লীজীবনের অলঙ্কার। পল্লীসমূহে উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করাই পল্লীসংস্কারের প্রথম সোপান, ঘরে পিতামাতার প্রদত্ত শিক্ষা, আপনার ভাইবোনের স্বভাবসুন্দর ভালবাসাই পল্লীবাসীর প্রথম স্নেহবন্ধন। জীবনের প্রারম্ভেই সে (পল্লীবাসী) দেখিবে জগৎ তাহার নিকট চিরমধুময়; অরুণ তাহার অপার্থিব কিরণমালায় জগতের অশেষ সৌন্দর্য্যভাণ্ডার তাহারই নয়ন সমক্ষে প্রতিদিন নূতন নূতন ছাঁদে খুলিয়া দেখাইবে, চাঁদ তাহার পবিত্র শীতল জ্যোছনাধারায় অপূর্ব্ব স্নেহরসের অনুভূতি জন্মাইয়া দিবে, অনন্ত সুষমাময়ী প্রকৃতি-জননী তাহার চির মনোহর সরলতাটুকু প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া দিবে, অসীম উন্মুক্ত গগনমণ্ডল নিত্য তাহার উদার গাম্ভীর্য্যে প্রাণ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, বিহগসমাজ প্রভাত এবং সন্ধ্যার বন্দনা-

গীতিতে প্রকৃত প্রেমাস্বাদ জানাইয়া দিবে। পল্লীবাসী তখন আত্মহারা হইয়া ভাবিতে থাকিবে যে সে কোথায় আসিয়াছে; এ স্বর্গ, না মর্ত্ত্য, ইহা লইয়া তাহাকে বিষম গোলে পড়িতে হইবে। যদি জীবনের প্রথম অবস্থাতে এমনি ভাবে পল্লীবাসী পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, যদি সে তাহার আশেপাশের সমস্ত গুলিকেই আপনার বলিয়া মনে ভাবিয়া লইতে পারিল, তাহার পরার্থপরতা এই খানেই শিক্ষা হইল। যে যাহাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসে, সে তাহার নিজের সুযোগ সুবিধাটুকু আপনার প্রেমাস্পদের কাজে লাগাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে, কাজেই, আত্মীয় স্বজন এবং পাড়াপ্রতিবাসী-সমূহ যদি তাহার নিজের বলিয়াই জ্ঞান হইল, তখন তাহাদের সুখ-সম্বর্দ্ধনের জন্য প্রাণও আপনিই আকুল হইয়া উঠিবে, আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ক্ষুদ্র সুখটুকু জগতে বিলাইয়া দাও, দেখিবে, মহাজগতের মহাসুখে তোমার প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে, তখনই যথার্থরূপে বলিতে সক্ষম হইবে

> "আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
> আসে নাই কেহ অবনী'পরে,
> সকলের তরে সকলে আমরা,
> প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"
>
> আলো ও ছায়া।

মহাত্মা বুদ্ধদেব জগৎবাসী সমস্তকেই আপনার ভাবিয়াছিলেন, তাই, তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদে অস্থির হইয়া রাজৈশ্বর্য্য, মান অহঙ্কার, বিলাস প্রভুত্ব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জগতের পরিত্রাণের জন্য, বিশ্ববাসীর সুখসম্বিধানের জন্য মৃতসঞ্জীবনী অমৃত ভাণ্ডারের তল্লাসে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাহার ব্যক্তিগত নিজ ক্ষুদ্র পরিবারের গণ্ডী ছাড়াইয়া মহাবিশ্বের মহাপরিবারের মুক্তির জন্য আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাই তিনি দেবতা, তাই তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া জগৎসংসারে কীর্ত্তিত। যেখানে কেবল আপনার প্রতিই ভালবাসা, আপনার অর্থ চিন্তারই অখণ্ড রাজত্ব, সেখানে জগতের ভালবাসা, জগতের স্বার্থ কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইবে? বিজ্ঞানশাস্ত্রেও দেখিতে পাই যে একই সময়ে একই স্থানে দুইটী বস্তুর একত্র সমাবেশ একটা অসম্ভব ব্যাপার। পরকে পাইতে হইলে আগে আপনাকে বিলাইয়া দাও। অভাবগ্রস্ত ভিখারীকেই লোকে ভিক্ষা দেয়; যার আছে, তাহাকে কে কেহ কখনও কিছু দিতে যায়? স্বার্থের সীমা ত অতি সঙ্কীর্ণ; একটী মাত্র জীবনেই উহা সীমাবদ্ধ, আমার আমি ত চিরকালই আছি! অপর দশজনকেও যদি আমার করিয়া লইতে পারি, তবেই আমার প্রকৃত পুরুষার্থ-সাধন হইল।—তাহাতেই আমার প্রকৃত সুখ এবং তাহাতেই আমার প্রকৃত শান্তিলাভ হইল। আগে যে পল্লীতে এত সৌন্দর্য্য ছিল তাহার কারণ কি? এক পল্লীনিবাসী মানবমাত্রের মধ্যে এমন একটা সৌহার্দ্দ্য ছিল যাহাতে সকলেই সকলকে আপনার লোক বলিয়া বুঝিত এবং পরস্পরের সুখ দুঃখই পরস্পরে এক এবং অখণ্ড বলিয়া মনে করিয়া লইত, গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ দাদা, কেহ খুড়া, কেহ ভাই এবং কেহ "মিতা" ইত্যাদি কোন না কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সম্পর্কে একে অন্যের সহিত জড়িত ছিল, সেখানে রক্তের সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, সকলেই সকলকে আপনার মনে করিয়া পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দেখাইত এবং পরস্পরের

উন্নতিসাধনে পল্লীবাসীরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। শুধু মানুষ বলিয়া কেন, তখনকার দিনে পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা ইত্যাদির সহিত ও এমন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবন্ধন সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইত। শকুন্তলা যখন স্বামী-সন্দর্শনাভিলাষে দুষ্মন্ত রাজার রাজধানীতে যাত্রা করিয়াছিল, তখন আশ্রমের মৃগ, আশ্রমের বিড়াল তাহার শোকে আকুল হইয়াছিল; আশ্রমমৃগী তাহাতে সুখপ্রসবা হয়, তজ্জন্য শকুন্তলার কিরূপ আন্তরিক কামনা দেখা গিয়াছিল? গমনোদ্যতা শকুন্তলা স্বযত্ন পরিপুষ্ট নবমালিকার বিচ্ছেদে প্রাণে কত যে ব্যথা অনুভব করিয়াছিল তাহা আর কি বলিব। ভালবাসার টান বড় টান। গৃহস্বামী আপন গৃহপালিত গো মহিষাদি জন্তুগণকে তখনকার দিনে প্রাণের মত ভালবাসিত। তাই তাহাদের জন্য চরিবার বিস্তৃত তৃণপূর্ণ ভূমি, পরিষ্কার পানীয়, উত্তম বাসস্থান ইত্যাদির খুব সুব্যবস্থাই করা হইত। পাছে, দুগ্ধাভাবে বৎসগণের কষ্ট হয় এই মনে করিয়া গৃহস্বামী বৎসগণের আকণ্ঠপানাবশিষ্ট দুগ্ধ লইয়াই আপন আপন গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহাতে একদিকে যেমন বৎসগণ সুস্থ বলিষ্ঠ হইত, তেমনি আবার অন্যদিকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ-সংস্থানেরও অভাব হইত না। এখন যেমন অতি লোভে পড়িয়া গৃহস্বামী গাভীর শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত দুগ্ধ আপনকার্য্যে নিয়োজিত করে এবং বেশী খরচের ভয়ে তাহার (গাভীর) খাওয়া এবং বাসস্থানের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে, তেমনি তাহার ফলে গোবৎসগণ দিনদিনই রুগ্ন এবং শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। গাভীরাও আজকাল আর তেমন প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ যোগাইতে পারিতেছে না। আজকাল না হয় তাহাতে গৃহস্থের কাজ, না হয় তাহাতে বৎসকুলের জীবন রক্ষা, দুইদিকই মাটি হইয়া গিয়াছে। রাস্তা ঘাট, দীঘি পুষ্করিণী, মাছ তরকারী ইত্যাদি যাহা কিছু মানব জীবনের অত্যা-বশ্যকীয় বস্তু, সমস্তটীর সম্বন্ধেই এই একই কথা প্রযুজ্য হইতে পারে। অতি লোভেই তাঁতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী ঘৃণিত স্বার্থই পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। নগরের চাকচিক্যে ভুলিয়া মানুষ পল্লীর সরল স্নিগ্ধ মধুরভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। কাচের মোহে পড়িয়া কাঞ্চনকে পায়ে ঠেলিয়াছে। তাই আজ পল্লীর এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সমস্ত লোকই এখন নগরপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সেই সাজাগোজা, আটঘাট বাঁধা, কৃত্রিম কৌশলজালই তাহাদের প্রাণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আদর যত্ন অভাবে পল্লী এখন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। খাল বিল ইত্যাদি সংস্কার-অভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদির প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। অতি সাধের পল্লী এখন রোগযন্ত্রণার লীলাভূমি এবং দস্যু তস্করের, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার, বিবাদ বিদ্বেষের নিরাপদ দুর্গ হইয়া পড়িয়াছে। যদি পল্লীর প্রতি লোকের তেমন টান থাকিত, তবে কি আর তাহার এত দুর্গতি হইত, অন্নপূর্ণার অন্ন-ভাণ্ডারে কি আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এত ঘনীভূত হইয়া পড়িতে পারিত? একটু আদর ও যত্নের অভাবে মানুষ একবার যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে, এখন শত চেষ্টা করিয়াও তাহার পুনরুদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং সহানুভূতি প্রদর্শন এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও সংযমসাধন

দ্বারাই বর্ত্তমানের অতি জঘন্য পাড়াগাঁকে আগেকার দিনের আদর্শ পল্লীতে পরিণত করা যাইতে পারে। গ্রামবাসী দশজনের মধ্যে সবই আর সমান হয় না। কেহ ভাল, কেহ মন্দ; কেহ সুস্থ কেহ রুগ্ন; কেহ জ্ঞানী আর কেহ বা অজ্ঞান; ইহাত থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার ভিতরে ইহাদের জন্য কোনই বৈষম্য নাই। অনুকম্পা এবং সহানুভূতির সর্ব্বদাই অবারিতদ্বার। একটী কথা মনে পড়িতেছে

"ঘৃণা অভিমানে দিব না বেদনা,
পশু পক্ষী কীট তাঁহারি রচনা,
প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা,
অহিংসামন্ত্র জপি অবিরাম,
অগ্নিদাহে কেহ সর্ব্বস্ব খোয়ায়,
দাঁড়ায়ে না রব পুতুলেরি প্রায়,
রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়
জাগিব গাইব তাঁহারি নাম।"

ইহাই পল্লীজীবনের অমৃতমন্ত্র এবং ইহাই পল্লীপ্রাণের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি।

যদি বিশ্ববাসিজনকে একই পরম পিতার সন্তান বলিয়া মনে ধারণা করিতে পারি, তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগতে কি এক মধুর স্নেহবন্ধনই দেখিতে পাই। সে প্রাণের রাজ্যে, প্রাণের খেলায়, প্রাণের মেলায় চিত্ত তখন ভরিয়া উঠিবে। সেখানে ঈর্ষা নাই, হিংসা নাই, বিবাদ নাই, বিদ্বেষ নাই; সেখানে কেবল চারিদিকেই আনন্দের মেলা দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে। সেথাকার পুণ্য প্রেমের বাতাস গায়ে লাগিয়া এই পঙ্কিল মর্ত্তাভূমির সমস্ত পাপ তাপ দূর করিয়া দিবে। তখন বিশ্বাসী মানব ফুল্লমনে পূর্ণ-প্রাণে দেখিতে পাইবে

"সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
থাকে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে।"
রবীন্দ্রনাথ।

আপন প্রাণের সমস্ত ভালবাসা জগতে বিলাইয়া দিয়া ভগবৎপ্রতিভাকে প্রাণে উপলব্ধিকরতঃ আপনার ভাইকে চির-আপন জ্ঞানে বুকের ভিতর টানিয়া লইতে পারিলেই পল্লীজীবন ধন্য হইয়া উঠিবে, সমস্ত দুঃখ-দুর্গতির অবসান হইবে এবং শত বিঘ্ন-বিপদজাল মুহূর্ত্ত মধ্যেই কাটিয়া যাইবে। আগেকার পল্লীজীবনের চিরমনোহারিত্ব, চিরমাধুরী এবং চিরকল্যাণ আশীর্ব্বাদ আমরা আবার আমাদের মধ্যেই ফিরিয়া পাইব। আমাদের সকল আশাই পূর্ণ হইবে। ইতি—

শ্রীশশিভূষণ দাস গুপ্ত।

রামচরিত ও সন্ধ্যাকর নন্দী

গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্য রচনা করিয়াছেন। পালবংশীয় রাজা মদন পালের সময় তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাই গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যে মদন পালের সুদীর্ঘ রাজ্য ভোগের কামনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের পুস্তকালয়

হইতে এই কাব্য খানি সংগ্রহ করিয়াছেন। আট শত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বঙ্গলিপি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থখানি সেই পুরাতন অক্ষরে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তার হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। এখানি নকল। শীলচন্দ্র নামক জনৈক বৌদ্ধ মূল পুস্তক ও টীকা দেখিয়া এখানি লিখিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের নিকট এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদর পাইয়াছে এবং সমসাময়িক কবির লিখিত প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

রাজসাহীর ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন—"রামচরিত-গ্রন্থ 'কাব্য' হইলেও 'ইতিহাস'; তাহা ঘটনা পরিস্ফুটরসে সুপরিপক্ক। সুতরাং কেবল 'কাব্য' বলিয়া 'রামচরিতের' উক্তি সহসা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ। সে কথা স্মরণ করিলে, সন্ধ্যাকর নন্দীকে বাঙ্গালার কবি কহ্লন বলিয়াই সমাদর করিতে ইচ্ছা হয়।" ১

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "সমসাময়িকগ্রন্থ বলিয়া এই পুস্তকখানি অদ্বিতীয় ইতিহাস গ্রন্থ।" ২

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"যদি কেহ কোন দিন সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামপাল চরিতের' ন্যায় * * * প্রাচীন গ্রন্থে * * * আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন উহা ইতিহাস ক্ষেত্রে সাদরে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। ৩।"

গৌড় রাজমালা লেখক বলেন "'রামচরিত' তুল্যকালীন কবির রচিত ঐতিহাসিক কাব্য।" (৪৮ পৃষ্ঠা)।

শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় লিখিয়াছেন—

"সন্ধ্যাকর নন্দীর এই কাব্য ঐতিহাসিকের অতিপ্রিয় পদার্থ হইয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।" ৪

সুতরাং রামচরিত কাব্যের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। কেহ সন্দেহ করিলে তাহাকেই উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। তথাপি আমি একবার কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিব, বাস্তবিক রামচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য কত?

(১) সন্ধ্যাকর নন্দী কে?

সন্ধ্যাকর কাব্য শেষে নিজ পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ
কুলস্থানম্।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃবৃহদ্বটুঃ ॥১
তত্রবিদিতে বিদ্যো তিনি নন্দিরত্ন সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধির্গুণোঘস্য ॥২
তস্যতনয়ো মতনয়ঃ করণানাম গ্রণীরণর্ঘগুণঃ।
সান্ধি শ্রীপদা সন্তাবিতাভি ধানতঃ
প্রজাপতির্জাতঃ ॥৩
নন্দিকুল কুমুদ কানন পূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানন্দী ॥"৪

এই চারিটি শ্লোকে সন্ধ্যাকর নন্দী আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তিনি "বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, 'নন্দ' নামক গ্রাম হইতে তিনি কুলোপাধি পাইয়া-

(১) সাহিত্য। (২) রামচরিত, উপক্রমণিকা।
(৩) প্রবাসী ১৩১৯। ৩৯১ পৃষ্ঠা। (৪) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন ১৩১৯। ৪২২ পৃষ্ঠা

ছেন, নন্দ শব্দ বোধ হয় "নন্দন শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের সান্ধি বিগ্রহক ছিলেন।"

অক্ষয় বাবু বলেন—"নান্দিকুল" নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কোনও কুল নাই, বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে আছে, এই কারণে সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। সন্ধ্যাকরের পিতা রামপাল দেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।" "করণ্য" শব্দ দ্বারা তিনি ব্রাত্যক্ষত্রিয় বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহার মতে সন্ধ্যাকর "নন্দী" কুলের বারেন্দ্র কায়স্থ।

বিজয় কুমার বাবুর মতে সন্ধ্যাকর নন্দী বৌদ্ধ ছিলেন, তাই মূলগ্রন্থ ও টীকা উভয়েরই আরম্ভের পূর্ব্বে শিরোভাগে "শ্রীঘনায় নমঃ" লিখিয়াছেন। ইঁহার মতেও প্রজাপতি নন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন এবং সন্ধ্যাকর মদনপালের সভাসদ ছিলেন।

আমার মতে সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৌদ্ধ, কিছুই বলা যায় না। তিনি ব্রাহ্মণ না হইতে পারেন এমন নহে। শাস্ত্রীমহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিলে সহজে ঠেলিয়া ফেলিবার উপায় ছিল না। কারণ রাঢ়ীশ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের একাদশ সন্তান মধ্যে বিষ্ণু "নন্দী" গ্রামে বাস করিয়া নন্দীগ্রামী হইয়াছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "নন্দী এখন নন্দীগ্রাম নামেই আখ্যাত। বর্দ্ধমান জেলার যেখানে ফড়িয়া ও ব্রহ্মাণী নদী মিলিত হইয়াছে, তাহারই পূর্ব্বাংশে কিয়দ্দূরে এবং কাটোয়া হইতে সাড়েতিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এইগ্রাম হইতে নন্দী বা নন্দিয়াল গাই হইয়াছে।" কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধ কুলস্থানে বাস করিতেন। এখনও জেলা মালদহের অন্তঃর্গত নবাবগঞ্জ থানা হইতে ৬।৭ মাইল উত্তরে নন্দাই বা নান্দাই নামে একটি গ্রাম আছে। "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধ" অর্থ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। এই নন্দাইগ্রাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যেই অবস্থিত বটে। এই নন্দাইগ্রাম সন্ধ্যাকর নন্দীর কুলস্থান হইতে পারে। তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া কায়স্থ বলা যায় এমন কোন প্রমাণও নাই। অক্ষয়বাবু এক "করণ্য" শব্দের বলে সন্ধ্যাকরকে কায়স্থ করিতে চান কিন্তু তাহা হয় না। পিতামহ পিনাক নন্দীর সময় জাতির নাম করা হয় নাই, জাতির নাম করা হইল প্রজাপতি নন্দীর বেলায়, ইহা অতি অসম্ভব কথা। পিতামহের নাম করিবার পূর্ব্বে অথবা তৎসঙ্গে জাতির নাম করাই স্বাভাবিক, তাহা করা হয় নাই। প্রজাপতিকে বলা হইয়াছে "করণ্যানামগ্রণী" অর্থাৎ করণ্যদিগের অগ্রণী। করণ অর্থ করা সুতরাং "করণ্য" অর্থ কর্ম্মকর্ত্তা বা কর্ম্মচারী, তাহাদের অগ্রণী অর্থাৎ প্রধান এই অর্থে "করণ্যানামগ্রণী" শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজাপতি সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, সুতরাং তিনি কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। করণ শব্দই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বাচক, করণ্য অর্থ তাহা নহে। সুতরাং নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, তিনি ব্রাত্যক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন।

বৌদ্ধও বলা যায় না। কারণ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে তিনি এক অর্থে মহেশ্বর এবং অপরর্থে বাসুদেবের বন্দনা করিয়াছেন। বিজয় বাবু মূল গ্রন্থ ও টীকার প্রথমে "শ্রীঘনায় নমঃ" দেখিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ মনে

করিয়াছিলেন। কিন্তু "শ্রীঘনায় নমঃ" তাঁহার লেখা নহে। যে শীল চন্দ্র গ্রন্থ নকল করিয়াছেন, তিনি বৌদ্ধ। "শ্রীঘনায় নমঃ" তিনিই লিখিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী যে হিন্দু ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ব্রাহ্মণ ছিলেন কি কায়স্থ ছিলেন তাহা ঠিক করা কঠিন।

প্রজাপতি নন্দী সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, কিন্তু কাহার, তাহা গ্রন্থে লিখা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "রামপালের," কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। তিনি রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক থাকিলে সন্ধ্যাকরও পিতার পদের উত্তরাধিকারী হইতেন, তিনি প্রজাপতি অপেক্ষা অযোগ্য ছিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যাকরের সান্ধিবিগ্রহিকত্ব বা সভাসদত্বের কোন প্রমাণই নাই। প্রজাপতি নন্দী কাহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিবার কারণ কি? অন্য কারণ কিছুই নাই, তিনি রাম পালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন না, ইহাই একমাত্র কারণ। আমার মতে তিনি "ভীমের" সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ভীমের অন্নে সন্ধ্যাকরের শরীর, তাই রাম-চরিত গ্রন্থ হইলেও, ভীমকে রাবণ বলিলেও তিনি প্রকারান্তরে স্পষ্টতঃ রামপাল অপেক্ষা ভীমের প্রশংসাই করিয়াছেন। কবির উদ্দেশ্য মদন পালের অনুগ্রহ লাভ করা। ভীমের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি নাই, সুতরাং কাহার আশ্রয়ে থাকিবেন, তাই রামচরিত লইয়া মদন পালের নিকট উপস্থিত হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটে নাই। টীকা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মদনপালের সহিত তাঁহার যে সংশ্রব ছিল না, তাহার প্রমাণ রাম চরিতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখনকার বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণ রামচরিতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু রামচরিত কাব্যগ্রন্থ—ইতিহাস নহে, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। তাহা দেখাইতেছি—

(১) রামচরিতে লিখিত আছে, বিগ্রহ পালের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হইয়া শূরপাল ও রামপালকে নিগড়বদ্ধ করতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্বোক তাঁহাকে নিহত করিয়া 'জনকভূ" বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন।" কিন্তু মদন পালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

তন্নন্দনশ্চন্দন বারি হারি
কীর্ত্তিপ্রভানন্দিত বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভুব ॥ ১৩

অর্থাৎ "সেই বিগ্রহপালদেবের চন্দন বারি মনোহর কীর্ত্তি প্রভা পুলকিত বিশ্ব নিবাসি কীর্ত্তিত শ্রীমান মহীপাল নামক **নন্দন** মহাদেবের ন্যায় দ্বিতীয় দ্বিজেশ মৌলি হইয়াছিলেন ১।"

তাম্রশাসনে "মহীপাল নাম নন্দন" বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, রাজা হইবার পূর্ব্বেই তিনি শিবত্ব পাইয়া-ছিলেন, অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-ছিলেন। সুতরাং তিনি শূর পাল ও রাম-পালকে নিগড় বদ্ধই বা করিলেন কবে, আর কারাগারেই বা বদ্ধ করিলেন কবে? মদন-

* গৌড় লেখমালা ১৫১ পৃষ্ঠা

পালের তাম্রশাসন মিথ্যা হইতে পারে না, সন্ধ্যাকর হয়ত মিথ্যা জনশ্রুতি শুনিয়া লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হইয়াছিলেন, "জনকভূ" হারাইয়াছিলেন, দিব্বোক হস্তে নিহত হইয়াছিলেন এসব কথা কিছুই তাম্রশাসনে নাই। তিনি পিতা বর্ত্তমানে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাই এসব ঘটনাই হয় নাই। সুতরাং সন্ধাকরের এই কাব্যাংশ মিথ্যা ঘটনাপূর্ণ, এবং ইতিহাসে স্থান লাভের অযোগ্য।

(২) "দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হইলে রামপাল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক "জনকভূ" উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

সন্ধ্যাকরের একথা ঠিক নহে। উপরোক্ত শ্লোকের পরশ্লোকেই মদন পালের তাম্র শাসনে লিখিত আছে—

তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্র মহিমা ক (স্ক) ন্দঃ
প্রতাপ শ্রিয়ামেকঃ সাহস সারথিগ্গুর্ণনয়ঃ
শ্রীশূর পালো নৃপঃ।
যঃসচ্ছন্দ নিসর্গ বিভ্রমভরা (ন্) বিভ্রং (স্র)
সর্ব্বায়ুধ প্রাগল্ভ্যেন মনঃ সুবিস্ময়ভয়ং সদ্য
স্ততাম দ্বিষাং ॥ ১৪

"মহেন্দ্র তুল্য মহিমান্বিত, স্কন্দতুল্য প্রতাপশ্রী সমন্বিত, সাহস সারথী নীতিগুণ সম্পন্ন শ্রীশূরপাল নামক নরপাল তাঁহার (মহীপালের) এক অনুজ ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাগল্ভ্যে শত্রুবর্গের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক বিভ্রমাতিশয্যধারী মনে শীঘ্রই বিস্ময় ভয় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন।"

ইহা অক্ষয় বাবুর নিজেরই অর্থ, সুতরাং তিনি একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাই ফুট নোটে লিখিয়াছেন, "শূর পাল অল্পকাল নাম মাত্র রাজা ছিলেন বোধ হয়।" শূর পাল নাম মাত্রই রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, তখনও দিব্বোক বরেন্দ্র জয় করে নাই, তখনও শূর পালের অস্ত্র শস্ত্রের প্রাগল্ভ্যে শত্রুবর্গের মনে ভয় হইত। অতএব দ্বিতীয় মহীপালের নিকট হইতে দিব্বোকের বরেন্দ্র জয় মিথ্যা কথা। শূর পাল রাজত্ব করেন নাই ইহাও মিথ্যা কথা। বৈদ্যদেবের (কমৌলি লিপিতে) শূর পালের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই বটে কিন্তু মহীপালের নামও লিখিত হয় নাই। সকলের নাম লিখা বৈদ্যদেবের উদ্দেশ্যও নহে।

(৩) তবে দিব্বোক কাহার নিকট হইতে বরেন্দ্র জয় করিয়াছিলেন ?

মদন পালের তাম্রশাসনে পরের শ্লোকে লিখিত আছে—

এতস্যাপি সহোদরো নরপতির্দ্দিব্য প্রজা
নিভর ক্ষোভাহুত বিধৃত বাসবধৃতিঃ শ্রীরাম
পালোঽভবৎ।
সাসত্যেব চিরং জগন্তি জনকেযঃ শৈশবে
বিস্ফুরৎ তেজোভিঃ পরচক্র চেতসি
চমৎকারং চকারস্থিরং ॥১৫

অর্থাৎ "(দিব্যপ্রজার) দেবলোক নিবাসিগণের (অসুরাক্রমণ সঞ্জাত) অতিশয় চিত্ত চাঞ্চল্যে আহত হইয়া আন্দোলিত চিত্ত দেবরাজ (বাসব) যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই নরপতির সহোদর শ্রীরাম পাল নামক নরপতিও সেইরূপ (দিব্যপ্রজার দিব্য নামক কৈবর্ত্ত পতির পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আহুত এবং আন্দোলিত চিত্ত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার (চিরং) সুদীর্ঘ শাসন সময়েই তিনি শৈশবে তেজঃ পুঞ্জের বিস্ফুরণে শত্রু মণ্ডলের চিত্তক্ষেত্র চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।"

ইহাও অক্ষয় বাবুর অনুবাদ। আর কতই স্পষ্ট চান। এই নরপতির (অর্থাৎ শূর পালের) সহোদর ভ্রাতা শ্রীরামপাল নামক নরপতিও সেইরূপ দিব্য নামক কৈবর্ত্ত পতির পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আহূত এবং আন্দোলিত চিত্ত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কথায় কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে রামপাল দিব্বোক কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইয়াছিলেন। "ও" শব্দের দ্বারাও কি বুঝায় না যে শূর পালের সময়েও দিব্বোক আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই? রামপাল আহূত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আন্দোলিত চিত্ত হইয়াও অর্থাৎ রাজ্য-হারাইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন অতএব সন্ধ্যাকর নন্দীর কথার মূল্য কবি কল্পনা ব্যতিত আর কি? বৈদ্যদেবও কমৌলি-লিপিতে লিখিয়াছেন—

তস্যোর্জ্জস্বল পৌরুষ্য নৃপতেঃ
শ্রীরাম পালোঽভবৎ পুত্রঃ
পাল কুলাব্ধি শীত কিরণঃ
সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্।
তেনেযেন জগত্রয়ে জনকভূ
লাভাদ্ যথাবত্যশঃ ক্ষোনী
নায়ক ভীম রাবণ বধাদ্যু-
দ্ধার্ণ বোল্লং ঘনাৎ ॥ ৪

অর্থাৎ "সেই পরাক্রমশালী নর পালের (বিগ্রহ পালের) রামপাল নামক (এক) পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পাল-কুল-সমুদ্রোত্থিত (শীতকিরণ) চন্দ্র (রূপে প্রতিভাত) এবং সাম্রাজ্য (লাভে) খ্যাতি-ভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যখন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনক নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন; রামপাল দেবও (যথাবৎ) সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌণী নায়কের বধ সাধন করিয়া, জনকভূমি (বরেন্দ্রী) লাভে ত্রিজগতে। শ্রীরাম চন্দ্রের ন্যায়) আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"

এখানেও ফুট নোটে অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয় মহীপালের যথেচ্ছ শাসনে সংক্ষুব্ধ হইয়া প্রজাপুঞ্জের নায়ক (কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্য) তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিলেন" ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার অনুবাদেই দেখা যাইতেছে রামপাল "পালকুল সমুদ্রোত্থিত চন্দ্ররূপে প্রতিভাত" হইয়াছিলেন অর্থাৎ সমুদ্র হইতে উদয়কালে চন্দ্র যেমন হীন প্রভ হয়, তদ্রূপ প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কেন? রাজ্য নাশ হেতু। আবার সাম্রাজ্য লাভে খ্যাতিভাজনও হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন জনক নন্দিনীকে হারাইয়াছিলেন, রামপালও তেমনি জনকভূমি হারাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণ বধ করতঃ জনক নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীমনামক ক্ষৌণী নায়ককে বধ করিয়া জনকভূমি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা গেল মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত বিবরণ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে সন্ধ্যাকর মদনপালের সংশ্রবেও ছিলেন না, তাই প্রকৃত তথ্য জানিতে পারেন নাই। সুতরাং অক্ষয় বাবু এবং রাখাল বাবু কেন যে সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম-চরিতকে এত আদর করিয়াছেন জানি না। রামচরিতকাব্য ইতিহাস মধ্যে স্থান পাইতে পারে না, ইহার একটি কথাও ঠিক নহে।

কাব্যাংশে খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৮০০ বৎসর পূর্ব্বের অক্ষরের একটি উৎকৃষ্ট সাক্ষীও বটে। সে হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়

শূন্য রহস্য

শূন্য গোলাকার কেন

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই কয়টি রাশি, আর একটি শূন্য। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অথবা বৈদান্তিকের সপ্তদশ অবয়বের ন্যায় এই কয়টির সংযোগ বিয়োগেই আমাদের যাবতীয় রাশিজ্ঞান। সংখ্যাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়াই প্রথমেই আমাদের শূন্যতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি যায়। ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতির ন্যায় ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি যাহা হয় একটা কিছু কি শূন্যের অবয়ব হইতে পারিত না? শূন্যকে গোলাকৃতি করার কারণ কি? রোমানদের মধ্যে শূন্যবাচক কোনও রাশি নাই দশবাচক × আছে বটে। গ্রীকদের উহা ৮ এইরূপ। পৃথিবীর আর কোনও জাতি কোনও রূপ চিহ্ন ব্যবহার করে কিনা আমাদের জানা নাই। কিন্তু আমরাও কি উহাদের মত যাহা হয় একটা কোনও রূপ চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারিতাম না?

জানি না ইহার ভিতর সত্যই কোন দার্শনিক যুক্তি নিহিত রহিয়াছে কিনা, কিন্তু সুধীগণ শূন্যতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া শূন্যের এই গোলাকারত্ব ব্যাপার হইতে বেশ একটুখানি রস অনুভব করিতে পারিবেন।

শূন্যর অর্থ কি

পাঠশালার শিশুতেও জানে শূন্যর অর্থ "কিছু নয়"। কিন্তু সত্যই কি কিছু নয়? জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাই আবার বলিবে কোনও রাশির দক্ষিণে বসাইলে তাহার দশগুণ মূল্য বাড়িয়া যায়। ইহা যেন বৈদান্তিকদের মায়াবাদ। মূলে কিছু নয় অথচ যাহা দেখিতেছ সমস্তই বটে। শূন্য অর্থহীন পদার্থ নহে—অর্থহীন হইলে দশগুণ বৃদ্ধিসূচক গুণটা আসে কোথা হইতে? শূন্যর এই অর্থবৈচিত্র্য "কিছু নয়" এবং "কিছু বটে ও" ব্যাপারের একটা মীমাংসা কেহ করিয়া দিবেন কি?

শূন্যর উৎপত্তি

মীমাংসা প্রকৃত হইক না হউক মীমাংসার চেষ্টাতেই প্রবন্ধের অবতারণা বটে। কিন্তু মীমাংসায় আসিবার পূর্ব্বে আরও দু একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দরকার। এক, দুই, তিন ইত্যাদি করিয়া নয়টি রাশি ও একটি শূন্য, এই দশটি মূল সংখ্যা গণিত হইল কেন? বিশটি বা পঞ্চাশটি অথবা দুই কি পাঁচটি মূল সংখ্যা ধরিয়া হইলে কোনও আপত্তি ছিল কি? রোমকদের সংখ্যা গণনায় দশটি মাত্র মূল সংখ্যা ছিল না। গ্রীক্‌, ইহুদি অথবা অন্য কোনও প্রাচীন জাতিরও বোধ হয় সেরূপ ছিল না। আমাদের দশটি মাত্র অঙ্ক দ্বারা সংখ্যাগণনা কি একটা অর্থহীন গায়ের জোরের ব্যাপার, না ইহার ভিতরও কোনও গূঢ় কারণ নির্ণয় করিবার আছে?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার কারণ নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায় সম্ভবতঃ ইহা "দশম" ন্যায়ের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। দশজন লোক

সাঁতারিয়া নদী পার হইল। সব কয়জন আসিতে পারিল কি না দেখিবার জন্য গণনা করিতে গিয়া গণনাকারী দেখে নয়জন হইতেছে একজন নাই। প্রত্যেকেই সেইরূপ করিয়া ও সেইরূপ ফল পাইয়া মহা দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছে এমন সময়ে কেহ বুঝাইয়া দিলেন তাঁহাদের মধ্যে অস্তিত্বহীন শূন্যটি অর্থাৎ দশমস্থানীয় ব্যক্তিটি গণনাকারী স্বয়ং। তখন সব গোল চুকিয়া গেল। মূল সংখ্যা-কয়টি নির্ব্বাচন সময়েও বোধ হয় সেইরূপ একটি কাণ্ড অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সকলেই জানেন করাঙ্গুলি দ্বারা গণনা করাই মানবের স্বভাব। কালাকে বুঝাইতে হইলে কথা কহিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই কি তিন অঙ্গুলি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়া থাকি এতগুলির কথা বলা হইতেছে। মানবের দুই হাতে দশটি মাত্র অঙ্গুলি। একটি দিয়া গণনা করিলে নয়টি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাই—নয়টি মূল সংখ্যা এবং একটি শূন্য হইবার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা ইহার কতকটা হেতুও দেখাইয়া থাকেন। গ্রীকদের সংখ্যা-বাচক শব্দের নাম ডিজিটস্ উহা অঙ্গুলি অর্থ ব্যঞ্জক। "figure" কথাটিও নাকি "finger" এর অপভ্রংশ মাত্র। সম্ভবও বটে, একটা অক্ষর তুলিয়া লইলেই হইল। ফিগারের অর্থ রাশি ও ফিঙ্গারের অর্থ অঙ্গুলি হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়াও বিবেচিত হয় না। কিন্তু প্রমাণের এইখানেই পরিসমাপ্তি নহে। আরও আছে। বিলাতি ঘড়িগুলিতে যে সব ঘণ্টার দাগ দেওয়া থাকে তাহা রোমান অক্ষরে লিখিত। উহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন প্রথম চারিটি সংখ্যা, I, II, III, IIII, এইরূপ চারিটি দাগ দিয়া বুঝান হইয়াছে। ইহা ঠিক যেন পর্য্যায়ক্রমে অঙ্গুলি তুলিয়া বলা হইতেছে কয়টি সংখ্যা। এইরূপ করিয়া গেলে পাঁচ বলিবার সময় পাঁচটি আঙ্গুল বা সমুদয় করতলটিই দেখিতে হয় সুতরাং পাঁচের আকৃতি V এইরূপ। ছয় বলিতে একটি হাত ও একটি আঙ্গুল সুতরাং তাহার আকৃতি VI এইরূপ। দশ বলিবার সময় দুই হাতই দেখাইতে হইবে কাজেই তাহা X অর্থাৎ বিপরীত ভাবে বসান দুটা পাঁচ মাত্র।

প্রমাণগুলি বেশ জোরাল বটে। গোল এইটুকু সংখ্যাবাচক রাশিগুলির দশটির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। C, L, প্রভৃতি অঙ্ক-বাচক অন্য অক্ষরও আসিল কোথা হইতে? অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করাই মূল কারণ হইলে এরূপ হইত কি?

হয়ত ইহা পরবর্ত্তী কালের রাশিগুলির উন্নতি সাধন প্রয়াসের ফল। কারণ ইহা দেখা যায় পরবর্ত্তী কালে চারি লিখিতে হইলে "IIII" এইরূপ না লিখিয়া IV এইরূপ লিখা প্রচলিত হইয়াছিল। নয় লিখিতে হইলে VIIII এইরূপ না লিখিয়া IX এইরূপ লিখা হইত। দক্ষিণস্থ রাশি যোগবাচক ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল এখন হইতে বামের রাশি বিয়োগ বাচক এটুকুও ধরা হইতে লাগিল। রোমানদের মস্তিষ্কে এতদপেক্ষা উন্নততর প্রথা প্রবেশ করে নাই। কালে কিছু আবিষ্কৃত হইত কিনা বলা যায় না। অন্য জাতির মধ্যে কি নিয়ম ছিল আমরা সবিশেষ জানি না। বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বদেশেই ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি নয়টি রাশি ও একটি শূন্য সাহায্যে অঙ্কগণনা করা হয়।

এ রকম প্রথার উৎপত্তি কোন দেশে সে বিষয় লইয়া প্রতীচ্যগণ মধ্যে অধিক মতভেদ

লক্ষিত হয় না। "Arabic system of notation" এই নামেই বুঝা যায় উহা তদানীন্তন কালের দিগ্বিজয়ী আরবগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে জ্ঞানপ্রিয় আরবগণ নিজ নিজ গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন উহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেই গৃহীত। উৎপত্তি যে দেশেই হউক আমরা তাহা লইয়া বাদ বিতণ্ডা করিতে বসিব না, আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা নয়। বলিতেছিলাম—

প্রাচীন গ্রীক বা রোমকগণ যে ভাবেই অঙ্ক গণনা করুন না কেন উহা যে অঙ্গুলিদ্বারা গণনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল বেশ বুঝা যায়। উহাদের "ফিগার" এবং "ডিজিট্স্" নামই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু কথা হইতেছে, বর্ত্তমান রীত্যনুযায়ী ১, ২, ৩, ৯ প্রভৃতি নয়টি রাশি ও একটি শূন্য সাহায্যে অঙ্ক গণনার ও কি মূল তাহাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে এদেশে বিলাতি এন্সাইক্লোপিডিয়াগুলির ধরণে অভিধান প্রণয়নে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। "শব্দেন্দু মহাকোষ" নামে একখানি কোষগ্রন্থ এইরূপ বাহির হইতেছিল। তাহাতে অঙ্কর উৎপত্তি পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন করাঙ্গুলি দ্বারা গণনা হইলে পদাঙ্গুলি বাদ যাইল কেন ও এই জন্য তিনি বিবেচনা করেন করাঙ্গুলি দ্বারা গণনার কথা অযৌক্তিক; নয়টি রাশির ও একটি শূন্য হওয়ার সম্ভবতঃ অন্য কারণ ছিল। লেককের মতে, হয়ত বর্ণমালার অক্ষরাবলি দৃষ্টে উহা বাহির হইয়াছিল। কারণ পঞ্জাবের উত্তরে টাকুরীভাষায় অদ্যাপি, এক দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দের আদ্যক্ষর দ্বারা (এ, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি) ১, ২, ৩ প্রভৃতি লিখিত হয়। এ অনুমান কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নত্রয়ের—শূন্য গোলাকৃতি কেন? শূন্যর অর্থ বৈচিত্র্যের কারণ কি? কেনই বা মূল সংখ্যাবাচক রাশিকয়টি দশটি মাত্র হইল অধিক বা অল্প হইল না—কোনই মীমাংসা হয় না। বর্ণমালার সংখ্যা কিছু দশটি মাত্র নয়, তবে মূল সংখ্যাবাচক রাশি কয়টি বর্ণমালা হইতে বাহির হইয়াছিল, বলা যায় কিরূপে? ব্যবহারিক কার্য্যে কখনও প্রয়োজনে আসুক না আসুক, যে কোন বিষয়েই হউক তথ্য নির্ণয়ে সজ্জনের বিশেষ আনন্দ আছে। আমরাও সেইজন্য এবিষয়ে একটা অনুমান পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিব সঙ্গতি অসঙ্গতি তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া লইবেন। আশা, গণিতের এই ইতিবৃত্ত পাঠকালে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া অনাদৃত পূর্ব্বগামীগণের মানসিক শক্তির কতকটা [illegible] পাইবেন এবং নিরপেক্ষ হইয়া সেকালের একালের বিচার করিয়া দেখিতে সুবিধা পাইবেন। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে আরও একটি বাজে কথা বলার জন্য পাঠকের ধৈর্য্য ভিক্ষা চাহি।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কি নিয়মে প্রাচীন তত্ত্ব সকলের উদ্ধার করেন আমরা জানি না কিন্তু অনেক সময়ে একটি সোজা কথা মনে রাখিলে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়। কথাটি এই, ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে যেমন পৃথিবীর এক একটি স্তর গঠিত হইতে বহুবর্ষ সময় প্রয়োজন, মানব জীবনের ইতিহাসে পরিবর্ত্তনাবলি সাধিত হইতেও সেইরূপ বহু বিলম্ব ঘটে। এক একটি প্রাচীন আচার ব্যবহার যাই যাই করিয়াও যায় না। পূর্ব্বে কি ছিল জানিতে হইলে বর্ত্তমানে যে সমস্ত আচার ব্যবহার ক্রমশঃ শিথিল হইয়া

লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে সেইগুলি ভাল করিয়া দেখিলে অনেকটা ফল পাওয়া যায়। এই সংখ্যা গণনা ব্যাপারেও এইরূপ একটি প্রাচীন প্রথা দেখিতে পাই। সেকালের পাঠশালার ছাত্রেরা ১, ২, ৩ পড়িবার সময় সাধা গলায় একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ প্রভৃতি পড়িয়া শূন্যের নিকট আসিয়া বলিত দশেদিক্। আমাদের সন্দেহ হয় এই "দশেদিক্" কথাটির ভিতরেই দশটি মূল রাশি হওয়ার সমগ্র ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে। অঙ্গুলিদ্বারা গণনাপেক্ষা এই অনুমান সমধিক সমীচীন বিবেচনা করি। কারণ ইহাদ্বারা শূন্যের পূর্ব্বোক্ত অর্থ বৈচিত্র বিশিষ্ট এবং গোলাকৃতি হইবার হেতুও পরিষ্কৃত হয় কেন?—বলিতেছি।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত, অগ্নি, বায়ু, উর্দ্ধ, অধঃ এই দশদিক। কোনও এক রেখাদ্বারা এই কয়দিক সংযুক্ত করিলে তাহা একটি গোলকবৎ দেখায়। দশদিক্ ব্যঞ্জক শূন্যের গোলাকৃতি হওয়ার সহিত ইহার কি কোনও সাদৃশ্য নাই? ব্রহ্মাণ্ডও বোধ হয় এই কারণে অণ্ডবৎ কল্পনা করা হইয়াছে। (অন্য কারণও থাকিতে পারে যেমন অণ্ডের ন্যায় উৎপাদন শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া)।

উপরোক্ত অনুমানটি অসঙ্গত বিবেচিত না হইলে শূন্যর অর্থ বৈচিত্র্যও সহজে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রথম ধর শূন্যর প্রচলিত অর্থ "কিছুই নয়।" যাঁহারা বেদান্তের সমগ্রভাগে জগৎ কল্পনার বিষয় অবগত আছেন তাঁহারা ইহাতে নূতন কোনও কথা শুনিতে পাইবেন না। দিক্ ও দেশ জ্ঞান মিশাইয়া দিলে এই শূন্যজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতই আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। "আমি" ও "আমি ব্যতীত আর কিছু" ভাবার অর্থই সেই "আর কিছু" আমার উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে অথবা পশ্চিমে অবস্থিত আছে ভাবা। এরূপ অবস্থায় দিগ্‌দেশজ্ঞান মিশাইয়া আছে বলা যায় না। সুতরাং ব্যষ্টি কল্পনা অর্থাৎ "আমি" ও "আমি ব্যতীত দ্বিতীয় একজন" এইরূপ দুই সংখ্যা ভাবিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংখ্যার সমষ্টি মূর্ত্তি "শূন্য" ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান থাকে বলা চলে না।

সহসা মনে হইতে পারে "দুই" চিন্তা করা না যাউক, দিগ্‌দেশ জ্ঞান মিশাইয়া দিলে "এক" চিন্তা করিতে বাধা কি? মধ্যস্থলে "আমি" আছি আর দশদিকে কিছুই নাই। দিগ্‌দেশজ্ঞান তিরোহিত করিলে অর্থাৎ মিশাইয়া দিলে এরূপ চিন্তা কি করা যায় না? সংখ্যার সমগ্রমূর্ত্তি "শূন্য" না বলিয়া "এক" বলিতে বাধা কি? আমার উত্তর দিকে নির্দ্দিষ্ট কাহাকেও চিন্তা করিতেছি না, দক্ষিণ দিকের কোনও নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতেও মন প্রধাবিত হইতেছে না, মধ্যস্থলে "আমি" থাকিয়া সমগ্রভাবে দশদিক্ কল্পনা করিতেছি এরূপ বলিলে কোনও দোষ হয় কি?

এরূপ বলিলে আর কোনও দোষ হয় না, কেবল প্রকৃত পক্ষে তখনও রাশিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে বলা উচিত নহে। একটুকু প্রণিধান করিলেই ইহা বুঝা যায় যে দুইজ্ঞান ব্যতীত এক জ্ঞান জন্মায় না। "এক" কে চিন্তা করিবার একজন লোক চাইত? জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সর্ব্বথা অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এক-টিকে ছাড়িয়া আর একটি থাকিতে পারে না। জ্ঞানের অর্থই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র পরস্পর সংযোগ। বিয়োগে তিনই বিলীন হইয়া যায়। তখনই প্রকৃতপক্ষে শূন্যরূপে প্রতীয়মান

তুরীয়ব্রহ্ম মাত্র বিদ্যমান থাকে। ইহাই প্রকৃতরূপ অদ্বৈতভাবে অবস্থান কিন্তু ইহা এক জ্ঞান নহে। মনকে একটি একটি করিয়া বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া কোনও কৌশলে অবশেষে সর্ব্ব বিষয়েই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র এই সংযোগ খুলিয়া দিতে পারিলে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা অনুমেয়। সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা, সম্ভব কিনা, অথবা কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় সে সব অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তা আলোচনা করা এখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে এ সমস্ত কথার এইখানে অবতারণায় আমাদের উদ্দেশ্য এই, জ্ঞানের জন্মই যে দ্বৈত জ্ঞান লইয়া তাহা বিশিষ্টরূপ অনুধাবন করা অর্থাৎ বুঝা উহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র নিত্য সংযোগ ফল। শূন্যরূপে অবস্থিত তুরীয় চৈতন্যের স্বশক্তি প্রভাবে যেদিন জড় ও অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য এই দুই ভাবের জন্ম হইল প্রকৃতপক্ষে সেইদিন হইতেই জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানরূপ কার্য্য সম্ভব হইয়াছে; উহাই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির আরম্ভ। নিত্য সংযুক্ত ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত জড় অননুমেয় সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। এই চৈতন্যই কালে জীবরূপী হইয়া ক্ষুদ্রবৃহৎ অসংখ্য "অহং" মূর্ত্তি ভাবে জগতে বিরাজ করিতেছেন। শক্তির তারতম্যানুসারে এই অসংখ্য "অহং" গুলিরই কেহ ঈশ্বর, কেহ দেব, কেহ মানব, কেহ বা নিকৃষ্ট জীব আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই অহং ভাবধারী চৈতন্যকে "প্রাজ্ঞ" বলিয়া থাকে। এই প্রাজ্ঞগুলির সমষ্টি, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকেই প্রকৃত পক্ষে সগুণ পরমেশ্বর বা বিধাতা বিবেচনা করা উচিত। তিনিই আমাদের সেই পুরুষ, প্রকৃতি সহ সংযুক্ত থাকিয়া যিনি এই বিচিত্রতাময় জগতের জন্ম দিয়াছেন। ইহার অজ্ঞান নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়াহীন রূপ আমাদের অননুমেয় তাহা আমাদের ধারণায় শূন্যরূপেই প্রতীয়মান হয়। ইহাই সেই তুরীয় চৈতন্যের স্বরূপ।

মধ্যস্থলে আমি অবস্থিত থাকিয়া সমগ্রভাবে দশদিক্ কল্পনা করিতেছি এইরূপ ভাবে সংখ্যার সমগ্রমূর্ত্তি ধ্যানকে "এক" জ্ঞান যেমন বলা চলে দ্বৈতজ্ঞানও সেই ভাবে বলা যায়। কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে এক জ্ঞানও নয় দ্বৈতজ্ঞানও নহে উহা ব্যবহারিক রাশি জ্ঞান আরম্ভ হইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বস্তর মাত্র। ঐরূপ ভাবে অবস্থিত থাকিতে থাকিতে জ্ঞাতার মনে যখন দিগ্‌দেশ জ্ঞান ক্রমশঃ বিভাসিত হইতে থাকে তখনই ঠিক রাশিজ্ঞানের উন্মেষ হইল বলিতে হইবে। তখনই শুধু বলা চলে আমার উত্তর দিকে এই "এক" দেখিলাম; তাহার পূর্ব্বে এই আর এক ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব বলা চলে শূন্যকে সংখ্যার সমগ্র মূর্ত্তি বলিলে তাহার অর্থ তখন "কিছুই নয়" হয় বটে।

"শূন্যর" আর একটি গুণের বিষয় আমরা অবগত আছি কোনও সংখ্যার দক্ষিণে বসাইলে তাহার অর্থ দশগুণ বাড়াইয়া দেয়। শূন্য, এগুণ পাইল কোথা নিরূপণ করিতে আমাদিগকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। শূন্যকে দশদিগ্বাচক ভাবা হইতে হইতে শীঘ্রই দশরাশি জ্ঞাপক ভাবা হইতে লাগিল। তখন শূন্য বলিলেই সংখ্যার সমগ্রমূর্ত্তি বা দশ সংখ্যার কথা মনে উঠিত। আজ কাল যেমন "ষোল আনা" "চারি পোয়া" প্রভৃতি কথা পূর্ণতা জ্ঞাপক,—অমুক বিষয়ের তিনি ষোল আনা উত্তরাধিকারীর অর্থ অমুক

বিষয়ের তিনি পূর্ণ অধিকারী। "পাপ চারপো হইলেই আপনি ফলে"র অর্থ পাপ পূর্ণ হইলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয় ইত্যাদি—শূন্যর অর্থ সেইরূপ দশ হইলেও উহাতে একটা সমগ্রতার ভাব নিহিত ছিল। আমাদের ব্যবহারিক রাশিজ্ঞান কিন্তু দশ সংখ্যার মধ্যেই নিবদ্ধ নহে কাজেই আজকাল "গণ্ডা" কথাটি যেরূপভাবে ব্যবহৃত হয় "শূন্য" ও সেইরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আজ কাল যেমন ১ গণ্ডা বা, ২ গণ্ডা প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা যায় তখন বোধ হয় ১দশ ২দশ এইরূপ বলা হইত। শূন্য দশ সংখ্যা জ্ঞাপক ছিল। সুতরাং এক দশ লিখিবার সময় এক ০ অথবা ১০, দুই দশ লিখিবার সময় দুই ০ অথবা ২০, দশ দশ লিখিবার সময় ১০০ অথবা শুধু ০০। কতবার সেই "দশ দশ" লওয়া হইয়াছে বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে "০০" র পূর্ব্বে সেই সংখ্যাটি বসান হইত। শূন্য দক্ষিণে অবস্থিত হইলে রাশি সমূহের দশগুণ মূল্য বাড়াইয়া দিবার ইহাই কারণ। প্রকৃত পক্ষে শূন্যের অর্থই দশ। বামস্থিত সংখ্যা গুলি কতবার সেই দশ লওয়া হইয়াছে তাহারই প্রকাশক মাত্র।

ইহা হইতেই কালে একক, দশক, শতক প্রভৃতি স্থানীয় মান নির্দ্দেশের প্রথা উদ্ভূত হইয়াছিল। তখন বামে কোনও রাশি থাকিলেই দক্ষিণে শূন্য আছে ধরিয়া লওয়া হইত। "'১১"র অর্থ তখন ১০ এবং ১,

$$\left.\begin{matrix}১০\\ ১\end{matrix}\right\} - \left.\begin{matrix}১\\ ১\end{matrix}\right\} = ১১$$

'১১৩" র অর্থ তখন ২০০ এবং ১০ এবং ৩

$$\left.\begin{matrix}২০০\\ ১০\\ ৩\end{matrix}\right\} - \left.\begin{matrix}২\\ ১\\ \end{matrix}\right\} \ldots ২১৩$$

ইত্যাদি। পার্শ্বের সাজান হইতেই সহজে মনে আসে শূন্য কয়টা ছাড়িয়া দিলে কিরূপ দেখায় ও উহাই কালে কিরূপে ১১,২১৩ প্রভৃতির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শূন্য হইতে এইরূপে সুবিশাল সংখ্যা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দ মধ্যে যেরূপ বীজরূপী ওঙ্কার সংখ্যা মধ্যে শূন্যেরও সেই স্থান।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, কলাবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবহারিক শাস্ত্র বেদভিত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা দেখিলাম ধর্ম্মের সহিত আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্ক শূন্য গণিত শাস্ত্রও বেদমূলক বেদান্ত দর্শনের উপর স্থাপিত বলা যায়। জানি না শূন্যতত্ত্বের ভিতর সত্যই কোন সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে কিনা কিন্তু শূন্যরহস্য পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে আমাদের ঐরূপই ধারণা হয়। গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি আজিকার দিনে নহে। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অত প্রাচীন কালেও দার্শনিক জ্ঞানের এরূপ বিকাশ হইয়াছিল (যাহা আমরা ইতিহাসে পরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া শিক্ষা পাই) সহজ উপায়ে করাঙ্গুলিদ্বারা গণনার প্রথা ছাড়িয়া গণিত শাস্ত্রকে দর্শনমূলক করার জন্য ঋষি মস্তিষ্ক চেষ্টিত হইয়া ছিল ভাবিলে একটু বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় বটে। আমাদের এসম্বন্ধে যেরূপ ধারণা বলিলাম এখন নিরপেক্ষ পাঠক সব দিক বিচার করিয়া নিজমত স্থির করিবেন।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

যৌথকারবারের বিষয়ে দু'একটা কথা

বাঙ্গালীর ব্যবসাবুদ্ধির উপর অনেককাল হইতেই একটা প্রতিকূল মন্তব্য চলিয়া আসিতেছে। অনেকেই ইহার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। যৌথকারবারেও বাঙ্গালী সেরূপ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই এ অনুযোগও অনেক সময়ই শুনা যায়। ইহা যে একেবারেই ভিত্তিহীন একথাও বলা চলে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে আমাদের এই বঙ্গদেশেই অনেকগুলি যৌথকারবারের কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল; তাহাদের কতকগুলি অঙ্কুরেই অনেক দরিদ্রের ধন জীর্ণ করিয়া বিলীন হইয়াছে। কতকগুলির জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ আর অল্প কয়েকটি কারবার একরূপ চলিতেছে মাত্র। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেও সর্ব্বত্র একই ভাবের উত্তর পাওয়া যায় না। কতকগুলিতে যে সব ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বা ঐরূপ বিদ্যা ধনমণ্ডিত উচ্চপদস্থ হইতে পারেন কিন্তু হয়ত কারবার সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনই অভিজ্ঞতা না থাকায় কি যে কি হইতেছে সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনই দৃষ্টি ছিল না। সুতরাং অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক যথেষ্ঠ অর্থের অপব্যয় হইয়া কারবার ফেল হইয়া গেল। কিন্তু কতকগুলির সম্বন্ধে তাহাও বলা চলে না। কারবারের কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসাতেও এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে সে দৃষ্টান্ত অপ্রাপ্য নহে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় সাধারণ লোকের মনোভাব এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও নিজ নিজ সঞ্চিত অর্থ এই সব কারবারের অংশ গ্রহণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই সব যৌথকারবারের অনুষ্ঠান পত্র হস্তে স্বদেশীর সেবক এজেণ্টগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বীয় বাক্‌চাতুর্য্যে অনেক দরিদ্রের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগের দ্বারা অংশ ক্রয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন সেইসব দরিদ্র ব্যক্তি কেবল সেই সেয়ার সার্টিফিকেটের কাগজ ধুইয়া জল খাইতেছেন আর স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সেয়ার সার্টিফিকেটও পাওয়া যায় নাই।

দেশের গণ্যমান্য লোকদিগের নাম ডিরেক্টর তালিকায় থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার এইরূপ পরিণাম হয় তবে দেশের লোক পুনরায় তাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে কি? ইহাতে এই সব দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রত্যক্ষভাবে যে ক্ষতি হইল তদপেক্ষাও পরোক্ষভাবে যে আরও গুরুতর ক্ষতি হইল তাহা কি কেহ বিবেচনা করেন না?

অদ্য আমি নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত দুই চারিটি এইরূপ কোম্পানির বিষয় 'গৃহস্থের' পাঠকবর্গের গোচরে আনিতেছি, ইহা হইতেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আমার অভিযোগ প্রকৃত কি না।

১। তারপুর সুগার ওয়ার্কস্—দেশপ্রসিদ্ধ বরেণ্য বঙ্গের কৃতি সন্তান অবসর প্রাপ্ত

হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহোদয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহারই বাটীতেই ইহার আপিস। তাঁহার নাম দৃষ্টে অনেক লোকই অসঙ্কোচে ইহার অংশ ক্রয় করেন এবং স্বীয় স্বীয় অংশ অনুযায়ী টাকাও প্রেরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ কোম্পানির আর কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাওয়া যায় না। অংশীদারগণকে সেয়ার সার্টিফিকেটও এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। অন্ততঃ আমি যাঁহার বিষয় জানি তিনি পাঁচটি অংশের ৫০৲ টাকা শোধ করিয়া দিয়াও এ পর্য্যন্ত উহা পান নাই। একবার পত্র লিখিলে পরে উহা দেওয়া যাইবে উত্তর পাওয়া গিয়াছিল তারপর পত্র দিলে উত্তর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না!

শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনের কোম্পানিরও অবস্থা যদি এইরূপ হয় তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করা যাইবে?

গৃহস্থের পাঠকবর্গের মধ্যে এই কোম্পানির অংশীদার কেহ আছেন কিনা এবং তাঁহাদের দশা কিরূপ হইয়াছে জানিতে উৎসুক রহিলাম। আর ঐ চিনির কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, উহার কার্য্য চলিতেছে কি উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে তাহারও সংবাদ কেহ দয়া করিয়া গৃহস্থে প্রকাশিত করিলে সুখী হইব।

আর শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর নিকট অনুরোধ তিনিও দয়া করিয়া এই কোম্পানীর সম্বন্ধে সব তথ্য প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার নিকট এই জন্যই আমরা বিনীতভাবে এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

২। ত্রিপুরা কোম্পানী চাঁদপুর। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ক্ষেত্রমোহন দে কোম্পানী ইহার ম্যানেজিং এজেণ্ট। ইহারা অব্যবসায়ী নহেন; ইহাদের নিজেদের কারবারে ইহারা যথেষ্ট যশঃ ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং খুব লাভও করিতেছেন। ইহাদের নাম দেখিয়াই অনেকে ইহার অংশ অসংকোচে গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারা নিজের কারবারে যথেষ্ট লাভ দেখাইলেও এই কোম্পানীর কার্য্যে কিছুই লাভ দেখাইতে পারিতেছেন না। একবার বুঝি শতকরা ২৲ কি ঐরূপ লাভ দেখাইয়াছিলেন তারপর নীরব। বিপুল অর্থ ব্যয়ে চাঁদপুরে ইহার জন্য পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার টাকার অনেকটা এই ক্ষেত্র মোহন দে কোম্পানী কর্জ্জ দিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের টাকার সুদ তাঁহারা প্রতিবৎসর পাইতেছেন, কিন্তু গরীব অংশীদারগণ যে "তিমিরে সেই তিমিরে।" কখনও যে ইহার কোন সুবিধা হইবে সে আশাও অংশীদারগণ ছাড়িয়া দিয়াছেন। এটা কি ঐ কোম্পানীর পক্ষে প্রশংসার কথা? তাঁহারা যখন ইহার লাভ দেখাইতে পারিতেছেন না অথচ নিজেরা অনেক অংশ লইয়াছেন তখন অন্ততঃ গরীব অংশীদারদের অংশ গুলিও যদি তাঁহারাই কিনিয়া লন তাহা হইলেই সব দিক রক্ষা পায়। গরীব অংশীদারগণের উষ্ণ নিঃশ্বাসে আর তাঁহাদের অমল যশঃপ্রভা মলিন হয় না!

৩। Small Industry Development Co. Ltd.—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির অধীনে ইহার প্রতিষ্ঠা। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদক। এই কোম্পানী পেন্‌সিল নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু লাভ দূরে থাকুক লোকসানই হইতেছে।

লোকসান পোষাইয়া কখন যে ইহার লাভ দাঁড়াইবে সে আশা সুদূর পরাহত। তাঁহারা রিপোর্টে বলিয়াছেন অধিকাংশ অংশীদার নিজ নিজ অংশের টাকা না দেওয়াতে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কি কোন হিসাব করিয়া দেখেন নাই যে কত টাকার দরকার হইবে আর কত টাকা হাতে আছে? অংশীদারগণের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া কারবারে হাত দেওয়া উচিত ছিল না কি?

অনেক গরীব লোক ইহাদের নাম দেখিয়াই ৫ অংশ, ১০ অংশ বা তাহার অপেক্ষাও বেশী অংশ ক্রয় করিয়াছিল—এখন তাহারা অনুতাপ করিতেছে যে কোনও স্থানে গচ্ছিত রাখিলেও শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা পাইতে পারিতাম! এইতো দশা।

৪। বোম্বাই প্রদেশের একটি কোম্পানীর পরিচয়ও এখানে দিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বোম্বাই প্রদেশে প্রসিদ্ধ জাফর জনাফ্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে All India Insurance Co. Ltd.—খোলা হয়। বোম্বাই বাসীগণ ব্যবসা বুদ্ধিতে বিশেষ অভিজ্ঞ জানিয়া অনেক বঙ্গবাসী ইহার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারাও কিছুই উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন না। অংশীদারগণকে কখন নাম মাত্র লাভ আর কখন লাভের অঙ্কে শূন্য দিতেছেন। অথচ জীবন বীমা ও অগ্নি বীমা উভয় বীমার কাজই তাঁহারা করেন আর এইরূপ সব কারবারে বুঝিয়া সুজিয়া কাজ করিলে বেশ ভাল লাভই হইয়া থাকে।

বঙ্গের হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলী, ধর্ম্ম-সমবায়, ন্যাসন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোং প্রভৃতির কার্য্যে উন্নতিই পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ বোম্বাইর কোম্পানির কার্য্যের সুপরিচালনা হইতেছে না ইহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

অধিক দৃষ্টান্তের আর আবশ্যক নাই।

এই সব পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় যে যাঁহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক তাঁহাদের পক্ষে এজেণ্টগণের কথায় প্রলুব্ধ হইয়া এইরূপ সব যৌথকারবারের অংশ গ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদের অগাধ অর্থ সঞ্চিত আছে, দুই চারি শত টাকা মারা গেলেও যাঁহাদের তাহাতে কোনও ক্ষতি বোধ হয় না সেইরূপ ব্যক্তিগণেরই এই সব যৌথ কারবারের অংশ গ্রহণ করা ভাল। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদিগের এই সব অংশ গ্রহণ করিয়া কোনই লাভ হয় না, তদপেক্ষা তাঁহারা ঐ টাকা সুদে খাটাইয়া বরং বেশী লাভ করিতে পারেন। সাইলক বা রঘুনন্দের মত অধমর্ণকে পেষণ না করিয়াও তাঁহারা যৌথ কারবারের অংশের লাভ অপেক্ষা বেশী লাভ করিতে পারেন।

অনেক সময় অনুষ্ঠান পত্রের চটকে শতকরা ২০৲২৫৲ অথবা তার চেয়েও বেশী লাভের আশায় সুখ স্বপ্নে বিভোর হইয়া দরিদ্র ব্যক্তিও নিজ কষ্টার্জ্জিত বিত্ত এই সব সেয়ার ক্রয় করিতে নিয়োজিত করেন; শেষে কিছুই না পাইয়া মূল সমেত হারাইয়া পশ্চাত্তাপের যাতনা ভোগ করেন।

আর যাঁহারা দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তি, তাঁহাদিগের নিকটও এই বিনীত নিবেদন যে কোনও কারবারে তাঁহাদের নাম সংসৃষ্ট করিবার অনুমতি দিবার পূর্ব্বে যেন ঐ কারবারের বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত হন। নতুবা শেষে তাঁহাদের নামেই কলঙ্ক লিপ্ত

হইয়া দেশের লোকের দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে এবং সাধারণ ভাবেও যৌথকারবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া পড়ে।

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীগণও যেন এ বিষয় বুঝিয়া বুজিয়া কাজে হাত দেন। অধিক আর কি বলিব। নিতান্ত ব্যথিত চিত্তেই আজ এই কয়টা কথা বলিলাম।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

মফঃস্বলের বাণী

১। পল্লী সংস্কার

পল্লীগুলি একদিনে বা এক বৎসরে জঙ্গলে ভরিয়া উঠে নাই—পথ-ঘাটগুলি একদিনের বা এক বৎসরের সংস্কার-অভাবে দুর্গম হইয়া উঠে নাই। আজ পল্লীগ্রামগুলি যে কলেরা-ম্যালেরিয়ার বিহারভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা পল্লিবাসীর বহু বৎসরের উপেক্ষা ও নিশ্চেষ্টতার ফল, ইহা কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন ?

তোমার বাড়ীর কাছে জঙ্গল, তুমি কাটাইয়া পরিস্কার না করিলে, ভিন্নগ্রাম-বাসীর তাহাতে স্বার্থ কি ? তোমার গ্রামের পুকুর-পুষ্করিণী হাজিয়া মজিয়া গেলে অন্যের তাহাতে দায় কি ? তোমার গ্রামের পথ সংস্কার-অভাবে দুর্গম হইলে, অন্যের তাহাতে অসুবিধা কি ?

তোমার খিড়কিতে জঙ্গল—তোমার চলিবার পথ বর্ষার জলে কর্দ্দমাক্ত—সুতরাং দুর্গম; তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিবে না—প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করিবে না। তোমার স্নান-পানের পুষ্করিণীর প্রতি তোমার দৃষ্টি না থাকিলে—উহাদের রক্ষায় তোমার যত্ন না থাকিলে, তোমাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। তবে তুমি নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন ?

কেবল আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইবে না। কোমর বাঁধিয়া পল্লীর সংস্কারের জন্য অগ্রসর হও। আপনার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও, তবে ফল পাইবে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে,—

Heaven helps those, who help themselves.

কথাটি খুবই সত্য। পুরুষকার ভিন্ন সিদ্ধি নাই—সাধনা ভিন্ন সাধ্য-বস্তু লাভের উপায়ান্তর নাই। এ জগতের নিয়মই এই। নিশ্চেষ্টতা, আলস্যের পরিণাম যাহা—পল্লীবাসীরা এখন তাহাই ভোগ করিতেছেন।

অনেক পল্লিগ্রামেই পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই অব্যবহার্য্য—তাহাদের জল অপেয়। কিন্তু হইলে কি হয়, পুষ্করিণীর অধিকারী স্বীয় স্বচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও উহাদের সংস্কারে মনোযোগী নহেন। তাঁহারা চাহেন গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সংস্কার হউক—অথচ উহার কোন স্বত্বই তাঁহারা ত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে পুষ্করিণী ব্যবহার্য্য করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ান। এরূপ স্বার্থপরতার পরিচয় সর্ব্বত্র না হইলেও —অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

তাই বলিতেছি, গ্রামবাসীগণ স্ব স্ব গ্রামের সংস্কারে হাতে কলমে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সাধু সংকল্পের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। নচেৎ প্রত্যেক কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা

করিলে, তাহা পূর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে -- এবং তাহা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু হইতেছেও যে তাহাই।

অধিকাংশ গ্রামই দলাদলিতে পূর্ণ। গ্রামের উন্নতির জন্য—গ্রামের দুরবস্থা মোচনের জন্য কাহারও আন্তরিক কামনা বা চেষ্টা নাই। এ অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র পাঠাইয়া প্রতিকারপ্রার্থী হইলে কি হইবে? সে রূপ প্রতিকার গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নহে।

আপনারা স্বহস্তে গ্রামের অন্ততঃ প্রত্যেক গৃহস্থ আপন বাসস্থানের সমীপবর্ত্তী জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করুন। সে ভার গবর্ণমেণ্টের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। পথে দুই কোদালী মাটি প্রত্যেকে তুলিয়া দিলে, লোকাল-বোর্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। এইরূপে পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য গ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কিছু সাহায্য লইয়া সম্পন্ন হইতে পারে। একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, গ্রামের সংস্কার হইবে না—পল্লীবাসীর দুঃখও ঘুচিবে না। এ কথাগুলি গ্রামবাসিগণ মনে রাখিলে ভাল হয়।

বার্ত্তাবহ।

২। মালদহের গোঁসাঞা গম্ভীরা

পরম কারুণিক মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় আমরা প্রত্যেক নব-বর্ষের প্রথম ভাগে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গম্ভীরা-মণ্ডপে তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া ধনী, জ্ঞানী, দীন ও দরিদ্র সকল ভ্রাতায় একত্র সমবেত হইয়া তাঁহার কনক-কমল-পাদ-পদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকি। তাঁহার ইচ্ছায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে গম্ভীরা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। গম্ভীরা যে একটী জাতীয় উৎসব, ইহা যে কোনরূপ ব্যবসাদারী আমোদ প্রমোদ নহে, তাহা বোধ হয়, কোন সম্প্রদায়েরই লোককে বুঝাইতে হইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে গম্ভীরার যে অবনতি হইতেছিল একথা গোপন করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সে সময় গম্ভীরায় নানারূপ অশ্লীল ভাবের অবতারণা করা হইত বলিয়াই গম্ভীরার কথা শুনিলেই সুধীমণ্ডলী কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিতেন। কিন্তু উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনের সময় হইতেই তাহা যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া সুধীমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করতঃ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে হইলে সঙ্গীতালোচনার আবশ্যক এবং সঙ্গীতে মানব চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হয় আর কিছুতেই সেরূপ ভাবে আকৃষ্ট হইতে দৃষ্ট গোচর হয় না। অধিকাংশ স্থলেই সঙ্গীতের দ্বারাই জন সমাজে ভাব বিনিময় হয়।

গম্ভীরার সমস্ত ভাব বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সাহিত্য আলোচনা, দেশের নৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিকতা, বাৎসরিক বিবরণ, কৃষি শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের যাহাতে আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনার ফল যাহাতে মালদহবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বঙ্গের জন সাধারণ মালদহের সুমিষ্ট আম্রের ন্যায় সুখে উপভোগ করিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। সেই উদ্দেশ্যেই আজ তিন বৎসর যাবৎ মকদুমপুর গোঁসাই গম্ভীরার পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ গায়ক ও নর্ত্তকগণকে পুরস্কার দানে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হইতেছে। স্থানীয় সুধী-মণ্ডলীর মধ্য হইতে গম্ভীরা সম্বন্ধে বহুদর্শী

কয়েকজন ভদ্রমহোদয়গণকে পরীক্ষক মনোনীত করা হইয়া থাকে এবং তাঁহাদেরই মতানুযায়ী গায়ক ও নর্ত্তকগণ আপন আপন যোগ্যতানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান বর্ষে প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বাবু রাধাকিশোর বসাক মোক্তার, বাবু নলিনীকান্ত বসু এল. এইচ, এম, এস্, বাবু হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এম, ই, বাবু তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, প্রফেসার, বাবু রাধিকানাথ সিংহ বি, এল, ও বাবু যতীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার বি, এল, মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পরীক্ষকদিগের মধ্যে কেবল তারক বাবু কার্য্য বশতঃ গম্ভীরায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়াই পরীক্ষকগণের রিপোর্টে তাঁহার নাম দস্তখৎ নাই। এ বৎসর প্রতিযোগিতায় গান গাহিবার জন্য পূর্ব্বেই মুচিয়া, মহেশপুর, কুতুবপুর, পুড়াটুলী, মকদুমপুর, গণিপুর, কোতয়ালী, মোজেমপুর, ছিলিমপুর, মঙ্গলবাড়ী, টীপাজানি, ও ভোলাহাট প্রভৃতি স্থানের বোলবাই সমিতির সঙ্গীতগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তন্মধ্যে মকদুমপুর, গণিপুর, ও ভোলাহাটের হৃষিকেশ ঠাকুরের দল ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত দলেরই সঙ্গীতগুলি গীত হইয়াছিল। পরীক্ষকদিগের মতে তাঁহারা তাঁহাদিগের যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত রূপে পুরস্কৃত হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্বেও গীত সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই সামাজিক ব্যাপার লইয়া রচিত হইয়াছে, অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বড় একটা আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে মকদুমপুর বোলবাই সমিতির প্রাপ্ত সংগীত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র দাস পীড়িত থাকায় গম্ভীরার সময় প্রতিযোগিতায় ঐ দল উপস্থিত হইয়া গান গাহিতে পারে নাই। আশাকরি আগামী বর্ষে যাহাতে উপরি উক্ত সকল বিষয়গুলিই গম্ভীরাতে আলোচিত হয়, গীত রচয়িতৃগণ তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লইবেন। গণিপুরের শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র দাস ও ভোলাহাটের শ্রীযুত হৃষীকেশ ঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের দল গম্ভীরার নির্দ্দিষ্ট দিনে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় উপস্থিত হইতে পারে নাই।

গতবর্ষে উত্তর--বঙ্গ--সাহিত্য--সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে মালদহের গম্ভীরার গান যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং বঙ্গদেশের যে অনেক বিখ্যাত দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় গম্ভীরাগানের প্রশংসা বাহির হইয়াছে ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

মালদহের গম্ভীরার গান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ ক্রমশঃ আদর পাইতেছে তাহা মালদহ বাসীর পক্ষে সাতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কিছুদিন হইল স্থানীয় গৌড়দূত পত্রিকায় গম্ভীরা-বিদ্বেষী জনৈক ব্যক্তি গম্ভীরার কার্য্য সম্বন্ধে একটী বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার উক্ত কার্য্যটী যে কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তাহা দেশহিতৈষী বিদ্বানমণ্ডলীর বিবেচ্য। উক্ত কবিতার প্রত্যুত্তরে কোন কোন গীত রচয়িতা গান রচনা করিয়া প্রতিযোগিতায় গান গাহিবার জন্য আমাকে দিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। কারণ, তাহাতে সাম্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না।

সুখের বিষয় আমার এই গম্ভীরার আদর্শে

এ বৎসর জোত গ্রামে শ্রীযুত ভোলানাথ খলিফা মহাশয় ও ভোলাহাটে শ্রীযুত নৃত্যগোপাল দাস মহাশয় গম্ভীরা করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের গম্ভীরার কর্ত্তৃপক্ষগণ গম্ভীরার গায়ক ও নর্ত্তকগণকে উৎসাহ দান মানসে রৌপ্য পদক প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মালদহের সর্ব্বত্র এইরূপ ভাবে গম্ভীরা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বৎসর আমার এই গম্ভীরার সঙ্গে সঙ্গে মকদুমপুরের সমস্ত গম্ভীরার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিন পরিবর্ত্তন করিয়া দশ বার দিন পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ ঐ সময় প্রায়ই দৈবদুর্যোগ ঘটিয়া আরব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে এবং আরও গায়কগণ প্রতিযোগিতার যে সমস্ত গান গাহিয়া থাকেন তাহা তাঁহারা প্রায়ই অন্যান্য স্থানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গম্ভীরায় ঐ সমস্ত গান না করায় প্রচার উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয় এই উভয় বিধ কারণে আমরা দিন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভবিষ্যতে একটি স্বর্ণ পদক দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহাদের দল উপর্য্যুপরি ৩ বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাঁহারাই এই স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে স্থানীয় সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ক্রমাগত একটি দলের উপর্য্যুপরি তিন বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করা বড়ই দুঃসাধ্য বিবেচনায় যে কোন দল বর্ত্তমান ১৩২১ সাল হইতে আগামী ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসর কাল মধ্যে তিনবার প্রথম স্থান অধিকার করিবে সেই দলই ১৩২৫ সালে একটি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইবে।

পরিশেষে আমাদের বিদ্যোৎসাহী ও সর্ব্বজন প্রিয় শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাঁহার বহুকার্য্য থাকা সত্বেও তিনি গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও বহু কষ্ট স্বীকারে আমাদের এই গম্ভীরা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে যেরূপ উৎসাহ দান করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং আমরা আমাদের মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গল কামনা করি। আমাদের সহৃদয় পুলিশ সাহেব বাহাদুর ও দৈবদুর্যোগবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সহানুভূতি আছে আমাদিগকে জ্ঞাপন করায় আমরা বিশেষ কৃতার্থ হইয়াছি। স্থানীয় হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, আমলাবর্গ ও অন্যান্য ভদ্রলোক যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গম্ভীরায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদেরও মঙ্গল কামনা করি।

স্থানীয় মালদহ সমাচার ও গৌড়দূত আমাদের এই গম্ভীরার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেছেন তজ্জন্য আমি মালদহ সমাচারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও গৌড়দূতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মহাশয়দ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপসংহারে আমার নিবেদন এ বৎসর গম্ভীরার সময় যেরূপ জন সমাগম হইয়াছিল তাহাতে হয়ত অনেকেরই যথোচিত আদর অভ্যর্থনার ক্রটী হইয়া থাকিবে। আশা করি তাঁহারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

আমি ইতঃপূর্ব্বে মুখস নাচের নর্ত্তকগণকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া আজ কয়েক

বৎসর হইতে বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোনও নর্ত্তকই রাত্রি ১২ বারটার পূর্ব্বে গম্ভীরা মণ্ডপে উপস্থিত হয়েন না তজ্জন্য পরীক্ষক ও ভদ্র মহোদয়গণের দেখিবার অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। আশা করি ভবিষ্যতে নর্ত্তকগণ যাহাতে সন্ধ্যা রাত্রিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিজ নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া পুরস্কৃত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

এ বৎসর বোলবাই গানের প্রতিযোগিতায়—

১। মহম্মদ সুফিয়ার রহমান সাং ফুলবাড়ী প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র।

২। সতীশচন্দ্র গুপ্ত সাং আইহো ২য় রৌপ্য পদক।

৩। গোপালচন্দ্র দাস সাং মহেশপুর ৩য় প্রশংসা পত্র।

৪। মৃত্যুঞ্জয় হালদার সাং চাপাজানি ৩য় রৌপ্য পদক।

৫। বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় সাং কোতুয়ালী ৪র্থ রৌপ্য পদক।

৬। কিশোরীকান্ত চৌধুরী সাং পুভাটুলী

৭। পোকাই বিশ্বাস সাং ছিলামপুর

৮। হরিচরণ দাস সাং মঙ্গলবাড়ী

৫ম প্রত্যেকে একটি করিয়া প্রশংসা পত্র স্থান অধিকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে সতীশ গুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় হালদার ও বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় মেডেল প্রাপ্ত হইবেন।

ইতঃপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হইয়াছিল যে যাঁহারা পূর্ব্বে মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এ বৎসর মেডেল দেওয়া হইবে না তজ্জন্যই মহঃ সুফিয়ার রহমান প্রথম স্থান অধিকার করিলেও মেডেল প্রাপ্ত হইলেন না এবং গোপালচন্দ্র দাস ও মৃত্যুঞ্জয় হালদার উভয়েই ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র দাস প্রথম শ্রেণীর রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় হালদার এ বৎসর মেডেল প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন গম্ভীরার গীত প্রচার কল্পে গীত রচয়িতৃগণকে যোগ্যতানুসারে যে পুরস্কার প্রদান করা হইতেছে তাঁহাদিগের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। ইহার মধ্যে মহম্মদ সুফিয়ার রহমানের নাম উল্লেখ যোগ্য। আশা করি তাঁহারা ভবিষ্যতে এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া গীত প্রচারে যত্নবান হইবেন। মেডেল প্রাপ্ত দল ব্যতীত অন্যান্য দলের জন্য প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বাক্ষর যুক্ত সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মালদহ সমাচার।

১। নিরক্ষর কবি—রামুমালী

বাঙ্গলা ১২৫৮ সনের মাঘ মাসে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ কুমার অন্তর্গত আউটপাড়া গ্রামে অনক্ষর কবি রামুমালী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩২০ সনের ৩০শে ফাল্গুন ৫টী পুত্র ও ১টী কন্যা রাখিয়া ৭২ বৎসর বয়সে তিনি এই জড় জগতের সূত্র ছিন্ন করতঃ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রামুর পিতামহ মঙ্গলানন্দ,—পিতার নাম রামপ্রসাদ ও মাতার নাম রায়মণী ছিল। প্রাগুক্ত আউটপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামুমালীর শিক্ষাগুরু। উপাধি না থাকিলেও অমর ভট্টাচার্য্য একজন মহাপণ্ডিত ও সাধক শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদে রামু একজন বিখ্যাত কবির সরকার।

কবি গায়কদিগের সাধারণ উপাধি "সরকার"। এই সূত্র ধরিয়া ছোট বড়

সকলেই রামুমালীকে "রামু সরকার" বলিতেন। আমরাও প্রাদেশিক রীতি অনুসারে সকলের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধে রামু মালীকে "রামু সরকার"ই বলিব।

রামু সরকার বাল্যকাল হইতে লেখা পড়ার দিকে মন না দিয়া গীত বাদ্যের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁ'র আর লেখা পড়া শিক্ষা হইল না। বিশেষতঃ সামাজিক হিসাবে যাহারা নীচ জাতি, তাহারা লেখা পড়া শিক্ষার বড় একটা চেষ্টা করিত না।

পূজ্যপাদ অমর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বালক রামুর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য ও সঙ্গীত সাধনার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আপন শিষ্য করিয়া লইলেন। রামু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্নেহানুগ্রহে ও শক্তি সঞ্চারে অল্প দিন মধ্যেই গীতবাদ্যে ও শাস্ত্র পরিজ্ঞানে মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত চণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ, রামু কেবল গুরুমুখে শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিয়া ফেলিতেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন,— তাহা আর ভুলিতেন না। রামুর স্মৃতি সংসার ছাড়া ছিল। গ্রন্থাদি বুঝিবার শক্তিও বেজায় ছিল বলিতে হইবে। কেননা, কেহ কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে, রামু শ্রবণ মাত্রই তাহার ভাব গ্রহণে সক্ষম হইতেন। এমন কি সহজ সংস্কৃত শ্লোকাদির অর্থ নিজেই বুঝিতে পারিতেন।

খুব শিক্ষিত পণ্ডিতের মত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থাপন ও খণ্ডন করিতেও তাঁহার শক্তি ছিল।

মৌখিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত রামু, শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে,—পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে ছড়া পাঁচালী বলিতেও শিক্ষা করিয়া লইলেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামু সরকার কবির দলে প্রবেশ করিয়া ২০।২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একজন বিখ্যাত কবির সরকার হইয়া পড়িলেন।

রামু সরকারকে কেহ কোন দিন কবিগানে হারাইতে পারে নাই। কি কোন কথার কৌশলে ঠকাইতে পারে নাই।

রামবসু, রামকানাই, শক্তিরাম, বড়হরি মিয়াজান, নন্দ সরকার, গোবিন্দ মালী, বিশ্বম্ভর ঠাকুর প্রভৃতি বহু স্বদেশী বিদেশী কবিওয়ালাগণ রামু সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহারা কবিত্ব শক্তিতে রামুর সমতুল্য হইয়াও অনেক সময় বিজয়লক্ষ্মী রামুকেই যেন স্নেহের চুম্বন দানে সুখী করিতেন

রামু লেখা পড়া না জানিয়াও একজন মহাকবি ছিলেন। একবার (অনেক দিন হয়) "নব্যভারত" পত্রে নারায়ণ দেব প্রসঙ্গে এই অনন্য কবি রামুর কথা নিদর্শন মাত্র আলোচিত হইয়াছিল।

রামু সরকার চৌপদী ছড়া এত সুন্দর ও তাড়াতাড়ি বলিতেন যে শুনিয়া অতি বিজ্ঞ লোকও অবাক হইয়া পড়িতেন। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনীয় বিষয়টী সভাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য, রামু সরকারের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। এই জন্য অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"না,—রামুর ছড়া !!!"

তিনি যে কেবল ছড়া বলিতে পারিতেন এমন নহে। পাঁচালীতেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ঢোলের তালে মিশাইয়া, স্বর সংযোগে অতি সুললিত পাঁচালী কীর্ত্তন দ্বারা সভাস্থ লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে রামুর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

রামু ইচ্ছা করিয়া সভাকে হাসাইতে কাঁদাইতে পারিতেন। কি শৃঙ্গার কি হাস্ত কি করুণ যখন যে রসের পাঁচালী বলিতেন,—তখন সেই রসই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিত।

রামুর ছড়া পাঁচালীতে যমকানুপ্রাস কি উৎপ্রেক্ষোপমা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি খুব সুন্দর হইলেও অনেক স্থলে ব্যাজস্তুতির ঝঙ্কারেই অধিক পরিমাণে পরিশ্রুত হইত। সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে রামুর উপমাগুলির তুলনা ছিল না।

রামু লেখা পড়া না জানিয়া কি প্রকারে এরূপ অসাধারণ কবিত্ব শক্তি লাভ করিলেন,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি ?

কবিত্ব শক্তি যে স্বাভাবিক কোন ভাষা-জ্ঞান সাপেক্ষ নহে,—রামু সরকার তাহার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আক্ষেপের বিষয় রামুর এই অতুল্য অমূল্য কবিতাগুলি শুধুই হাওয়ায় মিলিয়া গেল! রামু সরকার কোন পুস্তক কি পদাবলী রচনা করিয়া যান নাই। আমরা বহু যত্নে রামু সরকারের রচিত গীত ও টপ্পা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বারান্তরে প্রান্তবাসীর কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণকে তাহাই উপহার দিতে ইচ্ছা রহিল।

রামু নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার স্বভাব ভদ্রজনোচিত ছিল।

রামুকে সকলেই সমাদর করিতেন। অনেক কবির আসরে রামু সরকার ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

একদিন কাটিহালীর সভায় রামু সরকার পঞ্চ 'ম' কারের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা ও তাহার সাধন প্রণালী বর্ণন করিয়াছিলেন যে, বহু উপাধিভূষিত পণ্ডিতগণ, "ধন্য রামু! ধন্য রামু!!" বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অনেক কবির আসরে রামু সরকার করুণ রসের পাঁচালী গাহিতে গিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেন। রামু সরকার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। সময় পাইলে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রান্তবাসী।

৪। প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাবিধান সকল দেশে সকল গবর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেকদিন হইতেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনেক আলোচনা চলিতেছে।

কিছুদিন হইল ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াছেন যে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডসমূহের অধীনে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করা হোক। যে সকল স্থানে তেমন শিক্ষার প্রসারকল্পে বোর্ডের আর্থিক সংস্থান নাই, সেই সকল স্থানে প্রাইভেট স্কুলগুলিকে সাহায্য প্রদান করা উচিত।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এই নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণ-মেণ্ট স্বতন্ত্র ছিল তখন ১৯১৩ অব্দে বোর্ড স্কুলের সংখ্যা ১৩০০ ছিল। কিন্তু ১৯১৩।১৪ অব্দের শেষে ঐ স্কুলের সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি হয় নাই। ১৯১৩-১৪ অব্দে কেবল ২৯০টি স্কুল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই চেষ্টার মূলনীতি এই—যাহাতে প্রাথ-মিক শিক্ষা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত

প্রতিনিধিগণের অধীনে চালিত হইতে পারে —যাহাতে ডিষ্ট্রীক্ট ও জেলা বোর্ডসমূহ আপনাপন সীমার মধ্যে নিজেদের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া। যে সকল প্রাইমেরী স্কুল ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলিকেও বোর্ডের শাসনে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ইহার ফল কি হইবে? ইহাতে বাস্তবিক প্রাইমেরী শিক্ষার প্রসার হইবে না; প্রাইমেরী শিক্ষার ক্ষেত্র দিন দিন সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। সকল সভ্য দেশেই প্রাইমেরী শিক্ষার ব্যবস্থা ও ভার জনসাধারণের উপর। যাহাতে ব্যক্তিগত চেষ্টা শিক্ষা ব্যাপারে দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্যই গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উৎসাহ দিবার জন্যই সাহায্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাকেই Grants-in-aid system বলা হয়। ১৯০৪ অব্দের ভারত গবর্ণমেণ্টের রিজলিউশনে গবর্ণমেণ্টের এই নীতি স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে :—

"From the earliest days of British rule in India private enterprise has played a great part in the promotion of both English and vernacular Education and every agency that could be induced to help in the work of imparting sound instruction has always been welcomed by the state. The system of grants-in-aid was intended to elicit support from local resources and to foster a spirit of initiative and combination for local ends."

"ব্রিটিস রাজত্বের প্রাক্কাল হইতে দেশীয় ভাষায় এবং ইংরেজীতে শিক্ষার উন্নতি বিধানে ব্যক্তিগত চেষ্টাই অধিক ফলবতী হইয়াছে। যে সকল উপায়ে এবং ব্যবস্থায় জনসাধারণের চেষ্টা নিজেদের শিক্ষা বিধানের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট এতদিন যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। তজ্জন্যই গবর্ণমেণ্ট অনেক স্কুলে আংশিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; যাহাতে স্থানীয় লোকদিগের চেষ্টা শিক্ষা ব্যাপারে উত্তরোত্তর উৎসাহিত হইয়া উঠিতে পারে— যাহাতে জনসাধারণ আপনাদের শিক্ষার জন্য নিজেদের চেষ্টায় স্কুলের ব্যবস্থা করিতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট Grants-in-aid ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।"

ইহাতে এতদিন খুব আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৪ অব্দের হিসাবে দেখা যায়, ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত স্কুলের মধ্যে ৮২ হাজার ৫ শত স্কুল ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আংশিক সাহায্য লাভ করিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট যে স্কুলগুলিতে অধিকতর অর্থসাহায্য করিয়া ক্রমশঃ সবগুলি নিজের চালনায় লইবেন ইহা কখনও গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল না এবং কখনও আছে বলিয়া আমরা কোন মতে মনে করিতে পারি না। ১৯০৪ অব্দের উক্ত রিজলিউশনে একস্থলে স্পষ্টই বলিতেছেন :—

"The progressive devolution of primary, secondary, collegiate education under private enterprise and the continuous withdrawal of Government from competition therewith was recommended by

the education commission of 1883 and the advice has been generally acted upon. But while accepting this policy the Government of India at the same time recognise the extreme importance of the principle that in each branch of education Government should maintain a limited number of institutions both on models for private enterprise to follow and in order to uphold a light standard of education."

ক্রমে ক্রমে সকল স্কুলগুলি উত্তরোত্তর ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হউক—কি প্রাথমিক কি উচ্চ ইংরেজী কি কলেজিয়েট শিক্ষা—সকল শিক্ষা-অনুষ্ঠানগুলি ক্রমে ক্রমে জনসাধারণ দ্বারাই পরিচালিত হউক—ইহাই ১৮৮৩ অব্দে এডুকেশন কমিশনের অভিমত। সেই মত অনুসারে ভারতের শিক্ষানীতি নিয়মিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই নীতি অনুসরণ করিলেও গবর্ণমেণ্টের নিজের চেষ্টায় ও ব্যয়ে কতকগুলি স্কুল দেশের মধ্যে রাখা গবর্ণমেণ্ট একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই সকল স্কুল শিক্ষার একটি উচ্চ আদর্শ লোক-চেষ্টার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

শিক্ষাবিষয়ে ইহাই ভারত ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মূলনীতি। এই নীতি এতদিন চলিয়া আসিতেছিল এবং তদনুসারে গবর্ণমেণ্টও ব্যক্তিগত চেষ্টাকে যথাসম্ভব উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু বোর্ডের স্কুলের সম্প্রসারণ করিয়া এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করার যে উদ্যম দেখা যাইতেছে তদ্দ্বারা ভারতের পূর্ব্বতন শিক্ষানীতির অনুগামী যে কার্য্য কাজ চলিবে এমন মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত গোখলে যখন প্রাথমিক শিক্ষার বিল ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন তখনকার কর্তৃপক্ষ প্রতিকূলে এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাবিধান অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ —ভারত গবর্ণমেণ্টের তখনকার আর্থিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কখনও এই গুরুভার গ্রহণ করিতে পারেন না। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচার যে অতিশয় প্রয়োজন, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন। যে অত্যাবশ্যক কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক ব্যয় করিতে সক্ষম নহেন তথায় জনসাধারণের চেষ্টা ও অর্থ যাহাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে নিয়োজিত করা যাইতে পারে তাহাই বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন এই বিষয়ে কোনও মতভেদ হইতে পারে না।

যে সকল প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত তাহাদের সংখ্যা কম। কারণ বোর্ডের পরিচালিত স্কুলের ব্যয় অত্যধিক। যেখানে একটি প্রাইভেট প্রাইমেরী স্কুলের মাসিক ব্যয় ৮৲ টাকা সেখানে একটি বোর্ডের স্কুলে ব্যয় ১৮৲ টাকা। যেখানে দুইশত টাকায় একটি প্রাইভেট প্রাইমেরী স্কুলগৃহ রচিত হয়, সেইখানে বোর্ডের একটি স্কুলগৃহ ১০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়বাহুল্য হেতু বোর্ডের স্কুল বাড়াইয়া যে কোনও দিন অতিমাত্রায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এই দেশে হইতে পারিবে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে।

গবর্ণমেণ্ট ও বোর্ড দিন দিন অধিকতর

অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন বটে, কিন্তু উক্ত ব্যয়বাহুল্য হেতু বর্ত্তমানে যেসকল স্কুল রহিয়াছে তাহার উন্নতিসাধনেই বোর্ডের সব অর্থ ব্যয় হইতে থাকিবে। কাজেই বহু বর্ষ ধরিয়া আর যে স্কুলের সংখ্যা বাড়িতে পারিবে এমন মনে হয় না।

এই দেশের বোর্ডের আর্থিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে গবর্ণমেণ্ট বা বোর্ডের ব্যয়েই যে কোনদিন প্রাথমিক শিক্ষার সার্ব্বজনীন প্রসার লাভ ঘটিতে পারিবে তাহা সম্ভবপর হইবে না।

সাড়ে চারি কোটি বালকের শিক্ষাবিধানের ভার নেওয়া অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। জনসাধারণও গবর্ণমেণ্টের যুক্ত চেষ্টাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট বলেন:—"The Government can do no more begin. গবর্ণমেণ্ট এই শুভ চেষ্টার কেবল সূচনাই করিয়া দিতে পারেন। তদতিরিক্ত অধিক কিছু করা কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভবপর নহে।

সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা দেশবাসীদের হাতে; গবর্ণমেণ্ট কেবল পর্য্যবেক্ষণ এবং শিক্ষানীতি নিয়মিত করেন মাত্র।

আমাদের দেশে বোর্ডগুলি যেভাবে গঠিত, তাহাতে বোর্ডগুলি যে সম্পূর্ণ জনসাধারণের প্রতিনিধি এরূপ বলিতে পারা যায় না। কাজেই এই সকল বোর্ডের হাতে যদি প্রাথমিক স্কুলগুলি সম্পূর্ণ ন্যস্ত করা যায় তবে জনসাধারণ হইতে যে চেষ্টা যে উদ্যম এতদিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা অনেকাংশে বিনষ্ট হইবেই। লোকেরা নিজের অর্থব্যয়ে নিজের চেষ্টায় যাহা করিয়া থাকে তাহার উপর প্রভুত্ব করিবে। আধিপত্য করিতে তাহা নিজ আদর্শ ও ইচ্ছামত গঠিত করিয়া তুলিতে না পারিলে কোন কাজেই তাহাদের উৎসাহ উদ্যম থাকিবার কথা নহে। এতদিন ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের Grants-in-aid প্রথা প্রবর্ত্তিত করার মূল দুইটি:—

(1) "The progressive devolution of primary, secondary, and Collegiate education upon private enterprise and the withdrawal of Government form competion."

(2) "The Government recognises two other great benefits which in Government effort have no place.—"The fostering of a spirit of initiative and combination for local ends and the imparting of religious and ethical education to complete the intellectual training of the scholars."

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্ট সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা জনসাধারণের পরিচালনের উপর দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুলসমূহে ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে করিতে পারেন না—যতই লোকেরা উপযুক্ত হইয়া নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে শিখিবে, ততই ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইবে।

এই দুই আদর্শই, আমাদের মনে আশঙ্কা হইতেছে, যেন বর্ত্তমান শিক্ষানীতিতে অনেকাংশে কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

আজকাল সভ্যসমাজের নিয়ম এই, যে অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায়, স্কুলের আদর্শ

স্কুলের ছাত্রদিগের নিত্যজীবনের জীবন-প্রণালী, আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, স্কুলগৃহের শিক্ষা, স্কুলগৃহ ইত্যাদি সমুদয় উপকরণ সেই অঞ্চলের জনসাধারণের নিত্য জীবনের আদর্শ হইতে কোনওরূপে অতি উচ্চ না হয়। স্কুলের শিক্ষনীয় বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদিগের পারিবারিক জীবনের সর্ব্বদা যোগ থাকা চাই। তাহা হইলে স্কুলগুলি পরিবারের সঙ্গে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া অনেকাংশে সফল হইতে পারে।

কিন্তু বোর্ড স্কুলের যে একটি গৃহে ১০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়, তেমন ব্যয়বহুল গৃহাদির দ্বারা কি শিক্ষার উৎকর্ষ কিম্বা বিস্তৃতি বাড়িবে? স্কুলের শিক্ষা পারিবারিক শিক্ষার অনুবৃত্তি মাত্র। ছাত্রদিগের আপনাপন বাড়ীগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে সম্প্রসারিত করিলেই বিদ্যালয় গঠিত হয়। যেখানে পল্লীবাসীর শতকরা ৫ জনও ১০০ টাকা ব্যয়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না, সেই স্থানে এক হাজার কিম্বা ৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় রচনা করা ভ্রম।

এই উপায়ে বিদ্যাগৃহ পাকা হয় বটে, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যাগৃহের আসবাবের তলায় চাপা পড়িয়া যায়। টুল, বেঞ্চ, টেবিলের আড়ালে জীর্ণশীর্ণ, নগ্নপ্রায় শিশুগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই দেশে বাজে উপকরণ দিয়া শিশুজীবনকে ভারাক্রান্ত করিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে কোথাও ছিল না। গাছের তলায়, বড়লোকের অব্যবহৃত বাড়ীতে, ঘরের বারান্দায় গুরু মহাশয়ের নিজ বাড়ীর এক কোণায় স্কুল বসিত। অধ্যাপকগণ পড়াইতেন। কিন্তু তখনকার দিনে গুরু ও শিষ্য এই উভয়ের মধ্যে কতদূর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল আজকাল বিদ্যালয়ের আসবাব আসিয়া গুরু শিষ্যর মাঝখানে দিন দিন জড় হইতেছে। আর গুরু ও শিষ্য উত্তরোত্তর দূরে সরিয়া পড়িতেছেন।

তাই আমরা আশঙ্কা করি, যদি বোর্ডগুলি আমাদের বিদ্যালয়ের অভিভাবক হইয়া পড়েন, দেশের মধ্যে যৌথ চেষ্টা পঙ্গু হইবে, দেশের জনসাধারণের অক্ষমতা দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। আত্মচেষ্টার ফলে এক একটি জাতি যেভাবে সক্ষম ও সমর্থ হইয়া উঠে, আমাদের আশঙ্কা হয়, বর্ত্তমান শিক্ষাবিধানে সেই আত্মচেষ্টার প্রসার সঙ্কীর্ণ হইবে।

জ্যোতিঃ

পরিশিষ্ট

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয়-অংশ।
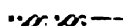
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব-কবিরত্ন-জ্যোতির্বিশারদ-সঙ্কলিত

গৃহস্থ পত্রে প্রকাশিত

ইণ্ডিয়া প্রেস—
২৭নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

∴ ৮। ৯। ৪৩—০। ০। ৮=৮। ৯। ৩৫ তাৎকালিক সায়ন শুক্র।

১৭ই বুধ—৬। ১২। ১০
১৬ই বুধ—৬। ১৩। ২৭

গতি —০। ১। ৪৩—অ.লগ ১.১৪৫৫
ঘণ্টা ৩। ৩৩—অ.লগ .৮২৯৯
০। ০। ১৫=অ.লগ ১.৯৭৫৪

∴ ৬। ১৫। ১০—০। ০। ১৫=৬। ১৪। ৫৫ তাৎকালিক সায়ন বুধ

আর রাহু ১১। ৬। ৮ সুতরাং কেতু ৫। ৬। ৮, এখন এই গুলি চক্রে বসাই। এই দেখুন (১২৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

গুরুদেব। হাঁ হ'য়েছে। এখন এতে ভাগ্যাংশাদি (Part of fortune). নামে একটি বিন্দু নির্দ্দেশ ক'ত্তে হ'বে। কারন অধিকাংশ পাশ্চাত্য জ্যোতিষাচার্য্য এ বিন্দু নিয়ে বিচার করেন। আমাদের দেশে তান্ত্রিক মতে এই রূপ অনেক বিন্দু নির্দ্দেশের রীতি আছে। সেগুলি যখন বুঝিয়ে দিব, তখন বুঝতে পার্ব্বে এটিও তা'রি একটি।

আমি। এটি নির্ণয়ের উপায় কি?

গুরুদেব। অনেকেই ভ্রমলাঘবাথে লগ্ন স্ফুট ও চন্দ্র স্ফুট যোগ ক'রে তা'থেকে রবিস্ফুট বাদ দিয়ে ভাগ্যাংশ স্ফুট নির্ণয় করেন। যেমন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে লগ্ন ১০। ২২। ৪০+চন্দ্র ১০। ১৯। ২০—রবি ৬। ২৩। ৩১=ভাগ্য ২। ১৮। ২৯ রাশ্যাদি। কোনও কোনও আচার্য্য চন্দ্রের বক্রোত্থান বা চন্দ্রের সপ্তমের বক্রোত্থান হ'তে সূর্য্যের বক্রোত্থান বাদ দিয়ে, তাতে লগ্নের বক্রোত্থান যোগ করে ভাগ্যাংশের বক্রোত্থান নির্ণয় ক'রে থাকেন।

আমি। দুয়েতে ফলের তারতম্য কিরূপ হয়?

গুরুদেব। ক'সে দেখ্তে পার।

আমি। লগ্নের বক্রোত্থান রয়েছে। চন্দ্র সূর্য্যের বক্রোত্থান নির্ণয় করতে হয় কেমন ক'রে? আর বক্রোত্থান মানেই বা কি? ভালক'রে বুঝিয়ে দিন।

গুরুদেব। গ্রহগণের এবং জন্মলগ্নাদির অবস্থিতি স্থান যে ক্রান্তিবৃত্তে তা জান, এবং এই ক্রান্তি যে বিষুবত্তের সঙ্গে বক্রভাবে অবস্থিত তাও জান (৬১ পৃষ্ঠা)। এখন মনে কর কোন গ্রহ মিথুনে আছে। তা'র মানে কি?—রাশিচক্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট ত্রিশ অংশ পরিমিত স্থান মিথুন, সেই—ত্রিশ অংশের উভয় প্রান্ত দিয়ে দু'টি রেখা কল্পনা ক'রে মেরু প্রান্তদ্বয়ে মিলিত ক'রে যে স্থানটুকু পাওয়া যায় তারি মধ্যে অবস্থিত ব'লে বুঝতে হ'বে, একথাও, পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে (৬২ পৃষ্ঠা দেখ)। এখন এই গ্রহের স্থিতিস্থান আরও দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হ'তে পারে। মেষারম্ভ বিন্দু হ'তে বিষুবত্তের উপর ঐ গ্রহের সমসূত্রে যে বিন্দু হ'বে সেই পর্য্যন্ত ঐ গ্রহের সরলোত্থান (Right Ascension—R. A.) বলা হয়, উহা ঐ মেষারম্ভ বিন্দু হ'তে অংশাদি বা ঘণ্টাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। আর ঐ গ্রহোদয়ের সময়ে

বিষুবতের যে বিন্দু পূর্ব্বাকাশে উদিত হয় তারি কৌণিক দূরত্বকে বক্রোত্থান (Oblique Ascension=O. A.) বলে। এই দু'য়ের অন্তরের নাম উদয়ান্তর বা অ্যাসেন্সন্যাল ডিফারেন্স (Ascensional Difference=Asc. Dif.)।

আমি। ভাল বুঝতে পারলাম না।

গুরুদেব। এ কথা তবে আর এক সময়ে একটা খ-গোলক সাহায্যে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিব। এখন ঐরূপ গোলক এখানে নাই কাজেই বুঝাতে পারলাম না। যাই হোক, এখন এই সব অঙ্ক নির্ণয়ের কতক গুলি সূত্র তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্চি, সেগুলি মনে-করে রাখ।

রবির স্ফুট=৬।২৩।৪১ অর্থাৎ সায়ন তুলার ২৩ অংশ ৪১ কলা। সরলোত্থান কত নির্ণয় করতে হবে।

১ম সূত্র। পরমাপক্রমের কোজ্যা (Log.cos O. E.) ও স্পষ্টচাপস্পর্শিনীর (Log. tan. Long.) চারাঙ্ক যোগ করলে লগ. সরলোত্থান-স্পর্শিনী (Log. tan. R. A.) হইবে।

বর্ত্তমান পরমাক্রম প্রায় ২৩-২৭', এবং রবিস্ফুট তুলার ২৩।৪১

∴ L. Cos. ২৩।২৭=৯.৯৬২৫৬
+L, tan ২৩।৪১=৯.৬৪৩১২
=L. tan. ২১।৫৮=৯.৬০৫৬৮

∵ তুলাপর্য্যন্ত ১৮০° ∴ ১৮০°+২১-৫৮'=২০১-৫৮' রবির সরলোত্থান, উহাকে ঘণ্টাদি করিলে ১৩।২৭।৫২ হয়। এই দুই রূপেই সরলোত্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে।

২য় সূত্র। যদি স্পষ্ট গ্রহ দেওয়া থাকে, তাহা হইতে গ্রহের ক্রান্তি (Dec) নির্ণয় করিতে হইলে লগ-জ্যা পরমাপক্রম+লগ-জ্যা স্পষ্টচাপ=লগ-জ্যা ক্রান্তি হইবে। ঐ ক্রান্তিমেষাদি ৬ রাশিতে উত্তর ও তুলাদি ছয় রাশিতে দক্ষিণ ক্রান্তি বুঝিতে হইবে। যথা—

L. Sin. ২৩।২৭=৯.৫৯৯৮৩
+L. Sin. ২৩।৪১=৯.৬০৪৭৪
=L. Sin. ৯। ৬=৯.২০৪৫৭

এই সময়ে রবি তুলার ২৩।৪১ অংশাদিতে থাকায় ক্রান্তি দ ৯।৬ হইল।

আমি। আমি চন্দ্রের সরলোত্থান ও ক্রান্তি নির্ণয় ক'রে চন্দ্রের স্ফুট ১০।১৯।২০=৩১৯।২০ অংশাদি। ৩৬০।০-৩১৯।২০=৪০।৪০ মেষের অগ্রে।

অতএব L. cos. ২৩।২৭=৯.৯৬২৫৬
+L. tan. ৪০।৪০=৯.৯৩৪০৬
=L. tan. ৩৮।১৫=৯.৮৯৬৬২

সুতরাং ৩৬০।০-৩৮।১৫=৩২১।৪৫ অর্থৎ চন্দ্রের সরলোত্থান ৩২১ অংশ, ৪৫ কলা। আর—

L. Sin. ২৩।২৭=৯.৫৯৯৮৩
L. Sin. ৪০।৪০=৯.৮১৪০২
L. Sin ১৫। ২=৯.৪১৩৮৫

চন্দ্র তুলাদি ষড় রাশির অন্যতম কুম্ভে থাকায় ক্রান্তি দ ১৫। ২ অংশাদি হ'লো।

গুরুদেব। হলো বটে, এবং এ অঙ্ক দিয়ে মোটামুটি কাজও চলে বটে, কিন্তু চন্দ্রাদি গ্রহের বিক্ষেপ (Lat.) থাকায়, ক্রান্তি ও সরলোত্থান নির্ণয়ের স্বতন্ত্র সূত্র আছে। তা এই—

৩য় সূত্র। লগজ্যা স্পষ্টচাপ + লগস্পর্শিনী পরমাপক্রম = লগস্পর্শিনী ∠ক। যদি স্পষ্টগ্রহ যে দিকের রাশি ষট্‌কে আছে, বিক্ষেপ ও সেই দিকে হয় তবে ৯০ অংশ হইতে ঐ বিক্ষেপ বাদ দিবে এবং বিপরীত দিকে হয়; তবে ৯০ অংশে যোগ করিবে। তাহাতে যে ফল লব্ধ হ'বে তাহা হইতে ∠ক বাদ দিলে ∠খ হইবে। তৎপরে ∠খ কোজ্যা লগ ও পরমাপক্রমের কোজ্যা লগ যোগ করিয়া তাহা হইতে ∠ক কোজ্যা লগ বিয়োগ করিলে গ্রহের লগ জ্যা ক্রান্তি নির্ণীত হবে।

যেমন র‍্যাফেলের পঞ্জিকায় ১৭ তারিখে চন্দ্রের বিক্ষেপ দক্ষিণ ১ অংশ ২৮ কলা ও ১৬ই তারিখে ২ অংশ ২৯ কলা সুতরাং ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডে ১ অংশ ১ কলা হ্রাস হ'চ্চে। এখন ত্রৈরাশিক কর—

২৪ ঘণ্টা : ৩। ৩৩ ঘণ্টাদি : : ১ অংশ ১ কলা কত ?

$$= \frac{\text{৩ ঘণ্টা ৩৩ মি} \times \text{৬১ কলা}}{\text{২৪ ঘণ্টা}}$$

= ৯ কলা প্রায়

অতএব ১ অংশ ২৮ কলাতে ঐ ৯ কলা যোগ করে, তাৎকালিক বিক্ষেপ হ'লো ১ অংশ ৩৭ কলা দক্ষিণ বিক্ষেপ। এখন সূত্রানুসারে—

L. Sin. ৪০ ৪০ = ৯·৮১৪০২
\+ L. tan. ২৩ ২৭ = ৯·৬৩৭৪৯
= L. tan. ∠ক ১৫। ৪৮ = ৯·৪৫১৫১

চন্দ্র দক্ষিণ রাশি কুম্ভে, বিক্ষেপ ১। ৩৭ দক্ষিণ
অতএব ৯০ — ১। ৩৭ = ৮৮। ২৩ এবং ইহা হইতে
১৫। ৪৮ বাদ দিলে
= ∠খ ৭২। ৩৫

এক্ষণে L. cos. ∠খ ৭২। ৩৫ = ৯·৪৭৬১১
\+ L. cos. প. অ. ২৩। ২৭ = ৯·৯৬২৫২
১৯·৪৩৮৬৩
— L. cos. ∠ক ১৫। ৪৮ = ৯·৯৮৩২৭
= চন্দ্রের ক্রান্তি L. sin. ১৬। ৩৫ = ৯·৪৫৫৩৮

এখন র‍্যাফেলের পাঁজি ধরে কসে দেখতে পার ফল প্রায় ঠিক হয়েছে।

আমি। প্রায় হ'বে কেন ?

গুরুদেব। আমরা ত টেবিল থেকে লগ নেবার সময় ঠিক ঠিক নিই নাই।

আমি। নেন না কেন ?

গুরুদেব। অত সূক্ষ্ম প্রয়োজন নেই বলে। ফলে ক্রান্তি ১৬। ৩৫ না হয়ে ১৬। ৩৪ কি ৩৩ হ'লে বড় বেশী অন্তর হ'লো না। তার পর সরলোত্থান (R. A.), যে গ্রহের স্ফুট ও বিক্ষেপ দেওয়া ও ক্রান্তি দেওয়া আছে তার জন্য সূত্র—

৪র্থ সূত্র। লগ কোজ্যা বিক্ষেপ ও লগ কোজ্যা স্পষ্ট যোগ করে তা থেকে লগ কোজ্যা ক্রান্তি বাদ দিলে লগ কোজ্যা সরলোত্থান হ'বে। যেমন—

	L. cos. বিক্ষেপ	১। ৩৭ = ৯.৯৯৯৮৩
+	L. cos. স্পষ্ট	৪০। ৪০ = ৯.৮৭৯৯৬
		৯.৮৭৯৭৯
−	L. cos. ক্রান্তি	১৬। ৩৫ = ৯.৯৮১৫৫
	L. Cos R. A.	৩৭। ৪৩ = ৯.৮৯৮২৪
		৩৬০। ০ − ৩৭। ৪৩ = ৩২২। ১৭

গ্রহের সরলোত্থান ও মধ্যাকাশের সরলোত্থানের অন্তর গ্রহের মধ্যেন্দিন রেখান্তর M. D. ইহাও ফল নির্দ্দেশে প্রয়োজন হয়। এইবার উদয়ান্তর (Asc Diff.) নির্ণয় প্রণালী বলছি—

৫ম সূত্র। যে দেশের উদয়ান্তর গণিত হইবে সেই দেশের অক্ষের লগ. স্পর্শিনী ও গ্রহের ক্রান্তি লগ স্পর্শিনী যোগ করিলে, উদয়ান্তরের লগ জ্যা লব্ধ হইবে।

যেমন ২২।৩৩ উত্তর অক্ষস্থিতে দেশের জন্য ঐ চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয়ান্তর নির্ণয় জন্য

	L. tan.	২২। ৩৩ = ৯.৬১৮২৯	
+	L. tan.	১৬। ৩৫ = ৯.৪৭৩৯২	
=	L. sin. Asc. Dif.	৭। ৩ = ৯.০৯২২১	চন্দ্রের
এবং	L. tan.	২২। ৩৩ = ৯.৬১৮২৯	
+	L. tan.	৯। ৬ = ৯.২০৪৫৯	
−	L. sin Asc. dif	৩। ৪৮ = ৮.৮২২৮৮	সূর্য্যের

এই যে উদয়ান্তর লব্ধ হলো। এটি যদি মধ্য মাধ্যাহ্নিক হয় তবে ক্রান্তি উত্তর হলে ৯০ অংশে উদয়ান্তর যোগ এবং দক্ষিণ হলে ৯০ অংশ থেকে বাদ দিলে দিবার্দ্ধ চাপ হবে, সূর্য্যের পক্ষে সেই দিবার্দ্ধ চাপের ঘণ্টাদিই স্ফুটাস্ত কাল এবং তাহা ১২ হ'তে বাদ দিলে স্ফুটোদয়কাল হবে। রবিচন্দ্র ভিন্ন গ্রহের জন্য সেই গ্রহের সরলোত্থান হ'তে রবির সরলোত্থান বাদ দিয়ে যে অঙ্ক পাওয়া যাবে তা যদি অংশাদি হয় তা'কে ঘণ্টাদি কর। উহাই ঐ গ্রহের মাধ্যন্দিন রেখাতিক্রম সময় এবং ঐ নিয়মে সেই গ্রহের দিবার্দ্ধমান নির্ণয় ক'রে সেই অঙ্ক ঐ মাধ্যন্দিন রেখাতিক্রম কাল হতে বাদ দিলে গ্রহের স্ফুটোদয়কাল এবং যোগ করে স্ফুটাস্ত কাল হ'বে; তাতে কালসমীকরণ সংস্কার করেই ঘড়ির সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে একটু জটিলতর অঙ্ক করা দরকার। যথা নৌপঞ্জিকার প্রতিমাসের IV পৃষ্ঠায় লিখিত চন্দ্রের মাধ্যন্দিন-রেখাতিক্রম-কাল গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে ঐ গ্রন্থের ৪৩২ পৃষ্ঠা লিখিত সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক, সংস্কৃত মাধ্যন্দিন অতিক্রম কাল নির্ণয় করা উচিত, (প্রতিমাসের V-XII

পৃষ্ঠা লিখিত চন্দ্রের তাৎকালিক ক্রান্তিগ্রহণ করে স্বদেশীয় অক্ষ সাহায্যে দিবার্দ্ধচাপ নির্ণয় ক'রে তার ত্রিশভাগের একভাগ সেই অঙ্কে যোগ ক'র্ত্তে হ'বে, পরে ঐ অঙ্ক মাধ্যাহ্নিন রেখাতিক্রম কাল হ'তে বিয়োগ কল্লে উদয়কাল ও যোগ কল্লে অস্তকাল হ'বে। এই অঙ্কে কাল সমীকরণ সংস্কার কল্লে, ব্যবহার যোগ্য ঘড়ির কারণ পাওয়া যাবে।

৬ষ্ঠ সূত্র। উত্তর ক্রান্তিযুক্ত সরলোত্থান হইতে উদয়ান্তর বাদ দিলে এবং দক্ষিণ ক্রান্তিযুক্ত সরলোত্থানে যোগ করিলে বক্রোত্থান লব্ধ হ'বে। যথা

রবির সরলোত্থান ২০১° – ৫৮ কলা ক্রান্তি দক্ষিণ

এজন্য উদয়ান্তর ৩ – ৪৮ কলা যোগ করিয়া

রবির অংশাদি ২০৫ – ৪৬ বক্রোত্থান হইল।

এবং চন্দ্রের সরলোত্থান ৩২২। ১৭ ক্রান্তি দক্ষিণ

অতএব উদয়ান্তর ৭। ৩ যোগ করিয়া

চন্দ্রের অংশাদি ৩২৯। ২০ বক্রোত্থান হইল

এক্ষণে যদি এই চন্দ্রের বক্রোত্থানে, লগ্নের বক্রোত্থান যোগ করে তা থেকে সূর্য্যের বক্রোত্থান বাদ দেওয়া যায় তা হলেই ভাগ্যাংশের (Part of Fortune) বক্রোত্থান হ'বে।

ইংলণ্ডীয় নৌপঞ্জিকায় রবি চন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহের স্ফুট নাই। সরলোত্থান ক্রান্তি এবং সৌরকেন্দ্রিক, স্পষ্ট আছে কিন্তু কোষ্ঠীতে ভূকেন্দ্রিক স্পষ্টই ব্যবহৃত হয় এজন্য নিম্ন সূত্র দুটী জানা প্রয়োজন—

লগজ্যা সরলোত্থান – লগ কোস্প, ক্রান্তি = লগ স্প [illegible] ক [illegible] যদি সরলোত্থান ১৮০ অংশের কম হয় তবে উহা উত্তর অন্যথা দক্ষিণ।

সরলোত্থান ও ক্রান্তি একদিকে হইলে ঐ [illegible] ক [illegible] পরস্পর বিয়োগ এবং বিভিন্ন দিকে অবস্থিত হইলে ঐ দুয়ের অন্তর [illegible] খ।

লগজ্যা [illegible] খ + লগ স্প সরলোত্থান—লগজ্যা [illegible] ক = লগ স্প গ্রহস্ফুট।

লগ কোজ্যা [illegible] খ + লগ কোজ্যা ক্রান্তি —লগ কোজ্যা [illegible] ক = লগজ্যা বিক্ষেপ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্র ৩৬০ অংশ কিন্তু উহার [illegible] মাত্র ব্যবহার্য্য কোণ, এজন্য প্রয়োজন মত ১৮০ বা ৩৬০ হইতে চাপ অন্তর করিয়া ৯০ অংশের কম যত যাবা, জ্যা প্রভৃতি লইতে হয় এবং ফলে, ঐ ১৮০ বা ৩৬০ যোগ বা বিয়োগ করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়।

সূর্য্যের ভূকেন্দ্রিক স্ফুট হইতে ১৮০ বাদ দিলে পৃথিবীর সৌর কেন্দ্রিক স্ফুট লব্ধ হয়।

অভীষ্ট গ্রহের সৌ-কে, স্ফুট—পৃথিবীর সৌ-কে, স্ফুট = [illegible] ক

১৮০ – [illegible] ক / ২ = [illegible] খ

গ্রহ হইতে সূর্য্যের দূরত্বের লগ + কোজ্যা সৌ কে. বিক্ষেপ = লগ [illegible] গ

লগ ∠ গ + লগ Rad. Vec. (নৌ পঞ্জিকায় দ্রষ্টব্য) = লগ স্প ∠ ঘ

লগ স্প (∠ ঘ—৪৫) + লগ স্প [illegible] খ = লগ স্পান [illegible]

$\angle$খ + $\angle$চ = $\angle$ইলাঙেসন্

সূর্য্যের ভূ. কে. স্প + $\angle$ইলঙেসন = গ্রহের ভূ. কে. স্পষ্ট।

যোগ কি বিয়োগ করিতে হইবে তাহা কার্য্যকালে চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্থির করিতে হয়।

উপস্থিত ক্ষেত্রে চক্রাঙ্কনের জন্য পাশ্চাত্য যে সমুদয় অঙ্কের প্রয়োজন তা বল্লাম চক্রে এতদ্ব্যতীত লগ্ন দশম ও সপ্তম সন্নিহিত স্থির তারার নির্দ্দেশ করে নিলে তদ্দ্বারা ফল বিচারে সুবিধা হয়। সেকথা বিচার প্রসঙ্গে বিশেষ ক'রে বল্‌বো।

ইতি দ্বিতীয় প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ

৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খ্রীষ্টাব্দের বর্ষধ্রুবাঙ্কচক্র অসম্পূর্ণ হওয়ায় পুনঃ প্রদত্ত হইল।

খ্রীষ্টাব্দের বর্ষ ধ্রুবাঙ্ক চক্র।

	ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	
১৭০০	*	৫৩	৫৪	৫৫	*	*	৫৭	*		*	*	৫৬	*	-	১৬০০
	৫৮	৫৯	*	*	৬১	৬২	৬৩	*		৬০	*		-	-	
	*	*	৬৫	৬৬	৬৭	*	*	৬৪		.	*	-	৬৮	.	
	৬৯	৭০	৭১	*	*	৭৩	৭৪	*	.	*	৭২	.	.		
	৭৫	*	*	৭৭	৭৮	৭৯		*	৭৬	*	*	*	.	৮০	
১৭০০	*	৮১	৮২	৮৩	*	*	৮৫	-		*	.	৮৪	-	*	
	৮৬	৮৭	*	*	৮৯	৯০	৯১	*	*	৮৮	*	-	.	.	
	*	*	৯৩	৯৪	৯৫	*	*	৯২	*	*	*	*	৯৬	.	
১৫০০	৯৭	৯৮	৯৯	০০	০১	০২	০৩	*	*	.	*	.	-	.	১৭০০
	*	*	০৫	০৬	০৭	*	*	০৪	*	*	*	*	০৮	.	
	০৯	১০	১১	*	*	১৩	১৪	.	*	.	১২	*	.		
	১৫	*	*	১৭	১৮	১৯	*	*	১৬		-	.	.	২০	
	*	২১	২২	২৩	*	*	২৫	*			-	২৪	.	.	
	২৬	২৭	*	*	২৯	৩০	৩১	*		২৮	.	.	.	.	
	*	*	৩৩	৩৪	৩৫	.	*	৩২		.	.		৩৬	.	
	৩৭	৩৮	৩৯	*	*	৪১	৪২	*			৪০	.		.	
	৪৩	*	*	৪৫	৪৬	৪৭	*	*	৪৪			.		৪৮	
	*	৪৯	৫০	৫১	*	*	৫৩	*			.	৫২			
	৫৪	৫৫	*	*	৫৭	৫৮	৫৯	*		৫৬		.	.	.	
	*	*	৬১	৬২	৬৩	*	-	৬০			.		৬৪		
	৬৫	৬৬	৬৭	*	*	৬৯	৭০	*		.	৬৮	*	.		
	৭১	*	*	৭৩	৭৪	৭৫	*	*	৭২			.	.	৭৬	
১৮০০	*	৭৭	৭৮	৭৯	*	*	৮১	*				৮০	.	.	
	৮২	৮৩	*	*	৮৫	৮৬	৮৭			৮৪	.	.	.	.	
	*	*	৮৯	৯০	৯১	*	*	৮৮				.	৯২		
	৯৩	৯৪	৯৫	*	*	৯৭	৯৮	.		.	৯৬		.	.	
১৯০০	৯৯	০০	০১	০২	০৩	*	*	*		.		.	০৪	.	১৮০০
	০৫	০৬	০৭	*	*	০৯	১০	.		.	০৮		.	.	
	১১	*	*	১৩	১৪	১৫	*	.	১২	.		.	.	১৬	
	*	১৭	১৮	১৯	*	*	২১	*		.	.	২০	.	.	
	২২	২৩	*	*	২৫	২৬	২৭	*		২৪	.	.	.	*	
	*	*	২৯	৩০	৩১		*	২৮		.	.		৩২	.	
	৩৩	৩৪	৩৫	*	*	৩৭	৩৮	.			৩৬	.	.	.	
	৩৯	*	*	৪১	৪২	৪৩	*	.	৪০	.		.	.	৪৪	
	*	৪৫	৪৬	৪৭	*		৪৯	.		.	.	৪৮	-	.	
	৫০	৫১	*	*	৫৩	৫৪	৫৫	.		৫২	.	.	.	.	
	*	*	৫৭	৫৮	৫৯	.	*	৫৬			.		৬০	.	
	৬১	৬২	৬৩	*	*	৬৫	৬৬	.		.	৬৪	.	.	.	
	৬৭	*	*	৬৯	৭০	৭১	*	.	৬৮	.	.	.	.	৭২	
	*	৭৩	৭৪	৭৫	*		৭৭	.	.	.	.	৭৬	.		
	৭৮	৭৯	*	*	৮১	৮২	৮৩	*		৮০	.	.	.	.	
	*	*	৮৫	৮৬	৮৭		*	৮৪	.	.	.	.	৮৮	.	
১৫০০	৮৯	৯০	৯১	*	*	৯৩	৯৪	.			৯২	.	*	.	
	৯৫	*	*	৯৭	৯৮	৯৯	*	.	৯৬	.	.	.	২০০০		

শুদ্ধিপত্র

জ্যোতিষ প্রসঙ্গের পাঠকগণ যে যে স্থানে সানে সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে কয়টি ভ্রম লক্ষিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদিগকে যথাসময়ে জানাইতেছি। এক্ষণে এই স্থলে প্রদত্ত হইল। আমরা নিজে এখনও মুদ্রিতাংশ দেখিবার সুবিধা করিতে পারি নাই, আশা করি অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইলে মারত্মক ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিতে পারিব। বর্ণশুদ্ধি প্রভৃতি সাধারণ বোধ্য ভুল সংশোধন প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ	
৩৩	১৪	২১	স্থলে	২২	হইবে
৭৫	১৮	জুন	,,	জুলাই	,,
৬২	৪	সত্তর	,,	সওয়া	,,
,,	৭	৬০	,,	৫০	,,
১০১	৩১	৩১.১০৩	,,	৩৬.১৯৬	,,
১০২	২	তুলাদি	,,	কর্কটাদি	,,

এতদ্ব্যতীত ১০১ পৃষ্ঠার ৩০ ছত্রারম্ভে "আমি" বসিবে এবং ৫০ পৃষ্ঠার টেবিলটিতে ভ্রম থাকায় পরপৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইল।

বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র।

অংশাদি হইতে ঘণ্টাদি ও দণ্ডাদি নির্ণয় ৩৮-৯

অক্ষাংশাদি নির্ণয় প্রণালী ৬৬,১১৭

অক্ষাংশাদি সারিণী ২৬-৩৬

অধিদেবতা (নক্ষত্রের) ৭

অব্দ গণনা ১৩

অমাসারিণী ৫৭

অমাসারিণী সাহায্যে তিথ্যাদি নির্ণয় প্রণালী ৫৮-৫৯

অয়নগতি ৪৪

অয়নাংশ ১৩-১৪,৬১-৬৩

অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান নির্ণয় প্রণালী ৯৬

অহর্গণ ৭৭

উগ্রগণ নক্ষত্র ৭

উত্তরায়ণ ৬

উদয়াস্তর ১২৪

উদয়াস্ত নির্ণয় প্রণালী ১৮,২১,২৪

উদয়াস্তের উদাহরণ ২১,২২,১২৭

কলিকাতার চর সারিণী ১২৫

" লগ্নখণ্ড ৯৪

কর্কট সংক্রান্তি ৪

কল্প ৮১-৮২

কাল সমীকরণ সারিণী ৪৫-৪৬

কোষ্ঠীর প্রয়োজন ৮

কোষ্ঠীর ফল অখণ্ডনীয় নহে ৮

ক্রান্তি নির্ণয় প্রণালী ৪৩

ক্রান্তি সারিণী ৪২

খ-বিষুবৎ ৫

খ্রীষ্টাব্দের বর্ষপ্রবাহ ৫০

গণ ৬৭

শুক্র প্রাপ্তি ৩
গ্রহগণের দৈনিক মধ্যগতি ৮৯
গ্রহগণের পূর্ব্বস্থানে আগমন কাল ৯১
গ্রহগতি ১১১
গ্রহণ গণনাপ্রণালী ৯
গ্রহণ গণনার উদাহরণ ১১-১২
গ্রহণ সম্ভাবনা ৯
গ্রহভগণ ৮৬,৮৫,৮৯
গ্রহস্ফুট ১১১
গ্রহাধ্যায় ৬৯
গ্রাস পরিমাণ ১০
ঘোরা সংক্রান্তি ৭
চন্দ্র-ধ্রুবাঙ্ক ১০
চন্দ্রপাত ৮৭
চন্দ্রোচ্চ ৮৭
চরগণ নক্ষত্র ৭
চর নির্ণয় প্রণালী ৯৫,১১২
চর সংস্কার ৯৩
চান্দ্রমাস ৮৬
চেষ্টার প্রয়োজন ৮
চৈত্র অয়নাংশ ৭৭,৮৩
জন্মকুণ্ডলী ৯৮,১০৪
জলবিষুব সংক্রান্তি ৬
তাৎকালিক গ্রহনির্ণয় প্রণালী ১১৭-১২১
তিথি নির্ণয় সূত্র ৫৫
তীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র ৭
তুলা সংক্রান্তি ৫
দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি ৬
দশম ভাব ১০৭-৮,১১৩-১৫,১২৪
দিনবৃদ্ধ ৭৭
দিনমান নির্ণয় প্রণালী ... ... ১৬।১৭
দিনার্দ্ধ ও রাত্র্যর্দ্ধ সারিণী ... ... ১৯।২০

দেশান্তর নির্ণয়োদাহরণ ১১৭-১৯
দ্বাদশ ভাব ১০৮,১১০,১২৫,১২৬
ধ্রুবগণ নক্ষত্র ৭
ধ্রুবাঙ্ক যোগে বার নির্ণয় চক্র ৭১
ধ্বাঙ্ক্ষী সংক্রান্তী ৭
নক্ষত্র ৭,৬৭
নক্ষত্র নির্ণয় সূত্র ৭৬
নক্ষত্রের অধিদেবতা ৭
নক্ষত্রের জাতি ৬৭
নক্ষত্রের প্রকৃতি ৬৭
নাক্ষত্রকালকে মধ্যকাল করা ১১৯-২১
নাক্ষত্রকাল সারিণী ১২০
নাক্ষত্র ভগণ ৮৭
নাগ নাড়ী চক্র ৬৮
পঞ্চাঙ্গ-নির্ণয়-প্রণালী ९৬
পর্ব্বতোপরি উদয়াস্ত ব্যতিক্রম ১২১
পলভা ২৪,৩৮,৯৩
পলভাসারিণী ৩৭
পাতধ্রুবাঙ্ক ১০
পূর্ণাতিথি ৯
প্রাচীন লগ্ন। কলিকাতার। ৯৩
ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ৪
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ৮৩
ভাবচক্র ১০৯,১২৬
ভাবসন্ধি ... ১০৯
ভাবস্ফুট .. ১০৮,১০৯,১১০,১১৩,১২৩
ভূগোলাঙ্ক ৪
ভৌম দূরত্ব সারিণী ১১৭
মকর সংক্রান্তি ৪
মন্দ কেন্দ্র ৭৯
মন্দ ফল ৭৯
মন্দাকিনী সংক্রান্তি ৭

মন্দা সংক্রান্তি ৭
মন্দোচ্চ ৯০
মন্দোচ্চ ভগণ ৯০
মন্বন্তর ৮১
মন্বন্তর সন্ধি ৮২
মহাবিষুব সংক্রান্তি ৬
মহোদরী সংক্রান্তি ৭
মাস পরিমাণ ৪০
মাস প্রবৃত্তি ৩
মাস বৃদ্ধি ৩
মাসিকক্ষেপ ১৬
মাসিকধ্রুবাঙ্ক ৫৫
মিশ্রগণ নক্ষত্র ৭
মিশ্রা সংক্রান্তি ৭
মেষ সংক্রান্তি ৪
মৃদুগণ নক্ষত্র ৭
যুগ ৮৩
যোটকবিচার ৬৬
রবি কেন্দ্র ৭৬,৭৮
রবিচন্দ্রস্ফুট স্থূল ৫৪
রবি নীচাংশ ৭৯
রবি মধ্য ৭৮
রবির নক্ষত্র-সঞ্চার চক্র ৫৩
রবির মন্দকেন্দ্র ৭৯
রবির মন্দফল ৭৯
রবি সারিণী .. .. ৬৯-৭১।৭২
রবি স্ফুট ৭৪-৭৫,৮০
রবি-স্ফুটধ্রুবাঙ্ক ৬৯-৭১
রাক্ষসী সংক্রান্তি ৭
রাশি বিভাগ ৮৪
রৈবত অয়ন ৬৩
লগ্ন খণ্ডা ৯৪,৯৯,১০২

লগ্ন নির্ণয়াধ্যায় ৯২

লগ্ন স্ফুট ... ৯৪,৯৫,৯৬,১০০-১,১০২-৩,১১০,১১৩,১১৮,১২২-১২৪,১২৭-৮

লগ্নাদির বক্রোত্থান ১১৩

লঘুগণ নক্ষত্র ৭

লঙ্কোদয় পল ৯৪,১০৬

লঙ্কোদয় প্রাণ ৯৪

লঙ্কোদয় সারিণী ১০৬

বর্ষধ্রুবাঙ্কযোগে মাসধ্রুবাঙ্কনির্ণয় চক্র ৫১

বর্ষ প্রবৃত্তি ১৫

বিশ্বোৎপত্তি ৮৩

বিষুবৎ রেখা ৫

বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি ৬

শিক্ষারম্ভ ১

শীঘ্রোচ্চ ৮৯

শ্রীগুরুচরণে ১

[illegible]স্ফুট ১১৯

ষড়শীতি মুখ ৬

ষড়শীতি সংক্রান্তি . . ৬

সংক্রান্তি নির্ণয় ১

[illegible] . . ৮৫

[illegible] . . ১[illegible]০-১

সূর্য্য . . ৬৯

স্পর্শকাল ১০

স্ফুট ও মধ্যকাল ১৮

সংসাধ্যমন্যৎ তৎসিদ্ধ্যৈ যতঃ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৮১ ॥

সোঽহং ন তেঽরির্ন মমাসি শত্রুঃ
সুবাহুরেষো ন মমাপকারী।
দৃষ্টং ময়া সর্ব্বমিদং যথাত্মা
অন্বিষ্যতাং ভূপ রিপুস্ত্বয়ান্যঃ ॥ ৮২ ॥

ইত্থং স তেনাভিহিতো নরেন্দ্রো
হৃষ্টঃ সমুত্থায় ততঃ সুবাহুঃ।
দিষ্ট্যেতি তং ভ্রাতরমাভিনন্দ্য
কাশীশ্বরং বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ালর্ক সম্বাদেঽলর্কনির্ব্বেদো নাম
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

এ সিদ্ধির পরে সাধ্য অন্য কিছু নাই
ইন্দ্রিয় সংযত হলে এই সিদ্ধি পাই ।৮১।
আমি তব—তুমি মম অরি নও
সুবাহু আমার অপকারী নয়,
সমুদয় মম আত্মা এই স্থির
এ বিষয়ে কিছু নাহিক সংশয়।
তাই বলি রাজা যাও দেখা আর
অপর শত্রুর কর অন্বেষণ,
আমার যা কিছু তোমার নিশ্চয়
এ সবে আমার নাহি প্রয়োজন।৮২
তাহার এমন শুনিয়া বচন
সুবাহু আনন্দে পুলকিত কায়,
"পরম সৌভাগ্য" বলিয়া উঠিল
আনন্দেতে বক্ষে ধরিয়া ভ্রাতায়।
পরে কাশীশ্বরে করি সম্বোধন
বলেন এ হেন মধুর বচন।৮৩।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে দত্তাত্রেয়-অলর্ক-সম্বাদে অলর্কনির্ব্বেদ
নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সুবাহুরুবাচ ।

যদর্থং নৃপশার্দ্দূল ত্বামহং শরণং গতঃ ।
তন্ময়া সকলং প্রাপ্তং যাস্যামি ত্বং সুখী ভব ॥ ১ ॥

কাশিরাজ উবাচ ।

কিং নিমিত্তং ভবান্ প্রাপ্তো নিষ্পন্নোঽর্থশ্চ কস্তব ।
সুবাহো তন্মমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২ ॥
সমাক্রান্তমলর্কেণ পিতৃপৈতামহং মহৎ ।
রাজ্যং দেহীতি নির্জ্জিত্য ত্বয়াহমভিচোদিতঃ ॥ ৩ ॥
ততো ময়া সমাক্রম্য রাজ্যমস্যানুজস্য তে ।
এতৎ তে বশমানীতং তদ্ভুঙ্ক্ষ স্বকুলোচিতম্ ॥ ৪ ॥

সুবাহুরুবাচ ।

কাশিরাজ নিবোধ ত্বং যদর্থময়মুদ্যমঃ ।
কৃতো ময়া ভবাংশ্চৈব কারিতোঽত্যন্তমুদ্যমম্ ॥ ৫ ॥

বলিলা সুবাহু তবে—"শুনহ রাজন
অভিলাষ এবে মোর হয়েছে পূরণ ।
যে আশায় লয়েছিনু শরণ তোমার,
এত দিনে সেই আশা পূরেছে আমার ।
আদেশ করহ এবে যাই নিজ স্থান
সুখে রাজ্য-সুখ-ভোগ কর মতিমান ।" ১ ।
কাশিরাজ বলে "আমি না বুঝি কারণ
কেন হে সুবাহু, তবে লইলে শরণ,
কি অভীষ্ট সিদ্ধ তব হ'লো আমা হ'তে ?
বুঝিতে সে কথা আমি নারি কোনমতে ।
বড় কৌতূহল মম শুনিতে সে কথা ।
সুখী কর মোরে সব বলিয়া সর্ব্বথা । ২ ।
বলেছিলে মোরে এই অলর্ক-ভূপতি
পৈত্রিক রাজত্ব নিয়ে করেছে দুর্গতি
সেই রাজ্য জিনি' দিতে করেছে তোমার
প্রার্থনা আছিল জানি নিকটে আমার । ৩ ।
তাই আমি তব রাজ্য করিতে উদ্ধার
সসৈন্যে জিনিতে আসি' অনুজে তোমার ।
এবে রাজ্য জয় হ'লো করহ গ্রহণ
পৈত্রিক এ রাজ্য সুখে করহ শাসন ।" ৪ ।
বলিলা সুবাহু তবে "শুন, কাশীশ্বর,
যে কারণে এ প্রার্থনা তোমার গোচর ।
তুমি সৈন্য লয়ে আসি করিলে যতন
তাহাতে পুরিল মোর আশা যে কারণ । ৫

ভ্রাতা মমায়ং গ্রাম্যেষু শক্তো ভোগেষু তত্ত্ববিৎ।
বিমূঢ়ৌ বোধবন্তৌ চ ভ্রাতরাবগ্রজৌ মম ॥ ৬ ॥
তয়োর্মম চ জন্মাত্রা বাল্যে স্তন্যং যথা মুখে।
তথাববোধো বিন্যস্তঃ কর্ণয়োরবনীপতে ॥ ৭ ॥
তয়োর্মম চ বিজ্ঞেয়াঃ পদার্থা যে মতা নৃভিঃ।
প্রকাশ্যং মনসো নীতাস্তে মাত্রা নাস্য পার্থিব ॥ ৮ ॥
যথৈকসার্থযাতানামেকস্মিন্নবসীদতি।
দুঃখং ভবতি সাধূনাং তথাস্মাকং মহীপতে ॥ ৯ ॥
গার্হস্থ্যমোহমাপন্নে সীদত্যস্মিন্ নরেশ্বর।
সম্বন্ধিন্যস্য দেহস্য বিভ্রতি ভ্রাতৃকল্পনাম্ ॥ ১০ ॥
ততো ময়া বিনিশ্চিত্য দুঃখাদ্বৈরাগ্যভাবনা।
ভবিষ্যতীত্যস্য ভবানিত্যুদ্যোগায় সংশ্রিতঃ ॥ ১১ ॥
তদস্য দুঃখাদ্বৈরাগ্যং সম্বোধাদবনীপতে।
সমুদ্ভূতং কৃতং কার্য্যং ভদ্রং তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥ ১২

তত্ত্বজ্ঞানী অলর্ক যে অনুজ আমার।
গ্রাম্য সুখে মত্ত ছিল ভুলি বস্তু সার।
বিমূঢ় যদিও মোর অগ্রজ দু'জন
তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী তারা শুনহ রাজন। ৬।
আমাদের জননী যতনে স্তন্য সনে,
তত্ত্বজ্ঞান কৈলা দান সবার শ্রবণে। ৭।
মানবের যেই তত্ত্বে প্রয়োজন নিত্য
জননী দিলেন সবে সেই সার সত্য।
অলর্কের নাহি হয়েছিল জ্ঞানোদয়,
এ হেতু জীবন তা'র দিয়ে কষ্টময়। ৮।
এক-পথ-গামী যারা তাদের মাঝারে
একে যদি দুঃখে পড়ে, তা হ'লে তাহারে
উদ্ধারের তরে সবে হয়ত কাতর।
তাহার দুঃখেতে সাধু দুঃখী নিরন্তর।
সেই মত একটি ভ্রাতার দুঃখ দেখি,
সকলে আছিনু মোরা নিরন্তর দুঃখী। ৯।
অলর্কের সনে মোরা সম্বন্ধ বন্ধনে,
বদ্ধ আছি এই দেহে ভ্রাতৃত্ব কল্পনে।
গার্হস্থ্য মোহেতে বদ্ধ হ'য়ে সে এখন
অবসন্ন হ'য়ে দুঃখ সহে অনুক্ষণ। ১০।
তাই মনে মনে আমি করিনু কল্পনা।
বৈরাগ্য আসিবে হ'লে দুঃখের যাতনা।
এত ভাবি' লয়ে আমি তোমার শরণ,
যুদ্ধ ঘটাইয়া কৈনু দুঃখের ঘটন। ১১।
সেই দুঃখে হলো তা'র বৈরাগ্য উদয়,
তত্ত্বজ্ঞান লভি সুখী হইল নিশ্চয়।
এবে মোর কার্য্য সিদ্ধ প্রসাদে তোমার।
সুখে রাজ্য কর এবে বিদায় আমার। ১২।

উষ্ট্বা মদালসাগর্ভে পীত্বা তস্যাস্তথা স্তনম্।
নান্যনারীসুতৈর্যাতং বর্ত্ম যাত্বিতি পার্থিব ॥ ১৩ ॥
বিচার্য্য তন্ময়া সর্ব্বং যুষ্মৎসংশ্রয়পূর্ব্বকম্।
কৃতং তচ্চাপি নিষ্পন্নং প্রয়াস্যে সিদ্ধয়ে পুনঃ* ॥ ১৪ ॥
উপেক্ষ্যতে সীদমানঃ স্বজনো বান্ধবঃ সুহৃৎ।
যৈর্নরেন্দ্র ন তান্ মন্যে সেন্দ্রিয়া বিকলা হি তে ॥ ১৫ ॥
সুহৃদি স্বজনে বন্ধৌ সমর্থে যোঽবসীদতি।
ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেভ্যো বাচ্যাস্তে তত্র ন ত্বসৌ ॥ ১৬ ॥
এতৎ ত্বৎসঙ্গমাদ্ভূপ ময়া কার্য্যং মহৎ কৃতম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি জ্ঞানভাগ্ ভব সত্তম ॥ ১৭ ॥

কাশিরাজ উবাচ।

উপকারস্ত্বয়া সাধোরলর্কস্য কৃতো মহান্।
মমোপকারায় কথং ন করোষি স্বমানসম্ ॥ ১৮ ॥
ফলদায়ী সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গমো নাফলো যতঃ।
তস্মাৎ ত্বৎসংশ্রয়াদ্‌যুক্তা ময়া প্রাপ্তা সমুন্নতিঃ ॥ ১৯ ॥

'মদালসা গর্ভে জন্মি', পিয়া তাঁর স্তন
যোগ্য যেই পথে এবে করিতে গমন
অন্যনারী গর্ভে জন্ম লভে যেই নর
তার পক্ষে এই পথ লাভ সুদুষ্কর ॥ ১৩।
ভাবি মনে এইরূপ নিকটে তোমার
আশ্রয় মাগিনু সিদ্ধ বাসনা আমার।
এবে কর অনুমতি যাই নিজ স্থান
করি সিদ্ধি লাভ সুখী হও মতিমান। ১৪।
স্বজন, সুহৃৎ আর বান্ধব নিকর,
অবসন্ন হয় যদি দুঃখে নিরন্তর,
দেখেও যে জন করে উপেক্ষা তাহায়
বিকল ইন্দ্রিয় বলি জানি সদা তায়। ১৫।
সুহৃদ স্বজন আর বান্ধব মাঝারে
সক্ষম থাকিতে যদি কেহ দুঃখভারে
অবসন্ন হ'য়ে কষ্টে কাটায় জীবন
ধর্ম্ম-অর্থ কাম মোক্ষ তরে অনুক্ষণ;
তবে সে সক্ষম জন জেনো সুনিশ্চয়
চতুর্বর্গ হ'তে সত্য সদাচ্যুত হয়। ১৬।
হে রাজন, আমি তব সঙ্গ লাভ করি'
পেয়েছি অভীষ্ট নিজ, তব বল ধরি',
জ্ঞানভাগী হও রাজা চির সুখে রও
প্রস্থানের কালে মোর এ আশীষ লও।" ১৭।
কাশিরাজ বলে' ওহে সাধু সদাশয়,
অলর্কের উপকার করিলে নিশ্চয়।
কিন্তু মম উপকার করিবার তরে
কি হেতু বাসনা নাই তোমার অন্তরে? ১৮।
সাধুসঙ্গ কোনো দিন বিকল না হয়,
তব সঙ্গে শুভ লাভ যোগ্য সুনিশ্চয়।" ১৯।

* অতঃ পরঃ—ত্রিতো·ময়া ভবাদ্ভৈব কারিতঃ কার্য্যমুত্তমমিত্যাধিকং পাঠঃ কচিৎ।

সুবাহুরুবাচ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
তত্র ধর্ম্মার্থকামাস্তে সকলা হীয়তেঽপরঃ ॥ ২০ ॥
তৎ তে সঙ্ক্ষেপতো বক্ষ্যে তদিহৈকমনাঃ শৃণু।
শ্রুত্বা চ সম্যগালোচ্য যতেথাঃ শ্রেয়সে নৃপ ॥ ২১ ॥
মমেতি প্রত্যয়ো ভূপ ন কার্য্যোঽহমিতি ত্বয়া।
সম্যগালোচ্য ধর্ম্মো হি ধর্ম্মাভাবে নিরাশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥
কোঽহমিতি সংজ্ঞেয়মিত্যালোচ্য ত্বয়াত্মনা।
বাহ্যান্তর্গতমালোচ্যমালোচ্যাপররাত্রিষু ॥ ২৩ ॥
অব্যক্তাদিবিশেষান্তমবিকারমচেতনম্।
ব্যক্তাব্যক্তং ত্বয়া জ্ঞেয়ং জ্ঞাতা কশ্চাহমিত্যুত ॥ ২৪
এতস্মিন্নেব বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতমখিলং ত্বয়া।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানমস্বে স্বমিতি মূঢ়তা ॥ ২৫ ॥
সোঽহং সর্ব্বগতো ভূপ লোকসংব্যবহারতঃ।
ময়েদমুচ্যতে সর্ব্বং ত্বয়া পৃষ্টো ব্রজাম্যহম্ ॥ ২৬

বলিলা সুবাহু" রাজা, শুন দিয়া মন,
পুরুষার্থ চতুর্বিধ শাস্ত্রের বচন,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সেই চারি,
বিশেষিয়া মনে, রাজা, দেখহ বিচারি।
তার মাঝে তিন সিদ্ধ হয়েছে তোমার
লব্ধ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সন্ধ নাহি তার। ২০।
মোক্ষতত্ত্ব বলি এবে সংক্ষেপে তোমায়
মন দিয়া শুন রাজা যদি ইচ্ছা তায়।
শুনি তাহা, যথাযথ করিলে সাধন
সিদ্ধকাম হ'বে এই শুনহ রাজন। ২১।
"এই আমি" "এ আমার" মমতা এরূপ
অহঙ্কার বশে কভু না করহ ভূপ।
সম্যক প্রকারে কর ধর্ম্মের সাধন,
ধর্ম্মের আশ্রয়ে হও নিরাশ্রয় মন। ২২।
"কে আমি" এ তত্ত্ব চিত্তে কর আলোচন
রাত্রি শেষে বাহ্যান্তর চিন্ত অনুক্ষণ। ২৩।
অব্যক্ত হইতে এই প্রকৃতি স্বরূপ
অবিকারী তত্ত্ব চয় চিত্ত সদা ভূপ।
অচেতন, ব্যক্তাব্যক্ত হয়ে অবগত
'জ্ঞেয়, 'জ্ঞাতা' 'কে আমি' এসব হও জ্ঞাত। ২৪।
এই সব তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে তোমার,
সকলি হইবে জ্ঞাত কহিলাম সার।
অনাত্মেতে আত্মজ্ঞান, মূঢ়তা নিশ্চয়
'স্বীয়' ভাবিও না তাহা যাহা স্বীয় নয়। ২৫।
সেই আমি সর্ব্বগত লোক ব্যবহারে,
যা তব জিজ্ঞাস্য এই বলিনু তোমারে
ইচ্ছা হয় এইরূপ করহ সাধন,
সুখী হও এবে আমি করিব গমন। ২৬।

এবমুক্ত্বা যযৌ ধীমান্ সুবাহুঃ কাশিভূমিপম্।
কাশিরাজোঽপি সম্পূজ্য সোঽলর্কং স্বপুরং যযৌ ॥ ২৭ ॥
অলর্কোঽপি সুতং জ্যেষ্ঠমভিষিচ্য নরাধিপম্।
বনং জগাম সন্ত্যক্ত-সর্ব্বসঙ্গঃ স্বসিদ্ধয়ে ॥ ২৮ ॥
ততঃ কালেন মহতা নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রাপ্য যোগর্দ্ধিমতুলাং পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥ ২৯ ॥
পশ্যন্ জগদিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
পাশৈগুর্ণময়ৈর্বদ্ধং বধ্যমানঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৩০ ॥
পুত্রাদিভ্রাতৃপুত্রাদি স্বপারক্যাদিভাবিতৈঃ।
আকৃষ্যমাণং করণৈর্দুঃখার্ত্তং ভিন্নদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥
অজ্ঞানপঙ্কগর্ভস্থমনুদ্ধারং মহামতিঃ।
আত্মানঞ্চ সমুত্তীর্ণং গাথামেতামগায়ত ॥ ৩২ ॥
অহো কষ্টং যদস্মাভিঃ পূর্ব্বং রাজ্যমনুষ্ঠিতম্।
ইতি পশ্চান্ময়া জ্ঞাতং যোগান্নাস্তি পরং সুখম্ ॥ ৩৩ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

তাতৈনং ত্বং সমাতিষ্ঠ মুক্তয়ে যোগমুত্তমম্।
প্রাপ্স্যসে যেন তদ্ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচসি ॥ ৩৪ ॥

এত বলি কাশিরাজে সুবাহু ধীমান,
গেলেন চলিয়া তবে আপনার স্থান।
কাশিরাজ অলর্কেরে সম্ভাষ করিয়া
গেলেন আপন দেশে প্রফুল্ল হইয়া। ২৭।
জ্যেষ্ঠ সুতে রাজ্য দিয়া অলর্ক রাজন
সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজি তবে পশিলা কানন। ২৮।
দীর্ঘ কাল সাধনায় গেল দ্বন্দ্ব জ্ঞান।
যোগ সিদ্ধ হয়ে রাজা লভিলা নির্ব্বাণ। ২৯।
সুরাসুর নর পূর্ণ নিখিল জগত
গুণময় পাশে বদ্ধ রয়েছে নিয়ত। ৩০।
ভ্রাতৃ পুত্র আদি স্বীয় পরকীয় গণ,
দৃঢ় করিতেছে সদা সেই ত বন্ধন।
সে পাশে আকৃষ্যমান জগত সংসার
দুঃখ ভুঞ্জি' নিরন্তর করে হাহাকার। ৩১।
দুস্তর অজ্ঞান-পঙ্কে মগ্ন সে সবায়
হেরি আপনারে মুক্ত জানি' নররায়
যেই গাথা ফুল্ল মনে করিলেন গান
সে গাথা বলিব এবে তব বিদ্যমান। ৩২।

অহো কষ্ট কত ভাগ্যেতে আমার
হয়েছিল সংঘটন।
রাজ্য সুখ ভোগে ছিলাম মোহিত
হইয়ে অন্ধ যেমন।
জানিলাম শেষে, যোগ পথ বই
সুখ লাভ আশা নাই
এবে মহাসুখী হইয়াছি আমি
আরত্ত ভাবনা নাই। ৩৩।

ততোঽহমপি যাস্যামি কিং যজ্ঞৈঃ কিং জপেন মে।
কৃতকৃত্যস্য করণং ব্রহ্মভাবায় কল্পতে ॥ ৩৫ ॥
ত্বত্তোঽনুজ্ঞামবাপ্যাহং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রযতিষ্যে তথা মুক্তৌ যথা যাস্যামি নির্বৃতিম্ ॥ ৩৬ ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

এবমুক্ত্বা স পিতরং প্রাপ্যানুজ্ঞাং ততশ্চ সঃ।
ব্রহ্মন্ জগাম মেধাবী পরিত্যক্তপরিগ্রহঃ ॥ ৩৭ ॥
সোঽপি তস্য পিতা তদ্বৎ ক্রমেণ সুমহামতিঃ।
বানপ্রস্থং সমাস্থায় চতুর্থাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৩৮ ॥
তত্রাত্মজং সমাসাদ্য হিত্বা বন্ধং গুণাদিকম্।
প্রাপ সিদ্ধিং পরাং প্রাজ্ঞস্তৎকালোপাত্তসন্মতিঃ ॥ ৩৯
এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ যৎ পৃষ্টা ভবতা বয়ম্।
সুবিস্তরং যথাবচ্চ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪০ ॥
যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াদ্বিপ্র পঠেদ্বা সুসমাহিতঃ।
যদশ্বমেধাবভৃতস্নাতঃ প্রাপ্নোতি বৈ ফলম্।
সকলং তদবাপ্নোতি শ্রুত্বৈতন্মুনিসত্তমঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিজ পুত্র বলে "পিতা করহ শ্রবণ,
মুক্তি আশে, যোগভ্যাসে দেহ প্রাণ মন।
তাহে ব্রহ্মপদ লাভ হইবে তোমার
পাইলে সে পদ দুঃখ নাহি রবে আর। ৩৪।
আমিও যাইব, আজ্ঞা লইয়া তোমার
তপ জপ যজ্ঞে কিবা প্রয়োজন আর ?
করেছি যে সব তাহে কিবা কাজ আর ?
মুক্তিলাভ আশে যত্ন করিব এবার। ৩৫।
এবে আজ্ঞা দেহ মোরে ত্যাজি সমুদায়
যাই তথা যা'র আশে মন সদা ধায়।" ৩৬।
পক্ষিগণ বলে "দ্বিজ করহ শ্রবণ
পিতারে এ সব তত্ত্ব কহিয়া বর্ণন
পরিগ্রহ ত্যজি' জড় ব্রহ্ম-পথে যায়,
আনন্দেতে মগ্ন হয়ে জীবন কাটায়। ৩৫।
পিতা তার বানপ্রস্থ করিয়া আশ্রয়
ক্রমে ক্রমে চতুর্থ আশ্রমে গত হয়। ৩৮।
তথা পুত্র সনে পুন হইয়া মিলিত
গুণমুক্ত হয়ে সিদ্ধি লভিল নিশ্চিত। ৩৯।
জিজ্ঞাসিলে যাহা সবি বলিনু এখন
বল এবে আর কিবা করিব বর্ণন। ৪০।
যেই জন এই সব করয়ে শ্রবণ।
কিম্বা সমাহিত চিত্তে করয়ে কীর্ত্তন,
অশ্বমেধ-অবভৃথ-স্নানের যে ফল
সেই ফল লভে হয় বাসনা সফল। ৪১।

এতৎ সংসারভ্রমণ-পরিত্রাণ মনুত্তমম্।
অলর্কাত্রেয় সংবাদমশুভান্মুচ্যতে নর ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-সংবাদে দত্তাত্রেয়ালর্কসংবাদ-শ্চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সংসারের যাতায়াত নাসিবার তরে
এর মত নাহি কিছু অবনী ভিতরে।
দত্তাত্রেয় সনে অলর্কের যত কথা
অনায়াসে নাশিবারে পারে ভবব্যথা।
সকল অশুভ নাশ হয় ত নিশ্চয়
নিশ্চয় এ কথা মুনি না কর সংশয় ॥ ৪২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে পিতা-পুত্র সংবাদে দত্তাত্রেয় অলর্ক সংবাদ নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বখণ্ড সম্পূর্ণ।

সংসারের
এর মত :
দত্তাত্রেয়

আধুনিক মানব পরিবার (হোমিনিডি)
প্রস্তর যুগের মনুষ্য
নিক শিম্পাঞ্জী
আধুনিক গরিলা
বানরা মনুষ্য
(পিথে ানথ্রপাস য়্যালুলা)
আধুনিক ওরাং
প্রাচীন নরাকৃতি কপি
আধুনিক গিবন্
প্রাচীন সিমিনি
আধুনিক সের্কোপিথিসিডি
প্রাচীন সিমিডি
প্রাচীন
লাঙ্গুল কপি
প্রাচীন
প্রাইমেট্স্
প্রাচীন
অণ্ডজ স্তন্যপায়ী
প্রাচীন
সরীসৃপ
প্রাচীন
উভচর
আধুনিক সন্ধিপদ
আধুনিক কীট
প্রাচীন
কীট
আধুনিক প্রতোজী
(দলবদ্ধ কোষ)
আধুনিক সিলেন্টারেটা
প্রাচীন
বহুকোষাত্মক প্রাণী
প্রাচীন প্রতোজী
দলবদ্ধ কোষ
আধুনিক প্রতোজী (এককাবস্থা)
প্রাচীনপ্রতোজী
এককাবস্থা)

বিবর্ত্তন তরু

কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভূগর্ভস্থ কঙ্কালরাজির সূচক ও এই সকল প্রশাখা নির্গত শেষ পল্লবরাজি বর্ত্তমান্ ভূপৃষ্ঠ-চারীগণের পরিচায়ক।

INDIA PRESS, Calcutta.

"মনে পড়ে সে বালকে? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্ত প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরু ছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতিবিন্দু অনুভব।
* * * * *
* * * * * কত ফিরিলাম,—
কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্বছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ জড়জীবে রন্ধ্র এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?
দৃঢ়বাহু—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু দুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্তমুখে ফলাখণ্ড ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা ন'লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে?
—জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।"

৺সতীশচন্দ্র রায়

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ
ভাদ্র, ১৩২১
একাদশ সংখ্যা

আলোচনা

১। ইউরোপে যুদ্ধ

যুদ্ধই সৃষ্টির নিয়ম—শুধু যাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া আপনাদিগকে অভিহিত করেন সেই সভ্য মানবজাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেও তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। নতুবা মানবসমাজে মাঝে মাঝে এমন বিষম বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিয়া উঠে কেন? কেন ধরণী এমন নরশোণিত লালসায় অধীর হইয়া উঠেন? এই যে ইউরোপে আজ প্রচণ্ড সমরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ইহারই বা কারণ কি? শুনিয়া থাকি ইউরোপীয়েরা নাকি সুসভ্য; তাঁহারা মানব-জাতিকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের

ইতিহাস হইতে যে শিক্ষা পাইতেছি তাহা আমাদের নিকট সুপরিচিত। কোন্ অনাদি কাল হইতে এই শিক্ষার বীজ পৃথিবীতে উপ্ত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা নূতন নহে। বিশ্বে এই হিংসা ও সংগ্রাম ব্যাপার অহোরহ চলিতেছে। ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য, বর্ব্বরতা প্রভৃতি যে সমস্ত খাপছাড়া কাল্পনিক শব্দাবলীর তাড়নায় আমরা নিরন্তর জর্জ্জরিত, সে কেবল আমাদেরই জন্য! অবশ্য এটাও প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের অধীন।

এখন আমরা কাজের কথা বলি। যুদ্ধ বাধিল সার্ভিয়ায় ও অষ্ট্রীয়ায়। রুশ, জর্ম্মান, ফরাসী, সুইস, ইটালিয়ান্ ও ইংরাজের তাহাতে এত বিচলিত হইবার কারণ কি? কেন ইংরাজ, ফরাসী ও রুশ সার্ভিয়ার সহায়তায় কৃতসংকল্প? জর্ম্মানি বা একা অষ্ট্রীয়ার পক্ষ লইলেন কোন্ সাহসে? এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। এবং তাহা জানিতে হইলে এই কয়েকটী রাজ্যের বিগত শতাব্দীর ইতিহাস ও বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে একটু পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

* *
*

২। বিগত শতাব্দীর ইউরোপ

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। বর্ত্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিভাগ-সকলের অধিকাংশই এক সময়ে না এক সময়ে রোম সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ফলে ক্রমান্বয়ে এক একটী রাজ্য পৃথক্ হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে থাকে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট 'রোমান্ সম্রাট' উপাধি ত্যাগ করেন এবং ঐ দিন হইতে রোম সাম্রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে মহাবীর নেপোলিয়ানের মহা সমর এক প্রকার শেষ হইলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ও ১৮১৪ সালের নভেম্বর মাসে যে দিন ভিয়েনায় কংগ্রেসে মিলিত হইয়া ইউরোপের পুনর্গঠন করেন, যদিও পরবর্ত্তী যুগে তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তথাপি বলিতে হয় সেইদিন হইতে ইউরোপের বর্ত্তমান রাজ্যগুলি স্থায়ী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য উহাদের সমস্ত রাজ্যই তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে নাই; Independent Principality বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল মাত্র। এবং ঐ রাজ্যসমূহের মধ্যে তখন অন্যান্য গোলযোগও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, অষ্ট্রীয়া-প্রুশিয়ার যুদ্ধ, ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধ, পোলাণ্ড, ইটালি বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে বিদ্রোহ, হাঙ্গেরী ও ইটালিয় প্রদেশগুলির স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা-প্রভৃতির কারণ ঐ গোলযোগের সহিত জড়িত। এমন কি, আজ ইউরোপে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহারও অনেক কারণ ঐ স্থানেই নিবদ্ধ আছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান ওয়াটার্লুর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হইয়া সেণ্ট হেলেনায় প্রেরিত হইবার পর প্যারি নগরীতে দ্বিতীয়বার যে সন্ধি হয়, তাহাতে ফ্রান্স বর্ত্তমান রাজ্য ও অন্য দুই একটী ছোট ষ্টেট প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইংলণ্ড—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কয়েকটী দ্বীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ, মরিটাস, সিলন ও মালটা দ্বীপ লাভ করে; অষ্ট্রীয়া তাহার ইতালীয় রাজ্যগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। প্রুশিয়াকে (বর্ত্তমানে জর্ম্মানি) রাইন প্রদেশ, ড্যানজিন, ওয়ার্স রাজ্যের কতকাংশ

গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ওয়ারস রাজ্যের অবশিষ্টাংশ রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। ইটালির পিড্‌মণ্ট, সেভয় ও জেনোয়া একত্রে যুক্ত এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যসকল পুনরায় স্বাধীন হইল, তাৎকালিক অষ্ট্রীয়য়িক নেদারল্যাণ্ড (বেলজিয়ম) হলাণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি করিল। সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক এতদিন এক রাজ্যভুক্ত ছিল; এই সময়ে ডেনমার্ককে পৃথক্‌ করা হয়। স্পেন সার্ডিনিয়ার পুরাতন বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অষ্ট্রীয়ার সম্রাট জর্ম্মানির সম্মিলত প্রদেশগুলির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। পশ্চিমাংশের যখন এই অবস্থা তখন পূর্ব্বাংশের গ্রীস, এলবানিয়া, থ্রেস, ম্যাসিডোনিয়া, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, মন্তিনিগ্রো, বুলগেরিয়া, রুমেলিয়া, বোসনিয়া, হার্জেগভিনা প্রভৃতি খৃষ্টান অধ্যুষিত রাজ্যগুলি অটোমান্‌ তুর্কীর পদানত। ইহাদের সকলেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য কিঞ্চিদধিক চেষ্টা করিতেছিল। বিশেষতঃ রুসো, ভল্টেয়ার, মণ্টেস্কু—অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকগণ যে চিন্তাধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা যে এই পর পদানত, অত্যাচার প্রপীড়িত ও বিগত গৌরব গ্রীস ও ইতালীর অধিবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই এমন নহে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের অবস্থা এই। যদিও ফরাসী বিগ্রহের ফলে সমস্ত ইউরোপে একটা নূতন জাগরণের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, যখন সকলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বরাজপ্রাপ্তিই জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু কল্পনা করিতেছিল, তথাপি ভিয়েনা কংগ্রেস রাষ্ট্রচিত্রে যে একটা নূতন দৃশ্যের অবতারণা করিল তাহা কোন প্রকারেই ঐ জাগরণের অনুকূল নহে।

সত্যবটে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন কিন্তু ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অন্তর্হিত হইল। কারণ, সে সময়ে নেপোলিয়নই প্রকৃতিপুঞ্জের একমাত্র ধুরন্ধর। তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজন্যবর্গ নিজ নিজ ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজা প্রজায় আবার বিবাদ আরব্ধ হইল। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ পর্য্যন্ত এই দেশ-ব্যাপী প্রজা-বিদ্রোহের যুগ। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম গ্রীস তুরস্কের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। পরবৎসর বেলজিয়াম হলাণ্ডের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ১৮৪৮ অব্দে ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়েনের নেতৃত্বে পুনরায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি সেখানকার সম্রাট নির্ব্বাচিত হন। প্রজাবৃন্দ চায় শান্তি কিন্তু লুই নেপোলিয়ন দেখিলেন বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য। ১৮৫৩ সালে রুশ-তুরস্কে ক্রিমিয়াতে যুদ্ধ হয়; কারণ, রুশের কনষ্টান্টিনোপল্‌ অধিকারের ইচ্ছা। এই যুদ্ধে সার্ডিনিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের সহায়তা করে। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে প্যারিস সন্ধিতে যুদ্ধাভিনয় শেষ হয়। ঐ বৎসর রুশ তুরস্ককে কয়েকটী ক্ষুদ্র প্রদেশ অর্পণ করেন ও নিজের দাবী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সম্মিলিত শক্তিত্রয় তুরস্ককে রুশের বাধাদানকারী প্রাচীররূপে আরো কিছুদিন ভোগ করিবার অবসর পাইলেন।

এই যুদ্ধের পরই ফ্রান্সকে অষ্ট্রিয়ার সহিত

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ইতালী অষ্ট্রিয়ার ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া অবিরত চেষ্টা দ্বারা অবশেষে ফ্রান্সের সাহায্যে ১৮৫৯ অব্দে ভিক্টর ইমানুয়েলকে স্বাধীন রাজপদে বরণ করিতে সমর্থ হয়। ১৮৬৬ অব্দে প্রুশিয়া অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্ব (President-ship) অস্বীকার করিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট যোগ দিতে পারেন নাই; কিন্তু ইতালী স্বতন্ত্র-ভাবে অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে। প্রেন সন্ধিতে ভিনিস যাহা এতদিন অষ্ট্রিয়াসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল পুনরায় ইতালীর সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ডেনমার্কের নিকট হইতে অপহৃত সেলস্থইন ও হলষ্টিন নামক স্থানদ্বয় যাহা এই বিবাদের আদি কারণ প্রুসিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হইল এবং প্রুশিয়া স্বীয় প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন করিল। এই সুযোগে হাঙ্গেরীও আষ্ট্রিয়াকে রাজ্যের শাসনে তাহার নায্য অধিকার দিতে প্রবৃত্ত করে।

এই মীমাংসাতে ফরাসী সম্রাটের ক্ষতি হয়; সুতরাং অনতিবিলম্বে জর্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। কিন্তু ফলে ফ্রান্সেরই পরাজয়। ১৮৭১ সালে প্যারি সন্ধিতে নেপোলিয়ন ভিয়েনা মীমাংসায় প্রাপ্ত রাজ্যদ্বয় প্রুশিয়াকে ত্যাগ করিলেন। প্রুশিয়া-রাজকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার উপর জর্ম্মান সাম্রাজ্যের সাধারণ শাসনের ভার দেওয়া হইল। প্রত্যেক রাজ্য অন্যান্য শাসনভার নিজেরাই গ্রহণ করিল। ফ্রান্সে তৃতীয়বার সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। এবং মাঝে মাঝে শাসনব্যাপারে বহু ভয়াবহ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া শেষ শাসন-প্রথাই এখন ফ্রান্সে বর্ত্তমান আছে।

ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের ৫ বৎসর পরে রুশো-তুরস্ক সমস্যা পুনরায় ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এবার তাঁহারা অস্ত্রধারণ করেন নাই। বার্লিনে সকলে মিলিয়া ১৮৭৮ সালে যে সন্ধি করিয়াছিলেন উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাই বর্ত্তমান ছিল। এই সন্ধিবলে রুশ পূর্ব্বযুদ্ধে হৃতরাজ্য ও আর্ম্মিনিয়া দখল করিলেন। মন্তিনিগ্রো, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, তুরস্কের অধীনে স্বাধীন প্রিন্সিপালিটি হইয়া দাঁড়ায়, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়া স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্ত হয়। আর বোসনিয়া, হারজেগভিনা অষ্ট্রিয়ার অধিকার ভুক্ত হইল। ১৮৮১—৮২র মধ্যে সার্ভিয়া, রুমানিয়া, পূর্ব্ব সর্ত্তানুসারে স্বাধীনতা লাভ করে। ইংলণ্ড সাইপ্রাস্ দ্বীপ ও লোহিত সাগরকে যদৃচ্ছা ব্যবহারের অধিকার পাইলেন। এই যুগ হইতে স্পেন ও পর্টুগাল রাজ্যের প্রভাব গৃহবিবাদে একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।

৩। বর্ত্তমান রাষ্ট্রসমস্যা

এইরূপে বহু গোলযোগের পর বিগত শতাব্দের অবসানে ইউরোপ পূর্ব্বোক্ত আকার ধারণ করিলে অনেকেই মনে করিলেন এইবার পৃথিবীতে শান্তি আসিল; মানবজাতি এখন বিশ্বমৈত্রীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ আপাত শান্তির পশ্চাতে যে অগ্নি লুকাইত ছিল তাহা সেই অসমীক্ষ সুন্দরগ্রাহী (Optimist) মহোদয়গণ দেখিতে পান নাই। একটু স্থির মনে চিন্তা করিলেই দেখা যায় বিগত এই শত বর্ষের এই সমস্ত সংঘর্ষের প্রধান কারণ দুইটী; হয় জাতীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ, না হয় বহির্বাণিজ্য প্রসারের সুবিধা সৃষ্টি। কাহারও আবার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা

না ছিল এমন নহে। রুশের কনষ্টান্টিনোপল্ অধিকারের চেষ্টার মধ্যে দুইটী উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বহির্বাণিজ্যের প্রসার, দ্বিতীয়তঃ তুর্কী-সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন-পূর্ব্বক প্রাচ্যভূমিতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা। অন্যান্য যাঁহারা তুর্কীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য রুশিয়ার কবল হইতে আত্মরক্ষা। প্রুশিয়ার সহিত অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধ স্বীয় প্রভাব বিস্তারের উদাহরণ। ক্ষুদ্র ও অধীন রাজ্যগুলির শুধু স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই সেকালে প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনেকের মীমাংসা হইল কিন্তু ভিতরের প্রকৃত গোলযোগ মিটিল না। সুইজারল্যাণ্ড চিরদিন স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, প্রাকৃতিক সীমাগুলি তাহার রক্ষাকর্ত্তা; কিন্তু রুশিয়া অষ্ট্রীয়া ও তুর্কীদেশের প্রান্তস্থিত অপরাপর ক্ষুদ্ররাজ্যগুলির উপর অনেকের লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত ছিল। হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ-বহ্নি তখনও ধূমায়িত হইতেছিল। নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে যে মিত্রভাব ছিল তাহা ১৯০৫ সালে তাহাদের বিচ্ছেদ হইতে জানা গিয়াছে। সার্ভিয়া, রোমানিয়া, মন্তিনিগ্রো, বুলগেরিয়া, পূর্ব্ব রুমেনিয়া যখন ক্রমান্বয়ে স্বাধীন হইল, তখন এলব্যানিয়া, থ্রেস, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি অবশিষ্ট বলকান ষ্টেটগুলির মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। একে অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীতে জর্ম্মান, ইতালীয়, মাগায়ার প্রভৃতি নানা জাতির বাস ও তাহাদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল; তাহাতে স্বাধীনতাপ্রয়াসী সার্ভজাতি প্রধান; বোসনিয়া ও হার্জগোভিনা প্রদেশদ্বয় ঐ সম্রাজ্যের অধীন এবং পরিশেষে ১৯০৮ সালে একবারে রাজ্যভুক্ত করা হইল। এই সমস্ত বিষয়গুলি এককালে বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান শতাব্দীর এই মহাসমরের অনেক কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আজ সার্ভিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার সহিত বোসনিয়া ও হার্জ্জগোভিনার ভাগ্যবিধাতার যোগ আছে। সার্ভিয়ার হস্তে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ ও তদীয় পত্নীর গুপ্ত হত্যা, বিগত বলকান সমরের পর স্কুটারি বন্দর লইয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে বিবাদ —উপরোক্ত ধূমায়িত অগ্নির শেষ অবস্থা।

জর্ম্মানি যে এই যুদ্ধে যোগদান করিল সেও অনেক কারণে। প্রথম ও প্রধান হেতু তাহার স্থানাভাব। বিপুল লোকসংখ্যা রাজ্য তদনুযায়ী অনেক ছোট; এদিকে অর্থবল প্রচুর শক্তিও প্রবল সুতরাং তাহার পক্ষে যুদ্ধটা অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ অষ্ট্রীয়া বলকান সমরের পর হইতে বিশেষভাবে জর্ম্মানের প্রতিদ্বন্দ্বী রুশের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার শক্তিও নিতান্ত কম নহে। যদি এই দুই শক্তি একদিকে যায় তবে ইউরোপের সমগ্র শক্তি এক না হইলে বিশেষ ভয়ের কারণ দাঁড়ায় না। এমন কি যুদ্ধে জয়ী হইবার দুরাশাও পোষণ করিতে পারে। এই সমস্ত কারণে জর্ম্মান তাহার সহিত যোগ দিল।

এখন জর্ম্মানি যদি রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় তবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশ নীরব থাকে কি করিয়া। এখন ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের একমাত্র চেষ্টা সমন্বয় সাধন অথবা প্রত্যেকেরই ভিতরেই একটা 'একরাষ্ট্রীয়তা' বা Imperialism এর আকাঙ্ক্ষা অতি গোপনে বাস করিতেছে বলিয়া অন্যের একত্রিত শক্তিবৃদ্ধিকে তাহারা বিষম সর্ব্বনাশের মূল কল্পনা করিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং যুদ্ধে যোগদানের মধ্যে আমরা পূর্ব্বোক্ত হাব ভাব ও উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান দেখিতে পাই। তারপর সমরায়োজন দেখিয়া আমাদিগকে

ইহার ভবিষ্যৎ গতি ও ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইবে। ঐ যে অত বড় বলকান সমর ঘটিয়া গেল তাহার এত আড়ম্বর দেখিয়াছ কি? যুদ্ধ ব্যাপারে 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া' প্রবাদটী প্রায় খাটে না। বিশেষতঃ এবারকার যুদ্ধে সভ্যজাতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রবল শক্তির 'অষ্টবজ্র সম্মিলন'। বিগত বিখ্যাত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পুনরভিনয় হইতে চলিল; যদিও এ যুদ্ধে নূতন আবিষ্কৃত উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া যাইতে পারে তথাপি এ যুদ্ধের ভাবিফল কোন অংশেই তাহা অপেক্ষা কম গুরুতর হইবে না।

৪। যুদ্ধের ভাবী ফল

যদি যুদ্ধ স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া গন্তব্যে উপনীত হয় তবে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের বিংশ শতাব্দে দ্বিতীয় বার পুনর্গঠন আশা করা যায়। মনে হয় পোলণ্ড, বেলজিয়ম, বলকান ষ্টেটসের মানচিত্র আমূল পরিবর্ত্তিত, এমন কি লোহিতসাগরের তীর পর্যন্ত এই আন্দোলনের ঢেউ উপনীত হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাপারে ইহা সমগ্র জগতকে একবার আলোড়িত করিবে।

৫। প্যানামা বিশ্বমেলা

গত বৎসর পানামা খাল লইয়া আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। ১৯১৫ সালে ঐ খাল খনন উপলক্ষ্যে সানফ্রান্সিস্কো সহরে একটি বিশ্বপ্রদর্শনী খোলা হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ইউনাইটেডষ্টেট্স্ হইতে প্রবাসীতে লিখিয়াছেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় জগতের অন্যান্য জাতির মধ্য হইতে এই প্রদর্শনীতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া নানা প্রকার বহু মূল্যবান জিনিষ নিজ নিজ দেশ হইতে আনাইয়া পৃথিবীর লোকদিগকে দেখাইবেন, আর জলদগম্ভীরস্বরে বলিবেন, আমরা উন্নত জাতি, আমাদের সবই আছে; কিন্তু আমরা ভারতবাসী, যাঁহাদের শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিদেশীদের তুলনায় হেয় নহে, আজ ঘরে বসিয়া কি করিতেছি? যে আর্য্য জাতি একসময় শিল্প, জ্ঞান ও সভ্যতায় পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিকে অতিক্রম করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, সেই জাতির বংশধরগণের কি আজ নীরব থাকা উচিত? মহাত্মা অশোকের কীর্ত্তিকলাপ, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কথা; আকবরের সভাসদ্গণের বিবরণ, আগ্রার তাজমহল প্রভৃতির কথা একবার প্রাণের মধ্যে জাগাইলেই ভারত-সন্তান সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, "ভারতের সবই ছিল এবং এখনও আছে।" ভারতের এ সব থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর উন্নত ও শিক্ষিত জাতির মধ্যে ভারতসন্তান পরিচিত হয় নাই; কারণ ভারতসন্তান ঘরের বাহির হইতে পাজি খোঁজে, শাস্ত্র হাতড়ায়। যদি দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আসেন এবং দেশের বর্ত্তমান ও প্রাচীন শিক্ষা শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, জাতীয় উন্নতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় আলোচনা করিয়া পৃথিবীর লোকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন, তবে ভারতবাসীর গৌরব আবার বাড়িবে। দেশ হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের পানামা-মহামেলায় আসা নিতান্ত দরকার। যদি আমাদের ভারত-গৌরব সাহিত্য-মহারথী রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকাতে না আসিতেন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করিতেন, তবে তাঁহাকে আজ এ সকল দেশে কে জানিত?

তিনি এ সব দেশে আসিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহাকে সকলে জানে ও লোকমুখে তাঁহার গুণের কথা শুনিতে পাই। ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ যদি ১৯০৩ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মসংক্রান্ত মহাসভাতে (Parliament of Religions) আসিয়া সর্ব্বজগৎসমক্ষে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা না করিতেন তাহা হইলে কি ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন আজ সভ্যজগতে এত মর্য্যাদা পাইত?" জানি না সুরেন বাবুর আহ্বান দেশবাসী শুনিবেন কি না। আমরা মনে করি, হিন্দুর জ্ঞানভাণ্ডার পাশ্চাত্যজাতির সম্মুখে যিনি যথার্থভাবে খুলিয়া দেখাইতে সমর্থ, তিনি এই মহামেলাকে উপেক্ষা করিবেন না। তবে সুরেন বাবু ভারতীয় বণিকসম্প্রদায়কেও ঐ মেলায় উপস্থিত হইয়া ভারতীয় শিল্পাদি প্রদর্শন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু যে কার্য্যে আমরা প্রতিযোগীতায় পরাজিত হইব না, তাহাতেই অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের বণিকসম্প্রদায় ব্যবসা ও বাণিজ্যে যদি পারণামে জয়ের আশায় বদ্ধপরিকর হইতে পারেন, তবেই এই মহামেলায় তাঁহাদের শিল্পদ্রব্য প্রদর্শন বিধেয়। কিন্তু কেবল কৌতূহল বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের যোগদান আমরা কিছুতেই অনুমোদন করি না। তবে যাঁহারা শিক্ষার্থ তথায় গমন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

৬। উপাধি প্রত্যাখ্যান

আমাদের দেশে বহুদিন হইতে উপাধিকে ব্যাধি বলিয়া মনে করা হইতেছে, তথাপি ম্যালেরিয়া ওলাউঠার মত ইহার প্রবল প্রসার প্রতিহত হইতেছে না। এখনও দেশের বহু ধনী, বহু বিদ্বান এই মায়ামরীচিকার মোহে বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছেন। মানুষের নিকটে তাহাঁর চরিত্রই যে সর্ব্ব গৌরবের গৌরব, সর্ব্ব ভূষণের ভূষণ তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমাদের বাহিরের দিকে এত নজর গিয়াছে। আমরা সকল কাজে আমাদের বাহিরের ঠাটই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছি। কিন্তু তাহাতে অন্তর ক্রমেই দীন হইতে দীনতর হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে আমরা প্রতিদিন জগতের চক্ষে কতখানি হীন হইয়া পড়িতেছি, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। আমাদের গোড়ায় গলদ। কিন্তু সেখানে সংশোধনের নাম গন্ধ নাই—আমরা চাহিতেছি সমাজের উন্নতি! ব্যক্তিতে যাহা অনুস্যূত হইল না, শুধু মাত্র বক্তৃতায় তাহা সমাজে পরিক্রামিত হইবে, ইহা কোন্ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকে বিশ্বাস করিতে পারে? ফলকথা তিলে তিলে ধীরে ধীরে এখন আমাদের আত্মচিন্তার প্রয়োজন হইয়াছে। এখন আমাদের বিশেষরূপে অন্তর-বিশ্লেষণের দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের কোথায় কোথায় মোহ, কোথায় কোথায় হীনতা সমস্তই পরিষ্কার করিয়া বুঝা উচিত। যেদিন নিজের গলদ নিজকে তাড়না করিবে, সেইদিন বুঝিব আমাদের শুভদিন সমাগত। সেইদিন আত্মশোধনের যে প্রয়াস আমরা করিব, তাহাতেই প্রকৃত উন্নতির মুখ পরিদৃষ্ট হইবে।

মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয় 'কে, সি, আই, ই' উপাধি সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। দেশের পক্ষে ইহা একেবারে নূতন। ইহাতে তাঁহার কতখানি সাহসিকতা, কতখানি চরিত্রবল, কতখানি আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল, উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত-ব্যক্তিগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি?

৭। চিত্রশিল্পে ভারত ও চীন

শুধু যে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ধর্ম্মই চীন ও জাপানের সঙ্গে যোগস্থাপন করিয়াছিল, তাহা নহে। ভারতের চিত্রবিজ্ঞানও ঐ সব দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতীয় চিত্র-চিন্তার প্রতিধ্বনি চীন ও জাপান চিত্রশিল্পের মধ্যে কেমন পরিস্ফুট 'ভারতী' পত্রিকায় ষড়ঙ্গদর্শন প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"চীন-ষড়ঙ্গের পঞ্চম অঙ্গটির যে অনুবাদ ফরাসী পণ্ডিত পেৎরুচি (Petrucci) এবং বিনিয়ান্ (Binyon) সাহেব দিয়াছেন তাহা পঞ্চদশীর চিত্রদীপের এই পঞ্চম শ্লোকটির অবিকল প্রতিধ্বনি যথা :—

"Dispoeser les lignes et leur attri buer leur place hi'erarchique.

(La philosophie de la Nature Laus l'art de l'extreme orient— Petrucci, page 89).

'Composition and subordination or grouping according to the hierarchy of things L. Bingon. The flight of the Dragon. page 12).

বেদান্ত-দর্শনের এই চিন্তাটি চীন-ষড়ঙ্গের মধ্যে কোন্ কালে কি ভাবে প্রবেশলাভ করিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমাদের ঋষিগণ বলিয়াছেন যে রূপের ধর্ম্মই হচ্ছে, প্রতিবিম্বিত হওয়া, কল্পিত হওয়া, ছন্দিত হওয়া এবং ছায়াতলে প্রকাশিত হওয়া, যেমন :—

'যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে
যথাপ্সরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে, ছায়া-
তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।'
(কঠোপনিষদ)

আত্মাতে দর্পনস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায়, পিতৃলোকে স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায়, গন্ধর্ব্বলোকে যেন জলের কম্পনের উপরে এবং আমাদের এই ব্রহ্মলোকে ছায়া এবং আতপ এতদুভয়ের বৈষম্য দিয়া।

'যথাদর্শে তথাত্মনি' এই ভাবটির ঠিক অনুরূপ ভাবটি ব্যক্ত করিতেছে জাপানের Sha I যথা :—

'They paint what they feel rather than what they see,' but they first see very distinctly (তাত্মাতে প্রতিবিম্ববৎ). It is the artistic impression (Sha I) which they strive to perpetuate in their work'.

(Page 8 on the Lands of Japanese painting by Henry P Bowie).

আত্মাতে প্রতিবিম্বিত না দেখা পর্য্যন্ত রূপকে সম্পূর্ণ বোধ করা অথবা প্রকাশ করা অসম্ভব ; ইহা জাপানও বলিতেছেন, আমাদের ঋষিগণও বলিয়া গিয়াছেন।

'ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে'—রূপ প্রকাশ পাইতেছে ছায়াতপের বৈষম্য দিয়া, যেমন—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে,
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি
চাকশীতি

দুই সুন্দর পক্ষী—শ্বেত, কৃষ্ণ,—জাগ্রত, ঘুমন্ত—যেন ছায়াতপের মত একত্র বাস করিতেছে। একটি পক্ষী ফল-আস্বাদ করিতেছে, গান গাহিতেছে, অন্যটি চুপচাপ্ বসিয়া তাহা দেখিতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মা (Sprit and matter) আকার নিরাকার, রূপ ও অরূপ এই দুয়ের সমতা ও বৈষম্যতা ব্যক্ত করিতেছে। ভারতের উল্লিখিত যে সনাতন চিন্তাগুলি তাহার ঠিক প্রতিধ্বনি দিতেছে জাপান-চিত্রশিল্পের In Yo মন্ত্রটি, যথা :—

'In Yo.........requires that there should be in every painting the sentiment of active and passive, light and shade (ছায়াতপ)....... The term In Yo originated in the earliest doctrines of chinese philosophy and has always existed in the art language of the orient (?) It signifies darkness (In, ছায়া) andlight (Yo, আতপ) negative and positive female and male (প্রকৃতি পুরুষ), passive and active (যেমন, দ্বাসুপর্ণা) lower and upper (উত্তমাধম) even and odd........Two flying crows one with its beak closed, the other with its peak open (?).........or

two dragons one ascending to the sky, the other descending to the ocean—illustrate the phases of In Yo, (vide page 48 on the Laws of Japanese painting, by Henry P. Bowie).

আমাদের ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ 'প্রমাণানি (correct perception, proportion, measure and structure of forms) ও চীন ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ (anatomical structure) যে সাধারণ ভাবে মিলিতেছে, তাহা নয়। চীন ও জাপান চিত্রশিল্পে এই প্রমাপ্রয়োগের পুংখানুপুংখ উপদেশগুলিও যেন প্রমাসম্বন্ধে আমাদের চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে। প্রমা অর্থে আমরা বুঝিতেছি কোন বস্তুর ভ্রমভিন্নজ্ঞান—তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির পরিমাণ। জাপান-শিল্পের Ichi Isho এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি দিতেছে যথা :—

'Ichi and Isho...........they aim to supply and express with sobriety what is essential to the composition, proportion (Ichi) determining the just arrangement and distribution of the component parts and design (Isho) the manner in which the same shall be handled. (Vide page 46 on the Laws of Japanese painting by H. P. Bowie).

প্রমাণ বা প্রমা যে কেবল বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বুঝায় তাহা নয়, প্রমাদ্বারা আমরা বস্তুর দূরত্ব এবং নৈকট্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। চীন-শিল্পশাস্ত্রে এই দূরত্ব ও নৈকট্য বুঝাইবার নীতিটিকে বলা হইয়াছে :—

'En Kin.........So far as the perspective is concerned, in the great treatise of Chu Kaishu entitled the 'Poppy Garden Art Conversation' a work laying down the fundamental laws of landscape painting, artists are specially warned against disregarding the principle of perspective called En Kin, meaning what is far and what is near (vide page 8 on the Laws of Japanese painting by Henry P. Bowie)

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হইতেছে যথা—

'শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্ত্বরম্ স্মৃতম্।'
(কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস)

চিত্রমাত্রেই অবর,—কি শব্দচিত্র, কি বাচ্যচিত্র—যদি তাহাতে ব্যঙ্গ্য না থাকে ইঙ্গিৎ না থাকে। জাপানী শিল্পশাস্ত্রে ব্যঙ্গকে বলা হইয়াছে :—

Yu Kashi.........Such suggestion or stimulation of the imagination is called Yu Kashi. The Japanese painter is early taught the value of suppression in design. (Vide page 47 on the Laws of Japanese painting by Henry P. Bowie).

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আমাদের বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতির গভীরতম সূক্ষ্মতম চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে চীনের ও জাপানের চিত্র সম্বন্ধে ষড়দর্শন। নানাদিক দিয়া ভারতে ও চীনে যেরূপ যোগাযোগ দেখা যায় তাহাতে আমার বোধ হয় যে বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মের সঙ্গে ভারতের চতুঃষষ্টিকলা ও আলেখ্যের এই ষড়ঙ্গটি চীনে নীত হইয়াছিল।"

৮। গুরুকুলের সৎচেষ্টা

গুরুকুল বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজ সম্প্রদায়ের বাহির হইতেও সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াসী। গুরুকুলে যে সমস্ত বিষয়

শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সব বিষয়ে দেশে যাঁহারা বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে তত্তৎ বিষয়ের পরীক্ষক নির্ব্বাচন করা ইহাঁদের এক প্রধানতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে ইহাঁরা দেশের অনেকের কাছেই অগ্রসর হইতেছেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা ইহাঁদিগকে অবৈতনিক ইন্স্পেক্টর রূপে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও পরীক্ষণীয় বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

অধ্যাপক রাম অবতার পাণ্ডে এম্ এ সাহিত্যাচার্য্য—সংস্কৃত সাহিত্য।

রেভারেণ্ড মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুস—ইংরাজী।

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি, আর, এস—ইতিহাস।

অধ্যাপক এইচ, সি, মুখার্জ্জি—দর্শন।

অধ্যাপক হসমত রায় এম, এস, সি—রসায়ন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ—উদ্ভিদবিজ্ঞান।

৯। খৃষ্টজগতে হিন্দু-প্রভাব

চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসমিতির বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতি মিঃ মারউইন মেরি স্নেল সাহেব খৃষ্টজগতে ভারতবর্ষের দান সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি "আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্য ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকটে সর্ব্বদাই ঋণী। খৃষ্টজগতে এমন কিছু সংসামান্য উচ্চভাব ও আকাঙ্ক্ষাও নাই যাহা হিন্দুচিন্তার ক্রমিক প্রভাবের কোন না কোন একটি ধারা হইতে নিঃসৃত নহে। পাইথাগোরাস এবং প্লেটোর হিন্দু ভাবাপন্ন গ্রীসীয়তত্ত্ব জ্ঞানবাদিগণের (Gnostics) হিন্দুভাবাপন্ন তত্ত্বকথা, য়িহুদীয় কাব্বালাবিদ্দিগের হিন্দুভাবাপন্ন ধর্ম্মমত। মূর দার্শনিকদিগের হিন্দুভাবাপন্ন মহম্মদীয় ধর্ম্ম, এমন কি থিওসফিষ্টদিগের হিন্দুভাবাপন্ন রহস্যবাদ (Occultism) এবং নব ইংলণ্ডের দুজ্ঞেয়বাদীদিগের খৃষ্টের ত্রিভাব অর্থাৎ দেবত্বে অবিশ্বাসবাদ প্রভৃতি বহুতর বিষয়ে প্রাচ্য প্রভাব-ধারা পরিলক্ষিত হয়, যাহা সমসাময়িক খৃষ্টজগতের ধর্ম্মক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া আসিতেছে।"

১০। বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান

বঙ্গদেশের মুসলমানগণ বঙ্গভাষার প্রতি তত শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা, অথচ তাহাতে তাঁহারা অনুরাগ প্রদর্শন করেন না কেন, বুঝিতে পারা যায় না। যে পথে চলিলে স্বাভাবিক হয়, সে পথে না চলিয়া অন্য পথে চলা কদাচ সঙ্গত নহে। আরব্য ও পারস্য ভাষা তাঁহাদিগের নিকটে গৌরবের সামগ্রী হইলেও মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করিলে, তাঁহাদের আধুনিক জাতীয় উন্নতি কি প্রকার ব্যাহত হইবে, তাহা একবার তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। মৌলবী আবদুল করিম মহাশয় এ বিষয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আশা করি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবেন।

"আমরা দেখিতে পাই, ইদানীং বহু মুসলমান বালকই বিদ্যাভ্যাস করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে যোগদান করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন সফলমনোরথ হইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসে, কেহ তাহার সংবাদ লইয়াছেন কি? ইহার জন্য শুধু শিক্ষার্থীদিগের অমনোযোগিতা বা মস্তিষ্কহীনতায় দোষারোপ করিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে। মুসলমান বালকেরা প্রায়ই মাতৃভাষায় (বাঙ্গালায়) কোনও জ্ঞানলাভ না করিয়াই, বা অতি সামান্য জ্ঞানলাভ করিয়াই ইংরাজী পড়িতে যায়। সেখানে গিয়া তাহারা যাহা দেখে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। তথায় তাহাদিগকে দুইটী সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়;—কিন্তু সেই ভাষা-শিক্ষায় তাহা-

দের মাতৃভাষা তাহাদের কোনও সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না। মাতৃভাষায় জ্ঞানাভাব বা সামান্য জ্ঞান তাহাদের প্রধান পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। একদিকে নিজের অজ্ঞতা, এবং অন্যদিকে আরব্য পারস্য ভাষার অধ্যাপনার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত থাকে, মাতৃভাষায় তাঁহাদের অজ্ঞানতাহেতু তাঁহারা তদ্ভাষার সাহায্যে সুচারুরূপে অধ্যাপনা করিতে পারেন না। ফলে বালকগণ তোতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, এবং ইংরেজী বা আরব্য, বা পারস্য, কোনও ভাষাতেই লব্ধপ্রবেশ হইতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে বার আনা ছাত্রেরই উদ্যম ভগ্ন হইয়া যায়। অবশ্য ভগ্নোৎসাহ হইবার আরও অনেক কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কথা নয়। এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার-ফলে অধিকাংশ ছাত্রকেই অকালে ছাত্র-জীবনে ইতি দিতে আমরা দেখিয়াছি। এস্থলে একবার হিন্দু শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহাদিগকেও দুইটি ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতে হয় সত্য, কিন্তু উভয় ভাষার শিক্ষাতেই তাহারা মাতৃভাষার সহায়তা পায়। হিন্দু শিক্ষার্থীদিগের অনেকেও বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া যায় না বটে, কিন্তু ইংরেজী স্কুলে গিয়া তাহারা মাতৃভাষা শিখিবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, সংস্কৃত ও আরব্য ও পারস্য ভাষার মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা না শিখিয়াও সংস্কৃতের অধিকাংশ শব্দ আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু আরব্য ও পারস্যের বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারি না। মুসলমান সমাজের পক্ষে ইহা এক বিষম সমস্যা, সন্দেহ নাই। কি ভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে, সমাজ হিতৈষিগণেরই তাহা বিবেচ্য। * * *

আমাদের দেশের লোকসংখ্যার ভূরিষ্ঠাংশ মুসলমান, এবং অল্পাংশ হিন্দু। অথচ বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সজীব ভাষাসমূহের মধ্যে একতম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে, একমাত্র হিন্দুগণই তাহার মূল। বঙ্গসাহিত্যের আশানুরূপ পুষ্টি ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমবেত যত্ন ও উদ্যম আবশ্যক। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অতি পরিমিতসংখ্যক লোকই মাতৃভাষার সেবায় ও অনুশীলনে অবহিত হইয়াছেন। দেহের অর্দ্ধাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে, অপরাংশ দ্বারা কোনও কাজ সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না। বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও কি তাহাই ঘটিতেছে না? বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য হইতে একটা অতিমাত্র 'হিন্দু হিন্দু গন্ধ' অনুভূত হয় বলিয়া আমরা—মুসলমানেরা অনুযোগ করিয়া থাকি। এ অনুযোগ যে কতকটা সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বঙ্গভাষার এরূপ হিন্দু-ভাবাপন্নতা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাহা কিছুতেই অস্বাভাবিক হয় নাই। এ পর্য্যন্ত হিন্দুগণই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাধনায় শীর্ণশিশু সাহিত্যকে প্রাদেশিকতার রৌদ্র-বায়ুহীন সঙ্কীর্ণ গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া, উহাকে উন্মুক্ত বায়ু কিরণময় জগতের বক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রতিভাবলে উহা আজ জগতের সাহিত্য-পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং সে জন্য হিন্দুগণকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না,—তজ্জন্য মুসলমানদের নিশ্চেষ্টতাই সম্পূর্ণ দায়ী।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাপি মুসলমানগণ সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, তাঁহাদের মাতৃ-ভাষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, এখনও অনেকে বঙ্গ-ভাষাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা-বোধ করেন। হিন্দুদের মধ্যে বঙ্গভাষার বিপুল প্রসারের ফলে তাঁহাদের ধর্ম্মভাষা সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থরত্নই বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে। তাহার ফলে মাতৃভাষার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাণপ্রবাহ অনুভব করিতে পারিতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণও যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরব্য পারস্য হইতে তাঁহাদের মহনীয় কীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষগণের গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন,

তাহা হইলে বঙ্গভাষা তাঁহাদেরও জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইত। এবং তাহাতে বঙ্গের উভয় সমাজের উন্নতির হেতু ও মিলনের চিরস্থায়ী সেতু নির্ম্মিত হইত। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃতের ন্যায় আরবা ও পারস্য ভাষার মহামূল্য রত্নমালায় বিভূষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মহিমা ধারণ করিত, এবং তাহা এখন হিন্দুগন্ধী বলিয়া আমাদের অনুযোগ করিবার কারণ থাকিত না।

মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করিয়া তাহার সমুচিত সমাদর ও অনুশীলন না করায়, মুসলমান সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করা সহজ নহে। প্রাচীন বঙ্গে বহু বহু মুসলমান কবি যেরূপ সযত্ন সেবায় বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিতেছিলেন, সেই যত্ন ও উদ্যম যদি এতদিন পর্য্যন্ত অবিরাম প্রবাহে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে আজ আমাদের সাহিত্য বিপুল বিস্তার ও অসীম শক্তি লাভ করিত। আমাদের জাতীয়তা বর্দ্ধন কল্পেও তাহা অশেষ সহায়তা করিতে পারিত, এবং বঙ্গসাহিত্যও ইসলামের ভাস্কর-গৌরবান্বিত হইয়া উঠিত। বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা সেই শুভকার্য্যে ব্রতীও হইয়াছিলেন। হিন্দু কবিগণ যেমন রামায়ণ মহাভারতাদি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিতেছিলেন। মুসলমান কবিগণও তেমনি তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থাবলী বাঙ্গালায় নিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। * * * * * * * *

বঙ্গের বর্ত্তমান মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তে অবহেলা করিয়া কোনও নূতন জাতীয় ভাষার আমদানী ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা কখনও সাফল্য লাভ করিবে না। প্রত্যুত, সে চেষ্টা নিজ হস্তে নিজের মস্তকে কুঠারাঘাতের সহিত তুলিত হইতে পারিবে।

আরও একটা কথা আছে। বঙ্গদেশ হিন্দু ও মুসলমানের দেশ এবং হিন্দু ও মুসলমান লইয়া বাঙ্গালী জাতি গঠিত। এই দুই জাতির মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহাতে জাতীয়তা গঠনের যেরূপ সহায়তা হইবে, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্মিলন-সাধনের প্রয়োজন কি, তাহা বোধ হয় এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। একমাত্র বঙ্গভাষাই বঙ্গের দুইটি সহোদর সমাজকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিশীল ও অনুরাগসম্পন্ন করিতে পারে। প্রায়ই ভাষার ভিতর দিয়াই তাঁহাদের পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান ঘটিতে পারে, এবং এই ভাষাই তাঁহাদের ক্ষুদ্র বর্ণগত পার্থক্য ঘুচাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিপুল অখণ্ড জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে

* *

১১। মহীশূরে শিল্পশিক্ষা

মহীশূরের গণশিক্ষা-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি সেখানে শিল্পশিক্ষা ক্রমশই প্রসারলাভ করিতেছে। আজ পর্য্যন্ত তথায় ২০টি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সব বিদ্যালয়ে শ্রমশিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রাথমিক ও উচ্চ প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন করা হইতেছে। ইতিমধ্যে স্থানে স্থানে ঐ প্রণালীর প্রবর্ত্তনও করা হইয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়-রক্ষাকল্পে লক্ষাধিক টাকাও বৎসরে ব্যয়িত হইয়া থাকে। উৎসাহ ও তদনুযায়ী উদ্যোগ না থাকিলে কোন বিষয়েই সাফল্য লাভ হয় না। মহীশূর-রাজ্য ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

* * *

১২। দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণ

ভারতবর্ষ দারিদ্র্যনিপীড়নে ব্যথিত হইয়া

উঠিয়াছে। চারিদিকে নাই নাই, চাই চাই রব। লোকের আয়ের দিকে বাড়িতেছে না। জিনিষের দর অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে লোকের কষ্টের সীমা নাই। এই দৈন্য-দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য নানা জনে নানা উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এই সমস্যা পূরণের জন্য নানাবিধ জল্পনা কল্পনার অন্ত দেখিতেছি না। কিন্তু কোন উপায়ই কার্য্যকরী হইতেছে না কেন, লোকে কেন দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে না, তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়।

আমরা এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দারিদ্র্য-নিবারণের দুইটি পথ প্রশস্ত দেখিতেছি। একটি—দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করা, অর্থাৎ আমাদের অভাবের মাত্রা যতদূর সম্ভব কমাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। দ্বিতীয়টি —অর্থাগমের যত কিছু উপায় আছে, সেইগুলি দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করা। প্রথমটি অবলম্বন করিলে বর্ত্তমানযুগের প্রতিকূলে চলিতে হইবে। তাহাতে স্থলবিশেষে লাঞ্ছনার এবং উপহাসাস্পদ হইবার আশঙ্কাও যে না আছে, তাহা নহে।—কিন্তু শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাঁহারা দৈন্যকে বরণ করিতে পারেন, বাহিরের অনাদর-অবহেলা তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ। তাঁহাদের চরিত্র-বল দৈন্যের মধ্য দিয়া প্রস্ফুট হইলে জগৎ তাঁহাদিগকে কিছুতেই হেয় মনে করিতে পারিবে না। অতএব প্রথম পথের পথিকের শঙ্কার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় পথ যাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শক্তিসঞ্চয় করা আবশ্যক। যে শিক্ষা ও সাধনা লাভ করিলে স্বাধীন অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেই শিক্ষা ও সাধনা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। কৃষি শিল্প বাণিজ্যের বিপুল বিস্তৃতির জন্য কায়মনে পরিশ্রম করিতে হইবে—রৌদ্র ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, আপদ বিপদ ক্ষতির আশঙ্কা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। অবশ্য গোড়াতেই প্রকাণ্ড কার্য্যে হাত দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি "বৃহদাকারের কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে আমাদের বর্ত্তমান মূলধন, পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতা প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়গুলি পরিচালিত করিতে পারিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি।" কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি চাহিলে এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই তৃপ্তিলাভ অসম্ভব হইবে, তখন ক্ষেত্র বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে, এবং আশা হয়, সেই আকাঙ্ক্ষাপূরণের যথাযথ ক্ষমতাও ধীরে ধীরে অর্জ্জিত হইতে থাকিবে।

এখন এই দুইটা পথেই সিদ্ধিলাভ বহু শ্রম, সাধনা ও শক্তিসাপেক্ষ। আমাদের দেশের লোক অধিকাংশ সময়েই ফাঁকি দিয়া সুখ অর্জ্জন করিতে চাহে। যেখানে বহু শ্রম ও সাধনার আশঙ্কা আছে, সে পথ দিয়া চলিতে চাহে না। তাই আজ দারিদ্র্যদুঃখে পীড়িত হইয়াও তাহারা তাহা মোচনের জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইতেছে না। কিন্তু এখনও সহজে সুখলাভের পথ একেবারে রুদ্ধ হয় নাই, তাই আমরা জাগ্রত হইতেছি না, আশার স্বপ্নে বিভোর হইয়া ঘুরিতেছি। কিন্তু অচিরেই এ স্বপ্ন একেবারে ভাঙ্গিবে, তখন আমাদের আলস্য-জড়তা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অতএব পূর্ব্ব হইতেই নিজের গন্তব্য ঠিক করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

১৩। এশিয়ার ঐক্য

তোমরা যে যাহাই বল না কেন,—আমরা জানি ভারতবর্ষ এক। ভারতবর্ষ বিশাল মহাদেশ বটে, কিন্তু এই বিশাল দেশ-কলেবরের ভিতর এক চিন্তা, এক প্রাণ, এক আদর্শ বিরাজ করিতেছে। এই ঐক্য আজ কালকার রেলগাড়ী টেলিগ্রাফের যুগসৃষ্ট বস্তু নয়। ধর্ম্মের ঐক্য, সমাজের ঐক্য, চিন্তা-প্রণালীর ঐক্য, আদর্শের ঐক্য—এ সকল ত ছিলই এবং আছেও। আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিতেছি যে, কাশ্মীরের পণ্ডিত বিদ্যারাজ্যে যাহা আবিষ্কার করিতেন

দ্রাবিড়ের পণ্ডিত হয়ত তাহার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচনা করিতেন। আবার গৌড়ের বৈজ্ঞানিক যে গ্রন্থ রচনা করিতেন সিন্ধুদেশের বৈজ্ঞানিক তাহার বিস্তার-সাধন করিতেন। প্রাচীন ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, প্রাণী-বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, সুকুমার শিল্প, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, দর্শনতত্ত্ব প্রত্যেকেরই ইতিবৃত্ত অনু-সন্ধান করিলে আমরা ভারতবাসীর গভীর-তর ঐক্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। বাঙ্গালীর আবিষ্কারে পাঞ্জাবী প্রভাবান্বিত হইতেন, মারাঠার গবেষণায় কাশ্মীরির উপকার সাধিত হইত। কোন প্রদেশের কোন চিন্তাবীরই অন্যান্য প্রদেশের চিন্তাবীরগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে জীবন যাপন করিতেন না। সমগ্র ভারতমণ্ডলে এক বিদ্যারাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গভীরভাবে ঐতিহাসিক আলোচনায় অগ্রসর হইলে দেখিব সমগ্র এশিয়াখণ্ডই এক চিন্তামণ্ডলের অধীন ছিল। প্রাচ্যএশিয়া, মধ্যএশিয়া, পাশ্চাত্যএশিয়া- সর্ব্বত্রই এক বিদ্যার গণ্ডী বিস্তৃত হইত। ওকাকুরা বলিয়া গিয়াছেন এশিয়ার সত্যসত্যই এক মানবাত্মার বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধেও সমগ্র এশিয়ার ঐক্য বুঝা ক[illegible] নয়

আজকাল ইতালীর কোন পণ্ডিত কোন সত্য আবিষ্কার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ইউরোপের সকল বিজ্ঞান-কেন্দ্র প্রচলিত হয়। জার্ম্মাণিতে কোন নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র ইউরোপেই তাহার প্রচার হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইউরোপের অসংখ্য দলাদলি স্বত্বেও বিজ্ঞানমণ্ডলে ঐক্য দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে এশিয়াতেও এইরূপ ঐক্য ছিল।

* *
*

১৪। প্রাচীন জাপানের গণিত চর্চ্চা

সম্প্রতি একজন জাপানী এবং একজন আমেরিকান পণ্ডিত মিলিত হইয়া জাপানী-দিগের গণিতচর্চ্চার ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া-ছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, দ্বাদশ ত্রয়ো-দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানীদের সঙ্গে চীনাদের ভাববিনিময় বিশেষরূপেই হইত। জাপানীরা গণিতশাস্ত্রের কয়েকটা বিষয় চীনের পণ্ডিত সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে হল্যাণ্ডের সঙ্গে জাপানীদের সংস্রব আরব্ধ হয়। কোন কোন জাপানী পণ্ডিত হল্যাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে গণিত শিখিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানী ও ইউরোপীয় সংমিশ্রণ সাধিত হইতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানীরা ㅠ এর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা ওলন্দাজগণের নিকট গ্রহণ করা নয়। তখনও ইউরোপের কেহ এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হন নাই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানীরা যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি বেশী কি গ্রহণ করিবার শক্তি বেশী এ সম্বন্ধে মীমাংসা করা কঠিন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের ন্যায় জাপানীরাও জগতের সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গণিত চর্চ্চা করিয়াছেন। গণিত চর্চ্চা হিসাবে জাপানীরা নগণ্য জাতি নহেন।

এদিকে চীনা ও জাপানী ভাব-বিনিময়ের যুগে ভারতবর্ষের কিরূপ স্থান ছিল তাহা মনে রাখিতে হইবে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের চিন্তাপ্রণালীই চীনদেশে অনুসৃত হইত। তাহার যথেষ্ট প্রাচীন লিপিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনের নিকট জাপানী যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষেরই আবিষ্কৃত সম্পত্তি।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানীরা ㅠ এর মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন দেখা যাইতেছে। এ সময়ে ইউরোপে সে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। পরন্তু ১৫০০ খৃষ্টাব্দের একখানা সংস্কৃত গ্রন্থে ㅠ এর যে মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছে সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানীগ্রন্থেও ঠিক সেই মূল্যই নির্দ্ধারিত দেখিতে পাইতেছি। অথচ ঐতিহাসিকদ্বয় এই আবিষ্কারের মূল্য অনু-সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে আমরা ভাস্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী যুগের বহু কথাই জানি না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি গণিত চর্চ্চা করিয়াছিলেন কিনা তাহার যথার্থ বিবরণ এখনও সঙ্কলিত হয় নাই। এই যুগে দক্ষিণ ভারতে নানা বিদ্যার অনুশীলন হইয়াছিল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ভারতীয় গণিত গ্রন্থখানা দক্ষিণ ভারতেই লিখিত হইয়াছিল। কাজেই জাপানী গণিতকারের আবিষ্কারের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুগের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। সেই যুগে চীনের সঙ্গে প্রাচ্য ভারতের, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিতে হইবে।

পাঠানেরা যখন আর্য্যাবর্ত্ত দখল করিতেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে সৈন্য পাঠাইতেছিলেন ঠিক সেই যুগের হিন্দুজাতির বিদ্যানুশীলন এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এক্ষণে অনুসন্ধান প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে চীনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়গত, ধর্ম্মগত ও সাহিত্যগত আদান প্রদান কতটা ছিল তাহাও নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

* *
*

১৫। ঐতিহাসিকের সমস্যা: স্থল

প্রাচীন যুগে গ্রীকের চিন্তা হিন্দু গ্রহণ করিতেন, হিন্দুর চিন্তা গ্রীক গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই আদান প্রদান কত দূর বিস্তৃত ও গভীর ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। গ্রীকে হিন্দুতে যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য আছে সেগুলি সম্বন্ধে পশ্চিমারা বলিয়া থাকেন যে, গ্রীকেরাই ঐ সমুদায়ের উদ্ভাবয়িতা, হিন্দুরা নকল করিয়াছেন মাত্র। মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুক্তি প্রায়ই দেওয়া হয় না। ভারতবাসী গ্রীকের নিকট ঋণী ইহা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ। আমরাও এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকি, "গ্রীকেরা হিন্দুর নিকট বহু বিষয়ে ঋণী। পীথাগোরাস, ও প্লেটো হিন্দু দার্শনিকগণের শিষ্য। এমন কি, হোমারের কাব্য-সাহিত্য ও বাল্মীকির রামায়ণের গ্রীক সংস্করণ।"

সত্য কথা, জগতের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি বহুমূল্য তথ্যের যথার্থ তত্ত্ব এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অতি প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলাম। মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার পরস্পর আদান প্রদানের কথা না তুলিলাম। কিন্তু আলেক্জাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পর এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এক চিন্তামণ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই মণ্ডলেও কর্ম্মবিনিময় এবং ভাববিনিময় কতটা সাধিত হইত তাহা আমরা বিশদরূপে এখনও জানি না।

এই যুগের কথাগুলি বুঝিতে পারিলে যীশুখৃষ্টের ত্যাগধর্ম্মের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে জানা যাইবে। এই যুগের চিত্র স্পষ্ট হইলে প্লটিনাসের নব্য প্লেটোতত্ত্ব ও হিন্দু বৈদান্তিক তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারিব। এই ভাববিনিময়ের আকার ও পরিমাণ জানিতে পারিলে আরব সভ্যতায় ভারতের স্থান বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হইবে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ আল্ রশিদের আমলে হিন্দু পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও দার্শনিক বাগদাদের রাজধানীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহা জানা যায়। "হিতোপদেশ" গ্রন্থের আরবী অনুবাদ তাহার অন্যতম প্রমাণ।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেক্জাণ্ডার ভারত পর্য্যন্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়া প্রত্যেক জনপদে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটাইতেছিলেন। তাহার পর দেখিতেছি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃত গ্রন্থ মুসলমান সমাজের জন্য অনূদিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে এশিয়ায় গ্রীক রাজ্য বিস্তার খৃষ্টধর্ম্ম নব্য প্লেটোতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং মহম্মদের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটিয়াছে। এই গুলির ভিতর প্রাচ্য জগৎ কতখানি এবং পাশ্চাত্য জগৎ কতখানি লুক্কায়িত তাহার বিশ্লেষণ এখনও হয় নাই।

* *
*

১৬। গ্রীসে ও ভারতে ভাববিনিময়

গ্রীক সাহিত্যের সকল বিভাগ নিঃশেষরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর নূতন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল সমুদ্র মন্থন কবে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এখানেও প্রমাণ পাওয়া বোধ হয় কঠিন। বস্তুতঃ ভারত ও গ্রীসের মধ্যবর্ত্তী জনপদেই তাহার সাক্ষ্য অন্বেষণ করিতে হইবে।

ভারতের উত্তর পশ্চিমে ব্যাকৃট্রিয়া, পার্থিয়া ইত্যাদি রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যের সঙ্গে একদিকে সীরিয়া অপর দিকে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। এশিয়া মাইনার অঞ্চলে পার্থিয়ার প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিল না। এদিকে পার্থিয়া জনপদে ভারতের বৌদ্ধ সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পার্থিয়ার ভিতর দিয়া এশিয়া মাইনরকে ভারতবর্ষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। পার্থিয়ার ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে সীরিয়া জনপদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই দুইটি নূতন ভাষায় পারদর্শী না হইলে ভারত ও গ্রীসের মধ্যবর্ত্তী জনপদের জীবন যাপন প্রণালী অবগত হওয়া যাইবে না। অধিকন্তু, ভারতের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে এবং গ্রীসের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য থাকাও প্রয়োজন। এতগুলি ভাষার অধিকারী না হইলে আলেকজাণ্ডারের পর হইতে ১০০০ বৎসরের ব্যবসায়, সাহিত্য ও ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন, বিপ্লব ও সংমিশ্রণ বুঝিতে পারিব না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এতগুলি ভাষা কেহই জানেন না। জার্ম্মাণ ও ফরাসীরা এদিকে যত পরিশ্রম করেন ইংরাজ পণ্ডিতেরা তাহার ‰ অংশও করেন না। অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্বিজের পাণ্ডিত মহলে এই বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই। এমন কি, জার্ম্মাণ মহলেও বিরল। কাজেই ইঁহারা ফেল মারিতেছেন। বলা বাহুল্য, ভারতবাসীর মধ্যেও এতগুলি ভাষা কেহই জানেন না।

অথচ এইক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলে বহু মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যাইবে। আজকাল ভারতীয় ছাত্রেরা উচ্চ বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন। বিদ্যালাভের পর তাঁহারা আশানুরূপ অর্থলাভ করিতেও পারেন না। ইঁহাদের কেহ কেহ এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইতে পারেন না কি?

আমাদের ছাত্রেরা বহু কষ্টে বিদেশ হইতে শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিয়া আসিয়া স্বদেশে নিতান্ত দরিদ্র-জীবন যাপন করিতেছেন। কেহ স্বেচ্ছায় কেহ সুযোগাভাবে দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহাদের আদর্শে কয়েকজন ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য এশিয়ার কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন এরূপ আশা করা অন্যায় নয়। আমাদের বিশ্বাস, যদি কোন ছাত্র স্বদেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে পারদর্শী হইয়া জার্ম্মাণি, আমেরিকা বা ইংলণ্ডে গ্রীক সাহিত্য আলোচনা করেন এবং তাহার পর আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, পারস্য ও এশিয়ামাইনরের সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টিত হন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। শিক্ষিত ভারতবাসীর স্বদেশসেবা এইরূপ ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রযুক্ত হউক।

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর *

সপ্তম অধ্যায়

টাস্কেজীতে পল্লীপর্য্যবেক্ষণ

এবার হ্যাম্পটনে আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এক সঙ্গে চলিয়াছিল। আমি প্রকৃত-প্রস্তাবে একজন ছাত্র-শিক্ষকভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলাম।

লোহিত 'ইণ্ডিয়ান' ছাত্রদিগের পরিদর্শন আমার হাতে ছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত নৈশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাও আমি করিতাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের উচ্চশিক্ষালাভও চলিতেছিল। আমি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সাহায্যে কতকগুলি নূতন বিষয় শিখিতে লাগিলাম। তাঁহার নাম রেভারেণ্ড ডাক্তার এইচ, বি, ফ্রিসেল। আর্মষ্ট্রঙ্গের মৃত্যুর পর তিনি হ্যাম্পটনের পরিচালক হইয়াছেন।

নৈশবিদ্যালয়ে এক বৎসর "কর্ম্মঠসমিতি"কে পড়াইলাম। দৈবক্রমে তাহার পর আমার একটা অভাবনীয় সুযোগ আসিল। তাহাতেই আমার জীবন-কর্ম্ম আরব্ধ হয়—সেই কাজেই আমি এখনও লাগিয়া আছি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ আমার যখন প্রায় ২২।২৩ বৎসর বয়স সেই সময়কার কথা বলিতেছি। একদিন সন্ধ্যাকালে গির্জ্জার কার্য্য শেষ হইবার পর সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ আমাকে বলিলেন; "দেখ, আমি আলাবামা প্রদেশ হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি। কয়েক জন লোক সেখানে একটা শিক্ষক-বিদ্যালয় খুলিতে চাহেন। এই বিদ্যালয়ে নিগ্রোজাতিরই শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। সম্ভবতঃ টাস্কেজী নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে তাঁহাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের একজন পরিচালক আবশ্যক। তাঁহারা আমার নিকট লোক চাহিয়াছেন।"

আলাবামার পত্রলেখকগণ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য নিগ্রো-জাতীয় শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল সেনাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে একজন শ্বেতকায় লোকেরই নাম করিবেন।

পর দিন সকালে সেনাপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ঐ কাজ লইতে প্রস্তুত আছি কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম "চেষ্টা করিতে পারি।" তিনি আলাবামায় উত্তর দিলেন "আমি একজন নিগ্রোকে পছন্দ করিয়াছি তাহার নাম বুকার ওয়াশিংটন। কোন শ্বেতাঙ্গের সন্ধান আমি দিতে পারিলাম না। যদি এই নিগ্রো যুবককে আপনারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন পত্র-পাঠ লিখিবেন। ইহাকে পাঠাইয়া দিব।"

কয়েক দিন পর আর্মষ্ট্রঙ্গের নিকট একটা তার আসিল। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে রবিবারে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন। কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তিনি তারের খবর ছাত্রদিগকে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল:—"বুকার ওয়াশিংটনের দ্বারা কাজ বেশ চলিবে। শীঘ্রই তাহাকে পাঠাইয়া দিন।"

* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের "আত্মজীবন চরিত" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

বিদ্যালয়ের মধ্যে আনন্দ উৎসব হইল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিয়া আমাকে বিদায়-ভোজ দিলেন। আমি টাস্কেজী যাত্রা করিলাম। পথে কয়েকদিন আমার পল্লী ম্যাল্‌ডেনে কাটাইয়া গেলাম।

আলাবামায় টাস্কেজী একটি ক্ষুদ্র নগর। ইহার লোক সংখ্যা মাত্র ২০০০। তাহার মধ্যে ১০০০ নিগ্রো! দক্ষিণপ্রান্তের "কৃষ্ণ-বিভাগে" এই জনপদ অবস্থিত। আলাবামা-প্রদেশের অনেকগুলি "কাউন্টি" বা জেলা। তাহার কয়েকটিতে নিগ্রোসংখ্যা খুব বেশী। কোন জেলায় শতকরা ৬০, কোন জেলায় শতকরা ৭৫ জন, কোন জেলায় এমন কি শত করা ৯০ জন নিগ্রোর বাস। যে জেলায় টাস্কেজী নগর সেই জেলায় শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই জন্যই বোধ হয় ঐ অঞ্চলকে কৃষ্ণ-বিভাগ বলা হইত।

শুনিয়াছি ঐ অঞ্চলের মাটি কাল বলিয়া উহার নাম কৃষ্ণ-বিভাগ হইয়াছিল। কাল মাটিই উর্ব্বর। এজন্য চাষাবাদের সুবিধা এই সকল স্থানে বেশী। কাজেই এ অঞ্চলে গোলাম খাটাইলে লাভ হইবার আশা যথেষ্ট। এই সকল কারণে গোলামীর যুগে গোলাম-খানা, গোলামাবাদ ইত্যাদি এই বিভাগকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। একে কাল মাটি তাহার উপর কাল লোকের বাস। সুতরাং কৃষ্ণ-বিভাগ নাম শীঘ্রই সমাজে প্রচারিত হইয়া গেল। আমাদের স্বাধীনতালাভের পর হইতে কৃষ্ণ-বিভাগ বলিলে প্রদেশ বিশেষ বুঝায়। আজকাল যে সকল স্থানে নিগ্রোর সংখ্যা বেশী সেই সকল স্থান কৃষ্ণ-বিভাগের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

টাস্কেজীতে পৌছিবার পূর্ব্বে মনে করিয়া-ছিলাম যে, ওখানে বাড়ীঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সকলই বোধ হয় আছে। আমাকে যাইয়াই শিক্ষকতার কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে। আমি পৌছিয়া দেখি কিছুই নাই বাড়ী ঘর আস্‌বাব পত্রত নাইই, এমন কি বিদ্যালয়ের জন্য কোন স্থানও নির্ব্বাচিত হয় নাই। সবই আমাকে নিজ হাতে করিয়া লইতে হইবে। তবে একথা আমি বলিতে বাধ্য যে, এখানে ইট কাঠ, চূণ শুরকি, খাতা-পত্র ইত্যাদি নির্জ্জীব পদার্থ ছিল না সত্য। কিন্তু এই সমুদয় অপেক্ষা সহস্রগুণ মূল্যবান্ এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ ছিল। সে ওখানকার নিগ্রো সন্তানগণের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা, মানুষ হইবার ব্যাকুলতা, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আন্তরিক পিপাসা। তাহাদের বিদ্যালাভের নিমিত্ত আগ্রহ দেখিয়া আমি বুঝিলাম এবং মনে মনে বলিলাম যে "ইহাই বিদ্যালয়, এই ক্ষুধা ও পিপাসাই বিদ্যালয়ের প্রাণ। এই ব্যাকুলতা হইতেই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রাণ হইতেই শরীর আসিবে। সাজসরঞ্জাম বাড়ীঘর আল্‌মারী চেয়ার ইত্যাদির অভাব এই আন্তরিকতাই পূরণ করিয়া লইবে। যেখানে আত্মা আছে সেখানে দেহের অভাব থাকিবে না।"

টাস্কেজী সহরটা নিগ্রো-বিদ্যালয়ের পক্ষে একটি অতি উপযুক্ত স্থান মনে হইল। ইহার চারিদিকেই অনেক গুলি নিগ্রো-পল্লী। স্থানও কিছু নির্জ্জন—বড় রেল রাস্তা হইতে প্রায় ৫৷৬ মাইল দূরে। অথচ তাহার সঙ্গে একটা ছোট রেল লাইনের যোগ ছিল। তাহা ছাড়া আর একটা সুবিধাও দেখিলাম। এই পল্লীর শ্বেতাঙ্গগণ বিদ্যার আদর করিতেন। গোলামীর যুগ হইতে এখন পর্য্যন্ত এখানে শ্বেতাঙ্গেরা একটা বিদ্যালয় চালাইয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং লেখা

পড়ার একটা আবহাওয়া এই অঞ্চলে মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের সৃষ্টি করিত। অধিকন্তু নিগ্রোরাও নিতান্ত দুশ্চরিত্র ছিল না। তাহারা লিখিতে পড়িতে পারিত না বটে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক বিষয়ে তাহারা উন্নত হইয়া ছিল। দুই জাতির মধ্যে সদ্ভাবও মন্দ বুঝিলাম না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সহরে একটা ধাতুর কারখানা ছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন নিগ্রো দুই জনে মিলিয়া ইহার যৌথ মালিক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্বেতাঙ্গ মালিকের মৃত্যুর পর ইহা সর্ব্বাংশে নিগ্রোর সম্পত্তি হয়।

আমি এক বৎসর পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। হ্যাম্পটনের সুনাম এ অঞ্চলে বেশ কাজ করিতে ছিল বুঝিতে পারিলাম। টাস্কেজীর নিগ্রো সমাজ হ্যাম্পটনের আদর্শে এখানে একটি শিক্ষক বিদ্যালয় খুলিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা আলাবামার প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিয়া বার্ষিক ৬০০০৲ পাইবার আশা পাইয়াছেন। রাষ্ট্রের কর্ত্তারা নিয়ম করিয়াছেন যে, এই টাকা হইতে শিক্ষকগণের বেতনাদি দেওয়া যাইবে মাত্র। জমি, বাড়ী আস্‌বাব লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য এই টাকা হইতে কিছু মাত্র খরচ করিতে পারা যাইবে না।

আমাকে পাইয়া নিগ্রোরা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই নানা উপায়ে আমার কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিল।

আমি প্রথমেই স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। একটা জায়গা পাওয়া গেল। সহরের মধ্যে নিগ্রোদিগের একটা ধর্ম্মমন্দির ছিল তাহারই পার্শ্বে একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এই "পোড়ো বাড়ী"-টাতেই বিদ্যালয় খোলা হইল। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদি বা বক্তৃতা ও সম্মিলনের জন্য গির্জ্জাঘরটি ব্যবহার করিতাম।

ঘর দুইটাই অতি জীর্ণ অবস্থায় ছিল। বর্ষাকালে ঘরের ভিতর বৃষ্টির জল চুঁইতে থাকিত। অনেক দিন ছাত্রেরা আমার মাথায় ছাতা ধরিয়া বসিত—আমি ছেলেদের পড়া শুনিতাম। কোন কোন সময়ে আমি যখন খাইতে বসিতাম আমাদের বাড়ীর মালিক আমার মাথায় ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইতেন।

আলাবামার নিগ্রোরা এসময়ে রাষ্ট্রনৈতিক হুজুগে খুব মাতিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা, আমিও তাহাদের আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাদের কার্য্যে সাহায্য করি। তাহারা অন্য জাতীয় লোককে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বেশী বিশ্বাস করিত না। এজন্য তাহারা আমাকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতে বড় পীড়াপীড়ি করিল। এক বৃদ্ধ আসিয়া আমার কাণে প্রায়ই জপিত—"ভায়া, তুমি এবার কাহাকে ভোট দিবে স্থির করিয়াছ? আমার ইচ্ছা আমরা যাঁহাকে দিব মনে করিয়াছি তাঁহাকেই তুমিও দিও। অনুরোধটা রাখিবে কি? আমরা কাগজ পত্র পড়িতে জানি না জানইত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমরা ভোট দিতে শিখিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা তুমিও আমাদের মতানুসারেই ভোট দাও।" আর একজন বলিল, "আমরা কেমন করিয়া ভোট দিয়া থাকি জান? সাদা চামড়া ওয়ালারা কি করে আগে দেখি। দূরে দূরে থাকিয়া খবর লই তাহারা কাহাকে ভোট দিল। যখন আমাদের ভোট দিবার পালা আসে আমরা চোখ কাণ বুঁজিয়া ঠিক তাহাদের উল্টা করি। কি বল, ভায়া, আমরা মন্দ করি কি?"

এই ছিল বিশ বৎসর আগেকার নিগ্রো রাজনীতি, আজ আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ মনোভাব আমাদের সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমরা এখন কর্ত্তব্য বুঝিয়াই কাজ করিয়া থাকি। শ্বেতাঙ্গ যাহা করে কৃষ্ণাঙ্গের ঠিক তাহার বিপরীত করা উচিত—এরূপ ভাবনা আমাদের নিগ্রো মহলে অনেকটা কমিয়াছে।

১৮৮১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি টাস্কেজীতে পৌছি। প্রথম মাসেই আমি বিদ্যালয়ের জন্য স্থান বাছিয়া লইলাম এবং আলাবামাপ্রদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিলাম। লোক জনের আর্থিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা সবই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে যত্ন লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে জেলাগুলির ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে টাস্কেজী বিদ্যালয়ের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইলাম। অভিভাবকগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া ছাত্র সংগ্রহেও নিযুক্ত রহিলাম!

আমি অধিকাংশ সময়টা পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া কাটাইতাম। একটা গরুর গাড়ীতে অথবা একটা খচ্চরে চড়িয়া আমার এই 'সফর' হইত। দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। তাহাদের সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া এবং সুখ দুঃখের গল্প চলিত। তাহাদের বাগান আবাদ পাঠশালা মন্দির ইত্যাদি সবই দেখিতাম। অবশ্য তাহাদিগকে আগে কোন খবর পাঠাইতাম না। হঠাৎ যে গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইতাম তাহার কোন গৃহস্থের ঘরে অতিথি হইয়া পড়িতাম। এ জন্য তাহারা আমাকে আদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার সুযোগ পাইত না। ইহাতে আমার লাভই হইত। কারণ এই উপায়ে তাহাদের স্বাভাবিক "আটপৌরে" চাল চলন বেশ ভাল রকম বুঝিতে পারিতাম।

এইরূপে আলাবামাপ্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া নিগ্রোসমাজের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থাই আমি জানিতে পারিলাম। আমি শেষে এই অঞ্চলের জেলা, নগর, গ্রাম, রাস্তাঘাট, অলিগলি ইত্যাদি আমার নখদর্পণে দেখিতে পাইতাম।

নিগ্রো সমাজে দারিদ্র্যের প্রকোপ অত্যধিক দেখিলাম। তাহাদের বাড়ীঘর ছিলই না বলিলে অন্যায় হইবে না। একটা ছোট কামরার মধ্যে সমস্ত পরিবার শুইয়া থাকিত। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব অতিথি সকলেরই সেই কামরায় স্থান হইত। আমাকে এইরূপ সকলের সঙ্গে একই কামরায় এবং এমন কি একই বিছানায় বহু রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে। স্নানের সুবিধা প্রায় কোন বাড়ীতেই থাকিত না। এমন কি মুখ হাত ধুইবারও জায়গা ছিল না। তবে ঘরের বাহিরে উঠানের কোন স্থানে হাত পা ধুইবার জন্য জল রাখা হইত।

রুটি ও শূকরের মাংস প্রধান খাদ্য ছিল। রুটি ও ডাল ছাড়া অনেক পরিবারে আর কোন খাদ্য জুটিত না। নিকটবর্ত্তী কোন সহরের দোকান হইতে পল্লীবাসীরা বেশী দামে মাংস ও রুটি ইত্যাদি কিনিয়া আনিত। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, তাহারা নিজে জমি চষিয়া শাকশব্জী ফলমূল ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া লইতে চেষ্টা করিত না। এমন কি, এ বিষয়ে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না। দুনিয়ায় যাহা কিছু কিনিতে পাওয়া যায় তাহার সমস্তই যে ঘরের সম্মুখবর্ত্তী জমিতে উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে এ কথা তাহারা ভাবিতে পারিত না। সহর হইতে

মামুলি ডাল, আটা ও মাংস বেশী পয়সায় কিনিয়া আনিতেও তাহারা প্রস্তুত। অথচ অল্প ব্যয়ে সুখে খাইবার পরিবার সুযোগ যে তাহাদের বাড়ীতেই রহিয়াছে তাহা এই সকল পল্লীর অধিবাসীরা জানিতই না! ঘরে তাহারা শস্য যে একেবারে বুনিতই না—তাহা নয়। তাহারা কেবলমাত্র তুলার চাষই করিতে শিখিয়াছিল। এদিকে তাহারা এতই মজিয়াছিল যে, ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত তাহাদের তুলার ক্ষেত আসিয়া পৌছিত। তথাপি দুই চারি হাত জমি স্বতন্ত্র করিয়া দৈনিক আহারের জন্য ফসল তৈয়ারী করিতে তাহারা যত্ন লইত না।

দুঃখের কথা আর কি বলিব? এই সকল দরিদ্রের কুটীরে অনেক স্থলে আমি মহামূল্য শেলাইয়ের কলও দেখিয়াছি। প্রায় ২০০৲ দিয়া কল কেনা হইয়াছে কিন্তু ব্যবহার করিবার যোগ্যতা খুব কম লোকেরই দেখিতে পাইতাম। মাস মাস আংশিকভাবে ৫৲ বা ১০৲ করিয়া তাহারা অতি কষ্টে কলের দাম শোধ করিত কিন্তু কল ঘরের এক কোণে পড়িয়াই থাকিত। আবার সৌখীন ঘড়িও অনেক পরিবারের আস্‌বাবের মধ্যে দেখিতাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি—এই সকল ঘড়ির মূল্য প্রায় ৫০৲! এ দিকে ত এত সভ্যতা, বিলাস ও বাবুগিরির লক্ষণ। কিন্তু সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিয়মই তাহারা শিখে নাই। তাহারা খাইতেই জানিত না। আমি এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। তাহার ঘরে ঐ সকল হাল ফ্যাশনের আস্‌বাব পত্র কিছু কিছু ছিল। কিন্তু খাইতে বসিয়া দেখি—একটা টেবিলে আমরা পাঁচ জন খাইতেছি অথচ একটি মাত্র চামচ! এবং একটি মাত্র কাঁটা! ঐ একটির দ্বারাই পাঁচ জনের কাজ চালাইতে হইল! অথচ সেই কামরারই এক কোণে একটা প্রকাণ্ড টেবিল হারমনিয়াম শোভা পাইতেছে। তাহার মূল্য ২০০৲। দেখিয়া অবাক্ হইলাম আর ভাবিলাম ইহাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই! 'অর্গ্যান' বাজাইয়া সভ্য হইতে শিখিয়াছে—অথচ এখনও আহারের নিয়মই জানে না।

অবশ্য বলা বাহুল্য প্রায়ই দেখিতাম মালিকেরা কেহই অর্গ্যান বাজাইতে জানে না। ঘড়ি দেখিয়া সময় বলিবার বিদ্যা কাহারও নাই। ঘড়ি মেরামত করা ত দূরের কথা, কাঁটা চালাইয়া সময় ঠিক রাখিতেও কেহ জানিত না। ব্যবহারাভাবে উহার চাবি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর শেলাইয়ের কলও যত্নাভাবে এবং লোকাভাবে ধ্বংসের পথে যাইতেছে। অথচ অত দামী জিনিষের মূল্য একবারে দিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তখনও মাসিক ৫।৭৲ হিসাবে দাম শোধ করা হইতেছে!

এক বাড়ীতে আমি পরিবারের সকলের সঙ্গে টেবিলে খাইতে বসিলাম। তাহারা যে টেবিলে খাইতে শিখিয়াছে আমার বিশ্বাস হইল না। অতটা সৌন্দর্য্য জ্ঞান তাহাদের জন্মে নাই। অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি একজন ভদ্রলোক তাহাদের গৃহে অতিথি হইয়াছি, কাজেই আমার খাতিরে তাহারা টেবিলে খানা পরিবেষণের আয়োজন করিয়াছে।

সাধারণতঃ তাহাদের ভোজন-ব্যাপার নিতান্তই পশুজনোচিত। ঘুম হইতে উঠিয়া নিগ্রোরমণী উননে কড়া চাপাইয়া দেয় তাহাতে মাংস, ডাল, যাহা হউক ভাজা হইতে থাকে। দশমিনিট পরেই উহা নামাইয়া

লওয়া হয়। খানা প্রস্তুত হইয়া গেল ! বাড়ীর কর্ত্তা কাজে বাহির হইবার সময়ে হাতে একটা রুটি আর কিছু তরকারী লইয়া যায়। পথে খাইতে খাইতে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। স্ত্রী ঘরের এক কোণে বসিয়া হয়ত খাইতে থাকে অথবা উননের কড়া হইতেও খানিকটা মুখে দিয়া চিবাইতে থাকে। আর ছেলেপিলেরা উঠানে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে রুটি ও মাংস যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে। অবশ্য ছেলেদের কপালে মাংস প্রায়ই জুটিত না। মাংসের দাম খুব বেশী।

সকালবেলার খাওয়া এইরূপে সমাপ্ত হইত। পরমুহূর্ত্তে সকলে সপরিবারে তুলার ক্ষেতে হাজির। ছেলে বুড়া কেহই বাড়ীতে থাকিত না। সকলকেই যে যেমন পারে খাটিতে হইত। খোকা পর্য্যন্ত মাঠে যাইত। তুলার বস্তার পাশে তাহাকে বসাইয়া রাখা হইত। মা কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া আসিত। মধ্যাহ্ন ভোজন এবং নৈশভোজন ব্যাপারও সকালবেলার আহারেরই মত ছিল।

তাহাদের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি এইরূপ। শনিবার ও রবিবারের জীবনযাপন প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। শনিবার নিগ্রোরা সপরিবারে সহরে আসিত। সমস্ত দিনটাই প্রায় সহরে কাটাইত। সহরে যাইত 'বাজার করিতে'! অথচ তাহাদের যা অবস্থা তাহাতে দশ মিনিটের বেশী বাজার করিবার জন্য কোন মতেই লাগিতে পারে না। আর একজন লোক গেলেই চলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না। সমস্ত পরিবারই বাজারে যাইবে! ৮।১০ ঘণ্টা সহরে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিত। দিনটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। মেয়ে পুরুষ জায়গায় জায়গায় জটলা করিয়া নাকে নস্যি গুঁজিত অথবা ধূমপান করিত। এই গেল শনিবারের পালা।

রবিবার তাহারা একটা বড় সভা করিত। সেই সভায় খোসগল্প বেশ চলিত।

তাহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিতাম। প্রায় জেলারই পল্লীবাসীরা ঋণগ্রস্ত। শস্য যাহা উৎপন্ন হইত সমস্তই পূর্ব্ব হইতে পাওনাদারদিগের নিকট 'বন্ধকি' থাকিত।

পাঠশালা গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছি সত্য কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্র তাহাদের জন্য বাড়ী ঘর জায়গা জমির কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কোন গির্জ্জাঘরে অথবা মামুলি কাঠের কুঠরীতে স্কুল বসিত। শীতকালে ঘরগুলি গরম রাখিবার কোন বন্দোবস্তই ছিল না। ছেলে ও মাষ্টারেরা বড় কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিত। উঠানের এক স্থানে কাঠের আগুন জালান হইত। আগুন পোহাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্র ও শিক্ষকেরা প্রয়োজন মত বাহিরে আসিত। এদিকে শিক্ষকদের যেমন বিদ্যা তেমন চরিত্র।

পাঁচ মাস করিয়া বৎসরে স্কুল খোলা থাকিত। একটা চৌঁথা কাল বোর্ড ছাড়া বিদ্যালয়ের আস্‌বাব কিছুই কোথায়ও দেখি নাই। পুস্তকাদি সাজসরঞ্জাম ছিল না। একবার একটা 'পোড়ো' কাঠের কামরায় ঢুকিয়া দেখি—পাচজন ছাত্র জড়াজড়ি করিয়া একখানা বই পড়িতেছে! প্রথম দুইজন সম্মুখে বসিয়া পুস্তকখানা ধরিয়া আছে। ইহাদের পশ্চাতে আর দুইজন দাঁড়াইয়া প্রথম দুইজনের ঘাড়ের উপর দিয়া দেখিতেছে। এই চারিজনের পশ্চাতে একটি ছেলে উঁকি মারিয়া, যাহা হয়, পড়া বুঝিতেছে।

বিদ্যালয়ের যেরূপ অবস্থা ধর্ম্মমন্দিরগুলির অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল নয়। গির্জ্জাঘরগুলি জীর্ণশীর্ণ। ধর্ম্মপ্রচারকগণও বিদ্যায় এবং চরিত্রে শিক্ষক মহাশয়গণেরই অনুরূপ।

আলাবামা প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি কয়েকটি লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তাহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় নিগ্রোজাতির চিন্তার ধারা বুঝিতে পারিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাহাতেই আপনারা বুঝিবেন ইহাদের মনের গতি কিরূপ ছিল। একজনকে আমি তাহার বংশ কথা ও পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার বয়স ৬০ বৎসর। সে বলিল তাহার জন্ম ভার্জ্জিনিয়ায়। ১৮৪৫ সালে সে বিক্রি হইয়া আলাবামায় আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার সঙ্গে কয়জন বিক্রি হইয়া আলাবামা প্রদেশে আসিয়াছিল?" "সে বলিল" "আমরা সর্ব্বসমেত পাচজন ছিলাম—আমি, আমার ভাই এবং তিনটি খচ্চর।"

জানোয়ার ও মানুষ যে একই শ্রেণীর অন্তর্গত নয় এই বৃদ্ধ গোলামের চিন্তায় তাহা আসিত না। প্রকৃতপক্ষে গোলামী করিতে করিতে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদই থাকে না। মনিবেরাও মানুষে এবং পশুতে কোন প্রভেদ রাখেন না। পশুও যেমন তাঁহার সম্পত্তি, গোলামও তাঁহার ঠিক সেইরূপই সম্পত্তি বিশেষ।

অষ্টম অধ্যায়

আস্তাবলে বিদ্যালয়

আলাবামা প্রদেশের পল্লী-সমাজগুলি দেখিয়া আমার কার্য্যের দায়িত্ব বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে একাকী, অথচ সমাজের সর্ব্বত্রই অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। এই সমুদয় নিবারণ করা কি একজনের পক্ষে সম্ভবপর? আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমি অসাধ্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছি।

নিগ্রো-পল্লীগুলির মধ্যে একমাস কাল ছিলাম। তাহাতে আমার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত লাভ করিলাম। মোটের উপরে বুঝিয়া লইলাম যে, নিউইংলণ্ড অঞ্চলের ইয়াঙ্কি মহলে যে নিয়মে বিদ্যাদান করা হইয়া থাকে, এ অঞ্চলে ঠিক সেই নিয়মে শিক্ষাবিস্তার করিলে সুফল পাওয়া যাইবে না। এখানে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পঠনপাঠনের রীতি চালান আবশ্যক। আমি ভাবিলাম যে, বোধ হয় সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ হাম্পটন বিদ্যালয়ের জন্য যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন টাস্কেজীর বিদ্যালয়ে সেই নিয়ম প্রয়োগ করা চলিতে পারে। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে নিগ্রোদিগের উপকার করা হইবে না। নিগ্রো বালকের সমগ্রজীবনই তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

১৮৮১ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে সেই পোড়ো বাড়ীতে স্কুল খুলিলাম। কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ খুব উৎসাহের সহিত আমার কার্য্যে সাহায্য করিল। শ্বেতাঙ্গ সমাজের অনেকেই আমার উপর বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা

নিগ্রোমহলে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী। তাঁহাদের বিশ্বাস নিগ্রোরা লেখা পড়া শিখিলে ক্ষেতের জন্য কুলী পাওয়া যাইবে না—গৃহস্থালীর জন্য চাকর জুটিবে না। নিগ্রোরা আর শারীরিক পরিশ্রম করিতে অস্বীকার করিবে—তাহাদের মধ্যে বিলাস ও বাবুগিরি প্রবেশ করিবে। ফলতঃ দেশময় আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

শ্বেতাঙ্গদের এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও ছিল। এতদিন যে সকল নিগ্রো লেখা পড়া শিখিয়াছে তাহারা সকলেই বাবু! আজ কাল মাথায় লম্বা টুপি, চোখে সোণার চস্‌মা, হাতে গিল্টি করা ছড়ি, পায়ে সৌখীন বুট—ইত্যাদি আমাদের "শিক্ষিত" নিগ্রোর লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আরও শিক্ষার প্রসার হইলে নিগ্রোরা যে ক্রমশঃ কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার হইয়া পড়িবে এরূপ সন্দেহ করা অন্যায় নহে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ বদলান যায়, এবং আদর্শ বদলাইতে পারিলে শিক্ষিত লোকের মতি গতি, ভাব ভঙ্গী ইত্যাদিও বদলান যায়। যথার্থ শিক্ষাপ্রচার করিতে পারিলে প্রকৃত 'মানুষ'ই গড়িয়া তোলা সম্ভব। এই শ্বেতাঙ্গগণ তাহা বুঝিতেন না। এজন্য তাঁহারা আমার কর্ম্মের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইলেন।

যাহা হউক, টাস্কেজীতে শিক্ষাপ্রচার-কর্ম্মে আমার দুইজন বন্ধু মিলিয়াছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ, আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ। ইহাঁরাই সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গকে লোকের জন্য লিখিয়াছিলেন। ইহাঁরা বিগত বিশবৎসর ধরিয়া আমার কার্য্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির নাম জর্জ্জ ক্যাম্পবেল। ইনি পূর্ব্বে অনেক ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন। এক্ষণে ইনি একজন বড় সওদাগর। শিক্ষাপরিচালনা সম্বন্ধে ইহাঁর অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির নাম লুইস য়্যাডাম্‌স্‌। ইনি পূর্ব্বে গোলামী করিয়াছেন, এক্ষণে চামড়ার কাজ ও লোহা পিত্তল দস্তার কাজ করিয়া অন্ন সংস্থান করেন। গোলামীর যুগে ইনি জুতা তৈয়ারী, জুতা মেরামত, ঘোড়ার লাগাম তৈয়ারী, এবং কর্ম্মকার ও সূত্রধরের কার্য্য ইত্যাদি নানাবিধ কারিগরি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কোনদিন বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন নাই কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সামান্যরকমের কেতাবী শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

বুঝিলাম, এই দুই ব্যক্তির জীবনে কর্ম্মেরই প্রাধান্য। ইহাঁরা কতকটা "আটপীঠে" কর্ম্মঠ ও 'করিতকর্ম্মা' লোক। কাজেই আমার শিক্ষাপ্রণালী ইহাঁরা খুবই পছন্দ করিলেন।

এইসঙ্গে একটা কথা অবান্তরভাবে বলিতে চাহি। য়্যাডাম্‌সের বিচক্ষণতা এবং চিন্তাশীলতা দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। চিরজীবন শৃঙ্খলার সহিত শিল্পে, কৃষিকার্য্যে অথবা ব্যবসায়ে লাগিয়া থাকিলে বুদ্ধিশক্তি যথেষ্ট মার্জ্জিত হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আপনা আপনি বাড়িতে থাকে। গ্রন্থপাঠ না করিয়াও সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার যোগ্যতা জন্মে। আমার নিগ্রো বন্ধু য়্যাডাম্‌স্‌ এই কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি গোলামীর যুগে শিল্পকর্ম্মে জীবনযাপন করিয়া উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গোলামীযুগের শিক্ষা বাস্তবিক পক্ষে এই উপায়ে অনেক লোককে কর্ম্মঠ ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিয়াছে। গোলামীর এই সুফল উল্লেখ করা আমি অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। এমন কি, আমি এরূপও বলিতে চাহি যে,

আজকাল দক্ষিণ অঞ্চলের লোক-সমাজে কর্ম্মক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের মধ্যে নিগ্রোদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। নিগ্রোদের এরূপ চিন্তাশীলতার কারণ গোলামীযুগের কৃষিকর্ম্মে অথবা শিল্পকার্য্যে অভ্যাস।

ত্রিশজন ছাত্র লইয়া পাঠশালা খোলা হইল। আমিই একমাত্র শিক্ষক। ছাত্রদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ দুই-ই প্রায় সমান ভাবে ছিল। ইহারা সকলেই টাস্কেজীর সমীপবর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসী। আরও অনেক ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চাহিল। কিন্তু আমরা নিতান্ত শিশু ছাত্র গ্রহণ করিলাম না। পনরবৎসর বয়সের কম কোন ছাত্র আমরা লই নাই। যাহারা পূর্ব্বে কিছু শিক্ষা পাইয়াছে এবং শিক্ষকতার কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

আমরা যে সকল ছাত্র গ্রহণ করিলাম তাহারা অনেকেই ৪০ বৎসরের হইবে। তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রও আসিয়াছিল। দেখিতাম, অনেক ছাত্র তাহাদের শিক্ষকগণ অপেক্ষা বেশীই জানে। বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে এই শিক্ষক ও ছাত্রগণের মামুলি ধারণাই ছিল। তাহারা বড় বড় বই পড়িয়াছে—খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। লম্বা চৌড়া নামওয়ালা বিষয়ের নাম করিতে পারিলেই তাহারা খুসী হয়। তাহারা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানের অধিকারী। তাহারা এই সকল 'বড় কথা'র জাহির করিয়া বেড়াইতে অত্যধিক লালায়িত।

বিদেশীয় ভাষা শিখিবার ইচ্ছাটা নিগ্রো-সমাজে একটা নেশায় পরিণত হইয়াছিল। আমি আলাবামা প্রদেশে পল্লীপর্য্যবেক্ষণকালে দেখিতে পাই যে, একটি যুবক অতি কদর্য্য ঘরে অপরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিয়া বসিয়া আছে, অথচ তাহার হাতে একখানা ফরাসী ভাষার ব্যাকরণ-গ্রন্থ।

আমার এই প্রথম ছাত্রদিগের পুঁথিগত বিদ্যার বড়াই দেখিয়া সত্যসত্যই লজ্জিত হইতাম। তাহারা ব্যাকরণের লম্বা লম্বা সূত্র আওড়াইয়া মনে করিত তাহারা কতবড়ই না পণ্ডিত। অথচ ভাষাজ্ঞান তাহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। অনেকে গণিতের ফর্ম্মুলাগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে—সুদকষা, ডিস্কাউণ্ট, ষ্টক সব বিষয়েরই সূত্রগুলি তোতাপাখীর মত বলিতে শিখিয়াছে। অথচ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে চোখে দেখে নাই—এমন কি নামও শুনে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের খাতাপত্র কেমন করিয়া লিখিতে হয় তাহা জানে না। টাকা পয়সার হিসাব রাখিবার নিয়ম কখনই দেখে নাই। বলা বাহুল্য তাহারা সংসারের কাজকর্ম্মের মধ্যে গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাজেই অঙ্কে তাহাদের মাথা একেবারেই খোলে নাই।

যাহা হউক এজন্য ইহাদিগকে দোষ দিয়া লাভ নাই। তাহারা যে নিয়মে শিখিয়াছে তাহার ফল আর কত ভাল হইতে পারে? তবে তাহাদের আন্তরিকতা, শিখিবার ইচ্ছা, মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায়ই বর্ত্তমান ছিল। এ জন্যই আমি হতাশ হইতাম না।

তাহারা যে বই মুখস্থ করিয়া এবং কতকগুলি সূত্র ও শব্দ আওড়াইতে আওড়াইতে নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাহাদের সাংসারিক জ্ঞান একেবারেই জন্মে নাই। একজন ছাত্র মানচিত্রের কোন্ স্থানে আফ্রিকার শাহারা মরুভূমি অবস্থিত বিনা ক্লেশেই দেখাইয়া

দিল। এমন কি চীন দেশের রাজধানী পর্য্যন্ত সেই মানচিত্রের মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিল। কিন্তু জমির উত্তর দক্ষিণ ভাল করিয়া নির্দ্দেশ করিতে সে শিখে নাই। টেবিলে খাইতে বসিয়া দেখি কোন্ দিকে বাটি কোন্ দিকে গ্লাস রাখিতে হয় তাহার ইহা জানা নাই! কেতাবী শিক্ষার ফলে সত্যসত্যই তাহারা নিরেট মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে।

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে ৫০ জন ছাত্র হইয়া গেল। সপ্তাহ ছয়েক পরে আমি আমার কর্ম্মে একজন নূতন সহায়ক পাইলাম। শ্রীমতী ওলিভিয়া ডেভিড্‌সন নামে একজন শিক্ষিতা রমণী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষা ও সেবাকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা ছিল। নিগ্রো-সমাজের নানা স্থানে তিনি ইতিপূর্ব্বে শিক্ষাবিস্তার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। জাতিতে তিনি নিগ্রো।

নানা স্থানে বসবাসের ফলে এবং নানা কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া তিনি বিদ্যাদানের অনেক নূতন নূতন প্রণালীর পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় সর্ব্বদা কর্ম্মের নব নব উপায় আসিত। তাঁহার উদ্ভাবিত কার্য্যপ্রণালীর সাহায্যে আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

তিনিও আমারই মত পুঁথি বিদ্যার আদর করিতেন না। আমরা দুই জনে দেখিলাম, আমাদের ছাত্রেরা লেখাপড়ায় মন্দ ফল দেখাইতেছে না। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরপালন ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা কোন যত্নই লয় না। তাহাদের গৃহে এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা নাই। কাজেই বিদ্যালয়েও তাহারা অপরিষ্কার ভাবেই থাকিত। আমরা বুঝিলাম —ইহাদের মধ্যে কেতাবী শিক্ষা বেশী প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা স্থির করিলাম—প্রথমতঃ ইহাদের শরীর গঠন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দাঁতমাজা, হাত পা ধোয়া, কাপড় পরিষ্কার করা, খাওয়া পরা, ঘর ঝাড়া ইত্যাদি বিষয় ইহাদিগকে প্রথমেই শিখান আবশ্যক। গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ইহাদিগের স্বাস্থ্যজ্ঞান ও সাংসারিক জ্ঞান জন্মিতে পারিবে। তাহার পর এক আধটা অন্নসংস্থানের উপায়ও ইহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কেবল দেখান নহে—হাতে কলমে শিখান আবশ্যক। তাহা হইলে ভবিষ্যতের খাওয়া পরার সংস্থানও হইতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে কম খরচে ও কম সময়ে বেশী কাজ করিবার চেষ্টা, পরিশ্রমের উপকারিতা, সময়নিষ্ঠা ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণেরও ইহারা অধিকারী হইতে পারিবে।

আমরা দেখিলাম ইহাদের পল্লীতে কৃষিকার্য্যই অন্নসংস্থানের প্রধান উপায়। শতকরা প্রায় ৮৫ জন নিগ্রো চাষাবাদের উপর বাঁচিয়া থাকে। কাজেই আমরা চাষাবাদের উপযোগী করিয়া আমাদের ছাত্রগণের জন্য বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টিত হইলাম। যাহাতে তাহারা সহরে বাবু না হইয়া পড়ে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলাম। লেখাপড়া শিখিবার পর যেন তাহারা আবার জমি চষিতে পারে এবং পশুপালন করিতে প্রবৃত্ত হয়—এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই আমরা শিক্ষার প্রণালী স্থির করিতে লাগিলাম। তাহারা বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়ও হইতে পারিবে—অথচ কৃষিকর্ম্মেও লজ্জা বোধ করিবে না—এই আদর্শে আমরা টাস্কেজী বিদ্যালয়ের নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

এক কথায়, অর্দ্ধশিক্ষিত কুশিক্ষিত এবং চরিত্রহীন বাবু-সমাজের পরিবর্ত্তে আমরা সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ চাষী ও শিল্পীর পরিবার গঠন করিবার জন্য সকল উদ্যোগ করিতে প্রয়াসী হইলাম। আমরা স্থির করিলাম গ্রন্থপাঠকে অতি নিম্ন স্থানে রাখিব। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা সংসারের কাজকর্ম্মের সাহায্যেই নিগ্রোপুরুষ ও রমণীগণকে গড়িয়া তুলিব। এই নূতন শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু কার্য্য উদ্ধার করা যায় কি করিয়া? আমাদের স্থানাভাব ত যথেষ্ট। কয়েকজন নিগ্রো অনুগ্রহ করিয়া বিনাপয়সায় সেই পোড়ো বাড়ীটা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন এই যা রক্ষা। ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল। ইহারাই ত আমাদের নূতন আদর্শ পল্লীতে লইয়া যাইয়া ভবিষ্যতের পল্লীসেবক, পল্লী শিক্ষক, ও পল্লী-সংস্কারক হইবে। এই ছাত্রগণই ত আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়া সমাজে সকল প্রকার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও বীজ বপন করিবে। কিন্তু ইহাদিগকে এখন স্থান দিই কোথায়?

তিন মাস আমাদের বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিল। প্রতিদিনই সকল দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। আলাবামার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে কত ছাত্র আসিতে চাহিল। বুঝিতাম আমাদের নামও প্রদেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই সময়ে একটা জমির সন্ধান পাওয়া গেল। টাস্কেজীর প্রায় দেড়মাইল দূরে একটা পুরাতন গোলামাবাদ বিক্রী হইবে জানিতে পারিলাম। মূল্য ১৫০০৲। জমির মালিক আমাদের নিকট দুই কিস্তীতে টাকা লইবেন। একে জমিটা সস্তা তাহার উপর এই অনুগ্রহ। কিন্তু হাতে যে আমাদের এক পয়সাও নাই—৭৫০৲ প্রথমেই দিব কিরূপে? বিপদ বুঝিয়া হ্যাম্পটনের ধনরক্ষক মার্শ্যালের নিকট ধার চাহিলাম। তিনি লিখিলেন "হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে টাকা ধার দিবার নিয়ম নাই। তবে আমি আমার নিজের ৭৫০৲ পাঠাইলাম।"

৭৫০৲ পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি এক সঙ্গে ২০০।৩০০৲ টাকাও দেখি নাই! জমিটা কেনা হইয়া গেল। একবৎসরের মধ্যে বাকি ৭৫০৲ দিব স্বীকার করিলাম।

নূতন স্থানে স্কুল উঠাইয়া লওয়া হইল। জমিতে সর্ব্বসমেত চারিটা পুরাতন ঘর ছিল। গোলামীর যুগে যখন বড় সাহেব এই কুঠিতে থাকিতেন তখন ইহাদের একটা ঘরে রান্না হইত ও একটা খাবার ঘর ছিল। আর দুইটায় ঘোড়া ও মুরগী থাকিত। কয়েক দিনের মধ্যে কুঠরীগুলি মেরামত ও পরিষ্কার করিয়া লইলাম। আস্তাবল ও মুরগীশালায় ক্লাশ বসিতে লাগিল।

আস্তাবলেই প্রথমে কাজ চলিতেছিল। পরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া যায়। এজন্য মুরগীখানায়ও ছাত্রদের জন্য 'ক্লাশ' খুলিতে হইয়াছিল। একদিন সকালে একজন নিগ্রোকে বলিলাম, "মুরগীশালাটা পরিষ্কার করা আবশ্যক। আমাদের ছেলে বাড়িয়াছে। ঐ ঘরটায় নূতন ক্লাশ বসিবে।" সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "কি বলেন মহাশয়, আপনি দিবাভাগে লোক জনের সম্মুখে ঐ ঘর পরিষ্কার করিবেন? সকলে নিন্দা করিবে যে?" চক্ষুলজ্জা এবং লোকনিন্দার ভয় নিগ্রোসমাজে এতদূর পৌঁছিয়াছিল।

এই নূতন স্থানে ও নূতন গৃহে স্কুল বসান

কাজটার মধ্যে কতকটা বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। আমরা একজনও বাহিরের কুলী এজন্য নিযুক্ত করি নাই। আমরা নিজেই স্বহস্তে সূত্রধরের কর্ম্ম, কর্ম্মকারের কার্য্য, ঝাড়ুদারের কাজ, ইত্যাদি করিয়াছিলাম। বিকালে স্কুলের ছুটির পর ছাত্রেরা এই সকল কার্য্যে সাহায্য করিত। মেরামত করা, পরিষ্কার করা, ধোয়া, ঝাড়া, যথাস্থানে সাজান—সকলই আমরা সমবেত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

যখন এই আস্তাবলে ও মুরগীশালায় স্কুল বেশ নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল তখন আমাদের জমির সম্মুখের খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া লইলাম। ইহাতে শাকশব্জী, ফুল ফল ইত্যাদি বুনিবার জন্য ইচ্ছা ছিল। ছাত্রেরা এ কাজ করিতে প্রথম প্রথম বেশী রাজি হইত না। তাহারা মাটি কোদলাইতে অপমান ও লজ্জা বোধ করিত। লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া কোদাল ধরিতে হইবে—স্বপ্নেও তাহারা পূর্ব্বে ভাবে নাই। লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে মাটি কাটার সম্বন্ধই বা কি—তাহারা বুঝিত না। তাহারা মনে করিত তাহাদিগকে মজুরের কাজ করাইয়া লইয়া স্কুলের পয়সা বাঁচান হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা এরূপ নিন্দাকর ও অপমানজনক কাজে একেবারেই নারাজ। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল—সময় বৃথা নষ্ট করা হইতেছে মাত্র।

কিন্তু আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আমি লোক লাগাইয়া জমি পরিষ্কার করিব না। আমার সুচিন্তিত শিক্ষাপ্রণালী কোন মতেই অর্জ্জন করিব না। শারীরিক পরিশ্রম করা আমার মতে উচ্চ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। যাহারা হাতে পায়ে খাটিয়া কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহারা আমার বিবেচনায় অশিক্ষিত, এমন কি কুশিক্ষিত। আমি সকল ছাত্রকেই এই নূতন শিক্ষার আদর্শ বুঝাইতে লাগিলাম। কথায় বেশী উপকার হইল না। আমি নিজে একাকী মাটি কাটিতে আরম্ভ করিলাম। জমি অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহাদের সাহায্য না লইয়াই বিদ্যালয়ের চারি পাশ যথেষ্ট সুন্দর করিয়া ফেলিলাম। ছাত্রেরা দেখিল আমার অপমান কিছুই হইতেছে না। ক্রমশঃ তাহারাও আমার কাজে সাহায্য করিতে আসিল। এইরূপে ৬০ বিঘা জমি সকলে মিলিয়া চষিয়া ফেলিলাম।

এদিকে শ্রীমতী ডেভিড্‌সন জমির দাম শোধ করিবার জন্য নানা কৌশলে টাকা তুলিতে থাকিলেন। তিনি আমাদের বিদ্যালয়ে কএকটা প্রদর্শনী বা মেলা খুলিলেন। এজন্য কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ দুই মহলেই তিনি সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মেলার উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। টাস্কেজীর লোকেরা কেহ কিছু আলু, কেহ কয়েকটা রুটি, কেহ কোন ফল ইত্যাদি দান করিলেন। এইগুলি বেচিয়া পয়সা আসিল। এইরূপ গোটাকয়েক মেলার ফলে টাকা মন্দ জমা হইল না।

তাহার পর নগদ টাকার জন্যও চাঁদার খাতা খোলা গেল। কোন নিগ্রো দশ পয়সা, কেহ বা চৌদ্দ পয়সা দান করিতে লাগিল। কেহ একটা রুমাল, কেহ বা খানিকটা চিনি, কেহ বা একখানা সতরঞ্চি দান করিল। একদিন এক বুড়ী ছেঁড়া কিন্তু পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমাদের স্কুলে হাজির হইল। সে বলিতে লাগিল,

"মহাশয়, আপনি ও ডেভিড্‌সন যে কাজ করিতেছেন তাহার জন্য ভগবান্ আপনাদিগকে সাহায্য করুন। নিগ্রোজাতিকে তুলিবার জন্য আপনারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনাদের ধন্য! আর আমিও ধন্য যে এতকাল গোলামী করিবার পর আপনাদের ন্যায় নিঃস্বার্থ সমাজসেবকদিগকে দেখিয়া মরিতে পারিলাম। আপনাদের ন্যায় কর্ম্মবীর যখন তন্ময় হইয়া সমাজ-সেবায় লাগিয়াছেন, তখন নিগ্রোজাতি অতি সত্বরই জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। আজ আমার জীবনের অন্তিম দশায় সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি।" এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তাহার পর সে আবার বলিল, "দেখুন, আমি নিতান্ত দরিদ্র। কাঁচা পয়সা আমি চোখে দেখিতে পাই না। আপনারা পাঠশালার জন্য চাঁদা চাহিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে আমার ক্ষুদ্র জীবনের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই ছয়টি ডিম দান করিতেছি। আশা করি, এইগুলি বেচিয়া আপনারা কাজ চালাইতে পারিবেন।"

এইরূপ মুষ্টি ভিক্ষার ফলে আলু, চিনি, কম্বল, জামা, ডিম, ইত্যাদি পাইতাম। পরে, সেইগুলি বাজারে বেচিয়া টাস্কেজীর ধনভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এই উপায়ে সরিষা কুড়াইয়া বেল তৈয়ারী করিতে প্রয়াসী হইলাম। বৃহৎ ব্যাপারেও খুদ কণার সাহায্য কম কার্য্য করে না!

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

দুঃখে সুখ

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শণম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১ম স্কন্দ, ৮ অঃ ২৪।

কুরুক্ষেত্র সংগ্রামাবসানে, পঞ্চ-পাণ্ডবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, পৃথা সতী, ব্রহ্মতেজ হইতে বিনির্ম্মুক্ত আত্মজগণ ও দ্রৌপদীর সহিত, শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উপরোক্ত প্রার্থনাটি ছিল। কুন্তিদেবী কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন? "অতএব হে জগদ্‌গুরো, সুখের পরিবর্ত্তে সেই সমস্ত বিপদরাশিই যেন আমাদের সর্ব্বদা উপস্থিত থাকুক, তাহা হইলে এই অসার দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তিপ্রদ ভবদীয় দর্শনলাভ হইতে কখন বঞ্চিত হইব না।"

হে ভগবন, আমাদের যখন যে বিপদ হইয়াছে, তখনই তুমি দয়া করিয়া সে সকল বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। দুর্য্যোধন যখন যেরূপে আমার পুত্রগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে, তুমি সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন রূপে উপস্থিত হইয়া তখনই সে সমস্ত বিপদ দূর করিয়াছ।

"বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
দসৎ সভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেক মহারথাস্ত্র তো
দ্রৌণ্যস্ত্র তশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ॥"

শ্রীভাঃ ১।৮।২৩।

"হে হরি, বিষ ভোজন, গৃহদাহ, রাক্ষসের আক্রমণ, দ্যূতসভা এবং প্রত্যেক যুদ্ধে মহারথিগণের শরজাল এবং সম্প্রতি অশ্বত্থামার

অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র হইতেও কেবল আপনার কৃপাবলে আমরা উদ্ধার লাভ করিয়াছি।"

অতএব হে বিপত্তারণ মধুসূদন, এখন দেখিতেছি যে বিপদই আমাদিগের সম্পদ। আমাদের অন্য সম্পদে প্রয়োজন নাই। যে বিপদে পড়িলে তোমাকে পাইব, সেই আমাদিগের সম্পদ, এবং সেই সমস্ত বিপদই যেন সর্ব্বদা আমাদিগকে বেষ্টন করে।

পঞ্চ-পাণ্ডবের জননী জগন্মান্যা কুন্তিদেবী প্রার্থনা করিলেন "আমাদের বিপদই হউক্।" কেন অন্য কিছু প্রার্থনা করিবার কি ছিল না? বিপদই প্রার্থনা করিলেন কেন? সুখ, শান্তি, সাম্রাজ্যশ্রী, ঐশ্বর্য্য এ সমস্ত তাঁহার করায়ত্ত হইলেও, তাহাতে তাঁহার চিত্ত তুষ্ট নয়। তিনি সানন্দে বিপদ চাহিলেন। কেন বিপদ চাহিলেন?

এখন দেখা যাউক, জগতের অভিধানে সম্পদ কাহাকে বলে এবং বিপদই বা কি?

জগতসংসারে দুইটি পদার্থ সর্ব্বদাই একত্রিত দেখা যায়। যেখানে আলোক বিকাশ সেইখানেই অন্ধকারের রাজ্য— সূর্য্যালোক ও অমানিশা জগতের অপরিহার্য্য বিধান। যেখানে সত্য মিথ্যাও সেখানে— সম্পদ বিপদ, সৎ অসৎ, পাপ পুণ্য এইরূপ যুগ্ম লইয়াই জগৎ। মানব কিন্তু সাধারণতঃ অসৎ ত্যাগ করিয়া, দুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখান্বেষণেই সতত তৎপর। সকলেই সুখ চায়—সাধ করিয়া কে দুঃখ গ্রহণ করে? সুখ চায় বটে কিন্তু পায় কয়জন? আর নিত্য সুখ এ মর্ত্ত্যভূমে একপ্রকার অসম্ভব। যাহাতে যাহাতে জীব সুখ পাইতে যায়, সুখ মনে করিয়া জগতের যে দ্রব্যে অভিনিবিষ্ট হয়, সে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর পদার্থ হইতে কখনও নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না। যাহা নিত্য, অনশ্বর, তাহা হইতে নিত্য ফল লাভ করা যায় কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই মরণশীল, অনিত্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ২য় অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাদ পরিহার্য্যার্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।"

"জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলেও পুনর্জ্জন্ম সুনিশ্চিত সুতরাং এই অপরিহার্য্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।"

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন মৃত্যুসৃষ্টি, তখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা কিছু লইয়া তাহাও নশ্বর, মৃত্যুশীল সুতরাং ইহা হইতে নিত্য চিরস্থায়ী সুখ অসম্ভব। ইহা জানিয়াও মানব এই খানেই সুখান্বেষণ করে ও অবশেষে হতাশ হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পায়। মানবদেহে যেরূপ আত্মা, চন্দনে যেরূপ সুগন্ধ, সেইরূপ এই বিশ্বের যে সারবস্তু তাহা ত্যাগ করিয়া অসারে আনন্দ পাইতে যায়, পায় না, তবুও সুখান্বেষণের অনুধাবন ত্যাগ করে না। "আজ নিরাশ হইলাম, হয়ত কাল পাইব।" ইহা মনে করিয়া অহরহ এই প্রধাবন লইয়াই থাকে। প্রতপ্ত মরুক্ষেত্রে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেমন জলাশায় প্রধাবিত হইয়া প্রতারিত হয়, সেইরূপ মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ দুর্ব্বুদ্ধি মানব, সেই নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য সংসারে, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সুখাশায় প্রধাবিত হইয়া বার বার প্রতারিত হইলেও এ অন্বেষণ ত্যাগ করে না। ইহাই ত্রিগুণময়ী দুরত্যয়া দৈবী মায়ার খেলা!

কুন্তিদেবী জগতের জীব হইয়াও একি অস্বাভাবিক প্রার্থনা করিলেন? সুখ সকলেই চায়, জীবের স্বাভাবিক প্রবণতা সর্ব্বদাই সুখের দিকে কিন্তু পাণ্ডবজননী চাহিলেন

বিপদ, সেই সেই বিপদ হউক যে যে বিপদে আপনি আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিশাল ভারতক্ষেত্রের সাম্রাজ্য, জগতে অতুলনীয় মান, তিনি পাণ্ডবজননী—বীরপ্রসূ, প্রভৃত ঐশ্বর্য্য, এ সমস্ত তৃণতুল্য বোধ করিয়া পাণ্ডবজননী আজ বিপদ প্রার্থনা করিলেন! কেন?—বিপদ-বারণকে পাইবার আশায়।

কুন্তিদেবী বেশ জানিতেন যে সম্পদকালে, ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের মদান্ধতা মানবকে আত্মহারা করিয়া ফেলে। সে অন্তর্দৃষ্টি শূণ্য হইয়া চিরকাল কামকাঞ্চনের দাস হইয়া পরমতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া যায়। স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে মদান্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয় ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে মত্ত হইয়া পরম মহেশ্বর বাসুদেবকেই কারারুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। যে বস্তুলাভের জন্য ব্রহ্মা মহেন্দ্রাদি দেবগণ বহু তপস্যা সাধন করেন, সেই পরম বস্তুকে সমক্ষে পাইয়াও দুর্ব্বুদ্ধি ধার্ত্তরাষ্ট্র চিনিতে পারিল না, মোহে চক্ষুহীন হইল। তাই ভগবানকে গৃহে পাইয়াও মূঢ় তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিতে চেষ্টা করিল।

সম্পদে যে উন্মত্ততা থাকে, সেই উন্মত্ততা মানবকে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হিতাহিত বিবেচনাহীন করিয়া ফেলে। অত্যাচার, অবিচার, পাপসেবা ক্রমে অঙ্গের আভরণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই বিপদই ভাল বুঝিয়া কুন্তিদেবী বিপদই চাহিলেন।

তোমার উপযুক্ত সন্তান তোমার চক্ষের সমক্ষে কালগ্রাসে পতিত হইল, তুমি ভাবিলে "ভগবান্ কি নিষ্ঠুর! কে তাঁহাকে দয়াময় বলে? এ আঘাত যে দিতে পারে সে কিসের দয়াময়?" কিন্তু ভাবিয়া দেখদেখি, তাঁহাকে ত ভুলিয়াছিলে, ঐশ্বর্য্যভোগের বিলাসিতায় তাঁহাকে একবারও মনে পড়ে নাই, এই আঘাত পাইয়া তাঁহাকে মনে পড়িল, যেমন করিয়াই হউক, ভক্তিতেই হউক, আর অভক্তিতেই হউক, ঐশ্বর্য্য মদমত্ত তোমার কঠিন হৃদয়ে ভগবানের কথা জাগিল। "বস্তুশক্তিঃ ন বুদ্ধিমপেক্ষতে।" গরল—জানিয়াই হউক আর অজ্ঞাতেই হউক পান করিয়াছি মৃত্যু নিশ্চিত, অমৃত পান করিলেই তাহার কার্য্য হইবে, ভগবানের নাম একবার উচ্চারণ করিলেই সে অক্ষয়বীজ তাহার কার্য্য করিবেই। বিপদেই হউক আর সম্পদেই হউক, নাম করিলেই তাহার সুফল ফলিবে।

কংস শত্রুভাবে চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধ ২ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে বলিতেছেন।

"আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্
পিবন্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥"

সে (কংস) উপবেশন, শয়ন, উত্থান, ভোজন, পর্য্যটন এবং পান প্রভৃতি সকল অবস্থাতে ও সর্ব্বকার্য্যে হৃষীকেশকে চিন্তা করিতে করিতে সমগ্র জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিল।

শত্রুভাবেই হউক আর মিত্রভাবেই হউক, যে যে ভাবে তাঁকে ভজনা করিবে, তিনি সেই ভাবেই তাঁ'র প্রতি কৃপা করেন যথা গীতায় সিদ্ধ বাক্য

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

কংস শত্রুরূপে কৃষ্ণচিন্তা করিয়া কৃষ্ণদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ভোজপতির কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক মঞ্চ হইতে তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্র পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তদুপরি পতিত হইলেন তখন কে কংস, কে কৃষ্ণ কেহ চিনিতে পারিল না।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৪৪ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক যথা

> "স নিত্যোদ্বিগ্ন ধিয়া তমীশ্বরং
> পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
> দদর্শ চক্রায়ুধ মগ্রতো যত
> স্তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥"

"চিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকাতে কংস পাণ, ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ, সকল সময়েই চক্রায়ুধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিত অতএব তাঁহারই দুর্লভরূপ প্রাপ্ত হইল।"

তাই বলিতেছিলাম জগৎসংসারে এই সমস্ত বিপদরূপ আঘাত আছে বলিয়া তাঁহার দিকে, সেই অব্যয় দণ্ডদাতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। শোকানলপ্রতপ্ত হৃদয় সেই নামসুধা সিঞ্চনে শীতলিত হয়, তাই দয়াময় দয়া করিয়া আমাদের মস্তকে বিপদভার চাপাইয়া দেন।

উন্মার্গগামী সন্তান, যদি পিতার শাসন না থাকে, তবে যথেচ্ছাচারী হইয়া পিতার মাথা হেঁট করে এবং প্রতিবেশীগণকে জ্বালাতন করিয়া তুলে। তাই পিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার ভবিষ্যতের নৈতিক জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সন্তানকে শাসন করেন।

পরমদয়াল জগৎপিতা তাই এত সুখ সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখ না থাকিলে, সুখের উৎকর্ষ থাকিত না। নিরবচ্ছিন্ন আলোক যদি জগতের বিধান হইত তাহা হইলে আলোকও লোকের বিরক্তিকর হইত। সুখের মধুরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য দুঃখের সৃষ্টি। দয়াময় জগৎ-কর্ত্তা জীবের অভাব বুঝিয়াই যেন আবশ্যক মত সকল দ্রব্য দিয়াছেন। কোন সুখাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন তাহাতে কটু, অম্ল, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহার স্বাদ মধুরতর করিতে হয় সেইরূপ এই দুঃখ আছে বলিয়া, সুখকে লোক সুখ বোধ করিতে পারে। বিপদ সম্পদের মহিমা বৃদ্ধি করে।

দয়াময় যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন কিছুই ব্যর্থ নহে। বিধেয় ও প্রয়োজন আছে। যে বিষ রক্তে মিশ্রিত হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু, তাহাই অন্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া রোগীকে সেবন করাইলে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য হয়।

পাপ না থাকিলে, পাপের উপর জীবের ঘৃণা না থাকিলে, কে সাদরে পুণ্য গ্রহণ করিত? পাপের বিভৎস ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া জীব পুণ্যাশ্রয় করে।

এই জগতোৎপত্তির আদি কারণ যে মহামায়া, যাহাকে চণ্ডীতে দেবগণ স্তব করিয়া "অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা" বলিয়াছেন তিনিও দুইশক্তি লইয়া এই বিশাল খেলা খেলিতেছেন। একটি বিদ্যা বা পরা, ও অপরটি অবিদ্যা বা অপরা। এই দুই শক্তির কার্য্যই এই বিশ্ব। যাঁহারা পরা আশ্রয় করেন, তাঁহারা পরম পথের পথিক হইয়া ভগবৎ সান্নিধ্যলাভে চিরশান্তি উপভোগে রত থাকেন, যাঁহারা বিষয়-তৃষ্ণায় মোহান্ধ তাঁহারা অপরার আশ্রয়ে, সুখ পাইব মনে করিয়া বিষয়াসক্ত হয়েন, কামিনী ও কাঞ্চনে মত্ত থাকেন, শেষে তাঁহাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। তাই সুধীগণ অবিদ্যা হইতে দূরে থাকিয়া, পরাশ্রয়ে পরম শান্তি ও পরম পদ লাভ করেন। অপরা না থাকিলে, পরাশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কেহ অনুভব করিতে পারিতেন না।

সৃষ্ট বস্তু কিছুই নিরর্থক নহে। সকল পদার্থেরই আবশ্যকতা আছে। সুখও যেমন

দুঃখও তেমনি। সুখ সম্পদ যে মহান হইতে উৎপন্ন দুঃখ বিপদও সেই স্থান হইতে আসিয়াছে। জগতের কোন দ্রব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, তদ্‌জাতীয় নিকৃষ্ট পদার্থ লইয়া তুলনায় সমালোচনা করিলে তবে উৎকর্ষ অনুমিত হয়। দিবালোকে দীপালোক প্রভাসিত হয় না। অমান্ধকারে দীপ উজ্জ্বলতর হয়। অন্ধকারেই আলোক বিকাশ। দুঃখ সুখের মানদণ্ড! বিরহ প্রেমের পরীক্ষক!

ভগবান বাসুদেব গোপকুমারীগণের নিকট প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাস-বিহারে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রজাঙ্গনাগণ

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহ্যধিকং ভুবি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১০। ২৯। ৪২।

এই প্রকারে অত্যন্ত উদার চরিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্তমনোরথ গোপীসকল পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন এবং তন্নিমিত্ত মানিনীও হইলেন। এবং সেই জন্য

"তাসাং সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

শ্রীভাঃ ১০।২৯।৪৩

শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের সেই সৌন্দর্য্যাভিমান ও গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাঁহাদিগের প্রতি প্রসাদ বিতরণের জন্য সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

তখন গোপকুমারী তাঁহার অদর্শনে, হাহাকাররবে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৃণ, লতা, বৃক্ষাদি সকলকে প্রিয়তমের সন্দেশ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"চূত প্রিয়ালপনসাসন কোবিদার
জম্বর্ক বিল্ব বকুলাম্র কদম্ব নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥"

হে চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং হে অপরাপর পরার্থৈকজীবন যমুনোপকূলবর্ত্তী বৃক্ষসকল, তোমরা শূন্যচিত্ত আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পথ বলিয়া দাও।

এইরূপে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন প্রিয়তমের বার্ত্তা পাইলেন না। তখন হতাশ হইয়া, তাঁহার লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

কেহ পূতনা হইলে, অপর গোপী শ্রীকৃষ্ণরূপে যেন তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিল। কেহ অঘাসুর, বকাসুর, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অভিনয় করিতে লাগিলেন। পরে যখন বুঝিলেন শ্রীকৃষ্ণ লাভের আশা সুদূরপরাহত, তখন সমস্বরে সকলে রোদনচ্ছলে স্তব আরম্ভ করিলেন। তাহাই মহর্ষি বেদব্যাস গোপীগীতানামে শ্রীভাগবতে স্থান দিয়াছেন।

এইরূপ বিলাপেতে অশ্রুজলে হৃদয়মলা বিধৌত হইলে ও গর্ব্ব প্রশমিত হইলে, যখন গোপবালা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশায় একরূপ নিরাশ হইয়াছিলেন। তখন

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥"

শ্রীভাঃ ১০।৩২।২

সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে সহাস্যবদনকমল পীতাম্বরপরিহিত প্রসূনমালালঙ্কৃত সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।

গোপীগণের প্রেমের পরিমাণ কতদূর তাহা লোকশিক্ষার জন্য জগতে জানাইতে ভগবান অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই বিরহজ্বালা গোপীপ্রেমকে উজ্জ্বলতর করিয়া জগজ্জনকে মোহিত করিয়াছিল। কামগন্ধহীন যে নির্ম্মল প্রেম গোপীগণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জানিত? তাই ভগবান দয়াপরবশ হইয়া লীলাচ্ছলে এই অপূর্ব্বধন, এই "অনর্পিত" রত্ন জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই বিরহ বিলাপ গোপীপ্রেমকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছে। ভগবান যে জীবকে ভালবাসেন, আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয়রূপে অঙ্কে স্থান দেন, তাহা কে জানিত, যদি দয়াময় দয়া করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে না দেখাইতেন? ব্রজবালা যে এরূপ নিঃস্বার্থ প্রেম ভগবানের জন্য রাখিয়াছিল, এই অদর্শন জনিত বিরহ না ঘটিলে, কে জানিতে পারিত? যাঁহারা বলিয়াছিলেন

"পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবা
পতি বিলঙ্ঘ্য তেঽস্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীত মোহিতাঃ
কি তব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

গোপীগীতা ১৬

হে অচ্যুত, তুমি আমাদিগের আগমণের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, সম্বন্ধী, ভ্রাতা ও বান্ধব সকলের অনাদর পূর্ব্বক তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। আমরা সব ত্যাগ করিয়া তোমার সমীপে আসিয়াছি, এই রাত্রিকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।

সর্ব্বত্যাগী হইয়া, যাহা যাহা এই পৃথিবীতে আকর্ষণের পদার্থ আছে সব বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যহৃদয় লইয়া, ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি শূন্য হৃদয় পূর্ণ করেন। উৎসৃষ্ট দ্রব্যে দেবপূজা হয় না। তাই হৃদয় হইতে সমস্ত আকর্ষণ বিসর্জ্জন দিয়া, শূন্য-হৃদয়ে অনন্যচিত্ত হইয়া, তাঁহার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলে তিনি গ্রহণ করেন। তাই গোপীগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া আসিয়াছি ইহা জানাইলেন।

তাই বলিতেছিলাম সুখ ও দুঃখ অবিযুজ্য। যেখানে সুখ সেই খানেই দুঃখ। বিরহ প্রেমের মানদণ্ড। দুঃখ সুখের পরিচায়ক। দুঃখ না থাকিলে জীবের সুখের অনুভূতি থাকিত না। তাই পাণ্ডবজননী পৃথাদেবী বিপদই চাহিলেন।

অন্ধকারে যেরূপ আলোকের জ্যোতি সুস্পষ্ট হয়, সেইরূপ দুঃখ ভোগের পর যদি সুখোদয় হয়, তাহার মধুরতা প্রকৃষ্টরূপে জীব অনুভব করিতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সেই জন্যই জগতের বিধান নহে। তাই কবি গাহিলেন—

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

সুখের প্রয়োজনীয়তা জগতে যতটুকু, দুঃখের প্রয়োজনীয়তাও তদ্রূপ। এইরূপ সুখ দুঃখ সমন্বিত এই সংসার। কিন্তু মোহান্ধ আমরা দুঃখ ছাড়িয়া কেবল সুখ চাই। দুরাশা কখন পূর্ণ হয় না—সুতরাং নিরাশ হই ও বার বার কষ্ট পাই। গুরুপদে মতি স্থির করিয়া সুখ ও দুঃখ, যাহা ভগবানের বিধান, তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে শিক্ষাই মনুষ্যত্ব। ইহা আমরা পারি না, তাই এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা এত উৎকণ্ঠা। সব ত্যাগ করিয়া, "ঠাকুর, সুখই দাও আর দুঃখই দাও, যা' তোমার

মনে আছে তাই কর" এই বলিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তাহা হইলে জীব আর কোন কষ্ট পায় না, সুখ দুঃখ সমজ্ঞানে সংসার করিতে পারে। এই মাত্র শান্তির পথ। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

মানবজাতির বিবর্ত্তন

"The goal of evolution seems to be men with great Minds of High Character. There is nothing great in the world but man, nothing great in man but mind, and nothing great in mind but character."

মানবজাতির ভ্রূণোদ্বর্ত্তন ও সজ্যোদ্বর্ত্তন আলোচনা করিবার নিমিত্ত পরীক্ষাদি সম্পন্ন করা অতীব দুঃসাধ্য। সুতরাং ইত্যাকার বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ভেকশিশুর পরিপুষ্টি পর্য্যালোচনা সমূহ ফলদায়ক।

ভেকজাতীর মধ্যে প্রকৃত সঙ্গমসাধন হয় না। পুরুষভেক তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয় সাহায্যে স্ত্রীভেকের দেহের পশ্চাদংশ সবলে বেষ্টন করে মাত্র, এই আলিঙ্গন সাধারণতঃ কয়েক ঘটিকা হইতে কতিপয় দিবস পর্য্যন্তও স্থায়ী হইয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই বাহ্যালিঙ্গনেই দম্পতীযুগলের ডিম্ব ও সুক্রনালী উত্তেজিত হইয়া উঠে, উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে ডিম্ব ও শুক্ররাজি সম্মিলিত হইয়া বহিস্থ জলে বা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। ডিম্বকোষে শুক্রকোষ প্রবিষ্ট হইলে সম্মিলিত-কোষটী দ্বিধা বিভক্ত হয়। এই বিভক্ত কোষদ্বয় হইতে চারি; তাহা হইতে আট; তদ্‌পর ষোল; অনন্তর বত্রিশ, চৌষট্টি; ও সর্ব্বশেষে বহু-সংখ্যক কোষ উৎপন্ন হইলে তাহাদিগের সমষ্টি একটী আতাফলের মত দেখায়। সাজ্যো-দ্বর্ত্তনিক গুণরাশির বংশপারম্পর্য্যহেতু এই কোষসমষ্টি ভবিষ্যজাতির বিভিন্ন দৈহিক কলায় পরিণত হয়। সুতরাং একটী সম্মিলিত কোষ হইতে বেঙাচি ও পরে তাহা হইতে ভেক উৎপন্ন হয়।

বেঙাচি প্রথমতঃ পদবিহীন ও লাঙ্গুল সংযুক্তাবস্থায় দৃষ্ট হয়, এই সময়ে ইহারা মাছের মত হাপি খাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই অবস্থায় ইহারা দেখিতে ঠিক মাছের মত। বরাবর এইরূপ অবস্থায় থাকিলে প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহাদিগকে মাছ ব্যতীত অপর কোন প্রাণী বলিয়া গণ্য করিবেন না। মৎস্যভ্রূণে এই অবস্থা অক্ষুণ্ন থাকে; ভেকভ্রূণ ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মৎস্যাবস্থার পর ইহার মাত্র সম্মুখস্থ পদদ্বয় ও পশ্চাৎ অপর পদদ্বয় উদ্গত হয়। এতদ্‌সঙ্গে ভেকশিশু ফুস্‌ফুস্ সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে সে ফুস্‌ফুস্ ও হাপি উভয়তঃই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া পরিচালন করিতে থাকে। বর্ত্তমান অবস্থাটী ঠিক সায়ার্ড্ডন্, মেনোব্রাঙ্ক্‌স্ ও সাইরেন্ প্রভৃতি নিম্ন স্তরের উভচর জন্তুর অনুরূপ। এইসকল জন্তুর ভ্রূণ এই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কিন্তু ভেক ইহা ছাড়াইয়া চলিতে

থাকে। হাপি খাওয়ার যন্ত্র-কোষ ক্রমশঃই শুকাইয়া যায় ও ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ভেকশিশু তখন ফুস্‌ফুস্‌ সাহায্যেই সম্পূর্ণরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস সাধন করিতে থাকে। লেজ কিন্তু এখনও অক্ষুণ্ণ। ট্রাইটন্‌ ও স্যালাম্যাণ্ডারের পরিপুষ্ট অবস্থা ঠিক এইরূপ। এই অবস্থার ভেক্‌ ইহা অতিক্রম করিয়া স্বীয় জাতীয়ত্বের দিকে অগ্রসর হয়। পরিশেষে ইহার লাঙ্গুল লোপপ্রাপ্ত হয় ও ভ্রূণ ভেকে পরিণত হয়।

এইরূপে ভ্রূণপুষ্টির সময়ে মৎস্য-ভ্রূণ মৎস্যাবস্থা প্রাপ্তির পর আর অগ্রসর হয় না। পেরেনিব্র্যাঙ্ক্‌স্‌ মৎস্যাবস্থা ছাড়াইয়া উঠে ও স্বীয় জাতীয়ত্ব লাভ করে। ক্যাডুকিব্র্যাঙ্ক্‌স্‌ শ্রেণী প্রথমতঃ মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পেরেনিব্র্যাঙ্ক্‌স্‌, অতঃপর ক্যাডুনিব্যাঙ্ক্‌ ও পরিশেষে ভেক বা র‍্যানুরা অবস্থায় উপস্থিত হয়।

ফলতঃ ভেকের ভ্রূণোদ্বর্ত্তন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বহুবিধ আকার ও গঠনগত পরাবর্ত্তন সাধিত হয়। এই সকল পরাবর্ত্তন এরূপ চরিত্রের হইয়া থাকে যে ভ্রূণের সাময়িক শ্রেণীবিভাগক্ষেত্রে তাহাদিগকে মানদণ্ডস্বরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ সাময়িক শ্রেণীবিভাগে ভ্রূণবিশেষের তাৎকালিক জাতি, গোষ্ঠি, পরিবার, বর্গ, শ্রেণী ও এমন কি সঙ্ঘ পর্য্যন্ত নির্ণয় করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ভ্রূণপুষ্টিতে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোনও একটী জাতি কেবল মাত্র যে সমগোষ্ঠিস্থ অপর এক জাতিতে পরিণত হয়, তাহা নহে; এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হয়। মৎস্য (পিস্‌কেস্‌ শ্রেণী) ভেক অর্থাৎ উভচর শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। জলচর জন্তু স্থলচরের অবয়ব বিশিষ্ট হয়। প্রত্যেক স্তরই শ্রেণীবিভাগ বিষয়ক প্রাণিবিজ্ঞানের সূত্র-সমূহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে। প্রত্যেক জাতীয় ভ্রূণেই তদপূর্ব্ববর্ত্তী জান্তবভাবের আবির্ভাব হয় ও তুলনামূলক অঙ্গবিনিশ্চয়ে যেরূপ প্রজন্তু বা প্রতোজী, মেরুদণ্ডী, ও এতদুভয়ের অন্তবর্ত্তী অন্যান্য জন্তুর অঙ্গবিকাশের ক্রম লক্ষিত হয়, ইহাদের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ ক্রমবিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাপার হইতে পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত সূত্রটী প্রাপ্ত হইয়াছেন, "জতিমাত্রই স্বীয় বংশেতিহের পুনরালোচনা করে," অথবা "ভ্রূণোদ্বর্ত্তন সঙ্ঘোদ্বর্ত্তনের পরিচায়ক"। *

ইহার কারণানুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে কিরূপে ইহা অভিব্যক্তিবাদের

* এস্থলে একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের উইস্‌কন্‌সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান বিভাগ হইতে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত প্রাণবিজ্ঞান প্রাসাদের অলিন্দে প্রতি সপ্তাহেই নানাপ্রকার উদ্ভিদ্‌ ও জন্তু, ও তদ্বিষয়ক পরীক্ষাদি রক্ষিত করা হইয়া থাকে। কোনও এক সপ্তাহে রাণা ক্ল্যামিট্যান্‌স্‌ জাতীয় ভেক ভ্রূণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। সোমবার প্রাতঃকালে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমি মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বীয় গন্তব্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। আমার বিরক্তি উৎপাদনের কারণ অপর কিছুই নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহ ধরিয়া মৎস্য ভ্রূণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সপ্তাহে আবার সেই একই দৃশ্য দেখিয়া আমি ক্ষুণ্ণ হইয়া ছিলাম। তবুও লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নীচে আসি ও প্রদর্শনীসম্মুখে যাইয়া দেখি যে পাত্রের গাত্রে লেখা রহিয়াছে "Rana clamitans"!!! আমি আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়া সেই স্থানেই কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলাম, যে নাকি ঐ ভেক শিশুর সহিত বেক্ষণাগারে সচরাচর পরীক্ষাদি করিয়াও প্রতারিত হয়, তখন সাধারণ লোকে যে ঐ অবস্থায় ভেককে ভেক বলিতে ইতস্ততঃ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পৃষ্ঠপোষক, জন্তুর ভ্রূণাবস্থাতে যে গুণরাশি বিকাশপ্রাপ্ত হয় পিতৃ ও মাতৃজননকোষে তাহাদের প্রত্যেকটীরই বংশপারম্পর্য্য নিশ্চয়ই নিহিত রহিয়াছে। পিতৃ ও মাতৃজননকোষে কোনও গুণের বংশপারম্পর্য্য দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে উক্ত কোষদ্বয় এমন কতকগুলি ব্যবহারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে জীবন ধারণ করিয়াছে যদ্দ্বারা তাহাদের মধ্যে সেই বিশেষ গুণের বংশপারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে কোন জাতিই হউক না কেন ভ্রূণাবস্থাতে তাহার অতিপূর্ব্ব গুণরাশিও বিকশিত হয়।

ভেকের ভ্রূণোদ্বর্ত্তনে যাহা ঘটে মানবভ্রূণোদ্বর্ত্তনে তাহাই ঘটিয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে ভেক সম্বন্ধে যে গবেষণার অবতারণা করা হইয়া থাকে মনুষ্য সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। মনুষ্যভ্রূণও প্রথমতঃ একটী আণুবীক্ষণিক অতি ক্ষুদ্রকোষ মাত্র। ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষ মিলিত হইলে যে মিলিত কোষ উৎপন্ন হয় তাহার আয়তন ⅕ মিলিমিটার। এই অবস্থায় ইহাকে একটী এককোষাত্মক প্রজন্তু বা প্রতোজী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কোষসংবিভাগ আরম্ভ হইলে এমন এক অবস্থা উপস্থিত হয় যখন ইহা একটী কোষগুচ্ছে পরিণত হইয়া বাহ্যতঃ আতা ফলের ন্যায় প্রতীয়মান্ হয়। বিবর্ত্তনমার্গে দ্বিতীয়স্তরের জন্তু ভল্‌ভকস্ ও এই মানবভ্রূণটীতে প্রভেদ কি? অতঃপর তৃতীয়াবস্থায় ইহা হাইড্রা নামক জন্তুর আকার ধারণ করে। পরিশেষে এই বর্দ্ধিষ্ণু মানবভ্রূণ তাহার মৎস্য ও সরীসৃপাবস্থা উপভোগ করিয়া স্তন্যপায়ী জন্তুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি ইহার বর্ণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এইরূপে ইহা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহার শরীর-সংস্থান এরূপ অবস্থায় পরিণত হয় যে তখন উহাকে প্রাইমেট্‌স্‌বর্গের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। ভেকের ন্যায় মনুষ্য গর্ভেও অতি স্বল্পকাল মধ্যে প্রজন্তু হইতে মানবের বিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সমূহ ঘটনাই ক্রমান্বয়ে পুনর্বিকশিত হয়।

বর্ত্তমান জন্তুজগতের বিবর্ত্তন ও তন্মার্গে জন্তুগণের স্থান নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরবর্ত্তী চিত্রানুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই চিত্রের নাম 'বিবর্ত্তনতরু'। অভিব্যক্তি বিকাশক এই চিত্রকে বস্তুতঃ একটী সদ্য বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হয়। ভূবিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের জন্তু বাস করিয়াছিল। সম্প্রতি ঐ সকল জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা হইলে, ভূপৃষ্ঠে আদি প্রাণী হইতে বর্ত্তমান জাতিসমূহ পর্য্যন্ত সমগ্র জন্তুজগৎকে যুগহিসাবে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠচারী ও (২) ভূগর্ভপ্রোথিত কঙ্কালাবশিষ্ট।

একটী বৃক্ষের মূল কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা উদ্‌গমনের বিভিন্ন স্তর জীবোদ্বর্ত্তনের বহুবিধ সোপানস্থানীয়। অর্থাৎ, কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার ভিন্ন ভিন্ন অংশ যেন ভূগর্ভস্থ কঙ্কালরাজির স্তবক ও এই সকল প্রশাখা নির্গত শেষ পল্লবরাজি বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠচারীগণের পরিচায়ক।

প্রজন্তু বা প্রতোজীই জন্তুজগতের প্রাথমিক বিকাশ। সম্যক্ পরাবর্ত্তন সাধনান্তর যখন বিবর্ত্তনতরু শনৈঃ শনৈঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন কতিপয় প্রাণীর অভিব্যক্তির গতি সরলরেখাক্রমে নিয়মিত হয়। এই সরলরেখাস্থ প্রাণিসমষ্টি বিবর্ত্তনতরুর কাণ্ডস্বরূপ। এই সরলরৈখিক অভিব্যক্তির স্তরে

নিম্নলিখিত ক্রমগুলি প্রধান :—(১) প্রতোজী; (২) কীট; (৩) মৎস্য; (৪) উভচর; (৫) সরীসৃপ; (৬) অণ্ডজস্তন্যপায়ী; (৭) দ্বিজরায়ু (ওপসম্, ক্যাঙ্গারু); (৮) এক-জরায়ু; ও শেষতঃ (৯) প্রাইমেট্স্‌বর্গ। এই বর্গের আদি স্থাপয়িতা পুনঃ ঋজুরেখাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত জন্তুসমূহে পরিণত হইয়াছে;—(১) য়্যান্থ্রপইডিয়া (গিবন্, ওরাং, গরিলা ও শিম্পাঞ্জী নামক নরাকৃতির আভাসযুক্ত জন্তু); (২) য়্যান্থ্রপপিথেকাস্ বা নরাকৃতি কপি; (৩) পিথেকান্থ্রোপাস্ (বানরের আভাসযুক্ত মনুষ্য। যবদ্বীপে প্রাপ্ত ভূগর্ভস্থ পিথেকান্থ্রপাস্ য়্যালেলাস্।); (৪) প্রস্তরযুগের মনুষ্য (প্যালি ও লিথিক ও পরে নিওলিথিক।); (৫) হোমিনিডি (বর্ত্তমান মানব পরিবার)।

উক্ত সরলরৈখিক অভিব্যক্তিকালে কোনও কোনও বংশ বিশেষ প্রকারের পরাবর্ত্তন প্রভাবে মূল গতি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বিপ্রকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কাজেই বিবর্ত্তনতরুর মূল কাণ্ড হইতে শাখাসমূহ বহির্গত হইল। সম্প্রতি নানা প্রকার মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে সকল জন্তুদ্বারা কাণ্ডের নিম্নাংশ প্রসূত শাখা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহারা উচ্চশাখাস্থ জন্তু অপেক্ষা অতীব হীন। বর্ত্তমান কালের সবিশেষ পরাবর্ত্তন বিশিষ্ট সরীসৃপ, খেচর ও অণ্ডজস্তন্যপায়ীগণের শরীর সংস্থান তুলনা করিলে উহাদের চরিত্রগত সাম্যসম্বন্ধে একাধিক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে। সাধারণ চরিত্রটী বিশেষভাবে সরীসৃপ শ্রেণীরই সম্পত্তি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সরীসৃপের বিশেষ চরিত্রের তুলনায় উহা অতিশয় সরল। গিরি গহ্বর প্রোথিত কঙ্কালরাজি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ভূমণ্ডলের জুরাসিক্ ও ক্রিটেসাস্ বা চাখড়ি বহুলাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অপর্য্যাপ্ত সরীসৃপ বাস করিয়াছিল। কিন্তু এই সকল সরীসৃপে খেচরের চরিত্রও প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। তারপর এই যুগে এমনও সরীসৃপ বিচরণ করিত যাহাতে অণ্ডজস্তন্যপায়ীর আকার ইঙ্গিত সুস্পষ্টরূপেই ছিল। ইত্যাকার সরীসৃপ বহু পূর্ব্বকালে অর্থাৎ পার্মিয়ান্‌যুগে যে বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সরীসৃপ চরিত্র অতীব স্বল্প পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছিল। কালপ্রসঙ্গে উক্ত দ্বিভাবাপন্ন বংশের কিয়দংশ হইতে সরীসৃপ চরিত্র বিলোপপ্রাপ্ত হয় ও জাতিটী প্রবলভাবে খেচর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপেই বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব সম্পন্ন খেচরকুলের উৎপত্তি হইয়াছে। পক্ষান্তরে কতকগুলি আদি সরীসৃপে খেচরভাব লুপ্ত হইতে থাকে; কিন্তু সরীসৃপের লক্ষণসমূহ ক্রমশঃই প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষত্ব বিশিষ্ট সরীসৃপকুল উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রিটেসাস্ যুগের অণ্ডজস্তন্যপায়ীর লক্ষণবিশিষ্ট সরীসৃপেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। পরাবর্ত্তন প্রভাবে ধীরে ধীরে উহাদের সরীসৃপত্ব প্রনষ্ট হইতে আরম্ভ করে ও আদি অণ্ডজস্তন্যপায়ীর চিহ্নসমূহ প্রাবল্যলাভ করে। এই অণ্ডজস্তন্যপায়ী কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ঐরূপ স্তন্যপায়ী হইতে এখনও বহু দূরবর্ত্তী। উক্ত আদি ডিম্বপ্রসূস্তন্যপায়ী হইতে আধুনিক ডিম্বপ্রসূস্তন্যপায়ী ও আদি দ্বিজরায়ুগণ পরাবর্ত্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত জন্তুর পরাবর্ত্তন হইতে আদি য়্যান্থ্রপইডিয়া ও তদুৎপন্ন অন্যান্য স্তরের মধ্য দিয়া মানব বিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

ইহাই মনুষ্য ও বানরের সন্ধিস্থল। এই স্থানে মনুষ্যত্ব ও কপিত্বের সম্মিলন হইয়াছে।

এই য়্যানথ্রপইডিয়াই প্রাচীন প্ল্যাটিরাইনস্‌ বা অনুন্নত ও প্রশস্তনাসিক বানরগণের ও ক্যাটারাইনস্‌ বা সঙ্কীর্ণ ও অনুন্নত নাসিকাযুক্ত কপিবংশের পূর্ব্বপুরুষ। পূর্ব্বোক্ত জন্তুসমূহের কিয়দংশ পরাবর্ত্তন সহযোগে সের্সোপিথেসিডি নামক পরিবারে পরিণত হইয়াছে। ইহারা সকলেই দীর্ঘলাঙ্গুল। কিন্তু প্ল্যাটিরাইনস্‌দিগের কেহ কেহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের পারিপার্শ্বিকান্তর্গত হইয়া পড়ে। ফলে পরাবর্ত্তন প্রভাবে তাহারা ক্রমশঃই মনুষ্যজাতির আকার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের দ্বারাই সিমিডি পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও একই প্রণালীসহযোগে তাহা হইতে প্রাচীন য়্যানথ্রপপিথেকাস্‌ বা নরাকৃতি কপি জন্মগ্রহণ করে। ইহারা লাঙ্গুলবিহীন। ডাক্তার থিওডোর গিল্‌ বহুপূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহারাই বর্ত্তমান কালের শিম্পাঞ্জীর পূর্ব্বপুরুষ। ইহাদিগকে এখন হইতে আমরা প্রাচীন শিম্পাঞ্জী নামে অভিহিত করিব। এই প্রাচীন শিম্পাঞ্জী চতুষ্পদ বা চতুর্ভুজ জন্তু। ইহারা বৃক্ষে বাস করিত। ইহার কতকগুলি বংশধর অভিব্যক্তি তরুর প্রধান কাণ্ড হইতে বিপ্রকৃষ্ট হইয়া পড়ে, ও অপরগুলি সরলরেখাক্রমেই পরাবর্ত্তিত হইতে থাকে। বিপ্রকৃষ্ট-সন্ততিগণ দক্ষতার সহিত বৃক্ষবাসী হইয়া আধুনিক শিম্পাঞ্জী ও গরিলায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন শিম্পাঞ্জী-সন্ততির দ্বিতীয় দল বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ভূচর হইতে আরম্ভ করে। ফলে তাহারা পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্রব্যাদি ধারণের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময় পরিভ্রমণের জন্যই ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এই প্রধান পরাবর্ত্তন ব্যতীত পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট আরও অনেকানেক পরাবর্ত্তন সংঘটিত হয়; যথা সরলভাবে দণ্ডায়মান, পরিবর্দ্ধিতায়তন মস্তিষ্ক, পরিবর্ত্তিত মুখাবয়ব ও দন্তসম্বন্ধীয় নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। এই বন্য মানবজাতি পরাবর্ত্তনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়া ধীর পদবিক্ষেপে মনুষ্যত্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। * ক্রমান্বয়ে পিথেকইড্‌ ও প্যালিওলিথিক্‌ অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া ইদানীন্তন মনুষ্যসমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। প্যালিওলিথিক্‌ মানবের বদনমণ্ডল বস্তুতঃই মনুষ্যোচিত কোমল ভাবরাশির আধার।

কপিকুল ও মনুষ্যজাতির মধ্যে শরীরসংস্থান সম্বন্ধে এত অধিক ঘনিষ্ঠতা যে প্রত্যেক অস্থি, প্রত্যেক পেশী ও প্রত্যেক দৈহিককলা সমসংখ্যক, এবং এই অঙ্গ সমূহের কোষসংবিধানও তুল্যরূপ। তবে তাহাদের বাহ্যাকৃতিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা এতই নৈকট্যবিশিষ্ট যে স্বনামধন্য প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ সার রিচার্ড আওয়েন্‌

* এই প্রবন্ধে 'পারিপার্শ্বিক' শব্দ ভূয়ঃ উল্লেখিত হইলেও বিবর্ত্তনমার্গের পরাবর্ত্তন (অর্থাৎ যেরূপ পরাবর্ত্তনে একজাতি অপরজাতিতে পরিণত হয়) পারিপার্শ্বিক প্রভাবজাত না জননকোষজাত সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই ও প্রয়োজনীয়তাও নাই। তবে এই পর্য্যন্ত এস্থলে বলা যাইতে পারে যে Neo-Lamarckian School "Inheritance of acquired character"এর ও Neo-Darwinian School "Inheritance of congenital character"এর পক্ষপাতী। Inheritance of acquired characters সম্বন্ধে Brown-Sequardএর 'Experiments on guinea pigs' পরীক্ষাই প্রধান সম্বল। এই পরীক্ষা প্রতিপাদ্য বিষয়ের বরং প্রতিকূল। পক্ষান্তরে জ্রণবিজ্ঞান হাতে কলমে জনন ও দৈহিককোষের যে সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে তাহাতে Inheritance of acquired characters প্রলাপবাক্যে পরিণত হয়।

লেখক।

স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন কপি ও মনুষ্যদেহে পার্থক্য আবিষ্কার করা অল্পবিনিশ্চয়বিৎগণের এক মহাসমস্তাই বটে !

মনুষ্যের ভ্রূণাবস্থায় ও প্রসবান্তর এমন কতকগুলি দৈহিক বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় যাহাদ্বারা ইতর জন্তুদিগের (তথাকথিত) সহিত তাহার জ্ঞাতিত্ব স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়। আমরা ইহাদের সহিত বহুপুরাতন জ্ঞাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ। তবে এমন লোকও বিরল নহে যাঁহারা বলিতে পারেন "আজকাল অনেক 'শিক্ষিত' লোকেই পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী—মনে করেন, ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায়, দীক্ষায়—সকল বিষয়েই নিয়ত পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়, সংসারের গতিই যেন কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; পরিবর্ত্তন দ্বারা সংসারের সকল পদার্থেরই যেন পরিস্ফুটন হইতেছে। এটী তাঁহাদের বিশ্বাস, কিন্তু এটী একটী বিষম ভ্রমাত্মিকা ধারণা।" পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ মত প্রকাশ বিরল নহে। আমাদের অধ্যাপক মাইকেল গায়ারের কথায় এরূপ ব্যক্তিকে আমরা "Rotten chair of biologists" বলিয়া থাকি। পরিবর্ত্তন যদি নাই হইতেছে তাহা হইলে বাস্তবিকই "To admit this view, is, as it seems to me, to reject a real for an unreal, or at least for an unknown cause. It makes the works of God a mere mockery and deception; I would almost as soon as believe, with the old and ignorant cosmogonists, that fossil shells had never lived, but had been created in stone so as to mock the shells living on the sea-shore."

কপিকুলের সহিত মনুষ্যের দৈহিক সাম্য ব্যতীত সংস্কারগত সাম্যও অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। কৌতূহলজনক এই সংস্কারটীর বর্ণনাই অগ্রে করিতেছি। ডাক্তার লুইস্ রবিন্‌সন্ বহুসংখ্যক অতি অল্পবয়স্ক শিশুর দোলায়মান অবস্থায় স্বীয় ভারবহনের ও মুষ্টিবন্ধনের ক্ষমতা নির্ণয়ের নিমিত্ত নিম্নস্থ পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করেন। এই শিশুগুলির মধ্যে ন্যূনাধিক ৩০ জনের বয়ঃক্রম এক ঘণ্টার ঊর্দ্ধে নহে। তিনি বলেন ইহাদের ২৮ জন তাঁহার প্রলম্বিত অঙ্গুলি অথবা যষ্টিখণ্ড মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ১০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শূন্যে দোলায়মান অবস্থায় নিজের আপন আপন ভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক ঘণ্টারও কম বয়স্ক ১২টী শিশু ৩০ সেকেণ্ড কাল ঐরূপে অবস্থান করিয়াছিল। ঠিক ঐ বয়সেরই ৪ জন এক মিনিট পর্য্যন্ত শূন্যে অবস্থান করিয়াছিল। ৪ দিবস বয়সপ্রাপ্ত ৫০ জনেরও অধিক ৩০ সেকেণ্ড ঐ অবস্থায় ছিল। তিন সপ্তাহ বয়স্ক কতিপয় সংখ্যক শিশু এক মিনিট ৩০ সেকেণ্ড কাল পর্য্যন্ত ঝুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। এমন কি একজন দুই মিনিট ৩০ সেকেণ্ড পরেও ক্লান্ত হয় নাই। আর একটী শিশু ১০ সেকেণ্ড পরে দক্ষিণ হস্ত ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাম হস্তে আরও ৫ সেকেণ্ড ঐ ভাবে কাটাইতে সক্ষম হয়। ডাক্তার রবিন্‌সন্ বলেন শিশুটী শুধু যে তাহার দক্ষিণ হস্তের বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা নহে; ঠিক সেই সময়ে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন সে শূন্যমধ্যে যোগ্যতর অপর কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল। অধিকন্তু কোনটী শিশুই নির্জীব পদার্থের ন্যায় বিলম্বিত হইয়া রহে নাই।

জন্মাস্থায় কটীদেশের সহিত সমকোণ প্রস্তুত করিয়াছিল এবং দৈহিক কলাসমূহ বিধ্বস্ত ভাবপূর্ণ বোধ হইতেছিল। বিশেষতঃ বাহুর পশ্চাদংশের ফ্লেক্সর নামক কলাটী অতিশয় নিটোল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত ব্যাপার শিক্ষাজাত না সংস্কারজাত? মাত্র কয়েক ঘণ্টা বয়স্ক শিশু আবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইল কি প্রকারে? এই অদ্ভুত সংস্কার পূর্ব্ব-পুরুষ কপিকুল হইতে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ইহা একটী অব্যবহার্য্য সংস্কার ও "ভ্রূণোদ্বর্ত্তন সজ্জোদ্বর্ত্তনের পরিচায়ক" এই সূত্রের পরিপোষক।

এক্ষণে দৈহিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পঞ্জরাস্থি,—প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্যের পঞ্জরাস্থির সংখ্যা ১২ জোড়া। কিন্তু ভ্রূণাবস্থায় লক্ষ্য করিলে ১৪ জোড়া পঞ্জরের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত শিম্পাঞ্জী ও গরিলার পঞ্জরও ২৮ সংখ্যক। এই স্থলেও সেই "ভ্রূণোদ্বর্ত্তন সজ্জোদ্বর্ত্তনের পরিচায়ক।"

কেশ,—গর্ভিণীর ছয় মাস অন্তঃসত্বাকালে গর্ভস্থভ্রূণের কেবলমাত্র পদতল ও করতল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গই কেশাবৃত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই অবশ্য উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উহা জীবান্তকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ইহাও কি সেই "জাতি-মাত্রই স্বীয় বংশৈতিহ্যের পুনরালোচনা করে" সূত্রের পরিপোষক নহে?

অন্ত্রজ-উপযোগ,—মনুষ্যের বৃহদন্ত্রের পার্শ্বে সংলগ্ন লম্বমান্ একটী অব্যবহার্য্য অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল নাম "য়্যাপেণ্ডিক্স্ ভার্মিফর্মিস্।" ইহা অন্ত্রের একটী উপযোগ মাত্র। মানবশরীরে বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণই অব্যবহার্য্য। কিন্তু উদ্ভিজ্জভোজী কোন জন্তুতে এই অন্ত্রজ উপযোগ সুদীর্ঘ ও ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণকরণে সাহায্য করিয়া থাকে। মনুষ্যভ্রূণে ইহা সুদীর্ঘ না হইলেও ইহার ব্যাস কিন্তু বৃহদন্ত্রের সমানই ও বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বল্পায়তন হয়। এক্ষেত্রেও পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মটী প্রযোজ্য।

লাঙ্গুল,—নরাভকপি ও মনুষ্য উভয়েই লাঙ্গুলহীন। কিন্তু উভয় জন্তুরই ভ্রূণাবস্থায় লাঙ্গুল বিদ্যমান থাকে। এমন কি উহার সঞ্চালনোপযোগী দৈহিক কলা সমূহও দৃষ্টি-গোচর হয়। সুতরাং এই দুই জন্তু লাঙ্গুল সংযুক্ত একই পূর্ব্বপুরুষ সম্ভূত।

কেবল মাত্র এই চারিটী বিশেষত্ব কেন, আরও এরূপ বহুসংখ্যক বিশেষত্ব মনুষ্যদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা বানরেতর অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ হইতে হস্তান্তরিত হইয়া আসি-তেছে।

তার পর মনুষ্যের চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্ক ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গের ভ্রূণোদ্বর্ত্তন পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকটীর পরিপুষ্টিকালে শুধু জাতি মাত্র নহে, অঙ্গমাত্রই স্বীয় বংশৈতিহ্যের পুনরালোচনা করে। এসম্বন্ধে আর বিশেষ আলোচনা করিবার স্থান নাই। তাহা হইলে বৃহদাকার গ্রন্থারম্ভ করিতে হয়।

এই সমস্ত মানসিক সংস্কার ও দৈহিক বিশে-ষত্ব আমাদের জনন-কোষে বিদ্যমান রহিয়াছে; অন্য কোথাও নহে। কারণ জনন-কোষই যুগযুগান্তর হইতে বংশ রক্ষা করিয়া আসি-তেছে ও করিতে থাকিবে। জনন-কোষের অর্থাৎ স্ত্রীর ডিম্ব ও পুরুষের শুক্র-কোষের পরিপুষ্টিকালে যদি ঔষধ ইত্যাদির প্রয়োগ দ্বারা উহাদের স্বভাবিক গঠনের বিকৃতি-সাধন করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ বিকৃতি

তজ্জুৎপন্ন বংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইহারই নাম Inheritance of congenital variation. Inheritance of acquired characters বা দৈহিক পরাবর্ত্তন সন্ততিতে প্রবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং এরূপ পরাবর্ত্তনে জৈবিক বিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত পরাবর্ত্তনই জীবাভিব্যক্তির মূল হেতু। সম্প্রতি প্রাণবিজ্ঞানে হাতে কলমে জননকোষের বিকৃতি আনয়ন সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে।

এক্ষণে এসম্বন্ধে রবার্ট চার্লস্ ডারউইনের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Descent of Man and Selection in Relation to Sex" এর প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভকালে লিখিয়াছেন :—

"মানব পূর্ব্বকালের অপর কোনও জন্তু সম্ভূত কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসায় যে ব্যক্তি প্রয়াসী, সম্ভবতঃ প্রথমেই তাহার মনে নিম্ন-লিখিত প্রশ্নসমূহ জাগিয়া উঠিবে। যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, মনুষ্যে দৈহিক ও মানসিক পরাবর্ত্তনের উৎপত্তি হয় কি না; যদি হয়, তাহা হইলে ইতর প্রাণিগণের মধ্যে যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কার্য্যকারী ঠিক সেই একই নিয়মাধীন হইয়া এই পরাবর্ত্তনরাজি মানব সন্ততিগণে প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা। পুনরায় আমাদিগকে যথাসাধ্য দেখিতে হইবে ইতর প্রাণিজগতে যে যে প্রণালীক্রমে পরাবর্ত্তন সমূহ সংসাধিত হয়, মনুষ্যমধ্যেও সেই প্রণালী বলবান্ কি না। নিম্নশ্রেণীর জন্তু ও উদ্ভিজ্জগতে পারম্পরিক পরাবর্ত্তন, ব্যবহার্য্য বা অব্যবহার্য্য অঙ্গনিচয়ের বংশ পারম্পর্য্য ইত্যাদি নিয়ম কার্য্যকারী কিনা। বর্দ্ধিষ্ণু অঙ্গ বিশেষের হতভম্ভতা, একাধিক সংখ্যক একই অঙ্গের উৎপত্তি ইত্যাদিরূপ অঙ্গবিকৃতি মনুষ্যদেহে ঘটে কিনা। এবং এই সকল বিকারগুণক্ষেপণবশতঃ কিনা। মানুষ অপরাপর জন্তুর ন্যায় নানা প্রকার বর্ণ ও গণ্ডীতে বিপ্রকৃষ্ট হয় কিনা, অথবা এই বিপ্র-কর্ষণের উৎপন্নকারী পরাবর্ত্তন সমূহের দূরত্ব এত অধিক কিনা, যদ্দারা সন্দেহাত্মক নূতন জাতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইত্যাকার প্রশ্নও গবেষণাকারীর মনে অতি সহজেই উপস্থিত হইবে। ভূপৃষ্ঠে এই জাতি-সমূহের বসতি বিস্তার কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন জাতির সঙ্গম-সম্ভূত সন্ততিগণ প্রথম বংশে ও পরবর্ত্তী বংশে কিরূপ চরিত্র বিশিষ্ট হইবে। এইরূপ বহুবিধ প্রশ্ন হইতে পারে।

"পশ্চাৎ অনুসন্ধানকারীর মনে এক অতি গূঢ় প্রশ্ন উপস্থিত হইবে। মানবের জন্মসংখ্যা এত অধিক কিনা যাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে ঘোর ধস্তাধস্তি বাধিয়া যাওয়ার খুবই সম্ভা-বনা। এবং পরিশেষে অনুকূল দৈহিক ও মানসিক পরাবর্ত্তনের নির্ব্বাচন ও প্রতিকূল পরাবর্ত্তনের বিলোপ সাধন। বাস্তবিকই কি বিভিন্নজাতীয় মনুষ্য পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া কতকগুলির বিলোপ সাধন করে? অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে ইত্যাকার প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাতে বোধ হয়, ইতর জন্তুর সমাজ ও মনুষ্য সমাজ একই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী। * * *।"

তবে কিনা মানব ও অন্যান্য জন্তুর সমাজে একটা অতি বিশেষ রকমের পার্থক্য রহিয়াছে। এই পরাবর্ত্তনটী মানব সমাজকে একেবারে বিভিন্ন পথে চালিত করিয়াছে। মানবেতর জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের দৈহিক পরাবর্ত্তন অতি অল্পপরিমাণে বিশেষত্বসম্পন্ন। মানুষ উটের ন্যায় সাহারা মরুভূমিতে বিচরণ

করিতে পারে না, হরিণের ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়িতে পারে না; বানরের ন্যায় সে গাছে গাছে বেড়াইতে পারে না; গণ্ডারের ন্যায় সে বলশালী নহে। মানসিক শক্তির আধার মস্তিষ্কই তাহার প্রধান সম্বল। ইহার বলেই আজ সে জগতকে যেন "নূতন করিয়া গড়িতে চায়।" ইহার বলেই আজ সে বিবেক, নীতি, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণরাজিতে বিভূষিত। সে সমাজকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কৃত্রিম নির্ব্বাচন বা সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া পীড়িতের সেবা, দরিদ্রের অভাব মোচন, দুষ্টের দমন, ও বিকৃতভাবাপন্নের সংশোধন করিয়া বিমলানন্দে পরিপ্লুত হইতেছে। কিন্তু এই সদ্‌গুণরাজিও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। ইহা শিক্ষার ফল নহে। যীশু, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ বা অপর মহাত্মাদের জন্ম না হইলেও মনুষ্য-হৃদয়ে ঐ গুণনিচয়ের অভাব হইত না। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইয়া অতি হীন জন্তুসমাজেও ইহাদিগের ইঙ্গিত দেখিতে পাইব। এই সমস্ত গুণের পর্য্যালোচনা যদি নীতি বিজ্ঞানের (Ethics) অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই বলিব নীতি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে নহে। তুমি ভগবান মানই আর নাই মান, পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস কর আর নাই কর, মনুষ্যে সদ্‌গুণ-রাজির অভ্যুদয় প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী। সত্যই সে দিন নর্থ্-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন

"Let us stop the activity of our churches, and see if humanity can progress."

পরিভাষা।

অঙ্গবিনিশ্চয়	...	Anatomy
অণ্ডজ স্তন্যপায়ী	...	Monotremes
উভচর	...	Amphibia
এক জরায়ু	...	Monodelphia
গণ্ডী	..	Sub-variety
গুণক্ষেপণ	..	Atavism
গোষ্ঠি	...	Genus.
জনন-কোষ	...	Germ-cell.
জাতি	..	Species.
দ্বিজরায়ু	...	Didelphia.
দৈহিক কলা	...	Tissue.
পরাবর্ত্তন	..	Variation.
পরিবার	..	Family.
প্রাণ-বিজ্ঞান	..	Biology.
প্রাণিবিজ্ঞান	...	Zoology.

(উদ্ভিদ্ ও জন্তু উভয়েই প্রাণময় হইলেও বহু-ব্যবহার-হেতু Zoology অর্থে প্রাণি-বিজ্ঞানই ব্যবহৃত হইবে।)

বর্গ	..	Order.
বর্ণ	...	Variety.
ব্যক্তি	..	Individual.
ভ্রূণোদ্বর্ত্তন	...	Ontogeny.
শ্রেণী	...	Class
সঙ্ঘ	...	Phylum.
সঙ্ঘোদ্বর্ত্তন	...	Phylogeny.
সম্মিলিত কোষ	...	Fertilized cell.

যে সকল শব্দের মূল নাম রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি, এ।

বঙ্গের ঐতিহাসিক

পাবনা উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে নাটোরের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গের ঐতিহাসিক সম্বন্ধে তিনি অভিভাষণে বলিয়াছেন—

"অক্ষয় কুমারের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি ছিল বা ছিল না, সে কথার বিচার তখন মনে আইসে নাই। * * * ইউরোপীয় মনীষাসম্পন্ন ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গলার মধ্যযুগের যে ইতিবৃত্ত উদ্ধার একরূপ অসাধ্যসাধন বলিয়া নিরাশার সহিত উদ্যম ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণ বিচারশক্তির গুণে সেই ইতিহাস রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দুষ্কর তপশ্চরণ করিয়া যে সকল মহানুভব মনীষীগণ দেশের লুপ্তপ্রায় ইতিহাস উদ্ধার করতঃ আমাদের চিরলাঞ্ছনা বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন, এই তপস্যার যথাযথ ফল তাঁহারা এখন না পাইলেও আমাদের উত্তর পুরুষদিগের জীবনের সর্ব্বপ্রকার সফলতার মধ্যে ইহার সাফল্যের বীজ নিহিত হইয়া রহিল।"

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এই অভিভাষণ মধ্যে অপর কোন ঐতিহাসিকের নাম না দেখিয়া ১৩২০ চৈত্রের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন—"কালানুক্রম, গুণানুক্রম বা বর্ণনানুক্রম না ধরিয়া ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানক্ষেত্রে আরও কয়েকটী নাম করা যাইতে পারে; যথা—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নিখিলনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাধেশচন্দ্র শেঠ, শরচ্চন্দ্র দাস, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, হারাণচন্দ্র চাক্লাদার" ইত্যাদি।

গত বৈশাখ মাসের মানসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাস্পদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সমস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের নাম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জন বাঙ্গালাভাষায় মৌলিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন বা পুস্তকাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের ইংরাজী ভাষায় রচিত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ বা পুস্তকাদির তুলনায় কিছুই নহে। * * * মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাসের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এখন বাঙ্গালাদেশে নাই, কিন্তু তাঁহারা কয়খানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বাল্মিকীর জয়" ও "মেঘদূত" রচয়িতা বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বিখ্যাত। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় কোন উল্লেখ

যোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। রসায়ন বিদ্যাবিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় লিখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখনও কোন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করেন নাই, এতদ্ব্যতিত নিখিলনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে কেন স্থানলাভ করিতে পারেন নাই, তাহা প্রথমে আমিও বুঝিতে পারি নাই। * * * সভাপতি মহোদয় বঙ্গ সাহিত্যে যুগ প্রবর্ত্তকগণের নাম দিয়াছেন মাত্র, তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নামের তালিকা নাই। যে হিসাবে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম কীর্ত্তন হইয়াছে, সেই হিসাবেই অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র বাদ পড়িয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস ক্ষেত্রে * * * প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের মহামহারথিগণ বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টায় যাহা করিতে পারেন নাই, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, ফ্লিট প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ যাহা অসাধ্যসাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন, রমাপ্রসাদ বাবু তাহা অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সাধন করিয়াছেন।"

রাখাল বাবু আরও বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গৌড়রাজমালা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই জাতীয় যশ তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া আর কেহ অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। * * * রমাপ্রসাদ বাবু ভারতের ইতিহাসের উপাদান হইতে গৌড়বঙ্গের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। বিশাল সমুদ্ররূপ উত্তরাপথ দক্ষিণাপথের খোদিত লিপিমালার সার সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার গৌড়রাজমালা প্রণয়ন করিয়াছেন।] ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তি এই উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে পারিত, কিন্তু সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রমাণগুলি যোজনা করিয়া উত্তর পূর্ব্ব ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না। রমাপ্রসাদ বাবু যে সমস্ত উপাদান লইয়া গৌড়রাজমালা রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। * * * ভারতবর্ষের অপরাপর দেশ বা রাজবংশের ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রমাপ্রসাদ বাবুকে এই ইতিহাসখানি রচনা করিতে হইয়াছে, তাই রমাপ্রসাদ বাবুর কৃতিত্ব। ইত্যাদি

আমরা এই প্রবন্ধে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে ইতিহাস নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক ছিল এবং এখনও আছে। ভারতবাসী আর্য্যগণ নাকি ইতিহাস লিখিতেই জানিতেন না—কিন্তু প্রমাণ আছে, ইতিহাস শব্দটা তাঁহারা জানিতেন, শুনিতে পাই সেই বৈদিক যুগের আদি কাল হইতে লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত ইতিহাস নাই। মুসলমানগণ ইতিহাস লিখিতে জানিতেন তাই তাঁহাদের রাজত্বকালে আমাদের দেশের ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যায়।

প্রথমে আমরা দেখিব ইতিহাস কি? শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

উর্ব্বশী পুরুরবার কথোপকথনাদি স্বরূপ ব্রাহ্মণভাগের নাম ইতিহাস এবং "সর্ব্ব প্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল" ইত্যাদি সৃষ্টি প্রক্রিয়াঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ।

মহাভারতে লিখিত আছে—

যাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে তাহাকে ইতিহাস কহে।

বিষ্ণু পুরাণের টীকায় (৩।৪।১০) শ্রীধর স্বামী এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আর্ষ্যাদি বহু ব্যাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যদ্ভুত ধর্ম্মযুক্॥

ঋষি প্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান দেব ও ঋষিচরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।

এই সমস্ত উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, ইতিহাস কি, তাহা আর্য্যগণ জানিতেন এবং ইতিহাস তাঁহারা লিখিতেন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, আখ্যানাবলী, ইতিহাস, পুরাণ সকল ও খিল সমূহ শুনাইতে হইবে।"

উপরে লিখিত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ ইতিহাস লিখিতেন এবং পুরাণ ও ইতিহাস পৃথক পৃথক্ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ইতিহাস গেল কোথায়? এখন আমরা ইতিহাস নামে কোন গ্রন্থ পাই না, পাই কেবল পুরাণ। অতএব ইতিহাস কি হইল? মহাভারতে লিখিত আছে— "পুরাণে সমুদয় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার নিকট সে সকল কথা শুনিয়াছি।"

অতএব ইতিহাস যে পুরাণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতিহাসে কেবল যে রাজাদিগের বংশ বৃত্তান্ত থাকিত না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ সাধারণ বংশবৃত্তান্ত এবং সমাজের বৃত্তান্তও থাকিত, তাহাও জানা যাইতেছে। সুতরাং এখন পুরাণ হইতে ইতিহাসকে পৃথক করিতে হইবে।

ইতিহাস লোপ পাইবার কারণও এই পুরাণ সমূহ। সমস্ত পুরাণই প্রশ্নোত্তর ক্রমে রচিত হইয়াছে। সুতরাং যে বিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে, পুরাণে কেবল তাহারই উত্তর পাওয়া যায়। ইতিহাস সম্বন্ধে যে প্রশ্ন হয় নাই, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে অনেক ইতিহাস নষ্ট হইয়াছে। সে সমস্ত উদ্ধার করিতে হইলে বিশেষ ধৈর্য্যতা সহকারে শাস্ত্র-সাগর মন্থন করা আবশ্যক।

এক্ষণে আমরা দেখিব, এখন ইতিহাস কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? ইতিহাস জাতীয় বিবর্ত্তের বিশদ বিবরণ। ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই জাতি। এই জন্যই ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন চরিত নহে; এইজন্যই একজনকে লইয়া ইতিহাস হয় না, সাধারণকে লইয়া হয়। এই জন্যই প্রধানতঃ প্রজাই ইতিহাসের বিষয়, রাজা কচিৎ। সিরাজুদ্দৌলা অত্যাচারী ছিলেন কিনা, আরঙ্গজেব স্বয়ং মদ্য পান করিতেন কিনা—ইহার অপেক্ষা সিরাজুদ্দৌলার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল, আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল কিনা এই সকল প্রশ্নের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক। সাধারণতঃ প্রজাই ইতিহাসের বিষয়। তবে যেখানে রাজার নিয়োগ প্রজার সাহিত্যে বা সম্পদে কোন নূতন স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—যেখানে রাজার শাসননীতির ফলে প্রজার জাতীয় জীবনে উন্নতি বা অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে—যেখানে রাজার আজ্ঞায় প্রজার বাণিজ্য সম্বন্ধে বা প্রজাসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত

হইয়াছে, সেখানে রাজার শাসন-নীতি সমালোচ্য—সুতরাং রাজা ইতিহাসের বিষয়। আরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষের অনুকূল পবন না পাইলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় উন্নতির তরণী বেগে অগ্রসর হইতে পারিত কি না সন্দেহ; ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ত্তমান আকার ধারণ করিত কি না, বলা যায় না; সুতরাং আরঙ্গজেবের শাসন-নীতি ইতিহাসের বিষয়—আরঙ্গজেব ইতিহাসের বিষয়ীভূত। *

এখন আমরা বুঝিলাম ইতিহাস কি? দেখাযাউক এই ইতিহাস কিরূপে উদ্ধার করিতে হয়?

বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মত। তাঁহাদের মূল মন্ত্র এই—

(১) কোন চিহ্ন, তাম্রশাসন বা শিল্প-লিপির প্রমাণ।

(২) সমকালের গ্রন্থ। তাহা আবার সেই সময়ের অক্ষরে হওয়া চাই, কারণ সাত নকলে আসল খাস্ত হয়।

(৩) পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত যে প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদান স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে।

(৪) যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য এবং যে জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল তাহাই ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য।

ইহার বাহিরে যিনি যাইবেন, তাঁহার আলোচনা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ বিজ্ঞান-সম্মত হইবে না। সুতরাং ঐতিহাসিককে এই নিয়মে বাধ্য হইয়া ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে।

এখনকার ঐতিহাসিকগণ তাহা করেন না। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"সকল বিদ্যার অনুশীলনেই অধিকারী অনধিকারী আছে, কেবল প্রত্নবিদ্যার অনুশীলনেই তাহা নাই এরূপ তর্ক আদৌ উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে তাহাই উত্থাপিত হইয়া থাকে। তাহার প্রভাবে যে কেহ লিখিতেছেন- যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন —অনেক স্থলে নিতান্ত নির্লজ্জের মত লিখিতেছেন।" †

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

"একে অনুসন্ধানকারীর সংখ্যা অল্প; তাহাতে আবার পেশাদারের সংখ্যাই অধিক। যাহারা পেশাদার নয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে আপন অহমিকার অথবা স্বার্থের চরিতার্থতা সাধনের জন্যই অধিক লালায়িত। এই সকল কারণে প্রত্নবিদ্যার অনুশীলনে অপরিহার্য্য অন্তরায়ের অভাব নাই। যাহারা বেতন লইয়া কাজ করে, অথবা দেশের লোকের নিকট চাঁদা কুড়াইয়া কাজ চালায়, তাহাদিগের পক্ষে মনিবের মনোরঞ্জন লালসা, আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপনের লালসা এবং যে কোনও উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের লালসা বড় স্বাভাবিক। তাহারা বিজ্ঞাপন চায়, চাটুকার চায়, যশের ডঙ্কা বাজাইবার জন্য লোক ভাড়া করে; যাহারা একটু চতুর, তাহারা চেলা সংগ্রহ করিয়া, তাহার সাহায্যে আপন অভিমত প্রচারিত করিতে থাকে। এই সকল লোক চাকরী বা ব্যবসায়টা বজায়

* সাহিত্য ১৩০৬। ১৫৪

† সাহিত্য ১৩১৯। ৬৯২

রাখিবার জন্যই প্রাণপণ করে। ভুল করিলে ভুল স্বীকার করে না; ভুল দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ না হইয়া, উত্যক্ত হইয়া উঠে। প্রত্ন-বিত্তার যাহা হয় হউক, আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা পাইলেই ইহারা কৃতার্থ হয়; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভুল করিলেও, বিজ্ঞতার আড়ম্বরে ভুলগুলিকে চাপা দিয়া রাখিতে চায়।" *

বহুদর্শী অক্ষয় বাবুর এই কথাগুলি খুব ঠিক। প্রমাণস্বরূপ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি হইতে প্রকাশিত "গৌড়রাজমালা"র কথা বলিতে পারি। রাজসাহী হইতে গৌড়রাজ-মালা যখন প্রকাশিত হইল, তখন একটা বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কলিকাতায় ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল— সোদর-প্রতিম সখার ব্রজভূমি মনে পড়িয়া গেল—ঐক্যতান বাদনের সমবেত ঝঙ্কারের ন্যায় হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল—শ্লাঘার বিস্ময় শত-বঙ্কি-জিহ্বায় হৃদয় খানা জুড়িয়া বসিল—কেহ গৌড়রাজমালার মন্দ খুঁজিয়া পাইল না। সাহায্যের জন্য বঙ্গীয় বিদ্বজ্জন সমাজের নিকট ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। পুস্তকখানি সমালোচনা করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা স্বীকার করিবার মত কেহই সমালোচনায় হাত দিলেন না। কেবল খাতিরে ওজনে সমালোচনা বাহির হইল। খাতির লোককে দোষ দেখিতে দেয় না, তাই গৌড়রাজমালার দোষ কেহ দেখিল না।

প্রশংসা দেখিয়া পুস্তকখানি দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। দেখিলাম—কিন্তু দেখিলাম কি? দেখিলাম যোগাড়ে ত্রুটী নাই, কিন্তু রাঁধুনী কাঁচা! কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঐতি-হাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"রমাপ্রসাদ বাবু যে সমস্ত উপাদান লইয়া গৌড়রাজমালা রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।" এই সমস্ত প্রমাণই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আবিষ্কার করিয়া Epigraphia Indica প্রভৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে রমাপ্রসাদ বাবু সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যে তরকারীতে যে মস্‌লা আবশ্যক তাহা দিতে পারেন নাই— এক তরকারীতে অন্য তরকারীর মস্‌লা দিয়া ফেলিয়াছেন। সাদা কথায় যাকে "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়া" বলে। কর্ত্তব্যবোধে আনন্দ বাজার পত্রিকার স্তম্ভে ১৩১৯ সালের ৩রা আশ্বিন হইতে ১৩২০ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্তাহের পর সপ্তাহে সে গুলি সকলকে জানাইয়া দিলাম। গৌড়-রাজমালার লেখক তাহার উত্তর দিতে অর্থাৎ খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

যিনি মহৎ, খাতির অপেক্ষা সত্যের যিনি আদর করেন, তিনি দেখিয়া বুঝিলেন পূর্ব্বে প্রশংসা করিয়া থাকিলেও পরে প্রতিবাদের গুরুত্ব স্বীকার করিলেন, কিন্তু লাভ করিলেন "সোদর-প্রতিমের" গালাগালী।

"(মহৎ ব্যক্তি) ছেড়ে দিলেন পথ্‌টা, (তাঁর) বদ্‌লেগেল মতটা"। কিন্তু "খাতিরের গেলনা জেদ্‌টা"। তাই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত লোক জেদী খাতিরদারদের নিকট গালি খাইলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অপরাধ, তিনি চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে আমার

* সাহিত্য ১৩১১। ৬৯৩ পৃষ্ঠা

প্রতিবাদের গুরুত্ব স্বীকার করিলেন, অমনি ভীমরুলের হাঁড়িতে ঢিল পড়িল, বসুমতি পত্রিকা জলিয়া উঠিল, সরকার মহাশয়কে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। সরকার মহাশয়ের মত বিজ্ঞ বিচক্ষণ সাহিত্যিককে ঐরূপ ভাষায় গালাগালি কোন ভদ্র লোকে দিতে পারে না। কিন্তু খাতিরের চোটে তাহাও হইয়া গেল, আমিও বাদ গেলাম না। একটু নমুনা শুনিবেন! "পরিশিষ্টে সরকার মহাশয় লজ্জার মাথা খাইয়া শিষ্টতাকে একেবারে জাহান্নমে দিয়াছেন।" "বিনোদ বাবু নির্লজ্জের মত আমাদের কথার কদর্থ করিয়া আমাদিগকে গালি দিয়াছেন" ইত্যাদি।

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—"বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় এই রাজমালার বিস্তর ভ্রম বা অনবধানতা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে যেন বোধ হয়, যতটা শ্রম বা যত্ন করিলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আরও নির্দোষ হইতে পারিত, ততটা যত্ন করা হয় নাই। বিনোদবিহারী রায় স্বয়ং প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকের ৫৬ খণ্ড ক্রয় করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।" (বঙ্গদর্শন ১২৯পৃষ্ঠা)

এই কথায় বসুমতী সম্পাদক এতই মর্ম্মাহত হইয়াছেন যে তিনি ২০শে বৈশাখের (১৩২০) বসুমতীতে লিখিয়াছেন—

"ইহাই 'গৌড়-রাজমালার' সরকারী সমালোচনা, এই সমালোচনার বাহার এই যে, সরকার মহাশয় একখণ্ড গৌড়-রাজমালা পাইয়া উহা পড়িয়া উহার লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়কে ঐ গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন সেই প্রশংসার এত বেগ আসিয়াছিল, যে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাও তিনি খুজিয়া পান নাই। তাহার পর তিনি চট্টলের সাহিত্যিক-কুঞ্জে পুংস্কোকিল হইয়া যখন কুহুরবে সকলের মনঃপ্রাণ হরিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি ঐ গ্রন্থখানিকে একেবারে গোল্লায় দিয়াছেন। ইংরাজীতে যাহাকে Damning with faint praise বলে, সরকার মাহাশয় গ্রন্থখানিকে তাহাই করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু গ্রন্থখানি লিখিতে শ্রম বা যত্ন করেন নাই, এই কথাই তিনি 'আড়ে আড়ে' বলিয়াছেন।"

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা নিজের দোষ পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান। বসুমতী সম্পাদক বলিয়াছেন —"পরের মুখে ঝাল খাইলে এইরূপ দশাই হয়। তিনি (সরকার মহাশয়) যদি নিজে ঐ গ্রন্থের কোনও দোষ বা ভ্রম দেখাইয়া দিতেন—তাহা হইলে আমাদের ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ ছিল না।" সরকার মহাশয়ের মত লোককে বসুমতী সম্পাদক এই যে গালাগালি দিতেছেন, ইহা কিন্তু একেবারে ফাঁকার উপর, কারণ বসুমতী সম্পাদক আমার প্রতিবাদ পড়েন নাই, তিনি বড়ই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছেন—"তিনি (আমি) কোথায় কি লিখিয়াছেন, তাহাই যে সকলকে আর সব কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া পড়িতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়া লইলেন কিরূপে? আমরা তাঁহার সেই বিদ্যার দৌড় দেখি নাই।" ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে গৌড়-রাজমালার খাতিরে বসুমতী সম্পাদক এতই জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, যে আমার প্রতিবাদ পড়া আবশ্যক বোধ করেন নাই, না পড়িয়াই সরকার মহাশয়কে গালাগালি দিয়াছেন।

তাই বলি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বহু মূল্যবান কথার এই একটী জীবন্ত উদাহরণ। এখনও গৌড়-রাজমালার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এইরূপ অবৈধ চেষ্টা চলিতেছে, তাই রাখাল বাবু মানসী পত্রিকায় তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু এই প্রশংসা পড়িলে বসুমতীর, না পড়িয়া দোষ দিবার কথাই মনে পড়ে। অক্ষয় বাবুর কথা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। এই রাখাল বাবুও হয়ত বসুমতীর মতই বলিবেন, "সব কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া গৌড়-রাজমালার প্রতিবাদ পড়া তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই।" যদি তিনি বাস্তবিক ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তবে আমার প্রতিবাদ পড়িলেই তিনি কখনই গৌড়রাজ-মালার মত সমর্থন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ভালবাসার নিকট সকলেই অন্ধ, তাই আমরা দেখিতে পাই, লোকে কাণাছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে, মুখরার নাম রাখে সুভাষিণী, কাল মেয়ের নাম রাখে সুন্দরী। যাহা সত্য এবং যাহা মিথ্যা তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবার উপযুক্ত চিত্তবল না থাকিলে এইরূপই হয়।

তাই বলি অক্ষয় বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ নিজ ভুল দেখিতে চান না,—কেহ দেখাইয়া দিলেও গ্রাহ্য করিতে চান না।

আগামী বারে আমরা বঙ্গের অন্যান্য ঐতিহাসিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

বঙ্গে শিক্ষাসমস্যা

মানুষ চিরকাল গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে যে ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। মানুষ কিসে শ্রেষ্ঠ একথার উত্তর হয়ত অনেকেই দিতে অসমর্থ কিন্তু সে যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব একথা সে কোন দিন অস্বীকার করে নাই ভবিষ্যতে বোধ হয় করিবে না। সে এতদূর গর্ব্বিত যে সে বানরের বংশধর একথা বলিতেও তার বুকে বাজে! মানুষ বড় কিসে? তাহার দয়ামায়ায়?—না সে কথা ঠিক নয় অনেক নিম্নস্তরের জীবও এগুণের অধিকারী—পাখীর মায়া কাহার অবিদিত! মানুষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে—বিবেকে—তাহার বুঝিবার ক্ষমতা আছে তাই সে বড়। তাহার ভাষা আছে তাই সে নিজে অভিজ্ঞতা পরের কাছে জানাইতে পারে সে অপরের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা করে তাহার কি হইবে।

"The distinguishing characteristic between man and brute is reason; and reason, the faculty that sees the general rule in a special example enables man to foresee the possible or probable course of events, to make plans, to avoid danger, and to sow the seed in summer with the expectation of reaping the harvest in the fall. All other creatures must adopt

themselves to the surrounding as well as all other conditions to his wants." *

বিবেকই মানুষকে বড় করিয়াছে। আজ মানুষ যে জগতের অন্য সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে বিবেকই তাহার মূল। পাশ্চাত্য জগত যে পূর্ব্বের উপর এতদিন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে বুদ্ধি ও বিবেক যে তাহার মূল সে কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? না কখনই নহে। আজ যে এসিয়াবাসী পৃথিবীতে শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিতে অগ্রসর হইতেছেন ইউরোপ আমেরিকা যে আজ সেই শান্তির বার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে ইহার কারণ কি?—ইহার কারণ এদেশবাসীর গভীর অসীম জ্ঞান একথা কি বলিতে হইবে। আজ পাশ্চত্য জগত রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতায়, ব্রজেন্দ্রশীলের ধর্ম্মপ্রাণতায়, ডাক্তার জগদীশচন্দ্রের ও প্রফুল্লকুমারের গবেষণায় বিভোর হইয়াছে; কেন?

বিবেকই মানুষকে বড় করিয়াছে। এই বিবেক কোথা হইতে আইসে? ইহা কি জীবের মধ্যে মনুষ্যের মধ্যে নিহিত আছে, না বাহ্য জগতের প্রভাবে মানুষ জ্ঞানী হয়? পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন এইগুণ মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে ইহার ক্রমবিকাশ হয়। এই গুণ লুকায়িত থাকে পরে ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে থাকে। ডিম্বাণুর মধ্যে যে হস্ত পদাদি উৎপন্ন হইবার জন্য একটি ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকে বিবেকেরও সেইরূপ থাকে।

"According to theory of evolution the nature of higher animals was assumed to be predetermined by the mystrious disposition of the original life plasm, in about the same way as the chicken, with all its limbs, its bodily and psychic faculties is some how pre-existing in the ovule of egg."

কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে এক্ষণে আর কেহ একথায় বিশ্বাস করিতে চান না। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণের মতে, বাহ্যিক প্ররোচনাই জ্ঞান উৎপত্তির প্রধান উপায়। মানুষ জগতের দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সমজাইয়া তবে শিখে তবে সে উন্নতির মার্গে উঠিতে থাকে। যে কোন জাতি চেষ্টা করিলেই উন্নতির মার্গে উঠিতে পারিবে—জন্মের জন্য তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। সে নীচ বংশে জন্মিয়াছে অতএব সে কিছুই শিখিতে পারিবে না, তাহার বুদ্ধি মোটা এশিক্ষা এখন আর জগতে স্থান পাইবে না। এখন বলিতে হইবে, যে চেষ্টা করিবে সেই উঠিবে—এখানে যিশুখৃষ্টের ন্যায় বলিতে হইবে—দ্বারে ধাক্কা দাও তোমার জন্য উন্মুক্ত হইবে, চেষ্টা কর তুমি যাইতে পারিবে—পথ তোমারই জন্য—অন্বেষণ কর তোমার নিশ্চয়ই মিলিবে—এখানে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে না। আমি ভারতে জন্মিয়াছি অতএব আমার শিক্ষা ইহার অধিক হইবে না এ ধারণা আর মনে স্থান দিও না। আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মাই নাই অতএব আমার শাস্ত্র আলোচনায় ফল নাই এ কথা এখন প্রচার করিলে চলিবে না।

"The majority of the naturalist of this age hold that the growth of

* The Rise of Man.

the higher life is not directly due to the latent qualities of ancestors, but is the result of new acquirements conditioned by extended experiences under definitely given surroundings. The progress which mankind is making still in its onward march to the planes of higher existence, is due to the lessons of life and not to the mysterious potencies of premordial germs."

জ্ঞানের দ্বার কাহারও একচেটিয়া নহে—হইতে পারে না। কেহ যদি ইহা একচেটিয়া করিতে চায় আমরা তাহাকে এরূপ করিতে দিব না। প্রকৃতির চক্ষে আমরা সকলেই এক, তাঁহার চক্ষে প্রভেদ নাই, থাকিতেও পারে না। কেহ যদি সে প্রভেদ রাখিতে চায় তাহা কালের স্রোতে টিকিবে না, তাহার প্রতিরোধ বালুকারাশির বাঁধের ন্যায় ধুইয়া যাইবে। তাই আজ কাহারও শাস্ত্র আলোচনায় বাধা নাই, তাই আজ কেহ নিজের হীন জন্মের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য নহে। আজ জ্ঞানের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত। ইহার রত্নরাশি যত ইচ্ছা লও ইহাতে কেহ বাধা দিবে না। আর যদি কেহ বাধা দিতে আইসে তাহা ক্ষণিক, সে কালের মুখে ভাসিয়া যাইবে।

জ্ঞান অর্জ্জন করিতেই হবে—জ্ঞান অর্জ্জন করিব কি করিয়া?—ভাষার সাহায্যে—কোথায় কি হইয়াছে, হইতেছে, হইবে সবই ভাষার সাহায্যে অর্জ্জন কর। তোমার যে ভাষা আছে যাহার জন্য তুমি নিজেকে অন্য সৃষ্ট জীব হইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর তাহারই সাহায্যে আজ জ্ঞান অর্জ্জন কর। তোমার ভাষা পুষ্ট করিয়া আজ তোমার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও। তোমার দেশবাসীর যাহার যত ইচ্ছা লইয়া যাউক এই অনন্ত সমুদ্র কেহ শোষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিবে না।

'গৃহস্থে'র মূলমন্ত্র—"মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অল্প-কালের মধ্যে পরিপুষ্ট ও সর্ব্বতোমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক, অনুবাদককে অনন্যকর্ম্মা হইয়া জীবন অতিবাহিত করাইতে হইবে। এই সাহিত্য সেবিগণের অন্ন চিন্তা দূর করিবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে "সংরক্ষণ নীতি" (Policy of Protection) প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে হইবে"। সকলেই এ কয়েকটি ছত্র প্রতিমাসেই পড়িয়াছেন কিন্তু কয়জন ইহার উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? কয়জন ইহাতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? মৌখিক সহানুভূতি থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে লাভ কি? জগতে ত্যাগই মহৎ—কয়জন আজ মাতৃভাষার জন্য কতটা ত্যাগ করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আজ কয়জন প্রাণের সহিত বলিতে পারেন—

"মন্দির রচি মা তোমার লাগি
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননী
স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান,
জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে
(আমি) চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
অমল কমল চরণে স্থান॥"

যদি এখনও বলিতে না পারেন যাহাতে শীঘ্র বলিতে পারেন সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হউন। সে জন্য প্রত্যহই চেষ্টা করুন। মাতৃ-ভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ না হইলে উন্নতি কোথায়? আজ বিংশশতাব্দীর ঘোর সংগ্রা-মের দিনে আমরা কোথায় থাকিব একবার চিন্তা করুন। আমাদের কোন কিছু বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করিতে হয়। ইহা বড় সোজা কথা নহে। ইহা কয়জনের ভাগ্যেই বা ঘটিয়া থাকে? বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে অন্ততঃ ১০বৎসর সময় লাগে। শিক্ষা-লাভের ভিত্তির জন্য ১০ বৎসর কাল বড় অল্প নহে। যাঁহারা Matriculation এর ছেলেদের বয়স দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে প্রায় ১৮ বৎসর বয়সে ছেলেরা এই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। বাঙ্গালীর এখন জীবন ৫০ হইয়াছে। শিক্ষার ভিত্তির জন্যই যখন ১৮৷২০ বৎসর কাল ব্যয়িত হয় তখন উচ্চ-শিক্ষার সময় কোথায়? তাহা ছাড়া আমাদের কালেজে যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিয়া থাকি তাহা পাশ্চাত্যদেশে স্কুলেই সম্পন্ন হয়। তাহা ত হইবারই কথা। তাহাদের ত ভিত্তির জন্য এতকাল ক্ষেপণ করিতে হয় না। ইংলণ্ডের স্কুলে যে সমস্ত পুস্তক বিশেষতঃ বিজ্ঞান পড়ান হয়, আমাদের দেশে সেগুলি কালেজে পড়ান হয়, কাজেই আমাদের শিক্ষা উহাদের অপেক্ষা কম হয়।

আমাদের দেশের সকলকেই বাঙ্গালা শিখিতে হইবে এরূপ একটা নিয়ম বা প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রবাদ বলিতেছি কেন না কথাটা আছে বটে কিন্তু তদনুযায়ী কোনও কাজই হয় না। একথা শুনিয়া হয়ত অনেকেই রাগ করিবেন কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিয়া দেখিবেন যে আমি এক্ষেত্রে সত্য ছাড়া আর কিছু বলিতেছি না। আমরা এই ভারটা অর্থাৎ বাঙ্গালা শিখাইবার ভারটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়াছি। আর বিশ্ববিদ্যালয় সেটা স্কুল কালেজের কর্ত্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কর্ত্তৃপক্ষ-গণ পণ্ডিতমহাশয়ের উপর এবং তিনি ছাত্রে-দের উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। স্কুল কালেজে যে বাঙ্গালা পড়া হয় তাহা তামাসা মাত্র। সপ্তাহে একদিন বাঙ্গালা হয় কোন কোন স্কুলে দুইদিনও হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীরা কিরূপ বাঙ্গালা পড়ে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অনেকেই বাঙ্গালা একটা পড়িবার জিনিস বা শিখিবার আবশ্যকতা আছে মনে করেন না। তাঁহারা চিঠি পত্র সবই ইংরাজিতে লিখেন—আমি এক কৃতবিদ্য ছাত্রের কথা জানি, তিনি মাতাকে পত্র লিখিবার সময় পত্রের শিরোনামায় ইংরাজিতে বাটীর ঠিকানা ও তারিখ লিখিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পত্রের মধ্যেও দুই চারিটি ইংরাজি শব্দ ছিল। বলা বাহুল্য মাতা ইংরাজির কোনও ধারই ধারিতেন না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে একটু কড়া কড়ি নিয়ম করিলে বোধ হয় এ অসু-বিধাটা দূর হয়। তাঁহারা পরীক্ষাগার সম্বন্ধে ইংরাজি tutorial class সম্বন্ধে অনেক আইন কানুন করিয়াছেন স্কুল কালেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা মানিয়া চলিতেছেন। আর এটুকু কি চলা অসম্ভব।

বাঙ্গালার আদর যথেষ্ট কম একথা বলিলে রাগ করিবার কিছুই নাই। Matriculation এ ইতিহাস বাঙ্গালায় লেখা চলে কিন্তু কয়জন

ছাত্র বাঙ্গালায় লিখেন এসংবাদ কি কেহ রাখেন। অনেক ছাত্রই বলেন যে ইংরাজিতে লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। দোষ কাহার? ছাত্রের না শিক্ষকের?

আমাদের অতি শীঘ্রই ভাষাকে সর্ব্বতোমুখী করিয়া লইতে হইবে—আর সেইগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাইবার বন্দবস্ত করিতে হইবে। হইবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস ভূগোল প্রণয়ন করিতে হইবে। ছাত্রেরা যাহাতে নিজ ভাষায় লেখে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবে। বাঙ্গালায় যাহাতে ছাত্রেরা আকৃষ্ট হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

বঙ্গের সাহিত্য সম্পদ জগতের কোনও সাহিত্যের নিকট হেয় নহে। বাঙ্গালায় উচ্চদরের সাহিত্যের অভাব নাই। অভাব কেবল পাঠকের। আমাদের স্কুল কালেজে এখনও অনেক অপাঠ্য গ্রন্থ পড়ান হয়। সেইগুলিকে বদলাইয়া রবীন্দ্রনাথের দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা পদ্য চালাইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্য মহারথিগণের অমূল্য গ্রন্থাদি পড়াইতে হইবে। ভারতের উচ্চভাব সকলের প্রাণে প্রাণে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। অনেকে বলেন বাঙ্গালায় উচ্চদরের গ্রন্থে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা স্কুলে চলিতে পারে না। ধরিয়া লইলাম এমন অনেক জিনিস আছে—কিন্তু তাহা হইলে Walterএর কেতাব চলিতেছে কি করিয়া। বাঙ্গালা যে দোষে দুষ্ট, Scottএর লেখা কি সে দোষে দুষ্ট নহে। যদি Scottএর লেখা অবাধে চলে তখন বাঙ্গালা চলিবে না কেন?

স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদি অনেক সময়ই অতি অপকৃষ্ট। ইহাতে শিক্ষা হয় না। ইহাতে মনের তেজ হয় না। ইহাতে বালককে সর্ব্বত্রই মস্তক হেঁট করিতে বলে, কোথায়ও বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে বলে না। যাহাতে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয় না সেরূপ অপদার্থ জিনিস পড়াইয়া কি কিছু লাভ আছে। বালক বিনয়ী হইবে সত্যবাদী নম্র হইবে সত্য কিন্তু আবশ্যক মত কি সে তেজস্বী হইবে না? তাহাকে কি সমস্ত বিষয়ই নির্ব্বিরোধে সহ্য করিতে হইবে? যে সাহিত্য এরূপ শিক্ষা দেয় সে সাহিত্য ঘৃণ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্ষমাগুণ কখন?—যে ক্ষমা করিতে পারে? যাহার শক্তি আছে সেই ক্ষমার অধিকারী। একজন মুটেকে আমি যদি মারি আর সে যদি কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে কি বলিব সে আমায় ক্ষমা করিয়া গেল? কাজেই মানুষ গড়িতে গেলে সব গুণের শিক্ষা দিতে হইবে। যে সাহিত্য এরূপ শিক্ষা দিবে না, যে সাহিত্য কেবল স্ত্রীলোকের গুণ শিক্ষা দিবে, তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। তাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রের আগাছা। কিন্তু আমাদের এতই দুর্দ্দিন যে এরূপ পুস্তকাদিই আমাদের বালকদের শিক্ষার জন্য পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমাদের স্কুলের জন্য, পাঠশালার জন্য পুস্তকাদি রচনা করিতে হইবে। আজ কাল আর্য্যকীর্ত্তির ন্যায় পুস্তক আর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে স্থান পায় না। কেন? অনেকই বলেন ইহা দূষণীয়। বীরত্ব কাহিনী দোষণীয় ইহা ভারতবাসীর মুখেই শোভা পায়। ইংরাজি একখানি বই খুলিয়া পড় দেখিবে তাহাদের দেশের বীরত্ব কাহিনী প্রতি ছত্রে লিখিত, তাঁহাদের স্বদেশপ্রেমিকতা প্রতি অক্ষরে প্রতিফলিত। সুকুমারমতি বালকগণ ইহা হইতে কি শিক্ষা করিবে? স্বদেশপ্রেমিকতা

কখনই রাজদ্রোহিতা নহে। কে নিজের ছেলে নিজের ঘর নিজের দেশকে না ভালবাসে? ইহাতে দোষ নাই। যে বলে সে পাগল হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে এ বিষয় লক্ষ্য করেন তাহার জন্য আমাদের অশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। গত আষাঢ় মাসের "গৃহস্থের" বঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব শীর্ষক আলোচনায় লিখিত হইয়াছে—"এই সময় সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদিগকে (বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে) ধরিয়া পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের বন্দবস্ত করিয়া লন তাহা হইলে আজ না হয় কাল অবশ্য আমাদের আশা ফলবতী হইবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের যাহাতে এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে সেরূপ চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে। আমরা নিজেদের ভাষা জ্ঞানার্জ্জন করিব ইহা আর অধিক কি? এরূপ বলিবার আমাদের একটা দাবী আছে। ইহা ত ভিক্ষা নহে। এটুকু দাবী তাঁহাদের গ্রাহ্য করিতেই হইবে। যাহা ন্যায্য তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী করিয়া সমস্ত জিনিসই লইতে পারি তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা আমাদের এই ন্যায্য দাবী মঞ্জুর করিবেন।—আমেরিকা আজ ফিলিপাইনদিগকে স্বাধীনতা দিতেছেন আর আমরা নিজের ভাষায় জ্ঞান অর্জ্জন করিব এটুকু পাইব না এরূপ হইতেই পারে না।

এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী পুস্তকাদি প্রণয়ন করা। আমাদিগকে অধিকাংশ স্থলেই অনুবাদ করিতে হইবে। প্রথমে অনুবাদ না করিলে আর উপায় নাই। আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদ এ বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন বলিয়া অনেকে বলেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যখন আমরা কর্ম্মের সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া দেখি তখনই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখনই মনে হয় সাহিত্য-পরিষদের কাজ অতি অল্প হইতেছে। বিশেষতঃ এই দুই বৎসর সাহিত্য-পরিষদ দেশের ও দশের না হইয়া কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মিলন মন্দির হইয়াছে—কয়েকজন শিক্ষিতের আলোচনার আগার হইয়াছে। দেশের লোক তাহাতে বাদ পড়িয়াছে। মাননীয় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রকৃত দেশবাসী বাদ পড়িয়াছে। বঙ্গের—শুধু বঙ্গের কেন ভারতের অধিকাংশ লোকই পল্লিবাসী মূর্খ বা নিরক্ষর। সাহিত্য-পরিষদ তাহাদিগকে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতের উন্নতি কখনও কি হইবে? জ্ঞানের বাণী নিরক্ষর কৃষকের মধ্যে প্রচারিত হইবে—দোকানদার মজুর—ধোবা নাপিত কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। রামেন্দ্র বাবু তাই বলিয়াছেন—"বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্ব্বাচন চলিবে না"। প্রকৃত দেশবাসীকে বাদ দিয়া আলোচনা করিবার সময় এখনও বঙ্গে আসে নাই। বিলাতে বিশেষজ্ঞদের আলোচনার জন্য অসংখ্য পরিষদ আছে কিন্তু ভারতে বিশেষজ্ঞ কয় জন? তাঁহাদের এখন প্রচার কার্য্যে লাগিতে হইবে—হাটে মাঠে ঘাটে জ্ঞানের বীজ ছড়াইতে হইবে বঙ্গ হইতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিতে হইবে। তাঁহারা বসিয়া আলোচনা করিবেন আর দেশবাসী আঁধারে মরিবে ইহা কি উচিত?

পরিষদের কর্ত্তব্য এখন দেশে কি প্রকারে জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য করা, তজ্জন্য প্রতি সপ্তাহে সাধারণের উপযোগী বক্তৃতা করা আবশ্যক। তাহাতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি বেশ সরল ও সরস ভাষায় প্রচার করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিতরণ করা। যদি একান্তই বিতরণ করিতে না পারেন মুদ্রণ-ব্যয়াদি লইয়া বিক্রয় করা। কিন্তু সে সব কৈ? সাহিত্য-পরিষদের মাসিক একটা অধিবেশন হয়, তাহাও আবার বিশেষজ্ঞদের জন্য।

পরিষৎ-পত্রিকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র—ইহাতে মৌলিক গবেষণাদি প্রকাশিত হয়। ইহাতে অন্য কিছু স্থান পায় না। এইরূপ পত্রিকার মূল্য যথেষ্ট স্বীকার করি কিন্তু সাধারণের কয়জনের উপকার তাহাতে হয়? তাহাতে ময়নামতির পুঁথি প্রকাশিত হয় কিন্তু কয়জন—(সাধারণের কথা বাদ দিয়া বলিতেছি)—উক্ত সভার সভ্যই বা ঐ সব পাঠ করেন সে কথা কি পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ জানেন?

ঐরূপ ধরণের পত্রিকার আবশ্যকতা নাই বলা মূর্খতা স্বীকার করি; কিন্তু সাধারণের উপকার হিসাবে উহার মূল্য সামান্য বলিতে বাধ্য। গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি বলিয়াছেন—"এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি তখনই কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-ক্ষেত্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষদ যদি সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য।"

এই হিসাবে সাহিত্য-পরিষদ অতি অল্পই কাজ করিয়াছেন বলিতে হইবে। আমার মতে তাঁহাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি মাসিক হওয়া কর্ত্তব্য আর তাহাতে দেশের ও দশের প্রয়োজনীয়—চাষবাসের কথা—স্বাস্থ্যের কথা—ধনলাভের উপায়ের কথা—সাধারণ বিজ্ঞানের নানা তথ্য থাকা দরকার। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় বিশেষজ্ঞদের জন্য ত্রৈমাসিক পত্র ও মাসিক অধিবেশন থাক। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইবে সবগুলিই তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া জনসাধারণে প্রচারিত হইবার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। Asiatic Society প্রভৃতি যাঁহাদের ছাঁচে এটী গঠিত তাঁহারা সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন না সত্য। কিন্তু সে সভাটা সাধারণের সম্পত্তি নহে, তাহাতে সাধারণের দাবী অনেক কম আছে। সাহিত্য-পরিষদের উপর প্রত্যেক বাঙ্গালীর দাবী আছে। কাজেই বলিতেছি তাঁহাদের পত্রিকায় সাধারণের উপযোগী তথ্যাদি প্রকাশ করিতে হইবে।

আজ যদি আমরা সাধারণ লোককে বাদ দিয়া উঠি তাহা হইলে কালই তাহাদের অনুন্নতির ভরে নামিতে হইবে। সমস্ত জাতিকে সঙ্গে লইয়া উঠিতে হইবে, তাহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। কাজেই সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

যে দিন বাঙ্গালায় শিক্ষা প্রচারিত হইবে সে দিন আমাদের দেশ সভ্যতার মার্গে আরও উঠিবে। তখন স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত

অনেক উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা পাইবেন। তখন কৃষককুলও বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে চাষ করিতে শিখিবে।—তখন বাঙ্গালা আবার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইবে—বাঙ্গালী তুমি কি তাই দেখিতে চাও—তাহা হইলে কিসে ভাষার উন্নতি হইবে চেষ্টা কর।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ

(৯৩০ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর

ইয়োরোপে এই ভাবগত প্রণালীর কিংবা সঙ্কেত লক্ষণের কবিতা যে নাই তাহা নহে। বর্ত্তমান ইয়োরোপ সাহসিকতার ভাণ্ডার, ওই ভূখণ্ডে, ভাল মন্দ যাহাই হোক, প্রত্যেক জাগ্রত ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিত্বটুকুন বিশেষিত করিতে চায় বলিয়া, যে কোনরূপেই হোক একটা 'নূতন কিছু' করিয়া ফেলিয়া সকলের কৌতূহলভাজন এবং দর্শনীয় হইবার জন্য মাথা ঘামাইয়া অসংখ্য লোক লাগিয়া আছে। সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্য্যে, কৌতুক কথায়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে, এমন কি বুজরুকির ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত এইরূপে মৌলিক হইয়া পড়ার একটা অতিরিক্ত ঝোঁক ওইদেশে বেগতিক প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। কলা-বিদ্যার প্রত্যেক তরফেই একদিকে যেমন রক্ষণশীল দল নানারূপ ছটপাট হুঙ্কার বা হাহাকার করিয়া প্রাচীনতার পূজ্যসীমা রক্ষা করিতেই লাগিয়া আছেন, অন্যদিকে তেমনি উন্নতিশীল এবং সাহসিকের দলও সমস্ত সীমা শিকলকে পদদলিত করাই যেন একটা মহৎ কার্য্য মনে করিয়া চলিতেছেন! ইহার ফলে সকল তরফেই হয়ত সুস্থির এবং অনবদ্য আদর্শের শিল্প উপার্জ্জন কম হইতেছে; কিন্তু মনুষ্যের মানসভূমি—দৃষ্টিভূমি—নানামুখী রীতিপ্রণালী এবং আদর্শের ভূমি অভাবনীয়-রূপে প্রসার লাভ করিতেছে। এই ব্যাপারের উত্তর ফল এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভবিষ্যতের পন্থা বিস্তারিত হইয়া বরং উত্তরাধিকারী এবং উন্নত শক্তিশালী অথচ সংযত আদর্শ সাধকের পক্ষে যে অশেষ সুবিধা ঘটিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে বর্ত্তমান ইয়োরোপের অনেক একদেশ-গামী সাহিত্য-মহিমাও ঐতিহাসিকভাবে ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্যের উপক্রম বই নহে! ইদানীং ইয়োরোপীয় সাহিত্যসমাজ ধর্ম্ম কিংবা কলাবিভাগের সর্ব্বত্রই, মোটের উপরে, উপস্থিত প্রাপ্তি অপেক্ষা বরঞ্চ ভবিষ্যতের প্রাপ্তিই যে সমধিক পরিষ্কৃত হইতেছে, তাহা পরিদর্শক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। মৌলিকতা এবঞ্চ উন্মার্গ-গামিতা, বলিতে কি উন্মত্ততাই বরং বাড়িয়া গিয়াছে! সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড অপেক্ষা বরং ফ্রান্স এবং জর্ম্মণীতেই এইরূপ সাহসি-কতার দৃষ্টান্ত অধিক! ইংরাজজাতি প্রধানতঃ রক্ষাপ্রবণ। এই জাতির মধ্যে, মহিমান্বিত অতীতের স্থির সমুজ্জ্বল মাহাত্ম্য গতিকেই, রক্ষাশীলতার একটা আদর্শ এত বলবান যে, তাহার কর্ম্মী এবং চিন্তাশীলগণ সকল বিভাগে সাহসিকতাকে যেন নিতান্ত ভয় করিয়া চলে

—প্রাচীন মহনীয় আদর্শকে ন্যূনাধিক মান্ত করিয়াই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। কোন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইলে, ইংরাজ প্রথমতঃ যেন অন্যজাতির দৃষ্টান্ত পরিদর্শন পূর্ব্বক নিজের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে উহার সঙ্গতি চেষ্টা করিয়াই সাধনায় মনোনিবেশ করেন; এবং ধীর সংযত সাধনা ক্রমে অনেক সময় আদিম উদ্ভাবক জাতিকেও অতিক্রম করিয়া যান। নূতন নূতন ভাবের প্রবল তরঙ্গগুলি ইংলণ্ডে আসিয়াই যেন চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে, এবং একনিষ্ঠ তদ্গত সাধকগণের সাহায্যে ধীরে ধীরে বিশ্বপরিদৃশ্য হইয়া উঠে। ইংরাজের এই গুণ সকল বিভাগেই ন্যূনাধিক লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

জর্ম্মণীতে বিশেষতঃ ফরাসী দেশের কাব্য সাহিত্যেই যেন এই মৌলিকতার হুজুগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! ফরাসীর অন্তঃকরণ অনেকগুলা কবি এবং লেখকের ভিতর দিয়া, বিগত শতাব্দীর শেষভাগে অত্যাশ্চর্য্য ভাবে সাহিত্যের প্রাচীন ভাব-সীমা এবং রীতি-প্রণালীর প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ইংরাজ পণ্ডিতগণ কৌতুকভরে বলিয়া থাকেন, প্যারীনগরীতে প্রতি ৫ বৎসরেই নূতন নূতন কাব্যরীতি এবং মৌলিকতার হুজুগ উদ্ভূত হইয়া বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইতেছে। এই সমস্ত বুদ্বুদ হইতে যে সাহিত্য সমাজ কিছুমাত্র লাভ করেন না, তাহা নহে; প্রত্যেক দলধর্ম্মের মধ্যেই তাহার চরম-পন্থিতার অন্তরালে একটা-না-একটা সুলক্ষণ না থাকিয়া পারে না—উহার সম্পর্কেই সমাজ লাভবান হয়। সাহিত্যপণ্ডিতগণ জানেন, এইরূপে ফরাসীদেশে এবং তাহার দেখাদেখি সমগ্র ইয়োরোপে নানান আদর্শ-বাদী এবং চরমপন্থী কবিতাসেবকের দল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক দলের মধ্যেই দুই একজন ন্যূনাধিক উচ্চশ্রেণীর কবি উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ বলিতে চাহেন যে, কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য কেবল ছন্দের নব নব লীলা এবং কোমল-মিষ্ট-পদাবলীর চমৎকারিতা সাহায্যে পাঠককে আবিষ্ট করা বই নহে; সুতরাং ওই উদ্দেশ্য সমাধা করিতে যদি ব্যাকরণের ভুলও করিতে হয় কিংবা অর্থহীন পদবাক্যও ব্যবহার করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আবার, অন্যদল বলিতে চাহেন যে, আমাদের মনোমধ্যে যে-ভাব জাগিয়া উঠে শব্দ প্রকৃতির মধ্যে তাহার এক একটা কারণরূপ আছে; সার্থক কিংবা নিরর্থক বাক্যচ্ছন্দের সাহায্যে এই কারণরূপ সৃষ্টি করার নামই কবিতা। সুতরাং, তাঁহাদের মতে কবিতা একটা গৎ বই নহে। যে-কোনরূপ শব্দের সংযোগ বিয়োগ সাহায্যে এই গৎ ভাঁজিয়া পাঠকের মনোমধ্যে ভাবের স্পর্শ জাগাইতে পারিলেই হইল! এই আদর্শের বশীভূত হইয়া সঙ্গীত কলার ক্ষেত্রে অনেকে যেমন 'তুফান গাহিতেছেন,' 'যুদ্ধ বাজাইতে-ছেন' সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শব্দ প্রকৃতির তুফান রচনা এবং যুদ্ধ রচনা চলিতেছে! আবার কেহ কেহ, এইরূপে উচ্চারিত শব্দের অর্থ রেখার জাল বুনিয়া (চিত্রের আদর্শে) পাঠকের মনোমধ্যে কেবল নিজের মর্জ্জি-স্থিত 'যুদ্ধের চিত্র' আঁকিতেছেন বলিয়াই খ্যাপন করেন। এমন সাহসী ব্যক্তিরও অভাব নাই, যিনি বলিয়া থাকেন যে অর্থ সম্পর্কে কবি বা পাঠকের মধ্যে কোনরূপ মিল কিংবা সমসূত্রিতা থাকার আবশ্যকই নাই। কবি নিজের মনের মতন গাহিয়া যাইবেন, পাঠক নিজ মনের মত উহার অর্থ বুঝিয়া লউক! রবীন্দ্রনাথের মানসী হইতে দুইটা পংক্তি

উদ্ধার পূর্ব্বক এই আদর্শটি বুঝাইতে পারি :—

আমার মনের ভাবে আমি এক গেয়ে যাব
তোমার মনের মত তুমি বুঝে যাবে আর।

বলা বাহুল্য, এই রূপে চিত্র এবং সঙ্গীত কলার রাজ্যে অনেক সময় অনধিকার প্রবেশ করিয়া, এবং প্রবল ভাবে দলবদ্ধ হইয়া, অপিচ সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শকে নানামতে তিরস্কার পূর্ব্বক ইয়োরোপে অগণ্য বাক্য-শিল্পী গ্রন্থ রচনা করিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীনতা-নিষ্ঠ সুধীগণ উহাদের নিন্দা করেন; উহাদিগকে 'সর্ব্বসাহিত্যের সংহারক' 'উন্মার্গ-গামী' 'অধোগামী' বা 'অধঃপেতে' নামে নির্দ্দেশ করেন। এই সমস্ত দলই আধুনিক সাহিত্যে decadent, Parnassian, Symbolist, Magii প্রভৃতি বিদ্রুপাত্মক নামে চিহ্নিত হইতেছে। অনেক সময় তাঁহারা পরের কথাকে 'সুবুদ্ধি' প্রকাশ পূর্ব্বক 'হাসিয়া উড়াইয়া' নিজেরাও সগর্ব্বে এই সমস্ত আখ্যায় আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বদ্‌লেয়ার ভার্লেন মৈতরলিঙ্ক ভারহারণ মরিয়াস্ বিগ্‌নিয়ার রোদেনবাক্ পীলাদন বোই প্রভৃতি ন্যূনাধিক দ্বিশত কবিতা লেখকের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহারা কাব্যের ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ 'অস্পষ্টতার' থিওরী অনুবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর। "উৎকৃষ্ট কবিতা এক একটা হেঁয়ালী বই নহে "(there should be always an enigma in poetry)। "To name an object is to take three quarters from the enjoyment of the Poem, which consists in the happiness of guessing little by little ; to suggest, that is the dream."—এই সকল কথায় ইহাদের মর্ম্মগত আদর্শকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়। এখন, দল মাত্রেই উপরে-উপরে কয়েকজন বিশিষ্টব্যক্তি এবং অপর সমস্ত অনুকরণকারী লইয়াই গঠিত হয়; এইরূপে এ সকল দলের মধ্যে কচিৎ বিশিষ্ট কবিও রহিয়াছেন। ইহারা আদিবন্ধে একরোখা মতবাদ অবলম্বনে আত্মপরিচয় করিয়া আসিলেও, ক্রমে আপনাদের মধ্যে সাহিত্যের সনাতন কিংবা সাধারণ অনুভবের পন্থার কিছু-না-কিছু সমন্বয় করিয়া দলের বাহিরেও বহুলোকের স্বীকার এবং সম্মানলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জনসমূহের বিচার করিয়া ক্রমে পণ্ডিতগণের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রত্যেকদলের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে; অর্থাৎ, কাব্য চিত্র বা সঙ্গীতের তরফে অনধিকার প্রবেশ করিয়াও সময় সময় এমন সমস্ত উপায়ন উপস্থিত করিতে পারে, যাহাতে উহার প্রতি অন্ততঃ বিদ্বেষটুকু কমিয়া যায়, স্থলবিশেষে নিরপেক্ষ বিচারকের চক্ষে উহা একটা সত্য উপার্জ্জন বলিয়াও প্রতিভাত হয়। তাঁহাদের স্থূল আদর্শটুকু অন্ধনেত্র অনুকরণকারীর পক্ষে শ্রেয়স্কর না হইলেও, উহা একটা ক্ষুরধার পন্থা হইলেও, সুনিপুণ সাধকের পক্ষে এককালে অগম্য নহে। ফ্রান্সের বদ্‌লেয়ার ভার্লেন এবং আধুনিক বেলজিয়মের মৈতরলিঙ্ক ও ভারহারণ প্রভৃতি কবি এইরূপে সঙ্কীর্ণ দলধর্ম্ম হইতেই বিশিষ্টতা অর্জ্জন পূর্ব্বক ইয়োরোপীয় আধুনিক সাহিত্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, একালের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কিংবা আমাদের দেশেও, কবি কিংবা ললিত শিল্পী মাত্রকে এই অতি-প্রবল 'সিম্বোলিষ্ট' আদর্শের কিছু-না-কিছু বর্ণধর্ম্ম স্পর্শ না করিয়া পারিতেছে না।

তবে, ইহাও বলিতে হয় যে, এই সিম্বোলিষ্ট কবিতা নূতন নহে—উহা প্রাচীন রূপক বই নহে। ইয়োরোপ খণ্ডে মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত পরিস্ফুট রূপক কবিতা ভূরি ভূরি রচিত হইত। ভারতবর্ষের কথাই ত নাই! আমাদের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ প্রভৃতি সমস্তই ত রূপকের খেলা! ইয়োরোপের Mystery Plays, Morality Plays প্রভৃতির স্তায়, স্পেন্সার, চসার, পোপ, ড্রাইডেন প্রভৃতির প্রসিদ্ধ কবিতাসমূহের স্তায়, আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রবোধ চন্দ্রোদয় এবং আশাকানন প্রভৃতি—কোন কোন দিকে আধুনিক 'যাত্রা'লক্ষণের নাটকগুলি! তত্ত্বজগতের গুণবাচক পদগুলিকে ব্যক্তি-রূপ প্রদান করিয়াই এই রূপক বলিয়াছিল। চরমপন্থী সিম্বোলিষ্টগণ মৌলিকতা হুজুগের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রাচীনকালের সহিত সম্বন্ধটুকু স্বীকার করিতে না চাহিলেও, আমাদের চক্ষে প্রকৃত সত্য অবভাত হইতে বিলম্ব হয় না! বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বকবিগণ স্তায়শাস্ত্র এবঞ্চ লোকনিন্দার ভয়ে রূপক চরিত্রগুলার ধরণ-ধারণ কথাবার্ত্তা এবং চাল-চল্‌তির মধ্যে একটা বস্তুসঙ্গতি এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চাহিতেন; আর, আধুনিক সিম্বোলিষ্টগণ কোনদিকে ধরা-পড়িতে চাহেন না, ওই প্রকার কোন স্তায়সঙ্গতি রক্ষার দিকেও দৃষ্টি করেন না; মনুষ্যের সাধারণ জীবন এবঞ্চ সাধারণ চরিত্র অবলম্বনে এক অর্থের প্রকাশ পূর্ব্বক অন্য অর্থের উপন্তাস করিয়া—মনে 'সুড়সুড়ি' দিয়াই পাঠককে আবিষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। এই আদর্শের দোষগুণ উভয়ই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। যেমন বলিয়াছি, এই কার্য্যকে এক শ্রেণীর পাঠক যেমন ভক্তিগদ্‌গদ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারে অন্যপক্ষ তেমনি পরম বিরক্তি এবং বেদনাকর বলিয়াও মনে করা বিচিত্র নহে। সাহিত্যে ভাব ভাষা এবং বিষয় বস্তুর সুদৃঢ় সঙ্গতি এক কথায় 'বাগর্থ প্রতিপত্তি'ই তাহার সনাতন মাহাত্ম্যলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। রচনার মর্ম্মটুকু মোটামুটিভাবে কিংবা আঁচে আভাসে ধরিতে পারা গেলেই যথেষ্ট হইল না; পাঠকের চিত্তপটে বাক্যসাহায্যে যেই ভাবরূপ অঙ্কিত হইতেছে, প্রত্যেক পদের প্রত্যেক তুলি সঞ্চালনের সামগ্র্য এবং অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিলে, ওই অসঙ্গতির তরফ হইতে মনে যেই বেদনা উপস্থিত হয়, 'মোটামুটি অর্থবোধের' আনন্দটুকু তাহা দমন করিতে অনেকের পক্ষেই কাজ দেখে না। বিস্তারিত কাব্যের ক্ষেত্রে এই দোষ 'যেন-তেন' সহিতে পারা গেলেও ক্ষুদ্রশিল্পের পক্ষে উহা নিঃসন্দেহে মারাত্মক হয়। বিশেষতঃ লেখকের সাধুতার উপরেই পাঠকের নির্ভর শিথিল হইয়া গিয়া বিরাগ উদ্রিক্ত হইতে থাকে। সুতরাং সিম্বোলিষ্ট আদর্শের সমস্ত মাহাত্ম্য মনে রাখিয়াও, এইস্থলে স্বীকার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য যে উহা একদিকে বর্ত্তমানকালের একটা চরমপন্থী বিশেষত্ব বই নহে। রিয়ালিষ্ট বা নেচরেলিষ্ট বলিয়া শিল্প আদর্শটাও যেমন নানাদিকে চরমপন্থী! ভবিষ্যতে এই সমস্ত টিকিবে কিনা সংশয়টাও কোনমতে অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষাধ্যায় কতকগুলা খামখেয়ালী নীতি নিয়মের সমষ্টি নহে; উহার মূলে শিল্পতত্ত্বের—মনুষ্যের মনস্তত্ত্বের অলঙ্ঘনীয় নীতি-ভিত্তি রহিয়াছে। স্তায়শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া কোন সারস্বত কার্য্যই

সুধীসম্মতি লাভ করিতে পারিবে না। 'লজিক' বজায় রাখিয়া চলিলে সকল সময়ে ভাল কবিতা হয় না' বলিয়া সিম্বোলিষ্টগণ যে অজুহাত উপস্থিত করেন, তাহাতেও কারি-করিতে পারে না; যেহেতু, মনুষ্যের মন নামক পদার্থটি চিরদিন সন্দিগ্ধ। কে বলিতে পারে, আজ যে পদার্থ এক কবির হস্তে—তাঁহার ভাষা এবং রীতিমুখে হয়ত অপরিহার্য্য ভাবেই অস্পষ্ট বলিয়া ঠেকিতেছে, তাহা আগামী কল্যই অন্যতর সমর্থ শিল্পী কর্ত্তৃক বাগর্থের রাজ্যে স্থির ধারণা লাভ করিয়া মনুষ্যের প্রাপ্তি ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়া দিবে! 'এই পর্য্যন্ত' বলিয়া সাহিত্যে কিংবা প্রতিভার সম্বন্ধে কোন সীমা নাই। দ্রষ্টার বা প্রকাশকের শক্তিটারই সীমা! এই ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠম্মন্য ব্যক্তির রায়-পরামর্শও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। কে বলিবে যে, এই স্থানেই এই স্বীকৃত দৈন্য-দুর্ব্বলতা লইয়াই সাহিত্যের শেষ! ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন মনুষ্যকে চক্ষে ধূলা দিয়া দীর্ঘকাল অন্ধ করিয়া রাখা কাহারও সাধ্য নহে। আমরা জানি, এই সিম্বোলিষ্ট আদর্শের বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাদের দেশেই একদিকে যেমন ভক্তি অনুরাগ অন্যদিকে প্রবল বিরাগের লক্ষণও দেখা দিয়াছে; উভয়েই বিস্তার এবং গাঢ়তা বিষয়ে এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে তুলনাহীন। মনুষ্যের সনাতন মনস্তত্ত্বের মধ্যেই উহার রহস্যটুকু নিহিত আছে! মানুষ শিক্ষা দীক্ষায়, কথায় কার্য্যে জীবনপথে চিরকাল ন্যায়নীতির সঙ্গতিটুকুই সাধন করিয়া চলিতেছে। সমাজের মধ্যেও, মানুষে-মানুষে যাহা প্রকৃত তফাৎ, ভাল-মন্দ বড়-ছোট এবং সুবোধ-অবোধের মধ্যে যাহা প্রকৃত পার্থক্য, তাহাও প্রকারান্তরে মনুষ্যের বাক্য এবং অর্থ, কথা ও চিন্তা, জ্ঞান এবং কর্ম্মের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে এই ন্যায়সাধনার সাফল্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে! মানুষ কখনও সজ্ঞানে ন্যায়-আদর্শকে অস্বীকার পূর্ব্বক কেবল অস্পষ্টতাজীবী হইতে পারিবে না; কাব্য-উপভোগের ক্ষেত্রে আসিয়াছে বলিয়া চিরজীবনের সাধনাভূত ন্যায়-সঙ্গতির দাবীটাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। সাহিত্য স্পষ্টভাবে লজিকের দাবীকে অগ্রাহ্য করিলে জনসমাজে তাহার বর্ত্তমান মাহাত্ম্য-টুকু যে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া পড়িবে, শ্রেয়ঃকামীর পক্ষে তাহার 'প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্কর' হইয়া দাঁড়াইবে, মনুষ্যের শাস্ত্রকার বা মঙ্গলচিন্তকগণও যে তাঁহাদের 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' নীতি সুদৃঢ় করিবার সাপক্ষ্যে আর একটা প্রবল অজুহাত লাভ করিবেন—তাহাতেও সন্দেহ হয় না। সিম্বোলিষ্টগণ এই অস্পষ্টতার আদর্শ কখনও সমাজের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছেন না—ধর্ম্মসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও নহে। অলখ-লোকের পদার্থ বিষয়েও মনুষ্য-ভাষার অস্পষ্টতাটুকুন প্রকৃত প্রস্তাবে অপরিহার্য্য বা ন্যায়সঙ্গত কি না, ইহা মানুষ চিরদিন জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে!

অন্যদিকে, মনুষ্যের দৃষ্টি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সকলদিকেই যেমন একটা সীমা থাকা প্রতীয়মান, ইহাও নিঃসন্দেহ যে এই সীমা চিরদিন থাকিয়া যাইবে; সমস্ত বিজ্ঞানের পরমাপ্রাপ্তির পরেও অনন্ত অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে! মানুষ অস্পষ্টতাকে কখন ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে না বলিয়াই অস্পষ্ট কবিতার একটা সম্ভব-ক্ষেত্র চিরকাল মনুষ্য-জীবনে থাকিয়া যাইতেছে। অদ্যকার অস্পষ্ট আগামী কল্য হয়ত স্পষ্ট হইয়া চলিতে থাকিলেও, এই অনন্ত গতিশীল ভূতচক্রের

রঙ্গভূমি যে মনুষ্যের দৃষ্টিসমক্ষে উহার আদি এবং অন্ত বিষয়ে নিত্যকাল অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। গীতার 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত' ইত্যাদি কথা যেমন সৃষ্টির প্রত্যূষে সত্য ছিল, তেমনি, সৃষ্টির অন্তিম বলিয়া কোন ঘটনা থাকিলে তৎকালেও সুপ্রযুক্ত হইতে পারিবে। সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কোন অস্পষ্ট কাব্যের সাধুতা বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন টুকুর মীমাংসা যেমন চিরকাল অভিজ্ঞ ব্যক্তির অপেক্ষা করিবে—বলিতে কি, সাধারণের পক্ষে এই ক্ষেত্রে যেমন পূর্ব্বাপর-অভিজ্ঞের মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই—তেমন ইহাও নিশ্চয় যে, মনুষ্যের এই আদি-অন্ত-উদ্দেশী ভাব এবং চিন্তা. এই অব্যক্ত-বিলাসিতা এবং ছায়াবাদিতার প্রবৃত্তি টুকুও নিত্যকালের অমর। সুতরাং, মনুষ্য সাহিত্যের প্রকৃতি মধ্যে এই মিষ্টিসিজমের প্রবৃত্তিটুকুও নিত্যকালের অপরিহার্য্য এবং অমর!

সুতরাং, স্বীকার করিতে হয় যে, এই সিম্বোলিষ্ট প্রভৃতি চরমপন্থী আদর্শের উপার্জ্জন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বসম্মত বা সনাতন প্রাপ্তি কি না, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার পক্ষে বিস্তর বিলম্ব থাকিলেও উহার থিওরী এখন আর পরিব্যাপ্ত বিদ্বেষ কিংবা পরিহাস উদ্রেক করে না। এই পথে অন্ততঃ ভবিষ্যতে সাহিত্যের একটা স্থায়ী প্রাপ্তি ঘটিবে বলিয়া, 'নিরবধি কাল এবং বিপুল পৃথিবীর' দিকে চাহিয়া, পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারিতেছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাও সত্য যে, কেহ কেহ যেমন 'ডিকেডেণ্ট' কবি বার্লেনকে Prince of Poets বলিয়াছেন, অনেকে তেমনি তাঁহাকে দ্বীপান্তরিত করার হুকুমজারী করিতেও ছাড়েন নাই। মৈতরলিঙ্ককে কেহ কেহ যেমন বর্ত্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন মৌলিক প্রতিভাবান্ অপিচ অতুলনীয় জ্যোতিষ্ক (Light-giver) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যেরা তেমনি Hopeless mental cripple বলিয়া ন্যক্কার করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। উভয় বিচারের মধ্যেই প্রভূত সত্য আছে। মৈতরলিঙ্ক যে ইতিপূর্ব্বে 'নোবল' পুরস্কার পাইয়াছেন তন্মধ্যে, তাঁহার কাব্যের সাধারণ সম্মত সমৃদ্ধি বিষয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্য রসিকগণের অন্ততঃ অধিকাংশের অভিমত লুক্কায়িত আছে বলিয়াই মনে করিতেছি। মৈতরলিঙ্ক বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর মৌলিক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক * এবং idealist কবি বলিয়াই পরিগণিত! সাহিত্যে স্বাধীন ভাবুকতার বা জগৎ-বস্তু-বিষয়ে কবির অধ্যাত্ম-দৃষ্টির অভিনবতার উপরেই সাহিত্যের প্রাণটুকুন এবং তাহার বিকাশের প্রধান রহস্যটুকুন নির্ভর করিতেছে

* মৌলিকত্তার ক্ষেত্রেও আবার এই শ্রেণী-বিভাগ নামক কথাটা বিবিক্তভাবেই বুঝিয়া লওয়া দরকার মনে করি। এই স্থলে বিশেষ করিয়া বলাও আবশ্যক যে মৌলিক কবি হইলেই প্রথম শ্রেণীর কবি হয় না। শেষের কথাটা কবির উপার্জ্জনের মাহাত্ম্য বিচার করিয়াই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি যে রবার্ট ব্রাউনীংকে অকাতরে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী বলিয়া হয়ত নির্দ্দেশ করিতে পারিব; তাই বলিয়া তাঁহাকে ওয়ার্ডসোয়ার্থ শেলী বা কীটস—এমন কি টেনিসন হইতেও শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে সঙ্কুচিত হইব। কেন না, শিল্প-উপার্জ্জনের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, বিশ্বজনীনতার ক্ষেত্রে অপিচ অধ্যাত্ম-আদর্শে উহার শক্তি বা সুদুর্ল্লভ রসবত্তার হিসাবেই বাণীপন্থী-মাত্রের চরম বিচার নির্ভর করিয়া থাকে। শেষোক্ত তুলাদণ্ডে পরিমাপিত এবং উত্তীর্ণ না হইয়া কেবল মৌলিকত্তার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হইতে পারিলেই শ্রেষ্ঠতার প্রতিপত্তি লাভ করা যায় না। লেখক।

বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিবেন; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের বিধানমতে ভাবুকতা-আদর্শের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেই বৎসর-বৎসর 'নোবল' পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে! বলা বাহুল্য, মৈতরলিঙ্ক 'নোবল' কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন।

কেলটিক রিভাইভেলের কবি ইয়েটস্ প্রভৃতির আদর্শও নানাদিকে ইয়োরোপের এই ডিকেডেণ্ট এবং সিম্বোলিষ্ট আদর্শের সহোদর; তাঁহাদের মধ্যেও মৈতরলিঙ্ক প্রভৃতির রূপকবুদ্ধি এবং 'মোটামুটি অর্থের' সঙ্কেত বুদ্ধিই জাগ্রত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। এখন, বর্ত্তমান ইয়োরোপের এই নব আদর্শের শিল্পকলা ভারতীয় আদর্শাভিজ্ঞের চক্ষে খুব মহীয়সী বলিয়া না ঠেকিলেও, উহার প্রকাশরীতি বা খণ্ডপদের অর্থগৌরব এবং বিশিষ্ট-শিল্পাদির সৌন্দর্য্য-সমাধান যে অতুলনীয় মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে উহার যেই অধ্যাত্ম-ভাবুকতা ইয়োরোপের চক্ষে অলৌকিক চমৎকারী' বলিয়া প্রতীয়মান, তাহার 'অলৌকিকতার' প্রতিভাসটুকু ভারত-বর্ষের সমক্ষে (বোধ করি, জড়বাদীতার হৃদয়জাত বলিয়াই) কিঞ্চিৎ 'মেটো' এবং মাটীঘেঁশা বলিয়া বোধ হইতে থাকে—দৃষ্টি-হীনের আলোকস্বপ্ন বলিয়াই প্রতীতি জন্মাইতে থাকে! ঋষিশিষ্যের পক্ষে এই ঘটনা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ভারতবাসীর সমক্ষে অন্য জাতির ভাবুকতা! বিশ্বজগৎকে ভাবুকতার বর্ণপাতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে, অন্য কোন জাতি? এই দেশে 'আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত,' পরলোকের অমর-জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া পার্থিব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলি পর্য্যন্ত, মনুষ্যের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান—ধর্ম্মজীবন, সমাজজীবন, পারিবারিক জীবন এবং উহাদের প্রত্যেক খুঁটিনাটি প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত সমস্তই ভাবুকতায় ওতপ্রোত! ইহা ভারতীয় আর্য্য-গণের চিরন্তন বিশেষত্ব! হিন্দুর ধর্ম্ম কতক-গুলি ভাব সাধনা—বিশেষ-আদর্শের সাধনা বই নহে! বিশেষতঃ এই ভাবুকতার রাজ্যে, তথাকথিত অধ্যাত্ম আদর্শের রাজ্যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষ একেবারে কল বসাইয়া—কলের-গাড়ী চালাইয়া গিয়াছে বলিয়াই সে মনে করে! সুতরাং ইয়োরোপীয়গণ যেই অধ্যাত্ম বিষয়ে কেবল 'সংকেত' এবং 'আভাস' পাইয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার বিশ্বাস (সত্যাসত্য যাহাই হোক) এই যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষ ওইরাজ্যে একেবারে গণিত এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণে সমস্ত অস্পষ্ট অনুভূতিকে সুদৃঢ় বস্তুমূর্ত্তি প্রদান পূর্ব্বক পথ দেখাইয়া গিয়াছেন! বাঙ্গালীর ত কথাই নাই! এই জাতির সমস্ত দোষগুণ, জীবনের মূলসূত্র, শক্তি এবং দৈন্যদুর্ব্বলতার মূলাধার টুকুই ভাবুকতা বলিয়া আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি! সুতরাং বাঙ্গালীর সমক্ষে আধুনিক idealismএর আদর্শ! ভাবুকতার ক্ষেত্রে যে জগতের অন্য কোন জাতি আমা-দিগকে উতরাইয়া যাইতে পারিবে না, তাহা ত আমাদের মনোমধ্যে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে! রবীন্দ্রনাথকে না কি কোন জর্ম্মণ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, হিন্দু এবং জর্ম্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি ভাবের কথা বুঝে না। এই জর্ম্মণও অবশ্য, প্রাচীন Platonism এবং Neo Platonismএর সন্ততিসূত্রে কাণ্ট্ ফিক্টে শেলীং শোপেনহর হেগেল এবং গেঠের মন্ত্রদীক্ষিত জর্ম্মণ—সুতরাং নানাদিকে আমাদের বেদান্ত-মর্ম্মের দীক্ষা প্রাপ্ত জর্ম্মণ!

ধর্ম্মের আদর্শকেই যদি মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান গঠনীশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম-আদর্শও যদি কেবল কতকগুলা বিশেষতন্ত্রীয় ভাবুকতার সমষ্টি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তা' হইলে বলিব, হিন্দুর স্থান সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চে! তারপর খ্রীষ্টান—মুসলমান—ও বৌদ্ধ! এসিয়ার মানসপুত্র খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ভাবুকতার লক্ষণে বলিষ্ট হইলেও তাহার শিষ্যগণের পক্ষে অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভাবুকতা করিবার জন্য এখন অবকাশ নাই—ইয়োরোপীয় জাতি জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর কর্ম্মভূমি এবং স্বর্ণভূমির অধিকার উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যস্ত! ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই জগতের অন্যজাতিকে প্রকারান্তরে জগতের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং তপোবনে সমাধি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যটাই বলবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভাবুকতা যে ভারতীয় আর্য্যের সকল পাপপুণ্য অপিচ সমস্ত সবলতা-দুর্ব্বলতার মূল কারণ তাহা দ্রষ্টামাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে, পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, আমরা ভারতবাসী এখন যাবৎ প্রায় সকল দিকেই নিদ্রিত; আমাদের সনাতন বিশেষত্ব বিষয়ে কেহই জাগরণ লাভ করিতে পারি নাই; এই ভাবুকতাকে আধুনিক শিল্পকলার সহিত সঙ্গত করিয়া এখনও আকার দান করিতে পারি নাই; আমাদের সাহিত্য এখন যাবৎ ভাবুকতা দেখাইবার জন্য যথোচিত বস্তু-ভিত্তি বা জীবনের ভিত্তিটুকু পর্য্যন্ত সম্যক্ উদ্দেশ করিতে পারে নাই। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগের পর ভারতবর্ষে কালিদাসাদির সাহিত্যযুগের অভ্যুদয়। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি, উহাও সকল দিকে আত্ম-জাগরণ লাভ করিতে-না-করিতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং জাতীয় দুরবস্থার সূত্রপাত; সুতরাং, ঐ সাহিত্য-চেষ্টা জাগিতে-না-জাগিতেই ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরেই আমরা বিশ্বসাহিত্য এবং বিশ্বজনীন আদর্শ প্রভাবের সম্মুখীন হইয়া সবেমাত্র জাগিতে আরম্ভ করিয়াছি বই নহে; আমাদের জাতীয় আত্মবোধ এখনো বিশ্বের সম্পর্কে বা নিজের দিক হইতেও যথেষ্টমতে অগ্রসর হয় নাই। আমাদের ধর্ম্ম কিছুকাল হইতে বিজাতীয় আঘাতে জাগিয়া থাকিলেও, তন্মধ্যে পূর্ব্বাপর সূত্রধারণা কিংবা বিশ্বচিন্তার দৃঢ়সংযত দার্শনিক প্রতিভা এখনও জন্মে নাই বলিতে হইবে। রামমোহন, দয়ানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে ন্যূনাধিক আত্মসংস্কারের চেষ্টা, ধর্ম্ম-ভাবুকতাকে বর্ত্তমানযুগের উপযোগী পথে ন্যূনাধিক Practical করার চেষ্টাই যেমন কার্য্য করিয়াছে, তেমন পরবর্ত্তী এবং অল্পায়ু বিবেকানন্দের মধ্যেই ভারতীয় বিশেষতন্ত্রের কোন কোন দিক আত্মপ্রাপ্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পন্থা খুঁজিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, এই সমস্ত দীনতা স্বত্বেও হিন্দুমাত্রেই, নিজের সমাজতন্ত্রীয় ধর্ম্ম-ভাবুকতার দরুণ এমন সমস্ত ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং বর্দ্ধিত হয় যে, নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিটাও এই ক্ষেত্রে নিজকে অন্যজাতি হইতে বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে থাকে! এই ভাবুকতা, এই চরমপন্থীতা এই বিশ্বাস বা এই অন্ধ অহংকারই একদিকে হিন্দুর সর্ব্বস্ব—তাহার অধঃপতিত পার্থিব জীবনের—তাহার পঙ্গুজীবনের একমাত্র নির্ভরযষ্টি! যে হিন্দুর লক্ষ লক্ষ লোক এখন যাবৎ, বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানসূর্য্যের প্রচণ্ড আলোক সমক্ষেও, বনে জঙ্গলে কেবল ভাবের সাধন

করিয়া সর্ব্বতোভাবে কেবল 'লক্ষ্মীছাড়া' হইবার অভিসন্ধিটুকু সম্মুখে রাখিয়াই চলিতেছে, কেবল বিজ্ঞানের নির্ভরেই প্রাণধারণ করিতেছে, তাহার সাহিত্যও যে কেবল মলয়া এবং জোছনা ভোক্ষণ করিয়াই বাঁচিতে পারিবে কিংবা অব্যক্ত এবং অভ্রান্তের উদ্দেশে কেবল হাহুতাশ করিয়াই, দূর-দূর-গামী অনুভবের ইসারা এবং ইঙ্গিত প্রসারিত করিয়াই বর্দ্ধিত হইতে পারিবে তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। যে ভাবুকতার জন্য 'নোবল' পণ্ডিতগণ এত লালায়িত হিন্দুর পক্ষে তাহাই নানাদিকে স্বতঃসিদ্ধ—বস্তুনিষ্ঠ হওয়াটাই বরং তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ পদার্থ!

এখন এই বিশ্বাসের ক্ষেত্র হইতেই ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সিম্বোলিষ্ট কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মৈতরলিঙ্ক স্বয়ং একজন সংশয়ী। তাঁহার রচনার মধ্যে পাঠকগণ যে আলোকের আভাষ পায়, উহা যেন সুস্থির কিংবা সমূলক আলোক নহে—আলেয়ার দীপ্তি! একটা অর্থকে বাহ্যতঃ অবলম্বনপূর্ব্বক উহা অর্থান্তরন্যাস উদ্দেশ্য করিতেছে! অন্য অর্থের ইসারা করিতেছে—এবং চাপিয়া ধরিতেই শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে! প্রতিপদেই মনে হয় এই সমস্তের মূলে যেন কবির কিছু মাত্র বিশ্বাসের ভিত্তি নাই—অনুভবের বিশেষ গভীরতাও নাই! উহা সংশয়ীর পরমার্থ সঙ্কেত! ইয়োরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে; সুতরাং বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিষয়ে সংশয়ী বলিয়া অধিকন্তু দেহী মাত্রেই অধ্যাত্মবিষয়ে ন্যূনাধিক সংশয়াপন্ন বলিয়া এই সিম্বোলিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমি যে বিশ্বব্যাপী হইবে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে, উহার সাধন করিতে গিয়া যে জাতীয় প্রতিভা প্রকটিত হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব শক্তির অংশ-অনুপাত অপেক্ষা বরং দর্শনশক্তি এবং দার্শনিকতার একটা বিশেষ ঝোঁকই যে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্য বন্ধুগণ, এই স্থলে সিম্বোলিষ্ট শিল্পের কয়েকটা গুপ্ততত্ত্বের দিকেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহার ভাষা অনেকস্থলেই নিতান্ত সরল—এত সরল যে উহা অনেক সময় নিতান্ত 'ঘোরো' এবং 'আটপৌরে'—উহার বিরুদ্ধে গ্রাম্যতার অভিযোগও আনিতে পারা যায়! রহস্য এই যে, ভাষাপ্রণালীর এই আপাতিক সরলতাই যেন অর্থসঙ্গতি বিষয়ে উহার প্রকৃত অসরলতাটুকুন—পরম অসাধুতাটুকুনও ঢাকিয়া রাখে! মিষ্টি বুলির ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া খেলার খেলায় মানুষের অর্থবিচার-বুদ্ধির চোক টিপিয়াই যেন উতরাইয়া যায়। মানুষ প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছু না বুঝিয়াও খুসী হইতে থাকে! যেই সিম্বোল বা রূপকের সম্মুখীন হইয়াছে উহা সর্ব্বথা ন্যায়-সঙ্গত হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে মাথা ঘামাইতে চায় না; খুব বড় একটা কিছু বুঝিতেছি বলিয়া মনে সুড়সুড়ি লাগিলেই হইল! ইহা যে নিদানতঃ চিত্র এবং সঙ্গীত অধিকারের বিশেষত্ব তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সূত্রে সিম্বোলিষ্ট শিল্পের আর একটা রহস্য—অবলম্বিত বিষয়-বস্তুর দূরত্ব ঘটনা। স্বয়ং কবিও পাঠকের সম্পর্কে কালে যতই দূরবর্ত্তী হইবেন, উহার মুগ্ধকরী শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে। বিষয়টুকু পাঠকের আসন্ন দৃষ্টিসম্বন্ধের বহির্ভূত হইলে উহার চমৎকারিতা বিধানে যেমন বিশেষ সহায়তা ঘটে, কারণ it is distance which gives enchantment to the view; তেমনি, কবিও ভিন্ন-দেশীয় কিংবা

ভিন্ন-জাতীয় হইলে তাঁহার ভাবের পরিবেষ পাঠকের জাতীয় সংস্কার (race-consciousness) হইতে দূরবর্ত্তী হইলে, উহার ক্ষমতা আরও বাড়িয়া যায়। বিষয় বস্তুর মধ্যে সত্য-সত্যই কোন দোষ বা অসঙ্গতি থাকিলেও পাঠকের অনভিজ্ঞতার সাহায্যেই উহার ধার-টুকুন অনেকটা কাটান যায়, অপিচ সম্পূর্ণ অসত্যও সত্য বলিয়াই মাহাত্ম্য অর্জ্জন করিতে পারে। এইরূপে স্বজাতির নেত্র সমক্ষে আসলের মাহাত্ম্য অপেক্ষাও বিজাতীয়ের চক্ষে নকলের পদবীটুকু বড় হইয়া পড়ার সুযোগও ঘটিতে থাকে—এই শিল্প আদর্শের মায়াটুকুন উহার illusion টুকুন এইরূপে সম্যক্ সমাধা হইয়া যায়। ফলতঃ এই আদর্শের মূল রহস্য মায়া বই নহে। কিন্তু তাহাও ত সাহিত্যকলার একটা বিশিষ্ট বিভাগে সম্পূর্ণ মায়িকতার সাহায্যেও সত্য রসনিষ্পত্তি বা রসাভাস সাধন করাটাও কবির পক্ষে কখনও অগ্রাহ্য নহে; উহা চিরকাল সাহিত্যকলার একটা প্রধান দাবী বলিয়াই পরিগণিত, সত্যই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য—যে কোন চমৎকার উপায় সাহায্যে উহাকে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারার নামই কাব্য-তন্ত্রের 'স্বাধীনতা'!

এইরূপে আমরা আধুনিক ইয়োরোপের একটা প্রবল শিল্প-আদর্শের মোটামুটি ধারণা করিয়া আসিলাম। এখন দেখিতে পারিব, উহার সহিত—প্রাচীন অথবা আধুনিক প্রাচ্য কাব্য-আদর্শের সহিত বঙ্গদেশের আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের মিল পার্থক্য কিংবা বিশিষ্টতা কোথায় এবং তিনি কোন স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন

সুন্দর বনের দেবদেবী

দেশের ন্যায় বনেও দেবদেবীর প্রভাব অল্প নহে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের উপকূলবর্ত্তী সুন্দরবন অঞ্চলে যত অধিক সংখ্যক দেবদেবী দেখিতে পাওয়া যায়, তত আর কোনও বনেই নহে। কিন্তু সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সেখানে একমাত্র হিন্দুদেবদেবীদিগেরই প্রভাব এবং প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হইত। পরিশেষে মুসলমান জাতির এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মুসলমান দেবদেবী বা পীরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখন সেখানে দেবদেবী হইতে পীরেরই সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেকালে হিন্দুবনদেব দক্ষিণ-রায়ই * সমস্ত সুন্দরবনের একছত্রী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের, শৌর্য্য

* সংপ্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে, সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি দক্ষিণরায় ও তাঁহার ভ্রাতা কালুরায়কে বৌদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ত জানি, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, দেবতা—সুন্দরবন-যাত্রী প্রাচীন হিন্দু মৌলেও কাঠুরিয়াদিগের স্বকপোল-কল্পিত বনদেব মাত্র। মনুষ্য হইলে মনুষ্য-সুলভ অনেক লক্ষণই তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান থাকিত কিন্তু তাহাত নাইই, উপরন্তু বহু অমানুষ লক্ষণ, অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাব ও চিহ্নাদিই তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপে-পরিলক্ষিত হইয়া

বীর্য্যের তুলনা ছিল না। জলের হাঙ্গর কুমীর, স্থলের ব্যাঘ্র ভল্লুক ও শূন্যের ভূত প্রেত প্রভৃতি তাঁহার অনুগত ও বাধ্য ছিল। তাহারা তাঁহার পক্ষ হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিত, তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিত। যখন তিনি সেই সকল অনুচর সহচরে পরিবৃত হইয়া; স্বীয় প্রবল পরাক্রান্ত সহোদর ও সেনাপতি কালুরায়ের সহিত, ব্যাঘ্র আরোহণে কি কুম্ভীর বাহনে বহির্গত হইতেন, তখন মানুষ ত দূরের কথা, স্বয়ং যমরাজও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস পাইতেন না। সুন্দরবনের সমস্ত সম্পদ, মোমমধু, কাষ্ঠ, গোলপত্র প্রভৃতি তাঁহার একায়ত্ত ছিল। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি ও ধ্বংস-সাধন করিতে পারিতেন। এজন্য যে সকল বনগামী 'মৌলে' (মধু-সংগ্রাহক) কি কাঠুরিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিত, তাহারা রাজা হইয়া যাইত—বাদাবনে 'মহল' করিয়া, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রভূত সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উঠিত। কিন্তু হইলে কি হয়, দক্ষিণরায়ের বড় একটা দোষ ছিল। তিনি নরমাংসাশী ছিলেন—ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রায়ই কাঠুরিয়া ও মৌলেদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক উদরসাৎ করিতেন। তবে যে ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে নরবলি দিত—আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে তাঁহার আহারের জন্য উৎসর্গ করিত, তাহার কোনও বিপদ ঘটিত না। সে তাঁহার যথেচ্ছ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইত এবং প্রচুর বন-সম্পদে আপনার নৌকাগুলি পূর্ণ করিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে ফিরিয়া যাইত। আর দক্ষিণ-রায় এইরূপ স্বজন-পরিত্যক্ত হতভাগ্যদিগের মাংস শোণিতেই আপনার ক্ষুৎপিপাসা প্রশমিত করিতেন! তাঁহার এই অত্যাচার, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বহুযুগ যাবৎ বন প্রদেশে অব্যাহত ছিল, শেষে মুসলমান দেব-দেবীর আগমনে তাহা নিবারিত হইয়া যায়—গাজীসাহেব, চাঁদসা, ভাঙ্গড়সা, বড়পীর, খোকাপীর, কালুগাজী, তাতাল খাঁ, বনবিবি, সাজঙ্গলী প্রভৃতি পীরদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, তাঁহার বিশাল বন-রাজ্যের সহিত, সেই অত্যাচারও হ্রাস হইয়া আইসে! এখন তাঁহার সে 'শোণিত-পিপাসা' আর নাই, সে রাজ্যও নাই, সে বলবিক্রমও নাই, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্তই সেই সর্ব্ববিধ্বংসী কালের কুক্ষিগত, নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। অধুনা তিনি তাঁহার সেই সুবিস্তীর্ণ বন-রাজ্য, মুসলমান পীরদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া, সুন্দরবনের একাংশে মাত্র আঠার ভাটী * বাদাবনের উপরেই আপন শাসনদণ্ড পরিচালনে বাধ্য হইয়াছেন। দক্ষিণ-রায়ের এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি

থাকে। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মূল ধর্ম্ম-নীতি কিন্তু দক্ষিণরায় (কালুরায় কিরূপ জানিনা) নরমাংসাশী সুতরাং ঘোর হিংসাপর ছিলেন। এরূপ অবস্থায় কোন্ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে যে দক্ষিণরায়কে বৌদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া স্থির করা হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শাস্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন কি?

* আঠারটী ভাটায় অর্থাৎ একশত আট ঘণ্টায় বা সার্দ্ধ চারি দিবস কাল নৌকারোহণে যতদূর গমন করিতে পারা যায়, ততদূর বিস্তৃত বনভূমিই আঠার ভাটী নামে প্রসিদ্ধ। সুন্দরবন অঞ্চলে 'জোয়ার' ও 'ভাটা' এই দুইটী কথার দ্বারা পথের পরিমাণ বা দূরত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে, যেমন—'দুই ভাটার পথ' 'তিন জোয়ারের রাস্তা' ইত্যাদি।

সম্বন্ধে ভাটীমুল্লুকে * তত্রত্য মুসলমান জাতীয় নিরক্ষর মৌলে ও কাঠুরিয়াদিগের নিকটে অনেক অদ্ভুত আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহাদিগেরই একটী এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া, পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

বরিজহাটী গ্রামে ধোনাই ও মোনাই নামে দুই মুসলমান ভ্রাতা বাস করিত। তাহাদিগের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইলেও, জ্যেষ্ঠ ধোনাই সুন্দরবনে মহল করিতে অভিলাষী হইল। কনিষ্ঠ মোনাই ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ তাহাকে বনে ব্যাঘ্রের মুখে পাঠাইতে অস্বীকার করিল কিন্তু ধোনাই তাহা শুনিল না, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তাহার মত খণ্ডন করিল এবং সাতখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া যথাপ্রয়োজন ভোজ্য-পানীয়, সাজ-সরঞ্জাম ও দাঁড়ী মাঝী প্রভৃতিতে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কেবল অভাব রহিল একজন পাচকের। কিন্তু অনেক সন্ধানেও সেরূপ লোক পাওয়া গেল না। ধোনাই নিরুপায় হইয়া শেষে একটী বালককেই সেই কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিল। তাহাদের বাটীর অনতিদূরে এক দরিদ্রা বিধবার 'দুখে' নামে একটী পুত্র ছিল। সে অল্প বয়স্ক হইলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ট ছিল। ধোনাই নানা প্রলোভনে তাহাকে ও শেষে তাহার মাতাকে বাধ্য করিয়া ফেলিল এবং বিপদ আপদে তাহাকে রক্ষা করিবে, অধিক বেতন দিবে এবং বাটীতে আসিয়া তাহার বিবাহ দিয়া দিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহাকে লইয়া নৌকায় উঠিল। দুখের মা পুত্রকে বিদায় দিয়া ক্ষণকালও গৃহে তিষ্টিতে পারিল না, উর্দ্ধশ্বাসে নদীর তীরে ছুটিয়া গেল এবং ধোনাই ও তাহার সঙ্গীদিগের হস্তে বার বার দুখেকে সমর্পণ করিয়া, তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল,—"দেখ বাছা, আমার একটা কথা রক্ষা করিও। বনে মা বনবিবি আছেন, তিনি যেমন দয়াবতী তেমনই শক্তিশালিনী। বিপদে পড়িলে তাঁহাকে 'মা' বলিয়া স্মরণ করিও; তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। আমার একথাটা যেন ভুলোনা বাছা।" "না ভুলিব না" বলিয়া হাসিতে হাসিতে দুখে তাহার ধোনাচাচার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। নৌকাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভাসিয়া চলিল। দুখের মা নদীর ধারে বসিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

ধোনাই মৌলের সাত ডিঙ্গী ক্রমে বরুণহাট, সন্তোষপুর ও ধুলিয়া দিয়া কানাই কাটীতে উপস্থিত হইল। শেষে গঙ্গানদী বামে রাখিয়া রায়মঙ্গল, রায়মাতলা, হাড়ভাঙ্গা, ফুলতলা ও পারগাঙ্গ প্রভৃতি অতিক্রম পূর্ব্বক সুন্দরবনে গড়খালীর বাদায় প্রবেশ করিল। ধোনাই কোনও নিরাপদস্থলে নৌকাগুলি একে একে নোঙ্গর করিয়া দুখেকে নৌকায় রাখিয়া সমস্ত লোকজন, অস্ত্র শস্ত্র ও আবশ্যক দ্রব্যাদি সহ ডাঙ্গায় উঠিল এবং বৃক্ষশাখায় বিস্তর মধুচক্র দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া, মধুসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। দূর হইতে দক্ষিণ রায় সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন—তাঁহার পূজা, বলিদান ব্যতীত, ধোনাই শঠতা পূর্ব্বক মধু আহরণে উদ্যত হইয়াছে বুঝিয়া, মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অদৃশ্যভাবে গড়খালীর বনে প্রবিষ্ট হইয়া, মায়াদ্বারা সমস্ত মধুচক্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধোনাই

* যে অঞ্চলে ভাটার সময়ে নৌকার সাহায্যে যাইতে হয় অথবা যেখানে জেটে ধান প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দক্ষিণে, সুন্দরবন অঞ্চলে।

সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড মৌচাক দেখিয়া যেমন তাহার নিকটস্থ হইল অমনই তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল! এইরূপে শত শত, সহস্র সহস্র মধুচক্র তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত ও শূন্যে বিলীন হইল!! ধোনাই ও তাহার অনুচরগণ, মধুলোভে মুগ্ধ, হতবুদ্ধি হইয়া, তিনদিবস কাল ক্রমাগত গড়খালীর বাদায় ঘুরিয়া বেড়াইল কিন্তু এক বিন্দু মধু বা মোমও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল না! তখন হতাশ হইয়া ধোনাই নৌকায় ফিরিয়া আসিল এবং দেবতার ছলনা বোধে তাঁহারই উদ্দেশ্যে অনাহারে অনিদ্রায় —'হত্যা' দিয়া পড়িয়া রহিল। ধোনাই ভাবিয়াছিল, উহা যদি প্রকৃতই কোনও দেবতার কার্য্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতই তিনি তাঁহাকে দর্শন দিবেন এবং মধু প্রাপ্তির কোনও উপায় আছে কিনা, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিবেন।

ধোনাই যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইল। দক্ষিণরায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন, দিয়া বলিলেন,—"ধোনাই, তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি? আমি দক্ষিণরায়, এই আঠার ভাটী বাদাবনের অবিসংবাদিত প্রভু, সর্ব্বময় অধীশ্বর। এখানকার সমস্ত মোম মধুই আমার সৃষ্টি সুতরাং আমার অনুমতি ব্যতীত কাহারও ইহা স্পর্শ করিবার শক্তি নাই। তোমার যদি মধু লইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার পূজা দাও, নরবলি 'মানসা' কর নচেৎ একফোঁটা মধুও এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না।"

"না, ঠাকুর, আমার দ্বারা তাহা হইবে না, আমি নরবলি দিতে পারিব না"—বিস্মিত ও ভীত হইয়া ধোনাই উত্তর দিল—"যত সব পরের ছেলে আমি মাহিনা করিয়া আনিয়াছি। তাহাদের কাহাকে কোন্ প্রাণে বলি দিব? আমার মধুর দরকার নাই।"

দক্ষিণরায় হাসিয়া বলিলেন,—"তবে এত 'খরচপত্র' করিয়া বনে আসিলে কেন? জানত দক্ষিণরায়ের পূজা ব্যতীত এখানে কিছুই পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

প্রত্যুত্তরে ধোনাই বলিল,—"না ঠাকুর, আমি তা' জানি না। জানিতে পারিলে কি আর বনে আসিতাম না এত 'ব্যয়ভূষণ' করিতাম?"

"যা' করিয়াছ, সে টাকাগুলি ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছ, তা'র উপায় কি করিবে? একটা পরের ছেলের জন্য সমস্তই কি জলাঞ্জলি দিবে—সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভিক্ষা মাগিয়া খাইবে?"

"তা' কি করিব? অদৃষ্টে যদি আমার তাই থাকে ত হইবে, কেহই খণ্ডাইতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া একটা মানুষ মারি কিরূপে? না হয়, খালি নৌকা লইয়াই গৃহে ফিরিয়া যাইব।"

এবার দক্ষিণরায়ের আর সে প্রসন্নভাব রহিল না। সহসা তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"শুধু ফিরিয়া গেলেই বাঁচিবে বুঝি? তোমার সাত ডিঙ্গাই জলে ডুবাইব, লোকজন সব কুম্ভীর দিয়া খাওয়াইব, তবে ছাড়িব।" ভয়ে ধোনাইএর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। সমস্ত শরীর বায়ু-তাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে যুক্ত করে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল,—"আমার অপরাধ হইয়াছে ঠাকুর, ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমা কেবল কথায় হইবে না, কাজে চাই" দক্ষিণরায় একটু নরম হইয়া উত্তর করিলেন,

—"যদি সকলের জীবন চাও, তবে একজনের জীবন বলি দাও। সে জীবন ত আবার তোমার আপনার কাহারও নহে, সম্পূর্ণ নিষ্পরের। তোমার নৌকায় দুখে বলিয়া যে বালকটী আছে, উহাকে ছাড়িয়া দিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। তাহাতে আমার যেমন তৃপ্তি জন্মিবে, তোমারও তেমনই সুখৈশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তোমার সাতখানি নৌকাই মোম মধুতে পরিপূর্ণ করিয়া দিব। সেই মোম মধু বেচিয়া কত টাকা পাইবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? একটা পরের জন্য এ টাকাটা কেন ছাড়িবে?"

সহসা গৃহে অশনিপাত হইলে গৃহমধ্যস্থ লোকেরা যেমন স্তম্ভিত, ভীত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উঠে, দুখের নাম শুনিয়া ধোনাই-এর অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল। তাহার উদ্বেগের, বিষাদের, দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। কিন্তু দক্ষিণরায়ের ভয়ে সে ভাব গোপন রাখিয়া বলিল,—"তাহা আমি কিরূপে করিব? দুখের মা যে আমার হাতে হাতে দুখেকে সঁপিয়া দিয়াছে এবং আমিও যে তাহাকে বিপদে আপদে রক্ষা করিব ও নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এখন কেমন করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া যাই? নরবলি গ্রহণের লালসা যদি আপনার এতই বলবতী হইয়া থাকে, তবে দুখেকে ছাড়িয়া আমাকেই গ্রহণ করুন। তাহাতে আমার জীবন নষ্ট হইলেও ধর্ম্ম বজায় থাকিবে।"

"না, তাহা হইবে না" দক্ষিণরায় কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন,—"দুখে ব্যতীত আমি আর কাহাকেও লইব না। তুমি আর আমাকে বিরক্ত করিও না, স্পষ্ট করিয়া বল, দুখেকে দিয়া যাইবে কি না? যদি না দাও তবে যা' বলিয়াছি, নিশ্চিতই তাই করিব—তোমাদের একজনকেও প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিতে দিব না। কি বল ধোনাই, আমার কথায় সম্মত হইলে ত?" ধোনাই এবার আর প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না, স্থিরভাবে নীরবেই শুইয়া রহিল। দক্ষিণরায় তাহার সেই মৌনভাবকেই সম্মতি লক্ষণ ভাবিয়া সুখী হইলেন এবং বার বার, তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, শেষে সহাস্যে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি কাল সকালেই মধু সংগ্রহ করিবে?" ধোনাই বিষণ্ণভাবে উত্তর দিল—"আর বিলম্ব করিয়া কি হইবে? প্রভাতেই বনে উঠিব।"

"তবে এক কাজ করিও" দক্ষিণরায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"গড়খালীর বাদায় আর যাইও না—কেঁদোখালীর বাদায় গিয়াই মধু আহরণ করিও এবং গমনকালে ঐ কেঁদোখালির চরেই তোমার দুখেকে রাখিয়া যাইও। কেমন মনে থাকিবে ত?" অন্যমনস্কভাবে ধোনাই উত্তর করিল,—"থাকিবে।" দক্ষিণরায় প্রফুল্ল মনে ধোনাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিও প্রভাত হইয়া গেল।

রাত্রিতে দক্ষিণরায়ের সহিত ধোনাইয়ের যে কথোপকথন হইল, তাহা কেহই শুনিতে পাইল না, শুনিল কেবল দুখে। সে ভিন্ন নৌকায়, পৃথক শয্যায়, শায়িত থাকিলেও, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে চৈতন্যলাভ করিয়াছিল, আর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাই শ্রবণ করিয়াছিল। কিন্তু সে কাহারও নিকট সে কথা প্রকাশ করিল না, প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া

কেবল হা হুতাশ ও কিসে জীবন রক্ষা হইবে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইলেই, ধোনাই কেঁদো-খালির চরে গিয়া নৌকা বাঁধিল এবং পূর্ব্ববৎ সমস্ত লোকজন ও আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া বাদায় উঠিল। একমাত্র দুখেই কেবল, রন্ধন করিবার জন্য, নৌকায় রহিল। সমস্ত লোক চলিয়া গেলে সে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দুই চক্ষু স্ফীত হইল, চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল! তবুও তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আর অধিককাল তাহাকে ক্লেশ পাইতে হইল না। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার জননীর সেই শেষ কথা কয়েকটী তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি অপসারিত হইয়া গেল: দুখে আশ্বস্ত হইল, মনে সান্ত্বনা পাইল আর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"মা বনবিবি, কোথায় তুমি মা?" দুখের সেই করুণ-আহ্বানে ভুরকুণ্ডে বনবিবির আসন টলিল। তিনি বিদ্যুদ্বেগে নৌকায় আসিয়া তাহাকে দর্শন দিলেন এবং তাহার বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া, সস্নেহে মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন বাছা, আমাকে আহ্বান করিলে? তোমার কি বিপদ হইয়াছে বল, এখনই আমি তোমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিব।" দুখে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পরিচয় দিল। বনবিবি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বাছা! আমি তোমাকে রক্ষা করিব। যখন তুমি আমাকে 'মা' বলিয়া আহ্বান করিয়াছ তখন সাধ্য কি রায়মণির যে তোমাকে হিংসা করে।" বিবির সান্ত্বনা-বাক্যে দুখে সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া গেল এবং মুগ্ধনেত্রে তাঁহার সেই প্রশান্ত ও প্রফুল্ল মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল! বনবিবি আবার বলিলেন,—"কিন্তু বাছা, তোমাকে একটী কাজ করিতে হইবে। রায় যখন বাঘ হইয়া তোমাকে ধরিতে আসিবে তখন তুমি 'মা বনবিবি' বলিয়া চীৎকার করিও। এই কেঁদোখালীর বাদা দক্ষিণরায়ের অধিকৃত, এখানে তাহারই সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব, আমার নহে। সুতরাং বিনা আহ্বানে আমার এখানে আসিবার কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিবার শক্তি বা অধিকার নাই। তবে 'মা' বলিয়া স্মরণ কি আহ্বান করিলে, এই বিশাল বনরাজ্যের সর্ব্বত্রই, সকল দেব দেবীর অধিকারেই আমি গমন ও বিপন্নের বিপদ নিবারণ ও জীবন রক্ষা করিতে পারি। অতএব বৎস, আমার এ নিদেশ যেন বিস্মৃত হইও না।" দুখে আনন্দে বিহ্বল হইয়া, উত্তর করিল,—"না কিছুতেই নহে। তবে মা, তুমি যেন তোমার দুখেকে ভুলিয়া থাকিও না। তুমি ভিন্ন তাহার আপন জন আর এখানে কেহই নাই মা।" বনবিবি অভয় দিয়া চলিয়া গেলেন। দুখে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার দয়ার কথা ভাবিতে লাগিল।

এদিকে ধোনাই ও তাহার সঙ্গিগণ বনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চারিদিকেই মধুচক্র, বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, কোটরে কোটরে অসংখ্য মৌচাক শোভা পাইতেছে—আর তাহাতে মধুইবা কত! তাহারা দক্ষিণরায়ের নামোচ্চারণপূর্ব্বক মধুচক্রে হস্তার্পণ করিতেই সমস্ত মক্ষিকা স্থানত্যাগ করিল! দংশন দূরে থাকুক একটী মক্ষিকাও তাহাদের নিকটে আসিল না! কিন্তু দক্ষিণরায়ের কৃপায় তাহাদিগকে স্বহস্তে মধুসংগ্রহ করিতে হইল

না। তাঁহার আদেশে, তাঁহার ভূতপ্রেতাদি অনুচরগণই মধু আহরণপূর্ব্বক ধোনাইএর সাতখানি নৌকা পূর্ণ করিয়া দিল! দক্ষিণ-রায়ের দয়া দেখিয়া ধোনাই মুগ্ধ হইল এবং শত মুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন দক্ষিণরায় প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"দেখ ধোনাই, সাত নৌকা মধু দেখিয়া তুমি খুব খুসি হইয়াছ বটে কিন্তু উহাতে তোমার লাভ ত বড় বেশী হইবে না। উহা যেমন স্বল্প মূল্য, তেমনই অল্পকাল স্থায়ী অতএব সমস্ত মধু জলে ফেলিয়া দাও এবং উহার পরিবর্ত্তে বহুমূল্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী মোম গ্রহণ কর। কেমন, ইহাতে সম্মত আছ কি?" "কেন অসম্মত হইব?" কৃতজ্ঞতাসূচক মধুর স্বরে ধোনাই উত্তর করিল,—"আপনি যখন আমার মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা করিতেছেন তখন আমি আপনার সমস্ত আদেশই শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য। আপনি আমাকে মোমই দিন।" তখন সেই সাত ডিঙ্গী মধু নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল আর তৎ-পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান মধুখে ডিঙ্গী-গুলি বোঝাই করিয়া দেওয়া হইল! ধোনাই-এর আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হইল। যেস্থলে, যে সঙ্কীর্ণ নদী বা খালে ধোনাই মৌলের সেই সাত নৌকা মধু দক্ষিণরায়ের আদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা এখন 'মধুখালী' নামে প্রসিদ্ধ। শুনিতে পাওয়া যায়—মধুখালীর জল মিষ্ট-আস্বাদ যুক্ত সেই মধুর জন্য, ঠিক মধুরই মত মিষ্ট! বনগামী মৌলেরা মধুখালীর মিষ্টজল পান করিয়া, এখনও নাকি দক্ষিণরায়ের মহত্ত্ব কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রতি আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ধোনাই সেই সাত নৌকা মোমের বিনি-ময়ে দক্ষিণরায়ের নিকটে আত্ম বিক্রয় করিল, তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া পড়িল। তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, পূর্ব্বের সেই সাধুতা প্রভৃতি সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। কি প্রকারে দুখেকে দক্ষিণরায়ের হস্তে সমর্পণ করিবে, তাহাই এখন তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। সে দুখের অসাক্ষাতে, নিজের মাঝীমাল্লাদিগের সহিত, ক্রমাগতই তৎসম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক তর্কবিতর্কের পরে শেষে স্থির হইল,—কাষ্ঠ সংগ্রহের অছিলায় দুখেকে তীরে উঠাইয়া দিয়া দক্ষিণরায়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হইবে এবং দেশে গিয়া প্রকাশ করিতে হইবে যে নৌকা হইতেই দুখেকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। এইরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, সে দিবস তাহারা মধুখালীতেই অবস্থিতি করিল।

পরদিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই, ধোনাই নৌকা খুলিতে আদেশ দিল। মাঝীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল। কেবল দুখে যে নৌকায় ছিল, সেই নৌকার মাঝী নৌকা ছাড়িল না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ধোনাই কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—"নৌকায় একখানিও কাষ্ঠ নাই, পথে রন্ধন চলিবে কিসে?"

"কাঠ নাই তবে কাল কি করিয়াছিলে?" ধোনাই বিরক্ত হইয়া বলিল,—"জান সকালে জোয়ার দিয়া যাইতে হইবে, আগে তার যোগাড় করিয়া রাখ নাই কেন? এখন দাও দুখেকে ডাঙ্গায় উঠাইয়া, কিছু কাঠ ভাঙ্গিয়া আনুক।" মাঝী কথার উত্তর না দিয়া নৌকাখানী তীরের দিকে একটু সরাইয়া দিল এবং দুখেকে নামিয়া কাঠ

ভাঙ্গিয়া আনিতে বলিল। কিন্তু দুখে তাহার কথা শুনিল না তাহার পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও পাঠাইতে অনুরোধ করিল। ধোনাই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অন্যে কেন যাইবে? কেহ ত আর তোমার মত বসিয়া খায় না যে কাঠও ভাঙ্গিতে যাইবে? উহারা খাটিয়া খায় আর তুমি এক-রকম বসিয়া বসিয়াই মাহিনা লও—এই সামান্য কাজটা পারিবে না কেন?"

"পারিব না ত বলিতেছি না"—দুখে কাতর ভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"আজ আমার শরীরটে বড় খারাপ, আমি উঠিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া এইবারটা আমাকে মাপ করুন। আজকার কাঠটা কাহারও দ্বারা ভাঙ্গাইয়া লউন, কাল না হয় আমি ভাঙ্গিব।"

দুখের কাতরতা দর্শনে ধোনাইএর চিত্ত দ্রব হইল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া পরুষস্বরে বলিল,—"তুমিত আর নবাব নহ যে অন্যে তোমার 'পয়নামী' করিবে? তা' হইবে না বাপু, আমি তা শুনিব না, তোমাকেই আজ কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিতে হইবে।"

"চাচা, আজ আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রাণ 'হু' 'হু' করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, দাঁড়াইতেই পারিতেছি না, তা কাঠ কাটিব কিরূপে? আজ আমার দ্বারা কিছুতেই একাজ হইবে না। আজ চাচা"—

ধোনাই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল এবং দুখের কথায় বাধা দিয়া মাঝীকে বলিল,—"ও যদি না নামে, তবে মাঝি, উহার দুই গালে দুইটা চড় মারিয়া, গলাধাক্কা দিয়া ডাঙ্গায় নামাইয়া দাও। বসে বসে মাইনে নেবেন উনি, কাজ কর্‌ব আমরা? কেন বল ত? ঘরে বুঝি আমার টাকা ধর্‌ছিল না? মজা ত মন্দ নহে!"

এবার আর দুখে, কিছু না বলিয়া, স্থির থাকিতে পারিল না। রোষে, অভিমানে তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাষ্পনিরুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে উত্তর করিল,—"বুঝেছি ধোনা চাচা, আমি সমস্তই বুঝেছি। দক্ষিণরায়ের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছ, তাহা আমার জানিতে বাকী নাই। আমাকে বাঘের মুখে তুলিয়া দিয়া তুমি গৃহে ফিরিয়া যাইবে, সাত ডিঙ্গী মোম বেচিয়া বড় মানুষ হইবে? এই না তোমার সঙ্কল্প? এইজন্যই বুঝি আমাকে ভুলাইয়া বাদায় আনিয়াছিলে? আমার দুঃখিনী জননীকে কি বলিয়া বুঝাইয়াছিলে, তাহা কি, ধোনাচাচা, এখন সমস্তই ভুলিয়া গেলে? এই কি তোমার ধর্ম্ম—এই কি তোমার মনুষ্যত্ব? কিন্তু খোদা কি তোমার এ অপরাধ—"

ধোনাই তাহাকে আর অধিক বলিতে দিল না, কথায় বাধাদিয়া বলিল,—"আর বক্তৃতায় কাজ নাই। আমাকে তোর আর ধর্ম্মতত্ত্ব, মনুষ্যত্ব শিক্ষাদিতে হইবে না। আমি পাপ করি আর পুণ্য করি তাতে তোর কি? তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে, আর ভাল চাস্ ত এখনি বাদায় উঠে কাঠ ভেঙ্গে আন্। নচেৎ আজ আর তোর দুর্গতির পরিসীমা থাকবে না।"

"তা' আমি অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি"—ধীরে ধীরে দুখে উত্তর দিল,—"কিন্তু তাতে কি তোমার ভাল হবে?"

ক্রোধে চক্ষু পাকল, ললাট কুঞ্চিত করিয়া ধোনাই বলিয়া উঠিল,—"কি? যত বড় মুখ না তত বড় কথা? একটা কাজ কোর্ব্বেন না, কথা শুনবেন না, কেবল আমার

অন্ন ধ্বংস কোর্ব্বেন আর আমারই অমঙ্গল গাইবেন! এটা বুঝি ধর্ম্ম?"

দুখে কথা কহিল না, উত্তর দিল না কেবল অধোমুখে ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাতেও ধোনাই-এর রাগ পড়িল না, বরং বাড়িয়াই উঠিল আর সেই বর্দ্ধিত রোষে কম্পিত কলেবর হইয়া সে বলিল, "আমার নৌকায় বসিয়া আমারই নিন্দা, আমারই মন্দ কামনা? এত বড় স্পর্দ্ধা, এত বড় যোগ্যতা তোর? পাজি নচ্ছার, নাম আমার নৌকা হ'তে। শীঘ্র নাম বল্‌ছি, নচেৎ 'জবরদস্তী' ক'রে এখনই তোরে জলে ফেলে দে চলে যা'ব।"

দুখে পূর্ব্ববৎ নীরবেই সমস্ত কথা শুনিল কিন্তু এবার আর স্থিরভাবে বসিয়া রহিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে নৌকা হইতে অবতরণ করিল। তাঁহার তখনকার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সকলেই কাতর হইল, সকলেরই হৃদয় দ্রব ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, কিন্তু পাষণ্ড, নির্ম্মম ধোনাই তাহাতে বিন্দু-মাত্রও ক্লেশ বোধ করিল না, উপরন্তু আনন্দে অধীর হইয়া, কতকগুলি ওড়চাকার ফুল তাহার দেহে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কোথা গো রায়মণি, এই তোমার দুখে রহিল, গ্রহণ ও ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন। আমরা দেশে চলিলাম।" ধোনাইএর সাতডিঙ্গী জোয়ার দিয়া পশ্চিমা-ভিমুখে চলিয়া গেল।

দুখে সমস্তই দেখিল, সমস্তই শুনিল কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। আপনার অদৃষ্টকেই শত ধিক্কার দিয়া কেবল বিলাপ ও অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সহসা সম্মুখে ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল এবং ভয়-চকিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিল, এক বিরাটকায় ভীষণ শার্দ্দূল, বদন ব্যাদন করিয়া দ্রুতবেগে তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে! ভয়ে দুখের মুখ শুকাইয়া গেল, বুক দুড়্‌দুড়্‌ করিতে লাগিল। সে বিষাদে নিশ্বাস ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"মা বনবিবি, বাঘের হাতে আমার প্রাণ যায়। শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর। কোথায় তুমি মা—" দুখে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল! কিন্তু তাহার সেই সকরুণ কাতর প্রার্থনা বিফল হইল না। ভুরকুণ্ড হইতে বনবিবি তাহা শুনিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা সাজঙ্গলীর সহিত কেঁদোখালীর চরে আসিয়া দুখের চৈতন্যহীন দেহ ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিলেন। বনবিবিকে দেখিয়া ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণরায় ভয় পাইলেন এবং দুখের আশা ত্যাগ করিয়া পলায়নে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বনবিবি তাঁহাকে সহজে যাইতে দিলেন না, সাজঙ্গলীকে দিয়া তাঁহার শিক্ষাবিধানের, অপরাধ অনুরূপ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন, জঙ্গলী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। দক্ষিণরায় ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন কিন্তু নিজকৃত দুষ্কৃতির জন্য লজ্জিত হইয়া মনের ক্রোধ মনেই গোপন রাখিতে বাধ্য হইলেন এবং নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মহা অপরাধীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইলেন। সাজঙ্গলী 'মার' 'মার' শব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দক্ষিণরায় জঙ্গলীকে বিব্রত করিবার জন্য সম্মুখবর্ত্তী এক নদীতে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য, হাঙ্গর কুমীরদিগকে আদেশ দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নদী অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণমুখে চলিয়া গেলেন। জঙ্গলী নদীতে পদার্পণ করিতেই শত শত

হাঙ্গর কুম্ভীর তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং দন্তাঘাতে তাঁহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও সেই মহাবল পীরের অগ্রগতি নিবারিত হইল না। তিনি স্বীয় অমানুষ শক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই সকল হিংস্র জন্তুকে নিরস্ত, নিহত ও দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া নদী পার হইলেন ও পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতবেগে দক্ষিণরায়ের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। নরহত্যারূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণরায়, নৈতিকবলে বহুল পরিমাণেই হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এজন্য দেহে শত মত্ত মাতঙ্গের শক্তি সত্বেও, তিনি জঙ্গলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাহসী না হইয়া, সুন্দরবনের অন্যতম পীর, মিত্র গাজী সাহেবের অধিকারে গিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন! জঙ্গলী সেখানে গিয়াও স্বীয় ঔদ্ধত্যবশতঃ, তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, গাজী সাহেব তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন এবং সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, মীমাংসার জন্য উভয়কে সঙ্গে লইয়া, বনবিবির নিকটে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণরায়ের সহিত বিবাদ করা বনবিবির অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তখনও তিনি সুন্দরবনের প্রায় অর্দ্ধাংশের, আঠারভাটী বাদাবনের অধীশ্বর ও মহাপরাক্রমশালী। তাঁহার সহকারী কালুরায়ও বড় কম পরাক্রান্ত নহেন। এ অবস্থায় দক্ষিণরায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বনের শান্তিরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। তবে তিনি তাঁহার নরহত্যার পক্ষপাতিনী ছিলেন না বলিয়াই, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। এজন্য গাজী সাহেবের মধ্যস্থতায় সহজেই বিবাদ মিটিল, উভয়ের মধ্যে অনায়াসেই সন্ধি বা সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়া গেল!

গাজী সাহেবের অনুরোধে; দক্ষিণরায় নরবলির লালসা, নরমাংসের লোভ সংযত করিলেন এবং তাঁহার সহিত বনবিবিকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া, দুখেকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। বনবিবি দুখেকে প্রভূত ধনসম্পদ প্রদানপূর্ব্বক 'সেকো' নামা এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন! সেখানে সে অতি অল্পদিনের মধ্যেই, একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইল এবং বিবাহ করিয়া পত্নী ও জননীকে লইয়া, পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। দুখের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সুন্দরবনের দেবদেবীদিগেরও মহোপকার সাধিত হইল। এতদিন তাঁহাদিগের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হিংসা, বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য বিদ্যমান ছিল, তাহা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। সমস্ত দেবদেবীর অধিকার সীমা নির্ণীত ও দৃঢ়ীভূত হইল এবং কেহ কাহারও সহিত কখনও বিবাদ করিবেন না, স্ব স্ব অধিকারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিবেন বলিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞাপাশে সংবদ্ধ হইলেন। সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, এখনও তাঁহারা বনরাজ্য শাসন করিতেছেন—বনবিবিও দক্ষিণরায়কে সমগ্র সুন্দরবনের নেতৃপদে বরণ করিয়া, পরমানন্দে দেবজীবন যাপন করিতেছেন।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য

যেমন সৈন্য পরিচালনে নেতার আবশ্যক হয়, তদ্রূপ গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেও উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সংসার ক্ষেত্রের কার্য্যাদি গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী সম্পন্ন করেন। তন্মধ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কি তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। সংসারচক্রে গৃহকর্ত্রীই নেমি স্বরূপ। সর্ব্বনিয়ন্তা সেই চক্রের পরিচালক।

সংসারের সমগ্র কার্য্যেই গৃহিণীর কর্ত্তৃত্ব সমভাবে রাখিতে হইবে। তাঁহার কার্য্য-কারীতার শক্তি অনুসারে ভৃত্য প্রভৃতি অধীন ব্যক্তিগণ কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। অলস গৃহকর্ত্রীর অকর্ম্মণ্য দাসদাসী অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্ট হয়। কর্ম্মিষ্ঠা গৃহিণীর সুনাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহাকেই আদর্শা রমণী বলিয়া লোকে সম্মান করে। সংসারে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইতে হইলে এই শ্রেণীর গৃহিণীর দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। সলজ্জা যুবতী, বুদ্ধিমতী রমণী, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা, কর্ম্মনিপুণা গৃহিণীই সংসারে শান্তিবারি সিঞ্চনে সমর্থা। পরন্তু নির্লজ্জা স্বরূপা নারী অথবা উত্তম পরিচ্ছদ বিভূষিতা কলহপ্রিয়া রমণী তাপদগ্ধা জ্বালাময়ী সংসারক্ষেত্রে শান্তিবারি বর্ষণ করিতে পারে না। যে গৃহিণী স্বামী এবং সন্তান সন্ততিগণকে সুখী করিতে পারে তাহার তদপেক্ষা সুখ আর কি আছে, তাহার চরিত্র যে কতদূর উন্নত তাহা আর কি অধিক করিয়া বলিতে হইবে। তাঁহার পবিত্র চরিত্র উপন্যাস-কথিত নায়িকা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। যিনি পতিকে নরকের পথ হইতে ধর্ম্মমার্গে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া কে স্থির থাকিতে পারে। যিনি সংসারে দাস দাসীগণকে মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত গৃহিণী যোগ্যা। উপন্যাসের নায়িকা কবির স্বকপোলকল্পিত আলেখ্য। আদর্শা গৃহিণী কবির কবি যিনি তাঁহার স্বরচিত জীবন্ত মূর্ত্তি! প্রথমটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতে যাওয়া আর কোন একটি উদ্ভিদের মুলোৎপাটন করিয়া তদুপরি জলসেচন করা একই অর্থ। মহাগুরুর সহিত ক্ষুদ্রাদপি শিষ্যের তুলনা চলিতে পারে না। অধুনা উপন্যাস-ভোজী পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে এই প্রকার ধারণা আছে। কেহ উপন্যাস কথিত নায়িকার সহিত স্বীয় পত্নীর তুলনা করিতে যাইয়া সংসারকে ঘোর অশান্তি-ময় করিয়া তুলেন। সেই জন্যই আমরা এই বাক্যের অবতারণা করিলাম।

যাহাহউক, কেহ যেন এ কথা মনে না করেন যে, উত্তম গৃহিণী হইতে হইলে সকল সুখস্বচ্ছন্দতা, কৌতুকামোদ, বিশ্রামাদি পরি-ত্যাগ করিয়া কেবল গৃহকার্য্য লইয়াই অষ্ট-প্রহর নিযুক্ত থাকিতে হয়। এইদেশে একটি প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে "রাঁধুনীও চুল বাঁধে।" ইহার অর্থ এই, যে রন্ধন কার্য্য সম্পাদন করে তাহার পোষাক পরিচ্ছদের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয় অর্থাৎ কেবল এক রকমের কার্য্য করিয়াই জীবন কাটাইতে হইবে না, আমোদ প্রমোদেও যোগদান করিতে

হইবে। শরীরেরদিকে নির্লক্ষ্য হইলে চলিবে না। অতএব গৃহিণীকে সংসারের কাজ কর্ম্ম সকলই দেখিতে হইবে এবং শরীর রক্ষা করিয়া আমোদাদি উপভোগ করিতে হইবে। কোন কার্য্যই নিরস হইলে শান্তিপ্রদ হয় না। এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। নিতান্ত দুরূহকার্য্যও সরল ও সরস করিয়া লইতে হয়। যে গৃহিণী সাংসারিক কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন না, তাঁহার সুখ কোন কালেই নাই। অতএব তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

গৃহকর্ত্রীর কি কি গুণ থাকিলে সংসার সুখের আগার হয় এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। তাঁহাকে অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহাকে প্রভাতে সুপ্তোত্থিত হইতে দেখিলে সেই পরিবারস্থ অন্য কেহ অধিকক্ষণ শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিবে না. সেই গৃহের দাসদাসী হইতে বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত গৃহকর্ত্রীর পদানুসরণ করিতে বাধ্য হয়। আর যত্তপি স্বয়ং তিনি অলসপরায়ণা হইয়া সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাভিভূতা থাকেন, তাহাহইলে তাঁহার অনুচরবর্গও তদনুসরণ করিবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব সৎগৃহিণী না হইলে সে সংসারের বিপত্তির পরিসীমা থাকে না। এবং শৈশবে বালক বালিকা সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহারা সংসারক্ষেত্রে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যুষে সুপ্তোত্থিত হইলে বহু কার্য্য করিবার অবসর পাওয়া যায়। তৎকালের শীতল বায়ু সেবন করিলে মনুষ্যের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র রজনী বিশ্রামের পর মস্তিষ্ক সুশীতল এবং সুস্নিগ্ধ হয় সুতরাং অতি দুঃসাধ্য কার্য্যও সহজে সুসম্পন্ন হয়। অতএব ছাত্রগণের পাঠাভ্যাসের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। দিবারাত্রির মধ্যে এমত মূল্যবান সময় আর নাই। মস্তিষ্ক শীতল থাকে বলিয়া গভীর মনোনিবেশ সহজেই হয়। প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত না হইলে সমগ্র দিনটিই বৃথায় নষ্ট হয় এবং মন ঘোর অশান্তিতে যাপন করিতে হয়। * যথাসময়ে শয্যায় গমন করিয়া প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতে শিক্ষা করিলে ধনী ও জ্ঞানী এবং সুস্থকায় হওয়া যায়। একজন ইংরাজ কবিও এই কথার অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন—

"Early to bed, and early to rise,
Makes a man healthy wealthy
and wise."

সুতরাং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা শিশু বৃদ্ধ সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্ষতি বিন্দুমাত্রও নাই কিন্তু লাভ পূর্ণমাত্রায়।

সুস্থকায় হইতে হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার-দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে, তদ্রূপ, গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যসম্ভারের দিকেও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। শরীর সুস্থ থাকিলে শীতল জলে স্নান করা বিধেয়। কেহ কেহ ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সেরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। প্রত্যহ উষ্ণ জলে স্নান করিলে গাত্রের চর্ম্ম লোল (ঢিলে) হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুস্থব্যক্তির পক্ষে শীতল জলই প্রশস্ত। তবে শীতপ্রধান দেশে উষ্ণজল ব্যবহারের আধিক্য দৃষ্ট হয় বটে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে রীতিনীর পার্থক্য হইয়া থাকে। অতি শৈশবে শিশুগণের দৈনিক স্নানের ব্যবস্থা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

* If you do not rise early, you can make progress in nothing." Lord Chatham.

সুনিপুণা গৃহিণী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সাংসারিক সমগ্র কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সময় বিভাগ করিয়া লইবেন। সকল কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে না পারিলে, গৃহমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইবে। প্রতি কার্য্যে সময় বিভাগ করিয়া লইতে পারিলে তাঁহার বিশ্রাম করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। গৃহিণীকে সর্ব্বদা মস্তিষ্ক শীতল রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। কোন্দলপ্রিয়া গৃহিণী সংসারের জঞ্জাল। সে কখনও মিষ্টবাক্যে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। তাহাতে সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠে।

গৃহকর্ত্রীর মিতব্যয়িতা আর একটি বিশেষ গুণ। ঐ গুণটি শিক্ষা না করিলে সংসারের কোন প্রকার উন্নতির আশা থাকে না। স্বল্প কথায় সাংসারিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, মিতব্যয়িতার নিতান্ত আবশ্যক। মিতব্যয়িতা প্রজ্ঞার দুহিতা, পরিমিত পানাহারের ভগিনী, স্বাধীনতার জনকজননী বলিয়া কথিত। যে গৃহকর্ত্রী পদাঘাতে ইহাকে বিদূরীত করেন, তাঁহার এবং সেই সংসারের পতন অনিবার্য্য। উক্ত গৃহিণীর পরিণাম ফল অতি বিষময়। পরিশেষে তাঁহার জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি।

মিতব্যয়িতা শিক্ষার গুণ সকলেই অবগত আছে। অতি দুস্থ ব্যক্তিও এই গুণ শিক্ষা-দ্বারা অতুল বিভবশালী হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে; আবার কেহ উহাকে অপমানিত করিয়া তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে। অপিচ, যাহার এই প্রকার প্রবল ক্ষমতা তাহাকে করতলগত করিতে শিক্ষাকরা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে গৃহিণী ইহাকে স্ব কবলে আনয়ন করিতে সমর্থা তাঁহারই জন্ম সার্থক। কেবল তিনিই স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দকে অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত করিতে পারেন। তাঁহারই ক্ষমতা অসীম। তাঁহারই প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে। যিনি বিপদসঙ্কুল স্থানে বহু বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় কার্য্যকরী শক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই সম্বন্ধে একজন কবি বলিয়াছেন, অত্যল্পস্থানের মধ্যে যে শকটবান তাহার শকটখানি স্বল্পায়াসে ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে, তাহাকেই সুনিপুণ শকটচালক বলা যায়। অর্থাৎ স্বীয় কার্য্যের কৃতিত্ব প্রখর বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা কোন বাধা বিঘ্নের অপেক্ষা রাখে না। গৃহকর্ত্রীও সুশিক্ষিতা হইলে বহু অসুবিধা সত্ত্বেও সংসারের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন। গৃহিণীর অত্যল্প আয়ে সংসার পরিচালিত করিতে হইবে। যৎসামান্য অর্থ দ্বারা ব্যবসায় পরিচালিত করিতে না শিখিলে অধিক অর্থের দ্বারা বিপুল আয়োজন করা সহজসাধ্য হইবে না। প্রথম সরল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে হয়, পরিশেষে কিঞ্চিৎ নৈপুণ্যলাভ করিলে, তদপেক্ষা অধিক আয়াসসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা মন্দ নহে।

আবার মিতব্যয়িতা অর্থে যেন কেহ কার্পণ্য না বুঝেন। মিতব্যয়িতার ত্রিসীমায় কৃপণতা তিষ্ঠিতে পারে না। প্রথমটি অতি উচ্চ দ্বিতীয়টি অতি নীচ। অত্যধিক পরিমাণে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিলেই কার্পণ্য দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং সে বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। উত্তম বিষয় শিক্ষা করিতে যাইয়া যদ্যপি কদভ্যাস শিক্ষা

করা হয়, তদপেক্ষা আর অধিক পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে! নীচতা হইতে যেন সকলেই বহু দূরে অবস্থান করেন। কারণ নীচতাই মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে। পরিশেষে তাহাকে ঘোর নরক যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়।

বন্ধু দ্বিবিধ। প্রকৃত এবং অপ্রাকৃত। এই উভয় প্রকার বন্ধু নির্দ্দেশ নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হয় অর্থাৎ বিপদকালে সমবেদনা প্রকাশ করে; তাহারাই যথার্থ মিত্র বলিয়া কথিত হয়। আর যাহারা 'সুখের পায়রা' অথচ দুঃখ বা বিপদকালে বন্ধুর সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া দূরে দূরে অবস্থান করে এবং অপরের কুৎসা ও নিন্দাবাদে অতীব আনন্দ বোধ করে তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধু অথবা জনান্তিকে শত্রু বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত বন্ধু ওরফে শত্রুকে বন্ধু শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া লইতে হইবে। পৃথক করিতে না পারিলে সংসারে বিশেষ অশান্তি থাকিয়া যায়। গৃহকর্ত্রী এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্রী। শেষোক্ত বন্ধুকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। এই বন্ধুবর্গের বহিরাবরণ এক ও অন্তরাবরণ অন্যপ্রকার। উহাদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ বিস রাখিয়া দিয়া তদুপরি দুগ্ধ ঢালিয়া সেই কুম্ভ পূর্ণ করিয়া রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয় শেষোক্ত বন্ধুর অবস্থাও তদ্রূপ। বহির্ভাগ দেখিয়া কিছুই স্থির করিবার উপায় নাই। পুষ্পবৃক্ষে যে প্রকার সর্প লুক্কায়িত থাকে তাহার বহির্ভাগ দর্শন করিয়া কোন বিষয়ই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না কিন্তু কেহ উক্ত বৃক্ষের নিকট পুষ্পচয়নার্থে আগমন করিয়া পুষ্পে হস্ত প্রদান করিবামাত্র সেই শেষোক্ত বন্ধুর ন্যায় লুক্কায়িত বিষধর তাহাকে দংশন করিল। মনুষ্যগণের এই শেষোক্ত শ্রেণীর বন্ধুগণও তাহাদের অনিষ্ট করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করে এবং অবসর মত ভীষণরূপে দংশন করে। সুতরাং এই প্রকার গুণধর বন্ধুকে জ্ঞাত হওয়ামাত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গৃহিণী যদ্যপি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ সময় প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে সেই পরিবারের শিক্ষার জন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ ও উপদেশাবলী কন্যা বালকবালিকা ও অপর ললনাগণকে শ্রবণ করাইলে এবং তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করাইলে বিশেষ ফলোদয় হইতে পারে। সেই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করাও মন্দ নহে। অবসর মত বালিকাগণকে সেলাইয়ের কার্য্যাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত।

কোন নবাগত বন্ধু আগমন করিলেন আর তাঁহার সহিত দু' তিন ঘণ্টা কথোপ-কথনের পর "গঙ্গাজল," "সন্দেশ," "মিছরী" প্রভৃতি পাতিয়া বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলেন। সেরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। এই প্রকার বন্ধুত্বের বিষময় ফল সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা অবগত আছেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপ বন্ধুত্বের ঢেউ উঠিয়া দেশ ভাসাইয়া লইয়া যাইতে বসিয়াছিল কিন্তু কতিপয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়া উক্ত ঢেউ একেবারে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঘটনা অনেকেই অবগত আছেন। এই সকল বিষয় প্রত্যেক গৃহিণীরই লক্ষ্য রাখা উচিত। তাহা হইলে আর পরিবার মধ্যে

কোন প্রকার অশান্তির কারণ থাকে না। বহুদিন ধরিয়া চরিত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া কাহারও সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। হঠাৎ কোন কার্য্যাই সম্পাদন করা বিধেয় নহে। হঠাৎ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলে প্রায়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুই মিলিয়া যায়। বস্তুতঃ প্রকৃত বন্ধু প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সেইজন্য জনৈক কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়॥
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥"

তাঁহার বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ভিন্ন যথার্থ বন্ধু আর কেহ নাই।

অতিথিসৎকার সংসারের আর একটি বিশিষ্ট গুণ। অতিথিকে সুপাচ্য খাদ্য পরিতোষরূপে আহার প্রদান করিতে পারিলেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যতা সম্পাদিত হইতে পারে। এই গুণটি প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহিণীকেই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এক সময়ে আমাদের দেশ অতিথিসৎকার দ্বারা বিপুল-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা আংশিক পরিমাণে কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয় মাত্র। অধিকাংশ স্থলেই উক্ত গুণটি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার স্থান আত্মতৃপ্তি এবং স্বীয় উদরপূর্ত্তি অধিকার করিয়াছে! প্রাচীনকালের ন্যায় বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা হয় না বলিয়া, অধিকাংশ গৃহকর্ত্রীর এই প্রকার হীনাবস্থা! অতিথিসৎকারে যে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। অতিথিসৎকারকারীর মনের মধ্যে অলক্ষিত-ভাবে যে নির্দ্দোষানন্দ ক্রীড়া করিতে থাকে তাহা তাহার বদনমণ্ডল দর্শন করিলেই উপলব্ধি হয়। অতিথিও তাহার হাস্যবদন দর্শন করিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। এই অপরিসীম আনন্দ অপরলোকে অনুভব করিতে পারে না। বোধ হয় এই সমুদায় সদ্‌গুণ ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্ধান করিতেছে বলিয়াই ভারতবাসী সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতেছে না।

গৃহকর্ত্রীকে আর একটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সংসারের কোন কথা দাসদাসীর অথবা বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ করিতে দেওয়া অতীব অন্যায়। যে সংসারে গৃহিণী ঘরের কথা পরের কানে উঠাইয়া থাকে সেই সংসার শীঘ্রই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ চিরকাল অশান্তিতে কালযাপন করে। সৎশিক্ষার অভাবে এই প্রকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক বালক বালিকাকে শৈশব হইতে সুশিক্ষা দান না করিলে এইরূপ বিষম বিপত্তি সংঘটিত হয়। মাতাপিতা বা অপর গুরুজনের শৈশবাবধি বালক বালিকাগণের সৎশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে দেশের অচিরে ধ্বংস সাধন হইবে। বালক বালিকাগণকে শৈশবে সুনীতি, সুশিক্ষা প্রদান এবং গল্পচ্ছলে শাস্ত্রীয় উপদেশাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। এবং নৈতিক জ্ঞান পরিবর্দ্ধন জন্য প্রত্যেক গুরুজনকে সচেষ্ট হইতে হইবে। তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া অপর কোনদিন তাহাদের মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিতে পারিলে শ্রোতা ও বক্তার উভয় কার্য্যই সম্পাদিত হয়। তাহারা অধিকাংশ সময়েই ঐতিহাসিক গল্পাদি শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করে সুতরাং নীতি এবং হিতোপদেশচ্ছলে তাহাদিগকে সেই সকল

উপদেশ করিলে যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। এই সকল বিষয়ের ভার গৃহিণীকেই লওয়া কর্ত্তব্য। বালক বালিকাগণ অধিকাংশ সময়ে মাতার নিকট থাকে এবং পিতা অর্থোপার্জ্জন এবং অপরাপর কার্য্যাদি সম্পাদন করিবার জন্য অধিকাংশ সময়ই গৃহের বহির্ভাগে অবস্থান করেন, অতএব জননীকে প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে তাহাদের উপদেষ্টা হইতে হইবে। তিনি এই প্রকার কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ প্রকৃত "মানুষ" হইবে না। এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাকেই বলে গৃহ-শিক্ষা। উহা ব্যতিরেকে বিদ্যাশিক্ষা ফলবতী হয় না। স্কুল, কলেজের মূলপত্তন মাতাপিতার নিকটেই হইয়া থাকে। তাঁহারা তত্ত্বাবধান না করিলে উচ্চ শিক্ষার কোন প্রকার ফলোদয় হয় না। কোন বালক বালিকার স্বভাব দুষ্ট হইতে পারে কিন্তু শিক্ষক কি তাহাকে দু' চা'র ঘণ্টা শিক্ষাদিয়া "গাধা পিটিয়া ঘোড়া" করিতে পারেন? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। মাতাপিতার সহায়তা ভিন্ন বাহিরের গুরুর উপদেশ ব্যর্থ হইতে পারে সুতরাং গৃহিণীকে সর্ব্ব প্রযত্নে সন্তানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সদা সদুপদেশ প্রদান করিতে হইবে। মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং নির্ম্মল চরিত্র এই দুইটির প্রতি তাঁহাকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পিতা ও গৃহিণী এই প্রকার চেষ্টা করিলে তবে শিক্ষকের সাহায্যে বালক বা বালিকার উন্নতি হইতে পারে।

অতঃপর চরিত্র গঠন। প্রকৃত প্রস্তাবে বালক ও বালিকা সকলেরই চরিত্র গৃহেই গঠিত হইয়া থাকে। অতি শৈশব হইতে গৃহিণীর উপরই এই গুরুতর ভার ন্যস্ত হয়। তাঁহাকে অতিশয় সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। এবং তাহাদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া অস্বীকার করিলে বিবিধ উপদেশ-বাক্যদ্বারা বলিতে হয়, "স্বীকার কর, কোন শাস্তি পাইতে হইবে না।" তাহারা স্বীকৃত হইলে মন্দকার্য্যের দোষ গুণ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তখন হইতে 'শাস্তি পাইবার ভয় নাই' ভাবিয়া আর তাহারা মন্দ কার্য্য করিয়া ফেলিলেও মিথ্যাকথা বলে না। এইরূপ কৌশলে তাহাদিগকে সত্যবাদী করিয়া তুলিতে হয়। অন্যান্য সদভ্যাসও এই প্রকারে শিক্ষা দিতে হয়। বালিকাগণের গৃহকার্য্যাদি শিক্ষা প্রদান করিবারও ঐ প্রকার নিয়ম।

ভগবানের আরাধনা করিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া দিতে হয়। এই প্রকারে ধর্ম্মের দিকে তাহাদিগকে গমন করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অন্ততঃ বালকবালিকাগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যাহাতে ভগবানকে এক একবার স্মরণ করে তাহার ভার গৃহস্বামী অথবা গৃহকর্ত্রীর লওয়া উচিত। এইরূপ করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশঃ ভগবানে প্রেমভক্তি হইবে। আজকাল অনেকে ভুলিয়াও একবার ভগবানের নাম পর্য্যন্ত করে না। ইহা তাহাদের শৈশব শিক্ষার দোষে হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহাদের মাতাপিতা সেজন্য দায়ী। তবে কোন কোন ব্যক্তি শৈশবে সৎ শিক্ষা পাইয়াও সংসর্গদোষে মন্দ হইয়া উঠে। তাহাতে আর মাতা পিতার দোষ কি। শাস্ত্রেই উক্ত আছে "সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি।" অর্থাৎ সংসর্গ হইতে দোষ এবং সংসর্গ হইতেই গুণ জন্মে। যেমন জড় জগৎ তেমনি অন্তর্জগতে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে, একটি বস্তু অপর বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে, আমরাও অপরকে

আকর্ষণ করিতেছি তাহারাও ঐরূপ করিতেছে। এই আকর্ষণ বিকর্ষণে স্বভাবের আদান প্রদান হইতেছে। তাহাতে কেহ সৎস্বভাবকে আকর্ষণ করিয়া ভাল হইয়া যাইতেছে, কেহ অসৎ সংসর্গ ধরিয়া উৎসন্নের দিকে চলিয়াছে। ইহাকেই সংসর্গ-দোষ বলে।

ধর্ম্মহীনতা এবং নাস্তিকতাও গৃহশিক্ষার দোষেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহিণীকে এই সকল গুণ শৈশবে শিক্ষা করিতে হইবে তবে সে গৃহিণী হইয়া তাহার সন্তানসন্ততিগণকে শিক্ষা দিতে পারিবে। পরদুঃখকাতরতা মানব-হৃদয়ের একটি উৎকৃষ্ট গুণ। তাহা শিক্ষা দান করিতে হইলে একটি নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতিদিন গৃহে কত অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি ভিক্ষার্থ আগমন করে। গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রী আপনাদের বালকবালিকাকে ডাকিয়া তাহাদের হস্তে দানের দ্রব্য দিয়া বলিবেন, "ভিখারীকে এই ভিক্ষা দিয়া আইস; ভিক্ষুককে বাড়ী হইতে ফিরাইতে নাই।" তাহারা এই প্রকারে সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎজীবন সুখের আগার করিয়া রাখিতে পারে।

অপর বিষয় বালকবালিকাগণের পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি। তাহাদিগকে গৃহিণী বা গৃহকর্ত্তা পোষাক এবং খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে প্রকার শিক্ষাদান করিবেন সন্তানগণও তাহাই শিক্ষা করিবে। কোন খাদ্য খারাপ হইলে মাতা পিতা প্রাণান্তেও আপন বালকবালিকাগণের সম্মুখে সে কথা বলিবেন না। খারাপ পাকের কথা না বলিলে তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণও বুঝিল মাতা পিতা যখন কোন আপত্তি করিতেছেন না, তখন আমাদের এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার দরকার দেখি না। জনষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পুত্রকন্যার সম্মুখে কোন খাদ্যের নিন্দা করিতেন না। পোষাক পরিচ্ছদও পিতার নিকট হইতে তাহারা যে প্রকার প্রাপ্ত হইবে তাহাই উত্তম বলিয়া প্রদান করিলে তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিবে। তাহাদের সম্মুখে "এইটি ভাল, এইটি মন্দ" এই প্রকার কথা উচ্চারিত করাই দোষাবহ। তবে পোষাকাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে গৃহিণীকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বালিকার গৃহকার্য্যাদি শিক্ষার দোষ গুণ গৃহিণীর উপরই নির্ভর করে। দৈনিক বাজার হিসাব ও ধোবার হিসাব প্রভৃতি গৃহিণীরই রাখা উচিত। যথাকালে পতি-সেবা এবং তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিতে পারিলেই প্রকৃত গৃহিণীর কার্য্য করা হইল। ইহাকেই সুখের সংসার বলে।

গৃহিণীর দোষেই পরিবার মধ্যে বিলাসিতার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের কোন কোন অংশে এখন আর পুরসীমন্তিনীগণ পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটে কলসীকক্ষে জল আনিতে যান না। এখন তাঁহারা সভ্যশ্রেণীভুক্তা হইয়াছেন। এখন তাঁহারা তেল হলুদ মাখেন না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা এসেন্স, অডি-কলোন ব্যবহারে নিরতা। অঙ্গার দ্বারা দন্ত পরিষ্কার নিতান্ত হেয় বলিয়া গৃহীত হয় না। তৎস্থানে টুথ পাউডার শোভা পায়। অঙ্গের শোভা সম্পাদনার্থে গোলাপ-সাবান এবং মুখমণ্ডলের শোভা বৃদ্ধি মানসে পাউডার ও ক্রিম ব্যবহার করিতেছেন। এক্ষণে বামাগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যূষে ভগবৎ নাম স্মরণ করা অসভ্যতা মনে করেন। প্রত্যূষে নিদ্রোত্থিত হওয়া অসুখের নিদান বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জন্য গৃহকার্য্যাদি দাসদাসীর উপর ন্যস্ত

হইয়াছে। রন্ধনকার্য্যে পাচক-মহারাজ নিযুক্ত আছে। পুত্রকন্যাদির লালনপালনের ভার দাসদাসী আয়া প্রভৃতির উপর অর্পিত হইয়াছে। স্বল্পভাবে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় তাহারাই যেন শিশুগণের প্রকৃত জনক জননী। ধনীগৃহে শিশুগণের জন্মের মাসাধিক হইতে না হইতে তাহাদের সমগ্র ভার এই সকল স্খলিত চরিত্র, দায়িত্বশূন্য, বিবিধ ব্যধিজড়িত নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যের উপর ন্যস্ত হয়। অপিচ শৈশবাবধি শিশুগণের "হীয়তেহি মতিস্তাত, হীনৈসহ সমাগমাৎ।" বচনের সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় সম্পাদিত হয়। এইরূপে সেই শিশুগণের চরিত্র শৈশব হইতেই মন্দ হইয়া পড়ে। সুদূর পল্লীর বামাগণ আর এখন বৃদ্ধা ঠাকুর মার নিকট রামায়ণ মহাভারতের গল্প শ্রবণ করে না। তাহারা এখন নভেল ও গল্পের বহি অধ্যয়নে নিযুক্তা। যাহা হউক, যতদিন মাতা পিতা তাহাদের পুত্র কন্যার সুশিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ না করিবেন ততদিন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশের এই প্রকার হীনাবস্থাই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

কপটতা

হিতং মনোহারি চ দুর্লভংবচঃ।

ভারবি।

দেশে অসংখ্য নিম্ন, মধ্য, এবং উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাত্র পাশ করিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়াও, দেশে সুশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, এ কথা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি না। সুশিক্ষা এবং বিদ্যা প্রাপ্ত মানুষের যে যে লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—আধুনিক পাশ হওয়া ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায়ই তাহাদের অভাব পরিলক্ষিত হয়,—অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা মাদ্রাসা অথবা চতুষ্পাঠীর পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিধারী ছাত্রকে মূর্খ বা অশিক্ষিত কদাপি বলা যায় না।

অবশ্য এমন কথা কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা দেশে সুশিক্ষিত ব্যক্তির একবারে অভাব হইয়াছে বলিতেছি। দেশে এক বা দুইজন কেন, শত শত সুশিক্ষিত মহাশয় ব্যক্তি আমাদের সমাজকে অলঙ্কৃত করিতেছেন,—তাঁহাদের দ্বারা জননী জন্মভূমি কৃতার্থা হইয়াছেন,—তাহা আমরা জানি। আমাদের অভিযোগ এই যে পরীক্ষাফলের "পাশের" অনুপাতে প্রকৃত সুশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। "বিদ্যা বিনয় দান করে এবং বিনয় হইতে পাত্রতা জন্মে" * ইহা আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রবাদ। কিন্তু "শিক্ষিত" ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিনয়ী এবং সুপাত্র লোকের যেন একটা বিশেষ অভাব লক্ষিত হইতেছে। পাশ করা ছাত্রদিগের মধ্যে "চরিত্র" পদার্থটিরও তেমন প্রাচুর্য্য নাই। "চরিত্র" শব্দটী ব্যাপক অর্থেই আমরা ব্যবহার করিতেছি। চরিত্র

* বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাম্‌।

লইয়া বিচার করিলে একই সমাজের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তেমন একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

যাঁহারা বলেন আমাদের ছাত্রগণ ইংরাজী শিখিয়া, অথবা সেই ধরণে অর্থাৎ ধর্ম্মশূন্য আচারশূন্য এবং জাতীয়তাশূন্য শিক্ষা পাইয়া এইরূপ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সহিতও আমরা একমত নহি। আমরা দেখিতেছি আবাল্য টোল অথবা মোক্তাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকও স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের ন্যায় একই প্রকার চরিত্র প্রাপ্ত হইতেছে। মোক্তাবের আদর্শের বিষয় আমরা অবগত নহি,—তবে টোলে যে আমাদের শাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধি ব্যবস্থা রক্ষিত হইতেছে না, তাহা নিশ্চয়। যাহাই হউক, বর্ত্তমান কালে ইংরেজী ডিগ্রী প্রাপ্ত, সংস্কৃত দীর্ঘ উপাধি যুক্ত এবং মোক্তাবের মুন্সী মৌলবী খ্যাতি বিভূষিত,—অনেক ছাত্রই বিদ্যার প্রধান ফল বিনয় এবং পাত্রতাগুণ বর্জ্জিত দেখিতেছি।

শুধু ছাত্র কেন,—বৃদ্ধাদপিবৃদ্ধও যেন পাত্রতা বা চরিত্র-বল শূন্য হইয়াছেন দেখিতেছি। সকলেই জানেন সত্য এবং সরলতা চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীনকালে হিন্দু বা আর্য্যসমাজ যে এই উচ্চগুণে বিভূষিত ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নহে,—বিদেশী অনেক গ্রন্থেও প্রচুররূপে পাওয়া যায় *। সত্য এবং সরলতার প্রশংসামূলক সংস্কৃত শ্লোক এবং সূক্তি উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। অধিক কি, আর্য্যগণ ব্রহ্মে গুণ আরোপ করিতে গিয়া "সৎ" বা "সত্য" গুণের বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে নিত্য কি দৃশ্য দেখিতেছি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মহামাননীয় লর্ড কার্জন বাহাদুর আমাদের চরিত্রের এই গুণের অভাব উপলব্ধি করিয়া ছাত্রগণকে দুএকটি উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া নানারূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতঃ সেই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আজি কালি এই সত্যপরায়ণতা এবং সরলতা, আমাদের বড় একটা নাই। কাহারও নাই, এরূপ কুকথা আমি বলিতেছি না,—তাহা বলাই বাহুল্য।

জানি না, কতদিন হইতে, কাহার অভিশাপে, আমাদের সমগ্র জাতির ভিতর এই দুর্বলতার আবির্ভাব হইয়াছে। রাজনৈতিক অধীনতা এই দুর্বলতার কারণ যাঁহারা বলিবেন,—তাঁহাদিগকে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে,—রাজনৈতিক অধীনতা আসিল কেন? আজি কালি, নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকারাও জানে যে ভারতবর্ষ কদাপি

* Strabo, Arrian, Hian-Tsiang, Khan-thai, Friar Tordanus, Feijn, Idrisi, Shams-ud-din, Murcopolo ইত্যাদি অসংখ্য বিদেশী লোক প্রাচীন আর্য্যগণের সত্যপরায়ণতা এবং সরলতার প্রশংসা করিয়াছেন। Prof: Max müller প্রাচীন বিদেশী পর্য্যটকদিগের কৃত এই সত্যবাদিতার প্রশংসার উল্লেখ করতঃ ঠিকই বলিয়াছেন,—"There must be some ground for this, for it is not a remark that is frequently made by travellers in foreign countries, even in our time, that their inhabitants invariably speak the truth. Read the accounts of English travellers in France, and you will find very little said about French honesty and veracity, while, French accounts of England are seldom without a fling at *Perfide Albion!*" Max Müller's India: What it can teach us; page 57

বাহুবলে পরাজিত হয় নাই। জাতীয় দুর্ব্বলতাই ভারতকে পরহস্তে তুলিয়া দিয়াছে। সেদিন একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান বেশ একটুকু গৌরবের সহিত বলিয়াছেন,—"বাহুবলে অথবা ষড়যন্ত্রের কৌশলে ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের হস্তগত হয় নাই,—ভারতবর্ষ-বিজয়-ব্যাপার ইংরাজের চরিত্রগুণেই সাধিত হইয়াছিল।" * এই কথা ত মিথ্যা নহে,—জাতীয় মহাসভার অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষণ্ নারায়ণ দর, ব্যারিষ্টার মহাশয়ই এই কথাটি তাঁহার একটি প্রবন্ধে † বলিয়াছিলেন,—এবং ঐ ইংরেজ সিভিলিয়ান সাহেবটি কেবল উহা আবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। যাঁহারা রাজনৈতিক আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য চেষ্টা করুন।

এক্ষণে সূক্ষ্মদর্শী সামাজিক মহাশয়েরা সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন এবং বলুন যে আমাদের সমাজদেহের সর্ব্বত্র এই নৈতিক দুর্ব্বলতা, অর্থাৎ সত্যবাদিতা এবং সরলতার অভাব ঘটিয়াছে কি না। উদাহরণ যদৃচ্ছা, যেখানে সেখানে পাওয়া যাইবে। নামাবলী আচ্ছাদিত, দীর্ঘশিখা এবং শুভ্রসূত্র সুশোভিত নগ্নপাদ অথবা চটি-পাদ (পাঠক ক্ষমা করিবেন) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে সাহেবী হ্যাট্, কোট, কলার কামিজ শোভিত আজানু-বুটাচ্ছাদিত মূর্ত্তি মিষ্টার পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে এই সরলতার অভাব। আমাদের আচারে ব্যবহারে, পরিচ্ছদে, খাদ্যে, কথায়, কার্য্যে, সর্ব্বত্র কপটতা। কোন মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কায়স্থ বাটীতে আবাল্য যাজন করিতেছেন,—কায়স্থের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন, মহা-লোভনীয় মহা উপাধিটির নিমিত্ত কোন উচ্চ পদস্থ কায়স্থ ভদ্রলোকের নিকট নিত্য তোষামোদ করিয়াছেন,—আবার একদিন প্রাতঃকালে সেই উচ্চপদস্থ ভদ্রলোককে দেখিয়া,—প্রাতঃকালে শূদ্রের মুখ দেখিবার ভয়ে,—উত্তরীয়াবগুণ্ঠনে,—অর্থাৎ কিনা ঘোমটা দিয়া, নিজ মুখ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন! ‡—নিজে অত বড় পণ্ডিত,—আচারে বিচারে নিষ্ঠায় পরম পবিত্র,—অথচ পুত্রটির প্রত্যহ নৈশ ভোজনের নিমিত্ত লুচির সহিত হংসডিম্ব এবং কপোত শিশুর ব্যঞ্জনের নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। এই পুষ্টিকর খাদ্য না পাইলে নাকি সেই ব্রহ্মচারী বটুটির স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না,—ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের ভারে তাহার মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা! এই দৃষ্টান্ত কল্পিত নহে,—সত্য, সত্য, সত্য। এত গেল নির্ভেজ সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা। আর বাবু?—(অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষিত ডেপুটি, মুন্সেফ, প্রফেসার, মাষ্টার, ডাক্তার—এডিটার ইত্যাদি—তিনি যে জাতিরই হউন,—তিনি বাবু,—) তিনি মনে মনে বুঝিবেন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা খুব দরকার, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া বড় বয়সে বিবাহ দেওয়া

* "He (Mr. Bishan Narayan Dar) is most emphatically right. India was not won by sword or by intrigue, but by character." A District Officer on "Indian Progress and Anglo Indian Bureaucracy" in the Hindustan Review, September 1913, p. 748.

† A serial Essay on "Indian Progress and Anglo Indian Bureaucracy" By Mr. Bishan Narayan Dar, Bar-at-Law, published in July and August issue of the Hindustan Review, 1913.

‡ উপাধি পাইবার পরে অবশ্য এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

দরকার, অল্প বয়স্কা, স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ জ্ঞানশূন্যা, বিধবা বালিকাদের শাস্ত্রমত পুনর্বিবাহ দেওয়া উচিত,—পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ অনুচিত ইত্যাদি,—এবং হয় ত তিনি এই সকলের বৈধতা প্রতিপাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তারস্বরে বক্তৃতা করিবেন,—অথবা মাসিক পত্রে বেশ মালমশলাযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন;—কিন্তু কার্য্যকালে?—একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। তখন আবশ্যকতা অনুসারে কখনও শাস্ত্রের দোহাই, কখনও ব্যবসায়ের দোহাই, কখনও পিতামাতার দোহাই, কখনও পূর্ব্বপুরুষের দোহাই,—কখনও বা শ্রীমতী গৃহলক্ষ্মীর দোহাই দিয়া পাশ কাটাইয়া বসিবেন। সেকালে দেশে "মরদের বাতের" (অর্থাৎ পুরুষের বাক্যের) সহিত হাতীর দাঁতের তুলনা দিত, * অর্থাৎ প্রকৃত পুরুষ যে, সে একবার যে বাক্য মুখ হইতে বাহির করিয়াছে, তাহা আর ঘুরাইয়া লইত না;—এখনকার নূতন প্রবাদ-রচক আমাদের বাক্যের সহিত কূর্ম্মের মস্তকের তুলনা দিবেন;—"এই আছে এই নাই, এই আরবার"! আমরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারির ন্যায় যাহা খুসী করিতেছি, খাইতেছি,—কিন্তু লোকের কাছে, একেবারে বকধার্ম্মিক! সেদিন বিক্রমপুরে "ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী" হইয়া গেল;—সভ্যগণ দুই ঘণ্টার সন্ধ্যাকরার জন্য ছুটি লইয়াছিলেন, সংবাদ পত্রে রিপোর্ট হইয়াছে। ইহার পর মাননীয় শ্রীযুক্ত গজনবী সাহেবের আদর্শে, হাকিম কেরাণী উকীল প্রভৃতির সন্ধ্যা করিবার নিমিত্ত ছুটির প্রার্থনায়, বোধ করি হুজুর কৌন্সিলে দরখাস্ত পড়িবে! কত মোকার্জ্জি, চাটুর্জ্জি, জাহাজ না দেখিয়াও স্বাস্থ্যরক্ষার (!) খাতিরে মুরগী মদ খাইতেছেন,—তাঁহারাই আবার ঘরে মুসলমান থাকিলে জলপান করিতে পারেন না,—এবং বিলাতপ্রত্যাগত ব্রাহ্মণ যুবককে একঘরে করিতে খুব পটু! বর্ত্তমান উৎকল সাহিত্যের মহাকবি কলির ব্রাহ্মণের কি সুন্দর চিত্রই আঁকিয়া গিয়াছেন।

"সারস্বত ব্রাহ্মণের বাণী আরাধনা
চিরব্রত, এবে সেহি দেবী তিরোভাবে,
ব্রহ্মচর্য্য তেজি বিপ্রে হেরে কলিযুগে,
লোভ মোহ জালে পড়ি, অবিদ্যা সেবক।
চন্দ্রিকা পীযূষপায়ী চকোর-ঔরসে
জন্মিবে উলূক,—অমাতিমির প্রণয়ী!
অকর্ম্মণ্য দ্বিজাতির হেব অবশেষে
ষট্‌কর্ম্মে ষষ্ঠকর্ম্ম একমাত্র ব্রত!
তপ, দম, নিয়মাদি সবু দূরে যাই
একমাত্র যজ্ঞসূত্র-গুণ-থিবে গুণে,
ধর্ম্মকু করিবে বিপ্রে জীবন-জীবিকা।"

মহাযাত্রা, পঞ্চমসর্গ। †

এই যে স্বদেশী আন্দোলনে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত মাতিয়া উঠিয়াছিল;—ইহাতেই বা আমরা কি শিখিলাম? কত কপট, স্বার্থসিদ্ধির বাসনায়, নেতৃ নাম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন দিব্য নাম ডাক ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইল, তাহার গণনা কেহ করিয়াছে কি? কত বিদেশী দ্রব্য

* মরদ কী বাত, হাতী কা দাঁত।

† "গৃহস্থের" গত আশ্বিন সংখ্যায় এই মহাকবির একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার নাম ৺রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর। চিত্রখানি ভাল হয় নাই,—যাঁহারা কবিবরকে চিনিতেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের সহিত এই কবির বিশেষ পরিচয় ছিল। "কায়স্থ পত্রিকায়" ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং "সুপ্রভাতে" ইঁহার রচিত কাব্যাদির কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। ওড়িশা দেশে ইঁহার নাম ঘরে ঘরে। উদ্ধৃত কবিতাংশ বাঙ্গালীর বুঝা কঠিন হইবে না। বিপ্রে=বিপ্রগণ, হেবে=হইবে, থিবে=থাকিবে।

স্বদেশী বলিয়া বিক্রয় করিয়া উহারা দুইদিনে বড়লোক হইয়া গেল ;—কত প্রবঞ্চক স্বজাতির শোণিতসম অর্থ শোষণ করত জলৌকার মত পুষ্ট কলেবর হইয়া গেল ; তাহা কয়জন লোকে লক্ষ্য করিয়াছে ? স্বদেশীর উত্তেজনায় কত বিদেশী বিলাস-দ্রব্য আমাদের ঘর ভরিয়া গিয়াছে ;—যাহারা আগে সাবান মাখে নাই, গন্ধদ্রব্য চিনিত না,—তাহারাও প্রচারকের মোহমন্ত্রে দ্বিগুণ মূল্যে বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া গেল ! এই যে কত অল্পবয়স্ক দুধের বালক দস্যুতা এবং নরহত্যাদি ঘৃণিত কার্য্য করিয়া নিজ নিজ জীবন ব্যর্থ এবং পরিবার, বংশ, কুল, জাতি এবং দেশের নামে দুরপনেয় কলঙ্ক রোপণ করিতেছে, কত গৃহস্থের গৃহে নিরানন্দের ঝড় বহিতেছে,—ইহার মূলে সেই কপট, ধর্ম্মধ্বজী, ভক্ত দেশ-সেবক অথচ প্রকৃতপক্ষে দেশের শত্রু তথা কথিত নেতৃগণের পাপ বিদ্যমান রহিয়াছে। দুধের বাছাদিগকে পাপ তাপের পথে ঠেলিয়া দিয়া সেই বকধার্ম্মিক পাপিষ্ঠেরা দিব্য সুখভোগ করিতেছে ! বক্তৃতাকারক সেই কাপুরুষ নরাধমেরা বিপদের সূত্রপাতমাত্রেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করিয়াছে ! কতজনে আপনারা স্বয়ং সুদূরে, ভিন্নদেশে নিরাপদ স্থানে থাকিয়া, তথা হইতে নানাবিধ অসদুপদেশপূর্ণ পত্র ও পুস্তকাদি দ্বারা এদেশের ছেলেদের ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অভিভাবক গৃহস্থদিগের সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য অবিরত চেষ্টা করিতেছে। আমরা এখন যাহাতে তথাকথিত নেতৃবৃন্দের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি এবং ছেলেদের বাঁচাইতে পারি, তাহার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল সামাজিক সুধিবৃন্দের দৃষ্টি এবং মনোযোগ প্রদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আমরা স্বভাবতঃই ভাবপ্রধান জাতি এবং ওজনেও কিছু লঘু,—সেইজন্য ভাবের স্রোতে অতি সহজেই ভাসিয়া যাই। "হুজুকে বাঙ্গালী" বলিয়া যে অখ্যাতি আছে, তাহা মিথ্যা অপবাদ নহে। ঘটি বাটি বাঁধা দিয়া লোকে স্বদেশী নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ার কিনিয়াছিল। বর্ষাকালের বেঙেরছাতার ন্যায় অসংখ্য স্বদেশী জুয়াচুরী কারবারে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল ;—এখন দেখিতেছি কত লোক হাহাকার করিতেছে। আর একটা আমাদের গুণ এই যে আমরা মুখস্থ "গৎ" আওড়াইতে খুব পটু,—তা বুঝি আর না বুঝি। এই "গৃহস্থে"ই দেখিতে পাইলাম যে বঙ্গদেশের কোন পত্র-সম্পাদক "এস দুঃখ" বলিয়া দুঃখকে আবাহন করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই দুঃখের আবাহন নূতন বৈকি !—আমাদের দর্শনশাস্ত্র-গুলি দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবও দুঃখ নিবারণের জন্যই কত চেষ্টা করিয়া তবে "নির্ব্বাণ ঔষধ" পাইয়াছিলেন। আমা-দের শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই দেখি, প্রত্যেক মানুষের চেষ্টা 'আমার সুখ হউক,—দুঃখ কিসে না হয়,—'বলিয়া বারংবার উক্ত হইতেছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "দুঃখে অনুদ্বিগ্ন না হওয়া মুনির লক্ষণ।" নীতিশাস্ত্র বলিতেছে "প্রয়োজন না থাকিলে মূর্খ ব্যক্তিও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।" অথচ এই সম্পাদক বলিতেছেন "আমি লক্ষ্মী চাই না,—অলক্ষ্মী চাই,—খাদ্য চাই না, উপবাস চাই,—সুখ চাই না ; দুঃখ চাই !" এটা কি সরল কথা,—না ভিতরে কোন অলঙ্কারের বা আধ্যাত্মি-কতার মার পেঁচ আছে ? ৺বঙ্কিম বাবু

কমলমণির সাহায্যে বাবলার কাঁটার দ্বারা হরিদাসী বৈষ্ণবীর "মরি মরব কাঁটা ফুটে" বক্তৃতায় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদেরও লোভ হয়, এই দার্শনিক সম্পাদক মহাশয়কে চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস করাই! এসব কি ব্যাপার? একি সেই গ্রীক দার্শনিক ষ্টোইক দলের অনুকরণ? বালকেরা এসব পড়িলে কি ভাবিবে? কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া দুঃখ আসে আসুক,—লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়ুন,—এ বেশ নীতি *; কিন্তু "দুঃখ এস,—আমি সুখ চাহি না—" এ কোন্ দেশের নীতি? আর সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা হয়, তিনি যত ইচ্ছা দুঃখ ভোগ করুন;—তাঁহার সহিত অন্যে দুঃখ ভোগ করিবে কেন? সমস্ত জগৎ সংসারটা সুখের জন্য পাগল,—লেখা-পড়া, চাষ-বাস, শিল্প-বাণিজ্য,—প্রভৃতি চেষ্টা, সকলই ত সুখের জন্য। কাজেই বলিতে হয়, হয় সম্পাদক মহাশয়ের এই দার্শনিক মতের কোনস্থানে কোন প্রকাণ্ড ছিদ্র আছে,—নচেৎ আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ওই সূক্ষ্ম মত প্রবেশ করে নাই।

"গৃহস্থে"র আলোচনার একস্থলে দেখিলাম,—আমাদিগের দেশের ভবিষ্যৎ গৃহস্থদিগকে,—অর্থাৎ বর্ত্তমান ছাত্রদিগকে,—বিদেশে অর্থাৎ য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া নানা বিষয়ে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করত এদেশে আসিয়া গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় (বিনা বেতনে অথচ) ঘুরিয়া ঘুরিয়া, পল্লীবাসীদিগের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মিশিয়া, তাহাদের ভাবে, তাহাদের ভাষায় ঐ সকল বিদ্যার সারতত্ত্বগুলি শিখাইয়া পল্লীবাসী জনসাধারণকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার নিমিত্ত, পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।—অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রকেই বিবেকানন্দস্বামী, অভাবপক্ষে বিনয়কুমার সরকার হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই উপদেশ খুব উচ্চ বটে, কিন্তু গৃহস্থের মুখ হইতে গৃহস্থের ছেলেদিগের প্রতি প্রদত্ত হইবার যোগ্য কি? ভাব উচ্চ হইলেই কি সকলের পক্ষে উপযোগী হয়? উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "একমাত্র ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান হইলে জগতে জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না।" কথা ত ঠিক,—কিন্তু এ জ্ঞান দিবে কে? আর এরূপ জ্ঞান লাভ করিবার যোগ্যই বা কে? নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ খুব উচ্চ বটে,—কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কি? মহাজ্ঞানী মনু তাই বলিয়াছেন যে "অকাম ব্যক্তির কোন ক্রিয়া বা কর্ম্মই নাই।" কামনা না থাকিলে মানুষ কোন কার্য্য করিবে কেন? তাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা "নিষ্কাম" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মকাম" করিয়াছেন। জন্ম হইতে যে বালকদিগকে আমরা নানাবিধ আকাঙ্ক্ষা শিখাইয়াছি এবং যে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্যই আমাদের পুত্র বা আত্মীয়গণ বিদেশে গিয়াছেন, এবং তথায় ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের নিমিত্তই নানাবিধ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও একতানমনে নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা এদেশে আসিবামাত্র সকলেই নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা, আশা, কামনা বর্জন করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন?

* নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরা॥

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত—যাঁহাদের স্কন্ধের উপর বৃদ্ধ পিতামাতা, অল্প বয়স্ক ভাই ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতিপালনের ভার, তাঁহারা কি করিবেন? জাপান কি এই-রূপ সন্ন্যাসীদলের দ্বারা বড় হইয়াছে? প্রকৃত কথা এই যে, আমরা মুখে যাই বলি না কেন, দুই একজন বাদে, আমরা সকলেই ঘোরতর স্বার্থপর; স্বার্থের ভিতরদিয়াই আমাদিগকে চালাইতে হইবে। যে মনীষী আমাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়ের ভিতর দিয়া দেশের স্বার্থসিদ্ধির উপায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন,—তাঁহারই জয় হইবে। স্বর্গের স্বপ্ন দেখিলেই যদি স্বর্গে যাওয়া যাইত, তাহা হইলে খুব সুখের হইত বটে কিন্তু সংসার কঠোর কর্ম্ম-স্থান। এখানে যোগ্যতমেরই জয়। রোদনের ফল মৃত্যু।

আবার আর একরূপ স্বদেশভক্ত দেখিতে পাইতেছি। বিলাতী পোষাক পরিয়া "স্বদেশী" বক্তৃতা দেওয়ার দৃশ্য আমরা অনেকে দেখিয়াছি। বাঙ্গালী শ্রোতার সম্মুখে, বাঙ্গালী বক্তা ইংরাজী ভাষায় স্বদেশী বক্তৃতা দিতেছেন দেখিয়াছি। স্বদেশের গৌরবসূচক কথা দেশের অতীত কীর্ত্তি-কাহিনী, এখন ইংরেজী ভাষায় লেখা হই-তেছে দেখিতেছি। শুধু ইংরাজী ভাষায় লেখা নহে,—বিলাতে মুদ্রিত না হইলে তাঁহাদের গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হয় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবুর "প্রাচীন ভারতের নৌ বাণিজ্যের ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তকখানির কথাই ধরুন। রাধাকুমুদ বাবু প্রথমতঃ এই বিষয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন; সেই সময়ে তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই ইংরাজীতে প্রবন্ধটি লিখিতে হইয়াছিল। তাহার পর বাড়াইয়া, সংশোধন করিয়া উহা ইংরাজিতে লিখিলেন কেন? হয়ত ইংরাজদিগকে আমাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই তত্ত্ব বাঙ্গালী সাধারণ পাঠক-দিগের যেরূপ অপরিচিত,—ইংরাজদিগের নিকট কি তদ্রূপ অপরিচিত? আমরা অবশ্য পণ্ডিত অর্থাৎ প্রাচ্য সাহিত্যসমূহে সুপণ্ডিত ইংরাজদিগের কথাই বলিতেছি। তাঁহার এই পুস্তক সাড়ে সাত শিলিং খরচ করিয়া সাধারণ ইংরেজ পড়িবে, এরূপ দুরাশা কেহই করিতে পারে না। ভারতবর্ষ-দেশটা কোথায়, হিন্দুকুশ একটা পর্ব্বত না একটা জাতি,—এরূপ মোটা মোটা কথাই সাধারণ ইংরাজে জানে না। সাধারণ ইংরাজে ভারত-সম্বন্ধে কিছু জানিতেও যে বড় একটা উৎসুক, তাহা নহে,—তাহার উপর আবার আমাদের গৌরবের কথা? এত একেবারে অচল। বিলাতে এখনও আমাদের সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় কুসংস্কার * চলিতেছে। যাহাই হউক, এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালী ধন্য ধন্য করিতেছেন কিন্তু কয়জন ইংরেজ উহার প্রাণখোলা প্রশংসা করিয়াছেন? একজন খুব দীর্ঘ নিন্দা করিয়া-ছেন, তাহা ইণ্ডিয়ান টাইম্‌সে পড়িয়াছি। কিন্তু পাঁচ টাকা দশ আনা খরচ করিয়া কয়জন বাঙ্গালী এই বই পড়িতে পারেন? যদি হঠাৎ বই খানি না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকেও এই সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইত। পুস্তকখানি মূল্যবান মোটা কাগজে বিলাতে অত নবাবী ফ্যাসানে না ছাপাইয়া যদি এদেশে সাধারণ ভাবে ছাপান হইত,—উহার দাম বড় জোর দুই টাকা হইত। আমাদের মত ঐ পুস্তকের মূল্য এক টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে। ইংরাজেরা শিক্ষার বিস্তার করিবার জন্য ক্রমাগত বইয়ের দাম কমাইতেছেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক

* যদি এই কুসংস্কার দূর করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ রাজসংস্করণ (Edition-de-luxe) বহুমূল্য পুস্তকের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আজকাল ইংলণ্ডে বড় বড় নানাবিধ বিষয়ে সাধারণকে শিখাইবার জন্য নানাবিধ সুলভ সংস্করণের পুস্তক বাহির হইতেছে।

একশিলিংএ পাওয়া যায়। নেলসনের বৃহৎ বিশ্বকোষ ২৫ ভাগ, পঁচিশ সিলিংএ বিক্রয় হইয়াছে। আর আমাদের দেশের দেশভক্ত স্বদেশের সেবক, শিক্ষক মহাশয় তাঁহার নিজ রচিত পুস্তক বিলাতে ছাপাইয়া দেশের লোকের অপ্রাপ্য করিলেন! আর একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক (তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের বিশেষত্বের দিকেও খুব লক্ষ্য আছে দেখা যায়) তাঁহার প্রণীত পুস্তক বিলাতে যন্ত্রস্থ বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ইঁহারাই ছেলেদের শিখাইতেছেন "স্বদেশের মাটী, স্বদেশের জল, ধন্য হউক, ধন্য হউক, ধন্য হউক হে ভগবান্।" এই দুঃখের স্থান নাই। ইংরেজ কম্পোজিটার, ইংরেজ-দপ্তরী, ইংরেজ কোম্পানীর হাত দিয়া পুস্তক বাহির না হইলে কি তাহা ভারতের স্বদেশীমন্ত্র প্রচারের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে? বড় দুঃখেই আমরা এত কড়া কথা বলিতেছি। যাঁহারা শিক্ষক, তাঁহারা আমাদের মাথার মণি, তাঁহাদের কথা ও কাজে ঐক্য না থাকিলে ছেলেদের কাছে, তাহার আশা করা বৃথা।

আর নয়, এখন থাকুক। জানি না আমাদের এই সরল প্রাণের কথা আমাদের শিক্ষিত সমাজ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে সকলেই স্ব স্ব হৃদয় অনুসন্ধান করুন। বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, ভোজনে, কার্য্যে কপটতা ত্যাগ করুন। সরলতা এবং সত্য আশ্রয় করুন। কয়েক বৎসর হইতে দেশহিতৈষণার এ কপটতা আমদানী হইতেছে এবং সেই কপটতা সাময়িক সাহিত্য দূষিত করিতেছে। ভাবের স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া কেবল কতকগুলা এলো মেলো বাক্যব্যয় করিলেই হইবে না, উচ্চ আদর্শের লোভে বা মোহে মত্ত হইলে চলিবে না। আমরা দরিদ্র গৃহস্থ,—আমাদের রাজার মত কি সন্ন্যাসীর মত কথা শোভা পায় না। দরিদ্র গৃহস্থের যাহা কর্ত্তব্য,—তাহার শক্তিতে সামর্থ্যে যাহা কুলায়, তাহাই করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাও করিবার আগে দুইবারের পরিবর্ত্তে দশবার আলোচনা করিয়া লইতে হইবে।

এরূপ কথায় অনেক ভাবুক আমাদিগকে কাপুরুষ বলিবেন, এরূপ ভীরু এবং হিসাবী লোকের দ্বারা বিশেষ উপকার কখনও হয় নাই এবং হইবেও না বলিবেন। জলে নামিবার পূর্ব্বে সাঁতার শিখা যায় না—ইত্যাদি বলিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিবেন।

আমরাও তাহা স্বীকার করি,—হিসাবী লোকের দ্বারা "যুগান্তর" আনীত হয় না তাহা ঠিক,—সকল সময়ে 'যুগান্তর' আনাও প্রার্থনীয় নহে। সাঁতার না শিখিয়া গভীর জলে ঝাঁপ দিলে মৃত্যুরই খুব সম্ভাবনা। * অল্পজলে আগে বালিমাটি ধরিয়া, পা হাত ছুড়িয়া তাহার পর অভিভাবকের সাহায্য লইয়া সাঁতার শিখিয়া জলে নামিতে হয়। গৃহস্থ নিশ্চয়ই সাবধানতার সহিত প্রত্যেক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। যিনি অবিমৃষ্যকারী, তিনি, যতই কেন বড় প্রতিভাশালী হউন না, গৃহস্থ নামের অযোগ্য। হুজুগে মাতা গৃহস্থের পক্ষে নিতান্তই অমঙ্গলজনক। আমরা গৃহস্থ,—গৃহস্থের নিমিত্তই আমাদের চিন্তা। বৈরাগী যিনি তিনি ত জানেন,—

"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্য মেবা ভয়ম্।"

অতএব তাঁহার কথা সম্পূর্ণ পৃথক্। কপটতা দূরীভূত না করিলে জাতীয় চরিত্র গঠনের সম্ভাবনা অল্প। শুধু ছাত্রদিগকে দোষ দিলে কি হইবে? তাহাদের অপরাধ কি?

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

* Swimming is impossible, if I think about it. But if I throw myself into water I easily learn to swim. "Creative Evolution, by Henry Bergson, translated by Dr. A. Mitchell, Ph. D. কিন্তু সত্যই কি তাই? একজন সমালোচক ইহার বেশ উত্তর দিয়াছেন "A man following Bergson's advice will inevitably be drowned."

মফঃস্বলের বাণী

১। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

রাজার নিকট আবদার করিবার আমাদের দুইটি বিষয় আছে। সে দুইটি বিষয় আর কিছুই নহে, আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি। একপক্ষে এটী আমাদের আবদার হইলেও চিন্তা করিয়া দেখিলে এটী রাজারই প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। এই যে প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি পীড়ায় অসংখ্য লোক অকালে কালসদনে গমন করিতেছে, এই ভাবে যদি ভারতের প্রজা সব মরিয়া যায়, তবে কাহাকে লইয়া রাজা রাজত্ব করিবেন? আবার মূর্খ লইয়া রাজত্ব করিয়াও সুখ নাই। প্রজা যদি প্রজার কর্ত্তব্য না বুঝে, রাজাকে ভক্তি করিতে না জানে, তবে কি রাজ্য শাসন করিয়া রাজার অন্তরে শান্তি আসিতে পারে? তাই বলি, এক পক্ষে আমাদের আবদার হইলেও এটী রাজারই সুখ শান্তির জন্য।

শিক্ষা বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বঙ্গবাসীই সমধিক উন্নত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই বাঙ্গালাতেই শতকরা ৮জন লোকও লেখা পড়া জানে না। ইহাতেই অনুমান করা যায়, আমরা শিক্ষার কত নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট প্রাইমারী শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন সত্য কিন্তু উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে কার্পণ্যতাই দৃষ্ট হইতেছে। কলেজের কথা ছাড়িয়া দিলেও উচ্চশ্রেণীর স্কুলপ্রতিষ্ঠাও আজকালকার দিনে সহজ ব্যাপার নহে। তাই সহর ব্যতীত সামান্য দুই চারিটী পল্লীতে মাত্র উচ্চশ্রেণীর স্কুল দৃষ্ট হয়। অনেক দরিদ্র পল্লীবাসী ইচ্ছা থাকিলেও সেই জন্য উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে না। আবার শিক্ষার ব্যয়ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাইমারী শিক্ষা বিস্তারে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন সত্য কিন্তু অনেক স্থানের প্রাইমারী স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত স্কুলের জন্য যেরূপভাবে সাহায্য করেন তাহাতে ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না। আবার যাহারা কার্য্য করে, অল্প বেতনের জন্য কিছু দিনের মধ্যেই তাহাদের কার্য্যে শিথিলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সব কারণে অনেক স্কুল উঠিয়া যাইতেছে। ছাত্রসংখ্যাই যে আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে সে কথাও বলিতে পারি না।

সরকারী রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে ১৯১১-১২ সালে বালিকা বিদ্যালয়গুলির ছাত্রী সংখ্যা ২,২২৫৭৬ জন ছিল, ১৯১২—১৩ সালে ২,২২,৭৪৯ জন হইয়াছে। অর্থাৎ এক বৎসরে ১৭৩ জন বেশী হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে বালিকা শিক্ষার উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিয়াছে। কারণ প্রতিবৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে হাজার-করা প্রায় অর্দ্ধজন। বঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ২ কোটী, সুতরাং প্রতি বৎসর স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার ১৫ ভাগের এক ভাগ যদি এমন বয়সের বালিকা হয়, যাহাদের স্কুলে পাঠ করা উচিত, তবে এক বৎসরে অন্যূন ৬৬৬ জন ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে হিসাব ঠিক থাকিত।

স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। পল্লীগ্রামে ব্যাধির অব্যাহত রাজত্ব বলিলেও চলে। জল কষ্টই পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। এই সমস্ত অভাব রাজার নিকট ভিন্ন আর কাহার নিকট জানাইব? এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকিলেও সেরূপ দৃষ্টি কৈ? ভারত সাম্রাজ্যের ১৯১৪ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ব্যয়ের হিসাবে দেখিতে পাই দীঘি নির্ম্মাণের জন্য আরও ১কোটী টাকা বরাদ্দ হইল। রেলপথ বাড়াইবার জন্য ১৮ কোটী,

সৈনিক বিভাগের জন্য ৩০ কোটী ৭০ লক্ষ, আর, শিক্ষার জন্য ৯ লক্ষ এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মাত্র ৬ লক্ষ টাকা! যে দেশের লোক এখনও শতকরা ৯২ জন মূর্খ, ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার প্লেগ, কলেরা যাহাদের নিত্য সহচর, তাহাদের পক্ষে ও দান ত হাতীর মুখে দূর্ব্বাঘাস! তাই বলি হে গবর্ণমেণ্ট, একবার আমাদের প্রতি তাকাও, আমাদের সৎশিক্ষার বিধান কর, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কৃপাদৃষ্টিপাত কর। ইহাতে একপক্ষে আমাদের সুখ শান্তির কারণ বটে, অপর পক্ষে তুমিও রাজত্ব করিয়া সুখী হইবে।

স্বরাজ।

২। ব্যবসা ও ধর্ম্ম

হিন্দু শাস্ত্র বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনাই পরম পুরুষার্থ। শাস্ত্র প্রথমে ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, পরে অর্থের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে ইহাই হিন্দুধর্ম্মের আদেশ। আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "যে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের আবার সংশ্রব কি? ব্যবসা বাণিজ্য করিতে গেলে "ধর্ম্ম" দেখিলে চলিবে না। দু'পয়সা যখন উপায় করিতে হইবে, তখন "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিলে চলিবে কেন? পয়সা না হইলে ধর্ম্ম হয় না।" এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আজকালকার ব্যবসায়িগণ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন সুতরাং ধর্ম্মের নামটী একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মাশ্রিত ব্যবসায়ী যে একেবারেই নাই, তাহা আমরা বলি না, তবে সংখ্যায় তুলনায় অতি অল্প।

সত্যবটে আমরা দারুণ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, নিরন্তর রোগ শোকে জর্জ্জরীভূত, অকাল জরায় জীর্ণ। অভাবের তীব্র তাড়নায় "হা অর্থ যো অর্থ" করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছি, অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, পয়সা না হইলে আর চলে না, এক মুহূর্ত্তও আমরা বাঁচিতে পারি না। বুঝি বা বাঙ্গালী নামও আর বজায় থাকে না। তাই যাহার যেরূপ অবস্থা, যেরূপ সামর্থ্য ও সুবিধা তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া দু পয়সা উপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট। সকলেরই মন পয়সার দিকে যে কোন উপায়ে হউক দু পয়সা উপার্জ্জন করা চাই। ধর্ম্মের দিকে আর কাহারও দৃকপাত নাই।

যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের অবশ্যই মন্ত্রটী অজ্ঞাত নহে যে—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। রাতারাতি এই লক্ষ্মী লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষাই বিস্তর ব্যবসায়ীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে গেলে সময় সাপেক্ষ। সে সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন সে ধৈর্য্যধন ইহাদিগের নাই তাই রাতারাতি বড় মানুষ হইব, এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম ও বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া ব্যবসায়ের আবরণে যেরূপ প্রতারণার অভিনয় আজকাল চলিতেছে, তাহা ভাবিলে অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে। এই সব ব্যবসাদারের বিশ্বাস, মিথ্যা, শঠতা ও কূট কৌশল অবলম্বন না করিলে ব্যবসা চলে না। এবং এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ইহাদের হস্তে যে দু পয়সা না আসিতেছে তাহা নহে। ইহারা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছেন। সুতরাং দিন দিন ইহাদের লাভও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রতারণার নানাবিধ কৌশল এবং উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীস্থ ব্যবসাদারদিগের কার্য্যস্থল। বিশেষতঃ মফঃস্বলবাসীরা ইহাদিগের বলি স্বরূপ।

চাউল, ডাউল, দুগ্ধ, ঘৃত, তরি তরকারী প্রভৃতি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে কোন দ্রব্যই খাঁটী পাওয়া যায় না। বাজারে গিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যের মূল্য দিয়া, অতি নিকৃষ্ট, জঘন্য দ্রব্য গৃহে লইয়া আসিতে হয়।

বীরভূমবার্ত্তা।

৩। সভ্যতায় স্বাস্থ্যহানি।

অদ্য আমাদের আলোচনার বিষয় এই কলিকাতা সহরের হিন্দুনামধারী বাঙ্গালী পরি-

লিত হোটেল সমূহ। হোটেল অর্থে "হিন্দু দ্রলোকদিগের আহার করিবার স্থান" নহে। পার চিৎপুর রোড, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, লালবাজার প্রভৃতি স্থানে াজকাল যে সকল মাংস খাইবার হোটেল। চা-পানাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎ-ম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্যবিভাগ শা মারিতে কামান দাগিতে পারেন। বসন্ত আসিতেছে, অতএব জনে জনে টীকা লও তাহা হইলে আর ভয় থাকিবে না—ম্যালেরিয়া ধ্বংশ করিতে চাও, তবে মশকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, আর ম্যালেরিয়ার ভয় থাকিবে না ইত্যাদি প্রকার গ্রাটিশ এডভাইস করিতে তাঁহারা খুব মজবুত। কিসে যথার্থ কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়, তৎপ্রতি কিন্তু কোন লক্ষ্য নাই। ময়রার দোকানে অনাবৃত খাবার খাইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, অতএব ময়রাবেটাদের জব্দ করা উচিত। ধূলিকণায় যাবতীয় রোগের বীজাণু আছে, অতএব নূতন আইন করিয়া ময়রাবংশকে জব্দ করিতে হইবে। এদিকে ভেজালে যে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে সে বিষয়ে কিন্তু কোন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নাই।

আমরা এই মাংস খাইবার ও সাধারণ চার দোকানগুলি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব—যে ইহারা দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে।

সাধারণতঃ এই সকল স্থানে যুবকগণের গতিবিধিই বেশী। বাপের পয়সায় তাহারা অবাধে এই সকল স্থানে গমন করিয়া মাংস ভ্রমে বিষ গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।

এই সকল হোটেল ও চায়ের দোকান-গুলি খুলিতে হইলে অগ্রে মিউনিসিপ্যা-লিটীর নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয় সত্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত শেষ। লাইসেন্স লইয়া তাহারা কি করে তাহা মিউনিসিপ্যা-লিটী দেখিয়াও দেখেন না।

এই সকল হোটেলওয়ালা—তাহাদের রাঁধুনি ও চাকরবৃন্দ (ওয়েটার) যে কোন জাতি সে সম্বন্ধ পাঠকের কৌতুহল জন্মিতে পারে। যতদূর জানিতে পারিয়াছি—হোটেল ওয়ালারা প্রায়ই সুবর্ণবণিক না হয় শুঁড়ী জাতীয়, রাঁধুনীগুলি সর্ব্বজাতীয় এবং চাকর-বৃন্দ বেহারী মেড়ো বা কাহার। পুরী হার মানিয়াছে, এবং কলিকাতা এখন নবপুরুষো-ত্তম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই মানসম্ভ্রম নাই, প্রবৃত্তি বশে আজ বাঙ্গালার হিন্দু ব্রাহ্মণ এই সকল স্থানে বসিয়া অখাদ্য সকল খাইতেছে, এবং কেহ কেহ মরাল করেজ দেখাইবার জন্যও হোটেলের বিল লইয়া বন্ধুবান্ধবকে দেখাইয়া বড়াই করি-তেছে! বঙ্গোপসাগরে কি বাঙ্গালীর স্থান হইতে পারে না?

এই সকল স্থানে মাংস অর্থে যে কি ব্যব-হৃত হয়, তাহা কি করিয়া বুঝাইব। মিউনি সিপ্যাল মার্কেটে মটন বিক্রয় হয়—কিন্তু সব টাটকা, বাসী মাংস স্থান পায় না—এই বাসী মাংস গুলি দোকানদারেরা মার্কেটের বাহিরে বরফ দিয়া রাখে। হোটেল ওয়ালারা উহা-দের নিকট হইতে সস্তাদরে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এই মটন বলিয়া সময়ে সময়ে অন্য মাংস প্রদত্ত হয়—পাঠক অনুসন্ধান করিয়া লউন।

চপ প্রভৃতিতে মাংস কিমারূপে ব্যবহৃত হয়। এই কিমার ভিতর যে কি নাই, তাহা বলিতে না— পশুর সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি এবং কাষ্ঠের কুঁচি পর্য্যন্ত ইহার সহিত প্রদত্ত হয়।

তারপর হোটেলের যেখানে মশলা মেশাই করা হয়, সেই স্থানটী অতীব রমণীয়। যদি কেহ কখনও সেই সকল স্থান দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি আর অমরাবতী দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইবেন না।

রাঁধিবার পাত্রগুলি প্রায়ই তামার না হয় এনামেলের হয়। তামার ডেকচি বটে—কিন্তু উহা কলাই করা কবে হইয়াছিল—সে কথা হোটেলের খতিয়ানে লেখা নাই। তামার পাত্রে কিম্বা চটাউঠা এনামেলের পাত্রে সিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীর কি প্রকার হয়, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা শক্ত। ডাক্তা-রেরা বলেন যে, এমন ব্যাধি নাই যে, উহা দ্বারা না হইতে পারে।

তারপর মংসাদি যদি একদিনে বিক্রীত না হয়, তাহা হইলে পরদিন উহা চপ্ কটলেটে পরিণত করা হয়। খরিদ্দারের ভুক্তাবশেষ উচ্ছিষ্ট মাংসও ফেলা যায় না। আমরা দেখিতেছি যে, শশা, আলুসিদ্ধ, পেঁয়াজ কুঁচি প্রভৃতি যাহা দেওয়া হয়—যদি কোন খরিদ্দার সমস্ত না খাইয়া যায়, তৎপর দিবস উহাও পুনরায় ব্যবহৃত হয়।

তারপর পানীয় জল। হোটেলের যে স্থানে বাটা হয়—সেই স্থানে একটী জালা মৃত্তিকাপরি অর্দ্ধপ্রোথিত ভাবে থাকে। উহাতে কলসী করিয়া জল পূর্ণ করা হয়। কোনও কালে সেই জালা পরিষ্কার করা হয় না। সুতরাং পানীয় জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে পাঠক অনুমান করিয়া লউন।

খরিদ্দার প্রস্থান করিলে—তাহার ভুক্তাবশেষ সমগ্র সামগ্রীগুলি পৃথক পৃথক পাত্রে রক্ষিত হয়। তারপর একটী বালতীতে রক্ষিত জলে ডিসগুলি ডুবাইয়া ধৌত করা হয় এবং পরিশেষে একখানি তৈলাক্ত পাথুরে বর্ণের তোয়ালে দ্বারা উহা মুছিয়া ফেলা হয়। তাহা হইলে দেখুন যদি কোন আহারার্থীর কোনও প্রকার সংক্রামক রোগ থাকে—আর তাহার পাত্রে অপর ব্যক্তি পুনরায় ভোজন করে, সেই ব্যাধির বীজ সহজেই তাহার শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে। সামান্য বিলাসিতা, সামান্য উদরপূর্ত্তির জন্য বাঙ্গালী কি সর্ব্বনাশই ঘটাইতেছে! যক্ষ্মা-রোগীর দেহস্থ বীজাণু—কিছুতেই বিনষ্ট হয় না—এই উচ্ছিষ্ট খাইতে গিয়া কি যক্ষ্মা-বিজাণু সাধ করিয়া বাঙ্গালী নিজ দেহে ধারণ করিতেছে না? অজীর্ণ, অম্বল, ডিসপেপ্সিয়া, ক্ষুধামন্দ্য, যক্ষ্মা, হাঁপানি কেন এত বাড়িয়াছে, এই সকল হোটেলে যাইয়া একবার অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু "কা কস্য পরিবেদনা!"

আজকাল ঘৃত বলিয়া বাজারে একটা তরল পদার্থ বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে ঘৃত বলিলে যাহা বুঝাইত, ইহাতে সে সকল গুণ কিছুই নাই। চার্ব্বাকের মতে যাহা হউক, তবু এই পদার্থ সময়ে সময়ে ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হয়।

রন্ধন কার্য্যে তৈল কিম্বা ঘৃতের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হোটেলওয়ালারা যে ৭৲ টাকা মণ দরে ঘৃত খরিদ করিয়া মাংসে উহা দেয়, ইহা পাঠক কল্পনায়ও আনিবেন না। তাহারা বাদামের তৈল, কলিকাতার উন্টাডিঙ্গির কলে প্রস্তুত নানাপ্রকার দুর্গন্ধ তৈলে এই মাংসাদি রন্ধন করিয়া থাকে। তারপর ভেড়া ছাগলের চর্ব্বিও ব্যবহৃত হয়।

মেদিনীপুর-হিতৈষী

৪। স্বদেশী গেল কেন?

বঙ্গ বিচ্ছেদের সঙ্গে বঙ্গদেশ এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া, যে একটা স্বদেশীর উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা এত শীঘ্র হঠাৎ দমিয়া গেল কেন। ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিরোধে ইহার উৎপত্তি, তাই এতশীঘ্র উহার বিকৃতি এবং লয়। ইহাই উহার একমাত্র বা অন্যতম কারণ কিনা তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সামান্য উপলব্ধির ফল আপনাদের সম্মুখে ধরিতেছি। আপনারা বিচার করিবেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, সতী স্ত্রীর স্বামীর প্রতি টান, মায়ের সন্তানের প্রতি টান, এবং কৃপণের ধনের প্রতি টান, এই তিন টান একত্র হইলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। নির্ব্বাসিতা সীতাকে সম্বোধন করিয়া রাম বলিয়া ছিলেন, তুমি! স্নেহে মাতা, প্রণয়ে সখা, বিলাসে রমণী, সেবায় ভগ্নী, ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, উপদেশে মন্ত্রী, বিপদে বন্ধু ইত্যাদি। সমাজতত্ত্ববিদ্ মনীষী ভূদেব তাঁহার একখানা গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে পরলোক প্রস্থিতা সহধর্ম্মিণীকে এমনই ভাবে সম্বোধন করিয়া তাঁহার স্ত্রীর দশবিধ উপযোগিতার কথা লিখিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কথিত তিন টান একত্র না হইলে যেমন ভগবান লাভ হয় না, তিন টানের জোর একত্র না হইলে আমরা ভগবান্‌কে আকৃষ্ট করিতে পারি না; বস্তুতঃ পক্ষে সেইরূপ স্ত্রীর যদি স্বামীর সুখ-সৌকর্য্যের জন্য দশবিধ উপযোগিতা না থাকিত, স্ত্রী

মায়ের ন্যায় সতত পতির মঙ্গল কামনা না করিতেন, ভগ্নীর ন্যায় কায়মনোবাক্যে পতির সেবা না করিতেন, স্ত্রীজনোচিত-হাব-ভাব-কটাক্ষ কোমলতা-শালীনতা-রুচি-সৌন্দর্য্য-দ্বারা পতির মনোরঞ্জন করিতে না পারিতেন, সখার ন্যায় হাস্য আমোদ-বিদ্রূপ রসিকতা চপলতা দ্বারা স্বামীর চিত্ত-বিনোদন করিতে না পারিতেন, বিপদে বন্ধুর কার্য্য, উপদেশ-দানে মন্ত্রীর কার্য্য না করিতেন, ধর্ম্মে স্বামীর সহচারিণী না হইতেন, তবে কি স্বামী পত্নীতে এত অনুরক্ত হইতেন, পত্নীর সহিত স্বামী এক আত্মা এক-প্রাণ হইতেন, স্ত্রীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতে পারিতেন স্বামীর নিকট স্ত্রীর দশবিধ উপযোগিতা আছে, স্ত্রী দশবিধ উপায়ে স্বামীর সাহচার্য্য, পরিচর্য্যা, সহায়তা, মনোরঞ্জন, কল্যানকামনা করিয়া এবং স্বামীর ধর্ম্ম কার্য্যে স্বয়ং যোগদান করিয়া, স্বামীকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করেন। এইরূপে স্বামী আর স্ত্রী হইতে ভিন্ন রহিতে পারেন না; দুই এক হইয়া দাম্পত্য বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আমাদের মনে হয়, আমাদের এই সেই দিনকার স্বদেশীটার অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল, তাই এই স্বদেশী আমাদিগকে উহার কোলে টানিয়া লইতে পারিল না. আমরা দূরে পড়িয়া রহিলাম, আমাদের ও স্বদেশীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা যায়গা পড়িয়া রহিল, সেই ব্যবধান আর ঘুচিল না। দুই চারি গণ্ডা উকীল বারিষ্টার, আর দুই চারি পাঁচশত ছাত্র ইহারাই সমাজের সমস্তটা নহেন, ইহারা সমাজের বহু কক্ষের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কক্ষের এক কোণ অধিকার করিয়া আছেন মাত্র। আর এই স্বদেশী ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া ছিল, তাহাও স্থায়ী হইল না। নিদ্রাবিষ্টের স্বপ্নের মত, ক্ষণকাল পরেই এই স্বদেশীর প্রভাব এত অপ্রকট হইল। এই সেদিনকার স্বদেশীর সমাজ ও দেশের জন্য বহুবিধ উপযোগীতা ছিল না। উহার তিন টান ছিল না বা দশটা দিক ছিল না প্রধান বা একমাত্র অঙ্গ ছিল ভারতের অর্থ-সংস্থান, দারিদ্র-মোচন, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করিয়া ও স্বদেশজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে অর্থাগম করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম যখন স্বদেশী গ্রহণ বিদেশী বর্জ্জনের প্রস্তাব হয়, তখনকার সংবাদ পত্রাদিতে এতৎসম্বন্ধে যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, যে কেহ তাহা পড়িয়া আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হন নাই, তিনিই এই কথা স্বীকার করিবেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতি কর স্বদেশ জাত দ্রব্য ব্যবহার কর বিদেশের আমদানি দ্রব্য বর্জ্জন কর, গুড় খাইব ত চিনি খাইব না, ছেড়া কাপড় পরিব ত বিলাতি কাপড় কদাচ কিনিব না এবম্বিধ উক্তিতেই ঐ সকল রচনা পূর্ণ থাকিত। যতস্থানে গোলযোগ ঘটিয়াছে, হাটে বাজারে, ও মেলায়, সর্ব্বত্রই স্বদেশী ও বিলাতি জিনিষের প্রচলন লইয়া গোলযোগ বাঁধিয়াছে। প্রথম প্রথম যত কিছু আইন আদালত হইয়াছিল, সমস্তই বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন সম্পর্কে। দেশের লোক তখন যেন ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহারা কেবল দেশের জিনিষ ছাড়িয়া বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে এমত নয়, তাহারা দেশের সমাজকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, দেশীয় সমাজের বিশেষত্বের স্থলে বিদেশীয় প্রথা সমূহ উহার অঙ্গে সন্নিবিষ্ট ও গ্রথিত করিতেছে, দেশীয় ধর্ম্ম ছাড়িতেছে, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিতেছে, সংস্কারের দোহাই দিয়া ধর্ম্ম ও সমাজকে বিকৃত করিতেছে, ভাষা ভুলিয়াছে, বিদেশী বুলি ধরিতেছে, সাহিত্যে বিদেশী ভাব, রচনা পদ্ধতি, শব্দ প্রণালী এতই প্রচুর পরিমাণে ঢুকিয়াছে যে, বিদেশের সর্ব্ববিধ প্রভাব-বর্জ্জিত খাঁটি বাঙ্গালী ঐ সাহিত্য পাঠ করিয়া উহার অর্থবোধ করিতে পারে না, আদব কায়দা চাল চলন সবই বিদেশীর অনুকরণে। দেশীয় বস্ত্রে প্রস্তুত হইলেও পোষাক প্রস্তুত হয় বিদেশী পোষাকের ঢঙ্গে। ভারতীয় সঙ্গীতের গূঢ়ত্ব নষ্ট হইয়া তৎস্থলে বিদেশীয় সঙ্গীতের লঘুতার অন্তর্বাহ্য স্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে স্বদেশী ঘোষণা করিতে গীত রচিত হইয়াছে বিদেশীয় সুরে বা মিশ্র-সুরে, শিক্ষা-দীক্ষা-ধ্যান-ধারণা সবই পাশ্চাত্য ভাবে। তাই বলিতেছিলাম, স্বদেশীর সমস্ত গুলি পাপড়ী ফুটিয়াছিল না, একটী মাত্র পাপড়ী মেলিয়া-

ছিল, সম্যক্ অপ্রস্ফুট স্বদেশী পুষ্পের গর্ভে দেশের লোক সমূহ মধুপদলের মত গিয়া বসিল না। সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় নাই, সমস্ত পাপড়ীগুলি মেলে নাই, তাই মধুপ তাহার দিকে উড়িতেছে না। স্বদেশীরও সমস্তটা দিক্ সমানভাবে লোক চক্ষুর ও মনের গোচর হইয়াছিল না, উহার দশটা দিকের মধ্যে মাত্র একটা দিক্ মনুষ্যের নজরে পড়িয়াছিল, উহার সমস্তগুলি উপযোগিতার পরখ্ হওয়া দূরে থাক্, উহাদের কথাই আলোচনা প্রসঙ্গে স্থান পায় নাই, তাই সমাজটা স্বদেশীর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই, স্বদেশী সমাজকে টানিতে পারে নাই। আবার এই স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের উৎপত্তি হইয়াছিল বঙ্গচ্ছেদ জনিত নৈরাশ্য-ক্ষোভ-ক্রোধ-অপমান--অভিমান--জাত বিরোধের ভাব হইতে—সাময়িক উত্তেজনায়। পাথর তাপ পাইলে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়, আবার ঠাণ্ডা পাইবামাত্র তাপ ছাড়িয়া যায়। সাময়িক উত্তেজনায় হৃদয়ের উদ্দাম বৃত্তি জাত স্বদেশী সারাটা ভারতবর্ষকে সহসা ছাইয়া ফেলিল, উষ্ণতা দ্বারা ভারত-বর্ষকে তাপ-ক্লিষ্ট করিয়া ভারত সহসা তপ্ত হইয়া পুনরায় হিমবৎ ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে।

তুঁতের দ্বারা কাঁঠাল পাকাইবার মত, সাময়িক উত্তেজনায় স্বদেশীর সৃষ্টি না হইলে এমনটী হইত না। যখন মন উত্তেজিত থাকে, তখন উহাদ্বারা কোনও পদার্থেরই স্বরূপ বিচার করা যায় না। সম্যক্ বিচার করিয়া স্বদেশী গ্রহণ করিয়া ছিলাম না; সাময়িক উত্তেজনায়, হুজুগে পেশাদার নেতাদিগের তালিতে পড়িয়া, স্বদেশী গ্রহণ করিয়াছিলাম; তাই, নির্ব্বিচারে সহসা ধৃত স্বদেশী আমাদের হৃদয়-পট হইতে সহসা মুছিয়া গিয়াছে। স্বদেশী যদি সর্ব্ববিধ উপযোগিতা লইয়া আসিত, আর আমরা যদি সম্যক্রূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া উহার স্বরূপ বুঝিয়া উহাকে ধরিতাম, তবে উহাতে আমরা ডুবিয়া যাইতাম, উহার এতগুলি উপযোগিতার আকর্ষণে উহাতে চিরজীবনের জন্য বদ্ধ হইয়া যাইতাম, উহার গতিতে আমাদের গতি এবং আমাদের গতিতে উহার গতি নিরূপিত হইত।

দেশের অপর দশটায় যাহার আস্থা নাই, ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, সমাজে শ্রদ্ধা নাই, ভাষায় রুচি নাই, আচার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি নাই, দেশীয় ধরণের পোষাকে তুষ্টি নাই, চাল চলতি আদব কায়দায় দৃষ্টি নাই, সবগুলি ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র অর্থনীতিমূলক একাঙ্গ মাত্রাবিশিষ্ট স্বদেশীতে তাহার স্থায়ী আগ্রহ ঐকান্তিকতা কখনও সম্ভবে না। একমাত্র অর্থনীতিমূলক স্বদেশী স্বার্থ-দোষ-দুষ্ট, অথচ স্বদেশজাত দ্রব্য ক্রেতাকে প্রথম ৩০।৪০ বৎসর ঐ স্বদেশীর সফলতার জন্য অগ্রিম অর্থ নাশ স্বীকার করিতে হইবে ভাবী অর্থাগমের আশায়। সংযত-চিত্ত ব্যক্তি ব্যতীত এত ধৈর্য্য অন্যত্র সুলভ কি? প্রথমতঃ স্বয়ং ক্ষতি স্বীকার করিয়া শিল্পীদিগকে অর্থাগমের পন্থা করিয়া দিতে কত জন সম্মত হইবেক? সুদূর ভাবী লাভের আশায় কোন ব্যক্তি বৎসরের তিন শত পঁয়ষট্টি দিন দুর্ম্মূল্য দিয়া দেশজাত জিনিষ ক্রয় করিবেক। ইহা সম্ভবপর হইত, যদি অর্থনীতির দিকে নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি হৃদ-য়ের মমতা বাড়িত। যাহারা স্বদেশী ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশী কুকুরের পূজা করে; তাহারা কেন অর্থনীতিমূলক স্বদেশীর সফলতার জন্য স্বীয় বিলাসিতার সংক্ষেপ করিতে যাইবেক, কারণ পাশ্চাত্যে সংবদ্ধ দৃষ্টি সেত বুঝে নাই যে, বিলাসে বিনাশ, সন্ন্যাসে বিকাশ। তাহার সখ মিটাইবার জন্য দেশে তেমন হাল ফেসনের জিনিষ প্রস্তুত হয় না, অথচ সে দেশীয় সমাজ সুলভ "অল্পেতে সন্তোষ" গুণটী হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে অপব্যয়ের ও অলসতার প্রশ্রয় দানের দোহাই দিয়া গৃহ-দ্বার হইতে ভিক্ষুককে সরোষে তাড়াইয়া দেয়, সে কেমন করিয়া অর্থনীতিমূলক স্বদেশীর জন্য অর্থব্যয় করিবে? উহাও কি তাহার মনে অপব্যয় ও শিল্পীকুলের অলসতার প্রশ্রয়

বুদ্ধি বলিয়া যাতনার উদ্রেক করিবে না? এই সকলই কিন্তু সম্ভবপর হইত, যদি সে ধর্ম্মপরায়ণ হইত, অল্পে সন্তুষ্ট হইত, বিলাসিতা-পরাঙ্মুখ হইত, পরের ব্যথায় ব্যথী হইত। কিন্তু স্বদেশীর এই অঙ্গগুলির ত প্রস্ফুটন হয় নাই, তাই বহু অঙ্গহীন নবজাত শিশুর আশু মৃত্যুর মত এই স্বদেশীও মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। ইটের দেওয়াল গাঁথিতে যেমন ইটের সঙ্গে মসলারও দরকার হয়, মসলা ব্যতীত ইষ্টকরাশি ঝরঝর্ করিয়া পড়িয়া যায়, তেমনি ধর্ম্ম-ভাব-পরিপ্লুত না হইলে অর্থনীতিমূলক স্বদেশীও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের নেতা হইলেন, সমাজ তাঁহাদিগের মন মুখ এক দেখিতে পাইল না, বহুরূপীর রূপ পরিবর্ত্তনের মত তাঁহাদের মুখের জবাব নিত্য নড়্ চড়্ হইত, তাঁহাদের মধ্যে নিত্য বিবাদ বিরোধ ঘটিত, তাঁহাদের প্রচারিত পদ্ধতি ও অনুশাসন তাঁহারা নিজেরা পালন করিতেন না, তাঁহারা সমাজে মিশিতেন না, তাঁহারা সমাজের লোক নহেন, সমাজবুঝেন না, সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন, তাই তাঁহাদের প্রচারের মর্ম্ম সমাজের মানসপটে গভীর রূপে অঙ্কিত হইল না।

দেশ কাল পাত্রোপযোগী আহার্য্য দ্রব্যে বিতৃষ্ণ হইয়া বিদেশী আহার্য্যে উদর পূর্ত্তি করিতেছি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিদেশীয় অনুকরণে গরমের দিনেও সার্ট, কোট, ওয়েষ্টকোট গেঞ্জি প্রভৃতি গায়ে দিয়া তপ্ত দেহকে ক্লিষ্ট করিতেছি, আমরা কেন স্বদেশী জিনিষের আদর করিব? পিতৃ পিতামহের আমলের গ্রাম্য বাস্তুভিটা ছাড়িয়া সহরে বাসা করিয়াছি, পুরাতনের স্মৃতি ফেলিয়া সহরের বিলাসিতায় গা ঢালিয়াছি; আমরা কেন অতি প্রাচীনতম জাতির পুরাতন গৌরব নিদর্শন শিল্প-সম্ভার সংরক্ষণে যত্নপর ও ত্যাগশীল হইব? আমরা এখন পুরাতনকে ছাড়িয়া নবীনের ভক্ত হইয়াছি, "রক্ষণশীল" নামে অপবাদ দিয়া পরানুকরণে ব্যস্ত হইয়াছি, এরূপ ক্ষেত্রে আমরা পর-দেশজাত শিল্পের গুণগ্রাহী ও গ্রাহক হইব, ইহাই সম্ভবপর। বন্যার জল যেমন দু' দিনে সরিয়া যায়, হুজুগের আমদানী স্বদেশ-জাত শিল্প-প্রীতিও সেইরূপ দু' দিনেই লোপ হইয়াছে!

ব্রাহ্ম সমাজ, খ্রীষ্টীয় পাদরীগণ, আর্য্য সমাজ, সংস্কারক দল, ইংরেজী শিক্ষা এইগুলি আমাদের দেশ, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মের নামে নানা কলঙ্কারোপ করিয়া এবং আমাদের কাণে নিয়ত ইহাদের বিরুদ্ধ কথা শুনাইয়া শুনাইয়া আমাদিগকে দেশ, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। গ্রীশ ও রোমের কলেজ পাঠ্য একখানা ইংরেজী ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়াই দেখিলাম, লিখা রহিয়াছে,—"The part played by Greece in the great drama of universal history makes her a connecting link between the East and the west, the Asiatic and the European, the enslaved and the free."

Beacon Lights of History নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে বার বার উহার সংকলন-কর্ত্তা বলিয়াছেন, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মাপকাঠি দিয়া তিনি জগতের অপরাপর ধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়াছেন, যেই ধর্ম্ম যেই পরিমাণে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সঙ্গে মিলে, সেই ধর্ম্ম সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ভারতবাসী প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেছে।

এক জাতিতে অমূলকরূপে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিলে, পরানুকরণ-প্রিয় জাতি নিজের বিশেষত্ব ও গৌরব বুদ্ধি ভুলিয়া সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত জাতির অনুকরণ করিতে থাকে। ইহা উহার ধ্বংসের কারণ হয়। আমাদের জাতির দশাও তাহাই ঘটিয়াছে।

আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা নাই, পাশ্চাত্য দেশে আছে, আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, সে দেশে আছে, সাম্য অত্র দুর্লভ, তত্র সুলভ, সে দেশে নীচ জাতি বলিয়া একটা জাতি নাই। আর এ দেশে ঐরূপ জাতিসমূহ বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করা হইতেছে, আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সূচিত হয় নাই, পাশ্চাত্যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র-

রূপে তাহা সংশোধন করিয়াছেন, এ দেশে বাল্য বিবাহ, বিধবার অনিচ্ছাকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন, অবরোধ প্রথা, কুসংস্কার, সহমরণ, স্ত্রী জাতি নিপীড়ন, পৌত্তলিকতা সবই আছে, ইউরোপে এই সকলের নাম গন্ধও নাই। আমরা ভূত প্রেতের নামে ভয় পাই, পাশ্চাত্য নির্ভীক ইত্যাকার বাক্য পরম্পরা আমাদিগকে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্মে আস্থাহীন করিয়াছে। কতকগুলি আন্‌কোরা নূতন সমাজ স্বীয় আয়তন বৃদ্ধির জন্য হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন, পাশ্চাত্য সমাজের মন্দটাকেও সাজাইয়া গুছাইয়া আমাদের সাম্‌নে ধরিয়া আমাদের ভালটাকে মন্দ বলিতেছেন, আমাদের প্রতিমা পূজাকে "পৌত্তলিকতা" অপবাদ দিয়াও নিজেরা পরদেশী খ্রীষ্টের ও মেরী মাতার পূজা করিয়াছেন। উহাঁরা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক চাক্‌চিক্যের তুলনায় আমাদের সভ্যতা ভব্যতাকে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন।

হিন্দু সমাজ এবংবিধ নানা প্রতিকূল অবস্থার ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভুলিয়াছে, তাই হিন্দু সমাজ কোন কিছুই শক্ত করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। স্বদেশী দশভুজা রূপে দশবিধ মঙ্গল হস্তে করিয়া আবির্ভূতা হয় নাই, স্বদেশীর কল্যাণময়ী মূর্ত্তি ষোল-কলায় বিকশিত হয় নাই, তাই, স্বদেশীর আকর্ষণী শক্তি কার্য্যকরী হয় নাই; স্বদেশী আমাদিগকে কোলে টানিয়া লইতে পারে নাই। তবে এস মা স্বদেশী দশভুজা-রূপিণী, মা তোমার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি ষোল-কলায় বিকশিত হউক; তোমার সর্ব্ববিধ উপযোগিতা আমাদের কল্যাণ কামনায় প্রযুক্ত হউক; শ্রাবণের ধারার ন্যায় তোমার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক; শ্রাবণের ভরা গাঙ্গের মত তোমার প্রভাব আমাদের নয়না-নন্দকর হউক; এস মা, তুমি তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লইয়া, কেবল অর্থ ও কাম দ্বারা আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিও না, মা। অর্থ ও কামের পুরোভাগে ধর্ম্ম ও মোক্ষ রাখিও। ধর্ম্মভাবের পোষণ দ্বারা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অনাসক্ত মুক্ত জীব হইয়া অর্থ ও কামের উপরে প্রভুত্ব করিব। বর্ষাকালে যেমন জলে খাল বিল ভরিয়া যায়, তেমনি মা তুমি তোমার মঙ্গল-করের শুভ্র কিরণ সম্পাতে দেশের দশদিক্‌ প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিও, মা। দেখিও যেন কয়েকখানা বরাভয়দায়ক হস্ত বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিও না। এইবার কেন মা নয়খানা হস্তই ঢাকিয়া আসিয়াছিলে। বস্ত্রাঞ্চলে হাত ঢাকিলে, তোমাকে যে লোকে ছিন্নহস্তা বলিবে। আমাদিগকে লোকে ছিন্নহস্তার সন্তান বলিয়া অপবাদ দিবে, এও কি প্রাণে সয় মা? যদি তুমি দশভুজা রূপে আবির্ভূতা হইতে, তবে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারাইয়া তোমার কতক গুলি স্বদেশী সন্তান বিপথে চালিত হইত? তাহা হইলে স্ত্রী-ঘটিত মোকদ্দমায়, প্রবঞ্চনার অভিযোগে, নানা কুৎসিত অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তোমার সন্তান তোমার মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিত না। এস মা চতুর্ব্বর্গ দায়িনী, ধর্ম্ম ও মোক্ষের জালে আমাদিগকে সস্নেহে ধর; তা নইলে, কলঙ্কের সাগরে ডুবিয়া মরিব। আমার স্বদেশী ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুত্থান হউক, উহাদের জয় জয়কার হউক। স্বদেশীর মঙ্গল আরাবে দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হউক।

বরিশাল হৈতৈষী।

পরিশিষ্ট

দারেশ দৃষ্ট্যা সুখিনঃ॥ ৩৮॥

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত কারকাদিভ্যো দারেণ দৃষ্ট্যা চতুর্থেশ দৃষ্ট্যা তেষাং কারকাদীনা মুপরীত্যর্থঃ নরাঃ সুখিনো ভবন্তি॥ ৩৮॥

আত্মকারকগ্রহ জন্মলগ্ন কিম্বা পদলগ্ন, স্ব স্ব চতুর্থ পতি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সূত্র হইতে পর পর চারিটি সূত্রে তিনটি করিয়া যোগ আছে। কুণ্ডলী মধ্যে তিনটি যোগেরই সমবায় হইলে ফলের পূর্ণতা জ্ঞাতব্য॥ ৩৮॥

রোগেশ দৃষ্ট্যা দরিদ্রা॥ ৩৯॥

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত কারকাদিভ্যো রোগেশ অষ্টমেশ দৃষ্ট্যা তেষা মাত্ম কারকাদীনা মুপরীত্যর্থঃ জনা দরিদ্রা ভবন্তি॥ ৩৯॥

আত্মকারক গ্রহ জন্মলগ্ন কিম্বা পদলগ্ন, স্ব স্ব অষ্টমাধিপতি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য দরিদ্র হইয়া থাকে॥

রিপুনাথ দৃষ্ট্যা ব্যয়শীলাঃ॥ ৪০॥

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত কারকাদিভ্যো রিপুনাথ দ্বাদশেশ দৃষ্ট্যা তেষা মাত্ম-কারকাদীনামুপরীত্যর্থঃ জনা ব্যয়শীলা ব্যয়াধিক্যকারিণো ভবন্তি॥ ৪০॥

আত্মকারক গ্রহ জন্মলগ্ন কিম্বা পদলগ্ন, স্ব স্ব ব্যয়পতি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য ব্যয়শীল হয়॥ ৪০॥

স্বামী দৃষ্ট্যা প্রবলাঃ॥ ৪১॥

স্বামী দৃষ্ট্যা কারকে কারকেশ দৃষ্ট্যা, লগ্নে লগ্নেশ দৃষ্ট্যা পদে পদেশ দৃষ্ট্যা বা জনাঃ প্রবলাঃ বলবন্তো ভবন্তি॥ ৪১॥

পূর্ব্বোক্ত আত্মকারক গ্রহ জন্মলগ্ন কিম্বা পদলগ্ন, স্ব স্ব অধিপতি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে জাতক বলবান হয়। উপরোক্ত সূত্রপঞ্চক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে আত্ম কারকগ্রহ, জন্ম বা পদলগ্ন, তৎ তৎ স্থান হইতে যে যে ভাবপতি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইবে তৎ তৎ ভাবোক্ত ফল প্রদান করিবে॥ ৪১॥

পশ্চাদ্রিপুভাগ্যয়ো গ্রহসাম্যে বন্ধঃ কীট যুগ্ময়ো
র্ভৃগুদারয়োঃ কোণয়ো র্নীরাঙ্গয়ো র্জ কান্তয়োশ্চ॥৪২॥

পশ্চাৎ (৬৬১ = ১) লগ্নাৎ জন্মলগ্নাৎ পদলগ্নাৎ (কারক লগ্নাদ্বা) রিপু (১২) ভাগ্যয়োঃ (২) দ্বির্দ্বাদশয়োঃ, কীট (১১) যুগ্মযোঃ (৩) তৃতীয়ৈ-

কাদশয়োঃ, ভৃগু (১০) দারয়োঃ (৪) চতুর্থ দশময়োঃ, কোণয়োঃ পঞ্চম নবময়োঃ, নীর (৮) অঙ্গয়োঃ (৬) ষষ্ঠাষ্টময়োঃ, জূক (৬) অন্ত্যয়োশ্চ (১২) ষষ্ঠ দ্বাদশয়োশ্চ গ্রহসাম্যে একশ্চেদেকঃ, দ্বৌচেদ্বৌ, ত্রয়শ্চেৎত্রয়ঃ ইতি ক্রমেণ গ্রহসাম্যে সতি বন্ধঃ কারাপতনং ভবতি ॥ ৪২ ॥

জন্ম লগ্ন পদ লগ্ন বা কারক লগ্ন হইতে দ্বির্দ্বাদশে, তৃতীয়ৈকাদশে, চতুর্থ দশমে, পঞ্চম নবমে, ষষ্ঠাষ্টমে, কিম্বা ষষ্ঠ দ্বাদশে এক একটি দুই দুইটি ক্রমে সমসংখ্যক গ্রহ থাকিলে বন্ধন যোগ জ্ঞাতব্য ॥ ৪২ ॥

শুভ সম্বন্ধে নিরোধ মাত্রং পাপ সম্বন্ধাৎ শৃঙ্খলাদয়॥ ৪৩।

পূর্ব্বোক্তানাং দ্বির্দ্বাদশাদীনাং রাশীনাং তৎতৎ রাশ্যাধিপতীনাঞ্চ শুভ সম্বন্ধে সতি কারাগার মধ্যে নিরোধ মাত্রং নতু পীড়নাদয়ঃ। পাপ সম্বন্ধাৎ তত্তৎ রাশৌ পাপক্ষেত্রে পাপগ্রহাধিষ্ঠিতে পাপদৃষ্টে বা শৃঙ্খলপ্রহারাদয়োঽপি ভবন্তি। মিশ্রে মিশ্রফলং জ্ঞাতব্যং ॥ ৪৩

পূর্ব্ব সূত্রে যে যে বন্ধন যোগ উল্লিখিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিশেষ এই যে উক্ত যোগাদি শুভক্ষেত্রে শুভগ্রহ কর্তৃক সংঘটিত হইলে সামান্য কারাবাস মাত্র বা কষ্টে তদ্দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ কিন্তু পাপ ক্ষেত্রে পাপ গ্রহ ঘটিত বা পাপ দৃষ্ট হইলে শৃঙ্খল প্রহারাদি বিবিধ দুর্গতি ভোগ হইয়া থাকে। মিশ্রে মিশ্র ফল অবশ্যই জ্ঞাতব্য। এতৎ যোগ সম্বন্ধে পারাশরী হোরায় লিখিত আছে যে—

পদাল্লগ্নাৎ কারকাদ্বা যদা বা বিত্ত দ্বাদশে।
ত্রিকোণে রোগরন্ধ্রে বা তথা বা মাতৃলান্তিমে ॥
তৃতীয়ৈকাদশে বিপ্র চতুর্থে দশমেঽপিবা।
গ্রহ সাম্যে তথা বিপ্র একমেকং দ্বয়ং দ্বয়ং ॥
বিত্তে দ্বৌ দ্বাদশে দ্বৌ চ তথা বা স্যাৎ ত্রয়ং ত্রয়ং।
ইতি ক্রমেণ সাম্যেন বন্ধকারক উচ্যতে ॥
রাশীনাং রাশি নাথানাং শুভ সম্বন্ধকে দ্বিজ।
তদা নিরোধঃ সঞ্জাত স্তনুপীড়া বিধীয়তে ॥
তথা তত্তৎ দশানাং চ সম্বন্ধং খলখেটতঃ।
প্রহার শৃঙ্খলাদ্ বিপ্র বন্ধযোগো ন সংশয় ॥ ৪৩ ॥

শুক্রাদ্ গৌণ পদস্থো রাহুঃ সূর্য্যদৃষ্টো নেত্রহা ॥ ৪৪ ॥

ভার্গবাৎ কারকাদ্বাপি লগ্নারূঢ় পদাৎ দ্বিজ।
ত্রিকোণস্থো যদা রাহুঃ সূর্য্যদৃষ্টশ্চ নেত্ররুক্ ॥

শুক্রাৎ (২৫=১) লগ্নাৎ (জন্মলগ্নাৎ পদলগ্নাৎ কারকাৎ শুক্র গ্রহাদ্বা) গৌণ (৫৩=৫) পদস্থঃ পঞ্চমারূঢ় স্থানগতঃ পঞ্চম ভাব গতো বা (উপলক্ষণে নবম মপি গ্রাহ্যং) রাহুঃ সূর্য্য দৃষ্ট শ্চেৎ নেত্রহা নেত্রনাশকরঃ ॥ ৪৪ ॥

সূর্য্য সংদৃষ্ট রাহু, জন্মলগ্ন পদলগ্ন কারকগ্রহ কিম্বা শুক্র হইতে পঞ্চমারূঢ় পদগত কিম্বা ত্রিকোণ গত হইলে নেত্র হানি হয়। এ স্থলে উদ্ধৃত শ্লোক এবং সূত্রে অর্থগত প্রভেদ সুস্পষ্ট। অঙ্গহীনতাদি যোগে সাধারণতঃ বিষমরাশি হইতে পুরুষের বামাঙ্গ এবং সম রাশি হইতে দক্ষিণাঙ্গ কল্পনীয়। স্ত্রীপক্ষে বিপরীত।

স্বদারগয়োঃ শুক্র চন্দ্রয়োরাতোদ্যং রাজ চিহ্নানিচ। ৪৫ ॥

স্বদারগয়োঃ স্বাৎ আত্মকারকাৎ দার (৪) গয়োঃ চতুর্থ স্থানগয়োঃ শুক্র চন্দ্রয়োঃ সতোঃ আতোদ্যং বাদ্য বিশেষঃ রাজচিহ্নাণি ছত্র চামরাদীনি চ ভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

আত্মকারক হইতে চতুর্থ স্থানে শুক্র এবং চন্দ্র থাকিলে মনুষ্য ছত্র চামরাদি রাজ চিহ্ন ধারণ করে, এবং দ্বারে তাহার নহবৎ বাজিতে থাকে। ৪৫ ॥

অপর কতিপয় রাজ যোগ আবশ্যক বোধে এ স্থলে লিখিত হইল :—

১। শুভে লগ্নে শুভে স্বর্থে তৃতীয়ে পাপ খেচরে।
চতুর্থে তু শুভে প্রাপ্তে রাজা বা তৎসমোঽপি বা ॥

২। উচ্চো বা হরিণাঙ্কো বা জীবো বা শুক্র এব বা।
একো বলী ধনগতঃ শ্রিয়ং দিশতি দেহিনাং ॥

৩। লগ্নং পশ্যতি যে খেটা স্তেসর্ব্বে শুভদায়িনঃ।
নীচ খেটোঽপি লগ্নং চেৎ পশ্যেদ্রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

৪। রাজযোগো জন্মলগ্নং পশ্যেদুচ্চ গ্রহো যদি।
ষষ্ঠাষ্টম গতো নীচো লগ্নং পশ্যতি যোগকৃৎ ॥

৫। ষষ্ঠাষ্টমাধিপে নীচে লগ্নং পশ্যতি যোগকৃৎ।
তৃতীয়ে লাভগে নীচে লগ্নং পশ্যতি রাজ্যদঃ ॥

৬। উচ্চ যুক্তো গ্রহঃ কশ্চিৎ লাভগো বা চতুর্থগঃ।
ধনস্থিতো বা লগ্নং চেৎ পশ্যেদ্বাহন কারকঃ॥

৭। নিশার্দ্ধাচ্চ দিনার্দ্ধাচ্চ পরং সার্দ্ধ দ্বিনাড়িকা।
শুভা তদ্ভুবো রাজা ধনী বা তৎ সমোঽপিবা॥

ইতি জৈমিনীয় উপদেশ সূত্রে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

অথ প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ পাদারম্ভঃ ॥

উপপদং পদং পিত্রনুচরাৎ ॥ ১ ॥

অথোপপদাদিক মালম্ব্য ফল মাদেশায় তত্রাদাবুপপদং নিরূপয়তি। পিত্রনুচরাৎ পিতৃ (১) লগ্নং তস্যানুচরাৎ দ্বাদশ রাশেঃযৎ পদং তৎ উপপদং নির্দ্দেশ্যং, অত্র অনুশব্দস্য পশ্চাদর্থকত্বং সিদ্ধং তথা বহুব্রীহের্জঘন্য তয়া তৎপুরুষমেব গ্রাহ্যং। "পিতৃলগ্নং তস্যানুচরো দ্বিতীয় ভাবঃ" ইতি যৎ সূত্রার্থ প্রকাশিকাকারেণোক্তং তদযুক্তং পশ্চাদর্থকানুশব্দস্য দ্বিতীয় ভাব বাচকত্বে অগ্রপদ-ব্যবহারঃ সাধুঃ স্যাৎ। মেষাদীনান্তু রাশ্যুদয় রীত্যা বৃষস্য পশ্চাত্ত্বং, নহি লগ্নানামপি তথা। তত্র হি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবানাং পশ্চাত্ত্ব রীত্যা ব্যয় ভাবস্য লগ্নভাবপশ্চাত্ত্বং প্রতীয়তে ॥ ১ ॥

এক্ষণে উপপদ হইতে ফল বিচার আরম্ভ হইল বলিয়া প্রথমতঃ উপপদ লক্ষণ লিখিত হইতেছে। পিতৃ (৬১=১) শব্দে লগ্ন। লগ্নানুচরভাবের আরূঢ়পদকে উপপদ কহে। লগ্নানুচর শব্দে লগ্নের অনুচর অর্থাৎ পশ্চাদ্‌গামী অর্থ করিলে ব্যয় স্থান এবং লগ্ন যাহার অনুচর এইরূপ ব্যাস বাক্যে দ্বিতীয় স্থানকে লক্ষ্য করা যায়। অতএব দ্বিতীয় বা দ্বাদশ ভাবের আরূঢ় পদই উপপদ। কিন্তু বহুব্রীহী এবং তৎপুরুষ সমাসদ্বন্দ্বে তৎপুরুষই গ্রাহ্য সুতরাং প্রথমোক্তার্থই সমীচীন। সুবোধিনী এবং সূত্রার্থ প্রকাশিকাকার "লগ্ন যাহার অনুচর" এইরূপ অর্থ করিয়াই অনুচর শব্দে ব্যয় ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু তাহা অযৌক্তিক, কারণ রাশিদিগের উদয়ানুসারে বৃষ রাশি মেষের পশ্চাদ্বর্ত্তী বটে কিন্তু ভাব সম্বন্ধে তাহা নহে। লগ্ন মেষ বৃষাদি ক্রমে গমন করায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবই তাহার পরবর্ত্তী ভাবের অনুচর। অতএব ব্যয় ভাবই লগ্নানুচর শব্দে বাচ্য। ১।

তত্র পাপস্য পাপযোগে প্রব্রজ্যা দার নাশো বা ॥ ২ ॥

তত্র (২) উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে পাপস্য পাপস্বামিকে রাশৌ পাপযোগে পাপগ্রহাধিষ্ঠিতে সতি প্রব্রজ্যা সন্ন্যাসঃ দারনাশো বা স্যাৎ ॥ ২

উপপদের দ্বিতীয় স্থান পাপস্বামিক হইয়া পাপযুক্ত হইলে মনুষ্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করে অথবা তাহার স্ত্রী বিয়োগ সংঘটিত হয়। এ স্থলে অর্থানুসারে তত্র শব্দে উপপদ এবং সংখ্যা প্রাধান্য হেতু সংজ্ঞানুসারে উপপদের দ্বিতীয় স্থান পরিলক্ষিত হয়। টীকাকারগণ প্রায়

সকলেই "উপপদে তৎ দ্বিতীয়ে বা" এইরূপ অর্থ করিয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু উভয় স্থান হইতে একরূপ ফল বিচার কখনই সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ উপপদ, তত্রশব্দের লক্ষ্যস্থল হইলে সূত্রে উক্তশব্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং তত্র শব্দে দ্বিতীয় স্থান ভিন্ন উপপদ অর্থ করা অযৌক্তিক। উক্ত দ্বিতীয় স্থান হইতে বৃদ্ধবাক্যে ভিন্ন ফল বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—আরূঢ়াৎ ষষ্ঠভে পাপে চৌরঃ স্যাৎ শুভ বর্জ্জিতে। সর্ব্বজ্ঞস্তত্র জীবে স্যাৎ কবির্বাগ্মী চ ভার্গবে॥ অর্থাৎ ব্যয়ারূঢ় পদের ষষ্ঠ (২৬—২) অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে শুভ সম্বন্ধ রহিত কোন পাপ গ্রহ অবস্থান করিলে মনুষ্য তস্কর হয়। উক্ত স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক সর্ব্বজ্ঞ এবং শুক্র থাকিলে কবি ও বাগ্মী হইয়া থাকে॥ ২॥

নাত্র রবিঃ পাপঃ॥ ৩॥

অত্র প্রকরণে উপপদস্যারূঢ়ত্বাদেব রবিঃ সূর্য্যো ন পাপঃ। তেন সিংহে উপপদদ্বিতীয়ে মেষাদি পাপরাশৌ বা সূর্য্যেস্থিতে প্রব্রজ্যা দার নাশো বা ন ভবেদিত্যর্থ॥ ৩॥

আরূঢ় পদাদি হইতে ফল বিচারে রবির পাপত্ব না থাকায় এস্থলে রবি পাপগ্রহ মধ্যে গণ্য নহেন। সুতরাং সিংহ রাশিতে কোন পাপগ্রহ থাকিলে কিম্বা মেষাদি কোন পাপক্ষেত্রে রবি থাকিলে উক্ত প্রব্রজ্যাদি ফল অগ্রাহ্য॥ ৩॥

শুভ দৃগ্‌ যোগাত্র॥ ৪॥

উপপদ দ্বিতীয়ে পূর্ব্বোক্তযোগে সত্যপি শুভ দৃগ্‌ যোগাৎ শুভগ্রহ দৃষ্টি যোগাভ্যাং প্রব্রজ্যাদি তৎ ফলং ন ভবতি॥ ৪॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে পূর্ব্বোক্ত যোগ সত্ত্বে শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগাদি থাকিলে তদ্‌-যোগোক্ত প্রব্রজ্যাদি কিছুই ঘটিবে না। সুতরাং শুভক্ষেত্রে উক্ত যোগের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সূত্রে উপপদ দ্বিতীয়ে পাপক্ষেত্র ফল নিবৃত্ত হইল॥ ৪॥

নীচে দারনাশঃ॥ ৫॥

উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে নীচে নীচগ্রহাধিষ্ঠিতে নীচনবাংশকগতে গ্রহে বা স্থিতে সতি দারনাশো ভবতি॥ ৫॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে কোন নীচগ্রহ কিম্বা নীচনবাংশকগত গ্রহ অবস্থান করিলে পত্নীনাশ সংঘটিত হয়॥ ৫॥

উচ্চে বহু দারাঃ॥ ৬॥

উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে উচ্চে উচ্চং গতে উচ্চনবাংশক গতে বা গ্রহে স্থিতে সতি মনুষ্যো বহুদারাঃ বহুপত্নীকঃ স্যাৎ॥ ৬॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে কোন উচ্চ বা উচ্চাংশ গত গ্রহ অবস্থান করিলে মনুষ্য বহুপত্নী লাভ করে। উচ্চ ও নীচ শব্দে উপলক্ষণে কেহ কেহ তত্তদ্ রাশির উচ্চ ও নীচ পতিকেও লক্ষ্য করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যুগ্মে চ ॥ ৭ ॥

উপপদাৎ দ্বিতীয়ে যুগ্মে (৫১-৩) মিথুন রাশৌ স্থিতে সতি চ কারাজ্জাতকো বহুপত্নীকো ভবতি ॥ ৭ ॥

মিথুন রাশি উপপদের দ্বিতীয় স্থান গত হইলে মনুষ্য বহু পত্নী লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তত্র স্বামীযুক্তে স্বক্ষে বা তদ্ধেতো

বুত্তরায়ুষি নির্দারঃ ॥ ৮ ॥

তত্র উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে স্বামীযুক্তে তদ্ধেতৌ তদ রাশ্যাধিপতৌ বা স্বক্ষে তস্য অন্য রাশৌ স্থিতে সতি উত্তরায়ুষি অধিকবয়সি মনুষ্যো নির্দারঃ পত্নীহীনো ভবতি ॥ ৮ ॥

উক্ত দ্বিতীয় স্থান স্বামীযুক্ত থাকিলে কিম্বা তদ্রাশিপতি স্বীয় অন্য রাশিতে স্বক্ষেত্রী হইলে মনুষ্য উত্তর বয়সে পত্নীহীন হইয়া থাকে। কোন কোন টীকাকার তদ্ধেতু শব্দে দারাকারক গ্রহ সিদ্ধান্ত করিলেও তাহা বিচার সিদ্ধ নহে, কারণ তদ্ধেতুর তৎশব্দে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় স্থান ভিন্ন দারাকে কখনই লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষতঃ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সূত্রেই দারাকারক গ্রহের উল্লেখ নাই। এস্থলে দারাকারক গ্রহ হইতে নির্দারত্ব চিন্তা করিলে, তদ্গ্রহ উচ্চস্থ হইলে বহু পত্নীকত্ব এবং নীচস্থ হইলে পত্নীহানি যোগ কেনই বা না সংঘটিত হইবে। সুতরাং তদ্ধেতু শব্দে তদ্রাশিপতি ভিন্ন অন্য অর্থ করা অযৌক্তিক ॥ ৮ ॥

উচ্চে তস্মিন্নুত্তম কুলাদ্দার লাভো নীচে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ উপপদ দ্বিতীয়াধিপতৌ উচ্চে উচ্চরাশৌ স্থিতে সতি উত্তমকুলাৎ স্বকুলাপেক্ষয়েতি শেষঃ দারলাভঃ স্যাৎ। নীচে তস্মিন বিপর্য্যয়ঃ নীচ কুলাদ্দারলাভশ্চিন্তনীয়ঃ ॥ ৯ ॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানপতি উচ্চস্থ থাকিলে স্বকুলাপেক্ষা সদ্বংশ হইতে এবং নীচ রাশি গত হইলে নীচ কুল হইতে পত্নী লাভ চিন্তা করিবে। মধ্যস্থ হইলে অবশ্যই অনুপাতে বিচার্য্য। এই সূত্র পর্য্যালোচনায় উক্ত রাশ্যাধিপতি শত্রু মিত্রাদি ক্ষেত্র গত থাকিলে তত্তদ্রূপ স্থান হইতে পত্নীলাভ চিন্তা করা অযৌক্তিক নহে ॥ ৯ ॥

শুভ সম্বন্ধাৎ সুন্দরী॥ ১০॥

উপপদাৎ দ্বিতীয়ে রাশৌ শুভ সম্বন্ধাৎ শুভবর্গস্থে শুভগ্রহ দৃগ্‌যোগে বা সতি সুন্দরী স্ত্রী ভবতি॥ ১০॥

উপপদের দ্বিতীয় রাশি শুভ বর্গস্থ শুভ যুক্ত বা শুভ দৃষ্ট হইলে মনুষ্যের গুণান্বিতা ভার্য্যা-লাভ ঘটে॥ ১০॥

রাহু শশিভ্যামপবাদাৎ ত্যাগো নাশো বা॥ ১১॥

উপপদাৎ দ্বিতীয়ে রাশৌ রাহু শনিভ্যাং যুক্তে সতি অপবাদাৎ স্ত্রিয় স্ত্যাগ স্তস্যা নাশো বা স্যাৎ॥ ১১॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থান শনি রাহু কর্ত্তৃক যুক্ত হইলে লোকাপবাদ বশতঃ পত্নীত্যাগে বা তাহার বিনাশ কার্য্য সংঘটিত হয়॥ ১১॥

এক্ষণে উপপদের দ্বিতীয় রাশি গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ হইতে স্ত্রী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রোগাদি বিচার লিখিত হইতেছে। স্পষ্টতা নিবন্ধন ইহাদিগের অন্বয়াদি আর লিখিত হইল না; কেবল বঙ্গানুবাদ এবং আবশ্যক বোধে দু এক স্থলে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা মাত্র প্রদত্ত হইল॥

শুক্র কেতুভ্যাং রক্ত প্রদরঃ॥ ১২॥
অস্থিস্রাবো বুধ কেতুভ্যাং॥ ১৩॥
শনি রবি রাহুভি রস্থিজ্বরঃ॥ ১৪॥
বিধুকেতুভ্যাং স্থৌল্যং॥ ১৫॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে শুক্র কেতুর যোগে রক্তপ্রদর (১২) বুধ কেতুর যোগে অস্থিস্রাব (১৩) শনি রবিও রাহুর যোগে অস্থি জ্বর (১৪) এবং চন্দ্র বুধের যোগে স্থৌল্য রোগ উৎপন্ন হয়॥ ১৫॥

বুধক্ষেত্রে মন্দারাভ্যাং নাসিকা রোগ॥ ১৬॥
কুজক্ষেত্রে চ॥ ১৭॥
গুরু শনিভ্যাং কর্ণরোগো নরহকা চ॥ ১৮॥
গুরু রাহুভ্যাং দন্তরোগঃ॥ ১৯॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থান গত বুধের ক্ষেত্র শনি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক যুক্ত হইলে পত্নীর নাসিকা রোগ জ্ঞাতব্য (১৬) শনি মঙ্গল যুক্ত মঙ্গলের ক্ষেত্রও উপপদের দ্বিতীয় স্থান গত হইলে উক্ত রোগ চিন্তা করিবে॥ এই সূত্রে দ্বিতীয় স্থান গত বুধের ক্ষেত্র নিবৃত্ত হইল॥ ১৭॥ মঙ্গলের ক্ষেত্রগত উক্ত দ্বিতীয় স্থান শনি গুরু কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইলে পত্নীর কর্ণরোগ কিম্বা নরহকা নামে এক প্রকার নাড়ী নিঃসরণ রোগ (১৮) এবং গুরু রাহু কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইলে দন্তরোগ

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণম্ ।

উত্তরখণ্ডম্ ।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ ।

সম্যগেতন্মমাখ্যাতং ভবদ্ভির্দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্ ॥ ১ ॥
অহো পিতৃপ্রসাদেন ভবতাং জ্ঞানমীদৃশম্ ।
যেন তির্য্যক্ত্বমপ্যেতৎ প্রাপ্য মোহস্তিরস্কৃতঃ ॥ ২ ॥
ধন্যা ভবন্তঃ সংসিদ্ধ্যৈ প্রাগবস্থাস্থিতং যতঃ ।
ভবতাং বিষয়োদ্ভূতৈর্ন মোহৈশ্চাল্যতে মনঃ ॥ ৩ ॥
দিষ্ট্যা ভগবতা তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।
ভবন্তো বৈ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বসন্দেহহৃত্তমাঃ ॥ ৪ ॥

বলিলা জৈমিনি—"আজি তোমা সবাকার
কৃপায় হইল নষ্ট সন্দেহ অপার,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এই দুই পথ হয়,
সমস্ত বৈদিক কর্ম্মে এ দুই আশ্রয় ।
সেই দুই পথ আজি করিয়া বর্ণন,
করিলে, যতনে মোর সন্দেহ ভঞ্জন । ১ ।
জনকের প্রসাদে এ হেন চমৎকার
জন্মেছে অপূর্ব্ব জ্ঞান তোমা সবাকার ।
যদিও তির্য্যক্ দেহ হৈল কর্ম্মবশে,
মোহ নাশ হ'য়েছে মজিয়া জ্ঞান-রসে । ২
ধন্য সবে হইয়াছ মোহনাশ-ফলে,
পূর্ব্বের মতন মন পেয়েছ সকলে,
সিদ্ধ হ'য়ে বিষয়ে হ'য়েছ মায়াহীন
মোহে মগ্ন নাহি আর ঘুচেছে দুর্দ্দিন । ৩
ভাগ্যবশে মহামনা মার্কণ্ডেয় পাশে
গিয়েছিনু আমি, শুভ জ্ঞানলাভ-আশে,
তাঁহার আদেশে আমি আসিয়া হেথায়
হইয়াছি ধন্য, হেরি তোমা সবাকায় ।
শুনেছিনু আপনারা করিয়া যতন
করেন অনায়াসে সর্ব্ব সন্দেহ ভঞ্জন । ৪ ।

সংসারেঽস্মিন্ মনুষ্যাণাং ভ্রমতামতিসঙ্কটে।
ভবদ্বিধৈঃ সমং সঙ্গো জায়তে ন তপস্বিনাম্ ॥ ৫ ॥
যদ্যহং সঙ্গমাসাদ্য ভবদ্ভির্জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ।
ন স্যাং কৃতার্থস্তন্নূনং ন মেঽন্যত্র কৃতার্থতা ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ ভবতাং জ্ঞানকর্ম্মণি।
মতিমস্তমলাং মন্যে যথা নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭ ॥
যদি ত্বনুগ্রহবতী ময়ি বুদ্ধির্দ্বিজোত্তমাঃ।
ভবতাং তৎ সমাখ্যাতুমর্হতেদমশেষতঃ ॥ ৮ ॥
কথমেতৎ সমুদ্ভূতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
কথঞ্চ প্রলয়ং কালে পুনর্যাস্যতি সত্তমাঃ ॥ ৯ ॥
কথঞ্চ বংশা দেবর্ষিপিতৃভূতাদিসম্ভবাঃ।
মন্বন্তরাণি চ কথং বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥ ১০ ॥
যাবত্যঃ সৃষ্টয়শ্চৈব যাবন্তঃ প্রলয়াস্তথা।
যথা কল্পবিভাগশ্চ যা চ মন্বন্তরস্থিতিঃ ॥ ১১ ॥

অতীব সঙ্কটময় এই ত সংসার,
ভ্রমি'ছে মানব হেথা সহি' কষ্টভার।
বহুভাগ্য বিনে হেথা তোমাদের মত
সুতপস্বী-সঙ্গ লাভ না হয় সতত। ৫।
জ্ঞান-দৃষ্টি আজি মোরে করিলে অর্পণ
তাহে যদি নাহি হই কৃতার্থ এখন,
নাহি জানি তবে আর কিরূপে কখন
কৃতার্থ হইব, ধন্য হইবে জীবন? ৬।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-পথ করিয়া আশ্রয়
দ্বিবিধ যে জ্ঞান-কর্ম্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,
তদাশ্রয়ে মলশূন্য মর্ত্তে সবাকার
হ'য়েছে নিশ্চয় মনে জানিয়াছি সার।
এমন এ ভবে নাহি হেরি অন্য জন
জ্ঞানবলে বলী তোমা সবার মতন। ৭।
পুনঃ অনুগ্রহ যদি হয় মোর প্রতি
জানিতে বাসনা কিছু হ'তেছে সম্প্রতি।
জিজ্ঞাসি সে কথা—মোরে হইয়া সদয়
বিচরিয়া বলি' নাশ মনের সংশয়। ৮।
স্থাবরজঙ্গমাত্মক হেরি এ জগৎ;
কি রূপে হইয়া সৃষ্ট হইল এমত?
কেমনে প্রলয় কালে হইবে বিলয়?
সেই তত্ত্ব বল এবে হইয়া সদয়। ৯।
কি রূপে বা দেব-ঋষি-পিতৃ-ভূতগণ
জনমে এ ভবে তাহা করহ বর্ণন।
মন্বন্তর-কথা, বংশানুচরিত আর
বিস্তারি' বলহ আজি নিকটে আমার। ১০।
সৃষ্টি যতবিধ আর যতেক প্রলয়,
কল্পের বিভাগ—মন্বন্তর সমুদয়—১১।

যথা চ ক্ষিতিসংস্থানং যৎ প্রমাণঞ্চ বৈ ভুবঃ।
যথা স্থিতি সমুদ্রাদ্রি-নিম্নগা-কাননানি চ ॥ ১২ ॥
ভূর্লোকাদিশ্চ লোকানাং গণঃ পাতালসংশ্রয়ঃ।
গতিস্তথার্ক-সোমাদি-গ্রহর্ক্ষজ্যোতিষামপি ॥ ১৩ ॥
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বমেতদাভূতসংপ্লবম্।
উপসংহৃতে চ যচ্ছেষং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

প্রশ্নভারোঽয়মতুলো যস্ত্বয়া মুনিসত্তম।
পৃষ্টস্ত্বং তে প্রবক্ষ্যামস্তচ্ছৃণুষ্বেহ জৈমিনে ॥ ১৫ ॥
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং পুরা ক্রৌষ্টুকয়ে যথা।
দ্বিজপুত্রায় শান্তায় ব্রতস্নাতায় ধীমতে ॥ ১৬ ॥
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানমুপাসীনং দ্বিজোত্তমৈঃ।
ক্রৌষ্টুকিঃ পরিপপ্রচ্ছ যদেতৎ পৃষ্টবান্ প্রভো ॥ ১৭
তস্য চাকথয়ৎ প্রীত্যা যম্মুনির্ভৃগুনন্দনঃ।
তৎ তে প্রকথয়িষ্যামঃ শৃণু ত্বং দ্বিজসত্তম ॥ ১৮ ॥

ভুবন সংস্থান আর পৃথ্বী-পরিমাণ
সমুদ্র-পর্ব্বত-নদী-কানন-সংস্থান—১২।
ভূর্লোক স্বর্লোক আর পাতাল নিচয়
অর্কাদি গ্রহের গতি ঋক্ষ সমুদয়—১৩।
এই সব তত্ত্ব জানিবার বাঞ্ছা মনে
প্রলয় অবধি সব বলহ এক্ষণে।
প্রলয়ের পরে যাহা রহিবে নিশ্চয়
শুনিতে সে কথা মনে ঔৎসুক্য উদয়।" ১৪।
পক্ষিগণ বলে—"দিলে যেই প্রশ্নভার
অতুল্য সে প্রশ্নচয়—সর্ব্বতত্ত্ব সার।
সকলি বিস্তারি' মোরা করিব বর্ণন,
এক মনে গূঢ়তত্ত্ব করহ শ্রবণ। ১৫।
ব্রত-স্নাত, শান্তশীল, ব্রাহ্মণ-নন্দন,
ক্রৌষ্টুকী এ প্রশ্ন পুরা করিলা যখন,
মার্কণ্ডেয় মুনিবর পরম যতনে,
বলিলেন এই সব প্রফুল্লিত মনে। ১৬।
শুন, প্রভো, একদিন আশ্রমে আপন
ছিলেন বসিয়া মার্কণ্ডেয় তপোধন।
সেই কালে তাঁ'র পাশে ছিলা মুনিগণ,
রত সবে নানা তত্ত্ব করিতে শ্রবণ।
এ হেন সময়ে সেই ব্রাহ্মণ-কুমার
ক্রৌষ্টুকি করিলা প্রশ্ন নিকটে তাঁহার। ১৭।
সেই প্রশ্নে যে উত্তর দিলা মুনিবর,
সেই কথা বলি এবে তোমার গোচর। ১৮।

প্রণিপত্য জগন্নাথং পদ্মযোনিং পিতামহম্।
জগদ্‌যোনিং স্থিতং সৃষ্টৌ স্থিতৌ বিষ্ণুস্বরূপিণম্।
প্রলয়ে চান্তকর্ত্তারং রৌদ্রং রুদ্রস্বরূপিণম্ ॥ ১৯ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উৎপন্নমাত্রস্য পুরা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
পুরাণমেতদ্বেদাশ্চ মুখেভ্যোঽনুবিনিঃসৃতাঃ ॥ ২০ ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রুর্বহুলাঃ পরমর্ষয়ঃ।
বেদানাং প্রবিভাগশ্চ কৃতস্তৈস্তু সহস্রশঃ ॥ ২১ ॥
ধর্ম্মজ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ মহাত্মনঃ।
তস্যোপদেশেন বিনা ন হি সিদ্ধং চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২
বেদান্ সপ্তর্ষয়স্তস্মাজ্জগৃহুস্তস্য মানসাঃ।
পুরাণং জগৃহুশ্চাদ্যা মুনয়স্তস্য মানসাঃ ॥ ২৩ ॥
ভৃগোঃ সকাশাচ্চ্যবনস্তেনোক্তঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
ঋষিভিশ্চাপি দক্ষায় প্রোক্তমেতন্মহাত্মভিঃ ॥ ২৪ ॥
দক্ষেণ চাপি কথিতমিদমাসীৎ তদা মম।
তৎ তুভ্যং কথয়াম্যদ্য কলিকল্মষনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

পদ্মযোনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি কার্য্য যাঁ'র ;
বিষ্ণুরূপে পালি'ছেন নিখিল সংসার ;
রৌদ্রবেশ রুদ্ররূপে প্রলয়-সময়
সেই বিভু বিনাশ করেন সমুদয়।
সেই জগন্নাথ-পদে করিয়া প্রণাম,
বলিতে লাগিলা মার্কণ্ডেয় গুণধাম—১৯।
"আদিতে অব্যক্তযোনি ব্রহ্মা যে সময়,
উৎপন্ন হইলা ; তবে বেদ সমুদয়,
পুরাণের সনে, চারিমুখ হ'তে তাঁ'র
আবির্ভূত হৈল ভবে জেনো তত্ত্ব সার। ২০।
সে পুরাণ বহুরূপে করিয়া বিস্তার,
মুনিগণ ধরাধামে করিলা প্রচার।
সহস্র সহস্র ভাগে বেদে ভাগ করি'
শিষ্যমুখে প্রচারিলা অবনি ভিতরি। ২১।
সেই উপদেশ ছাড়ি' ধর্ম্ম, জ্ঞান আর
বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য চারি ভবে মেলা ভার। ২২।
তাঁহার মানসজাত সপ্ত-ঋষিগণ,
করিলা প্রথমে সেই বেদের গ্রহণ।
আর আর যত তাঁ'র মানসকুমার
পুরাণ লইয়া বিশ্বে করিলা বিস্তার। ২৩।
ভৃগুর নিকটে ইহা পাইলা চ্যবন।
পাইলেন তাঁ'র কাছে যত মুনিগণ।
মুনিগণ দক্ষপাশে করিলা প্রকাশ,
শুনিয়া দক্ষের তাহে পূর্ণ হৈল আশ। ২৪।
দক্ষ মোরে কৃপা করি' করিলা প্রদান,
তদবধি এই তত্ত্ব আছে মম স্থান।
বলি তাহা আজি পুরাইব তব আশ।
কলির কলুষ যা'র শ্রবণেতে নাশ। ২৫।

সর্ব্বমেতন্মহাভাগ শ্রূয়তাং মে সমাধিনা ।
যথাশ্রুতং ময়া পূর্ব্বং দক্ষস্য গদতো মুনে ॥ ২৬ ॥
প্রণিপত্য জগদ্‌যোনিমজমব্যয়মাশ্রয়ম্ ।
চরাচরস্য জগতো ধাতারং পরমং পদম্ ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মাণমাদিপুরুষমুৎপত্তি-স্থিতি-সংযমে ।
যৎকারণমনৌপম্যং * যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৮ ॥
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় লোকতন্ত্রায় ধীমতে ।
প্রণম্য সম্যগ্বক্ষ্যামি ভূতসর্গ-ম†-মনুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্ ।
প্রমাণৈঃ পঞ্চভির্গম্যং স্রোতোভিঃ ষড়্‌ভিরন্বিতম্ ॥ ৩০ ॥
পুরুষাধিষ্ঠিতং নিত্যমনিত্যমিব চ স্থিতম্ ।
তচ্ছ্রূয়তাং মহাভাগ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩১ ॥
প্রধানং কারণং যত্তদব্যক্তাখ্যং মহর্ষয়ঃ ।
যদাহুঃ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং নিত্যাং সদসদাত্মিকাম্ ॥ ৩২ ॥

সমাহিত চিত্তে এবে করহ শ্রবণ
দক্ষের বর্ণিত তত্ত্ব করিব বর্ণন । ২৬ ।
জগতকারণ যিনি অব্যয়, আশ্রয়,
চরাচর-ধাতা, অজ, অনাদি, চিন্ময়,
যিনি সে পরম পদ, তাঁহার চরণে
প্রণিপাত করি আমি ভক্তিযুত মনে । ২৭ ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ যে জন,
উপমা-রহিত, আদি কারণ-কারণ
যাঁহে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ব চরাচর
তাঁ'র পদে লগ্ন সদা রাগহ অন্তর । ২৮ ।
সেই সে হিরণ্যগর্ভ লোকতন্ত্র আর
প্রণাম করিয়া আমি চরণে তাঁহার,
অনুত্তম ভূতসর্গ করিব বর্ণন ।
সমাহিত চিত্তে এবে, করহ শ্রবণ । ২৯ ।
মহদাদি বিশেষান্ত সবৈরূপ্য আর
লক্ষণের সনে বলি নিকটে তোমার ।
পঞ্চ প্রমাণের গম্য এই সমুদায়
ষড়্‌বিধ স্রোতের স্থিতি রয়েছে যাহায় । ৩০ ।
পুরুষাধিষ্ঠিত নিত্য এই সমুদায়
অনিত্যের মত আছে এই ত ধরায় ।
গূঢ়তত্ত্ব তব পাশে করিব বর্ণন ।
সমাহিত চিত্তে এবে করহ শ্রবণ । ৩১ ।
অব্যক্ত-নামেতে যেই পরম কারণ
সদসদাত্মিকা যাঁ'রে বলে মুনিগণ,
সেই সে প্রকৃতি নিত্যা, সূক্ষ্মা অতিশয়,
জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা কোন কালে নয় । ৩২ ।

* অনৌরস্যমিতি বা পাঠঃ ।

† লোকসর্গমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

ধ্রুবমক্ষয্যমজরমমেয়ং নান্যসংশ্রয়ম্।
গন্ধরূপরসৈর্হীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥
অনাদ্যন্তং জগদ্‌যোনিং ত্রিগুণপ্রভবাব্যয়ম্।
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥ ৩৪ ॥
প্রলয়স্যানু তেনেদং ব্যাপ্তমাসীদশেষতঃ।
গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে ॥ ৩৫ ॥
গুণভবাৎ সৃজ্যমানাৎ সর্গকালে ততঃ পুনঃ।
প্রধানং তত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ ॥ ৩৬ ॥
যথা বীজং ত্বচা *তদ্বদব্যক্তেনাবৃতো মহান্।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধোদিতঃ ॥ ৩৭ ॥
ততস্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধো বৈ ব্যজায়ত।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চ স তামসঃ ॥ ৩৮ ॥
মহতা চাবৃতঃ সোঽপি যথাব্যক্তেন বৈ মহান্।
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রকং ততঃ ॥ ৩৯ ॥

ধ্রুব, নিত্য, অপ্রমেয়, অক্ষয়, অজর,
অন্যের আশ্রয় বিনা আছে নিরন্তর।
গন্ধ রূপ রস আর স্পর্শ শব্দহীন
সেই তত্ত্ব জেনো বৎস আছে চিরদিন। ৩৩।
জগতকারণ আর অনাদি অনন্ত
ত্রিগুণ-কারণ তিনি কে বুঝিবে অন্ত।
বিনাশ-বিহীন আর চির-বিদ্যমান,
অবিজ্ঞেয় ব্রহ্ম আগে ছিলা বর্ত্তমান। ৩৪।
প্রলয় সময়ে সব করি' আবরণ
থাকেন সতত তিনি শুন দিয়া মন।
গুণসাম্য সেই কালে রহে ত তাঁহার,
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত হ'য়ে করেন বিহার। ৩৫।
সৃষ্টিকালে গুণাশ্রয় করেন যখন, †
প্রধান মহতে তবে করে আবরণ। ৩৬।
বীজ যথা ত্বকে আচ্ছাদিত হ'য়ে রয়,
অব্যক্ত প্রধানাবৃত মহৎ সে হয়।
মহতের তিন গুণ সত্ত্ব রজঃ আর
তমঃ এই তিনাশ্রয় ত্রিধারূপ তা'র। ৩৭।
ত্রিবিধ মহৎ হ'তে তিন অহঙ্কার,
বৈকারিক, তৈজস, ভূতাদি নাম আর।
ভূতাদির অন্য নাম তামসাহঙ্কার,
বিস্তারি' বলিব সব নিকটে তোমার। ৩৮
অব্যক্তে আবৃত যথা হইল মহত,
ভূতাদি মহত্তে তথা হইয়া আবৃত;
বিকৃত হইল, তাহে হইল উদয়
শব্দতন্মাত্রের, ইহা জানিহ নিশ্চয়। ৩৯।

* ত্বচা কন্দমেবং তেনাবৃতো মহানিতি বা পাঠঃ।

† সদ্‌গুরু কৃপায় যাহার ভূতশুদ্ধি হইয়াছে তিনিই এ তত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভবে সমর্থ।

সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ ততঃ ॥ ৪০ ॥
স্পর্শতন্মাত্রমেবেহ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুস্তস্য স্পর্শগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥ ৪১ ॥
বায়ুশ্চাপি বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ ॥ ৪৩ ॥
সম্ভবন্তি ততো হ্যাপশ্চাসন্ বৈ তা রসাত্মিকাঃ ॥
রসমাত্রাস্তু তা হ্যাপো রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥ ৪৪ ॥
আপশ্চাপি বিকুর্ব্বন্ত্যো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ ॥ ৪৫
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রং তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততশ্চ তে ॥ ৪৬ ॥

শব্দতন্মাত্রেতে সৃষ্ট হইল আকাশ,
শব্দ গুণ তাহে মাত্র হয় ত প্রকাশ।
আকাশে আবৃত কৈল ভূতাদি যখন
শব্দতন্মাত্রের ঘটে বিকৃতি তখন। ৪০।
স্পর্শতন্মাত্রের হৈল উৎপত্তি, তাহার
স্পর্শ গুণ বলবান বায়ু জন্মে আর।
শব্দ মাত্র আকাশ আবৃত কৈল তায়
স্পর্শ মাত্র বায়ুর বিকৃতি ঘটে তায়। ৪১।
বায়ুর বিকারে রূপতন্মাত্র উদয়
রূপযুক্ত জ্যোতিঃ তাহে জন্মিল নিশ্চয়। ৪২।
স্পর্শমাত্র বায়ু পরে করে আবরণ
রূপতন্মাত্রেরে, তাহে হইল ঘটন,
জ্যোতির বিকার—রসতন্মাত্র তাহায়
নিশ্চয় জানিহ কিছু সন্দ নাহি তায়। ৪৩
সে রসতন্মাত্র হ'তে প্রকাশিল জল,
রসাত্মক সেই তত্ত্ব জীবন সম্বল।
রসমাত্র অপে সবে করে আবরণ
সে রূপতন্মাত্র, তাহে ঘটিল এমন। ৪৪।
অপের বিকৃতি হৈল উপজিল তায়
সে গন্ধতন্মাত্র পৃথ্বীতত্ত্ব হৈল যায়। ৪৫।
যেই তত্ত্বে যেই গুণ গণনীয় হয়।
সেই সে তন্মাত্র তাহা জানিহ নিশ্চয়।
বিশেষ বাচক কিছু নাহি এ সবার
অবিশেষ বলি' তাই হইল প্রচার। ৪৬।

ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষতঃ।
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ ॥ ৪৭ ॥
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাত্তু সাত্ত্বিকাৎ।
বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনস্তত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥
শ্রোত্রংত্বক্চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥
পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাক্ পঞ্চমী ভবেৎ।
গতির্ব্বিসর্গো হ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম তৎ ॥ ৫১ ॥
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণো জায়তে বায়ুঃ শব্দস্পর্শগুণো মতঃ ॥ ৫২ ॥
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততশ্চাগ্নিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্ ॥ ৫৩ ॥

সেই সব শান্ত, ঘোর, কিম্বা মূঢ় নয়
অবিশেষ তাই তা'রা জানিহ নিশ্চয়।
তামসাহঙ্কার হ'তে এই ত প্রকারে
ভূত-তন্মাত্রের সৃষ্টি জানিহ সংসারে। ৪৭।
সত্ত্বোদ্রিক্ত বৈকারিক যেই অহঙ্কার
সত্ত্বগুণযুক্ত তাহা জেন এই সার।
বৈকারিক সৃষ্টি তাহে হয় যেই মত,
বিশেষিয়া বলিব তাহাতে হৈল যত। ৪৮।
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর
তৈজস ইন্দ্রিয় সবে জেনো ইহা সার।
দশ ইন্দ্রিয়াধিদেব বৈকারিক দশ ;
একাদশেন্দ্রিয় মন, দেব একাদশ। ৪৯।

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা সে আর
শব্দাদির জ্ঞান জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সার। ৫০।
পাদ, পায়ু, উপস্থ সে হস্ত, বাক্ আর
এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় জেনো ইহা সার।
গতি আর বিসর্গ, আনন্দ, শিল্প, কথা,
এই পঞ্চ কার্য্য তাহে নাহিক অন্যথা। ৫১।
শব্দমাত্র আকাশেতে হইলে মিলন।
স্পর্শমাত্র হ'তে হয় বায়ুর জনন,
দুইগুণযুক্ত বায়ু শব্দস্পর্শ আর
বায়ুতত্ত্ব-স্বরূপ জানিহ এই সার। ৫২।
শব্দ স্পর্শে হয় যবে রূপের মিলন
তিনগুণযুক্ত তেজ জনমে তখন। ৫৩।

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু-গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা ক্ষেত্র........সাঙ্খ্যসূত্র-প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।...... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

৫ম খণ্ড | ৫ম বর্ষ — আশ্বিন, ১৩২১ — দ্বাদশ সংখ্যা।

আলোচনা

১। বর্ণাশ্রম ও বিশ্বশক্তি

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, হিন্দুসমাজের 'জাতি' গুলি স্ব স্ব প্রধান সমাজবিশেষ। এই সমুদয়ের বিভিন্নতা ও অনৈক্যই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অন্তরায়। এই জন্যই হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশে এক আদর্শ ও এক চিন্তা প্রচারিত হইতে পারে না। ইউরোপের মধ্যযুগে বহু ব্যবসায়ী সমিতি এবং শিল্প-"গিল্ড" বর্ত্তমান ছিল। আমাদের জাতিভেদকে পুরাপূরি সেই ধরণের গিল্ড-ভেদ বিবেচনা করিয়া ইহাঁরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

জীবতত্ত্বে সকল মানুষই এক, অথবা অধ্যাত্মতত্ত্বে সকল মানুষই এক, অতএব মানব সমাজে উচ্চনীচভেদ, অসাম্য, অনৈক্য থাকা

উচিত নয়—এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিতে পারা যায় সমাজ গড়িয়া তোলা যায় না। সুতরাং এ যুক্তির অবতারণা সম্প্রতি করিব না। দুনিয়ার লোকে অসাম্য স্বীকার করিতে বাধ্য—দুনিয়ায় যত সমাজ উঠিয়াছে মরিয়াছে সকলকেই অসাম্য মানিয়া চলিতে হইয়াছে। আমরাও তাহা মানিয়া লইলাম। নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়ের তর্কে কাল কাটাইয়া লাভ নাই। যাঁহার সময় আছে তিনি এবিষয়ে মাথা ঘামাইয়া একটা সূক্ষ্ম দর্শনবাদ উদ্ভাবন করুন।

তথাপি 'বর্ণাশ্রম' প্রথা সম্বন্ধে বিংশশতাব্দীতে আমাদের আলোচ্য বিষয় বহুবিধই রহিয়াছে। আমরা ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতে বর্ণাশ্রমের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা মানব-জীবন-সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুই "ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী"র সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এই ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালীকে সাধারণ ঐতিহাসিক তথ্যের বিবরণ মাত্ররূপে বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী "প্রাণ বিজ্ঞানে"র নিয়মে অনুশাসিত। যুগে যুগে মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বশক্তির প্রভাবে এই মূর্ত্তির বিভিন্নতা সাধিত হয়। অথচ সকল মূর্ত্তি-বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে মানবপ্রাণ বিরাজ করিতে থাকে। যে আলোচনা-প্রণালীর সাহায্যে আমরা ক্রমবিকশিত মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বশক্তির ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ ও আদান প্রদান বুঝিতে পারি তাহাকেই ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী বলিতেছি।

উনবিংশশতাব্দীতে "জাতিভেদ" যে আকার ধারণ করিয়াছে পূর্ব্বে তাহার অবিকল সেই আকার ছিল না। কাগজে কলমে বর্ণনা করিবার সময়ে আজকাল প্রত্যেক বর্ণকে এক একটা স্বাধীন সমাজরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ তত বাঁধাবাঁধি ছিল না—থাকিতে পারিত না।

বিশেষতঃ স্বাধীনতার যুগে প্রত্যেক সমাজের রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমা প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইত। তাহার ফলে নব নব অবস্থায় জাতিসমূহের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা নব নব আকার ধারণ করিত। সুতরাং আজকালকার আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা নড়ন চড়নহীন বিভাগের ন্যায় বিভাগ বেশী দিন থাকিতে পারিত না। নূতন নূতন শক্তির প্রভাবে জাতিগুলি সর্ব্বদা সজীবভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত।

ইংরাজ আমলে আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের অভাব অত্যন্ত বেশী—ইংরাজ নিজেই তাহা স্বীকার করেন। তাহা ছাড়া আইনের প্রভাব অত্যধিক। এইজন্য প্রত্যেক জাতির ভিতর এক একটা জমাটবদ্ধ দানা বাঁধিয়া গিয়াছে। যথার্থ স্বাধীন চিন্তার অভাবে ভিতর হইতে নূতন প্রাণ বিকাশের সুবিধা নাই। অথচ বাহির হইতেও নবশক্তি সঞ্চারিত হইতেছে না। হইলেও তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। কার্য্যতঃ জাতিগুলি অনেকটা গতিবিধিহীন সমাজ-প্রকোষ্ঠে পরিণত হইয়াছে। প্রাণ-বিজ্ঞানের হিসাবে ইহা একটা শোচনীয় অবস্থা। এরূপ দুর্দ্দশা আমাদের কোন দিন হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

তবে এই প্রকোষ্ঠগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অল্পায়তন প্রকোষ্ঠের ভিতর চলাচল বেশী হয় না। তাহাতে বিবাহের নির্ব্বাচন, ভাব বিনিময়, এবং কর্ম্ম-বিনিময় শীঘ্রই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু হিন্দুসমাজস্থ

জাতিগুলির লোক-সংখ্যা যথেষ্ট অধিক। তাহার ফলে প্রত্যেক জাতির ভিতর উঠানামা এবং আদান প্রদান ভালরূপই হইতে পারে।

এইরূপ উঠানামা ও বিনিময় চিরকাল হইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্তই জাতিভেদে সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইতে পারে নাই। যুগে যুগে নব নব আদর্শ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সমাজের ভিতর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

* *
*

২। জাতিভেদের সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎ

উনবিংশশতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংঘর্ষ পরাধীনতা, রেলগাড়ী এবং সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন হিন্দুসমাজকে নূতন এক স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পূরাপূরি ফল এখনও আমরা পাই নাই। কিন্তু কোন্ দিকে যাইতেছি তাহা বুঝা কঠিন নয়। প্রথমতঃ, অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা থাকিবে না। বিংশশতাব্দীর পরে বোধ হয় কাহাকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিব না। স্বদেশী আন্দোলন, অর্দ্ধোদয় যোগ, দামোদরের বন্যা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন এই গতির সাক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি অন্ন সংস্থানের কোন পথই জাতি-গত হইয়া থাকিবে না। যে কোন জাতির যে কোন লোকই এই সকল কর্ম্মে যোগদান করিতে থাকিবে। উনবিংশশতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এই কার্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে, বাস্তবিকপক্ষে, জাতি হিসাবে কোন ব্যবসায় নাই।

ইহার ফলে আমাদের বৈষয়িক জীবনে একটা স্বাধীনতা এবং গতিবিধিপ্রিয়তা আসিয়াছে। ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে আমরা সকলেই সকল কর্ম্ম করিতে অধিকারী হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোকমত এবং জাতীয় আদর্শও অনেকটা একপ্রকার হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও সমাজের শাসনে সমগ্রদেশের ভিতর একপ্রাণতা বর্ত্তমান ছিল। পাশ্চাত্য শাসনের আমলে ধর্ম্ম ও সমাজের প্রকৃত শাসন দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে নব্য ব্যবসায় ও নব্য শিক্ষার প্রভাবে সেই একপ্রাণতা নূতনরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের যতগুলি লোক এক ভাষায় কথা বলে তাহাদের সকলেরই আদর্শ ও লক্ষ্য একরূপ এ কথা আমরা বর্ত্তমানে বলিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, বিবাহের নিয়ম শীঘ্র বিস্তৃতরূপে বদলাইবে না। জাতিনির্ব্বিশেষে পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনই জাতিভেদের শেষ নিদর্শন এখনও বহুকাল থাকিবে। বিশেষতঃ, আজকাল পাশ্চাত্যদেশীয় বিবাহ-বন্ধন এবং সামাজিক জীবনের দৃষ্টান্তে ভারতবাসী বিশেষ উৎসাহিত নন। তাহার উপর নব্য 'ইউজেনিক্স্'-বিজ্ঞান বা বংশতত্ত্ব এবং "ম্যান্থ্পলজি" বা জাতিতত্ত্বের আলোচনায় হিন্দুসমাজের বিবাহ প্রথাই বোধ হয় সুফলদায়ক প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। ইউরোপের নিকট হিন্দুর এ বিষয়ে শিক্ষণীয় কিছু আছে কি না সন্দেহ। ইউরোপ নিজেই তাহার ঘর সাম্লাইবার জন্য বিবাহের নিয়মে ও পারিবারিক জীবনে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে ব্যস্ত।

তবে এক্ষণে হিন্দুসমাজের জাতিগুলি বহু খণ্ডে উপখণ্ডে বিভক্ত রহিয়াছে। এতগুলি বিভাগ থাকিবে না। কয়েকটা মোটা মোটা বিভাগের ভিতর সামাজিক লেনদেন প্রচলিত

হইতে থাকিবে। ইহার ফলেও সমাজ-জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র বেশ সুবিস্তৃত হইয়া পড়িবে। যৌনসম্বন্ধে নির্ব্বাচনের সুযোগ যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। আজকালই এই সকল সুফল দেখা যাইতেছে।

চতুর্থতঃ, ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শ কখনও সামাজিক জাতিপ্রথা অনুসারে খণ্ডশঃ বিভক্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই একরূপ চিন্তা করিত এবং এক আদর্শে জীবন গঠন করিত। ইহারা পরস্পর পরস্পরের শত্রু বা বিরোধী কোনদিনই ছিল না। সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার, ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তার, পুরোহিতদিগের সংশ্রব, এবং মেলা, উৎসব, তীর্থগমন, শোভাযাত্রা ও লোক-সাহিত্যের প্রভাব—এই সকলের দ্বারা দেশের ভিতর কালোপযোগী ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইত। ফলতঃ মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বন্ধনের যেরূপ আদর্শ ছিল সেইরূপ সমন্বয় এবং এক জাতীয়তা স্থাপিত হইত।

বর্ত্তমানকালে সেই একজাতীয়তা বা এক-রাষ্ট্রীয়তা কথঞ্চিৎ নূতন আকারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে প্রাদেশিক সাহিত্য ও মাতৃভাষার প্রভাবে ঐক্যের পথ বিস্তৃত হইতেছে। অধিকন্তু, আর্থিক অবস্থার প্রভাবেও ঐক্যবিধান সাধিত হইতেছে। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই একপ্রকার বৈষয়িক কর্ম্মে যোগদান করিতে পারে। তাহার ফলে নব উপায়ে আমাদের সমাজে একজাতীয়তা বিকশিত হইতেছে।

*
* *

৩। হিন্দুসমাজে নবশক্তি প্রবেশের পথ

ভারত সমাজ হইতে পরানুবাদ ও পরানুকরণের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মেকলে-নীতির বিরুদ্ধে দেশীয় শিক্ষা নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছেন।

আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য বর্জ্জন করিতে চাহিতেছি না অথচ একমাত্র এই বিদেশীয় চিন্তারাশির প্রভাবেও জীবন-গঠন করিতে অনিচ্ছুক। আমরা আমাদের সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে নব্যজগতের উৎকর্ষ অঙ্গীভূত করিয়া লইতে প্রয়াসী।

আমরা বুঝিয়াছি যে, বাহির হইতে আমাদের উপর পরকীয় সভ্যতার বোঝা চাপান হইতেছিল। তাহাতে আমাদের উন্নতি বাধা পাইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আধুনিক সভ্যতা হইতে প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি বাছিয়া লইতে চাহি।

কিন্তু তার্কিক প্রশ্ন করিতেছেন, "আপনাদের এই আকাঙ্ক্ষা, প্রয়াস ও আন্দোলন অত্যন্ত সাধু এবং সুবিবেচনারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশের আবিষ্কারগুলি আপনাদের সমাজে ও সভ্যতায় প্রবিষ্ট হইবে কি করিয়া? প্রবিষ্ট হইবার কোন পথ আছে কি? হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রমনীতি কি পরকীয় সভ্যতার অনুষ্ঠানগুলি সহজে গ্রহণ করিতে অবসর দেয়?"

বর্ণাশ্রম-নীতিকে একপক্ষ স্থিতিশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে পূজা করিয়া থাকেন, অপর পক্ষ এই জন্যই ইহাকে জঘন্য সমাজ-গঠন-নীতিরূপে ভৎর্সনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমকে স্থিতিশীল এবং পরস্পরবিরোধী ও স্বস্বপ্রধান সঙ্কীর্ণ দলভেদ বিবেচনা করা অন্যায়। অষ্টাদশ ও উনবিংশশতাব্দীর সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া

ভারতীয় সমাজতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। তাহা ছাড়া এই যুগে বর্ণাশ্রমে যে সকল সঙ্কীর্ণতা প্রবিষ্ট হইয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহার দ্বারা সমাজে নবশক্তি প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই।

*
* *

৪। হিন্দুসমাজবিকাশের বিচিত্র উপকরণ

অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই হিন্দু সমাজতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দুসমাজ জগতের সকল প্রকার শক্তিপুঞ্জ হইতে নিজ কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। গ্রীক, রোমাণ, পারস্য, মুসলমান, চীনা, তিব্বতী সকল জাতীয় সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আমাদের সমাজে স্থান পাইয়াছে। আমরাও এই সকল সভ্যতাকে নানা উপকরণে ভূষিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানা প্রকার আবিষ্কার গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে কেন পারিবে না?

সত্য কথা, আমরা কোন দিনই সোজা একটানা ভাবে গড়িয়া উঠি নাই। আমরা নিজেদের ভিতরই কত অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমন্বয় করিতে করিতে বিকশিত হইয়াছি। ভারতবর্ষ সর্ব্বগ্রাসী। এতদিন আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হজম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছি। নূতন শক্তি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা কি এক্ষণে আর নাই?

যতদিন ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনভাবে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিত এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইত, ততদিন হিন্দু সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে দুনিয়ার নব নব আবিষ্কার সহজে প্রবেশ করিতে পারিত। সংস্কৃত ভাষার ভিতর কোন চিন্তা একবার প্রবেশ করিলে তাহা ক্রমশঃ প্রাদেশিক ভাষায় এবং লোকসাহিত্যেও আসিয়া পড়িত। অধ্যাপকগণের গবেষণায়, শিষ্যগণের আলোচনায়, পুরোহিতগণের সাহচর্যে, কথক ও পুরাণ পাঠকগণের প্রচারে এবং মেলা উৎসব সঙ্গীতে শোভাযাত্রা ইত্যাদির প্রভাবে কঠিন কঠিন তত্ত্বগুলিও অল্পকালের ভিতর সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যাইত। প্রয়োজনানুসারে নিত্য নূতন পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি হইত। গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের আবিষ্কার বরাহমিহির গ্রহণ করিলেন। পঞ্জিকার সাহায্যে সে গুলি এক্ষণে নিরক্ষর কৃষকেরও সহজে বোধগম্য হইয়া রহিয়াছে। খনার বচনই বা কে না জানে? দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ, কৃষিতত্ত্ব, জ্যোতিষ ও অধ্যাত্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ গুলি ইহাদের প্রচারের প্রতিবন্ধক হইয়াছে কি?

৫। সমাজশক্তির নবীন মূর্ত্তি

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনীয় বস্তু গুলিও এই উপায়েই আধুনিক কালে গ্রহণ করিতে পারিব। জোর করিয়া গ্রহণ করাইবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের অভাব অনুসারে গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইলেই কোন গোল বাধিবে না। উনবিংশশতাব্দীতে সে সুযোগ পাই নাই। এই জন্যই পরকীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতে যাইয়া পরানুকরণ ও পরানুবাদ মাত্র করিতে পারিয়াছি। স্থিতিশীল দল এই কথা বুঝিলে ক্রমবিকশিত

হিন্দুত্বের অপূর্ব্ব মূর্ত্তির পরিচয় পাইবে না গতিশীল সংস্কারকের দলও একথা বুঝিলে অযথা হিন্দুত্বের নিন্দা করা হইতে বিরত হইবেন। আমাদের সমগ্র জীবনমণ্ডলে এবং ভারতবর্ষের আবেষ্টনে যে একটা অস্বাভাবিকতা আসিয়া জুটিয়াছে তাহা দুই পক্ষই বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন।

বিংশশতাব্দীতে আমরা নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়া, নিজেদের স্বভাব বুঝিয়া, নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র অনুসারে ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে বুঝা পড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হিন্দুসমাজ এইরূপ বুঝা পড়া করিবার সুযোগ যদি পায় তাহা হইলে সে প্রাণ-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় বিজয়লাভ দেখাইতে সমর্থ হইবে। সুযোগ যদি না পায় তাহা হইলে হিন্দুসমাজের প্রকৃত পরীক্ষা হইল না। এখনও আমাদের বিচারের সময় আসে নাই। আমরা এখনও প্রকৃত পরীক্ষাক্ষেত্রের বাহিরেই বসিয়া আছি কিন্তু ভিতরে যাইতে পারিব সে আশা আছে। সে আশা আছে বলিয়াই হিন্দু এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহা না হইলে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ইত্যাদির দশা ভারতবর্ষে ঘটিল না কেন?

এই বুঝা পড়ার ফল প্রধানতঃ আমাদের মাতৃভাষায় দেখিতে পাইব। আমাদের মাতৃভাষা কোন জাতিবিশেষের বা ধর্ম্মবিশেষের সম্পত্তি নয়। হিন্দু মুসলমান নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ সকলেরই এক মাতৃভাষা। বিবাহের নিয়ম এবং রান্নাঘর ও পূজা পদ্ধতি বিভিন্ন রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষা এবং ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব ও চিন্তাপ্রণালী সকল সম্প্রদায়েরই একরূপ। মাতৃভাষার কোন বিভাগে পাশ্চাত্য জ্ঞান একবার স্থান পাইলে অল্পকালের ভিতরেই তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে আপামর জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়িবে।

স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দিতেছি। এত তথাকথিত প্রভেদ সত্ত্বেও সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এক হইল কি করিয়া? এই কথা বুঝিলে আমাদের সমাজে নবশক্তি প্রবেশের উপায় ও কারণগুলি বুঝা যাইবে

* *
*

৬। বার্গ্‌সোঁতত্ত্ব

ফরাসী পণ্ডিত হেনরি বার্গসো আজকাল ইউরোপের দার্শনিক মহলে শীর্ষস্থানীয় কীর্ত্তিভোগ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পর এডিনবারায়ও তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ডে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। বলিবার ভঙ্গী এবং রচনাপ্রণালী বেশ চিত্তাকর্ষক।

ইউরোপে "একমেবাদ্বিতীয়ং" রূপে পূজা পাওয়া সহজ কথা নয়। বার্গসোঁ সেরূপ পূজা পাইতেছেন না। তাঁহার দর্শনবাদ সর্ব্বত্র বিনা আপত্তিতে গৃহীত হয় না। ইঁহার চিন্তার ভিতর কতখানি নিজস্ব এবং কতখানি পরকীয় তাহার সমালোচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক গবেষণার মূল্যই বা কতটুকু—ভবিষ্যতে ইঁহার প্রভাব বাড়িবে কি কমিবে সমালোচকেরা তাহাও বুঝা করিয়া দেখিতেছেন।

জার্ম্মাণির কোন কোন দার্শনিক বলিতেছেন "কাণ্টের পর পাশ্চাত্য জগতে বার্গসোঁর সমান চিন্তাবীর কেহ জন্মেন নাই। আধুনিক দর্শনের মধ্যে একমাত্র বার্গসোঁতত্ত্বই টিকিয়া যাইবে।" বিলাতের পণ্ডিত হাল্ডেন বলেন,

"বার্গসোঁ নূতন কিছুই শিখাইতে পারেন নাই। জার্ম্মাণ বৈদান্তিক সোপেন-হোয়ারের কথাই বার্গসোঁ ফরাসী ভাষায় প্রচার করিতেছেন।" এদিকে আমেরিকার সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত জেম্‌স্‌ বার্গসোঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন। জেম্‌সের বক্তৃতাফলেই ফরাসী দার্শনিক অক্সফোর্ডে নিমন্ত্রিত হন। অথচ জেম্‌স্‌ ও বার্গসোঁ দুই ভিন্ন পথের পথিক! ফরাসীরাই কি বার্গসোঁকে সর্ব্ববাদি-সম্মত গুরুরূপে গ্রহণ করিতেছে? তাহা নহে। প্রবীণ ফরাসী দার্শনিকেরা বলিতেছেন "বার্গসোঁ নাস্তিকতার নূতন অবতার!" পক্ষান্তরে যুবক ফরাসীরা বার্গসোঁকে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রচারকরূপে পূজা করিতেছেন। ইঁহারা বিবেচনা করেন, বৈজ্ঞানিকতার পরিবর্ত্তে ভাবুকতার এবং আধ্যাত্মিকতার প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। এই ভাবুকতার প্রচার ইঁহারা বার্গসোঁতত্ত্বে পাইয়া থাকেন।

বার্গসোঁতত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ মতবৈচিত্র্য বড়ই বিস্ময়জনক। সত্য সত্যই বার্গসোঁ একটা নূতন বাণী প্রচার করিতেছেন। তাহা বুঝিতে যাইয়া নানা মুনি নানা কথা বলিতেছেন। এই নূতন বাণীর প্রচারক বর্ত্তমানজগতে আরও অনেকেই আছেন। অবশ্য সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত নন। যাঁহারা গত শতাব্দীর শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সাম্রাজ্য, বিজ্ঞান, ইত্যাদির প্রভাবপ্লাবিত মানবজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহার ফলে সমাজ, সভ্যতা, আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে নব নব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে। মানবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নানা ভাবে আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনা প্রণালীগুলি পূর্ব্বতন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র—প্রায়ই পূর্ব্বতন প্রণালীর প্রতিবাদ স্বরূপ প্রবর্ত্তিত। সেই পুরাতন রীতির সাহায্যে মানবজীবন বুঝা যাইবে না—এই ধারণা ইঁহাদের সকলের মধ্যে বদ্ধমূল।

দার্শনিক ও সুকুমার শিল্পের সমালোচক পোল্যাণ্ডবাসী নীট্‌শে, জার্ম্মাণির চিন্তাবীর পলসেন ও অয়কেন, আমেরিকার জেম্‌স্‌, এবং বিলাতের ব্র্যাড্‌লে ইত্যাদি পণ্ডিতগণ এই নব্য দর্শনের বিভিন্ন প্রচারক। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এই নব্য চিন্তাবীরগণের সঙ্গে আসন পাইয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ এক্ষণে নূতন নূতন প্রথায় জীবন সমালোচনা চাহেন। এই জন্যই তাঁহারা ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া 'গীতাঞ্জলি'র সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

বার্গসোঁ নব্য দর্শনের যে পথে চলিতেছেন তাহা আমাদের ভারতীয় পথের অনেকটা নিকটবর্ত্তী। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় ইনি একথা বলিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত Intuition বা অন্তর্দৃষ্টি-তত্ত্বে হিন্দু দার্শনিকেরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এইরূপই ইঁহার মত। কিন্তু ইনি নিজগ্রন্থে "ইনটুইশন" সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি আমাদের পরিচিত 'অন্তর্দৃষ্টি' 'নিদিধ্যাসন' 'ধ্যান' ইত্যাদি হইতে বহুদূরে। ইনি পাশ্চাত্য মহলের Observation, Experiment, Inductive, Deductive, *apriori*, *aposteriori* ইত্যাদি আলোচনাপ্রণালী অথবা আমাদের শ্রবণ, মনন ইত্যাদি প্রণালী ছাড়াইয়া বেশী ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

যাহাহউক এই অন্তর্দৃষ্টিতত্ত্ব ইউরোপে নূতন নয়। জার্ম্মাণ শেলিঙ্গ ও শোপেনহোয়ার প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী দার্শনিক সংসারে প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহারা হিন্দু

সাহিত্যের নিকট ঋণী ছিলেন। সে ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে। বার্গসোঁ শেলিঙ্গের ফরাসী শিষ্য র‍্যাভেসোঁর নিকট এই নূতন বিদ্যা পাইয়াছেন।

* *
*

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা

গত বৎসর মাদ্রাজের বিশপ মহোদয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে বাঙ্গালোর সহরে একটি বক্তৃতা দেন। শিক্ষাবিষয়ক পাক্ষিক পত্র 'কলেজিয়ানে' তাহা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা সেই বক্তৃতা হইতে মাতৃভাষার উপযোগীতা সম্বন্ধে বক্তার মত কি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা কিছুতেই আদর্শ পন্থা হইতে পারে না। যাহারা পাসকোর্সে যাইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে মাতৃভাষার সাহায্যই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া অধ্যয়ন ও চিন্তা তাহাদের নিকট দুরূহ ভার বলিয়াই অনুমিত হয়। ইহাতে তাহাদের মৌলিক চিন্তা অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং কেবলমাত্র স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিতে তাহারা বাধ্য হয়। ইংরাজীতে ভাবা বা ইংরাজীতে অনুভব করা ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী না হইলে হয় না। অবশ্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের ইংরাজীতে যথেষ্টই অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের পক্ষে ঐ কার্য্যটি কঠিন নহে। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের ত ওরূপ হইবার জো নাই। তাহারা ইংরাজীতে কাঁচা থাকে, ইংরাজী তেমন বলিতে বা লিখিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে ইংরাজী সাহিত্য বা কাব্য পাঠ করিতে দিলে, তাহারা ঠিক ঠিক ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। খুব সম্ভবত ভারতের কাব্য ও সাহিত্য তাহাদিগকে অধ্যয়ন করিতে দিলে, তাহারা ঐ বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে কেন না ইংরাজী কাব্য ও সাহিত্য অপেক্ষা দেশের কাব্য সাহিত্য স্বভাবতঃই তাহাদিগের অন্তরকে বেশী স্পর্শ করিবে। ভাব ও সত্য মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই লোকের কাছে পৌঁছে, তাহাতেই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিন ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবে, ততদিন সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে ইহার যোগ থাকিবে না, ততদিন লোকের মধ্যে মহৎ ভাবপুঞ্জের উন্মেষণ হইবে না, ততদিন জাতীয় প্রতিভা নিস্তেজ হইয়া রহিবে—সম্যকরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে না।

৮। ভারতের চিত্র-শিল্প

আজকাল ভারতশিল্প সম্বন্ধে নানাজনে নানাকথা বলিতেছেন। সেদিন মাদাম হালবেক (Madame Hollebecque) ভারতশিল্পের নবজাগরণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ প্রেরিত চিত্রের সমালোচনাই ঐ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐ প্রবন্ধের একস্থানে আছে, "প্রাচীন ভাস্করগণের রচনায় যে তেজ, শক্তি ও উদ্যম দৃষ্ট হয়, কলিকাতার চিত্রকরগণের চিত্রে তাহা দেখা যায় না। প্রশান্ত লাবণ্যসৃষ্টির প্রতি ইঁহাদের অনুরাগই তাহার কারণ। ইঁহারা ভারতের খাঁটি লক্ষণগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত করেন নাই। বিশাল স্বপ্নের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অসংখ্য দেবতারূপে পরিকল্পনা করিয়াছিল। সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের

অসংখ্য হস্ত, ভোগের জন্য তাঁহাদের সহস্র মস্তক পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীনকালে আমরা পরস্পরবিরোধী অনেক ভাব দেখিতে পাই; জীবন ও মৃত্যু, অনুভূতি ও চিন্তা, ভোগবিলাস ও সন্ন্যাস। কিন্তু তখনও উত্তেজনার মধ্যে আমরা স্থিতিশীলতার প্রতি আগ্রহ দেখিতে পাই; এবং উদ্দাম প্রবৃত্তির উন্মত্ততার মধ্য হইতে স্থির চিত্তবৃত্তির উৎপত্তি লক্ষ্য করি। এই বৈচিত্র্যময় ও উচ্ছ্বলিত চিন্তাশক্তির উপযুক্ত অভিব্যক্তি আমরা এই চিত্রকরগণের নিকট পাইব বলিয়া আশা করি। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ একদিন ধ্যানের রাজ্য অতিক্রম করিয়া বিশ্বজগতের কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবে; তখন উহা নব-যৌবন লাভ করিয়া এরূপ এক শিল্পের সৃষ্টি করিবে যাহার দৃষ্টান্ত আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।" লেখিকার কল্পনা সার্থক হইবে কি না জানি না। তবে এই কথা মনে হয় আপনার সনাতন জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে খাপছাড়া কোন শিল্প উন্নতি লাভ করিবে না। আমরা অনেক বিষয়েই নিজের আদর্শকে বাহিরের চাকচিক্যে ভুলিতে বসিয়াছিলাম, এখন সেই মোহ আমাদের অনেক দিকেই কাটিতে বসিয়াছে। চিত্রশিল্পেও আমাদের মোহ বিমুক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই সন্ধিস্থলেই ভারতশিল্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় 'ধর্ম্ম ও কল্পনা এবং ভারতশিল্প' লইয়া যমুনায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতশিল্প বিষয়ে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, "আমাদের সেকালকার শিল্পের প্রধান যে দোষ আমার চোখে পড়ে, তাহা তাহার বৈচিত্র্যাভাব। তখনকার শিল্পীদের পরিকল্পনায় নানা বিষয়, মূর্ত্তি, ভঙ্গিমা ও ভাব কল্পিত হইয়াছে বটে,—কিন্তু বহুস্থলে একই বিষয়, মূর্ত্তি, ভঙ্গিমা ও ভাব নানাস্থানের নানা শিল্পীর কার্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুধু অঙ্কন বা ক্ষোদন শিল্পে নয়, আমাদের প্রাচীন কাব্য-কলাও এই দোষে দুষ্ট। - - - - এখানকার পুরাতন কলার ভিতরে চাঞ্চল্য বড় নাই। ইহার আসল কারণের মূলে ভারতের ধর্ম্মানুগত্য প্রচ্ছন্ন আছে। প্রাচীন কোন শিল্প-ক্ষেত্রে গেলে মনে হয়, যেন যুগান্তরের শান্ত গাম্ভীর্য্য সেখানে স্তম্ভিত হইয়া আছে। ঐ যে অযুত বুদ্ধমূর্ত্তি,—তাহাদের কেহ পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কেহ সরলভাবে দণ্ডায়মান, কেহ ধ্যানতন্ময়, কেহ উপদেশদানরত, কেহ ঈষদ্ধাস্যোজ্জ্বল, কেহ গভীর চিন্তাপরায়ন—সমস্তই সমীরচুম্বনমুক্ত সমুদ্রের মত স্থির। পরন্তু, বায়ু-লুলিত সাগরের উপরকার চাঞ্চল্য যেমন তাহার হৃদগত ঘুমন্ত শান্তিকে জাগ্রত করিতে পারে না, এখানেও তেমনি একটু হাসি বা একটু ভঙ্গী তাঁহাদের সে স্থিরতাকে ছুঁইতে পারে নাই। যেখানে বুদ্ধমূর্ত্তি নাই, সেখানেও প্রায় ঐ স্থিরতা। বলিয়াছি, ভারতের ধর্ম্মানুগত্য এই স্থিরতার কারণ। যে ধর্ম্মভাবকে প্রকাশ করিতেছে, সে কি কখনও চঞ্চল হইতে পারে? ধ্যানের আলেখ্য হিমাচলের ছায়ার মতই আত্মমহিমমুক্ত—নৃত্যশীলা তটিনীর হৃদয়ে প্রভাত ময়ূখের মত চপল নয়।"

"কিন্তু যেখানেই দরকার হইয়াছে, সেখানে গতি কেমন ফুটিয়াছে! শিল্পে গতির এই চাঞ্চল্যকে জাগাইয়া তোলা বড় শক্ত কাজ। * * * * ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গতির চরম পরিণতি 'মহাদেব তাণ্ডবে'।" * * * *

"ভারতে শিল্পী প্রাণপণে শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। আগে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া তবে সে কাজে হাত দিয়াছে। অজ্ঞতা কি শিক্ষার ফল? অশিক্ষাইত অজ্ঞতার আকর। ভারতে শিল্পীর জন্য যে কত পাঠ্য পুস্তক ছিল, রাম-রাজ তাঁহার প্রসিদ্ধপুস্তকে বিশদরূপে সে

পরিচয় দিয়াছেন (Essay on the Architecture of the Hindus, by Ram Raj)। এখানে শিল্পী হইতে হইলে আগে শাস্ত্রগ্রাহী হইতে হইত। শিল্পী গুরুর অধীনে থাকিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিতেন, এমন কি গণিতে দক্ষতা না জন্মিলে কেহ শিল্পী হইতে পারিতেন না। যিনি গুরুর আদেশ অমান্য করিতেন, শিল্পবিদ্যালয়ে তাঁহার প্রবেশাধিকার ছিল না। 'মানসার' প্রভৃতি পুস্তকে শিল্পকার্য্যের নিয়মগুলিপর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি ছোট স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াও শিল্পী কখনও শাস্ত্রের নিয়মছাড়া কাজ করিতে পারিতেন না। অবশ্য, প্রতিভা কখনও নিয়মের বেড়ার ভিতরে ঘুমাইয়া থাকে না। এখানেও থাকিত না। * * * কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিভা কখনও যথেচ্ছাচার করে না। সে, সেইখানে নিয়মের বেড়া ভাঙ্গে, যেখানে নিয়ম তাহার ভাবপ্রকাশের পরিপন্থী। শিল্পশাস্ত্রই এমন উপদেশ দেন। অতএব ইহা নিয়মহীনতার ভিতরেও নিয়মরক্ষা।" * * * * "ভারতের কলাবিদ্গণের যত্নাঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রপট আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কতিপয় চিত্রপট মাত্র আজ দেখা যায় —তাহার অধিকাংশই যে ভাল চিত্রকরের আঁকা, এমনও বলিতে পারি না। তবে ভারতের "ভিত্তি-চিত্রে"র কিয়দংশ আজিও যে বিদ্যমান আছে, ইহা সৌভাগ্যের কথা। পরন্তু ঐ সকল "ভিত্তি চিত্র" যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ভাস্কর্য্য অপেক্ষা ভারতের ভিত্তিচিত্রের পরিকল্পনা অধিক মনোরম, তাহার ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। কিরূপ রাসায়নিক পদার্থে সে কালের চিত্রবর্ণ প্রস্তুত হইত, জানি না,—কিন্তু তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট, সে কথা অনায়াসে বলা যায়। কারণ কালের অত্যাচারে, মানুষের অত্যাচারে ও ধূলার অত্যাচারে এবং যত্নের অভাবে ঐ সকল ছবির রং এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই; বরং স্থানে স্থানে তাহার ঔজ্জ্বল্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; মনে হয় এ রং বুঝি নূতন—সবে মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ভাবি, যথার্থ নূতন অবস্থায় না-জানি তাহা কিরূপ দেখিতে ছিল।

তাহাদের অঙ্কনকৌশলও অতি প্রাণরঞ্জক। য়ুরোপের প্রাচীন চিত্রে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব আছে। কিন্তু এখানকার ছবির মূর্ত্তিগুলি যেমন অনায়াস ভঙ্গীতে রমণীয়। তেমনি পুষ্পপেলব—তাহাতে কাঠিন্যের আঁচ পর্য্যন্ত লাগে নাই। চিত্রকারীদের রেখা টানিবারও কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, কি অদ্ভুত নিপুণতা! রেখার এই ইন্দ্রজালেই ভারতের চিত্র-কলা দর্শকের নয়ন-মন একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়। আধুনিক যুগের কোনও প্রসিদ্ধ শিল্পীই তাহার চাইতে ভাল রেখা টানিতে পারে না। ঐ সকল চিত্রের এক একটি রেখার টানে এক একখানি সম্পূর্ণ কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

* *

৯। রাজ পিপ্‌লায় নূতন বিদ্যালয়

রাজপিপলা ষ্টেটের ঝগদিয়া সহরে একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টিতে ইংরাজী ও মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। উক্ত ষ্টেটের পরলোকগত দেওয়ান বাহাদুর ধুনজিসা এদালজি মহাশয়ের নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ হইয়াছে। দেওয়ান সাহেব একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকথা ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়। তাঁহার একটা প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা ছিল যে ইংরাজী শিক্ষাকে প্রজাবর্গের নিকট অতি সহজলভ্য করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি তাঁহার নিজের জীবনেও শিক্ষার চরমফল—উদারতা, সরলতা, সহানুভূতি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য ঝগদিয়া ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহারই স্মৃতিচিহ্নরূপে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় দ্বারা স্থানীয় ছাত্রবৃন্দের অশেষ উপকার হইবে, আশা করা যায়। যাঁহার নামের সঙ্গে ইহা সংযুক্ত তাঁহার আদর্শ, ছাত্রদিগের মধ্যে অনুসৃত হইলে, তাহারা চরিত্রবান্, ধর্ম্মভীরু এবং সমাজের অলঙ্কাররূপে

পরিগণিত হইতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

* *
*

১০। মহীশূরে বাৰ্ত্তিক সম্মিলনা

মহীশূরে বার্ত্তিক (Economic) সম্মিলনীর পঞ্চমবার্ষিক বৈঠকে বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) শিক্ষা বিষয়ক

১। প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্কদিগের শিক্ষা এবং কার্য্যকরী শিক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণ ও তাহার নেতাদিগের সহকারিতা গ্রহণের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন।

২। রাজ্যে বৈষয়িক শিক্ষার স্থাপন ও পর্য্যবেক্ষণকল্পে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ইনস্পেক্টর নিয়োগ।

৩। প্রতি জেলার এবং প্রত্যেক তালুকের সদরে ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন।

৪। কন্নাড় সাহিত্যপুষ্টি সম্বন্ধে সমিতি গঠন।

৫। বড়োদার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষা কর্ম্মচারীকে তথায় প্রেরণ।

৬। জেলায় প্রতি গ্রামে বা কয়েকটি গ্রামসমূহে একটি গ্রাম্য শিক্ষক নিয়োগ—গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ স্কুল-গৃহ ও শিক্ষকের আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, এইরূপ শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে।

৭। কৃষিসমিতি বা তদ্দ্বান সহকারী সমিতি কর্ত্তৃক গ্রামসমূহে সংবাদ-পত্র প্রচার।

৮। শিল্প বা অর্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচার-কল্পে গ্রামসমূহে সুলভ মূল্যে মাতৃভাষায় সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার।

৯। রাজ্যে অবৈতনিক বাধ্যকরী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায় নির্দ্ধারণ।

১০। জনসাধারণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া বক্তৃতা দিবার জন্য প্রত্যেক তালুকে অন্ততঃ একজন ভ্রমণকারী বক্তা নিয়োগ।

(খ) কৃষি বিষয়ক

১। দুগ্ধ, পশুখাদ্য এবং সার সরবরাহের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট নিয়মের ব্যবস্থা।

২। রাজ্যে ডেয়ারীর উন্নতিকল্পে পাঁচ বৎসরের জন্য এক জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

৩। দুগ্ধদানক্ষম গাভী উৎপাদনের জন্য আইরসায়ার ষাঁড়ের আমদানী ও তাহাদিগকে কোন সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ।

৪। একশ খানি গ্রাম্য কো-অপারেটিভ সমিতিতে কৃষিসমিতি কর্ত্তৃক উন্নত লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রদর্শন—এবং প্রত্যেক কো-অপারেটিভ সমিতিতে ১০০৲ টাকা মূল্যের কৃষিযন্ত্রপাতি প্রদান।

৫। বর্ত্তমানে প্রচলিত কৃষিপ্রণালীর মধ্যে দোষ আছে কি না তৎপর্য্যবেক্ষণ এবং থাকিলে তাহার সংশোধনের জন্য চেষ্টা।

৬। গো-সংরক্ষণ কো-অপারেটিভ সমিতি-সংগঠন।

৭। জলাশয়-খনন এবং সংরক্ষণ নিমিত্ত স্বাবলম্বন।

(গ) ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক

১। পরীক্ষার্থ কোন একটি মনোনীত তালুকে গ্রাম্য সেভিংস ব্যাঙ্ক সংস্থাপন।

২। বয়ন, পিত্তলের কাজ, ধান ভাণা প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন চিন্তা প্রচারের জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্য সমিতি কর্ত্তৃক তিন জন বক্তা নিয়োগ।

৩। কল কব্জা ও যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ শিখিবার জন্য যুবকদিগকে বিদেশে প্রেরণ।

৪। নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিবার কারখানা-সংস্থাপন।

৫। বণিক ও ব্যবসায়ীদিগকে নানা দেশে দেশে ঘুরিবার জন্য উৎসাহ-প্রদান।

৬। হাড়ের সার তৈয়ারী করিবার জন্য ফ্যাক্টরী স্থাপন।

৭। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে ব্যবসাকেন্দ্র প্রভৃতি দেখিয়া ব্যবসাসম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

শক্তি পূজা

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥

*　　*　　*　　*

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি
নমোস্তুতে॥"

কালচক্রের অবিশ্রান্ত আবর্ত্তনে শরৎকাল আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা ভারতের মহা মহোৎসবের কার্য্যকাল। প্রকৃতি দেবীই এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সম্বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। নিদাঘের নিরন্তর বারিবর্ষণে নদনদী, তটিনী তড়াগাদির প্লাবণে সুখশান্তির নিকেতন কত গ্রাম ভাসাইয়া, কত সমৃদ্ধ অট্টালিকাকে ভূমিসাৎ করিয়া, ঘোর রোলে দিগ্‌দিগন্তবাসিগণকে ভীত ত্রস্ত করিয়া চলিয়া গেল। মানব-সমাজে হাহাকার—ক্রন্দনের রোল। কিন্তু প্রকৃতি-দেবী স্বীয় সাজ সজ্জা লইয়াই ব্যস্ত। ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষা আসিয়া উহাঁর তরু লতাগুলির ধূলিধূসরিত মলিন মুখ মার্জ্জনা করিয়া, পত্র পল্লব কিশলয় দলকে সতেজ করিয়া এই উৎসবের উপযোগী করিয়া দিয়াছে। "নিশির শিশির" বিন্দু নব দূর্ব্বা-দলশ্যাম ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—যেন বহুমূল্য মনি মুক্তা-খচিত আস্তরণে উৎসব মণ্ডল শোভা করিতেছে। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণে এখনও ভূপৃষ্ঠ দগ্ধ করতেছেন, কখন কখন পৃথিবীর তাবাক্লিষ্ট ম্লানমুখদর্শনে লজ্জিত হইয়া মেঘমালার অন্তরালে মুখ লুকাইতে-ছেন। রাত্রির শোভা অতুলনীয়। সুনীল আকাশে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্রমণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে যেন একখানি উজ্জল মনিমালা-খচিত চন্দ্রাতপের ন্যায় প্রভাসমাণ হইতেছে। সুধাকর মেঘবিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল আকাশে উদয় হইয়া অসংখ্য তারকাবালাগণের সহিত কেলিতে মত্ত। কখন বা বারিদবসনে মুখ ঢাকিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। সরসীতে কুমুদিনী অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক বায়ু আন্দোলিত চঞ্চল বারির সহিত তালে তালে নৃত্য করিতেছে। ভূমিতে যূথী, জাতি, মল্লিকা, মালতি, সেফালিকা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি তরুলতা ফুল্ল কুসুমদামে বিভূষিতা। পবনদেবও আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রেমভরে লজ্জাবগুণ্ঠিতা পুষ্পবধূর মুখ চুম্বন করিতেছেন, কাহাকেও বা আলিঙ্গন, কাহাকেও বা ক্রোড়ে লইতেছেন এবং উহাদের সকলেরই পরিমল অঙ্গে মাখিয়া চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত করিয়া চলিতেছেন। স্রোতস্বতী-গণ হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া ষোড়শী যুবতীর ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে।

প্রকৃতির এই সাজসজ্জা এই আনন্দোৎসব কিসের জন্য? প্রকৃতির রাণী মহাশক্তি মহামায়ার আবির্ভাবকাল উপস্থিত বলিয়া।

সমস্ত জগতই আজ আনন্দময়—হাসিমাখা। কেবল ভারতবাসীর মুখ আজি কেন বিষাদ-ছায়ায় ম্লান? দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সংক্রামক-ব্যাধি, সমাজ-বিপ্লব, রাজ-দ্রোহিতা, রাজভয়, দস্যুভয় আজি ভারতকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের নিশ্চিন্ত হইয়া একটি নিশ্বাসও ফেলিবার অবসর নাই। ত্রিশ কোটি ভারত সন্তান

আজি অধর্ম্মে, কুকর্ম্মে, রোগে, শোকে, সর্ব্বোপরি উদরান্নের অভাবে প্রায় সকলেই আসন্ন-মৃত্যু। ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ, পীড়িতের কাতর স্বরে অন্তর নিরন্তর দগ্ধ—একবার জলাভাবে বসুমতীর হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়, আবার বহু বৃষ্টির জলপ্লাবনে আজ একমাত্র আশ্রয়স্থল পর্ণকুটির খানিও ভাসিয়া গিয়াছে।

হে ভারত! তোমার আজি এ দুর্দ্দশা কেন? চিরকাল তোমার এ অবস্থা ছিল না। আমাদের এই বসুন্ধরা চিরকালই 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' ছিল। ভারতের পল্লী-জীবনে সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য সর্ব্বদাই বিরাজ করিত। ভারতবাসী চিরকাল "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনুক্ষীণ" ছিল না। একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশ অশেষ শিল্প পণ্যের প্রধান উৎপত্তির স্থান ছিল। এসিয়া ও য়ুরোপের প্রধান নগর নগরীর বিপণী শ্রেণী উহার শিল্প-সম্ভারে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকত। ঐসকল দ্রব্যাদি এদেশীয় প্রজাবর্গেরই কঠিন পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায় দ্বারা প্রস্তুত করিত। এবং উহাদের বিনিময়ে এদেশে প্রভূত অর্থের সমাগম হইত। কিন্তু আজ আমরা সামান্য সূচী, সূত্র, ক্রীড়ণক হইতে বস্ত্রযানাদির উপকরণ পর্য্যন্ত জীবন-যাত্রা ও সমাজযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। এখন

ছুঁচ সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
(মনোমোহন বসু)

তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন, ছিল যেই পুণ্য ভূমি;
অনন্ত ঐশ্বর্য্য খনি প্রাচুর্য্য ভাণ্ডার;
যাহার মলয়ানিলে, যাহার জাহ্নবী জলে,
বহিত, ভাসিত, চির আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার!
(নবীন সেন)

"প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে যেতে, কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।" ইহার ফলে আমাদের দেশের যাবতীয় অর্থ নিঃশেষ হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের কৃষীশিল্পীগণ দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এবং দারিদ্র্যের চির সহচর অনশন, অর্দ্ধাশন, আধিব্যাধি আমাদেরও এখন নিত্য সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার এক দিকে যেমন আমরা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি, অপর দিকে তেমনই আমরা আত্ম-নির্ভরতা হারাইয়া নিতান্ত পরবশ হইয়া পড়িতেছি। এইরূপ নিষ্কর্ম্মা-ভাব হইতে আমাদের মানসিক অবসাদ ও জড়তা আসিয়াছে। আমরা এখন মনে ধারণাও করিতে পারি না যে আমরাই পূর্ব্বে তৎকালীন সভ্যজগতকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, লেখাপড়া শিখাইয়া "মানুষ" করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের যে কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে তাহাও আমরা মনে করিতে পারি না। এমন কি আমরা যে মানুষ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি।

আমাদের এই আত্মশক্তি বিস্মৃতিই আমাদের সকল দুর্দ্দশার কারণ। আমরাও যে মানুষ এবং তদুপযোগী গুণান্বিত ও কার্য্য করিবার ক্ষমতাশালী এবং সকল মানুষের ন্যায় আমাদেরও সত্বাধিকার আছে এ কথা আমাদের মনে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। "তৃণাদপি সুনীচ" এবং "তরোরিব সহিষ্ণু"—এই ভাব আধ্যাত্মিক জগতে আবশ্যক হইলেও বাস্তব জগতে উহাতে আমাদের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় নাই।

আমাদের এই আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে হইলে শক্তিপূজার বিশেষ আবশ্যক।

অতএব হে ভারতবর্ষ! ভগ্নহৃদয়ে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলে চলিবে না। বিশ্ব-প্রসবিণী মহাশক্তি মহামায়ার আবির্ভাবের সময় উপস্থিত। এস আমরা ভারতের ত্রিংশৎ কোটী কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার আবাহন করি এবং ষষ্ঠী কোটী হস্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পূজা করি।

বেদমুখে দেবী বলিয়াছেন—

"অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমণী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
* * * * *
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য সং শৃণোত্যুক্তং।
অমন্তবো মাং উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি।
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তব উ।
* * * * *
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিম্ তং সুমেধাম্ ॥"
(ঋগ্বেদ দেবী সূক্ত)

আমি সমগ্র জগতের রাজ্ঞী। আমার উপাসকগণই বিভূতিসম্পন্ন হয়। সকল যজ্ঞে আমারই প্রথম পূজাধিকার; দর্শন, শ্রবণ, অন্নগ্রহণ ও শ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রাণীগণের সমস্ত চেতন ব্যাপার আমার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যে আমাকে উপেক্ষা করে সে বিনষ্ট হয়। হে শ্রুধি, শ্রদ্ধাবান হইয়া শ্রবণ কর। ব্রহ্মের হিংসক অসুরদিগের বধের নিমিত্ত ধনুর্ধারী রুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে অবস্থিতা। আমার কৃপাতেই লোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। আমার কৃপা কটাক্ষেই পুরুষ শ্রষ্টা, ঋষি এবং সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

দেবগণও দেবীর স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়তে ময়া॥
(১।৭৮)

এই অখিল সংসারে ভাবী, ভূত ও বর্ত্তমান কালে সদসৎ যত বস্তু আছে, ছিল বা থাকিবে হে সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপিণী, তৎসমুদায়ের তুমিই শক্তি স্বরূপা। আমি তোমাকে কি বলিয়া স্তব করিব।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥"
(৩২)

যে দেবী সমস্ত জীবে শক্তি রূপে অবস্থিতি করিতেছেন সেই দেবীই তুমি—তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীর্য্যা"
তুমি বৈষ্ণবী শক্তি অনন্তবীর্য্যবতী
"সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি"
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী সর্ব্বশক্তিমতী সনাতনী

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে॥

হে দেবী তুমি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, আমরা ভয়ার্ত্ত, আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমায় নমস্কার করি।

পুরাকালে দেবতাগণ যখনই বিপদে পড়িয়াছিলেন তখনই বিপদুদ্ধারের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহাশক্তি মহামায়া দুর্গাদেবীর স্তব করিয়াছিলেন। দেবীও—সদা ভক্তগণের প্রতি প্রসন্না—তাঁহাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

দেবতাগণের সর্ব্বদাই বিপদ। দুর্দ্দান্ত অসুরগণ কখন বা দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে, কখন বা ব্রহ্মাকে আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যা করিতে উদ্যত, কখন বা প্রধান প্রধান দেবতাগণকে জয় করিয়া অসুর-রাজ স্বীয় ভৃত্য স্বরূপে কর্ম্ম করাইয়া লইতেছেন। দেবতাগণের এইরূপ বিপদ হইতে ত্রাণকর্ত্রী একমাত্র মহাদেবীই। দেবতাগণের এইরূপ বিপদের সময়ে তাঁহাদের একান্ত প্রার্থনায় দেবীর আবির্ভাব হয়।

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থ মাবির্ভবতি সা যদা
(২।৫৮)

দেবতাগণের কার্য্য সিদ্ধির জন্যই তাঁহার আবির্ভাব।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রও যখন লঙ্কায় মহাপরাক্রমশালী অসুররাজ দশানন রাবণের বিরুদ্ধে মহাসমরে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অনুজ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে ভূপতিত দেখিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া সীতা উদ্ধারের আশায় নিরাশ হন তখন অকালে দেবীর বোধন করিয়া

দেবী পূজা করিয়া যে শক্তিলাভ করিয়াছিলেন সেই শক্তি বলেই রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহারাজ সুরথও যখন রাজগণকর্ত্তৃক স্বীয় রাজ্য ভ্রষ্ট হইলে বনে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া তাঁহার নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অতএব আমাদের দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে শক্তিপূজা একান্ত আবশ্যক। উহাই এক মাত্র উপায়। এ কথা দেবী নিজেই বলিয়াছেন—

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারী সমুদ্ভবান।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং স্মরেন্মম॥"
(১২। ৮)

আমার মাহাত্ম্য কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহামারিজনিত অশেষ উপসর্গ এবং ত্রিবিধ উৎপাত শান্তি হইয়া থাকে।

এমন কি শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি নিবন্ধন পৃথিবী জলশূন্যা হইলে এবং তজ্জন্য লোক সকল অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া লোক সকলকে রক্ষা করিবেন এই আশ্বাসবাণীও দেবী আমাদিগকে দিয়াছেন—

"ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্টামনম্ভসি

* * * *

ততোহমখিলং লোকমাত্ম দেহ সমুদ্ভবৈঃ
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ"
(১১।৪৬, ৪৮)

এই মহাশক্তির আবাহন করিতে হইলে আমাদের সমগ্র জাতির সম্মিলিত ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। দেবতাগণেরও যখন বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তখন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সকলে মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের সকলের সম্মিলিত ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁহাদের আপদুদ্ধার উপায় স্বরূপ এই মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া যথাশক্তি তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাই মেধস মুনি সুরথ রাজাকে বলিয়াছিলেন—

"ইত্যেবং কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয় হিতৈষিণী"
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৪। ৪০)

হে ভূপতি ত্রিজগতের হিতৈষিণী দেবী পুরাকালে যেরূপে সুরগণের শরীর হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে বলিলাম।

দেবতাগণও তাঁহার স্তব করিবার সময় বলিয়াছিলেন:—

"নিঃশেষ দেবগণ-শক্তি-সমূহ-মূর্ত্ত্যা"
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ৪। ৩)

তিনি সকল দেবতার শক্তি হইতে সমুৎপন্না হইয়াছিলেন।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে যখন মহিষাসুর কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দেবতাগণ ব্রহ্মাকে সহায় করিয়া হরিহরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন তখন তাঁহারা সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ নির্গত হইয়া একত্রিত হইল এবং সেই অনুপম তেজঃপুঞ্জ নারীরূপে পরিণত হইল।

"ততোঽতি কোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥

* * * *

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥"
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ২।১০-১৩)

এইরূপে তাঁহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা-সমুৎপন্না দেবীকে তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ বিশিষ্ট অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা মহাসুর জয়োপযোগিনী সজ্জায় সজ্জিতা করিলেন। মহাদেব তাঁহার ত্রিশূল হইতে অন্য শূল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চক্র হইতে অন্য এক চক্র, ইন্দ্র ঘণ্টা ও বজ্র, যম কালদণ্ড, বরুণ পাশ, ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, কাল খড়্গ ও চর্ম্ম, বিশ্বকর্ম্মা শাণিত কুঠার, অন্যান্য নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং অভেদ্য কবচ, হিমালয় বাহনের জন্য সিংহ, অনন্তদেব নাগহার, অন্যান্য দেবগণও বিবিধ

অস্ত্র ও নানাপ্রকার অলঙ্কার দ্বারা দেবীকে ভূষিত করিলেন।

"অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা" * *
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ২।১০—৩২)

আবার যখন চণ্ডমুণ্ডের নিধনের পর অসুর-রাজ শুম্ভ যাবতীয় অসুর সৈন্য লইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল তখন দেবতাগণও যথাসাধ্য দেবীর সাহায্যার্থে মহাসমরে উপস্থিত হইলেন। চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের শরীর হইতে তাঁহাদিগের নিজ নিজ শক্তি সকল নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ রূপ ভূষণ ও বাহন বিশিষ্ট হইয়া এবং নিজ নিজ বিশেষ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অসুরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্॥
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥"
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ৮।১৩-১৪)

তাই বলি এস বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিভিন্ন জাতীয় ভারতবাসী—

"বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠা
গুর্জ্জর, পাঞ্জাব, রাজপুতান,
হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান,
* * * *
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে
কায়মনঃ প্রাণ,"
(শ্রীমতী সরলা দেবী)

* * * *

"আয় সবে মিলে করি জাগরণ
মিলে পরস্পরে দেশের উদ্ধারে
আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ
দেখিবে দুর্দ্দশা না যায় কেমন।"
(শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী)

* * * *

"এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক
এক সুরে গাও সবে গান

* * * *

দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল,
উড়াইয়া একতা নিশান।"
(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ইহাই শক্তিপূজার আবাহন মন্ত্র। এইরূপে এক মনঃপ্রাণে মহামায়া মহাশক্তিস্বরূপাকে ডাকিলে তিনি আবির্ভূতা হইবেন। কারণ তিনি স্বভাবতঃ ভক্তবৎসল।

সে জননী মূর্ত্তি কিরূপ এস সকলে মিলিয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে তাহাকে দর্শন করি।

"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী বীর-জন শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত—দিগ্‌ভুজা—নানা প্রহরণ ধারিণী—শত্রু বিমর্দ্দিণী—বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-দায়িনী—সঙ্গে বাঘ-রূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ"।

এস সকলে মিলিয়া একমনঃ প্রাণে তাঁহায় প্রণাম করি

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥

* * * *

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গেদেবি নমস্ততে॥
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

অতএব এস বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন প্রদেশস্থ সকলে মিলিত হইয়া এক মন প্রাণে দেশের দুর্গতিনাশের জন্য সেই মহাশক্তির পূজায় নিযুক্ত হই।

এই মহাপূজাই আমাদের দুর্ব্বলের বল-বিধান, নিরাশ্রয়ের সহায়তা, নির্ব্বীর্য্যের তেজ উদ্দীপনা, দুঃখীর দুঃখাপনোদন করিবার আশাস্থল।—এই শক্তিপূজা আমাদের জাতীয় জীবনের উৎসব—পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যভূমি ভারত-বর্ষের হৃদয়ের মহামহোৎসব। ভাবী-ভারতের একমাত্র ভরশাস্থল।

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর *

নবম অধ্যায়

অর্থচিন্তা ও বিনিদ্র যামিনী

টাস্কেজীবিদ্যালয়ের কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম বৎসরের উৎসবে আমি নিগ্রোসমাজকে আরও ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাইলাম। আমাদের বাড়ীতে বড়-দিনের সময়ে রোজ প্রায় ১০০।১৫০ ছেলে মেয়ে আসিত। তাহারা আমাদের নিকট টাকা পয়সা বক্‌শিষ উপহার ইত্যাদি পার্ব্বণী চাহিত। রাত্রি দুইটা হইতে সকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের ভিড় কমিত না। আজও দক্ষিণ অঞ্চলে বড়দিনের আগমনী উপলক্ষ্যে শিশুরা এইরূপ করিয়া থাকে।

গোলামীর যুগে বড়দিনের উৎসবের জন্য নিগ্রোরা সপ্তাহকাল ছুটি পাইত। সেই সময়ে পুরুষেরা মদ খাইয়া পড়িয়া থাকিত। টাস্কেজীতেও দেখিলাম, বড়দিনের একদিন পূর্ব্ব হইতেই নিগ্রোরা কাজ ছাড়িয়াছে। নববর্ষ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কাজে আর ফিরিল না। যাহারা বৎসরে অন্য কোন দিনে মদ খাইত না তাহারাও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এ কয়দিন বেশ মাতলামী করিল। পল্লীময় উৎসব, আনন্দ, নৃত্যগান ;—কোথায়ও সংযম বা শ্লীলতা কিছুই দেখিলাম না। কেহ কেহ বন্দুক পিস্তল লইয়া শিকারেও বাহির হইল। হায়, ভগবানের জন্মতিথি কি এইরূপ উদ্দামতা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নির্দ্দয়তার অভিনয়ের উপলক্ষ্যমাত্রে পরিণত হইয়াছে!

সহর ছাড়িয়া জেলার ভিতরকার পল্লী-গ্রামের মধ্যে 'বড়দিন' দেখিতে গেলাম। এই দরিদ্র সমাজ যীশুর শুভাগমনে কিরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে জানিতে ইচ্ছা হইল কোন কামরায় যাইয়া দেখি কতক-গুলি তুই পট্‌কা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা সেইগুলি মাটিতে আছড়াইয়া আওয়াজ করিতেছে। কোন কামরায় গোটা কয়েক কলা ঝোলান আছে। সেইগুলি আট দশ জনে মিলিয়া খাইতে বসিবে। কাহারও ঘরে কয়েকটা আপ দেখিতে পাইলাম। আর এক গৃহস্থ সস্তায় এক বোতল মদ কিনিয়া আনিয়াছে। স্বামী স্ত্রী দুই জনে এক সঙ্গে বসিয়া উহা পান করিতেছে অথচ সেই ব্যক্তি ঐ পল্লীর একজন ধর্ম্মগুরু! কোন কোন গৃহে ছেলেরা নানারংএর ছাপান "কার্ড" লইয়া খেলা করিতেছে। সেই কার্ডগুলি বিশেষ কিছু মূল্যবান্ জিনিষ নয়। বড় বড় সহরের ব্যবসাদারেরা নিজেদের মাল প্রচার করিবার জন্য ঐরূপ কার্ড ছাপাইয়া নানা স্থানে বিলি করিয়া থাকে। কেহ বা একটা নূতন পিস্তল কিনিয়া পাড়ার মধ্যে তাহা জাহির করাইয়া বেড়াইতেছে।

মোটের উপরে, বুঝিলাম, ইহারা সকলেই কাজ বন্ধ করিয়াছে। যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি

* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের "আত্মজীবন চরিত" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

এবং আর্থিক অবস্থা সে-সেইরূপ পান-ভোজন ও আনন্দ উৎসবের উদ্যোগ করিতেছে। রাত্রিকালে সকলে মিলিয়া একটা বাড়ীতে নাচ গান করিবে। সেখানে মদ খাওয়ারও সবিশেষ আয়োজন আছে। শুনিয়াছি এই উদ্দামনৃত্যগীতের আসরে অনেক সময়ে মারপিট এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

বড়দিনের সফর করিতে করিতে এক বৃদ্ধ স্বজাতির সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল, "বুঝিলেন, ইডন উদ্যানে আদমের জীবন লক্ষ্য করিলেই জানা যায় যে, ভগবান্ কাজ কর্ম্ম ভালবাসেন না। এইজন্য আজকাল বড়দিনের সময় সর্ব্বত্রই দিবসব্যাপী উৎসব। কোথায়ও কাজ কর্ম্ম কিছুই দেখিতে পাইবেন না। বাঁচিয়াছি, এ কয়দিন খাটিতে হইতেছে না, হাড় জুড়াইল।" সে আরও বলিল "এক বৎসর কি পাপেই না জীবন কাটিয়াছে—কেন না একদিনও যথার্থ বিশ্রাম পাই নাই। আজ আমার কি পুণ্যের দিন—কিছুই কাজ করিবার ভাবনা নাই।"

নিগ্রোসমাজের ধর্ম্মমত এবং লোকচরিত্র দেখিয়া শুনিয়া আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলাম। আমাদের স্কুলে ছাত্রদিগকে বড়দিনের সার্থকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। আমাদের চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে। আজ ১৫।২০ বৎসর কার্য্যের ফলে দেখিতে পাইতেছি যে, নিগ্রোরা বড়দিনের উৎসবে যথেষ্ট সংযম, শৃঙ্খলা, চরিত্রবত্তা এবং ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া চলে।

টাস্কেজীবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আজকাল বড়দিনের সময়ে বিশেষভাবে সমাজ-সেবা লোক-হিত এবং পরোপকারের কর্ম্মে লাগিয়া যায়, দুঃখী ও দরিদ্র লোকদিগকে সুখ দিতে তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সেদিন তাহারা একজন দরিদ্র বৃদ্ধা নিগ্রোরমণীর কামরা নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে। একজন লোক শীতে জামা অভাবে কষ্ট পাইতেছিল। একথা আমি আমার ছাত্রদিগকে জানাইবামাত্র তাহাদের নিকট দুইটা জামা পাইলাম।

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, টাস্কেজীর শ্বেতাঙ্গেরাও আমাদের অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় সাহায্য করিতেন। আমাদের মুষ্টি ভিক্ষা তাঁহাদের নিকটও আদায় হইত। নগদ টাকাও মাঝে মাঝে তাঁহারা দিতেন। তাহা ছাড়া কুমারী ডেভিড্‌সন যখনই তাঁহাদের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইতেন তখনই কিছু না কিছু পাইতেন।

আমি প্রথম হইতেই বিদ্যালয়টিকে সমগ্র পল্লীর জীবন-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিতেছিলাম। পল্লীর সকল কাজ কর্ম্মেই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ রাখিতাম। গ্রামের লোকেরা সহজেই বুঝিতে পারিত যে, বিদ্যালয়ের সাহায্যে তাহাদের নানা বিষয়ে উপকার হইতেছে। তাহা ছাড়া উহা সকলেরই সম্পত্তি—টাস্কেজীর সাদা কাল সকলেই উহার মালিক ও কর্ত্তা। সাধারণ জনগণের সৎপ্রবৃত্তিতেই উহার ভিত্তি। কেহই যেন না বুঝিতে পারে যে, কয়েকজন বাহিরের লোক আসিয়া গ্রামের উপর একটা বোঝা চাপাইয়াছে। এই ভাব মনে রাখিয়া আমি বিদ্যালয় চালাইতাম। গ্রামের লোকের উৎসাহ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধ আমি সর্ব্বদাই নানা উপায়ে জাগাইয়া রাখিতাম। জমির মূল্য দিবার জন্য সকলের নিকটই চাঁদার খাতা লইয়া যাইতাম। ইহাতেও তাহারা বিদ্যালয়কে নিজের জিনিষ

বলিয়া আদর করিতে অভ্যস্ত হইত। জমির দাম শোধ করিবার জন্য তাহাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে ইহা জানিবামাত্র তাহারা বিদ্যালয়ের জন্য নূতনভাবে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পোষণ করিতে লাগিল। সাদা কাল চামড়ার ভেদ ভুলিয়া যাইয়া সকলেই বিদ্যালয়কে সমস্ত টাস্কেজীর যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে ভাবিতে থাকিল।

শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে আজ টাস্কেজীর অনেক বন্ধু রহিয়াছেন। আমি প্রথম হইতেই ইহাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। দক্ষিণ প্রান্তের নিগ্রোগণকেও আমি এই বন্ধুত্বের সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে চিরকাল উপদেশ দিয়াছি।

আমরা টাকা তুলিতে লাগিলাম। মেলা, প্রদর্শনী, মুষ্টিভিক্ষা, চাঁদা ইত্যাদি নানা উপায়ে আমরা তিন মাসের মধ্যেই মার্শ্যালের ৭৫০৲ দেনা শোধ করিলাম। তার পর দুই মাসের ভিতর অবশিষ্ট ৭৫০৲ জোগাড় করিয়া জমির মালিককে দিয়া ফেলিলাম। জমিটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সম্পত্তি হইয়া গেল। সুখের কথা এই সমস্ত টাকাই টাস্কেজী নগরের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের নিকট হইতেই উঠিয়াছিল।

এখন আমরা জমিচষিবার সুব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, এই চাষবাস করিলে বিদ্যালয়ের জন্য কিছু লাভ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা ক্ষেতে কাজ করিয়া কৃষিকর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। তৃতীয়তঃ, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়ার সুখও বেশ হইবে।

আমরা সব কাজই এক সঙ্গে আরম্ভ করিতাম না। ভাল কাজ হইলেও তাহা যখন তখন আমাদের কর্ম্মকেন্দ্রে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হইতাম না। আমাদের যখন যেরূপ অভাব হইত তখন ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতাম। আমাদের সর্ব্বপ্রথম অভাব হইয়াছিল—বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য ভাল শাক শব্জীর। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমেই আমরা চাষে লাগিয়া গেলাম।

ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, আমাদের ছাত্রেরা এতই দরিদ্র যে বৎসরে তিন মাসের বেশী পয়সা খরচ করিয়া স্কুলে থাকিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহাদের অন্যান্য মাসের খরচ চালাইবার জন্য আমাদের নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইল। এজন্যও চাষের ব্যবস্থা ভাল করিয়াই করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধরের কার্য্য, কর্ম্মকারের কার্য্য ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম খুলিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

আমাদের টাস্কেজীতে একটা কাণা ঘোড়া লইয়া পশু পালন আরম্ভ হয়। ঘোড়াটা একজন শ্বেতাঙ্গ আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন। আজকাল আমাদের বিদ্যালয়ের পশুশালায় ২০০ ঘোড়া, খচ্চর, গরু, বাছুর, বলদ ইত্যাদি, ৭০০ শূকর এবং কতকগুলি মেষ ও ছাগল রহিয়াছে।

ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। পুরাতন বাড়ীতে আর কোন মতেই কাজ চলে না। তখন একটা নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিলাম। প্রায় ২০,০০০৲ টাকার আনুমানিক ব্যয়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হইবে হিসাব করিয়া দেখিলাম। এত টাকা আমাদের চিন্তার অতীত বোধ হইল। কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি তখন হয় আমাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেই হইবে, না হয় পুরাতন অবস্থায়ই পচিতে হইবে। বিশেষতঃ আমরা ছাত্রদিগকে

এক সঙ্গে এক জায়গায় রাখিয়া আমাদের আদর্শ অনুসারে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। সে উদ্দেশ্যে অতি সত্বরই কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক। এজন্য বিলম্বের আর সময় ছিল না। কাজেই এত ব্যয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীর ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ সংবাদ রটিয়া গেল যে, এক বৃহৎ ব্যাপার টাস্কেজীর কর্ত্তারা আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন সকালে দক্ষিণ প্রান্তের একজন শ্বেতকায় কাঠের সওদাগর আসিয়া আমায় বলিলেন, "শুনিতেছি, আপনারা নূতন বিদ্যালয় গৃহের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে সমস্ত কাঠ জোগাইতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণেই মূল্য দিতে হইবে না। আপনাদের যখন সুবিধা হয় তখন দিবেন।" আমি বলিলাম "আমাদের হাতে কিন্তু সম্প্রতি এক কড়িও নাই।" তিনি বলিলেন "তাহা আমি জানি। তথাপি আমি আপনাদের জমিতে কাঠ পৌঁছাইয়া দিব।" আমি বলিলাম "মহাশয়, কিছু অপেক্ষা করুন। আগে আমাদের হাতে কিছু টাকা জমা হউক। তাহার পর আপনাকে জানাইব।"

এই ঘটনায় আমি অতিশয় আশান্বিত হইলাম। ভাবিলাম—সৎকার্য্যে অর্থাভাব হয় না।

কুমারী ডেভিড্‌সন আবার নানা কৌশলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ হইতে টাকা তুলিতে চেষ্টিত হইলেন। নিগ্রোরা এই গৃহের কথা শুনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিল। আমরা একদিন টাকা তুলিবার জন্য একটা সভা আহ্বান করিয়াছিলাম। সভার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় নিগ্রো দাঁড়াইয়া উঠিল। সে প্রায় ১২ মাইল দূর হইতে আসিয়াছে—সঙ্গে একটা বড় শূকর বহিয়া আনিয়াছে। সে বলিতে লাগিল, "ভাই সকল আমার টাকা পয়সা নাই। আমার সম্পত্তির মধ্যে দুইটা বড় শূকর আছে। তাহাদের একটি আমি এই বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে দান করিবার জন্য আনিয়াছি। আমি আপনাদিগকে করুণভাবে নিবেদন করিতেছি যে, যদি স্বজাতির জন্য আপনাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, অথবা আপনাদের চিত্তে যদি বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান ও আত্ম-গৌরব বোধ থাকে, তাহা হইলে আপনারা সকলেই একটি করিয়া শূকর এই বিদ্যালয়ের জন্য দান করুন। আমার বিশ্বাস আপনারা আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন না।" আর কয়েক জন নিগ্রো এই সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি আমার স্বজাতির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে আমি দুই সপ্তাহ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সাহায্য করিব।"

দক্ষিণ অঞ্চল হইতেই ২০,০০০ টাকা উঠা অসম্ভব। কুমারী ডেভিড্‌সন উত্তর প্রান্তের ইয়াঙ্কি মহলে চাঁদা আদায় করিতে বাহির হইলেন। সেখানে নানা গির্জ্জায় যাইয়া এজন্য বক্তৃতা করিতে হইল। বিভিন্ন বিদ্যালয়-গৃহে এবং সভা সমিতির সম্মুখেও তিনি টাস্কেজীর বৃত্তান্ত জানাইলেন। বড়ই কঠিন কার্য্য। কেহই উঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। এদিকে লোকের উৎসাহ আকৃষ্ট করা অল্প পরিশ্রমের ব্যাপার নহে। যাহা হউক, ডেভিড্‌সন ধীরে ধীরে উত্তর প্রান্তের ভালবাসা পাইতে লাগিলেন।

ডেভিড্‌সন একদিন এক ষ্টীমারে নিউইয়র্ক যাইতেছিলেন। সেখানে একটি ইয়াঙ্কি

রমণীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। রমণী ষ্টীমার ত্যাগ করিবার সময়ে ডেভিড্‌সনকে ১৫০৲ টাকার একটা 'চেক্' লিখিয়া দিলেন।

ডেভিড্‌সনকে অর্থসংগ্রহের জন্য যারপর নাই খাটিতে হইয়াছিল। এজন্য তিনি এত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন যে অনেক সময় তাঁহার চলিবার ক্ষমতা থাকিত না। একদিন বোষ্টন নগরে একটি রমণীর সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ডেভিড্‌সন তাঁহার 'কার্ড' পাঠাইলেন। কার্ড পাইয়া রমণী বৈঠকখানায় আসিলেন। আসিয়াই দেখেন ডেভিড্‌সন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ডেভিড্‌সন যে সময়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছিলেন সেই সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্যও তাঁহার ছিল। তাহা ছাড়া তিনি টাস্কেজীর রমণীমহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিক্ষা দিতেন, এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেন। অধিকন্তু একটি রবিবারের বিদ্যালয়ের ভারও তিনি লইয়াছিলেন।

তিনি আমাদের সাহায্যকারী বন্ধুগণের সঙ্গে সর্ব্বদা চিঠিপত্রের সাহায্যে আলাপ রাখিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ের অবস্থা জানাইতে চেষ্টাও করিতেন। এইরূপে টাস্কেজীর জন্য নানা স্থানে স্থায়ী বন্ধুর সৃষ্টি হইয়াছিল।

গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া গেল। ঘরের নাম রাখা হইয়াছিল "পোর্টার হল"। পোর্টার নিউইয়র্কের ব্রুক্‌লিন নগরের একজন সহৃদয় ইয়াঙ্কি। ইনি কিছু বেশী টাকা দিয়াছিলেন —এজন্য গৃহের নাম ইঁহার সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছিলাম। এই ঘর তৈয়ারী করিবার সময়ে টাকার অভাব খুব বোধ করিতে লাগিলাম। একজন পাওনাদারকে কথা দিয়াছিলাম, অমুক তারিখে তাঁহার প্রাপ্য ১২০০৲ দিব। সেই তারিখ আসিল। সকালে একটিমাত্র টাকাও হাতে নাই দেখিলাম। দশটার সময়ে ডাক পাইলাম। সেই সঙ্গে কুমারী ডেভিড্‌সনের একখানা চিঠি ছিল। তাহার মধ্যে একটা ১২০০৲ টাকার চেক্! আমি অবাক্ হইয়া গেলাম! আরও অনেক সময়েই এইরূপ অবাক্ হইয়াছি। এই ১২০০৲ বোষ্টনের দুই জন রমণী দান করিয়াছিলেন। এই দুই রমণী এক বৎসর পরে আরও ১৮,০০০৲ দান করিয়াছিলেন। বিগত ১৪ বৎসর ধরিয়া এই দুইটি রমণী ১৮,০০০৲ করিয়া প্রতি বৎসর দিয়া আসিতেছেন।

গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে মাটি কাটা আরম্ভ হইল। ছাত্রেরাই এই কাজ করিল। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত তাহারা নবভাবে সম্পূর্ণরূপে মজিয়া উঠে নাই। এখন ত তাহাদের সেই পুরাতন বাবুগিরির ভাব কিছু কিছু ছিল। "আমরা লেখা পড়া শিখিতে আসিয়াছি, মাটি কাটিব বা ইট গড়িব কেন ?"—অনেকেরই এই ভাব! যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে শারীরিক পরিশ্রমের উপকারিতা ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

মাটি কাটা হইয়া গেলে—দেওয়ালের ভিত্তি গুলি প্রস্তুত হইয়া গেল। এখন সমারোহ করিয়া প্রকাশ্যভাবে 'ভিত্তি প্রতিষ্ঠা' উৎসবের আয়োজন করিলাম।

১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কেনা গোলাম ছিলাম। দক্ষিণ প্রান্তের এই অঞ্চলেই গোলামাবাদ বেশী ছিল। এই বিভাগের নামই "কৃষ্ণ বিভাগ।" গোলামী যুগে এই বিভাগে নিগ্রোকে লেখাপড়া শিখান মহাপাপের কার্য্য বিবেচিত হইত। যে শিক্ষক

নিগ্রোকে শিখাইতে চাহিত সমাজে তাহার কুখ্যাতি রটিত, আইনেও সে দণ্ডনীয় হইত। আজ ১৬ বৎসরের ভিতর সেই গোলামাবাদের আবহাওয়ার মধ্যে বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, এবং ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসব! সর্ব্বত্র আনন্দের মহা কোলাহল—সকলের চিত্তেই স্ফূর্ত্তি। যেন কি এক দেবভাবে টাস্কেজীর শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই সংসার দেখিতে লাগিল।

আলাবামা প্রদেশের শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধায়ককে উৎসবের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। তিনিই প্রধান বক্তৃতা করিলেন। গৃহের যে কোণে ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছিল সেখানে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, বন্ধু, আত্মীয়, প্রদেশ-রাষ্ট্রের কর্ম্মচারী, মহাজন, ব্যবসাদারসকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা গোলামখানার মালিক ছিলেন আজ তাঁহারা গোলাম-জাতির হাত ধরিয়া এই শিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিলেন। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই সেই ভিত্তি-প্রস্তরের নীচে কিছু না কিছু চিহ্ন রাখিতে উৎসুক হইল।

গৃহ-নির্ম্মাণের কার্য্য যখন অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে বহুবার আমাদের বড়ই দুশ্চিন্তায় দিনরাত্রি কাটাইতে হইত। হাতে পয়সা থাকিত না—অথচ পাওনাদারদিগের টাকা দিবার দিন চলিয়া আসিত। ভুক্তভোগী ভিন্ন এই উদ্বেগ আর কে বুঝিবে? কত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই।

আমি জানিতাম যে, আমি অসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছি। এখন আমাকে কেহই সাহায্য করিবে না। বরং সকলেই বাধা দিবে। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই অবস্থায় আমাকে একাকীই সকল কার্য্য করিতে হইবে। আমি কষ্টভোগ করিয়া, নীরবে দুঃখ সহিয়া, লোকজনের উপহাসে বিচলিত না হইয়া, দৃঢ়ভাবে কাজ করিতে করিতে যদি সফল হইতে পারি, তবে ভবিষ্যতে আমি সমাজের সাহায্য পাইব। সাধারণ লোকেরা আগে কোন কাজ করিতে চাহে না—তাহারা যখন দেখে যে অন্যের আরব্ধ অনুষ্ঠানটা কৃতকার্য্য হইতে চলিল তখন তাহারা উহার প্রতি অনুরক্ত হয়। সুতরাং সকল দুঃখ নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তার বোঝা এক্ষণে আমাকেই নিজ মাথায় বহন করিতে হইবে। আমার কবরের উপরই নিগ্রোসমাজের জাতীয় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক।

দশম অধ্যায়

অসাধ্য সাধন

প্রথম হইতেই টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আমি আমার নূতন আদর্শে তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার মতে বিদ্যালয়ের সকল প্রকার কাজই ছাত্রদের নিজ হাতে করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বোর্ডিং-গৃহের ঘরঝাড়া, কাপড়ধোয়া, রান্নাকরা ইত্যাদি সকল কাজই ছাত্রদের করা উচিত। তার পর স্কুলঘরের টেবিল চেয়ার মেজে পরিষ্কার রাখা, এবং আসবাবপত্র সাজান এ সবও ছাত্রদেরই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু

বিদ্যালয়ের উঠান মাঠ ও জমির শ্রীবিধান সম্বন্ধে ছাত্রদেরই দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া পশুপালন, কৃষিকার্য্য, চাষবাস, মাটি-কাটা ইত্যাদি কর্ম্মের জন্যও বাহিরের মজুর লাগান উচিত নয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই এই সকল কাজ সম্পন্ন করা আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে—বাড়ীঘর মেরামত, নূতন নূতন গৃহ-নির্ম্মাণ, করাতে কাঠ চেরা, ইঁট তৈয়ারী করা, চুণ শুরকি প্রস্তুত করা—এই সমুদয় ঘরামি ও মিস্ত্রিগিরির কাজও ছেলেদেরই করা প্রয়োজন।

সকল প্রকার গৃহস্থালী, কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ছাত্রেরা বেশ পাকা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। নানাবিধ কারিগরি এবং শিল্পিমহলের নূতন নূতন আবিষ্কারগুলি তাহাদের 'হাতে কলমে' শিক্ষা হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহারা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য অর্জ্জন করে ও কর্ম্মঠ হইতে থাকে; এবং নৈতিক চরিত্র বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। খাটিয়া খাওয়া নিন্দনীয় কাজ নয়। লেখা পড়া শিখিলেই 'বাবু' হইয়া যাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকদেরও স্বহস্তেই চাষ করা উচিত এবং নিজের ঘর বাড়ী নিজেই প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এক কথায়, সকলেরই নিজ অভাবগুলি যথাসম্ভব নিজেই মোচন করিয়া লওয়া উচিত। খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা ইত্যাদি কোন বিষয়েই পরের উপর নির্ভর করা শিক্ষিত ও সভ্য লোকের লক্ষণ নয়। এই সকল ধারণা আমার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে ছাত্রদের মাথায় সহজেই বসিতে পারে।

শারীরিক পরিশ্রম এবং স্বাবলম্বন এই দুইটি গুণই আমি প্রকৃত শিক্ষালাভের চিহ্ন মনে করি। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমকে কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। নিজে খাটিলে অনেক বিষয়ে খরচ কম হয়—তাহা সকলেরই জানা আছে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহাও বুঝেন। কিন্তু একমাত্র এই জন্যই তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের আদর করেন না। তাঁহারা খাটিয়া খাওয়াকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন। পরিশ্রমের অন্য কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক, তাঁহারা পরিশ্রম করিতে পারিলেই সুখী ও আনন্দিত হন। পরিশ্রম করিতে পারাটাই একটা মহাগুণ—পরিশ্রমী ব্যক্তিমাত্রই গুণবান্ এবং সকলের প্রশংসাযোগ্য। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপ ভাবিয়া থাকেন।

এই ধর্ম্মভাবে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে খাটিয়া খাওয়ায় কোন অপমান, কষ্ট ও লজ্জাবোধ হইতেছে না। কারণ পরিশ্রম করা তখন অপর লোকের কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র মনে হইবে না। উহার দ্বারা নিজেরই উপকার হইতেছে ভাবিতে পারিবে। উহা নিজ জীবনেরই সার্থকতা লাভের অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইবে। পরিশ্রমের ফলে তুমি প্রকৃত মানুষ হইতেছ এই জ্ঞান থাকিবে। কাজেই পরিশ্রম গৌরবজনক পুণ্যের কাজরূপেই আদর পাইতে পারিবে—কোন মতেই ঘৃণ্য বা কষ্টকর বোধ হইবে না। নিজের আত্মার যাহাতে উন্নতি হয় তাহাতে কেহ কখনও কষ্টবোধ করে কি?

আমার নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে ছাত্রেরা শারীরিক পরিশ্রমের এইরূপ মর্য্যাদা ও গৌরব দান করিতে শিখে। তাহা ছাড়া বিদ্যালয় চালাইবার পক্ষেও খুব সুবিধা হয়। কারণ এই উপায়ে প্রায়

সকল খরচই কমাইয়া ফেলান যায়। ছাত্রদের পরিশ্রমেই ঝাড়ুদার ধোপা নাপিত মিস্ত্রী ছুতার কামার কুমার চাষী ইত্যাদি সকল প্রকার মজুরের কাজ চলিতে থাকে। এজন্য অর্থব্যয় প্রায় হয়ই না বলিলে চলে। সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছাত্রেরা নূতন নূতন শিল্পবিদ্যা শিখিতে থাকে। জল, বায়ু, বাষ্প, তড়িৎ, জীবজন্তু ইত্যাদি জগতের সকল শক্তি মানুষকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতেছে। কৃষিকর্ম্মে এবং শিল্পকার্য্যে লাগিয়া থাকিলে অতি সহজেই এ বিষয়ে ধারণা জন্মে। বস্তুজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় ছাত্রদিগকে আর নূতন করিয়া শিখাইতে হয় না। তাহারা বিশ্বশক্তিগুলি প্রতিদিনকার নানা কাজে লাগাইতে লাগাইতে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান জীববিদ্যা, পদার্থ-তত্ত্ব ইত্যাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

আমার প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষা-প্রণালীর সুবিধাগুলি বর্ণনা করিলাম। এই আদর্শে আমি টাস্কেজী বিদ্যালয় চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুতরাং যখন নবগৃহ নির্ম্মাণের সুযোগ আসিল আমি ছাত্রদিগকেই এই কাজে লাগাইতে চাহিলাম। কেহ কেহ বলিলেন "ছাত্রেরা এখন মিস্ত্রীর কাজ জানেই না। কাঠ কাটিতেও তাহারা তত পটু নয়। ঘরামিগিরি করিবে কিরূপে? এত বড় ইমারত তৈয়ারী করা কি ইহাদের সাধ্য? পারিলেও যে, বাড়ীটা অতি বিশ্রী ও কদাকার দেখাইবে! আপনার এ পরামর্শ ভাল নয় নাই। সহর হইতে পাকা মিস্ত্রী ডাকিয়া আনাই উচিত। ছাত্রেরা না হয়, ইহাদের কাজে সাহায্য করিবার জন্য জল, হাতিয়ার [illegible] ইত্যাদি বহিয়া দিবে।"

আমি [illegible] বন্ধুগণকে বলিতাম, "দেখুন, আমি বুঝিতেছি যে, আমাদের বাড়ীটা ছেলেরা প্রস্তুত করিলে নিতান্তই কদাকার দেখাইবে। কিন্তু গৃহের সৌন্দর্য্যবিধানই কি আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য? নাই বা হইল বাড়ীটা দেখিতে সুশ্রী। কিন্তু ছেলেরা ত এতগুলি কাজ শিখিয়া ফেলিবে। তাহারা স্বাবলম্বী হইতে অভ্যস্ত হইবে। আর, এত বড় ইমারতের জন্য মাটি খুঁড়া হইতে আরম্ভ করিয়া চূণকাম ও রংকরা পর্য্যন্ত সকল কাজ নিজহাতে সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে শিল্পশিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রগঠন যথেষ্টই হইতে থাকিবে। অধিকন্তু, আনুষঙ্গিক-ভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অশেষবিধ উৎকর্ষ এবং সাধারণ সভ্যতা বিষয়েও ইহাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে। এইগুলি কি কম লাভ? আমার বিবেচনায় এজন্য ঘরবাড়ীগুলি যদি অতি বিশ্রী ভাবেই তৈয়ারী হয় তাহাতেও দুঃখ করা উচিত নয়।"

আমি আরও বলিতাম, "আমাদের ছেলেরা সকলেই গরিব। ইহারা পল্লীগ্রামে বাস করে। ইহাদের গৃহসম্পত্তির মধ্যে একটা করিয়া কাঠের কামরা আছে মাত্র। তুলা, চিনি ও চাউলের আবাদে ইহাদিগকে সারা দিন খাটিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহারা যদি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রথমেই একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের মত বাড়ীতে থাকিতে পায় তাহাহইলে ইহাদের আনন্দের ও গৌরবের সীমা থাকিবে না। ইহা স্বাভাবিক, কারণ কষ্টের পর সকলেই সুখ আশা ও ইচ্ছা করে। কিন্তু আমরা যদি এই অবস্থায় ইহাদিগকে কিছু নূতন আদর্শ ও জীবনের নূতন লক্ষ্য না দিতে পারি তাহা হইলে আমরা ইহাদের জন্য কি করিলাম? পূর্ব্বে ইহারা যে চিন্তা ও যে ধারণা লইয়া লেখা পড়া শিখিতে আসিয়াছিল গৃহে

ফিরিবার সময়েও ইহাদের সেই চিন্তাও ধরিয়া থাকিয়া যাইবে না কি?

এইজন্যই আমি মনে করিয়াছি যে, ইহারা ইটের ঘরে থাকিয়া সুখভোগ করিবার পূর্ব্বে নিজ হাতে ইট তৈয়ারী করিতে শিখুক। তারপর সেই ইট দিয়া ইহারাই ঘর প্রস্তুত করিবে। নিজ বসবাসের জন্য নিজহস্তে গৃহ-নির্ম্মাণ করাও কি মানুষের স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? আর ছাত্রগণ ইহাতে গৌরব এবং আনন্দও কি কম পাইবে? অধিকন্তু নিজ হাতে গড়া জিনিষ সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে থাকিলে তাহাই শিক্ষালাভের একটি প্রধান উপায় হইবে। কারণ তাহা দেখিয়াই ছাত্রেরা অতীতের ভুলগুলি বুঝিতে পারিবে। তাহারা সেইগুলি সহজেই সংশোধন করিবার উপায় বুঝিয়া লইবে, এবং ভবিষ্যতের জন্য উন্নতি বিধানের পথও খুলিতে থাকিবে। ছাত্রেরা এইরূপে নিজেই নিজেদের শিক্ষক হইয়া পড়িবে। এই 'আত্মশিক্ষা'র সুযোগ আর কোন উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে কি?"

টাস্কেজী বিদ্যালয়ের প্রথম গৃহ ছাত্রেরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ-পর্য্যন্ত এই ১৯ বৎসরের ভিতর বিদ্যালয়ের জন্য যতগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে প্রায় সকলগুলিই আমাদের ছাত্রগণের প্রস্তুত। আমি আমার শিক্ষাপ্রণালী কোন সময়েই বর্জ্জন করি নাই। আজ আমাদের সর্ব্বসমেত ছোট বড় ৪০ টা গৃহ। এইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ৪ টার জন্য ছাত্রদের খাটান হয় নাই। অবশিষ্ট ৩৬ টা গৃহই ছাত্রেরা নিজহাতে তৈয়ারী করিয়াছে। বাহিরের মিস্ত্রীর সাহায্য একবারেই লওয়া হয় নাই বলা যাইতে পারে।

এই বিশ বৎসরের কার্য্যফলে দেখিতে পাই, যে আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় লোকেরা আজকাল সকলেই ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। টাস্কেজী বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৪০ টা গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণ ঘরামি মিস্ত্রী ছুতারের কাজে ওস্তাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য লোকেরাও কিছু কিছু গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য শিখিয়া ফেলিয়াছে। আর আমাদের বিদ্যালয়ের উপকারই কি হইয়াছে কম? বৎসরের পর বৎসর ছাত্র আসে যায়—কিন্তু গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যা আমাদের স্কুলের স্থায়ী আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন ছাত্রদের উত্তরাধিকারের সূত্রে নূতন নূতন ছাত্রেরা মাটি কাটা, গর্ত্ত খুঁড়া, কাঠ চেরা, ইট গড়া, গৃহের চিত্র অঙ্কন করা, এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব করা, হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যাসের কল লাগান, ইলেক্ট্রিক্ বাতীর ব্যবস্থা করা সবই শিখিয়া লয়, এখন আমরা গৃহনির্ম্মাণ সংক্রান্ত কোন বিষয়েই বাহিরের লোকের সাহায্য চাই না।

কোন সময়ে একজন নূতন ছাত্র ছেলে-মানুষী করিয়া দেওয়ালে পেন্সিলের দাগ দিতে থাকে, অথবা টেবিলে ছুরি দিয়া নাম লিখিতে থাকে, অমনই পুরাতন ছাত্রেরা তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। তাহাদের তিরস্কার আর কিছুই নয়—এইমাত্র "ওহে, ও দেওয়ালটা আমরাই প্রস্তুত করিয়াছি, এই টেবিলটাও আমাদেরই হাতে গড়া। নষ্ট করিলে আমাদিগকেই সারিতে হইবে।"

সর্ব্বপ্রথম গৃহনির্ম্মাণের সময়ে ইট প্রস্তুত করিতেই আমাদিগকে বিশেষ ভুগিতে হইয়াছিল। আমাদের নিজের প্রয়োজন ছাড়া ইট তৈয়ারী করিবার আর একটা কারণও ছিল। আমাদের টাস্কেজী অঞ্চলে সেই সময়ে

ইট গড়িবার কোন কারখানা ছিল না। অথচ বাজারে ইটের কাট্‌তি যথেষ্ট। কাজেই ইটের ব্যবসায় বেশ লাভ করা যাইত। এই লাভের আশায়ও আমি বিদ্যালয়ে ইটের কারবার খুলিতে ইচ্ছা করিলাম।

বাইবেলে পড়িয়াছি—ইজরেলদের শিশুরা বিনা খড় কুটায় ইট তৈয়ারী করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমি দেখিলাম আমাদের কাজ তাহা অপেক্ষা কম কষ্টকর নয়। কারণ প্রথমতঃ এ বিষয়ে আমাদের কাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয়তঃ তহবিলে এই ব্যবসা চালাইবার জন্য এক পয়সাও মজুত নাই।

তার পর, ইটগড়া কাজটাও নেহাত সোজা নয়। কাদামাটির গর্ত্তের মধ্যে ২।৪ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া কাজ করা বড়ই দুঃখ জনক। হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা লাগিয়া থাকে। ছাত্রদিগকে এ কার্য্যে ব্রতী করিতে বড়ই বেগ পাইতে হইত। এতদিন তাহাদিগকে বুঝাইতে বুঝাইতে জমি চাষবার কাজে লাগান গিয়াছে। কিন্তু যখন এই কাদামাটি ঘাঁটিবার কাজ আসিল তখন তাহাদিগের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া শারীরিক পরিশ্রম করাই ত তাহারা আদৌ পছন্দ করিত না। তাহার উপর এইরূপ জঘন্য ও কষ্টকর কাজ করিতে তাহারা সম্পূর্ণরূপেই নারাজ। কষ্টে দুঃখে অপমানে ও লজ্জায় অনেক ছাত্র আমাদের স্কুল ছাড়িয়া গেল।

আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম ইট তৈয়ারী করিতে বেশী বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাজে নামিয়া দেখিলাম, খুব পাকাহাত না হইলে ইট গড়া বড় কঠিন। প্রথমতঃ কাদামাটি প্রস্তুত করিতেও বিশেষ অভিজ্ঞতা চাই। আমরা একনা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় আমাদের মাটির গর্ত্ত সরাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শেষে একস্থানে বেশ ভাল মাটি পাওয়া গেল। সেইখানে ইট প্রস্তুত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ ইট পোড়ান কাজ খুবই কঠিন। ২৫,০০০ ইট মাটি দিয়া প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু এই গুলি পুড়াইতে যাইয়াই মহা বিপদ। আমরা একটা, দুইটা, তিনটা পাঁজা প্রস্তুত করিয়া তিন তিনবার অকৃতকার্য্য হইলাম। আমার কয়েক জন শিক্ষক হ্যাম্পটনে ইট প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহারা তৃতীয় পাঁজাটা বিশেষ দক্ষতার সহিতই প্রস্তুত করিলেন। এক সপ্তাহ আমাদের ইটগুলি বেশ পুড়িতে লাগিল। ভাবিলাম এযাত্রায় সফল নিশ্চয়ই হইব। কিন্তু সাতদিন পর রাত্রি ১২।১টার সময় পাঁজাটা ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা তৃতীয়বার বিফল হইলাম।

সকলেই বলিতে লাগিলেন, "আর চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। ইট গড়া আমাদের দ্বারা হইবে না।" তাহার উপর আমার পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে। চতুর্থবার এক্‌স্‌-পেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা করিতে হইলেও টাকার প্রয়োজন। একে নৈরাশ্য তাহাতে দারিদ্র্য। পুনরায় চেষ্টা করা অসম্ভব মনে হইতে লাগিল। আমার একটা পুরাতন ঘড়ি ছিল। এই সময়ে সেটা একটা দোকানে বাঁধা রাখিয়া ৫০৲ ধার লইয়া আসিলাম। এই টাকার সাহায্যে ইটের পাঁজা তৈয়ারী করিতে যাওয়া গেল। এইবার কৃতকার্য্য হইলাম। এত-দিন পর ২৫০০০ ইট আমাদের কারখানায় তৈয়ারী হইল।

আজ ইটের কারবার টাস্কেজী বিদ্যালয়ে

খুব জোরের সহিতই চলিতেছে। গত বৎসর আমাদের ছাত্রেরা ১,২০০,০০০ ইট গড়িয়াছিল। এখন এত সুন্দর ও নিরেট যে আমি যে কোন বাজারে ফেলিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্য আদায় করিতে পারি। তাহা ছাড়া বিগত বিশ বৎসরের শিক্ষার ফলে, আজ আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে গণ্ডায় গণ্ডায় নিগ্রো যুবক ইটের ব্যবসায় করিয়া অন্নসংস্থান করিতেছে।

ইটের কারবার করিতে করিতে আমার একটা নূতন দিকে দৃষ্টি পড়িল। আমাদের বিদ্যালয়ে বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ইট খরিদ করিতে আসিত। তাহারা পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা বলিত না। কিন্তু অন্যত্র ইট পাওয়া যায় না। কাজেই ইহারা কৃষ্ণাঙ্গের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল।

আর পূর্ব্বে অনেক শ্বেতাঙ্গই ভাবিত যে, লেখা পড়া শিখিয়া নিগ্রোরা বাবু হইয়া পড়িবে। তাহারাও এখন বুঝিল যে, নিগ্রোরা এই জাতীয় বিদ্যালয় খুলিয়া সত্য-সত্যই নিজেদের উন্নতি করিতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সহরেরই উপকার হইতেছে। এই উপায়ে কৃষ্ণাঙ্গ সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গের ধারণা বদলাইতে লাগিল।

ফলতঃ আমাদের দুই সমাজে কর্ম্মবিনিময় ও ভাব-বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হইল। আজ দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোয় ও শ্বেতাঙ্গে যে সদ্ভাব রহিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ আমাদের টাস্কেজীর এই ইটগড়া এবং ইটের কারবার। বহু বক্তৃতা দ্বারা যে কার্য্য করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহা নীরবে ও সহজে সিদ্ধ হইয়া গেল।

শ্বেতাঙ্গ যে কৃষ্ণাঙ্গকে বাদ দিয়া সংসারে চলিতে পারিবে না—এই ব্যবসায় হইতে তাহারা বেশ বুঝিয়া লইল। কাজেই আজ দুই সমাজই এক বৃক্ষের ফলের ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ। পরস্পর পরস্পরের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। শ্বেতাঙ্গের কার্য্যে কৃষ্ণাঙ্গের উপকার হয়, এবং কৃষ্ণাঙ্গের বিদ্যায় শ্বেতাঙ্গের অভাব মোচন হয়। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ আজ আমেরিকা-জননীর যমজ সন্তানের ন্যায় চলাফেরা করিয়া থাকে। শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার মূল্য কি কম?

আমি আমার স্বজাতিগণকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকি, "দেখ, গলাবাজী করিয়া কখনও একটা বড় কিছু করা যায় না। তোমরা ভাবিয়াছ যে চেঁচামেচি করিলেই তোমাদিগকে শ্বেতাঙ্গেরা ভাই বলিয়া ডাকিবে, এবং তাহাদিগের সমান ক্ষমতা তোমাদিগকে দিতে থাকিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। কাজ করিতে লাগিয়া যাও। কৃষিকর্ম্মে লাগিয়া যাও, শিল্পকার্য্যে লাগিয়া যাও, ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগিয়া যাও। বাড়ী, গাড়ী, রেল, জাহাজ, ষ্টীমার তৈয়ার করিতে থাক। এ সকল বিষয়ে তোমাদের 'হাত' দেখাও। তাহাদিগকে তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় দেখাও। তাহারা বুঝুক যে তোমরাও মানুষ, তোমরাও মাথা খাটাইয়া একটা জিনিষ দাঁড় করাইতে পার। তাহা হইলেই তাহারা তোমাদিগকে সম্মান করিবে—তোমাদের সঙ্গে বসিতে চাহিবে—তোমাদের সঙ্গে খাইতে চাহিবে। দেখিতে পাও না—যে যে অঞ্চলে নিগ্রো শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা বেশ দক্ষতার সহিত কারবার চালাইতেছে সেই সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে বিরোধ বড় বেশী নাই? সেখানে কালচামড়া সাদা চামড়ায় প্রভেদ অল্প মাত্রই দেখা যায়!"

আমি বিশ্বাস করি, গুণ যাহার মধ্যেই থাকুক না কেন, সমস্ত জগৎই তাহাকে সম্মান করিতে বাধ্য। দুদিন আগে কিম্বা দুদিন পরে—এই যা। গুণ, যোগ্যতা, প্রতিভা, চরিত্রবত্তা এ সকল জিনিষ চাপিয়া রাখা যায় না। কেহ এ গুলিকে কোনদিন ঢাকিয়া রাখিয়া দাবিয়া ফেলিতে পারিবে না। আর একটা কথাও আমি সর্ব্বদা মনে রাখি এবং সকলকে বলিয়া থাকি,—"কথা অপেক্ষা কাজের মূল্য শতগুণ বেশী। একশত জন লোক ঐক্য-বিধান, সুবিচার, অধিকার-বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সমাজের যে উপকার করিতে না পারে, একজন লোক একটা সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করিয়া সেই উপকার করিতে পারে। যখনই শ্বেতাঙ্গেরা রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে নিগ্রো-নির্ম্মিত একখানা সুন্দর গৃহ দেখিবে তখনই তাহারা নিগ্রোর ক্ষমতায় বিশ্বাস করিবে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার পরক্ষণ হইতেই কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের বন্ধু ও পূজার পাত্র হইয়া পড়িবে। কেবল গৃহনির্ম্মাণে কৃতিত্ব কেন, সকল বিষয়েই কৃতিত্ব দর্শক, ও শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট না করিয়া যায় না। তখন তাহারা কে গান করিতেছে, কে চিত্র আঁকিতেছে, বা কে মূর্ত্তি গড়িতেছে, বা কে বাগান তৈয়ারী করিতেছে—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কৃতিত্বের দাস হইয়া পড়ে। গুণপনার ক্ষমতা অসীম। সুতরাং শ্বেতাঙ্গ-দিগকে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে এখন আমাদের গুণপনা দেখান আবশ্যক। গুণমুগ্ধ হইলে শীঘ্রই তাহারা আমাদিগকে আদর করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের কাল চামড়ার জন্য বেশী বাধা পাইব না।"

ছাত্রেরাই টাস্কেজীর গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঠিক সেই আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তাহাদিগের দ্বারা আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ী জুড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করাইয়াছি। আজ কাল আমাদের এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১২টা। সকল গুলিই ছাত্রদের নিজ হাতে প্রস্তুত। তাহা ছাড়া আরও অনেক গাড়ী তৈয়ারী করিয়া আমরা বাজারে বেচিয়াছি। আমাদের গাড়ীর কারখানার সাহায্যেও শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গে সদ্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। আমাদের শিক্ষিত ছাত্রেরা যে অঞ্চলে গাড়ীর কারবার করে তাহারা সেই অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গমহলে বিশেষ প্রতিপত্তিই অর্জ্জন করিয়াছে দেখিতে পাই।

সংসারে লোকের যাহা অভাব তাহা তুমি যদি মোচন করিতে পার, তোমার প্রভুত্ব সেখানে সুনিশ্চিত জানিয়া রাখিও। লোকে চায় শাক শব্জী, ইট কাঠ, লোকে চায় স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতি, লোকে চায় বাড়ী ঘর আসবাব গাড়ী ইত্যাদি। তোমরা যদি সেখানে তোমাদের গ্রীকভাষার ব্যাকরণ লইয়া হাজির হও তাহা হইলে তোমাদিগকে তাহারা সম্মান করিবে কেন? বাজারের কাটতি বুঝিয়া মাল জোগান দিতে থাক, দেখিবে সংসার তোমার গোলাম।

আমার নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী ত প্রবর্ত্তিত হইল। ধনী নির্দ্ধন বিচার না করিয়া সকল ছাত্রকেই শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য করিলাম। সকলকেই শিল্পে কৃষিকর্ম্মে, গৃহস্থালীতে লাগাইয়া দিলাম। আমার নিয়মগুলি টাস্কেজীময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই ভাবিতে লাগিল আমি একজন কিম্ভূত কিমাকার লোক। যা খুসী তাই করি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। ছেলেগুলির মাথা খাইতে বসিয়াছি।

ছাত্রদের অভিভাবকেরা পত্র দিলেন—তাঁহাদের সন্তানদিগকে যেন হাতে পায়ে খাটিতে না বলা হয়। এইরূপ অসংখ্য আপত্তি আসিল। অনেকের বাপ মা স্কুলে স্বয়ংই আসিয়া হাজির। তাঁহারা চাহেন পুস্তক-শিক্ষা! যত পুস্তকের সংখ্যা ততই তাঁহাদের ধারণায় পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি।

দেখিতে দেখিতে আমার বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, আমার শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে এবং আমার নিজের বিরুদ্ধে বেশ একটা বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিল। পাড়ার লোকেরা, সহরের লোকেরা, জেলার লোকেরা, ছাত্রদের অভিভাবকেরা এবং ছাত্রেরা একাকী বা দলবদ্ধভাবে আমার নিন্দা ও অপমান করিতে লাগিল। তাহারা আমার ঐরূপ নূতন নিয়মে শিক্ষাপ্রচার চাহে না। আমি কিন্তু অটল অচল ও গম্ভীরভাবে রহিলাম। আমার মত পরিবর্ত্তন করিলাম না। অনেক ছাত্র নাম কাটাইয়া চলিয়া গেল। অনেকে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করিল। তথাপি আমি নড়িলাম না—আমার মত ধীরভাবে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। আমি নানাস্থানে যাইয়া অভিভাবকগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলাম। ক্রমশঃ লোকজনেরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমার ছাত্রসখ্যা ১৫০ হইল। দেখা গেল আলবামাপ্রদেশের সকল জেলা হইতেই টাস্কেজীতে ছাত্র আসিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশ হইতেও দুই চারিজন আসিয়াছে। মোটের উপর টাস্কেজী বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়া উন্নতির পথে দাঁড়াইল। আমার একটা অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল। আমার শিল্পশিক্ষা-নীতির জয় হইল।

"পোর্টার হল" নির্ম্মিত হইয়া গেল। সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের উপযোগী হইবার কিছু বাকি থাকিল। তথাপি আমরা শীঘ্র শীঘ্র গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করিয়া লইলাম। উত্তর অঞ্চলের একজন শ্বেতাঙ্গ ধর্ম্মগুরুকে এই উপলক্ষ্যে সভাপতির আসনে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাঁহার নাম রেভারেণ্ড রবার্ট সি বেড্‌ফোর্ড। তিনি আমার নাম পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই। যাহা হউক তিনি একজন অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি—আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিগ্রোজাতিকে উৎসাহিত করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যতম ট্রাষ্টী বা অভিভাবক ও রক্ষকরূপে কার্য্য করিতেছেন।

ইহারই কিছুকাল পরে টাস্কেজী বিদ্যালয়ে একজন কর্ম্মী পুরুষ হ্যাম্পটন হইতে আসিলেন। তখন হইতে বিগত ১৭ বৎসর কাল তিনি আমাদের হিসাব রক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁর নাম ওয়ারেণ লোগান। এই অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ যুবকের সাহায্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি উন্নত হইয়াছে।

আমরা "পোর্টার হলে" কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিলাম। এইবার আমরা ছাত্রাবাস সম্বন্ধে সবিশেষ উদ্যোগী হইলাম। দেড় বৎসর হইল টাস্কেজীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বহুদূর দেশ হইতেই ছাত্র আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছাত্রসংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগের গতিবিধি স্বভাব চরিত্র বুঝিবার জন্য বড় রকমের ছাত্রাবাসের আয়োজন করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই বুঝিয়াই আমরা এত বৃহৎ গৃহনির্ম্মাণে উৎসাহী হইয়াছিলাম। এতদিনে তাহার সুযোগ সত্যসত্যই আসিল।

পোর্টার হল তৈয়ারী করিবার সময়ে তাহাতে রান্নাঘর এবং ভোজন শালার কামরা রাখা হয় নাই। কাজেই নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইল। আবার ছাত্রদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করা গেল। স্থির করিলাম যে, গৃহের নীচে একটা গর্ত্ত করিতে হইবে। মেজে কাটিয়া মাটি তোলান হইল। একটা বড় গর্ত্তের মত জায়গা প্রস্তুত করিলাম সেই স্থানেই রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থা হইবে।

এখন ছাত্রাবাস চালান যায় কি করিয়া? কাজ আরম্ভ করিতে পয়সার প্রয়োজন। থালা বাটি টেবিল চেয়ার ইত্যাদি না হইলে ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলা ও ভোজনের রীতি শিখাইব কি করিয়া? বাজারে ধার পাওয়া সহজ নয়। ষ্টোভও নাই যে ভাল রান্না করা যাইবে। অগত্যা বাহিরেই কাঠ জ্বালাইয়া সেকেলে নিয়মে রান্না করান যাইতে লাগিল। বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময়ে যে সকল বেঞ্চের উপর রাখিয়া কাঠ পালিশ করা হইত সেই বেঞ্চগুলিকে খানা খাইবার টেবিল করা গেল। আর থালা বাটি বেশী সংগ্রহ করিয়া উঠা গেল না।

গৃহস্থালী চালাইতে কেহই জানে না বুঝিলাম। নিয়মিত সময়ে খাইতে হয় তাহাই ছাত্রদের জানা নাই। তারপর সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া সকল ছাত্রের সুখ সুবিধা বুঝিয়া কাজ করা সেত আরও কঠিন। প্রথম দুই তিন সপ্তাহ সকল বিষয়েই হট্টগোল চলিল—কেহ খাইতে পাইল, কেহ পাইল না। কেহ এক তরকারী কম, কেহ বা বেশী পাইল। কোন খাদ্যে নুন বেশী, কোন খাদ্য বেশী পুড়িয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত।

আমি এই সব দেখিতাম তথাপি উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইতাম না। ভাবিতাম দেখা যাউক, আপনা আপনি শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠে কি না। এক দিন সকাল বেলায় খাওয়া চলিতেছে। আমি ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি শুনিতে লাগিলাম। ছাত্রছাত্রীরা মহা হাল্লা আরম্ভ করিয়াছে। সকলের মুখেই বিরক্তির ভাব। কারণ সে বেলা কাহারই কপালে খাওয়া জুটিল না সমস্ত রান্নাটাই পুড়িয়া অখাদ্য হইয়া গিয়াছে। একজন ছাত্রী বকিতে বকিতে কূপের নিকট গেল। ভাবিয়াছিল কূপ হইতে জল তুলিয়া খাইবে এবং জল পান করিয়াই সকাল বেলার ভোজন শেষ করিবে। যাইয়াই দেখে কূপের দড়ি ছেঁড়া। তাহার জল পান করা হইল না। মহা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল "আঃ, এই স্কুলে একটুকু জল খাইতেও পাই না!" আমি নিকটেই ছিলাম সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একসময়ে আমাদের নূতন বন্ধু বেড্‌ফোর্ড টাস্কেজী বিদ্যালয়ের অতিথি হইয়াছিলেন। ভোর রাত্রে তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার নীচের ঘরে মহা গোলযোগ হইতেছে। ব্যাপার কি? ছাত্রদের প্রাতরাশ চলিতেছে। দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে পেয়ালায় কাফি খাওয়া আজ কা'র পালা? আগেই বলিয়াছি আমাদের তখনও বাসন কোসন থালা বাটি বেশী জুটে নাই। কাফি পান করিবার জন্য পেয়ালা সকলেই রোজ পাইত না। তিন চারিদিন পর এক এক জনের ভাগ্যে পেয়ালা পড়িত।

ছাত্রাবাসের এই দুর্দ্দশা অবশ্য বেশী দিন ছিল না। ক্রমশঃ আমাদের শৃঙ্খলা আসিল। এই সকল অসুবিধা, বিরক্তি, এবং দুঃখ ভোগের পর আমরা এখন অনেকটা সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছি। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ

কষ্টের মধ্যে না পড়িয়া উঠিলে আজ কি এত নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম?

আজ সেই পুরাতন ছাত্রেরা টাস্কেজীতে আসিয়া কি দেখে? অনেকগুলি বড় বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ। চকচকে টেবিল চেয়ার আসবাব পত্র। পরিপাটি গৃহস্থালী রন্ধন ও ভোজনের সুব্যবস্থা। যথাসময়ে ভোজন শয়ন। এইসব দেখিয়া অনেকেই আমাকে বলিয়াছে—"আমরা পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে দুঃখে কাটাইয়াছি। তাহারই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে দেখিতেছি এই সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ বুঝিতেছি,—অগ্রগামীদিগের দুঃখ স্বীকারেই ভবিষ্যৎ সমাজের সুখের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই টাস্কেজীর নিকট আমাদের শেষ শিক্ষা।" (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার ও তাহার ক্রমোন্নতি *

(Cajory's History of Physics অবলম্বনে লিখিত)

জগতের ক্রমপরিবর্ত্তনের সহিত বিজ্ঞান একদিন কতিপয় মানবের স্নেহক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া বর্ত্তমানে গৌরবের মধ্যাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষকে যেমন বাল্যাবস্থা হইতে বহুতর দুঃখ দৈন্য নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া, প্রতিদিন নৈসর্গিক প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় এবং মনুষ্যত্বলাভ করিতে হয় সেইরূপ বিজ্ঞান একদিন মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের দ্বারা সযত্নপালিত এবং রক্ষিত হইয়া ও বহুবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে জগতে তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে। একদিন মানব-সমাজে যাহা অবহেলার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহার যশঃ গৌরবের শুভ্রালোক মানবমণ্ডলীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মানবের বহু সাধনার মধ্য দিয়া কিরূপে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে সংক্ষেপে তাহারই ইতিহাস প্রদান করিতেছি।

বহু পুরাতনকালে অথবা মধ্যযুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের অস্তিত্ব আমরা কোন ইতিহাসে দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিক গ্যালেলিও এবং গিলবার্টের পূর্ব্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা কাহারও নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। সকলেরই বিশ্বাস ছিল গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক গিলবার্ট যে সময়ে Loadstone হইতে নীরেট সুগোল চুম্বক প্রস্তুত করাইয়া দেখাইলেন যে ঐ ক্ষুদ্র নীরেট পদার্থটী যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি পৃথিবীও তাহার চুম্বক শক্তির সাহায্যে অন্যান্য চুম্বককে আকর্ষণ করে, তাহার পরবর্ত্তীকাল হইতেই পৃথিবীতে পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করে। যখন গ্যালেলিও

* 'ছাত্রসম্মিলনে' পঠিত।

ইটালির পিসানামক নগরের স্তম্ভের উপর হইতে একটী ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পদার্থ ভূমির দিকে নিক্ষেপ করিয়া দেখাইলেন যে ইহারা একই সময়ে ভূমিস্পর্শ করে, তাহার পর হইতেই তৎকালীন Aristotalian মতবাদ পরিত্যক্ত হইল এবং বিজ্ঞান গবেষণার জন্য জগতে সূচিত হইল।

অনেকেই হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে অনেক বিখ্যাত যশস্বী মহাত্মা তৎকালে মনে করিতেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবনের বিশেষ অনিষ্টকর। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে কোন একজন লেখক Royal Society এর ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষপাতী হইয়া লিখিয়াছিলেন—"বৈজ্ঞানিক গবেষণা শিক্ষার অন্তরায় এবং শিক্ষাপরিষদের পক্ষে মারাত্মক হইবে না"। এইরূপ লিখিবার কারণ এই যে তৎকালে ধর্ম্মযাজকগণ বলিতেন 'সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবার্ট বয়েলের (Robert Boyle) গবেষণা ধর্ম্মের অনিষ্ট-সাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্তঃসার শূন্য করিতেছিল।

বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনাও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে প্রত্যেকের পৃথক্ গবেষণাগার ছিল। কোন কলেজে বা শিক্ষাপরিষদে বিজ্ঞান-গবেষণার কোন বন্দোবস্ত ছিল না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বেই রসায়ন এবং জ্যোতি-র্বিদ্যার জন্য গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি জার্ম্মণিতে 'Laboratonium' শব্দ অদ্যাপি 'Chemical Laboratory' বা 'রসায়নের পরীক্ষাগার' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ইউরোপে যত পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিবরণ প্রাপ্ত হই তাহার প্রায় সমস্তই Alchemy এবং জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলনের জন্যই নিয়োজিত হইত। তখনকার দিনে যাঁহারা রসায়নচর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহারা এমন একটী মহৌষধি আবিষ্কার করিতেন যেন তাহা দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এবং ধাতুসমূহকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়। ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিস নগরের Louvre গেলা-রিতে Flemish দেশীয় চিত্রকর Teneers কর্ত্তৃক অঙ্কিত একখানি চিত্র আছে। উক্ত চিত্রখানিতে চিত্রকর এক প্রশস্ত গৃহের মধ্যে Forge Furnacc, crucible এবং Retort অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। সেই সুবৃহৎ গৃহ-প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থিত একখানি টেবিলের চতুর্দ্দিকে রসায়নের উৎসাহদাতাগণ আসীন রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রসায়ন চর্চ্চার যত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ-গুলি হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, পরীক্ষা-সিদ্ধ গবেষণা বৈজ্ঞানিকগণ নিজ গৃহেই সম্পন্ন করিতেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে Berzelius এর মত বিখ্যাত রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ তাহার রন্ধন গৃহই বিজ্ঞান চর্চ্চার স্থানরূপে ব্যবহার করিতেন। যখন Gilbert এবং Gallilio এর চেষ্টায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ হইল, তখন তাহার পরীক্ষা-গার রন্ধনশালাতেই আরব্ধ হইয়াছিল। যখন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Robert Boyle তাহার "Boyle's law" নামক গ্যাসের স্থিতিস্থাপ-কতার তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি এরূপ একটী সুদীর্ঘ কাচের নল ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, তিনি গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত

উহাকে যথেচ্ছভাবে নাড়িতে পারিতেন না। নিউটন তাঁহার সূর্য্যালোক বিশ্লেষণের সমস্ত গবেষণাই কেম্ব্রিজনগরে স্বগৃহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। Benjamin Franklin ঘুড়ির সাহায্যে বিদ্যুতের গবেষণা শেষ করিয়া Philadelphia নগরে স্বগৃহে বিদ্যুৎ অপরিচালক একখণ্ড লৌহ রাখিয়া দিয়াছিলেন, যেন তিনি ইচ্ছামত সকল সময়ে বায়ুমণ্ডল তড়িত ভারাক্রান্ত হইলেই গবেষণাব্যাপারে নিয়োজিত হইতে পারেন।

আমি যে সময়ের বিবরণ প্রদান করিলাম সেই সময়ে বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার কেবল গবেষণার জন্যই ব্যবহৃত হইত। প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষায় তাহার কোন উপযোগীতা কেহই উপলব্ধি করিতেন না। এজন্য তৎকালীন শিক্ষাসংস্কারক Johan Amos Comenius বলিয়াছিলেন "মানুষকে জ্ঞানশিক্ষা যতদূর সম্ভব পুস্তক ভিন্ন বৃক্ষলতা ভূমি আকাশ হইতে দেওয়া উচিত। মানুষ যে কেবল অন্যের লব্ধ অভিজ্ঞতার বিষয় জানিয়াই সন্তুষ্ট হইবে তাহা নহে তাহাকে মৌলিক গবেষণাও করিতে হইবে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অম্লজান বাষ্পের আবিষ্কারক Joseph Priestly বলিয়াছেন "আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান আজিও এদেশে শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা যদি বিজ্ঞানানুশীলন করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে প্রয়াসী হই, তবে আমাদিগকে বাল্যকাল হইতেই যন্ত্রসাহায্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতে হইবে। এদেশের লোকদিগকে শিক্ষারম্ভ হইতেই গবেষণার নিয়ম-প্রণালী জানিতে হইবে এবং উক্ত কার্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের পরীক্ষাসিদ্ধ গবেষণা রাসায়নিক গবেষণার অনেক পরবর্ত্তী কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই ইহার যথার্থ কারণ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে একটী সুগম পথ। বিশেষতঃ মৌলিক ধাতুগুলিকে বিমিশ্রিত পদার্থ হইতে নিঃসৃত করিতে হইলে রসায়ন-বিজ্ঞানের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। অন্য একটী কারণ এই যে—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিতে বিপুল অর্থব্যয় ঘটিয়া থাকে।

তখনকার দিনে বিজ্ঞানের উপযোগীতা দেশের সম্ভ্রান্ত এবং ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ অনেকে স্বীকার করিতেন না। বিশেষতঃ তড়িৎবিজ্ঞান, বাষ্পের উপযোগীতা এবং চুম্বকের বহুবিধ ব্যাপার তখনও নিতান্ত বাল্যাবস্থায় থাকিয়া তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগেরই কেবলমাত্র কৌতূহল উৎপাদন করিত। রসায়নাগারে সাধারণতঃ মৃৎপাত্র, Bottle এবং Test-tube থাকিলে একপ্রকার কাজ চলিতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের জন্য যন্ত্র ক্রয় করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তিনশতবর্ষ পূর্ব্বে বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র এবং দূরবীক্ষণ ক্রয় করিতে বহু অর্থব্যয় ঘটিত।

বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দেওয়া প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়েই আরম্ভ হয়; তৎপরে তাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়াদিতে প্রসার লাভ করিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌বিন্‌ বলেন যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে Glasgow বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে

যন্ত্র-সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানাগার গুলির মধ্যে Liebig এর স্থাপিত বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারই ইহার জন্মাবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত অস্তিত্বরক্ষা করিতেছে। ১৮২৪ খৃঃ Liebig G'ssen বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহা নিশ্চিত যে স্কটল্যাণ্ড অপেক্ষা একমাত্র জার্ম্মণীতে রাসায়ন শিক্ষার প্রথম আন্দোলন তীব্রতর বেগে সংঘটিত হইয়াছিল। জগতে প্রায় সমস্ত দেশ হইতে Gissen নগরের ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানলাভের অভিপ্রায়ে ছাত্রগণ আসিয়া সমবেত হইত। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই Tubiguen, Bonu, Berlin এবং অন্যান্য স্থানে বিজ্ঞান-শিক্ষা ক্ষেত্র স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিল।

আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম নিউইয়র্ক নগরে Reussachusetts Polytechnic Institute বোষ্টন নগরে Massachusetts Institute of Technology প্রভৃতি বিজ্ঞানাগার রসায়ন শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে রীতিমত গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত।

এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিলাম—বৈজ্ঞানিক গবেষণা সর্ব্বপ্রথম লোকালয়ে জন্মলাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তাহার কৈশোর এবং যৌবন অতিবাহিত করিতেছে। জার্ম্মণীর রাজধানী বার্লিন নগরে Heimrich Gustav Magnus তাহার স্বগৃহে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার জন্য কয়েকজন ছাত্রকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন। Magnusও বাল্যবয়সে Liebig এর মত Berzelius এবং Gaybessac হইতে অত্যন্ত উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি বিজ্ঞান অনুশীলন কার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া অন্যকেও এই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি যে স্বগৃহে বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট হইতে আজিও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক জগতে মৌলিক গবেষণা হেতু যাঁহারা অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে G. H. Wiedemanu, Helmholtz এবং Tyndall প্রভৃতি Magnus এর শিষ্য ছিলেন। দিন দিন ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে Magnusএর গৃহে বিজ্ঞান-চর্য্যার স্থান অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠিল, এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহার বাসভবনই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানাগার-রূপে পরিণত হইল।

জার্ম্মণীতে উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণে ক্রমে আরও বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হইতে লাগিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে Philipp Gustav Jolly Huldelburg নগরে একটী বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিলেন। এই বিজ্ঞানাগারের যন্ত্র সমুদায় অল্পদিন পরে একটী যথোপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত হইল এবং এই নূতন স্থানেই—Kirchoff এবং Busen আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ কার্য্যে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্কটলণ্ডে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্ব্বপ্রথম ছাত্রদিগকে রসায়ন শিক্ষা দিবার জন্য বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল তাহাই নহে, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান

শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম যন্ত্রাগার স্থাপিত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কেল্‌ভিন্‌ প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের অনেককে মৌলিক গবেষণায় তাঁহাকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিলেন এবং অবশিষ্ট অনেকে অনাহুতভাবে স্বেচ্ছায় তাহা গ্রহণ করিল। এই সময়ে তাহাদের উৎসাহ এতাধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ছাত্রসংখ্যার আধিক্য প্রযুক্ত একদল রাত্রিতে এবং একদল দিবাভাগে ক্রমান্বয়ে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনুশীলনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু তখন গ্লাস্‌গো কিম্বা বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভেপ্সু প্রত্যেককেই বাধ্য হইয়া গবেষণা-কার্য্য করিতে হইবে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছার উপরে ইহা নির্ভর করিত।

একমাত্র আমেরিকার বোষ্টন নগরের Massachusetts Institute of Technology বিদ্যালয়েই বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম প্রচলিত হয় এবং উপাধিলাভ করিতে হইলে প্রত্যেককেই উপযুক্ততা দেখাইতে হইবে এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহার পরে লণ্ডন নগরে King's Collegeএর কর্ত্তৃপক্ষগণ বোষ্টনের Institute of Technologyএর সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া উক্ত নিয়ম প্রচলন করেন। ইংলণ্ডে Robert Bellany Cliftons বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপদেষ্টারূপে বিশেষ পরিচিত। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে Owens Collegeএ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে বিজ্ঞানানুশীলনের উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন করেন। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Clerk Maxwell কেম্ব্রিজ নগরে Cavendish Laboratory স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বৈজ্ঞানিক কারখানাটী পরিদর্শন করেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভীপ্সীত বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-গবেষণার বিভাগে ছাত্র সংখ্যা অল্প ছিল তবুও এই অল্প কয়েক জনের মধ্য হইতেই অধুনাতন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ দেখা দিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফ্রান্স বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। তবুও অধ্যাপক Welch বলিতে বাধ্য হইয়াছেন "ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ যথোপযুক্ত পরীক্ষাগারের অভাবে অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন"। সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষা-বিশারদ Benordএর মত বৈজ্ঞানিকও একটি সেঁতসেঁতে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গবেষণা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং তিনি নিজে ইহাকে—"বিজ্ঞানগবেষণাকারীদের কবরস্থান" আখ্যা দিয়াছিলেন। Gaylussac একটী সেঁতসেঁতে নিম্নতল প্রকোষ্ঠে পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং আর্দ্রতা হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করিতেন। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ণ উদ্যমের সহিত অনুশীলন এবং ছাত্র-শিক্ষাদান-কার্য্য করিতেন। বৈজ্ঞানিক Liebig তাহার আত্ম-জীবনচরিতে বলিয়াছেন "Gaylussac, Thenord এবং Dulong এর বক্তৃতায় কি যেন একটা মোহিনী শক্তি ছিল।.........

তাঁহারা যন্ত্র-সাহায্যে বক্তৃতার বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে ছাত্রদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন এবং ফরাসী ভাষা জ্ঞাত ছিলাম বলিয়া তাহাদের বক্তৃতায় বেশ আমোদ অনুভব করিতাম"।

Gaylussac Liebig কে তাঁহার স্বকীয় পরীক্ষাগারে গবেষণা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফরাসীতে সে সময়ে ছাত্রদের জন্য কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ছিল না। যাঁহারা মৌলিক গবেষণা করিতেন, তাঁহাদিগকে ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। Arago বলেন "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনেকের বিশ্বাস ছিল—যাঁহাদের মূল্যবান, সুমার্জ্জিত এবং কাচের বাক্সে সংরক্ষিত যন্ত্র নাই তাঁহারা যথার্থ বৈজ্ঞানিক নহেন। Dulog তাঁহার সমস্ত অর্থরাশি যন্ত্র ক্রয় করিতে ব্যয় করিয়াছিলেন। Frensel স্বকীয় ব্যয়ে তাহার সমুদায় অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার সমূহ স্বগৃহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে Rue-Fosses Saint-victor নগরে তড়িদ্বিজ্ঞানবিশারদ Ampere এর ক্ষুদ্র গৃহে একখানি প্লেটিনাম ধাতুর তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে উহা যে magnetic meridianএ স্থিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য বহু পণ্ডিত অত্যন্ত কৌতূহল-পরবশ হইয়া সমবেত হইয়াছিলেন।

বহুবৎসর পর্য্যন্ত ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাগার ও তাহার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির অভাবে অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগীয় মন্ত্রী Duruy এই সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর করিতে প্রয়াসী হইলেন। শীঘ্রই ফ্রান্সে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের মৌলিক গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাহার ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপিত হইল। M. Darboux এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "গত বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকল্পে প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এই উদ্দেশ্যে পদার্থবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া-গৃহ-নির্ম্মাণ এবং তাহার বিস্তৃতিসাধন করা হইয়াছে ও তন্মধ্যে বহুমূল্য যন্ত্রাদি সুরক্ষিত হইয়াছে।"

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পুরাতন Sorbonne নগরে একটী প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হয়। J. Jamin মরণাবধি ইহার পরিচালক ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহা New Faculty of Science এর গৃহে স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহা বিজ্ঞানবিদ্ Lippmann এর গবেষণাবলে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পরীক্ষাগারগুলির উন্নতি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Massachusetts Institute of Technology নামক বিদ্যালয়ই সর্ব্বপ্রথম যন্ত্র সাহায্যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতি William Barton Roger ছাত্রদিগকে রীতিমত পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে নিয়ম প্রচলন করেন। এই সময়েই উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Edward C. Pickering এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন সভাপতি J. D. Runkle উহার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমরা কালক্রমে

রসায়নের মত পদার্থবিজ্ঞানেরও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিব।"

Pickering একবৎসর কাজ করার পর দেখিলেন যে এক সময়ে অনেক ছাত্রকে একই কাজে নিয়োগ করিলে বহু যন্ত্রের আবশ্যক হয় এবং যন্ত্রাদি নানাস্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার দরুণ অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। শেষোক্ত দোষটী দূর করিবার জন্য তিনি দুইটী প্রকোষ্ঠ উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে এবং তাহাতে গ্যাসের ও জলের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তাব করিলেন ও যন্ত্রগুলি স্থানান্তরিত না করিয়া টেবিলের উপর দৃঢ়বদ্ধ করিতে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার যুক্তি-যুক্ত প্রস্তাব অন্যান্য বিদ্যালয়ও গ্রহণ করিল। এই সময়ে Pickering বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকায় চারিটী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগার আছে; আমার বিশ্বাস অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।" Pickeringএর ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও আমেরিকার কলেজগুলিতে বিজ্ঞান অনুশীলনের বন্দোবস্ত বহুপরেই সাধিত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃঃাব্দ পর্য্যন্ত হারবার্ড কলেজে বিদ্যুৎপরিমাপক যন্ত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না; এজন্য অধ্যাপক Towbridge অধ্যাপক Cook এর স্বকীয় ভাণ্ডার হইতে গবেষণা করিবার জন্য Cosine Galvonometer ধার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানাগারের অধিকাংশগুলি গত ২০ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ছয়টী এরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আজকাল যুক্তরাজ্যের বিদ্যালয়গুলির মধ্যেও এতই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে পূর্ব্বে কোন কলেজেও এরূপ ছিল না।

ছাত্রদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে এপর্য্যন্ত দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এই দ্বিবিধ উপায়ের কোন একটী বা উভয়টীই আজকাল প্রত্যেক স্কুল কলেজে অবলম্বন করা হইয়া থাকে। প্রথমটী এই যে—ছাত্রদিগকে এক সময়ে একই পরীক্ষায় লিপ্ত হইতে দেওয়া এবং দ্বিতীয়টী—প্রত্যেককে একই সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতে দেওয়া। এই উভয়বিধ উপায়েই কোন না কোন দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথমটীর দোষ এই যে—প্রত্যেককে এক সময়ে একই পরীক্ষা করিতে দিলে একপ্রকার বহুযন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু অধ্যাপক বা শিক্ষকগণ পরীক্ষণীয় বিষয়টী সকলের নিকট এক সময়ে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এজন্য অতিরিক্ত সময় নষ্ট করিতে হয় না। দ্বিতীয় উপায়টীর দোষ এই যে—শিক্ষককে প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পরীক্ষার বিষয়টী পৃথক্‌ভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়। ইহাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার সুবিধা এই যে ইহাতে এক প্রকার বহুযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং একই স্কুল বা কলেজে স্বল্পব্যয়ে বিবিধ প্রকার যন্ত্রের সংরক্ষণ চলিতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মণী এবং ফ্রান্স অপেক্ষা আমেরিকায় যুক্তপ্রদেশের স্কুল সমূহেই বিজ্ঞান-চর্চ্চার সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ এবং আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে নিজব্যয়ে জাতীয় বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ কোন মনোযোগ দেন

নাই। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার ফল স্বরূপ ইংলণ্ডে Davy-Faraday-Research Laboratory এবং Royal Institute, জার্ম্মণীর Charlottenberg নগরে Physio-Technical Institute এবং ফ্রান্সে এক শতাব্দী পূর্ব্বে Sonservatoire des arts et meters ও প্যারিস নগরে Electrical Testing Laboratory স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Royal Institute এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার সম্বন্ধে একজন ইংরাজ লিখিয়াছিলেন "আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য Royal Institute এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছে; তাহা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও করিতে পারে নাই। Young, Davy এবং Faraday—জগতের মধ্যে এই তিনজন অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের প্রভূত পরিশ্রম ও শিক্ষাদান বলে ইহা বাস্তবিকই জগতের সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটনবাসী ইহাকে 'Pantheon of Science' বা 'বিজ্ঞানমন্দির' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।" ১৮০০ খৃষ্টাব্দে Royal Institute এ অভিনয়ক্ষেত্র, যন্ত্রের নমুনা-গৃহ এবং কর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়। প্রথমাবস্থায় ইহাতে সকল প্রকার যন্ত্রের নমুনা ছিল। Rumford প্রথমে এই Royal Institute ফলিত-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে স্থাপন করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলে শিল্পবিভাগের অবনতি ঘটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-গবেষণার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যে ইহাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপিত হইলে Sir Humray Davy, Faraday এবং Tyndall এর আবিষ্কার পরম্পরার বলে ইহা বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। ইহার যথার্থ উন্নতি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল।

Dr. Ludwig Mondএর বদান্যতার বলে ইহার পরিবর্দ্ধন সম্পাদিত হইল এবং তৎসংস্রবে সাধারণ লোক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 'Davy Faraday Research Laboratory' নামে একটী বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা Lord Releigh এবং অধ্যাপক J. Dewar এর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত রহিয়াছে। অধুনা জগতের মধ্যে ইহাই প্রধানতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানানুশীলনে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী সকলের নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—জার্ম্মণীতে Charlottenburg নগরে Physio Technical Institute বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইহার স্থাপন কল্পে Werner Siemens ৩৯০৬২৫ টাকা দান করিয়াছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Helmholty ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে এই বিজ্ঞানাগারে কেবলমাত্র যে বিজ্ঞানানুশীলন হইয়া থাকে তাহা নহে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী প্রভূতপরিমাণে বিবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ফরাসী দেশে একশতাব্দি পূর্ব্বে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য Conservatoire des arts et meters স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় ইহাতে বাণিজ্যোপযোগী সাধারণ যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত এবং সময়ে সময়ে শিল্পীদিগের নিকট ফলিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতাদান করা হইত পরবর্ত্তীকালে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আঠারটী জাতীর সমবেত চেষ্টায় সাধারণ ওজন ও পরিমাপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'অন্তর্জাতিক সমিতি' গঠিত হয় এবং তদনুসারে প্যারিস নগরের নিকট Pavillon de Bretenil নামক স্থানে পরিমাপ যন্ত্র ও ওজন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে একটী সুবৃহৎ বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত।

নব্য-বিলাতের স্বদেশ-সেবক

ইংরাজ নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্তই চিন্তিত। কেহ পল্লীর শোচনীয় অবস্থা হৃদয়-বিদারক ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন। কেহ নগরবাসীদিগের দারিদ্র্য-চিত্র উচ্চ-সাহিত্যে প্রচার করিতেছেন। আধুনিক ইংরাজী বৈষয়িক ও সামাজিক সাহিত্য পাঠ করিলে বুঝা যায় আজকালকার বিচক্ষণ ইংরাজেরা স্বদেশ সেবায় জনগণকে ব্রতী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

কেহ বলিতেছেন "আমাদের শারীরিক শক্তি কমিয়া যাইতেছে—ইংলণ্ড শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।" কেহ বলিতেছেন, "আমাদের শতকরা ৩০ জন লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ইহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?" কেহ বলিতেছেন "আমাদের শ্লীলতা, সংযম, চক্ষুলজ্জা থাকিবে কোথা হইতে ?—আমাদের বিবাহিত জনগণের জন্য শয়ন গৃহই নাই! দেশে বাড়ীঘরের অভাব যৎপরোনাস্তি। স্ত্রীপুরুষেরা ঘরকন্না করিবার সুযোগ পায় না। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী নরনারীগণের জন্য সস্তায় স্বাস্থ্যকর গৃহ প্রস্তুত করিয়া না দিলে আমাদের সমাজ অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" কেহ বলিতেছেন, "দেশ যে ফোঁপরা হইয়া গেল লোকজন পল্লীত্যাগ করিয়া নগরে আসিতেছে—নগরেও সুখ না পাইয়া দূর বিদেশে যাইতেছে।"

খাওয়া পরার দুরবস্থা, ঘর বাড়ীর অভাব, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, অকাল-মৃত্যু, চরিত্রনাশ, লোক-জনের দেশত্যাগ এই সকল বিষয় লইয়া নানা পণ্ডিত বহুপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গুলি পাঠ করিলে ইংলণ্ডকে দুঃখ দারিদ্র্যময় অবনত দেশ ভিন্ন আর কিছু বিবেচনা করা কঠিন। ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা এত বেশী কি না সন্দেহ হয়! ইংরাজসমাজ অস্থিকঙ্কালসার জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সেনাবিভাগে যত লোক কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার ভিতর শতকরা ৫০ জন লোক অসুস্থ, পীড়িত, এবং আইনানুসারে সেনাবিভাগের অযোগ্য। ১৯০০ সালের সেনাবিভাগের কার্য্যবিবরণী হইতে রাউন্‌ট্রি তাঁহার বিখ্যাত দারিদ্র্যচিত্র "Poverty" নামক গ্রন্থে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানাইতেছেন :—

"The health and physical development of one-half of the recruit who applied for enlistment in the British Army during 1900 was *below the Comparatively low standard* required by the Army authorities, and it must be remembered that even this does not adequately measure the low standard of health

amongst the working classes generally, for only those men were sent up for medical examination who were "reasonably probable" to be passed by the Army doctors."

শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য অর্জ্জন করা অন্য কারণেও অত্যাবশ্যক। তাহা না হইলে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। Temperance Problem and Social Reform নামক "মাদকতা নিবারণ এবং সমাজ সংস্কার" বিষয়ক গ্রন্থে রাউন্ট্রি এবং শারওয়েল বলিতেছেন—

"Within the last thirty years Germany, Belgium and even Russia have transformed themselves economically. The two former specially are now highly developed industrial states claiming a large share of the world's markets, while we are as face to face with the unprecedented condition of the United States. The conditions of industrial competition are, therefore, wholly changed, and the question of efficiency mental and physical has become one of paramount importance.

At present our most highly equipped and therefore most formidable competitors are our kinsmen across the Atlantic. America is commercially formidable, not merely because of her gigantic enterprise and almost illimitable resources, but because, as recent investigations have shown, her workers are better nourished, and possess a relatively higher efficiency."

এই ভাবনা ইংরাজ সমাজের মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। ১৮১৫ সাল হইতে ইংরাজ জগতের একমেবাদ্বিতীয়ং রূপে বিরাজ করিতেছেন। শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে রুশিয়া ও জার্ম্মাণির প্রতিদ্বন্দ্বিতা পদে পদে তাঁহাকে বাধা দিয়াছে। আজ ১৯১৪ সাল—শতাব্দী পূর্ণ হইল—ইতিমধ্যে ইংরাজ ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারই নাম জগতের চঞ্চলতা—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।"

ইংরাজ স্বদেশ-সেবকেরা প্রধানতঃ এই কয়টি প্রস্তাব তুলিয়াছেন—

(১) পল্লীজীবনের উন্নতিবিধান

(২) কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের প্রবর্ত্তন

(৩) পারিবারিক বন্ধনে দৃঢ়তা ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব আনয়ন।

আজকালকার স্বাস্থ্যহানি, চরিত্রহানি এবং লোকক্ষয়ের কারণ সম্বন্ধে ইঁহাদের মত—

(১) নগরে জীবনযাপন

(২) বিশাল কারখানা ও ফ্যাক্টরীর প্রভাবে শ্রমজীবীদিগের মনুষ্যত্ব লোপ

(৩) বিবাহিত জীবনে শিথিলতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা।

দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় আদর্শের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাই শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ-সমাজের লক্ষ্য হইয়া পড়িবে। অবনত পদ-দলিত জাতিই প্রবল রোম সাম্রাজ্যকে খৃষ্টধর্ম্ম দান করিয়াছিল। সুতরাং ভারতবাসী,

কোন বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে ব্যাপারটা তলাইয়া মজাইয়া বুঝুন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাষ্প এবং যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। শিল্প ও ব্যবসায়ে এই সমুদয়ের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পূর্ণরূপে দেখা দেয়। তাহার ফলেই ইংলণ্ডের সকল প্রকার সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশাল সাম্রাজ্যের বাজার একচেটিয়া ভাবে ইঁহারা ভোগ করিয়াছেন। এই জন্যই ল্যাঙ্কাশিয়ার ও ইয়র্কশিয়ারের নগরগুলিতে বৃহদাকার ফ্যাক্টরীর 'মৌচাক' সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র ইংলণ্ডের ⅙ অংশ লোক এই প্রদেশের ৮।১০ টা নগরে জমা হইয়াছে!

নরনারীদিগের জীবন অতি বিষাদময়, বৈচিত্র্যহীন, সৌন্দর্য্যশূন্য, একঘেয়ে কর্ম্মে প্রত্যেকের জীবন অতিবাহিত হয়। পরিবারের সুখ দুঃখ দেখিবার সময় মাতারও নাই, পিতারও নাই। কারখানার গোলাম এবং যন্ত্রের সেবক সেবিকারূপে ইহারা জীবন-ধারণ করে।

ফ্যাক্টরীর মালিকেরাও বেশী কিছু দেখেন না। তাঁহারা যে মাল জোগাইতেছেন তাহার কাট্‌তি যথেষ্ট থাকিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। তাঁহারা সর্ব্বদা কাট্‌তি ও বাজার অন্বেষণ করিতেছেন। যতই সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকরূপে বিস্তৃত হইয়াছে ততই ইঁহাদের বাজার দৃঢ় ও বড় হইয়াছে, ততই ইঁহারা ফ্যাক্টরীর কল যন্ত্রগুলি বাড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন; ততই শ্রমজীবীরা নির্জ্জীব পদার্থের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে, সাম্রাজ্য-নীতির প্রভাবেই ফ্যাক্টরী-নীতি সফল হইয়াছে। সাম্রাজ্য না থাকিলে এই সকল বিশাল ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিত না।

সস্তায় মাল জোগানই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক কলের নিয়ম এই যে, কারবার যত বড় হইবে খরচ তত কমিতে থাকিবে। শ্রমবিভাগ নীতি তত বেশী প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। তত অল্প সময়ে বেশী মাল বাজারে ফেলা যাইবে। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্যাক্টরীর আকার বাড়িয়াই চলিয়াছে। দুইজন একজন মহাজনের আওতায় ("Trusts") সকল ব্যবসায়ই আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ফ্যাক্টরী-গুলি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করিতেছে।

সাম্রাজ্য বাড়িয়াছে, কল কারখানা বাড়িয়াছে, সম্পদ বাড়িয়াছে, অথচ সুখ ত বাড়িতেছে না, ইংলণ্ডের দারিদ্র্য ত কমিতেছে না। বরং যে পরিমাণে সাম্রাজ্য ও ফ্যাক্টরী, সেই পরিমাণেই দারিদ্র্য! বুথ সাহেব লণ্ডনের শ্রমজীবীদিগের বৈষয়িক অবস্থা তন্ন তন্ন ভাবে আলোচনা করিয়া ৫ খণ্ডে পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ শতকরা ৩২ জন ইংরাজ অর্দ্ধাশনে থাকে। ইয়র্ক নগরের শ্রমজীবী-দিগের জীবনও ঠিক এইরূপই শোচনীয়। এ কথা রাউন্ট্রি সাহেবের তথ্য সংগ্রহের ফলে জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বার্ম্মিংহাম নগরের শ্রমজীবী-সমাজ-বিষয়ক গ্রন্থেও দরিদ্রের করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছি।

শিল্পবিপ্লবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া উন-বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইল। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ হইল ইংরাজ জাতির সর্ব্ব-নাশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া। চার্লস্‌ বুথের Life and Labour in London গ্রন্থ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

কাজেই ইংরাজ এখন স্তম্ভিত ভাবে ফ্যাক্টরী-নীতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "কোন্ পথে চলি ?" ইহাই ইংরাজের কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। উনবিংশশতাব্দীর পথে চলিলে অল্পকালের ভিতরই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

সংসারের এই পরিবর্ত্তন সম্যক্ বুঝিয়া হিন্দু প্রচার করিতেন :—

"রাঙা ফলেতে আর ভুলিব না বার বার
খাইয়ে দেখেছি তায় কিছুই নহেক তার
সে যে পূরিত গরলে খাইলে কুফল ফলে।"

ইংরাজ ইহা বুঝিয়া কি করিতেছেন? সমাজধ্বংসের কাল আগত প্রায় ভাবিয়া দরিদ্র নরনারীদিগের জন্য ইহাঁরা যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হইয়াছেন। নগরসংস্কার, স্বাস্থ্যোন্নতি, গৃহ নির্ম্মাণ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মিউজিয়াম গঠন ইত্যাদি নানাবিধ লোকহিত-বিধায়ক কর্ম্মে তাঁহারা জলের মত টাকা খরচ করিতেছেন। শ্রমজীবিসমাজে বিবাহ বন্ধন সুখময় করিবার নিমিত্ত ইহাঁরা সচেষ্ট হইয়াছেন। যাহাতে ইহাদের অবকাশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যাহাতে ইহারা কর্ম্ম হইতে বেশীক্ষণ বিরাম ও শান্তি পায় তাহার ব্যবস্থা আইন দ্বারা করা হইতেছে। দেশের বৈষয়িক জীবনে, ধনী দরিদ্রের সম্বন্ধে, প্রভুভৃত্যের ব্যবহারে কতকগুলি নূতন আদর্শ, নূতন লক্ষ্য এবং নূতন লক্ষণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের চিহ্নগুলি দেখিলে মনে হইবে যে, এদেশে আবার একটা নব্য শিল্প-বিপ্লব সাধিত হইতে চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ফ্যাক্টরী যুগ ছাড়াইয়া ইংরাজ জাতি এক নূতন ধরণের বৈষয়িক অবস্থায় প্রবেশ করিতেছে। বিংশশতাব্দীর এই সমীপবর্ত্তী শিল্প-বিপ্লব পূর্ব্বতন বিপ্লব হইতে কোন বিষয়ে হীন মনে হইবে না।

লোকহিতব্রত, দরিদ্রসেবা এবং পরোপকারের অনুষ্ঠানগুলি হইতে ইংলণ্ডের বৈষয়িক বিপ্লব মাত্র সাধিত হইবে না। ইংরাজের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও একটা বিপ্লব আসিতেছে। স্ত্রী-স্বামীর সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, ব্যক্তিগত জীবনের চরম লক্ষ্য, মানবের কর্ত্তব্য ইত্যাদি মনুষ্যত্বতত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তাগুলিও অভিনব ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। এই নব্য সমাজ ও পরিবার বিলাতের পক্ষে একটা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ বিবেচিত হইবে। বার্ণস্, স্কট, কার্লাইল, রাস্কিন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ গত শতাব্দীতে নবযুগ আনিয়াছিলেন। বিংশশতাব্দীর মধ্য ভাগেও ইংলণ্ডে এইরূপ একটা যুগান্তর সাধিত হইবে বোধ হইতেছে।

সম্প্রতি চিন্তাক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-জগতে সামান্য সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। মানবসেবা, পরোপকার, লোকহিত, ইত্যাদি কর্ম্মক্ষেত্রেই নবযুগের আবাহন বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি। যাঁহারা উনবিংশ-শতাব্দীতে বিজ্ঞান ফলাইয়া শতকরা ৩০ জন নরনারীকে অর্দ্ধাশনে রাখিয়াছেন তাঁহারাই বিংশশতাব্দীতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানা উপায়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবা আরম্ভ করিয়াছেন। দরিদ্রসেবার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডে আজ কাল সংখ্যাতীত।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, ইংলণ্ডে সমাজ সেবা, লোকহিত, পরোপকার ইত্যাদি কর্ম্ম সাধারণ জনগণ নিজে করিয়া থাকে, তাহা নয়। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই বিলাতের স্বদেশসেবক এবং লোকহিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, উৎসাহদাতা ও অর্থ সাহায্যকারী।

কেবল বিদ্যাদান কেন, জলদান, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান ইত্যাদি দ্বারা দরিদ্র জনগণের সকল প্রকার অভাব মোচন করিবার ভার গবর্ণমেণ্ট লইয়াছেন। ইংলণ্ডে কোন বড় কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য ও পরিচালনা ব্যতীত হয় না।

ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা জানেন যে, একমাত্র জার্ম্মাণির জনগণই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী এবং সাহায্য প্রত্যাশী। সত্য কথা, ইংলণ্ডও জার্ম্মাণির আদর্শে সকল কর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, শাসন এবং পরিচালনা প্রবর্ত্তন করিতেছে। ইংরাজ জাতির রাষ্ট্র দিন দিন ছাত্র ও যুবকগণের অভিভাবক, কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের মা বাপ, নরনারীগণের চরিত্রের সংস্কারক, এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, ও বিজ্ঞানের "সংরক্ষক" হইয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণ-সমাজের আদর্শ ইংরাজসমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আজকালকার লয়েড জর্জ্জ ইংলণ্ডের জার্ম্মাণ নীতি প্রচারক।

দরিদ্রের ক্রন্দন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদিগের কর্ণে কিরূপে উঠিল? শ্রমজীবীদিগের পক্ষ অবলম্বনকারী পার্লামেণ্ট সভ্যেরা (Labour Party) এখনও প্রবল হইতে পারে নাই। এখনও ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী এবং ভূস্বামীদিগের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করা ইংলণ্ডে অসম্ভব। পয়সাওয়ালা লোকদিগের কথায়ই লোকেরা উঠে বসে—তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই জাতীয় মহাসভার সভ্যপদ পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সমাজ যে ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে, স্বাস্থ্যের অভাব, শক্তির অভাব, অন্নবস্ত্রের অভাব, চরিত্রের অভাব যে জনগণকে অধঃপতিত করিতেছে তাহা বুঝিতে কাহারও আর বাকী নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, দারিদ্র্য-সমস্যা ইংরাজ-সমাজে মহাসমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। লেখক, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ধনবিজ্ঞানবিৎ, সকলেই ইহা বুঝিতেছেন। এ কথা সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজেই পার্ল্যামেণ্টেও দরিদ্রের পক্ষ অবলম্বন করা অনিবার্য্য। মোটের উপর, সমস্ত মহাসভাই কিছু না কিছু দরিদ্র পক্ষের বন্ধু হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিগত ১০।১৫ বৎসরের ভিতর বিলাতে যতগুলি আইন জারি হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই এই দারিদ্র্য-সমস্যা হইতে উত্থিত। তাহার ফলে পার্ল্যামেণ্ট, টাউনসভা, কাউন্টি সভা, পল্লীসভা, ইত্যাদি সকল সভাই দরিদ্রগণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। অভাবগ্রস্ত ছাত্রদিগকে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে খাওয়ান আজকাল প্রত্যেক নগরে মহাকর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। খরচ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে দেওয়া হয়। প্রয়োজন হইলে বুট, জামা, টুপি, মোজাও বিতরণ করা হয়। মাঝে মাঝে স্কুল ও কারখানার বালকবালিকাদিগকে সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হয়। নগরের অসুস্থ নরনারীগণকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করান হয়। সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

এতদ্ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে কড়া আইন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ১২।১৫ বাড়ীতে একটি মাত্র জলের কল এবং পায়খানা থাকিত। এক্ষণে প্রত্যেক গৃহে কল ও পায়খানা রাখিবার আইন জারি হইয়াছে। কারখানার গৃহগুলি স্বাস্থ্যকররূপে প্রস্তুত করা এবং সর্ব্বদা সেইরূপ রাখার ব্যবস্থা হইতেছে ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কারখানার শ্রমজীবীদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য দুই স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের এই অভিভাবকোচিত শাসন কেবল নগরেই আবদ্ধ নয়—পল্লীতে এবং কৃষিক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইতেছে। কৃষকদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিভূমির মালিক করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য মনে করেন। ধনী ভূম্যধিকারীদিগকে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের জমি কৃষকগণের নিকট বিক্রয় করান হয়।

তাহা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সের লোকমাত্রকে পেন্সন দেওয়া হইতেছে। তাহাও গবর্ণমেণ্ট ঘাড় পাতিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি জার্ম্মাণির জীবনবীমা প্রণালীও ইংলণ্ডে অবলম্বিত হইল। কারখানার শ্রমজীবীরা যাহাতে দৈবক্রমে কর্ম্মহীন এবং অসুস্থ হইলে অনাহারে মারা না যায় তাহা দেখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন।

ফলতঃ ধনী মহাজনগণের উপর কড়া আইন করিয়া, তাঁহাদের ধনসম্পত্তির উপর অধিকহারে কর বসাইয়া, দরিদ্র অভাবগ্রস্ত নরনারীর স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য বিলাতের রাষ্ট্রকে সচেষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহার নাম Socialistic State. বিলাতের রাষ্ট্রমণ্ডলে Small Holdings Act, Factory Acts, Allotment Acts, Old Age Pension, Progressive Taxation, Feeding of the Poor, Unemployment ইত্যাদি বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য বিশেষরূপেই আলোচিত হইয়া থাকে। এখানকার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলনসমূহও এই সকল আলোচনার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত।

ম্যাঞ্চেষ্টার ফ্যাক্টরীর মৌচাক, আবার ম্যাঞ্চেষ্টারই দরিদ্র-সেবক সোশ্যালিষ্টদিগের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র! ম্যাঞ্চেষ্টার নগরই নব্য শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রথা আবিষ্কার করিয়াছে। ধন বিজ্ঞান এবং ফ্যাক্টরী জীবনের জন্ম এই নগরেই হইয়াছিল। তাহার সুফল-কুফল ঐশ্বর্য্য-দারিদ্র্য উভয়ই এখানে চরম আকারে দেখা দিয়াছে। একদিকে বিজ্ঞানাবলম্বিত শিল্প ও ব্যবসায় এবং অপর দিকে স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, গৃহহীন, চরিত্রহীন, কুলীসমাজ, এই নগরেই আবার কুলীসমাজের জন্য ধনীদিগের দয়ার্দ্র মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে।

মানুষ এক হাতে নিজের ব্যাধি আহ্বান করিয়া আনে, অপর হাতে তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম"—এই নীতি কি মানব সংসারে প্রচলিত হইতে পারে না? মানব সভ্যতার এই বিচিত্র ধারা কি বিস্ময়জনক! সহজ পথে সভ্যতা প্রবাহ অগ্রসর হইলে কত শক্তির অপব্যয় বাঁচিয়া যাইত!

এক্ষণে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংরাজ আইনের পরিচয় দিব। মিউনিসিপ্যালিটির খরচে Infant Life Preservation Committee, Health Visitors Society, Ladies' Health Society ইত্যাদি নানা সেবকসমিতির কার্য্য পরিচালিত হয়। ১৯১২ সালের মিউনিসিপ্যাল কার্য্যবিবরণী হইতে নিম্নের তথ্য উদ্ধৃত হইল:—

"In 1909 a cleaning Station was opened by the Sanitary Committee * * * for the cleaning of the verminous children. School children found to be in a verminous condition are sent by the Education authorities to the Cleansing Station, and at the same time a notice to this effect is sent to the Medical Officer of Health, who refers the case to the

Health Visitor for that District. It is her duty to visit and report to the Medical Officer for health upon the condition of the house, and especially of the bedrooms and bedding. She is required to inspect all the children in the house, whether of school age or under, and to instruct the mother or person in charge, as to treatment, also to continue to visit at regular intervals until she can report that all the house has been cleansed, the bedclothes washed, and the children kept clean. This work has to be specially arranged, as those children who attend school can only be seen during the dinner hour on Saturday, and frequently when the Health Visitor calls to inspect the house and children she finds that the family have removed, and much time is spent in trying to trace them. If after making full inquiries, the family cannot be found, a letter is sent to the School Medical Officer asking him to obtain the correct address.

Those cases which come outside the area worked by a Health Visitor are undertaken by a Nurse specially appointed to deal with them, or by the District Sanitary Inspector. Then, again it has been found advisable to pay monthly visits to delicate children threatened with phthisis or children of consumptive parents. The object of these visits is to see that the children get medical advice and treatment in time, and that they are sufficiently clothed and fed. In order to ensure the latter, it is sometimes necessary to send warning letters to the parents, or in cases where poverty is causing suffering, efforts are made to procure assistance either from the Board of Guardians District Provident Society or other agency."

কালিদাস আদর্শ হিন্দু নরপতির বর্ণনা করিয়াছেন :—

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষনাদ্ ভরণাদপি।
সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

নব্য বিলাতের মিউনিসিপ্যাল কর্পরেশন সেই আদর্শ রাষ্ট্রের কর্ম্মই করিতেছেন মনে হইতেছে। যে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হইলে সমগ্র রাষ্ট্র প্রতাপশালী হইবে বিবেচনা করা যায় একমাত্র সেই দেশেই এইরূপ "সংরক্ষণ-নীতি" অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড বুঝিয়াছেন যে, জনগণকে হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল না করিতে পারিলে তাঁহারা জগতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। এই জন্যই তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সমগ্র রাষ্ট্রই নব্য বিলাতে সমাজ-সেবক ও স্বদেশ-সেবক। এজন্য ওখানে জনসাধারণ প্রবর্ত্তিত সেবা-সমিতি, রামকৃষ্ণ-মিশন, সোশ্যালসার্ভিস্‌লীগ ইত্যাদির বেশী আবশ্যক হয় না।

বঙ্গের ঐতিহাসিক

(১০৩৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

রমাপ্রসাদ বাবুর সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করিব। তিনি ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য পত্রিকায় "আর্য্য" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"কাহারা আর্য্য? * * বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; এবং সেইরূপ আলোচনার সূচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।"

১নং আলোচনা—"ঋগ্বেদে দুইশ্রেণীর লোক আর্য্যনামে অভিহিত হইয়াছেন; একশ্রেণী—অথর্ব্বা, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গোতম, কশ্যপ, অগস্ত্য, কণ্ব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষির বংশধরগণ। আর এক শ্রেণী—যদু, তুর্ব্বস, অনু, দ্রুহ্যু, পুরু, ক্রিবি, রুশম, চেদি, ভরত, তৃৎসু, সৃঞ্জয় প্রভৃতি বংশীয় যোদ্ধা বা যজমানগণ। এই সকল আর্য্যগণ ঋগ্বেদে আপনাদিগকে একই বীজপুরুষের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন নাই। যদিও ঋষিরা অনেক স্থলে বৈবস্বত মনুকে 'পিতা মনু' বা আমাদের পিতা, অর্থাৎ মানবজাতির বীজ-পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণের মধ্যে অধিকাংশকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেব বংশাবতংস বলা হইয়াছে *।"

রমাপ্রসাদ বাবু একটু শ্রম স্বীকার করিলেই জানিতে পারিতেন, তিনি যে দুইশ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাঁহারা একই বীজ-পুরুষের বংশোদ্ভব। ব্রহ্মা বীজ-পুরুষ, তাঁহার নয়টী মানস পুত্র, যথা, "ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ। * * * ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ আপনাকেই আত্মসম্ভূত অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু করিলেন †।" এই প্রজাপালক স্বায়ম্ভুব মনুই ক্ষত্রিয় এবং পূর্ব্বোক্ত নয়জন ব্রাহ্মণ। ঋষি ও দেবগণের বংশে কোন প্রভেদ নাই। কারণ "কখন ঋষিগণের পুত্র দেবতা, কখন দেবগণের পুত্র পিতৃগণ; আবার কখন বা দেবপুত্রগণই ঋষি হইতেছেন ‡।" সুতরাং ইহাঁরা সকলেই এক বীজপুরুষ ব্রহ্মার বংশজাত।

২নং আলোচনা—"ঋগ্বেদোক্ত বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের 'শ্বিত্বং চ' এবং পতঞ্জলির (গৌরঃ শুচ্যাচারঃ পিঙ্গলঃ কপিলকেশঃ ইত্যেতানপ্যভ্যন্তরান্ ব্রাহ্মণ্যে গুণান্ কুর্ব্বন্তি) এই উক্তি একত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, বৈদিক আর্য্য-সমাজে একদল শ্বেতাঙ্গ ছিল; এবং কণ্বের 'শ্যাব' বিশেষণ হইতে দেখা যায়, আর একদল লোক শ্যামাঙ্গ ছিল। শ্যামাঙ্গও শ্বেতাঙ্গ জনসঙ্ঘের মধ্যে নিকট জ্ঞাতিত্বের কল্পনা কঠিন। এই নিমিত্তই হয় ত আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ ছিলেন, তাঁহারা বরুণ, প্রজাপতি বা অগ্নির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, এবং শ্যামাঙ্গ আর্য্যগণকে বৈবস্বত মনুর বংশধর সাধারণ মানবের শ্রেণীতে গণনা করিয়া গিয়াছেন §।"

* সাহিত্য ১৩১৯। ২৮০ পৃষ্ঠা।

‡ বায়ু পুরাণ ৬১ অঃ ২১ শ্লোক।

† বিষ্ণু পুরাণ ১। ৭। ৫, ১৪ শ্লোক।

§ সাহিত্য ১৩১৯। ২৮২ পৃষ্ঠা।

কম্বের শ্যাবত্ব সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু ঋগ্বেদের ১০।৩১।১১ ঋক প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঋকে লিখিত আছে—

"কথিত আছে, কণ্ব ঋষি নৃসদের পুত্র। সেই অন্ন সম্পন্ন শ্যামবর্ণ কণ্ব ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নি সেই শ্যামবর্ণ কণ্বের জন্য দীপ্তিযুক্ত নিজ উধঃ স্ফীত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থাৎ অগ্নির জন্য আর কেহই তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নাই।" (রমেশ)।

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রমাণেই দেখা যাইতেছে এই কণ্ব ঋষি নৃসদের পুত্র। নৃসদ নামে কাহাকেও বৈবস্বত মনু বংশে দেখা যায় না। অতএব এই নৃসদের জন্ম যে বৈবস্বত মনু বংশে, তাহাই প্রথমে প্রমাণ করা আবশ্যক। তিনি তাহা করেন নাই, অথচ বৈবস্বত মনুর বংশকে শ্যামাঙ্গ বলিয়াছেন। সুতরাং এই আলোচনা বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে না।

৩নং আলোচনা—"ঋগ্বেদে যদু ও তুর্ব্বস, অনু পুরু ও দ্রুহ্যুর সহিত একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। নির্ঘণ্টু নামক প্রাচীন বৈদিক অভিধানে যদু, অনু, তুর্ব্বস, দ্রুহ্য ও পুরু মনুষ্য শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বা জাতিবাচক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতে যদু প্রভৃতি শব্দ জাতিবাচক নহে, ব্যক্তিবাচক,—যযাতির পাঁচ পুত্রের নাম। জাতিতত্ত্বের হিসাবে মহাভারতোক্ত রাজা যযাতি ও তাঁহার পাঁচ পুত্র বিষয়ক আখ্যানের অর্থ যদু, তুর্ব্বস, অনু, দ্রুহ্য ও পুরুগণ এক বংশোদ্ভব বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অনু, দ্রুহ্য ও পুরুগণ হয় ত আদৌ যদু ও তুর্ব্বসগণের জ্ঞাতি ছিলেন এবং বেবিলনের দিক হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন *।"

যদু, তুর্ব্বস, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু এই পাঁচজন রাজা যযাতির পুত্র, ইহা মহাভারতের কথা। নির্ঘণ্টুতে ঐ পাঁচ নাম জাতিবাচক দেখিয়া রমাপ্রসাদ বাবু গোলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাই তিনি মহাভারতের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই তাই তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "অনু, দ্রুহ্য ও পুরুগণ "হয় ত" আদৌ যদু ও তুর্ব্বসগণের জ্ঞাতি ছিলেন।" একজনের পাঁচ পুত্রের বংশ যে জ্ঞাতি তাহা প্রকাশ করিতে "হয় ত" শব্দের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় অধিক আলোচনার আবশ্যক, হঠাৎ যা তা লেখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আমাদের দেশে যা তা লিখিলেই ঐতিহাসিক হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গন্ধ থাকিলেই হইল।

অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট আমরা যত উপকার পাইয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইতিহাস আলোচনার পথ তাঁহারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে ইতিহাস লিখিতে হয়, তাহা তাঁহাদের নিকট আমরা শিক্ষা করিতেছি। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বলিয়া অন্ধের ন্যায় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? তাঁহাদের গবেষণার ফল আমরা গ্রহণ করিব বটে, কিন্তু নিজে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিব। এই যাচাই কার্য্যে নিজের দেশের শাস্ত্রজ্ঞান থাকা চাই, কারণ এই শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াই তাঁহারা ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের যে মত আমরা ঠিক বলিয়া বুঝিতে পারিব, কেবল তাহাই লইব। যা তা লইব কেন?

* সাহিত্য ১৩১৯। ৭৫৮ পৃষ্ঠা।

রমা প্রসাদ বাবু নিজের দেশের শাস্ত্রগুলি পরিশ্রম করিয়া আলোচনা করিলে অধ্যাপক উইঙ্কলার (Winckler) এবং অধ্যাপক ডাক্তার ভন লুশনের বক্তৃতায় ভুলিতেন না, তাঁহাদের কথা যাচাই করিয়া লইতেন।

তিনি লিখিয়াছেন—"প্রাচীন মিটেনি রাজ্যের অনতিদূরে, এসিয়া মাইনরের পূর্ব্বাংশ হইতে পারস্যের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুর্দ্দিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে আর্য্য ভাষাভাষি গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশ মনুষ্য অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার ফেলিক্স্ ডন লুশন ত্রিশ বৎসর কাল পশ্চিম এসিয়ার জাতি-তত্ত্বের ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া অনুসন্ধানের ফল ১৯১১ সালের হক্সালি স্মারক বক্তৃতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—কুর্দ্দিগণ অধিকাংশই গৌরাঙ্গ কপিল কেশ (fair hair) বিশিষ্ট, তাঁহাদের মস্তক দীর্ঘ, অর্থাৎ মস্তকের প্রাশস্ত্য ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত ৪/৫ এর ন্যূন। ইনি উপসংহারে বলিয়াছেন 'অতএব কুর্দ্দগণ আর্য্য আক্রমণকারীগণের বংশধর, এবং ৩৩০০ বৎসরেরও অধিককাল আপনাদিগের ভাষা এবং আকৃতি অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন *।"

কুর্দ্দগণ কোথা হইতে পশ্চিম এসিয়ায় আসিয়াছেন, অর্থাৎ আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান কোথায়, ডাক্তার লুশন এ প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—ইউরোপের উত্তরাংশের অধিবাসিগণের (Nordic Race) উৎপত্তি যে দেশে, কুর্দ্দগণের উৎপত্তিও সেই দেশে। গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশ ভারতীয় আর্য্যগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, কুর্দ্দিস্থান ভিন্ন এসিয়ার আর কোথাও ইহাদিগের জ্ঞাতিগণের বংশধর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহারাও এই একই দিক হইতে—পশ্চিম এসিয়া হইতে—স্থলপথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন †।" গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশ ভারতীয় আর্য্যগণের, আদিম মিটেনিগণের ও কুর্দ্দগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একদেশবাসী ও এক গোত্রীয় হইতে পারেন, কিন্তু আর্য্যগণ পশ্চিম এসিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি ?

বোধ হয় এই লুশন সাহেবের বলেই একদিন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"যে সময়ে বেদের বরুণ দেব ভ্রূণমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ এবং যে সময়ে ঋগ্বেদের ঋষিগণের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বাসস্থান খুজিয়া হয়রান হইতেছিলেন, সেই সময় কালদীয়গণ পারস্যোপসাগরের উপকূলে ইউফ্রেতিসের মোহানায় সুরম্য এরিধু নগরীতে মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ 'ইয়া' দেবতার পূজায় রত ছিলেন, সে আজ খৃষ্টপূর্ব্ব সাড়ে চারি সহস্র বৎসরের কথা আমি এই **ইয়া দেবতার দোহাই দিয়াছি। বেদের ধমক আমার নিকট পৌঁছাইবে না।** (!) বেদে পৃথিবী সচলা হউন আর অচলাই হউন বিনোদ বাবুর অতদূর অগ্রসর হইবার অধিকার নাই। ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ হইলেও মানবজাতির আদি

* সাহিত্য ১৩১৯। ৭৫৯

† সাহিত্য ১৩১৯।৭৬০ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ নহে। আমাদের হাতে যে মালমসলা আছে তাহাতে আর্য্যজাতির ভারত প্রবেশ ঠেলিয়াও খৃষ্ট পূর্ব্ব পনেরো শত বৎসরের ওপারে লওয়া চলিবে না। নইলে তাহা ইতিহাস হইবে না *।" (!)

এটা কার আজ্ঞা? বোধ হয় ইয়াদেব আর অধ্যাপক লুশন সাহেবের আজ্ঞা! কারণ তিনি বলিয়াছেন "কুর্দ্দগণ ৩৩০০ বৎসরের অধিককাল আপনাদের ভাষা অটুট রাখিয়াছেন। ৩৩০০—১৯০০=১৪০০ খৃঃ পূঃ + ধীরেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহলব্ধ ১০০= ১৫০০ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। এইরূপ পরিশ্রম-কাতর তৈয়ারী খানার প্রত্যাশী ঐতিহাসিক নাম লব্ধেচ্ছুগণের দ্বারাই এদেশের ইতিহাস নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অক্ষয় বাবু যথার্থই বলিয়াছেন—"যে কেহ লিখিতেছেন—যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন" ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪নং আলোচনা—"ঋগ্বেদে লিখিত আছে ইন্দ্র. তুর্ব্বস ও যদুকে সমুদ্রপার করাইয়া আনিয়াছিলেন। কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "সমুদ্র" শব্দ সাগর অর্থে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা মনে করেন, ঋষিরা সিন্ধুনদের সুপ্রশস্ত দক্ষিণাংশকে সমুদ্র সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ মনে করিবার একমাত্র কারণ, আর্য্যেরা উত্তর-দক্ষিণদিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এই দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার। ক্ষণকালের জন্য এই সংস্কার ত্যাগ করিয়া বিবেচনা করিলে, ঋগ্বেদ ব্যবহৃত "সমুদ্র" শব্দকে প্রকৃত সমুদ্র অর্থে গ্রহণ করিবার কোনও বাধা থাকে না †।"

এইরূপ আলোচনাবলে রমাপ্রসাদ বাবু সিদ্ধান্ত করিলেন—"আরব সাগরের অপর পার হইতে আর্য্যভাষাভাষী ইন্দ্র উপাসক (ইন্দ্র কর্ত্তৃক আনীত) আগন্তুকগণের জলপথে আসিয়া সৌরাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভব নহে ‡।" কিন্তু একটু বিশেষরূপ আলোচনা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন সিন্ধুনদীর দক্ষিণাংশ বাস্তবিক সমুদ্র ছিল, এবং সে সমুদ্রকে ঋগ্বেদের ব্যবহৃত সমুদ্র শব্দের প্রকৃত সমুদ্র অর্থে গ্রহণ করিবার কোন বাধা দেখা যায় না। যে রামায়ণকে তাঁহারা আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, সুগ্রীব পশ্চিমদিক্‌গামী বানর-দিগকে বলিয়াছেন—সৌরাষ্ট্র, বিশালনগর প্রভৃতি ও পশ্চিমবাহিনী সরিৎ সকল, তপস্বী-দিগের অরণ্য সমুদয়, কান্তারযুক্ত গিরিসমূহ, তত্রত্য মরুভূমি অন্বেষণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলে তিমি নক্র প্রভৃতি জলজন্তু সমূহে সমাকুল সমুদ্র দেখিতে পাইবে। পরে মুরচীপত্তন, জটীপুর, অবন্তী অন্বেষণ করিয়া যে স্থলে সিন্ধু ও সাগরের সঙ্গম হই-য়াছে, তথায় শতশৃঙ্গবিশিষ্ট বিশাল সোমগিরি দেখিতে পাইবে।" পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমান "সোলেমান পর্ব্বতকে" সোম-গিরি বলেন §। সুতরাং সোলেমান পর্ব্বত হইতে হালা পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে সমস্ত ভূভাগেই রামায়ণের সময় সমুদ্র ছিল। ঐ স্থানের ভূস্তরই এখন তাহার সাক্ষী দিবে এবং রামায়ণ যে কতদিনের গ্রন্থ তাহাও জানাইয়া দিবে।

রামায়ণ মহাভারতাদির এবং পুরাণ ও কুলজী প্রভৃতির কোন মূল্যই নাই বলিয়া ইহারা সে সমস্ত পাঠরূপ শ্রম হইতে অব্যাহতি

* প্রবাসী ১৩১৮।১।২০৫ পৃষ্ঠা। † সাহিত্য ১০১১। ৭৫৬ পৃষ্ঠা। ‡ সাহিত্য ১৩১১। ৭৫৭ পৃষ্ঠা।

§ A Note on the Ancient Geography of Asia, By Nabin Chandra Das M. A. Page 62 (Note).

লাভ করিয়াছেন। তবে আবশ্যক হইলে উপর উপর দুই একটা খণ্ড প্রমাণ লইতে ছাড়েন না। কিন্তু সেটা "কিছু নহে" প্রমাণ করিবার গরজে। গৌড়-রাজমালা লেখক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বংশাবলী এবং মহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায় আদিশূরের নাম নাই দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক এই দুই গ্রন্থে আদিশূরের নাম না থাকিবারই কথা। কারণ ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে কুলবিধি প্রচলনের পরবর্ত্তী বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাই শিশু গাঙ্গুলী প্রভৃতির বিবরণ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে আদিশূরের নাম না থাকিবারই কথা। মহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকাও অনেক পরে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত, তাই তাহাতে আদিশূরের নাম নাই, কিন্তু তিনি যে গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আছে। হরিমিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে—

কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতিশ মেধাতিথিশ্চ বীতরাগ সুধানিধিঃ।
সৌভরি স চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে *॥

ইহার পূর্ব্বে আরও শ্লোক আছে। কুলজ্ঞদিগকে এইগুলি কণ্ঠস্থ করিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা যত বাদ দিতে পারেন, তাহাতে ত্রুটী করেন না। তাই মহেশ "ক্ষিতিশ" হইতে স্বীয় গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব এই দুই গ্রন্থ আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহারের অযোগ্য। এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া পাঠকের মনে ধোঁকা ধরাইয়া দেওয়া ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য নহে। রমাপ্রসাদ বাবু অবলীলাক্রমে লিখিয়াছেন—আমার পরীক্ষিত রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ মধ্যে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী" গ্রন্থে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের কোন উল্লেখ নাই। ধ্রুবানন্দ "নত্বা তাং কুলদেবতাং" ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন—

"আম্রিতো বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাং শিশো মকরন্দশ্চ জাহ্নবাখ্যঃ সমা ইমে॥"

মহেশের "নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায়"—

"ক্ষিতিশো তিথিমেধা (চ) বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥"

এই পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে, আদিশূরের ন'ম নাই।" (গৌড়রাজমালা ৫৭ পৃষ্ঠা)। মহেশের শ্লোকে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি হরিমিশ্রের কতক বাদ দিয়া কতক লইয়াছেন। অতএব এই দুই প্রমাণ উপস্থিত না করাই রমাপ্রসাদ বাবুর উচিত ছিল। আদালতে উকীল মোক্তারগণ নিজ নিজ পক্ষের উপকারী কথা বিচারকের নিকট উপস্থিত করেন, ঐতিহাসিকের পক্ষে সেরূপ করা বড়ই দোষের কথা। তাঁহার মনে কোনরূপ পেঁচ থাকা উচিত নহে। কুলজী গ্রন্থকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে, এই পণ করিয়া ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করা ঐতিহাসিকের উচিত নহে। নিরপেক্ষভাবে লিখিতে বসিলে সত্য মিথ্যা সমস্ত আপনিই ধরা পড়িয়া যায়। ঐতিহাসিকের পক্ষে একটা ধারণা লইয়া ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করা, এবং যে কোন উপায়ে সেই ধারণাকে বজায় রাখিতে চেষ্টা করা বড়ই অন্যায়। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিক-প্রণালীর ধূয়া ধরিয়া অনেকেই এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৯ সালের ১ম খণ্ড প্রবাসীর ৩৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ খণ্ড, প্রথমাংশ ১০৪ পৃষ্ঠা।

"এখন এমন একটা সময় আসিয়া পড়িয়াছে যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। খোদিত লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, লক্ষ্মণ সেন ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলগ্রন্থসমূহ হইতে এবং 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুৎসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ১০৮১ শকে বল্লাল সেন অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ও ১০৯১ শকে তিনি 'দানসাগর' রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হইতে পারে না। একপক্ষে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক খোদিত লিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি ও অপর পক্ষে খৃষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত কতকগুলি কুলশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষের গ্রন্থ। কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অদ্যাপি ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য হয় নাই, কিন্তু 'দানসাগর' বা 'অদ্ভুত সাগরে'র বচনগুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য। বোম্বাইয়ের, কাশ্মীরের বা বঙ্গদেশের সমস্ত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বল্লাল সেন এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া তাহার পরে আধুনিক নাগরী বা বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থদ্বয় লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশত বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই গ্রন্থ কতবার লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বল্লাল সেন এতদ্দেশে আভিজাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভিজাত্যের অনুরোধে এখনও পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্য সমাজে কৃত্রিম বংশ-পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই অভিজাত্যাভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় কত শত কুলশাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোন তারিখ সত্যপ্রমাণ করাইবার জন্য, কোন ব্রাহ্মণ হয় ত 'অদ্ভুত-সাগর' ও 'দান-সাগরে' মানবাচক শ্লোক কয়টি রচনা করিয়া যোগ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থসমূহের অনুলিপি নানা দেশে নীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলি নাই, তখন সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' ব্যতিত 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' এইরূপ মানবাচক কয়েকটি শ্লোক আছে, কিন্তু সেগুলিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি কেহ কোনদিন সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রাম পাল' চরিতের ন্যায় অথবা মহীপাল দেব, নরপাল দেব, বিগ্রহপাল দেব বা হরিবর্ম্ম দেবের রাজ্যকালে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার' ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকগুলি আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন উহা ইতিহাসক্ষেত্রে সাদরে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। কোন স্থান অন্ধকার থাকিলে আলোকের আবশ্যক হয়, কিন্তু স্বতঃ আলোকিত ক্ষেত্রে আলোক আনিলে তাহা ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ অক্ষরতত্ত্ব বা মুদ্রাতত্ত্ব প্রমাণের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্যের প্রমাণ উপস্থিত করিলে, তাহা গ্রাহ্য হইবার আশা থাকে না। বাল্যস্মৃতি-জড়িত বল্লাল সেন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিলে তাহা

সহজে গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। চিরশ্রুত-নামা 'দান-সাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' গ্রন্থদ্বয়ে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিলে হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগে। বংশগত আভিজাত্যাভিমান আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে। যদি কোন স্বদেশীয়, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কোন অংশকে পরবর্ত্তীকালের রচিত বলিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে কুলাঙ্গার বলিয়া মনে হয়। জীবনের লক্ষ্য সার সত্যের অনুসন্ধান নেত্র-পথ হইতে অপসৃত হয়, সুতরাং জাত্যাভি-মানজড়িত ঘটনার বিশ্লেষণ, বিদেশীয়ের হস্তেই অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়।"

ইনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন— "শশাঙ্কের শত শত সুবর্ণমুদ্রা বঙ্গদেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কতক-গুলিতে 'শশাঙ্ক' এবং কতকগুলিতে 'নরেন্দ্র গুপ্ত' নাম পাওয়া যায়। ডাক্তার বুলার বলিয়াছেন যে 'হর্ষচরিতের' একখানি হস্ত-লিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে 'নরেন্দ্র গুপ্ত' নাম দেখিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শশাঙ্কের অপর নাম 'নরেন্দ্র গুপ্ত' এবং তিনি মগধের গুপ্তবংশ সম্ভূত। মগধের গুপ্তরাজ বংশের কোনও খোদিত লিপিতে অদ্যাপি শশাঙ্কের বা নরেন্দ্র গুপ্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই।"

রাখাল বাবু লক্ষ্মণ সেনের সময় নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পরেও বহু বৎসর লক্ষ্মণ সেন জীবিত ছিলেন। নিজের অক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া, প্রাচীন প্রমাণগুলিকে অতল জলধি-জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। ভাবেন নাই যে একখানা হস্তলিখিত পুঁথিতে যদি কোন শ্লোক না থাকে, আর সেই শ্লোক যদি শত শত হস্তলিখিত পুঁথিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, হয় ত সেই লেখকটি খেয়ালের বশে, প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে না পারিয়া, শ্লোকটী বাদ দিয়াছেন—ভাবেন নাই যে রাম চরিতের উপর জোর দিয়া সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রকে ত্যাগযোগ্য বলিয়াছেন, সেই রামচরিতই ত্যাগযোগ্য, কারণ ঠিক সমসাময়িক তাম্র-শাসন সহ তাহার মিল নাই *—ভাবেন নাই যে, বুলার সাহেবের নিকট যে একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে "নরেন্দ্র গুপ্ত" লিখিত শুনিয়া, শশাঙ্ককেই নরেন্দ্র গুপ্ত করিয়াছেন, সেই পুঁথিতে লেখক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ নামটী লিখিতে পারেন, সুতরাং শত শত পুঁথিই ঠিক হইতে পারে, একখানি পুঁথি ঠিক নাও হইতে পারে। এইরূপ লেখক দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হওয়া সুদূরপরাহত। ইঁহারা বরং প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের অন্তরায় স্বরূপ। ইহারা পরিশ্রম করিয়া, পাকা জহুরির ন্যায় রত্ন চিনিয়া বাহির করিতে নারাজ, অথচ পাকা জহুরী বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব। তাই এইরূপ লোকের দ্বারা ইতিহাস নষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ নিতান্ত শ্রমকাতর। তাই তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ ও পুরাণাদি না পড়িয়াই বলেন তাহাতে কিছু নাই— আবার যাহা লইতে ইচ্ছা করেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন। রাখাল বাবু মানসী পত্রিকার ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসের সংখ্যায় আমার আদিশূর প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ডাঃ ষ্টাইন রচিত রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদের ভূমিকা আমাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি ষ্টাইন সাহেবের

* শ্রাবণ মাসের গৃহস্থ পত্রিকা।

এই ভূমিকার বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি। ইনি চীন ইতিহাসের সহিত মিল করিবার জন্য রাজতরঙ্গিণীর সময় ২৫ বৎসর পিছাইয়া দিয়া রাজতরঙ্গিণীকে একেবারে মাটী করিয়াছেন। আমাদের দেশের "তৈয়ারী খানাপ্রত্যাশী" ঐতিহাসিকগণ অবনত মস্তকে ষ্টার্ইন সাহেবের মত গ্রহণ করিয়া আহ্লাদের সহিত তাহা প্রচার করিতেছেন, এবং পণ্ডিত কহ্লন বেচারীর উপর কতই কঠোর মন্তব্য ঝাড়িতেছেন। কিন্তু যদি তাঁহারা একটু পরিশ্রম করিয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন ষ্টার্ইন সাহেব বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় যে যে ঐতিহাসিক তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই ভ্রম পথে চালিত হইয়াছেন। কিন্তু এ আলোচনার পথ তাঁহারা নষ্ট করিয়া বসিয়া আছেন। রামায়ণ কিছু না, পুরাণ কিছু না, মহাভারত কিছু না ইত্যাদি "কিছু না" শব্দদ্বারা তাঁহারা প্রমাণগুলি অতল জলধিজলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। পুরাণাদির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন ষ্টার্ইন সাহেব কোন স্থানে কি ভুল করিয়াছেন। তাই বলি ঐতিহাসিক যদি পরিশ্রম করিতে কাতর হন, তবে তাঁহার দূরে থাকাই উচিত। যিনি ঐতিহাসিক হইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি সমস্ত গ্রন্থই মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।" এই বাক্যটী তিনি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, অথবা রাখাল বাবুর মত স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধারের ভার বিদেশীয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন।

রাখালবাবু কিন্তু অন্যরূপে ইতিহাসের অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি এখন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সাজিয়াছেন। এ পন্থা মন্দ নয়, কারণ এখন তিনি উপন্যাসের আবরণে ইতিহাসের সর্ব্বনাশ করিলেও উপন্যাস বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। তাই "শশাঙ্ক" নামক উপন্যাসে দামোদর গুপ্তের পুত্র মহাসেন গুপ্তকে মগধে বসাইয়াছেন, শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত ও মাধব গুপ্তকে তাঁহার পুত্র করিয়াছেন। স্থানীশ্বররাজ প্রভাকর বর্দ্ধনকে সম্রাট মহাসেন গুপ্তের ভাগিনেয় করিয়াছেন। যিনি তাম্রশাসন এবং শিলালিপির মধ্যে বসিয়া থাকেন, তাঁহার দ্বারা ইতিহাসের এমন সর্ব্বনাশ এই বঙ্গদেশেই শোভা পায় এবং এরূপ লেখকের আদর এই বঙ্গদেশেই হয়।

রাখাল বাবু প্রবাসীতে "ধর্ম্মপাল" নামে একখানি উপন্যাস ক্রমশ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে তিনি গোপালকে বরেন্দ্রের রাজা করিয়াছেন। তাঁহার একথাও আমরা সমর্থন করিতে পারি না। তিনি তাঁহার কল্পিত বরেন্দ্র রাজ গোপালের রাজধানী করিয়াছেন, মালদহ জেলার অন্তর্গত গৌড়। বোধ হয় এই সাহসেই তিনি গোপালকে "বরেন্দ্ররাজ" করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে ঐ গৌড় কতদিনের?

ঐতিহাসিকেরও এ চিত্র আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না। তাম্রশাসন ও শিলালিপির মধ্যে বসিয়া থাকিলেই হয় না, ঐতিহাসিক হইতে হইলে কঠোর পরিশ্রম করা চাই।

অক্ষয় বাবু যথার্থই বলিয়াছেন—"আবিষ্কার চেষ্টার সঙ্গে দুইটী কার্য্যের সম্পর্ক রক্ষা অপরিহার্য্য—অনুসন্ধানের জন্য অধ্যয়ন এবং অধ্যয়নের জন্য অনুসন্ধান। একের অভাবে অপর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না।"

আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ অধ্যয়ন-ক্লেশ স্বীকার করিতে একেবারে নারাজ। তাঁহারা সে কার্য্যটী বিদেশীয়ের স্কন্ধে দিয়া কেবল অনুবাদ করিয়া বাহাদুরী লইতে চান। ঐতিহাসিকের এ রীতি নহে। ঐতিহাসিক যাহা গ্রহণ করিবে তাহা যথাসম্ভব যাচাই করিয়া লইবে। কেবল অনুবাদে ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা বেশী। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

অভিব্যক্তির কারণনির্ণয়ে ল্যামার্কীয় সিদ্ধান্ত

"Nothing in natural history seems to be surer than evolution, and yet the final solution of evolutionary problems defies the most subtle skill of the trained analyst of nature's order."

বিবর্ত্তনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ; তবে কি ভাবে যে এই বিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তদ্‌সম্বন্ধে এখনও কোন অদ্বিতীয় মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। কারণের প্রকৃতিই কার্য্যের গতিনিয়ামক, অতএব প্রাণবিজ্ঞানবিদ্‌গণ সম্প্রতি অভিব্যক্তির কারণ নির্ণয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদই অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান্। এই মতবাদ চার্লস্ ডারুউইন্ ও ওয়ালেসের স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারা উভয়েই ম্যাল্‌থাসের "Essay on population" পাঠ করিয়া একই ভাবে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। "Weismann is more Darwinian than Darwin himself" অর্থাৎ স্বয়ং ডারুউইন্ অপেক্ষা ভাইজ্‌মান্ অধিকতর ডারুউইন্‌বাদী—এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন মূলে ঠিকই রহিয়াছে; তবে পরবর্ত্তী উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ক আবিষ্কারের ফলে কি প্রকারে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কার্য্যকারী হয় তদ্‌সম্বন্ধে নানা পরস্পরবিরোধী গবেষণার সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্‌সত্বেও কতকগুলি সত্য অভ্রান্তরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

জঁা বাপ্‌টিষ্টে পির্ (১৭৪৪—১৮২৯ খৃঃ) সাধারণতঃ শেভালিয়ে ড্যে লামার্ক্ নামে খ্যাত, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পারিনগরের Jardiu des plauts (জাঁর্ডে ডে প্লাঁট্) নামক বৈজ্ঞানিক উদ্যানে প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার উদ্যম ও আগ্রহের ফলে অনতিকালমধ্যেই প্রাণিবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগাংশে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। জাতির স্থিরতানুমোদক প্রাচীন বিশ্বাসের মূলে তিনিই প্রথমতঃ কুঠারাঘাত করেন। এবং তিনিই সর্ব্বাগ্রে জাতীয় চরিত্রের চাঞ্চল্য উপলব্ধি করেন। এই মুহূর্ত্তেই বিবর্ত্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

বিবর্ত্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে য্যারিষ্টোট্‌ল্ ও ডারুউইনের মধ্যবর্ত্তীকালে

ল্যামার্ক্ই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কোন গ্রন্থেরই তদ্‌প্রণীত Philosophy Zoologique (ফিলোসোফি জুলোজিক্) এর সহিত তুলনা হইতে পারে না। যেরূপ অবস্থা-বৈষম্যে তিনি এই কার্য্য সমাধান করেন তাহা চিন্তা করিলে কেহই এই ধীমানের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। অধিকন্তু তাঁহার উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান হইতে জন্তুজগতে মনোনিবেশ করার অত্যল্পকালমধ্যেই এই গ্রন্থপ্রণয়ন শেষ হয়। তিনি যেরূপ পক্ষ-পাতিত্বের সহিত সমালোচিত হইয়াছেন এরূপ আর কেহই হন নাই। অতি-প্রশংসা ও স্বল্প-প্রশংসা উভয়ই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তথাপি জার্ম্মেণির হিকেল্ ও অন্যান্য মহোদয়-গণ, তাঁহার স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ ও বর্ত্তমান কালে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক লেখকের নিকট তিনি শ্লাঘনীয়। এমন কি স্বয়ং ডারুউইন্ তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতরাজি হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের গবেষণার কেন্দ্রস্থল।

যাহাই হউক, লামার্ক-প্রচারিত কারণ-সমূহ বিবর্ত্তনবাদে বস্তুতঃ ক্রিয়াশীল কি না বর্ত্তমান প্রাণবিজ্ঞান তদ্‌সম্বন্ধেই সন্দিহান্! বাস্তবিকই যদি বিবর্ত্তনমার্গে ইহাদের কোন মূল্য না থাকে তথাপিও ল্যামার্ক প্রাণ-বিজ্ঞানের মতবাদসমূহের ইতিহাস প্রধান স্তম্ভ। আর যদি তদ্‌প্রচারিত হেতুবাদ অভিব্যক্তির প্রকৃতি-নিয়ামক-স্বরূপ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিকতর জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। এই শ্লাঘনীয় আসন ডারুউইনের বড় নিম্নে হইবে না।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে তদ্‌প্রণীত Hydrogeology (হাইড্রোজেওলোজি) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁহার ভূতাত্ত্বিক যুক্তিরাশি লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানেই সর্ব্ব প্রথমে Biology বা প্রাণবিজ্ঞাণ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই বৎসরেই Recherches sur l'organisation des corps Vivants (রেশার্শ্ সুর্ লো'র্‌গানিজাসিওঁ ডে কোর্প্ ভিভাঁ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রাণোৎপত্তি, জীবিত পদার্থের বর্দ্ধনশীলতা; এবং ইহার ক্রমবিকাশশীল উপকরণরাশি আলোচিত হইয়াছে।

তিনিই সর্ব্বপ্রথমে অতিপ্রাকৃতিক সৃষ্টি-বাদে আস্থাহীন হইয়া অন্যতর কারণ নির্ণয়ে নিযুক্ত হন। তিনি বলেন প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহে কতকগুলি বিধান নিয়োজিত রহিয়াছে। এই বিধানরাজি প্রাণোন্মেষণের স্তরে স্তরে প্রকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ তাহাদের নিয়মাবলীর আশ্রিত। প্রকৃতি অপ্রতিহত প্রভাবে ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবের সৃষ্টি করিতেছে। বাহ্যিক শক্তিপুঞ্জ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারে না। তবে তদ্দ্বারা বহুবিধ পরাবর্ত্তন সাধিত হয়। তাহা হইতেই প্রাণের রেখায় বা জীবাভিব্যক্তিতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক জন্তোদ্ভিদ যে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও জীবনযাত্রার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা তিনি সর্ব্বৈব অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবসমূহ তাহাদের স্বভাবের সঞ্জাত ফল মাত্র। গগনবিহারী প্রাণিগণকে গগন-পর্য্যটনের জন্য পক্ষপ্রদান করা হয় নাই, শূন্যমার্গে উড্ডীন হইবার চেষ্টাই তাহাদের পক্ষোৎপাদনের কারণ।

ফিলোসোফি জুলোজিক্ এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Histoire Naturelle (ইষ্টোয়ার্ নাটুরেই) গ্রন্থে অভিব্যক্তির প্রামাণিকতা, প্রকৃতি ও তাহার উৎপাদক সম্বন্ধে তৎকালোচিত চূড়ান্ত মীমাংসা করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্র-চতুষ্টয় সর্ব্বপ্রধান :—

প্রথম সূত্র,—পদার্থমাত্রই তদন্তর্নিহিত প্রাণের শক্তি কর্ত্তৃক বর্দ্ধিতাকার প্রাপ্ত হয়; এবং প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এই শক্তিদ্বারা সেই সেই জীবের স্বভাবোপযুক্ত সীমায় নীত হয়।

দ্বিতীয় সূত্র,—যে কোনও অঙ্গোৎপত্তি জীবনযাত্রার নূতন অভাবানুভূতির ফল। এইরূপ অভাব সর্ব্বদাই অনুভূত হইতে থাকে।

তৃতীয় সূত্র,—অঙ্গবিশেষের সম্বর্দ্ধণ ও কার্য্যকারিতা উহার ব্যবহারের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট।

চতুর্থ নিয়ম,—জীবনযাত্রাকালে জীব যে গুণরাশির অধিকারী হয় তাহা সেই ব্যক্তিবিশেষের উপর তো প্রভাব বিস্তার করিবেই তদ্ব্যতীত তদুৎপন্নসন্ততিমধ্যেও ঐসকল গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবর্ত্তিত হইবে।

"ঐ সকল গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবর্ত্তিত হইবে"—এই বাক্যটীকে ল্যামার্ক্ স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ দৈহিক সংবর্ত্তন (adaptation) ভবিষ্যৎবংশাবলীর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে কি না সে সম্বন্ধে তিনি আদৌ বিচার করেন নাই। এই সূত্রটী বাস্তবিকই যদি সত্য হয় তবে অভিব্যক্তির কারণ ও গতিনির্দ্দেশে ল্যামার্কীয় সিদ্ধান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু যত কিছু বিসদৃশ তাহা ঐ স্থলেই।

কি কি উপায়ে আমাদিগের দৈহিক পরাবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে?

(১) বাহ্যিক আবহাওয়া
(২) আভ্যন্তরিক অবস্থা
(৩) অঙ্গাদির ব্যবহার ও অব্যবহার; এবং
(৪) নানাবিধ পীড়া। ইহা (১) ও (২) এর অন্তর্গত।

জন্তু ও উদ্ভিদ্ সততই এই কয়টী প্রভাবের অধীন। ল্যামার্ক বলেন যে স্নায়বীয় পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত যাবতীয় উদ্ভিদ্ ও নিম্নস্তরস্থ সমূহ জন্তুই বাহ্যিক আবহাওয়া দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইতেছে। ইহাই উহাদের পরাবর্ত্তনের একমাত্র কারণ।

তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ কেবলমাত্র স্নায়ুযুক্ত জন্তুর উপর প্রভাবশালী। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটী অর্থাৎ অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারজনিত পরাবর্ত্তন জন্তুজগতের উৎপত্তির "একমেবাদ্বিতীয়নাস্তি" হেতু। পৃথিবীর ভৌগলিকাদি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে জন্তুজগতে নূতন রকমের অভাব অনুভূত হয়। এই নবপ্রবর্ত্তিত অভাব সমূহ উপলব্ধি করণান্তর জন্তুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তন্নিরাকরণে যত্নবান্ হয়। সুতরাং বাধ্য হইয়া কোন অঙ্গের অতিব্যবহার ঘটে; ও কোনটীর বা একেবারেই ব্যবহার হয় না। এই অব্যবহৃত অঙ্গ ক্রমশঃই ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে; এবং ইহার ক্ষুদ্রত্ব সন্তানে প্রবর্ত্তিত হইয়া শেষে বিলোপপ্রাপ্ত হয়। তিম্বির দন্তহীনতা, নানাপ্রকার জলজন্তু ও কর্দ্দমসেবী মৎস্যাদির ক্ষুদ্রচক্ষু অব্যবহারপ্রসূত। সন্তরণের প্রয়াস হইতে জলচর পক্ষিকুলের জালময় পদোৎপত্তি হইয়াছে। বেলাভূমি ও চরনিবাসী পক্ষীসমূহ তীরসংলগ্ন শিকার ধরিবার নিমিত্ত অনুক্ষণ যত্নবান্। সুতরাং মৃগয়াসন্ধানের নিমিত্ত তাহাদিগকে লম্বমান হইতে হয়। ফলতঃ তাহাদিগের

পদদ্বয় সুদীর্ঘ। জিরাফের অতি দীর্ঘ কণ্ঠদেশও স্বচেষ্টাপ্রসূত। ইহারা বৃক্ষের পত্র চর্ব্বন করে। হিংস্রজন্তুগণের সুদৃঢ় নখর মৃগয়াধারণের প্রয়াসোৎপন্ন। ইহাই ল্যামার্কের যুক্তির গতি।

ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে জন্তুগণ যেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সততই জ্ঞানবান ও তাহাদের জীবন ধারণের গতি তাহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে। ডার্উইন্ একস্থানে বলিয়াছেন "Heaven forefend me from Lamarck's nonsense of a tendency to progressive adoptation from the slow willing of the animals." বস্তুতঃ ল্যামার্কের মতানুসারে জন্তুজগতের পরাবর্ত্তন যদি "slow willing of the animals" (জন্তুগণের ক্ষীণ ইচ্ছা) এর উপর নির্ভর করে তাহা হইলে তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ তৎক্ষণাৎ গৃহবিবাদে মাতিয়া উঠিবেন। লইড্ মোর্গ্যান্ বলিবেন "In no case may we interpret an action as the outcome of the exercise of a higher psychological faculty, if, it can be interpreted as the outcome of the exercise of one which stands lower in the psychological scale." পক্ষান্তরে রোমেনিস্ যুক্তি প্রয়োগ করিবেন "Common sense will always and without question conclude that the activities of organisms other than our own when analogous to those accompanied by certain mental states are analogous mental states." রোমেনিস্ এইরূপ মতের পোষক হইলেও তিনি কখনই সমগ্র জন্তুজগৎকে সমানভাবে মানসিক ধর্ম্মরাজিতে বিভূষিত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "Analogous to our own." যাহাই হউক শেষতঃ রোমেনিস্ একেবারেই ল্যামার্কবাদী নহেন।

এই ত মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আপত্তি। এক্ষণে আমরা দৈহিক পরাবর্ত্তনের বংশপারম্পর্য্যের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ধরা হউক দৈহিক পরাবর্ত্তন সমূহ উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা সত্বেও ল্যামার্কের সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত কতিপয় ব্যাপার সম্বন্ধে কোনই উত্তর দিতে পারে না।—

(১) পক্ষিশ্রেণির অস্থির অত্যাশ্চর্য্য লঘুত্বোৎপাদন। লঘুত্ববশতঃ দৃঢ়তার আদৌ লাঘব হয় নাই। ফুস্ ফুস্ হইতে কেশবৎ সূক্ষ্ম বায়ুবাহী প্রণালী-সমূহ অস্থিমধ্যে বিস্তৃত বলিয়াই উহা অতিশয় লঘু। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহার ও অব্যবহার কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে?

(২) খদ্যোৎপ্রমুখ প্রাণীর আলোকবিধায়ক অঙ্গোৎপত্তি; এবং চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার ন্যায় যৎপরোনাস্তি জটিল অঙ্গ সমূহেরই বা উৎপত্তি ব্যবহার ও অব্যবহার দ্বারা কি প্রকারে ঘটিতে পারে? ব্যবহার ও অব্যবহার কেবলমাত্র ভূতপূর্ব্ব অঙ্গের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা যতদূর সম্ভব জন্তুর পরাবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে।

(৩) বর্ণবৈচিত্র্য।

ইত্যাদি।

দৈহিক পরাবর্ত্তন বংশের উপর কি প্রকারে প্রভাবশালী হইতে পারে তাহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই নিম্নস্থ চিত্রটী স্মরণ রাখিতে হইবে।—
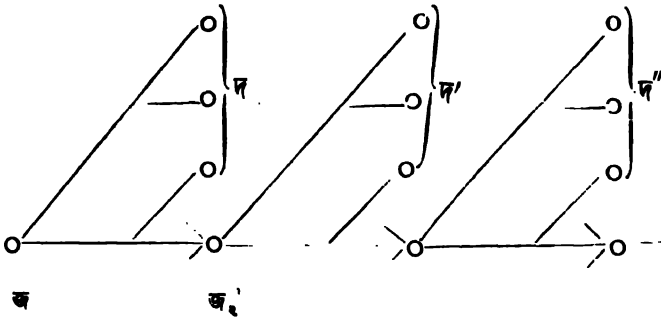
(কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই, বি, উইল্‌সনের প্রস্তুত চিত্রানুরূপ।)

জ, সম্মিলিত কোষ (অণ্ড + শুক্রকোষ); এই ভ্রূণোৎপত্তির স্বল্পকাল পরেই সংবিভক্ত কোষ-মণ্ডল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে জ₂ ও দ। স্ত্রীজাতীয় ভ্রূণে জ₂ অণ্ডকোষে, ও পুংজাতীয় ভ্রূণে ইহা শুক্রকোষে পরিণত হইবে। দ শ্রেণীর কোষমণ্ডল হইতে বিভিন্ন প্রকার দৈহিক কলা উৎপন্ন হইয়া পূর্ণাবয়ব সন্তানে পরিণত হয়। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভ্রূণপুষ্টির এত শৈশবাবস্থায় জ₂ অবশিষ্ট কোষ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে যে দৈহিক কলানির্ম্মাণের তখন মাত্রও সূত্রপাত হয় নাই। তদ্‌পর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে পরবর্ত্তী বংশ দ' জ₂ হইতে উৎপন্ন হইবে। দএর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। জ₃ ইত্যাদিও তদ্রূপ।

ল্যামার্ক-বিবৃত পরাবর্ত্তনরাজি দ, দ', দ'' ইত্যাদি কোষ-সম্বন্ধীয়। আর পরবর্ত্তী বংশাবলী উৎপন্ন হইতেছে জ, জ₂ জ₃ ইত্যাদি হইতে। সুতরাং দৈহিক পরাবর্ত্তনের বংশপারম্পর্য্যের অর্থ হইতেছে ঐ পরাবর্ত্তন সমূহ জ, জ₂ জ₃ ইত্যাদি কোষেরও বিকৃতি সাধন করিবে। কিন্তু ইহা কি উপায়ে সম্ভবপর? কারণ প্রথমতঃ দ, দ' ইত্যাদি দেহগঠনকারী কোষমণ্ডলী বিভিন্ন কলায় পরিণত হইবার বহুপূর্ব্বেই জ, জ₂ ইত্যাদি জননকোষ পূর্ব্বোক্ত কোষগুচ্ছ হইতে সম্যক্‌-প্রকারে পৃথক্ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণাঙ্গদেহের প্রাণপঙ্কের সহিত পৃথকগ্‌ভূত অণ্ডকোষ ও শুক্রকোষের প্রাণপঙ্কের সংযোগ নির্ণয় করিতে যাইয়া লিনিয়াস্, ড্রোকাঁডো, স্পেন্‌সার্, হাকে, হিস্, কোপ্, ডার্‌উইন্, গাল্‌টন্, ক্রুক্‌স্, নেগেলি, ক্যোলিকার্, ডে ভ্রিস্, হার্টভিগ্ ও বাঁফো প্রমুখ বিখ্যাত প্রাণবিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা বা গবেষণা কোন উপায়েই সমস্যা সাধন করিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রত্যেকেই এক একটী বিশিষ্ট মতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক প্রাণবিজ্ঞান মহাসমিতির লাইডেন্-অধিবেশনে ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক আউগুষ্ট্ ভাইজ্‌মান্ "জননকোষে নির্ব্বাচন স্থিরপরাবর্ত্তনের উৎপত্তিবিধায়ক" (Germinal Selection as a Source of Definite Variation) নামক এক দীর্ঘ নিবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে দৈহিক প্রাণপঙ্ক ও জনন-কোষস্থ প্রাণপঙ্কে যখন কোন সংযোগই নাই তখন যে পরাবর্ত্তনপ্রভাবে অভিব্যক্তি

সাধিত হইতেছে অর্থাৎ যে পরাবর্ত্তন সন্তানে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা নিশ্চয়ই জননকোষোৎপন্ন। কারণ জননকোষ দ্বারাই গর্ভোৎপাদন হইয়া থাকে। এক্ষণে নানাবিধ পরাবর্ত্তনবিশিষ্ট জননকোষদিগের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহারই ফলে পরবর্ত্তী বংশের ভাগ্য নিয়মিত হয়। ইহাই উত্তর-ডারুউইন্‌বাদিগণের মূল সূত্র। ইহা দ্বারাই ভাইজ্‌মান্ স্বয়ং ডারুউইন্ হইতে অধিকতর ডারুউইন্‌বাদী। যে হেতু ডারুউইন্ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন আবিষ্কার করিলেও দৈহিক পরাবর্ত্তনের বংশপারম্পর্য্যের প্রভাব হইতে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি উত্তর-ল্যামার্কীয়গণ যে কতিপয় পরীক্ষাসাধন করিয়াছেন তাহার মধ্যে ব্রাউন্ সেকার্ডের গিনিপিগ্ নামক দন্তুর জন্তুর সহিত পরীক্ষাই প্রধান। ইহাদিগের ফল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বড় অনুকূল নহে। বস্তুতঃ যদি পিতামাতার দৈহিক বিকৃতি সন্তানগণ প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে আজ জন্তু ও উদ্ভিজ্জগতের দৃশ্য কি ভীষণই না হইত!

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি, এ,।

বঙ্গ-সাহিত্যে সেখ সাদি

এক সেখ সাদির আবির্ভাবে চিরদিনের জন্য পারস্যের সাহিত্যগগন আলোকিত ও কাব্যকানন মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্ত কালের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে, পারস্যের মহাকবি সেখ মস্‌লে উদ্দীন সাদির কবিতা-নিচয় আজও সেইরূপই নূতন—সেইরূপই বিদ্বজ্জন-চিত্তহারী। রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে আজ পারস্যের-তক্ত তাউস—বাতান্দোলিত দীপ-শিখার ন্যায় ব্যপমান কলেবরে আপন নিয়তির প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সেখ সাদির সিংহাসন অদ্যাপি আপন মহিমায় আপনি সমুজ্জ্বল ও হিমাদ্রিবৎ সেইরূপই অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান! পৃথিবীর কোন রাজচক্রবর্ত্তীর সাধ্য নাই তাঁহার সেই সিংহাসন অধিকার করেন! সেই এক সেখ সাদি,—যাঁহার জনমে পারস্য দেশ ধন্য ও কাব্যরসপিপাসুগণ কৃতার্থন্মন্য। বঙ্গের সাহিত্যকাননে আজ আবার আর এক সেখ সাদির উদয়। এস্থলে আগেই বলিয়া রাখা ভাল, নাম সাদৃশ্য ব্যতিরেকে এ উভয় সাদির মধ্যে আর কোন বিষয়ে তুলনাই হইতে পারে না। পারস্যের সেখ সাদির মত আমাদের সেখ সাদির বঙ্গীয় কাব্যকাননের ধ্বান্তরাশি দূরীকরণ করিবার মত কোন প্রতিভা নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য-গগনে অসংখ্য তারকারাজির মধ্যে অন্ততঃ একটা ক্ষীণরশ্মি জ্যোতিষ্কের মতও প্রতিভাত ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না। প্রাচীন কালে অগণিত কবি আবির্ভূত হইয়া আমাদের দীনা ক্ষীণা মাতৃভাষার কলেবরের অশেষ পুষ্টি-সাধন করিয়াছিলেন। গণ্য ও নগণ্য সকল কবির সমবেত শক্তিতেই যে বঙ্গ-সাহিত্যের এই বিরাট বপুঃ গঠিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কথা নয়। আমাদের এই কবিও

আপনার ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্যে মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধনে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য বঙ্গ-সাহিত্য যে তাঁহার নিকটও কতক পরিমাণে ঋণী এবং তিনি যে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহারই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

সংপ্রতি সেখ সাদির ভণিতাযুক্ত একখানি অত্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার নাম গদা-মল্লিকার পুঁথি। পুঁথির শেস পত্রগুলি না থাকায় হস্তলিপির তারিখ জানা যায় না, কিন্তু কাগজের অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা যায়, উহার বয়স ২০০ বৎসরের ন্যূন হইবে না। ২৪×১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ২৮শ পত্রের পর পুঁথিখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তারপর উহা কতটুকু ছিল, বলিবার উপায় নাই। আব্দুল লতিপ নামক জনৈক লোক পুঁথির প্রতিলিপিকারক। তাঁহার বাসস্থানাদির কোন উল্লেখ নাই। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দেবপুর নামক গ্রাম হইতে তত্রত্য শ্রীমান মিঞা ইস্মাইল হায়দর আমাকে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

পুঁথির স্থানে স্থানে এইরকম ভণিতা দেখা যায়:—

সএখ (সেখ) সাদিএ কএ মোহাম্মদ বিনে।
মুই গোনাগার নিস্তার না দেখি নয়ানে॥

কেবল এই নামটুকু ভিন্ন কবি সেখ সাদির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের ভাষা আলোচনা দ্বারা তাঁহাকে চট্টগ্রাম বিভাগের লোক বলিয়া মনে হয়। আগেই বলিয়াছি, পুঁথিখানির বয়স ২০০ বৎসরের কম বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং কবি সেখ সাদিকেও অন্ততঃ দুই শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

পাঠকগণ পুঁথির নামেই বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা একখানি মুসলমানী উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ। ঠিক এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আর একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহার নাম "মল্লিকার হাজার সওয়াল।" হাছন সরিফ নামক পীর-পদ ধ্যান করিয়া সেরবাজ নামক জনৈক কবি উহা রচনা করিয়াছেন। এই উভয় পুঁথির মধ্যে ঘটনা-সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের রচনা প্রণালীতে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। সেখ সাদি অপেক্ষা সের বাজ শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা উভয় পুঁথির ভাষা-তুলনায় সহজেই ধরা পড়ে। তবে এই উভয় কবির মধ্যে কে আদি কবি, তাহা বিনির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথির তুলনায় সমালোচনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দুঃখের বিষয়, আজ আমরা নানা কারণে সে কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছি।

সমালোচ্য পুঁথির উপাখ্যান ভাগ দুই কথায় সমাপ্য। মল্লিকা রুমরাজ দুহিতা এবং পশ্চাৎ স্বয়ং রুমের দণ্ডধারিণী। তাঁহার এক সহস্র প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম ব্যক্তিকেই তিনি স্বীয় পতিত্বে বরণ করিবেন, মল্লিকা এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। সেই প্রতিজ্ঞার কথা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইলে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত রাজপুত্র মল্লিকার পাণি লাভাভিলাষে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই মল্লিকার সওয়ালের জবাব দিতে পারিলেন না! কাজেই

"মল্লিকাএ সে সবেরে বন্দিতে রাখিল।
লজ্জা দিআ কত জনে মারি খেদাইল॥"

অবশেষে 'তুরুক' দেশ হইতে গদা-উপাধি-

ধারী * আব্দুল হালিম ("মল্লিকার হাজার সওয়ালে"র মতে আব্দুল্লা) নামক এক ফকির আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এই বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মল্লিকার পাণি ও রূমের তক্ত উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। এই হইল গ্রন্থের উপাখ্যানভাগের সারাংশ। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে দু একটা অবান্তর কথাও যে নাই, এমন নহে।

সের বাজ কৃত "মল্লিকার হাজার সওয়ালে" হাজার সওয়ালের উল্লেখ আছে; কিন্তু ঠিক হাজার সওয়াল আছে কি না, গণিয়া দেখি নাই। সমালোচ্য পুঁথিতেও অনেক সওয়াল আছে কিন্তু সংখ্যায় কতটি হইবে, গণনা করা ব্যতীত বলিবার উপায় নাই। উভয় পুঁথির সওয়াল গুলি মূলতঃ এক,—তবে প্রশ্নের ও উত্তরের ভাষা বিভিন্ন বটে। প্রশ্নগুলির অধিকাংশই আধ্যাত্মিক ভাবের. পাঠকগণকে নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর প্রদর্শন করিতেছি :—

(১) তার পাছে এক কথা পুছে মল্লিকাএ।
এক আইসে আর জাএ এ দুই সদাএ॥
জাবত্‌ কেআমত হএ তাবত্‌ এইরূপ।
এই কোন জন হএ কহত স্বরূপ॥
ফকিরে বোলএ জান রাত্রি আর দিন।
এক আইসে যার জাএ নিবন্ধের চিন॥

(২) কোরানের আয়েত পড়ি ফকিরে কহিল।
ফিরি য়ার এক ছোয়াল মল্লিকাএ পুছিল॥
সরিরেত কোন স্থানে চন্দ্র উলিয়াছে।
কোন কোন স্থানে বোল নক্ষত্র উলিছে॥
চন্দ্র উদএ হইছে দিনের যন্তর।
নক্ষত্র উলিয়াছে কলিজা উপর॥
অরুণ উদিত হইছে কমর † মৈদ্ধেত।
সোনহ মল্লিকা বিবি কহিলাম তোমাত॥

(৩) তবে কহে দুই মৈদ্ধে বসন্ত হেমন্ত।
কোন কোন কারণরে কহ তার যন্ত॥(?)
মগজেত উথলিয়া বসন্তের বায়।
মণিস্তের নাভিমূলে রহেন্ত সদাএ॥
উথলিয়া নাভিমূলে হেমন্তে পবন।
উজান চলিয়া উঠে মেঘের গমন॥

(৪) ফি'র মল্লিকাএ পুছে পড়িয়া কলিমা।
আর কিছু কহ তান (ঈশ্বরের) রূপের মহিমা॥
গদাএ কহে এইসব কইলে গোনা ‡ হএ।
পুসিস § করহ তোমি না কইলে নয়॥
চন্দ্রের সমান দিষ্টি ধরিয়াছে কর।
শশিরূপে দুনিয়াই করহে পসর॥
রবি রূপে তাপ দিয়া চৌদিগে ব্যাপিত।
সিতল রূপে রহিয়াছে জলের সহিত॥
তেজ রূপে রহিয়াছে জলের(?) মাঝার।
কটি (কোটী) রূপ ধরিয়াছে নাহএ প্রচার॥
সিতল স্বগন্ধিরূপে পুষ্পেত সঞ্চরে।
য়লিরূপ ধরি চরে পুষ্পের মাঝারে॥
য়লিরূপে কুসুমেত মধু করে পান।
ফকিরে কহেন্ত কথা মল্লিকার স্থান॥
সবা বিদ্যমান নহে যাছএ গোপত।
গোপ্তরূপে রহিআছে নাহএ বেকত॥

মল্লিকার প্রশ্নগুলির মধ্যে এমন অনেক প্রশ্নও আছে, যেগুলি শুধু মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক হইতেই আলোচিত হইয়াছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত সেগুলি মুসলমান ভিন্ন অন্যেরা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া আমরা সেরূপ কোন প্রশ্ন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। প্রাচীন কালে গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাব্যরসের ভিতর দিয়া লোকহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ করা। কবি

* গদা—পারস্য শব্দ—অর্থ ফকির।
‡ গোনা—পাপ।
† কমর—কোমর; কটিদেশ।
§ পুসিস—জিজ্ঞাসা।

সেখ সাদিও সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

এতক্ষণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে এই পুঁথি কবির কবিত্ব শক্তি প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। মোটের উপর তাঁহার রচনা যে সহজ, সুন্দর ও অনাড়ম্বর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাঁহার সাধারণ রচনার নমুনা স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে পাঠকগণ আমাদের এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন :—

(১) কেহ হাবিলাসে আইসে সংসার মাজার।
কেহ চলি জাএ নিজ ঘরে য়াপনার ॥
সংসার য়াপনা নহে সোন নরগণ।
বাদিয়ার বাজি জেমন য়াখেরে মরণ ॥
এই ধন সম্পদ জত জোয়ারের জল।
মৃত্যু কালে ভিন্ন ভিন্ন হইব সকল ॥

(২) মল্লিকা সুবদনী সুলতান নন্দিনী
রোদন করহে বহুতর।
আএ প্রভু ছোবাহান তুমি জগতের প্রাণ
কি কহিমু মহিমা তোমার ॥
আব আতস খাক বাই চারি চিজে দুনিয়াই*
চারি চিজ করি এক সঙ্গ।
কাম ক্রোধ লোভ মায়া জীবন যৌবন দিয়া
পরিণামে কেনে কর ভঙ্গ ॥

(২) নাথরে মোরে কর পার।
বিসম সঙ্কট মাজে না দেখি উদ্ধার ॥
উৎপন্ন প্রলয় কেবা করিছে স্জন।
আপেত আপনা গুণ করিআ ভোবন ॥
মিছা ঘর বাড়ি পাইয়া হইলা ভোর মন।
নিকুঞ্জ মন্দির ছাড়ি পলাই গেল কান্ত (?) ॥
আপনা আপনা বোলি সেবিলাম জাহারে।
জাইতে বোলান দিআ না গেলা য়ামারে ॥
নিদআ হইয়া মুরে (মোরে) ভাসাইলা সাগরে।
নিচিন্তে রইলা গিআ নিগোর মন্দিরে ॥
দুনিআইর ধান্দা বাজি লাগে চমৎকার।
বিষম সঙ্কট মাজে কেমনে হইমু পার ॥
সএখ (সেখ) সাদিএ কহে মনে করি সার।
আল্লা ভনে উদ্ধারিতে কেহ নাই আর ॥

আর বেশী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বর্দ্ধিত করা অনাবশ্যক। উপরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই পুঁথিখানির স্বরূপ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে, আশা করি। অধুনা দেশে এই সকল পুঁথির প্রচলন নাই কিন্তু এক সময়ে এ সকল পুঁথি সমাজে ধর্ম্মভাব স্ফুরণের প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা অবান্তর কথা বলি। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা স্বীকার করিয়াও তাহাকে জাতীয় ভাষা স্বীকার করিতে চাহেন না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের মধ্যে আশানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছে না। প্রাচীন কালে কিন্তু এরূপ বিসদৃশ ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যে সময়ে দেশে পারস্য ভাষা রাজভাষা রূপে প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই অনেক মুসলমান কবি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষাকে জাতীয় ভাষা মনে না করিলে তাঁহারা কখন এরূপ করিতে যাইতেন না, ইহা ঠিক কথা। তাঁহাদের সেই যত্ন ও উদ্যম যদি এতদিন পর্য্যন্ত অভগ্ন

* ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চভূতের মধ্যে মুসলমানেরা কেবল ভূতচতুষ্টয় স্বীকার করেন,—যথা:—আব (অপ্), আতস (তেজঃ), খাক (ক্ষিতি) ও বাই (মরুৎ)।

প্রবাহে চলিয়া আসিত, তবে আজ আমাদের বঙ্গসাহিত্য এক বিপুল বিস্তার ও অসীম শক্তি লাভ করিত, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর জাতীয়তা-গঠন-কল্পেও তাহা অশেষ সহায়তা করিতে পারিত এবং বঙ্গসাহিত্য এখন যেরূপ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ কখন হইতে পারিত না। প্রাচীন মুসলমান কবিগণ বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও উহাকে জাতীয় ভাষা রূপে উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে আরব্য পারস্য হইতে তাঁহাদের মহাযশাঃ পূর্ব্বপুরুষগণের গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই শুভকার্য্য মধ্যপথে রুদ্ধগতি না হইলে আজ বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের সম্পূর্ণ জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইত এবং বঙ্গের বিশাল মুসলমান সমাজের উন্নতির একটা চিরস্থায়ী সেতু নির্ম্মিত হইত। মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করিয়া তাহার সমুচিত আদর ও অনুশীলন অভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের কি যে অনিষ্ট হইতেছে, দুঃখের বিষয় আজও তাহা অনেকে বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তাঁহাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি কখন বড় হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যই জাতীয়-জীবন-তরীর দিঙনির্ণয় করিয়া থাকে এবং জাতীয়-সাহিত্য হইতেই রসাকর্ষণ করিয়া সমাজদেহ পুষ্টিলাভ করে। যতদিন বঙ্গসাহিত্য সমাজদেহের পুষ্টিসাধনে সহায় না হইতে পারিবে, ততদিন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত, একথা ধ্রুব সত্য।

আবদুল করিম

ঊনবিংশশতাব্দী

বিগত শতাব্দী জগতে ইংরাজপ্রভাবের যুগ। ঊনবিংশশতাব্দীর ইংরাজজীবন আলোচনা করিলে নব্য পাশ্চাত্য সভ্যতার ধরণ ধারণ বুঝা যাইবে। আমরা সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া এই যুগের পরিচয় দিতেছি। বলা বাহুল্য, এই শতাব্দীটা ভারতবাসীর পক্ষে মোটের উপর একটা "নিষ্কর্ম্মার যুগ"।

অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান আমলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। ইংরাজ রাজত্বেই রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান দেশে দেখা দিয়াছে। সত্য কথা ইংরাজেরা যখন ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ লাভ করিতে থাকেন তখন তাঁহাদের স্বদেশেই বড় বড় প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, স্বাস্থ্যবিধানের নিয়মাবলী ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তাঁহারা ভারতবর্ষকে শিখাইবেন কোথা হইতে? বরং বৈষয়িক সুখস্বচ্ছন্দতার অনেক কথা তাঁহারা দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইত্যাদি নগর হইতে শিখিয়াছিলেন।

যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড অথবা ইউরোপের অন্যান্য দেশের আর্থিক এবং বৈষয়িক অবস্থা তুলনা করিলে কিছু বুঝিতে বাকী থাকে না। ঊনবিংশ-শতাব্দীতে

পশ্চিমারা অভাবনীয়রূপে জাগতিক উন্নতি-লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত ইহাঁরা কোন বিষয়েই ভারতবাসী হইতে উন্নত ছিলেন না। দৈবক্রমে ষ্টীমের প্রয়োগ আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউরোপে যুগান্তর আসিয়াছে।

১৮০৫ সালে নেপোলিয়নের রণতরী নেলসন কর্ত্তৃক চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এই প্রসিদ্ধ ট্রাফাল্‌গার যুদ্ধে কিরূপ জাহাজ ব্যবহৃত হইয়াছিল? তখনও বাষ্পের প্রভাব দেখা দেয় নাই। সেই পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর মামুলি পালের জাহাজ, কাঠের জাহাজ এবং দাঁড়ের জাহাজই তখন প্রচলিত ছিল। আজকাল সেইগুলিকে জাহাজ বলিতে লজ্জা বোধ হইবে। ভারতবর্ষের লোকেরা যবদ্বীপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সময়েও এইরূপ জাহাজই ব্যবহার করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমানেরা যে সকল জাহাজ ব্যবহার করিতেন সেগুলির সঙ্গে বিংশশতাব্দীর ড্রেডনটের তুলনা করিলে উপহাস করা হইবে মাত্র। কিন্তু সেই যুগের পাশ্চাত্য রণতরীসমূহও আজকালকার হিসাবে নিতান্ত খেলানার সামগ্রী নয় কি? আম্‌ষ্টার্ডাম, লিস্‌বন, ভেনিস, হাম্বা এবং অন্যান্য নগর বন্দরের জাহাজ নির্ম্মাণপ্রণালী আলোচনা করিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে।

কোন সমাজের সঙ্গে অপরাপর সমাজের তুলনা করিতে হইলে যুগ ও সময়ের কথা মনে রাখা আবশ্যক। কোন এক যুগে দুই তিন সমাজের অবস্থা পরস্পর তুলনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমরা এ কথা ভুলিয়া যাই। অবিবেচকের ন্যায় আধুনিক পাশ্চাত্যগণের নূতন আবিষ্কারসমূহকে অতি প্রাচীন ভাবিয়া থাকি এবং তাহার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের অবস্থা তুলনা করিয়া হতাশ হইয়া পড়ি! বাস্তবিক পক্ষে, নব্য ইউরোপের বিশিষ্ট আবিষ্কারগুলি ৭০৮০।৯০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নয়। এই কয় বৎসরের ভিতরেই ওদেশে এই অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে।

বাষ্পচালিত এঞ্জিনের ব্যবহার পৃথিবীতে ১০০ বৎসর মাত্র চলিতেছে। গ্লাসগো নগরে তাহার সূত্রপাত। তাহার প্রবর্ত্তক জেম্‌স ওয়াট্ এই নগরেরই সন্তান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "কমেট" নামক জাহাজে বাষ্প নিয়ন্ত্রিত কল প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিছুকাল পর্য্যন্ত নূতন নৌশিল্পের উন্নতি দ্রুত সাধিত হয় নাই। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একব্যক্তি গ্লাসগোর শিল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কৃষিকর্ম্ম, তুলার কারবার, রঞ্জন-শিল্প, মৎস্য চাষ, এবং অন্যান্য জীবিকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু বাষ্পপোত-নির্ম্মাণবিষয়ক শিল্প তখনও প্রসিদ্ধ হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৫৯ সাল হইতে এই নূতন শিল্পের প্রভাব গ্লাসগো নগরে লক্ষিত হইয়াছে।

গ্লাসগো বন্দরের এই ইতিবৃত্তটুকু মনে রাখিলে বুঝিতে পারিব কেন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের* পর হইতে ভারতীয় নৌশিল্প অবনত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে গ্লাসগো এবং ভারতীয় বন্দরে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। বরং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী লেখক বলিতেছেন, হিন্দু জাহাজই উন্নততর। "In ancient times the Indians excelled in the art of constructing vessels, and the present Hindus can in this respect

* History of Indian shipping—R. K. Mookerji, p. 250-251.

still offer models to Europe—so much so that the English attentive to eve.; thing which relates to naval architecture have borrowed from the Hindus many improvements which they have adopted with success to their own shipping. * * * The Indian vessels unite elegance with utility, and are models of patience and fine workmanship."

বাস্তবিক পক্ষে, আজকাল ইউরোপে যত-কিছু সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখিনা কেন প্রায় সকলই একশত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। আজ-কালকার লণ্ডন, গ্লাসগো, এডিনবারা নগরের বাহ্য সম্পদ, অট্টালিকা ও রাজপথ সমূহ এই সময়ের ভিতরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এই সমুদয় নগর স্বাস্থ্য, বিলাস, সুখস্বচ্ছন্দতা অথবা সৌন্দর্য্য হিসাবে নিতান্ত অবনত ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্লাসগো নগর কিরূপ ছিল তাহার এক চিত্র প্রদান করিতেছি। ওয়ালেস প্রণীত "গ্লাসগোর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিত আছে :—"The sanitary condition of the city in those early periods was of a somewhat primitive description. In 1589 there was an order made by the magistrates that "no midden be laid upon the hiegat," but no attention seems to have been paid to this order. In 1655 the state of the streets was such, that the citizens had to place stepping stones in front of their houses so that they might be enabled to make their exits and entrances 'dryshod.' But the main streets were used for other purposes than as the receptacles of 'midden.' Swine were allowed to roam at large. Hay and peat stocks were erected on the streets and the fleshers appear to have been in the habit of slaying and building the whole bestial they kill on the Hie Street on both sides of the gate, which is very loathsome to beholders and also raise a filthy and noisome stink. * * * About the year 1755 the magistrates erected a new market in King Street, and it was not till then that a public slaughter house was provided."

অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আধুনিক ইংলণ্ডের "দ্বিতীয় নগরে"র এই অবস্থা! প্রথম নগর লণ্ডনও এইরূপই ছিল। এই সকল কথা মনে রাখিয়া আমাদের নব্য ভারতীয় ছাত্রেরা গ্লাসগো, এডিনবারা, লণ্ডন, প্যারি, বার্লিন ইত্যাদি নগরে প্রবেশ করিলে চমকাইয়া যাইবেন না এবং হতাশ হইয়া পড়িবেন না। "ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী"র অবলম্বনই আত্মবিস্মৃতি এবং চিত্তসংমোহন নিবারণের একমাত্র উপায়।

ষোড়শ-শতাব্দীর গৌড় কিরূপ ছিল? ডি ব্যারোজ্ ষোড়শ-শতাব্দীর পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক-গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"It is said to be three of our leagues in length and contain 200,000 inhabitants. The streets are so thronged with the concourse and traffic of people that they cannot force their way past. A great part of the houses of the city are stately and well wrought buildings."

ষ্টিভেন্‌সন "Portuguese Asia" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The principal city Gouro, seated on the bank of the Ganges, three leagues in length, containing one million and two hundred thousand families and well-fortified ; along the streets which are wide and straight, rows of trees to shade the people, which sometimes in such numbers that some are trod to death."

পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকেরা মুসলমান গৌড় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বিংশশতাব্দীর লণ্ডন-নগরের ব্যাঙ্ক-পাড়ায় দাঁড়াইলে বোধ হয় সেই কথা মনে হয়। অথচ লণ্ডনের এই জনতাপ্রবাহ ইউরোপের অন্য কোন নগরে দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ভারতবাসীর 'ধাতে' কি সংসারধর্ম্ম নাই ? ইহারা কি একমাত্র মালা জপিতে এবং খোল করতাল লইয়া নৃত্য করিতেই ওস্তাদ ? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে ভারতবাসীর এই চিত্রই দিয়াছেন! বিংশশতাব্দীর মন্ত্রমুগ্ধ ভারতবাসী নিজ অতীত সম্বন্ধে ঐরূপই ভাবিতেন। বিংশশতাব্দীর ভারতবাসী বুঝিতেছেন ঐসকল ইতিহাস গ্রন্থ পুরাপুরি সংশোধন না করিলে চলিবে না।

এইবার আমাদের তাঁতীপাড়া ম্যাঞ্চেষ্টারের কথা কিছু বলিব। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খোলা হয়। তাহার পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়া যাইতে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিত। তাহা ছাড়া ইংরাজজাতির ব্যবসায় সম্বন্ধীয় আইনও তখন ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কোন কোন কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হইত। "তুরস্ক কোম্পানী" ব্যতীত আর কোন ব্যবসায়-মণ্ডলী তুরস্কে বাণিজ্য করিবার অধিকারী ছিল না। সেইরূপ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ব্যতীত আর কোন কোম্পানী চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। কাজেই ম্যাঞ্চেষ্টারের ধনী মহাজন সমিতি-সমূহ সর্ব্বত্র ব্যবসায় বিস্তারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই সকল "monopolies" বা একচেটিয়া অধিকার সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করা হয়। তাহার পর হইতেই ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী সমাজে স্বাধীনতা এবং কর্ম্মপ্রবণতার যুগ আরব্ধ হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়-শক্তিও তাহার পূর্ব্বে বিশেষ লক্ষিত হয় নাই।

আর একটা কথাও মনে রাখা আবশ্যক। ম্যাঞ্চেষ্টার নগর তূলার কারবার এবং কাপড়ের কারখানার জন্যই আজকাল জগতে প্রসিদ্ধ। এই কারখানাগুলিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োগেই শিল্পজগতে বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। এই যন্ত্রসমূহের আবিষ্কার হইয়াছে কখন ? ১৭৬৯—৮৭ খৃষ্টাব্দের ভিতর। কিন্তু শিল্প-কারখানায় সুচারুরূপে ব্যবহার করিয়া লাভবান্‌ হইবার সুযোগ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পরে উন্মুক্ত হইয়াছে। এই সময়ে পেটেণ্টের নিয়ম (Patent Act) সংস্কার করা হয়।

তাহার ফলে শিল্পকারখানার স্বত্বাধিকারী মাত্রেই নিজ নিজ কারবারে যন্ত্র সমূহ প্রবর্ত্তন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে; এবং ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে জগতের সর্ব্বত্র মাল পাঠাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খালের প্রভাবে বাণিজ্য পথ সুগম হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্প সম্পদ এবং বাণিজ্যৈশ্বর্য্য নিতান্তই কালকার কথা।

"ইতিহাস"

ধূপ

প্রায় সকল হিন্দু-সন্তানই অবগত আছেন যে, যে কোন পূজা দৈব বা পিতৃকার্য্য শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠিত হইতে গেলেই ধূপ দীপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধূপ দিবার কেনই বা ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহার উপকারিতাই বা কি এবং কি কি দ্রব্য ধূপ প্রদানের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে আধুনিক সম্প্রদায়ের অনেকে অবগত নহেন; তাই শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট প্রশ্নাদিদ্বারা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের ভার পাঠকবর্গের উপর।

সাধারণতঃ বাজারে এক প্রকার ধুনা পাওয়া যায় তাহাই লোকে ধূপ জন্য ব্যবহার করে। বিশুদ্ধ শালবৃক্ষের নির্য্যাস বিশুদ্ধ ধুনা নামে খ্যাত। এই ধুনা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে এক প্রকার ধূম উত্থিত হয়, তাহাই দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়া থাকে। বাজারে অনেক সময় বিশুদ্ধ ধুনা পাওয়া যায় না, এবং ইহাতে অন্য দ্রব্যও মিশ্রিত থাকে, প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রে কাহাকে ধূপ বলে ইহা জানা আবশ্যক। ধূপঃ (পুং) গন্ধ দ্রব্য বিশেষোত্থ ধূমস্তদ্বর্ত্তিশ্চ।—"এবং বাং কথিতো দীপো ধূপ শৃণু তং সুতো। নাসাক্ষিরন্ধ্রসুখদঃ সুগন্ধোঽতিমনোহরঃ॥ দহ্যমানস্য কাষ্ঠস্য প্রযতস্যেতরস্য বা। পরাগস্যাথবা ধূমো নিস্তাপো যস্য জায়তে॥ স ধূপ ইতি বিজ্ঞেয়ো দেবানাং তুষ্টিদায়কঃ। রাশিকৃতেন চৈকত্র তৈর্দ্রব্যৈঃ পরিধূপয়েৎ॥" অর্থাৎ কোন গন্ধ দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে যে ধূম নির্গত হয় তাহাই ধূপ বলিয়া কথিত, ইহা চূর্ণ বা বর্ত্তি আকারের হইতে পারে। বর্ত্তির সংস্কৃত পর্য্যায় গন্ধ পিশাচিকা দেবতাদিগের কি প্রকার ধূপ তুষ্টিদায়ক তাহাও পূর্ব্বে বলা হইল, অর্থাৎ কোন কাষ্ঠ বা অন্য দ্রব্য বা পুষ্পের পরাগ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য অগ্নিতে দহ্যমান হইলে, তন্নির্গত ধূম যদি নাসিকার ও চক্ষুর অপ্রীতিকর না হয়, সুগন্ধযুক্ত ও তাপহীন হয়, এই ধূপ দেবতাদিগের প্রীতিজনক। ঐরূপ দ্রব্যসমূহ একত্র করতঃ ধূপ প্রদান করা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধূপ প্রিয়। শাস্ত্রে তাহারও বিধি লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ধূপের উপকারিতা কি তাহাই আলোচনা করা যাক। শাস্ত্রবিধানানুযায়ী

পূজা প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ধূপ যথেষ্ট উপকারী। যথা (১) ধূপ দুর্গন্ধ নাশ করে। Disinfectant জন্য যেমন Phenyle প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তেমনি ধূপদ্বারা দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়। কোন গৃহাভ্যন্তরে যদি chlorine বাষ্প ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সেই গৃহ হইতে রোগের বীজাণু প্রভৃতি দূরীভূত হয়। গন্ধকের ধূম যদিও দেবতার প্রিয় নয় এবং তীব্রতা প্রযুক্ত নাসারও প্রীতিজনক নয়, তথাপি ইহাকে একপ্রকার ধূপ বলা যাইতে পারে, এবং সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, যে সময় কলেরা প্রভৃতি মারীভয়ের প্রকোপ হয়, সে সময় গন্ধকের ধূম খুব উপকারী, এবং অনেকেরই স্ব স্ব গৃহে ঐ ধূম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য আজকাল ঐ ধূম মিউনিসিপালিটীতেও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই রূপ অনেক দ্রব্য আছে, যাহাদের ধূম বিভিন্ন বিভিন্ন উপকার প্রদান করে, ও ব্যাধির শান্তি করে। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী যে সকল ধূপ প্রচলিত আছে, তাহাতেও যে সব দ্রব্য মিশ্রিত হয়, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই ধূমের কোন না কোন বিশেষ গুণ আছে; আবার সকলের মিশ্রণে একটী রাসায়নিক ক্রিয়া (Action) হয় ও তাহার ফলে ঐ দ্রব্য-সমূহ-জাত যে ধূম তাহা উপকারী। যদিও আমরা বুঝিতে না পারি তাই বলিয়া কোন দ্রব্যের উপকারিতা কিছু মাত্র নাই ইহা বলাও উচিত নয়। বিশেষতঃ ধূপ কেবল হিন্দুর মধ্যেই চলিত এমন নহে, হিন্দু ব্যতিত জৈন, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীরাও কোন এক প্রকার ধূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহার ব্যবহার একপ্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত বলা যাইতে পারে। ধূপোত্থিত ধূম সুগন্ধীকর, মনের প্রসন্নতা আনয়ন করে (মনের প্রসন্নতা চিত্তশুদ্ধির সোপান) তাহা হইলেও ধূপ উপকারী। কেহ কেহ একথাও বলেন যে, যেখানে সুগন্ধ উত্থিত হইতে থাকে সেখানে অধিক পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তড়িৎ-প্রবাহ জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, অতএব যদি একথা সত্য হয়, তবে ধূপ যে কত উপকারী তাহা বলা অনাবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহুবিধ ধূপের উল্লেখ দেখা যায়, যদ্বারা নানা-বিধ পীড়া উপশম হইতে পারে, তন্মধ্যে আমি এখানে একটীর উল্লেখ করিতেছি—

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরিতকী।
সর্ষপা সযবা সর্পির্ধূপনং জ্বর নাশনং॥

অর্থাৎ গুগ্‌গুল, নিমের পাতা, বচ, কুড়, হরিতকী, শ্বেত সর্ষপ, যব ও ঘৃত এই আট রকম দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে, পুরাতন জ্বর দূরীভূত হয়। জঙ্গল পরিষ্কার করা, মশক বিনাশ করা ও eucalyptus বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি যেমন ম্যালেরিয়া দূরীকরণের উপায়, তেমনি উক্ত ধূপও ম্যালেরিয়া প্রকোপের সময় উপকারী। এই স্থানে মশক ও মক্ষিকা দূর করিবার পুরাণোক্ত একপ্রকার ধূপের উল্লেখ করিতেছি যথা—

"অর্জ্জুনস্য চ পুষ্পানি ভল্লাতকবিড়ঙ্গকে॥
বালা চৈব সর্জ্জরসং সৌবীর সর্ষপাস্তথা॥
সর্প যুক্তা মক্ষিকানাং ধূমো মশক নাশনঃ॥

ইতি গরুড়ে

ত্রিফলার্জ্জুনপুষ্পানি ভল্লাতকশিরীষকং।
লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্‌গুলুঃ।
এতৈর্ধূপো মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনঃ।

ইতি গরুড়ে

অর্থাৎ ত্রিফলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ভেলা, শিরীষ-বৃক্ষ, লাক্ষা, ধূপ, বিড়ঙ্গ, গুগ্‌গুল এই সকল

দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মক্ষিকা ও মশক বিনাশ পাইয়া থাকে।

ইহা আমাদের পরীক্ষিত। আর ইহার লিখিত মত না হইবার কারণও কিছুই নাই। কারণ যদি Carbolic Acidএর গন্ধে সর্প পলায়ন করে, গোয়ালে সাঁজাল দিলে গরুকে মাছি বিরক্ত না করে, তবে ঐরূপ তীব্র গন্ধবিশিষ্ট ধূপের গন্ধ দ্বারা যে মক্ষিকাদি পলায়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি; অধিকন্তু উক্ত ধূপের ধূমের এমন একটী শক্তি জন্মায়, যদ্দারা মক্ষিকা প্রভৃতির পাখা পুড়িয়া যায় ও দৃষ্টির ব্যাঘাৎ ঘটে। এইরূপ অনেক স্থানে অনেকবিধ আবশ্যকীয় ধূপের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুও দ্রব্যবিশেষ মিশ্রিত ধূপের গন্ধে অস্থির হইয়া পড়ে, এমন কি ঘোড়ার দুষ্ট স্বভাব পর্য্যন্ত সারিয়া যায়!

প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনা করিলাম না।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ ধূপ পূজাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কেন ব্যবহার করা হয় তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাক্; এসম্বন্ধে পূর্ব্বেও সামান্য বলিয়াছি।

(১) আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতাসমূহ অতীন্দ্রিয় এবং স্থূল জড় জগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী। স্থূল পদার্থ, সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত দেবতাদিগের গ্রহণীয় নয়, এই জন্যই অগ্নিমুখে দেবতারা গ্রহণ করেন;— ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে"।

৩।৭৬

অগ্নিতে আহুতি প্রদানে সূর্য্যের উপস্থান হয়। অগ্নি স্থূল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সূক্ষ্ম উপাদানে পরিণত করে, এবং সূক্ষ্ম উপাদান গুলি দেবতারা গ্রহণ করেন।

(২) অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী মহাশয়েরা বহুবিধ উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই বহির্জগতের অন্তরালে আর একটী সূক্ষ্ম জগৎ আছে এবং সেই জগতে সূক্ষ্ম শরীর-ধারী জীবও আছেন। যদি মানা যায় তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, spirits দের মধ্যে সৎ অসৎ দুই প্রকৃতির spiritsই আছে, সৎ spirits দের মধ্যে অনেকে জীবের উপকার করিতে প্রয়াস পান, এবং অসৎ spirits দের অনেকে জীবের অপকার করিতে যত্ন করেন, ঐ প্রকার যে সকল জীবের অনিষ্টাভিলাষী spirits আছে, তাহারা অনেকে সুগন্ধ বা পবিত্রতা পছন্দ করে না, সেই জন্য পূজার্চ্চনার সময় মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ধূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, যাহাতে অসৎ প্রকৃতি spirits রা সহজে ধ্যান ধারণায় ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে না পারে।

(৩) প্রত্যেক দেবতাই সেই এক অনাদি অখণ্ড পরব্রহ্মের কোন না কোন শক্তি বা ভাবের বিকাশ মূর্ত্তি। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অতীব দুরূহ এবং ক্লেশকর, সেই জন্য অধিকারীভেদে সাকার দেবতা লইয়া পৃথক্ পৃথক্ সাধনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। যে বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করিবে সে ক্রমে ক্রমে উচ্চ অঙ্গে অগ্রসর করিতে পারিবে। পূজার গুহ্য উদ্দেশ্য হইতেছে যে যাহার যিনি ইষ্ট দেবতা বা আরাধ্য দেবতা তাহাতেই সমস্ত ভাবনা করা, সমস্ত জাগতিক পদার্থ হিন্দু শাস্ত্রের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ ব্যোম এই পাঁচ অবস্থায় বিভক্ত, ইহা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারাও সমর্থিত, তাহারই short-

symbol স্বরূপে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচার পূজায় প্রচলিত। আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ধূপ বায়ুর অনুকল্প, তাহার প্রমাণ মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

গন্ধং দত্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেবচ।
ধূপংদত্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে॥

ইহা ভিন্ন সাধারণ পূজা পদ্ধতিতে যে মানস পূজার বিধান আছে তাহাতেও ধূপকে বায়ুরূপ কল্পনা করা হইতেছে যথা,—বায়ুাত্মকং ধূপং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। ধূপ হইতে উত্থিত ধূম ক্রমে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নিজের বিস্তার লাভ করে, যেমন Homœpathic ঔষধের প্রত্যেক dilution potency বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ধূপ ক্রমে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে এবং ক্রমে তাহার সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আয়তনে বিস্তার লাভ করিতে করিতে অবশেষে অনন্ত বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া লীন হইয়া যায়।

ধূপ ধূপচি যোগে প্রদানই কর্ত্তব্য অথবা * বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিবে।

তৎপ্রমাণং—

ন ভূমৌ বিতরেৎ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা।
যথা তথাধারগতং কৃত্বা তন্নিবেদয়েৎ॥

ধূপ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবার পূর্ব্বে আঘ্রাণ লইবে না। যথা—

পুষ্পং ধূপঞ্চ গন্ধঞ্চ উপচারাংস্তথাপরান্।
ঘ্রাতান্নিবেদ্য দেবেভ্যো নরো নরকমাপ্নুয়াৎ॥

এক্ষণে কত প্রকার ধূপ প্রচলিত আছে এবং কি কি দ্রব্য প্রধানতঃ ধূপে ব্যবহার বিধি আছে তাহাই উল্লেখ করা যাক্।

"শ্রীচন্দনঞ্চ সরলঃ সালঃ কালাগুরুস্তথা।
উদ্রঃ সুরথঃ কন্দিরক্তবিক্রম এব চ।
পীতসালঃ পরিমলো বিশ্বদ্রীকামনস্তথা॥
নমেরুর্দ্দেবদারুশ্চ বিল্ব শারোহথ খদিরঃ।
সন্তানঃ পারিজাতশ্চ হরিচন্দনবল্লভৌ॥
বৃক্ষেষু ধূপাঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিদাঃ
পরিকীর্ত্তিতাঃ।

উপরি লিখিত দ্রব্যগুলি ধূপে ব্যবহার হইতে পারে।

পঞ্চাঙ্গ ধূপ—

চন্দনং কুস্কুমং নৃত্বং কর্পূরং গুগ্গুলোঽগুরু।
ধূপোঽয়ং ঘৃতসংযুক্তঃ পঞ্চাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥

ষড়ঙ্গ ধূপ—

সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্গুল্বগুরু চন্দনং।
ষড়ঙ্গ ধূপমেতত্তু সর্ব্বদেব প্রিয়ং সদা॥

অষ্টাঙ্গ ধূপ—

গুগ্গুল্বগুরুকং তেজপত্রং মলয়সম্ভবং।
কর্পূরং বালকং কুষ্ঠং নূতনং কুস্কুমং তথা॥
অষ্টাঙ্গঃ কথিতো ধূপো গোবিন্দ প্রীতিদঃ শুভঃ।

দশাঙ্গ ধূপ—

কর্পূরং কুষ্ঠমগুরু গুগগুলুর্নলিয়োদ্ভবং
কেশরং বালকং পত্রংত্বগজাতীকোষমুত্তমং॥
সর্ব্বমেতদ্ ঘৃতযুতং দশাঙ্গো ধূপ ঈরিতঃ॥

দ্বাদশাঙ্গ ধূপ—

গুগ্গুলুশ্চন্দনং পত্রং কুষ্ঠঞ্চাগুরু কুস্কুমং
জাতীকোষঞ্চ কর্পূরং জটামাংসীচ বালকং।
ত্বগুশীরঞ্চ ধূপোঽসৌ দ্বাদশাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ষোড়শাঙ্গ ধূপ—

গুগ্গুলুং সরলং দারু পত্রং মলয়সম্ভবং।
হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জ্জরসং ঘনং॥
হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজং
ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পিত্র্যেচ কর্ম্মণি॥

* ভাল ধূপের বাতি মহিশূর রাজ্যে প্রস্তুত হয়।

অর্থাৎ গুগ্গুল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, শ্বেতচন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধূনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাহা, জটামাংসী শৈলজ, এই ষোলটী দ্রব্য পসারীর দোকান হইতে ক্রয় করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করত চূর্ণ করিয়া ব্যবহারানুসারে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিলেই উত্তম ও সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত ধূপ প্রস্তুত হইবে। নখী ঘৃত ভর্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে। যদি বর্ত্তি প্রস্তুত করার অভিপ্রায় হয় তবে ঐসকল দ্রব্যের চূর্ণ ২ দিন জলে ভিজাইয়া পরে উত্তমরূপে পেষণ করত সূক্ষ্ম বাঁশের শুখনা কাঠিতে লাগাইয়া বর্ত্তি করত শুখাইয়া লইলেই হইল। এই ধূপ-সলাকা আমাদের দেশে পূর্ব্বে অনেকেই প্রস্তুত করিতে জানিত, কিন্তু কালের প্রভাবে ক্রমে সব নষ্ট হইতেছে। উপরিউক্ত শ্লোকে পরিমাণের উল্লেখ না থাকায় প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি অল্প ব্যয়ে ধূপ করিতে হয়, তবে মূল্যবান দ্রব্য পরিমাণে কম দিবে ও চন্দনের মাত্রা দ্বিগুণ করিয়া লইবে। ভাল কয়লার আগুণে ধূপ দেওয়া কর্ত্তব্য। যেমন প্রকৃতিভেদে মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের মনুষ্যের ভিন্ন দ্রব্য প্রিয়, অপ্রিয় হয় সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রীতির জন্য ভিন্ন প্রকার ধূপের ব্যবস্থা শাস্ত্রকারেরা করিয়াছেন যথা—

কেশবার্চ্চয়াং ষোড়শাঙ্গ ধূপ—

মুস্তকং গুগ্গুলুঃ কুষ্ঠং কর্পূরং মলয়োদ্ভবং।
দেবদারু জটামাংসী জাতিকোষঞ্চবালকং॥
মুরামাংসী হ্যগুরুকংত্বগুশীরঞ্চ কেশরং।
এলা তথা তেজপত্রং সর্ব্বমেতদ্ ঘৃতাক্তকং॥
ধূপোঽয়ং ষোড়শাঙ্গঃ স্যাদ্গোবিন্দপ্রীতিকারক

প্রতি ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ধূপের ব্যবস্থাও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে দৃষ্ট হয়। যথা—

গ্রীষ্মে চন্দনসারেন রাজসূয় ফলং লভেৎ।
তুরুষ্কস্য প্রদানেন প্রাবৃষ্যুত্তমতাংলভেৎ।
কর্পূর দানাৎশরদি রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ॥
হেমন্তে মৃগদর্পেণ বাজিমেধফলং লভেৎ।
শিশিরেঽগুরুসারেন সর্ব্বমেধফলংলভেৎ॥
বসন্তে গুগ্গুলুং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ।
পদমুত্তমমাপ্নোতি ধূপদঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
ধূপলেখা যথোর্দ্ধং নিত্যমেব প্রসর্পতি।
তথৈবোর্দ্ধগতো নিত্যং ধূপদানাত্তবেন্নরঃ॥

গ্রীষ্ম ঋতুতে চন্দনসার দ্বারা ধূপপ্রদান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষা ঋতুতে তুরুষ্ক ধূপ অর্পণ করিলে উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়। শরৎ ঋতুতে কর্পূর অর্পণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। হেমন্ত ঋতুতে মৃগনাভি অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। শীতকালে অগুরু সার প্রদান করিলে সর্ব্ব যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। বসন্ত ঋতুতে গুগ্গুল অর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। যিনি ধূপ প্রদান করেন, তিনি পরলোকে উত্তম পদ লাভ করিয়া থাকেন এবং ইহলোকে তাঁহার পুষ্টিলাভ হয়। ধূপশিখা যেমন প্রত্যহ ঊর্দ্ধগামী হয়, ধূপ দাতাও তদ্রূপ ধূপদান বশত প্রতিদিন ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকেন।

মুকুন্দ ধূপে বর্জ্জনীয় দ্রব্য—

ঐক্ষবং শালনির্যাসংপদ্মকং সরলক্রতু।
বচা মধুরিকা তৈলং গন্ধকাষ্ঠং কলম্বকং।
গন্ধকং টঙ্কণং তালং হিঙ্গুলঞ্চ মনঃশিলা
কক্কোলমুখরং দার্ব্বী গন্ধমাত্রী রসাঞ্জনং
অষ্টবর্গঃ শটীমেথী শিলাজিদ্গন্ধ চন্দনং
কুন্দুরু রেণুকং রাস্নাজমোদাশতপুষ্পিকা
হরিদ্রা জীরকং বৃক্ষক্ষীরঞ্চ রক্তচন্দনং।
কর্চুরকং মরুবকং যবানী গ্রন্থিকস্তথা॥

শৈলজং ধাতকী পুষ্পং নখী মোচরসাদিকং
মুকুন্দ ধূপে দেবর্ষে সর্ব্বমেতদ্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে

মহাদেবের প্রীতিকর ধূপ—
গুগ্‌গুলুং ঘৃতসংযুক্তং সাক্ষাদ্ গৃহ্নাতি শঙ্কর।
মাসার্দ্ধমস্য দানেন শিবলোকে মহীয়তে ॥
—"ইতি শৈব সর্ব্বস্বসার"—

কৃষ্ণাগুরুং সকর্পূরং ধূপংদত্মান্মহেশ্বরে।
নৈরন্তর্য্যেন মাসার্দ্ধং তস্য পুণ্যফলংশৃণু ॥
কল্পকোটি সহস্রাণি কল্পকোটী শতানি চ।
ভূঙক্তে শিবপুরে ভোগানন্ত্রাস্তেস মহীপতিঃ
"ইতি ভবিষ্যপুরাণে"

যে ব্যক্তি পনের দিন নিরন্তর কর্পূর মিশ্রিত কৃষ্ণাগুরু ধূপ মহেশ্বরকে প্রদান করে, সে কল্পকোটী সহস্র ও শত কল্পকোটী কাল শিবপুরে ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া পরে রাজা হয়।

দেবীপ্রিয় ধূপ:—
রক্তবিক্রম শালোচ সুরথঃ সরলস্তথা।
সন্তানকো নমেরুশ্চ কালাগুরুসমন্বিতঃ ॥
জাতিকোষাদ্য সংযুক্তো ধূপকামেশ্বরী প্রিয়ঃ।
ত্রিপুরায়াস্তথৈবায়ং মাতৃণামপি নিত্যশঃ।
সর্ব্বেষাং পীঠদেবানাং কান্তাদিনাঞ্চ পুত্রক।
এষ বাং কথিতো ধূপঃ শৃনুতং নেত্ররঞ্জনং ॥
ইতি কালিকাপুরাণে—

সকল দেবতাই ধূপদানে প্রীতিলাভ করেন, তবে মনসা ঠাকরুণের সঙ্গে ধূপের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্য হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"একে মনসা তাতে ধূনার গন্ধ।"

সাধারণতঃ এস ধূপ অমুক দেবতায় নমঃ বলিয়া ধূপার্পণ করা হয় কিন্তু ইহার বিশেষ মন্ত্র আছে যথা—

বনস্পতি রসোদিব্যোগন্ধাঢ্যোস্থমনোহর
আঘ্রেয়াঃ সর্ব্ব দেবানাং ধূপোঽয়ং
প্রতিগৃহ্যতাম্।

ধূপদান বিধির্যথা—
মধ্যমানামিকাভ্যাস্তমধ্যপর্ব্বণি দেশিকঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেন দেবেশি ধৃত্বাধূপং নিবেদয়েৎ ॥
ধূপাস্থানং সমভ্যর্চ্চ তর্জ্জন্যা ঘামায়াস্পৃশন্।
ধূপ ভাজন মন্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্চ্য হৃদাত্মনা।
উত্তীর্য্য দৃষ্টি পর্য্যন্তং ঘণ্টাংবামদিশিস্থিতাং ॥
বদায়ন্ বামহস্তেন দক্ষহস্তেন চাপয়েৎ ॥
"ইতি তন্ত্রসারঃ ॥"

ধূপ অর্পণ আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত যখন সেই আর্য্য ঋষিগণ বৈদিক অনুষ্ঠানাদি করিতেন তখনও দেবতার প্রীতির জন্য ধূপ ভাজন করা হইত তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি নিম্নে শিবার্চ্চন বিধি হইতে ধূপ সমর্পণের বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মন্ত্র

যাতেহেতির্মীঢুষ্টম্ হস্তেবভূবধনু। তয়াস্মান্বিশ্বতস্ত্বময় ক্ষমাপরিভূজ ॥ ধূবসিধুর্ধমন্তশ্চো মসমান্ধর্বতিত স্বঘষমম্বর্ধাম। দেবানামসিঘহ্লিগু মঠসস্মিতম্পপ্রিতমঞ্জুষ্ট তমন্দেবহূতম্ ॥

মুসলমানেদের মধ্যে লোবান নামে এক প্রকার দ্রব্য ধূপনের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ কখন কখন চন্দন কাষ্ঠের গুঁড়া ও অগুরুর আতর ব্যবহার করেন। জৈনদিগের মধ্যে কয়েক প্রকার ধূপের প্রচলন আছে তন্মধ্যে আমি নিম্নে একপ্রকার উৎকৃষ্ট ধূপের মসলার নাম সংগ্রহ করিয়া পাঠকদের প্রদান করিতেছি। যথা—

চন্দন ৴২ সের	কর্পূর কাছড়ি ৴।৷০ সের
অগুরু ৴।৷০ "	ফোনক গুণ ৴।৷০ "
টগর কাষ্ঠ ৴।৷০	গুগ্গুল্ ৴।৷০ "
দেবদারু ৴।৷০	অম্বর ৴।৷০ ভরি
কৃষ্ণাগুরু ৴।৷০	কস্তুরী ভরি

শীলারস উপযুক্ত পরিমাণ।

কেহ কেহ গুগ্গুলের পরিবর্ত্তে লোবানও দিয়া থাকেন। রাঢ় অঞ্চলে পাকাকলা ঘৃত ও ধূনা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার ধূনা প্রস্তুত হয়।

যদি অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত ধূপ প্রস্তুত করা কেহ আবশ্যক মনে করেন তবে তিনি আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহ ব্যবহার করিবেন। গুগ্গুল, অগুরু, বেনামূল, চন্দন, নাগর, মুথা, শৈলজ, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, বালা, কুড়, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, কর্পূর, জাতী কোধ, মুরামাংসী, কেশর, ছোট এলাচ, টগর, কস্তুরী, ধনে, বিড়ঙ্গ ধূণা, একম কাঠ, জ্যৈষ্ঠমধু, সৌনঙ্গী, গন্ধমাত্রি, কর্পূর, শর্করা ও ঘৃত। যাঁহারা অধিক জানিতে চাহেন তাঁহারা শাস্ত্র অনুসন্ধান করুন। পরিশেষে বক্তব্য—

ওঁ পার্থিব দ্রব্য সম্ভূতং পার্থিব দ্রব্য সংযুতম্।

জলদগ্নি শিখাপূতং ধূপং দেবি গৃহাণ মে।

ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (বর্ম্মণ)।

ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ

(১০৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

জর্ম্মণীর সুবিখ্যাত কবি গেটে একস্থলে বলিয়াছেন, সাহিত্যে পূর্ব্ববর্ত্তীর অর্জ্জিত সম্পত্তিতে পরবর্ত্তীর দায়াধিকারতন্ত্র বিশেষভাবেই প্রচলিত। সেই কবি বলেন যে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীর নিকট কিছুমাত্র ঋণী নহেন, তিনি হয় ত একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেকুব, নতুবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাবান্ ব্যক্তি, তবে, শেষোক্তের ঘটনা বর্ত্তমানকালে অসম্ভব। এইরূপ দায়াধিকার সাহিত্যে এত প্রবল যে পূর্ব্ববর্ত্তীর তহবিল হইতে পরবর্ত্তীগণ যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ করিলেও, তাঁহাদের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এই ক্ষেত্রে প্রধান কথা এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তীর সম্পত্তিকে পরিমার্জ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়াই গ্রহীতাকে উক্ত ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে; বিশ্বলোকের সমক্ষে নিজের মৌলিক উপার্জ্জন এবং পরিবর্দ্ধনা দেখাইয়া—মানবের জ্ঞানভাবের ভাণ্ডার পরিপুষ্টভাবে বর্দ্ধিত করিয়াই ঋণকলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এইরূপে সাহিত্যের গতি এবং উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর ধারাসম্বন্ধে ঋণ-গ্রহণ এবং ঋণ-মুক্তি বই নহে। বন্ধুগণ, আপনারা সকলে বর্ত্তমান কালের বহুপ্রচলিত "সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব" 'মৌলিকতা' 'জাতীয় সাহিত্য' 'বিশ্বসাহিত্য' প্রভৃতি সংজ্ঞাশব্দের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন বলিয়াই মনে করিতেছি। অধুনা, মনুষ্যসভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, গত তিনশতাব্দীর উন্নতিশীল পদার্থবিজ্ঞান এবং আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতির সাহায্যে মানুষ প্রাচীনতর কালের মনুষ্য-অদৃষ্ট এবং দেশকালের সীমাসংকীর্ণতাকে নানাদিকে অতিক্রম করিয়াছে। সমাজের মধ্যে শান্তি, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার স্থিরতা এবং সুখ সুবিধা প্রভৃতি বর্দ্ধিত করিয়া ব্যক্তিবিশেষকেও নিজ নিজ 'ব্যক্তিত্ব' লাভ করিতে

—সুতরাং অধ্যাত্মলোকেও অশেষপ্রকারে লাভবান্ হইতে অশেষ সাহায্য করিতেছে। আমাদের মধ্যে অনেক 'একরোখা' পণ্ডিতম্মন্য-ব্যক্তি এই ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে 'জড়-সভ্যতা' বলিয়া অভিধান রচনাপূর্ব্বক কেবল উহার বিজাতীয় দোষের লক্ষণগুলি উজ্জ্বল করিয়াই আমাদের অবজ্ঞা উদ্রেক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া থাকি যে এই 'সভ্যতা' মানবের অধ্যাত্ম-সভ্যতার নামান্তর, এবং উহার পরম ক্রম-বিকশিত প্রকাশ বই নহে। সৌভাগ্যগতিকে ইয়োরোপের এই 'জড়' সভ্যতা আমাদের উপর আপতিত হইয়া, আমাদের দ্বার-সমক্ষে বিশ্বমনুষ্যের সমস্ত জ্ঞানভাবকর্ম্মসম্পত্তি —সুতরাং অধ্যাত্মসম্পত্তি অপ্রত্যাশিতভাবে রাখিয়া যাইতেছে! আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাগরিত আছেন তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সমগ্রধরণীর মনুষ্যহৃদয়ের কর্ম্ম-উচ্ছ্বাস এবং জ্ঞানভাবের অভীজ্ঞতার পরিণতি গভীর আনন্দকল্লোলে জাগিয়া থাকিয়াই নিজের এই 'ব্যক্তিত্ব' এবং ইহপরকালের পরমার্থসাধনায় নিয়ত থাকিতে পারিতে-ছেন! এই সৌভাগ্য দুইশত বৎসর পূর্ব্বকার কোন মনুষ্যসন্তানের পক্ষেই এত সুলভ ছিল না। বন্ধুগণ, এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কোটি কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে এবং সহস্র সহস্র সাহিত্যসেবকের মধ্যে সেইরূপ একজন পরম সৌভাগ্যবান্ জাগ্রত ব্যক্তি। তিনি সভ্যজগতের প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যসম্পদ্, সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ এবং উহাদের প্রকাণ্ডতা জ্ঞাত আছেন, স্বীয় শক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ টুকুও বিশেষভাবেই জ্ঞাত আছেন; অপিচ তিনি সভ্যজগতের সহস্র পূর্ব্ববর্ত্তীকে হজম করিয়াই যেমন নিজের সাহিত্যজীবনকে the work of Supreme Culture* রূপে খাড়া করিয়াছেন তেমন একটা বিশেষত্বকে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার পরমতম সৌভাগ্যও উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি ইয়োরোপীয় কবিগণ হইতে ঋণগ্রহণ পূর্ব্বক এবং সেই ঋণ তাঁহাদের পক্ষেই পুরামাত্রায় শোধ করিয়া—বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্য-সম্পত্তির যাহা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা প্রথম পক্ষেই ইয়োরোপের সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করেন নাই; সর্ব্বাধিক প্রাচ্যের প্রণালী অবলম্বনে তিনি যেই সম্পত্তি উপার্জ্জন করত স্বাধীন মাহাত্ম্যতটে উত্তোলিত করিয়াছিলেন, পরম স্বানুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া এই গীতা-গুলির মধ্যে তাহাই পাশ্চাত্যের নয়নসমক্ষে ধরিয়াছেন, এবং উহা সরল ত্বরিতভাবে লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে!

ইংরাজী গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব কি, এখন তাহাই ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ নিজের দিক হইতে, অবশ্য, শৈশব-সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া নৈবেদ্য, খেয়া, রাজা ও ডাকঘরের রবীন্দ্রনাথের সমূহ ফল সন্দেহ নাই। সোণার তরীর সময় হইতে উহার বহু-আলোচিত প্রথম কবিতাটি হইতে, রবীন্দ্রের কাব্যজীবনে একদিকে যে সিম্বোলিষ্ট আদর্শের ধারা দেখা দিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন—উহা একদিকে শৈশব-সঙ্গীত হইতে আরব্ধ কবি-জীবনের উত্তর ফল; পক্ষান্তরে, উহার মধ্যে ইয়োরোপীয় আধুনিক সিম্বোলিষ্টগণের শিল্প-লক্ষণ ও কার্য্য করিয়াছে। বহির্দ্দিক হইতে

* গীতাঞ্জলির ভূমিকায় ইয়েট্‌স।

তিনি প্রাচ্যতরফের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগীতি-কবিগণের, পারস্যের স্থফীকবিগণের, এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক 'ভাবুক' কবিগণের—বিশেষতঃ, প্রাগুক্ত নৈভরলিঙ্ক ভারহারণ প্রভৃতি ফরাসী-বেলজী কবিসংঘের উত্তরাধিকারসূত্রে দাঁড়াইয়াছেন। সর্ব্বোপরি, ইংরাজী গীতাঞ্জলি হীব্রু বাইবেলের—বিশেষতঃ উহার ইংরাজী-অনুবাদ গীত-সংহিতার (Psalms) ভাষা-রীতি অবলম্বনেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখন, এই কথা আপনাদের সমক্ষে একটা প্রহেলিকা বলিয়া ঠেকিতে পারে। অনেকেই হয়ত, উক্ত সমস্ত গ্রন্থের প্রাণ-পদার্থের সহিত সাহিত্যিকের হিসাবে পরিচিত নহেন। কিন্তু সাহিত্যে, কোন কবিকে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ সূত্রে আনিয়া দৃষ্টি করিতে হইলে এই প্রণালী ব্যতীত গত্যন্তর নাই—কথাগুলিকে যথাসাধ্য বিবৃত করিতেই চেষ্টা করিতেছি।

এই সভায় কোন বক্তা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল বৈষ্ণব কবিগণের কতিপয় ভাব-সম্পত্তি লইয়া 'নাড়াচাড়া' করিয়াই ইয়োরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে, বিশেষতঃ সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তির কথা আর কিছুই হইতে পারে না। ইংরাজীতে 'বেকুবের স্বর্গলোক' বলিয়া একটা স্থান আছে, রবীন্দ্রকে বৈষ্ণব কবির বা হীব্রু পারসীক অথবা ইয়োরোপীয় কোন কবির কিংবা কবিসংঘের কেবল অধমর্ণ বলিয়া স্থির করিলে, আমরা ঐ 'বেকুবের স্বর্গেই' অবস্থান করিতে থাকিব। অসাহিত্যিকের পক্ষে এই স্বর্গবাসের দ্বারা কিছুই আসিয়া-যায় না; কিন্তু, যাঁহাদের পক্ষে, সাহিত্যের পূর্ব্বাপর-বিভিন্ন দায়সম্পত্তি এবং স্বোপার্জ্জনের যথাযথ পরিজ্ঞান বলিয়া পদার্থটি অপরিহার্য্য, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ নির্দ্ধারণ অপেক্ষা অধিকতর আত্মবঞ্চনা কিংবা ভয়াবহ ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উহা অপেক্ষা অপ্রকৃত কথাও বেশী কিছু সম্ভব নহে। আপনারা প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব-কবিগণের তেমন অন্য কোন কবির উপার্জ্জিত সম্পত্তির কোনরূপ অসঙ্গত উপচার কিংবা আত্মসাৎ ব্যবহার দেখিতে পাইবেন না, তিনি ভাবুকতা এবং ভাব প্রকাশের রীতি বিষয়েই পূর্ব্ববর্ত্তীর পথে—উহাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া এবং স্বয়ং গেঠের কথিত বেকুব নহেন বলিয়া—অন্তরাত্মার সহজাত প্রবৃত্তি বশে সাহসী হইয়া চলিয়াছেন; এবং স্বসিদ্ধ দৃষ্টি শক্তির ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালী জীবনের উদ্যানজাত সংগীত কুসুম চয়নপূর্ব্বক সাহিত্যমণ্ডলীকে উপহার দিয়াছেন। প্রকৃত বিচারকগণ তাঁহার পূর্ব্ব ঋণ যেমন দেখিবেন তেমন স্বকীয় উপার্জ্জনের সুমহৎ ফল টুকুও না দেখিয়া পারিবেন না।

যেমন বৈষ্ণবের, তেমন 'ব্রহ্মসঙ্গীত' লেখক-গণের অথবা হীব্রু বা স্থফীগণের কবিতাকে দার্শনিকতার ক্ষেত্র হইতে মোটামুটি 'দ্বৈত' আদর্শের অন্ততপক্ষে 'বিশিষ্টাদ্বৈত' আদর্শের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিলে ভুল হইবে না। তবে, এই দ্বৈত শব্দকে একটা বিশেষ দৃষ্টি-সহকারে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাঁরা দৃষ্টতঃ-জীব ব্রহ্মের অভেদবাদ মানেন না বলিয়া, মনুষ্যের অহংতত্ত্ব বা জগৎ-তত্ত্বকে অবিদ্যা-প্রাপ্তি কিংবা মিথ্যামূলক বলিয়া কোন ধারণা ইহাঁদের রচনার মধ্য হইতে আপনাকে চরম-প্রাপ্তি রূপে উপস্থিত করে না; আমাদের প্রাচীন 'অদ্বৈত' বাদিগণ হইতে ব্যবহারিক-

ভাবে এই স্থলেই তাঁহাদের পার্থক্য! সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, তাই, ইহাঁদের সমস্ত ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে 'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধটাই আমাদের চিত্তকে মুখ্যভাবে আঘাত করে। বন্ধুগণ, এই 'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধবোধ হইতেই মোটামুটি এই সকল কবিগণের সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস প্রকট হইয়াছে! সুফীগণ যেমন গ্রীক্ গীতিকবিগণের উত্তরসম্বন্ধসূত্রে দাঁড়াইয়াছেন, তেমন আমাদের বৈষ্ণব কবিগণও একদিকে প্রাচীন ভারতের 'ভক্তি'বাদী বা ভাগবৎগণের, অন্যদিকে সুফী মুসলমান কবিগণের পরবর্ত্তিতা-সূত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের এই ঋণ—মুসলমান প্রভাবজনিত ঋণ, বঙ্গসাহিত্যের ইতিবৃত্ত-আলোচকগণ কেহ যথাযথ ভাবে নিরূপণ না করিয়া থাকিলেও, উহা বিশেষজ্ঞের চক্ষে সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণের 'রাধা'কে সমষ্টি মনুষ্যের 'আমি' বলিয়া ধরিয়া লইলেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-বিচার রক্ষিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গে বৈষ্ণব কবিসূত্রে দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতসমূহ বা তজ্জাতীয় কবিতার মধ্যে ভারতীয় 'অদ্বৈত' আদর্শের ঝাঁঝ অপেক্ষাও বরং সুফীগণের লক্ষণটাই প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, দার্শনিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস অপেক্ষাও তাঁহার মধ্যে বরং হাফেজ জামী এবং তাঁহাদের শিষ্য নানক কবীরের বিশেষত্বই যে সমধিক প্রবল হইয়াছে, তাহাও ধীরভাবে নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার ভাবরীতির মধ্যেও ভারতীয় লক্ষণ অপেক্ষা বরং পারসীক লক্ষণটাই যে অধিক, তাহা বিলাতী সমালোচকগণও লক্ষ্য করিয়াছেন, গীতাঞ্জলি এই 'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতেই ন্যূনাধিক ধর্ম্ম এবং সাহিত্য অধিকারের মধ্যপথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! পক্ষান্তরে, উহার ভাষা-রীতির মধ্যেও যেমন ইংরাজী বাইবেলের প্রকাশ-প্রণালী পরিস্ফুট, তেমনি উহার 'সিম্বোলিজম' ও খ্রীষ্টের 'পেরেবল্' হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত পারশীক কবিগণের অপিচ আধুনিক ইয়োরোপের সিম্বোলিষ্ট কবিসংঘের প্রণালী পথেই অগ্রসর হইয়াছে। শেষোক্তের সহিত বিশেষতঃ মৈতরলিঙ্কের সহিত রবীন্দ্রের পার্থক্যটাও বিশেষভাবে ধর্ম্মক্ষেত্রের পার্থক্য! মৈতরলিঙ্ক সংশয়ী, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী, মৈতরলিঙ্কের sightless প্রভৃতি পরিদর্শন করিলে উভয়ের এই পার্থক্য সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। মৈতরলিঙ্ক যেন অন্ধের ন্যায় অজানার উদ্দেশ্যে 'হাতড়াইতেছেন'! তাঁহার প্রত্যেক বাক্যের অপূর্ব্ব ইঙ্গিত এবং আভাস বিচ্ছুরিত হইয়া হৃদয়কে আকুল করিতেছে, তীব্র বিদ্যুতের সচকিত উচ্ছ্বাস পরিহাসের, মতনই দৃষ্টিদ্বারে লীলা প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যাইতেছে! মৈতরলিঙ্কের সহ-পথিক এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহসী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ইঙ্গিত এবং আভাষই ন্যূনাধিক স্থির নিষ্ঠা এবং স্থির লক্ষ্য সাধন পূর্ব্বক পাঠকের হৃদয়কে বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থির করিতে এবং সময় সময় তদ্গত করিতেও পারিতেছে! তাঁহার রাজা ও ডাকঘরের মধ্যে এই "মৈতরলিঙ্ক প্রণালী" অপিচ উহার সহিত তাহার মিল এবং পার্থক্য উভয়ই প্রবল। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি ইয়োরোপে এখন বিজ্ঞান-যুগ এবং বিজ্ঞানের সংশয় বুদ্ধিই প্রবল বলিয়া মৈতরলিঙ্ক এই "আঁধার আবৃত ঘন সংশয়ের" মধ্যে একজন পরম Lightgiver বলিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইয়োরোপে মৈতরলিঙ্কের বর্ত্তমান প্রতিপত্তি হইতে রবীন্দ্রনাথ যে একটা পরম সাহস-ভিত্তি লাভ করিয়াছেন,

তাহা সাহিত্য-রসিক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। সংশয়ীর অপেক্ষা বিশ্বাসীর সঙ্কেত এবং ইঙ্গিত যে একটা পরম দৃঢ়তানিষ্ঠ বিশিষ্ট রসে পাঠকের চিত্ত অধিকার করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ কি? রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনা হইতে 'বুক বাধিয়া'ই যে গীতাঞ্জলির অধ্যাত্ম-সঙ্কেত কবিতাগুলি চয়নপূর্ব্বক ইয়োরোপের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ হয় না। সুতরাং এই 'আমি-তুমির' তত্ত্ব এবং সম্বন্ধ-সঙ্কেতের সূত্রকে পূর্ব্বকথিত স্বদেশী এবং বিদেশী প্রাচীন এবং আধুনিক কবিগণের মধ্যে অনুসরণ পূর্ব্বক বলিয়া না থাকিলে বুঝিতে পারিব না যে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকভাবে তাঁহার গীতাঞ্জলির মধ্যে কোথায় দাঁড়াইয়াছেন! এই রীতি এবং সিম্বোলিজমের ক্ষেত্রেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সম্মিলিত হইয়া কিপলিং এর অপসিদ্ধান্তকে বিপ্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে! এইরূপে দেখিলেই বুঝিব যে রবীন্দ্রের মধ্যে বরং ভারতীয় প্রাচীন লক্ষণ অপেক্ষা—হিন্দু আর্য্যের অদ্বৈতবাদস্ব অপেক্ষাও বরং পারশিক সুফীগণের লক্ষণই প্রবল হইয়াছে; বৈষ্ণবীয় 'মধুর' ভাবের জাগ্রত এবং প্রগাঢ় সম্বন্ধ-বুদ্ধি কিংবা বস্তু-গত রসনিষ্ঠা অপেক্ষাও বরং তাহার মধ্যে স্বপ্নমিলনের চঞ্চল অথচ তীক্ষ্ণ-উদ্দীপ্ত রসাভাসই সমধিক প্রবল হইয়াছে! দয়িতের সম্ভোগরসে স্থিরসন্নিবেশ বা 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের' অবস্থা অপেক্ষাও বরং উহার মধ্যে বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আকুলতা অথবা প্রয়ানের পিপাসা টুকুই উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে! শতমুখে শতভাবে শতছন্দে এই আকুলতা টুকুই সমগ্র গ্রন্থের অন্তরঙ্গীয় 'আত্মা'রূপে আমাদের অন্তরাত্মা দখল করিতেছে! এই অনুপম রসাভাস, এই অর্থাভাস, এবং এই আকুলতাই উহার প্রধান নিজস্ব এবং মাহাত্ম্য! এই বিশ্বাসী কবি স্বামী এবং কবীরের পক্ষেই নিজের বিশ্বাস লাভ পূর্ব্বক গীতাঞ্জলিতে সংক্রামিত করিয়াছেন! সুতরাং এই অঞ্জলির করজোড়ের প্রণালী বিশ্বমনুষ্যের নিত্যকালীয় পুরাতন পদার্থ! উহার জল-টুকুন—জলের শুভ্রতা স্বচ্ছতা উহার বালসুলভ সারল্য এবং তারল্য টুকুন মানবজাতির গায়ক কবি এবং ভক্তমাত্রের সাধারণ সম্পত্তি! জলের কমনীয় কোমল রসটুকুন তাঁহার হৃদয়জাত নিজস্ব! এই অঞ্জলির ফুলগুলিন একদিকে বঙ্গদেশের (প্রাচ্য) উদ্যানজাত, অন্যদিকে, ফুলের বিশিষ্ট বর্ণধর্ম্ম, মধু এবং গন্ধটুকু পুনর্ব্বার নানামতে কবির নিজস্ব! এইরূপে গীতাঞ্জলির মূল উপার্জ্জন নানাদিকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব! পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের রচনা পাঠ করিয়া গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জ্জিত বর্ণ মধু এবং গন্ধ লাভ করিলাম বলিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরা যে 'বেকুবের স্বর্গে' বসবাস করিতে থাকিব তাহা পুনঃপুনঃ আপনাদের বিচারপথবর্ত্তী না করিয়া পারিতেছি না।

এখন, বিলাতী সমালোচকগণ কোন্ দিক হইতে এই গীতাঞ্জলিকে একটা বিশেষ প্রাপ্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন? আমাদের চক্ষে ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে গুরুবাদী; জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে 'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসাহী অথবা উচ্ছ্বসিত হওয়া অপেক্ষাও, বরং খ্রীষ্টানগণের অধিকাংশ উচ্ছ্বাস কেবল পরিত্রাতা খ্রীষ্টের অভিমুখেই প্রবাহিত। ভারতবর্ষের বা পারস্যের 'ভাগবৎ' গণের মধ্যে এই 'আমি ও তুমি'র প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের ক্ষেত্র যে একটা ভাবোচ্ছ্বাস

দেখা যায়, উহা ঐরূপ অন্তরঙ্গভাবে কেবল বাইবেলের Psalms গুলির মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইবে। তন্মধ্যেও প্রায় সর্ব্বত্র পিতা-পুত্র সম্বন্ধের তরফ হইতেই যাহা কিছু উচ্ছ্বাস! পারসীক বা বৈষ্ণবভাবের—এক কথায় 'মধুর ভাবে'র কোন লক্ষণ উহাতে নিতান্ত কম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জগদীশ্বরকে খ্রীষ্টান কবি 'নাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতে জানেন না। তাঁহাদের হৃদয়ের ঐদিক সময় সময় খ্রীষ্টকে অবলম্বন করিয়া উদ্ঘাটিত হইতে দেখাগেলেও এই 'মধুর' রস ইয়োরোপীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রবল নহে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভগবান্‌কে 'রাধা' ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'নাথ' সম্বোধন করিতে হইলে যে জাতীয় বিশ্বাস এবং চরিত্র-প্রতিপত্তির আবশ্যক, অনন্তনিরয়বাদী বা আদিম-পাপসূত্রবাদী খ্রীষ্টশিষ্যের পক্ষে তাহাও নানা দিকে অসম্ভব বলিতে হইবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রতীচ্যের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের এই অপরিচিত 'মধুর' রসের বিশিষ্ট ধারা এবং কাব্য-রীতি প্রকটিত করিয়াই প্রতীচ্যের হৃদয়দ্বারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আঘাতপূর্ব্বক সম্পূর্ণ নবীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে! এই স্থলে বলিতে পারি যে, কবীর কিংবা জামীর রচনা বা বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবীর কোন রচনা নানাদিকে ভক্তি-তন্ত্রীর ভাবুকতা বা চরমপন্থী মিষ্টিসিজম বিষয়ে অতুলনীয় হইলেও, উহারা বর্ত্তমান ইয়োরোপের ঐ অস্পষ্ট-সঙ্কেতী এবং স্বপ্ন-সন্ধেনী 'সিম্বোলিষ্ট' কবিতার লক্ষণযুক্ত নহে বলিয়াই, ইয়োরোপের চিত্তকে—সংশয়ী ইয়োরোপের চিত্তকে এইরূপে আঘাত করিতে পারিত কি না সন্দেহ—পারিত না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচ্য অথচ বহুপ্রাচীন 'আমি তুমি'র সম্বন্ধকে ধর্ম্মসংগীতের পথে—ইয়োরোপের আধুনিক 'সিম্বোলিষ্ট' কবিতার প্রণালীপথে সাধন করিয়াই, সাফল্য এবং সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন! এই স্থানেই সাহিত্যবিচারকের চক্ষে 'গীতাঞ্জলির' অন্তরঙ্গীয় শক্তি এবং মাহাত্ম্য!

অন্যদিকে, গীতাঞ্জলির আদিম বাঙ্গালা কবিতাগুলিই যে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইবে—তাহা হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারেন না। 'কড়ি ও কোমল' বা 'মানসী' হইতে 'নৈবেদ্য' পর্য্যন্ত, পুনশ্চ 'নৈবেদ্য' হইতে 'ডাকঘর' পর্য্যন্ত কবি রবীন্দ্রের জীবনে যে যে যুগ গিয়াছে, তাহাই হয়ত আমাদের সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য উপার্জ্জনের যুগ বলিয়া বিবেচিত হইবে। বলিতে কি, ইংরাজী গীতাঞ্জলি একদিকে উহাদের সংগ্রহ-ফল হইলেও, বাঙ্গালা গীতাঞ্জলি কবিত্ব বিষয়ে উহাদের অনুরূপ ফল, কিংবা শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়াও হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা গীতাঞ্জলির মধ্যে প্রকৃত সাহিত্য-অধিকারের স্থির সামর্থ্য খলতা কিংবা ভাষা এবং ভাবার্থের পরিপূর্ণ সম্বন্ধ-সিদ্ধি না ঘটিয়া, বরঞ্চ 'প্রকাশ বেদনা' রসের তরলতা এবং অজানা পদার্থের উদ্দেশে কবিচিত্তের ব্যাকুলতাটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে—এবং উহা পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম অধিকারের সঙ্গীত-সাহিত্যরূপেই দাঁড়াইয়াছে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের রচনাগুলির মধ্যে ভাষা ছন্দ এবং ভাবার্থের যে নিবিড় 'বাঁধুনী' পরিলক্ষিত হয়, এইস্থলে সঙ্গীতের সুর-তালের অত্যধিক প্রাবল্য গতিকে উহা হয়ত নানাদিকে জলদ হইয়া পাঠকের চিত্তকে কেবল একটা অজানার আকুলতায় চঞ্চল করিতেই বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করিতেছে! অনেকে হয়ত

সঙ্গীত-কবির এই সমস্ত গুণকে সাহিত্য-অধিকারের 'দোষ' বলিয়াই মনে করিতে থাকিবেন। যেমন বলিয়াছি, অলঙ্কার শাস্ত্র যে সমস্ত 'অন্যায়'কে দোষ বলিয়া মনে করে, এ কালের রচনাগুলি সে সমস্ত দোষকে বরং জ্ঞান-পূর্ব্বক মানিয়া লইয়াই—সময় সময় ন্যায়-বাদার্থকে উল্লঙ্ঘন করিয়াও কেবল সংকেত রসিকতার সাধনাকেই উদ্দেশ্য করিতেছে। সবিশেষ, এ কালের ভাষা এবং ছন্দো-রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটা 'প্রত্যাবর্ত্তনের' লক্ষণই সূচিত! ছন্দ এবং ভাষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এত নির্ব্বিকার সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন যে, উহা ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়! একেবারে ভাষা এবং ছন্দো বন্ধনের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া চিত্তকে পরিব্যাপ্ত স্বেচ্ছাচারিতায় ছাড়িয়া দেওয়া! অনেকটা বালসুলভ সরলতার দিকে—অপিচ শৈশব সঙ্গীত এবং ভগ্নহৃদয় প্রভৃতির ভাষা এবং ছন্দো গতির দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন! ধর্ম্মের প্রভাবে কবি-চিত্ত যেমন বালসুলভ সারল্য-সাধনায় অগ্রসর!—উহা হয়ত ধর্ম্মের দিক হইতে, মনুষ্যত্বের দিক হইতে অনেকে বিশেষ লাভ অপিচ উন্নতি বলিয়াও মনে করিতে পারিবেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গলা গীতাঞ্জলি যে নৈবেদ্য বা খেয়া হইতে অগ্রসর হইতে পারে নাই; কেবল প্রাগুক্ত রীতির তরফ হইতে প্রাক্কালের অর্জ্জিত সম্পত্তিকে—মনিরত্ন এবং সোনা মোহর-গুলিকে নূতন টাকশালের রূপার চাকতি এবং তামানিকেলের ভাঙ্তি করিয়া চালাইতে চাহিতেছে; পূর্ব্বের ঘন রসকে তরল করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়াই সাধারণ্যে সংপ্রসারিত করিতে চাহিতেছে, অভিজ্ঞ পাঠক তাহাও হয়ত বলিতে ছাড়িবেন না! অবশ্য এই তরলতা 'দোষ' হইলেও; উহা একটা decadent style বলিতে পারা গেলেও উহা মর্ত্ত্যজীবনের পরবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের! উহা তাঁহার নিজস্ব মনিরত্নের ভাঙ্তি! এই ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যে স্বকীয় দোষে গুণে তিনি চিরকাল গরীয়ান্—'তাঁহারি তুলনা তিনি এ বঙ্গ মণ্ডলে'! আমরা দেখিতেছি, ধর্ম্মসঙ্গীত এবং নিজস্ব ভাবুকতার ক্ষেত্রে 'মহিমণ্ডলে' বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের প্রতি ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিব, তিনি একজন প্রেমতত্ত্বের গীতিকবি—সঙ্গীত কবি। তদনুসারে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফল কোন কোঠায় খুঁজিতে হইবে, তাহা সহজেই স্থির হয়। আমরা দেখিয়াছি, ভাবকে সুসঙ্গত বাক্যচ্ছন্দে কিংবা হৃদয়গ্রাহী নামরূপে ধরিয়া রাখা এক কথা, আর তাহাকে সঙ্গীতের পথে নিজের অজানা শূন্যবিশূন্যে খুঁটিহীন এবং উধাও করিয়া ছাড়িয়া দিয়া উহার চঞ্চল গতির অস্পষ্ট রেখাসমূহের প্রতিবিম্ব মাত্র গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা অন্য কথা! উহা সঙ্গীতের বিশেষত্ব! সুতরাং, এই দিক হইতে, সহৃদয় মাত্রেই হয়ত কণিকা, নৈবেদ্য এবং খেয়ার সঞ্চিত সমৃদ্ধিকে—ইংরাজী গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ বলিয়া মনে করিতে পারিবেন, উহার মধ্যে সোণার তরী চিত্রা কিংবা চিত্রাঙ্গদার সাহিত্য-সমৃদ্ধি অথবা ভাষা ও ভাবের ঘনরস নাই, কিন্তু কবির মৌলিক বিশেষত্বধারা এই পথে আসিয়াই নিজের চরমকে লাভ করিয়াছে এবং ঐ অপ্রাপ্তির আকুলতা বা অপ্রাপ্তিবোধকেই কবির সম্পর্কে একটা পরম প্রাপ্তিরূপে উপস্থিত করিতেছে! উহা ভানুসিংহের চরম খণ্ড—বৈষ্ণব কবির,

গায়ক কবির প্রৌঢ়-পরিণত বিকাশ। ভানু-সিংহের 'রাধা' চরিত্রের আকুলতাই 'রাজা' এবং ডাকঘরের 'অব্যক্ত' সম্পর্কিত কাকুতি এবং চ গীতাঞ্জলির 'ত্বং'পদের উদ্দিষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে! সাহিত্যের 'ভাব' পদার্থ টি কেবল রাগরাগিনীর উপর 'চড়াউ' হইলে, বীণাপাণি স্বয়ং পক্ষীরাজ ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া ছুটিলে, চিত্তপটে অর্থের যে ছায়া-ছবি অঙ্কিত হইতে থাকে, তাহাই রীতির ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলির প্রধান বিশেষত্ব, উহার মধ্যে সমাজের বা মনুষ্যজীবনের সুখদুঃখের সংঘাত, জীবনপথে ভালমন্দ বা পাপপুণ্যের কোন সমস্যা কিংবা সমস্যাপূরণের কোন সহায়তা পাঠক হয়ত পাইবেন না; কিন্তু একটা অচলপ্রতিষ্ঠ হৃদয় দর্পণের উপর ছায়াতপের বিচিত্রলীলা এবং পদে পদে ঊর্দ্ধের নীলিমা-অন্তরাল বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ চমকের ঈষারা লাভে মুগ্ধ হইতে চাহিলে এই কাব্যগ্রন্থের তুলনা বিশ্বসাহিত্যে আর মিলিবে না, উহার ঈষারা গুলিও হয়ত নানাদিকে 'একঘেয়ে'; কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহার নিজের বিশেষত্বের মধ্যে যে একটা চূড়ান্ত চরমপন্থিতা আছে, তাহাও বিশ্বের সঙ্গীত কবিতার সাহিত্যে অতুলনীয় বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না। এই সঙ্গীতরীতি এবং ভাবুকতার দিক হইতেই গীতাঞ্জলি প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিপত্তি প্রমাণিত করিতেছে— উহার মূল উপার্জ্জন একজন জন্মসিদ্ধ গায়ক ভাবুক এবং প্রেমিকদার্শনিকের অধ্যাত্মজীবন-জাত অপিচ জগতের অজ্ঞাতপদার্থের প্রতি একোদ্দিষ্ট হইয়া শত সহস্র মুখিন্ অথচ 'একহারা', উচ্ছ্বাস! কবিহৃদয় তুবরীর ন্যায় উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়া আকাশমার্গে কোমল মিষ্ট অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আলোকের ধারা-সম্পাত সৃজন করিয়া মিলাইয়া যাইতেছে!

সাহিত্য-বন্ধুগণ, এসিয়ার ব্যাস বাল্মীকি রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে প্রাচীন আর্য্য-জাতির সরল শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ব এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রকাণ্ড অথচ উদারগম্ভীর সঙ্গীত উপস্থিত করিয়া ইয়োরোপের হৃদয় জয় করিয়াছেন; উহাদের অন্তরস্থিত প্রাচ্য-সভ্যতার বিশিষ্ট বর্ণধর্ম্ম এবং সুর সাধারণ মানবত্তার ক্ষেত্র হইতেই, হোমরের দীক্ষাশিষ্য বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বক্ষে স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহাদের পর, কালিদাস ভবভূতির মধ্যে পরিপাটী ভাবরস এবং মার্জ্জিত-নিপুণ শিল্পসাধনার দৃষ্টান্ত দেখিয়াও ইয়োরোপ উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ দিয়াছে! পারস্যের ফারদোশী ও সাদী, বিশেষতঃ জামী এবং হাফেজও প্রেমের নামামুখী 'মিষ্টীক' কবিতার ক্ষেত্রে সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন। খণ্ড বা ক্ষুদ্র কবিতার ক্ষেত্রে— গীতি কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক ইয়োরোপের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন দুইজন কবি—পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্য কবি ওমর খায়ম এবং আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ! ওমর খায়ম স্বয়ং সুফী হইলেও তাঁহার হৃদয় বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদে পরিপূর্ণ! তিনি যে সমস্ত 'রুবাইর' দ্বারা orthodox বা ধর্ম্মধ্বজী সুফীসমূহের ভণ্ডতাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, উহারাই এখন (অবশ্য বিশিষ্ট কবিত্ব মাহাত্ম্যে) সংশয়ী ইয়োরোপের সহানুভূতি আকর্ষণপূর্ব্বক সাহিত্যরসিকগণের অনাবিল প্রশংসা লাভ করিতেছে। আর এখন, অধ্যাত্মবিষয়ে পরম সংশয়ী অথচ ভক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে পর্য্যাকুল ইয়োরোপের সমক্ষে ভক্তিপর্য্যাকুল রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী

গীতাঞ্জলিও অপরিচিত অর্থসংকেত এবং অধ্যাত্মতা উপস্থিত করিয়া সেইরূপ সাধুবাদই লাভ করিতেছে; উহা কালে ওমর খায়মের সম প্রতিপত্তি এবং খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। গীতাঞ্জলির অভ্যন্তরে প্রাচীন ব্যাস বাল্মীকির জ্ঞান-বৈরাগ্য কিংবা শৌর্য্যমহত্ত্বের উদাত্ত-মহীয়ান উচ্ছ্বাসের শিষ্যতা না থাকিলেও, কবির বীণা-তন্ত্রীর ঝঙ্কার মধ্যে নারদের সঙ্গীতি-সূত্রে যে অপরূপ মৃদুভঙ্গরঙ্গিণী এবং ভক্তিবিনোদিনী ব্যাকুলতা আছে, সঙ্গীত-প্রতিভার ঐ উদার পরিণতি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা মহার্ঘ প্রাপ্তি বলিয়া চিরকাল পরিগণিত থাকিবে; এবং অভিনিবিষ্ট বিচারকের চক্ষে উহার মাহাত্ম্য বরং বর্দ্ধিত হইয়াই চলিবে।

বন্ধুগণ, ইহা নিশ্চিত যে আধুনিক এসিয়ার অন্য কোন কবি এই সৌভাগ্য এবং সুবিধা লাভ করিতে পারেন নাই। অনুরূপ শক্তি কিংবা নৈপুণ্যের সংঘটনা পরের কথা, রবীন্দ্র-নাথের ন্যায় সরস্বতীর পদতলে লক্ষ্মীমাতার সুবর্ণপদ্মাসন স্থাপন করিতে না পারিলে, 'সাত সমুদ্র তের নদীর' দূরতা, বিভিন্ন ভাষা এবং আচার-সভ্যতার অশেষ অন্তরায় হইতে আপনাকে উত্তীর্ণ করিতে না পারিলে এ-পারের গীতাঞ্জলিকে ও-পারের বোকে (boquet) রূপে ধরিতে না জানিলে—কোন এসিয়াবাসীর পক্ষে ইয়োরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্যতা লাভও অসম্ভব ছিল। এত-দ্দেশীয় সাহিত্যসাধকের প্রতিষ্ঠাপক্ষে ইয়ো-রোপের সাধুবাদে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না স্বীকার করি—কোন প্রকৃত কবির চরমের মাহাত্ম্য বিষয়েও হয় ত বিশেষ কিছু আসিয়া-যায় না, কিন্তু বঙ্গদেশ বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গ-ভাষার পক্ষে আধুনিক সাহিত্যসভ্যতার ক্ষেত্রে একটা স্বীকৃতপদবী লাভ করা একান্তই লোভনীয় ছিল; উহা বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবি-গণের আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন বিষয়েও নিতান্ত অপরিহার্য্য ছিল। এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত বিচারক বা সমালোচকের দর্শন আমরা যথেষ্টমতে পাইতেছি না বলিয়াও উহার আবশ্যক ছিল। আমরা যতদূর জানি, রবীন্দ্র-নাথের কিংবা আমাদের কোন কবির সাহিত্য-উপার্জ্জনের দোষ বা গুণবিষয়ক প্রকৃত কোন সমালোচনাই এ যাবৎ দেশে প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় হৃদয়ের সহজাত বিবেক-ধারণার উপর নির্ভর করিয়া—একরূপ অসহায় ভাবেই, এতকাল সাহিত্য-সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। বন্ধুগণ, আমরা, বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রেই যে এইরূপ অসুবিধা ন্যূনাধিক ভোগ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ কি? রবীন্দ্রনাথ যেই পদবী অর্জ্জন করিলেন, উহা তাঁহার নিজের অন্তরাত্মার পক্ষে হয় ত এখন কোন বিশেষ উপকারে আসিবে না। কিন্তু বাঙ্গালী উহাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ এই উপার্জ্জনের উত্তর-ফললাভে যথোচিতমতে প্রয়াসী হইতে জানিলে ব্রতধারী সাহিত্যসেবক মাত্রেই নিজ-নিজ জন্মসিদ্ধ প্রতিভা এবং বিশেষত্বের সহিত ভারতীয় বিশেষত্বের সঙ্গতিপূর্ব্বক জগতের সাহিত্যগঙ্গার সঙ্গে উহার স্রোত-সম্মিলন এবং সুর-সঙ্গৎ করিতে পারিলেই, আমরা যেমন রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তেমন নিজেদের বিষয়েও প্রধান কর্ত্তব্যটুকু সমাধা করিতে থাকিব সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্ব এই যে, সাধকের ব্যক্তিত্বটুকুই সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রধান কথা! উহাই যাবতীয় সামর্থ্যের, মৌলিকতার কিংবা মাহাত্ম্যের

নিদান। উহা লাভ না করিয়া—ভালমন্দ যাহাই হোক—কেহই প্রকৃত সাহিত্যিক কিংবা কবি হইবার দাবীটুকুও উপস্থিত করিতে পারেন না। আমরা জানি, ইহাপেক্ষা অভাবের কথাও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য কিংবা সমাজের পরিসর মধ্যে আর দ্বিতীয়টি নাই। সাহিত্যের চরম বিচার প্রণালী নিদারুণ নির্ম্মম এবং নিরপেক্ষ পদার্থ! অনন্ত কাল প্রবাহের স্রোতোমধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আত্মতত্ত্বের নির্ভরে দাঁড়াইতে না পারিলে এইরূপ বিচারলাভের যোগ্যতাটুকুও অর্জ্জন করা যায় না, আমরা দেখিয়া আসিলাম রবীন্দ্রনাথ উক্তরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াই দাঁড়াইয়াছেন——তাঁহার প্রকৃত বিচার ভবিষ্যতের হস্তে। সুতরাং আমরা উপসংহারে কেবল বর্ত্তমানের যথাযথ পরিজ্ঞান এবং ভবিষ্যতের উদার উপলব্ধির প্রশস্তপথে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াই রাখিয়া যাইতেছি। মহানাটকের প্রাচীন কবি রামভদ্রের শ্রীমুখাৎ যেই প্রণালীতে ভারতীয় ভাবী রাজন্যবর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন উপস্থিতক্ষেত্রে তাঁহার ব্যঞ্জনাবহুল বাক্যকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়াই বলিতেছি :—

নত্বা সত্বা ভাবিনঃ শিল্পিবর্য্যান্
ভূয়োভূয়ো যাবতে শীলভদ্রঃ॥

শ্রী শশাঙ্কমোহন সেন।

নগর-বিজ্ঞান এবং অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ্

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে এডিনবারার অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ্ (Patrick Geddes) ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ইহাঁর সঙ্গে বহু ভারতবাসীর পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আজকালকার চিন্তাশীল ইংরাজ পণ্ডিতগণের মধ্যে গেডিজের আসন অতি উচ্চ। সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় ভারতবাসিগণ ইহাঁর নিকট অশেষ সাহায্য, পরামর্শ ও উপদেশ পাইবেন।

অধ্যাপক গেডিজের কথা আমরা ৺ভগিনী নিবেদিতার কাছে প্রথম শুনিয়াছিলাম। ইনি এক্ষণে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়র্ল্যাণ্ডের শিক্ষাসংস্কারে বিশেষ প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান এবং প্রাণ-বিজ্ঞান ইহাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সকল বিজ্ঞানের নিয়ম সমাজ-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করিয়া ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি Civics বা 'নগর-বিজ্ঞানে'র চর্চ্চায় নিযুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ব্যতীত ইহাঁর অনেক শিষ্য ও সহযোগী আছেন। কেহ অধ্যাপক, কেহ সম্পাদক, কেহ শিল্পী, কেহ চিত্রকর, কেহ বক্তা, কেহ ধর্ম্মপ্রচারক, কেহ চিকিৎসক, কেহ দার্শনিক। এইরূপ নানা শ্রেণীর শিষ্যগণকে নব নব পথে চালিত করিবার উপযুক্ত চরিত্রবল ইহাঁর বিশেষ সম্পত্তি।

গেডিজ তাঁহার অনুচরবর্গকে বলিয়া থাকেন, "আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করি। কাজেই সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ,

নগর, পল্লী ইত্যাদি সকল বস্তুই প্রকৃতির নিয়মানুসারে বুঝিতে চেষ্টা করা আমার স্বভাব। আমার বিবেচনায় নগর ও পল্লী-গুলি নরনারীর "মৌচাক" মাত্র। যে কারণে মধুমক্ষিকারা চাক প্রস্তুত করে মানুষেরাও সেই কারণে 'বসতি' প্রস্তুত করে। এই বসতিগুলির বৃদ্ধি, বিকাশ ও লয় মৌচাকের ইতিবৃত্তের অনুরূপ।"

গেডিজের লাইব্রেরীতে প্রাচীন নগর ও পল্লী সমূহের মানচিত্রের সংখ্যা খুব বেশী। জয়পুরের অম্বর প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে অযোধ্যা, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী ইত্যাদি নগরের এইরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান চিত্রকরেরাও এইরূপ নগর-চিত্র অঙ্কন করিতেন। মিশরের কাইরোনগরের মুসলমানী মিউজিয়ামে প্রদর্শিত মক্কা ও মদিনা নগরদ্বয়ের চিত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কাশী, কালীঘাট ইত্যাদি নগরের পটগুলিও মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিত্রকরদিগের নগর-চিত্রের অনুরূপ।

গেডিজের শিষ্যেরা রোম, ম্যাড্রিড, প্যারি, আমষ্টার্ডাম, অক্‌স্‌ফোর্ড, এডিনবারা ইত্যাদি নানা নগরের নানা চিত্র এক সঙ্গে দেখিতে পান। গেডিজ এই গুলির তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। নগরের morphology বা গঠনাকৃতি সম্বন্ধে ইনি গবেষণা করিতে ভাল বাসেন। ইঁহার নগর-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্রই হইবে।

নগর-বিজ্ঞান এক হিসাবে নূতন বিদ্যা, আর এক হিসাবে নিতান্ত নূতন নয়। নগরের রাষ্ট্রজীবন, শিল্পজীবন ইত্যাদি বিষয়ে নানা গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমাদের যাঁহারা ধন-বিজ্ঞান-বিষয়ক উচ্চ সাহিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে নগরশিল্প এবং নগর-ব্যবসায় বিশেষরূপেই বুঝিতে হয়। এ সকল বিষয়ে ইংরাজী গ্রন্থ অনেকই আছে। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ফ্রীম্যান, গ্রীণ এবং ফ্রেডরিক হ্যারিসন নগরসম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গেডিজের আলোচ্য বিষয় নগর-নির্ম্মাণের রীতি। নগরের ভিতর গৃহনির্ম্মাণ, পথ সমাবেশ, প্রাচীর সংস্থান, দুর্গ প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় গঠন ও মন্দির স্থাপন ইত্যাদি বিষয় বোধ হয় গেডিজের পূর্ব্বে আর কেহ বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করেন নাই। আমেরিকার "সিভিক্‌স্‌" অর্থে বর্ত্তমান রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক নানাবিধ আলোচনা বুঝায়।

নগর-নির্ম্মাণ বিদ্যা হিন্দুজাতির নিকট নূতন নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে "বাস্তুশাস্ত্র," "ময়শাস্ত্র," "ময়মত," "শিল্পশাস্ত্র" "নীতিশাস্ত্র" এবং "অর্থশাস্ত্র" নামক অসংখ্য গ্রন্থ আছে। নগর বিজ্ঞান বা Civics বিদ্যার নানা কথা এই সকল গ্রন্থে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিবৃত রহিয়াছে। সুতরাং গেডিজের সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে ভারতবাসীরা এ কথার উল্লেখ করিলে একটা অভিনব দিক হইতে হিন্দু সমাজের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি পড়িবে। এই সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক জয়পুর নগর শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য কতৃক ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগর স্থাপনায় তিনি "নীতিশাস্ত্রা"নুমোদিত নিয়ম মানিয়া কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দু 'নগর-বিজ্ঞানে'র অন্ততঃ একটি বস্তুব প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গেডিজ্ অবশ্য এখনও প্রাচীন বা আধুনিক

ভারতীয় নগরের কোন চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন কি না জানি না। বলা বাহুল্য, হিন্দু সাহিত্যে নগর-বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ আছে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। ভারতবর্ষে আসিয়া এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিবে কি না বলা কঠিন।

গেডিজের লাইব্রেরীতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। একই নগরের বিভিন্ন চিত্র তাঁহার নিকট পাওয়া যায়। প্রত্যেক চিত্রে গৃহ, দুর্গ, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, বিদ্যালয়, প্রাচীর, মন্দির ইত্যাদি সকল বস্তুই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমষ্টার্ডামের বন্দরে বহুসংখ্যক নৌকা এবং অর্ণবপোত চিত্রিত দেখিয়া প্রাচীন ভারতীয় নৌগঠনের সঙ্গে তুলনা করিবার সুবিধা হয়।

সকল চিত্র এক সঙ্গে দেখিলে যুগে যুগে নগর গঠন-কৌশলের বিভিন্নতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একই নগর যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও অনুপাতের গৃহ, উদ্যান, এবং দুর্গের আশ্রয়দাতা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলির রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক কারণ এবং প্রভাব বুঝিবার সাহায্য হয়। মোটের উপর নগর গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া মানব-সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম দিক্ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, নগর-বিজ্ঞান সভ্যতা-বিজ্ঞানেরই নূতন এক অধ্যায়।

তাড়াহুড়া করিয়া নগর নির্ম্মিত হইলে সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। মধ্যযুগে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীনকালের নগরে গৃহে, পথ, উদ্যান—সকল বস্তুই বেশ সামঞ্জস্য সহকারে সন্নিবেশিত হইত। হঠাৎ যুদ্ধ বিগ্রহের প্রভাবে অজস্র অর্থব্যয়ে নগরবেষ্টনী প্রাচীর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইল। তখন বাড়ী ঘর, রাস্তাঘাট, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রাচীন সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য ধ্বংস করা হইল। এদিকে প্রাচীরের ফলে নগরের ভিতরেও ঘেঁসাঘেঁসি, স্থানাভাব, সঙ্কীর্ণ গলি, বহুতল-বিশিষ্ট ঘর, অপরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদির প্রভাব আসিয়া পড়িল। রণসজ্জার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া নগরের অধিবাসীরা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইল। আমাদের কাশী, মথুরা, ইত্যাদি নগরের সঙ্গে ইউরোপীয় মধ্য-যুগের নগরের সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে।

গেডিজ এডিনবারা নগরকে নিজ নগর-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী বা বিজ্ঞানালয় স্বরূপ ব্যবহার করেন। ইঁহার মতে এডিনবারা 'নগর-বিজ্ঞান' আলোচনাকারীদিগের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। "প্রথমতঃ, এখানে প্রাচীন অবস্থা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। প্রাচীনের পার্শ্বেই নবীন গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক যুগের শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও কারুকার্য্য এবং কদর্য্যতা ও সৌষ্ঠব-হীনতা একসঙ্গে এই নগরে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, এডিনবারা নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়, আবার লণ্ডনের মত একটা বিশাল জনপদও নয়। নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলে নগর-জীবনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য এখানে থাকিত না। অথচ বৃহৎ মহাদেশ বিশেষ হইলেও এডিনবারাকে একটা নগর বলিতে সঙ্কোচ-বোধ করিতে হইত।"

গেডিজ বলেন, "মধ্যযুগের এডিনবারায় রণনীতির প্রভাবে অস্বাস্থ্যের বীজ প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে কদর্য্যতা এবং সৌষ্ঠবহীনতাও সর্ব্বত্র দেখা দেয়। আজকালও সৌন্দর্য্যহীনতা এবং অসামঞ্জস্যের অনেক

পরিচয় পাওয়া যায়।" এডিনবারা নগরে morphology বা গঠনাকৃতি আলোচনা করিবার জন্য গেডিজ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন সেই প্রণালীও আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ও নবীন নগর সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে আমাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বহু নূতন তথ্য পাইতে পারি। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, গৌড়, তমলুক, সাতগাঁ, কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর, চিতোর, গোয়ালিয়র, পুণা, মাদুরা, ইত্যাদি নগরকে আমাদের সমাজবিজ্ঞানসেবিগণ ল্যাবরেটরী স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর নগরগঠন সম্বন্ধে গেডিজের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—"অষ্টাদশ শতাব্দীতে এডিনবারায় এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই যুগে জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট-প্রবর্ত্তিত দর্শনবাদের প্রভাবে এক-গোষ্ঠীভুক্ত বৈচিত্র্যহীন লম্বা লম্বা ভবন নির্ম্মিত হইতেছিল। সেই সমুদয়ের ভিতর ঐক্য পাওয়া যায়, সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, বৈচিত্র্যের হানি পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায় না। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। যাহা হউক, তাহাতেও একপ্রকার সৌন্দর্য্যের বিকাশ সাধিত হইতেছিল—কারণ তাহাতে শৃঙ্খলা ও নিয়মের অধীনতা মন্দ ছিল না।

কিন্তু তাহার পর রেল আসিয়া জুটিল, এবং রেলের আনুষঙ্গিক নানাপ্রকার শিল্পের জন্য কল কারখানা, ফ্যাক্টরী, ইত্যাদির আমদানী হইল। এইগুলি রেলপথের নিকটেই পুরাতন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া বিকটমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর একটা নূতনত্ব আসিয়া জুটিয়াছে সত্য; কিন্তু এ কিরূপ বৈচিত্র্য?—এ যে রাক্ষসের পরপীড়নশীল ব্যক্তিত্ব, এ যে উৎকট নিয়মহীনতার তাণ্ডব! এই অবস্থায়ই এডিনবারা এখনও রহিয়াছে। এই অবস্থায়ই আধুনিক ইউরোপের বড় বড় নগরগুলি বিদ্যমান।"

গেডিজকে তাঁহার একজন বিদেশীয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, দেখিতেছি নগর বিজ্ঞান আলোচনার ফলে আপনি মধ্যযুগের মহিমা ও গৌরবের পক্ষপাতী হইতেছেন। আপনি কি আপনার স্বদেশীয় সাহিত্যরথী স্যার ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় মধ্যযুগকে ফিরাইতে চাহেন? পাশ্চাত্য সমাজের সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবিয়াছেন? ভবিষ্যতে ইউরোপের নগর ও পল্লী কোন্ আদর্শে গঠিত হইবে?" গেডিজ বলিলেন, "পারিলে মধ্যযুগই ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টিত হইতাম। কিন্তু মধ্যযুগের সমর ও রণসজ্জা চাহি না। মধ্যযুগের মারামারি কাটাকাটি, রক্ত পাত, জাতিবিদ্বেষ এবং ঐক্যহীনতা চাহি না। আমার মনে হয়, মধ্যযুগের জার্ম্মাণ সমাজ যেরূপ ছিল, আগামী যুগে পাশ্চাত্য সমাজ সেই দিকেই যাইবে। প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, নগরে নগরে সভ্যতার বৈচিত্র্য থাকিবে—শাসনের বিভিন্নতা থাকিবে, শিল্পের ও কৃষির পার্থক্য থাকিবে। অথচ দেশ ভরিয়া (এবং এমন কি স্বদেশের বাহিরেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে) আদর্শের ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিজ্ঞানের ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইবে, যুদ্ধবিগ্রহ অপসৃত হইবে, যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত হইবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারিত হইবে। আমি প্রদেশ মাত্রের শিক্ষা, সভ্যতা ও শিল্পের স্বাতন্ত্র্য চাহি। প্রত্যেক region বা জনপদের ভিন্ন ভিন্ন বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান, ভিন্ন ভিন্ন

সাহিত্যজীবন এবং ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি—এইরূপই আমার মত। এই জনপদগত (rigional) স্বাধীনতা খর্ব্ব না করিয়া মানব ভবিষ্যৎ সভ্যতা গঠন করিবে।”

গেডিজের জনপদগত স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত ভারতেতিহাসের সকল যুগেই পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই অবস্থাকে উনবিংশ-শতাব্দীতে ভারতবাসীরা অনৈক্য এবং বিভিন্নতার কুফলরূপে বর্ণনা করিতে শিখিয়াছেন। দেখিতেছি বিংশশতাব্দীতে সোশ্যালিষ্ট চিন্তাবীরেরা তাহাকেই আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিবেচনা করিতেছেন। Socialismএর পরিভাষায় ইহার নাম Decentralisation অর্থাৎ বহুকেন্দ্রী করণ। গেডিজের পরিভাষায় তাহারই নাম Regional Independence অর্থাৎ জনপদগত স্বাতন্ত্র্য। গেডিজ জার্ম্মাণির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় পল্লীস্বরাজের কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধেও গৌণভাবে এই তত্ত্বেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসী, কথায় কথায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া স্বদেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে মাথায় তুলিবেন না। অথবা বিসর্জ্জন দিতেও বসিবেন না। স্বাধীনভাবে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করুন। নিজ মাথা খাটাইয়া বর্ত্তমান সমস্যাগুলি তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। সমাজ-গঠনের আলোচনায় অনুকরণের স্থান একেবারেই নাই।

গেডিজের “জনপদগত স্বাধীনতা” অথবা সোশ্যালিষ্টদিগের “বহুকেন্দ্রীকরণ”-নীতি আরও গভীর ভাবে দেখা আবশ্যক। আমরা যদি ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, “আপনারা কি ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজজীবন, পল্লীসভ্যতা এবং বৈচিত্র্য-প্রিয়তা চাহেন? কেন না সময়ে সময়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রবলভাবে না থাকিলেও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চিরকালই সমাজ ও সভ্যতার আদর্শে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য ছিল। অথচ প্রদেশে প্রদেশে, জনপদে জনপদে, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, শাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ে যথেষ্ট বৈচিত্র্যও রক্ষিত হইত।” সোজাসুজি এইরূপ প্রশ্ন করিলে ইহাঁরা বলিবেন, “আমরা জার্ম্মাণি ও ভারতবর্ষের আদর্শ গ্রহণ করিতেছি মাত্র, পূরাপূরি সেই জিনিষই চাহি না। বিংশ শতাব্দীর মানব সপ্তদশ-শতাব্দীতে ফিরিয়া যাইবে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশশতাব্দীর আবিষ্কারগুলিকে ব্যর্থ যাইতে দিব না। সেইগুলির সাহায্যে এক নবীনতর সমাজজীবন গড়িয়া তুলিব। আমরা ঐক্যযুক্ত বৈচিত্র্য চাহি সত্য। কিন্তু প্রাচীন জার্ম্মাণি ও ভারতে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম অত্যধিক ছিল। সেগুলি চাহি না।”

এইরূপ চিন্তায় অগ্রসর হইলে আমরা একটা অভিনব মানবজগতে আসিয়া পড়িব। আজকালকার nation-গত এবং দেশ-গত রাষ্ট্রীয় ঐক্য বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। প্রত্যেক দেশে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা-কেন্দ্র এবং মানব-‘মৌচাক’ প্রস্তুত হইবে। অথচ এই মৌচাকগুলি পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। এই সখ্যসূত্রের নানা আকার দেখা যাইবে:—(১) বিদ্যাজগতে বিজ্ঞানের প্রভাব সকল জাতিকে অর্থাৎ মানব-মৌচাককে একীকৃত করিবে। জগতের যে কোন স্থানের মানবমাত্রই বিজ্ঞানের ফল ভোগ করিবে।

(২) রাষ্ট্রজীবনের federation বা যুক্ত শাসনপ্রণালী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ও জনপদে জনপদে বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে। Interna-

tional Tribunals বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়গুলি সেই ঐক্যের পথ প্রস্তুত করিতেছে।

(৩) ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধিপত্র বা Zollvereinsএর ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলিতে অভ্যস্ত হইবে।

এইরূপ ঐক্য প্রবর্ত্তনের প্রভাবে জগতের নানা কেন্দ্রে নানাপ্রকার শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, চিন্তাপ্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী, পারিবারিক জীবন ইত্যাদির বিকাশ হইতে থাকিবে। জাতি, nation, দেশ, ইত্যাদির পরিবর্ত্তে নগরকেন্দ্র, পল্লীকেন্দ্র, জনপদ-কেন্দ্র ইত্যাদি নূতন নূতন কেন্দ্রের অভ্যুদয় হইবে।

গেডিজ সকল জিনিষই চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া থাকেন। কাগজ পেন্সিলের সাহায্য না লইয়া ইনি কোন তথ্য প্রকাশ করেন না। মধ্যযুগের প্রথম অবস্থা হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতা কিরূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন করিয়াছে তাহার বিবরণ ইনি চিত্রাকারে প্রদান করিতেছেন। চিত্রগুলি এখনও কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। সভ্যতা-বিকাশের ধারা বুঝাইবার জন্য এইরূপ ব্যাখ্যা প্রণালী নিতান্তই কার্য্যকরী।

জগতের বিবিধ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইঁহার স্বতন্ত্র মত আছে। ইনি ফরাসী দার্শনিক কম্‌তের নিয়মে বিজ্ঞানসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানগুলিকে বিক্ষিপ্তভাবে না দেখিয়া ইনি পরস্পর-সাপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করেন। ইনি বৈজ্ঞানিক মহলে শ্রমবিভাগনীতির বিশেষ পক্ষপাতী নন। ইঁহার মতে কোন বিদ্যার আলোচনা-কালে অন্যান্য বিদ্যা ভুলিয়া থাকা উচিত নয়। বিজ্ঞানসমূহের পরস্পর সাপেক্ষতা সম্বন্ধে তাঁহার মত একটি বক্তৃতায় বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"This multifarious division of labour, with its corresponding specialisms, arose to promote civilisation, and to further the productivity of each individual life; yet now it overpowers the individual and is more than threatening the community. * * * The advancing sciences are coming to realise their manifold connections, their profound and intimate unity: the arts no longer content with the separate pursuit of technical perfection, are striving towards harmony; and this, with widening aims, of expression and of citizenships. This humanising and reunion of the sciences, this kindred orchestration and application of the arts, are now seen as the essential problem and movement of our time."

পাশ্চাত্য জগতে এক্ষণে একটা বিরাট বিপ্লব চলিতেছে। ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা এবং ভবিষ্যৎগতি সম্বন্ধে গেডিজ তাঁহার নব প্রকাশিত Sex-নামক গ্রন্থে (Home University Library Series) লিখিয়াছেন :—

"The essential transition is that in progress within the Industrial Age itself, that between its initial lower phase and the incipient higher

one—in a word, from the past century of *paleo*-technic industry, mechanical militant, monetary to the opening one, that of a *neo*-technic civilisation, founded upon more skilled and scientific industries and arts, and aiming towards truer peace than any which can be guaranteed by armour ; and towards these ends sustained alike by synthetic intelligence and by creative idealism. On one side is the present dominant civilisation—of coal and steam, of machinery and chief products, of expanding markets and widening empires—themselves groaning under ever-increasing armaments torn by fiscal disputes and ruled by the financiers' assumed omnipotence. * * * Even the "progress" of which it has boasted so much is too little to be estimated in quality of life, however easily in quantity. * * * Wherever any words be said of progress in quality of civilisation and of life towards its ideals, then there is silence, or if that will not answer, a very tumult of utilitarians and paleotects crying out with one voice, 'Away with these utopians !'

Yet the advance quietly making in our own generation, since Ruskin was thus hooted out of Economics, is that his prophecies of the final social economy we here call *neo*-technic are actually coming to pass. * * * * The practical utopians are already at work, and even drafting, as here, their historic estimate of the receding futilitarians. * * * This central antithesis of *palio*-technic and *neo*-technic thus involve the passage from the predominant *mechano-centric* thought and philosophy of industrial man to the originative, *bio-centric* instinct and inspiration of domestic woman. Thus in a word, we find ourselves meeting Bergson upon a fresh path."

এই অংশ পাঠ করিয়া যুবক ভারতের ভাবুকগণ গেডিজকে তাঁহাদের স্বজাতিভুক্ত করিয়া লইতে উৎসাহী হইবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গেডিজ ফরাসী দার্শনিক কম্‌তের শিষ্য। ইনি ফরাসী পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। ইঁহার মতে ফরাসীজাতির সংস্রবে থাকিয়াই স্কট্‌ল্যাণ্ডের সভ্যতা গঠিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের রাজরাজড়া হইতে রাণী মেরী, ধর্ম্মপ্রচারক নক্‌স্, দার্শনিক কার্লাইল এবং ঔপন্যাসিক স্কট্ পর্য্যন্ত সকলেই মুখ্যতঃ অথবা গৌণতঃ ফরাসী প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই কথা গেডিজের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, কম্‌তের "ইতিহাস-বিজ্ঞান" এবং "বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ" গেডিজের চিন্তারাজ্যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইনি নগরবিজ্ঞান আলোচনার জন্য একটা স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার নাম "আউটলুক্ টাওয়ার" বা নগরপর্য্যবেক্ষণালয়। এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া গেডিজ ভূগলবিদ্যায় "বিজ্ঞানের পরস্পর সাপেক্ষতা" বিশদরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। কোন বিদ্যাই যে অন্যান্য বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইতে পারে না এই ভৌগোলিক সংগ্রহালয়ের সাজসজ্জা দেখিলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ইতহাস-বিজ্ঞানের আলোচনায়ও গেডিজ কম্‌তের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য নূতন চর্চ্চার ফলে ইনি কতকগুলি নূতন দিকে তথ্যরাশি সাজাইয়া গুছাইয়া মত প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহার চিন্তার "কাঠামো" ইংরাজ-পণ্ডিত ফ্রেডরিক হ্যারিসন সম্পাদিত কম্‌তের New Calendar of Great Men অর্থাৎ "মহাপুরুষপঞ্জী"র আদর্শে গঠিত। এই আউটলুক টাওয়ার গৃহে মানবসভ্যতার ইতিহাসধারা চার্ট ও মানচিত্রের সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। চিত্রগুলি দেখিলে বুঝা যায় কম্‌তের আদর্শ ইনি কতখানি গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইঁহার স্বাতন্ত্র্য তাহাও ধরিতে পারা যায়। New Calendar of Great Men গ্রন্থে বীরবর্গের জীবনকথাই বিবৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভূমিকার অভ্যন্তরে জনসাধারণ এবং সভ্যতাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গেডিজের চর্চ্চায় এই প্রবাহের বিবরণই বিশেষরূপে পওয়া যায়। ইনি বীরপুরুষগণের নাম বেশী উল্লেখ করেন না।

গেডিজ তাঁহার চিরজীবনের অর্জ্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ সমস্তই এই আউটলুক টাওয়ারে সঞ্চিত করিয়াছেন। গেডিজ এখনও বেশী গ্রন্থ লিখেন নাই। ইঁহার প্রকাশিত পুস্তক অতি অল্পমাত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার চিন্তার ফল বহুলোকই পাইয়াছেন। ইঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া অনেকেই "মানুষ" হইয়াছেন। আমাদের দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথা মনে পড়ে। ইনিও এখন পর্য্যন্ত বেশী কিছু লিখেন নাই।

দাশরথি রায় *

কালের কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে যে আশা, যে আকাঙ্ক্ষা, যে সুখ দুঃখ, আমাদিগকে উত্তেজিত করিত, এখন আর তাহা করে না। এখনকার মনের গতি ও আদর্শ তখনকার মনের গতি ও আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাই এখনকার সাহিত্য তখনকার সাহিত্যের সহিত মেশে না। পূর্ব্বে আমাদের বেদবিধির উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি আমাদের আদর্শ গ্রন্থ ছিল। উহাদের তাবৎ ভাব আমাদের মনের এবং সাহিত্যের উপর আধিপত্য করিত। আমাদিগের সকল ক্রিয়া কর্ম্মই ঐ সকল বিশ্বাসমূলক ছিল। যুক্তির মনোহারিত্বে ভুলিয়া, ঐ বিশ্বাসগুলিকে

* সাহিত্য-সভার ১৩২১ শ্রাবণের অধিবেশনে পঠিত

আমরা এখন যেরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখি, তখন সেরূপ দেখিতাম না। আশা ও আকাজ্ক্ষা অল্প ছিল বলিয়া, আমরা অভাবও অতি অল্প বোধ করিতাম। তখন রেল, তার, পোষ্ট-অফিস প্রভৃতি ছিল না। কাজেই জীবনের প্রসারও কেবল নিজ গ্রামে বা সন্নিহিত গ্রাম সমূহে নিবদ্ধ থাকিত। জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা না থাকায়, গ্রামস্থ দলাদলীর উত্তেজনা লইয়া, কিম্বা তাস, পাসা, দাবা, যাত্রা, পাঁচালী, কবি, ঢপ্, কীর্ত্তন, তুক্ক প্রভৃতি লইয়া আমোদে আমরা দিন কাটাইতাম। রসে ডুবে থাকাই তখন আমাদের স্বভাব ছিল। অভাবের এত রকম, তখন ছিল না। তখন খাইয়া পরিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া দিন কাটাইবার অবস্থা আমাদের প্রায় সকলেরই ছিল।

বঙ্গের এই সচ্ছলতার দিনে দাশরথি রায় মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পাঁচালীর ভূমিকায় নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

ধাম—গ্রাম বাঁধমুড়া
তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-চূড়া
দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম।
অহং দীন তৎ-তনয়
পীলায় মাতুলালয়
ইদানীং মাতুলালয়ে ধাম।

পূর্ব্ববর্ণিত সময়ের, এবং আদর্শের প্রভাব, দাশরথির কাব্যে এবং জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাল্যকালে কবির গান, তাঁহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ছিল। তাই কবিওয়ালা হইবার আশায় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠে কখনও মনোযোগ করেন নাই। কবিওয়ালাদের লইয়া, সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে দিন কাটাইতে ভাল বাসিতেন। পরে এক সময়, পিতার এবং মাতুলের তিরস্কারে, তিনি কবিগান এবং কবিওয়ালাদিগের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পাঁচালী রচনা এবং পাঁচালী গান করিতে আরম্ভ করেন। এই পাঁচালী তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। ইহার দ্বারা তিনি সঙ্গীতে, ভাবে এবং ভাষায় এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন। কি সুরের গাম্ভীর্য্যে, কি বৈচিত্রে কি অর্থগৌরবে, কি রচনা চাতুর্য্যে, কি শব্দের বাঁধুনিতে, কি ভক্তি, প্রীতি, করুণ প্রভৃতি রসের অবতারণায়, দাশরথি সমভাবে নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যতদিন বঙ্গ সঙ্গীত থাকিবে, যতদিন প্রাচীন আদর্শ থাকিবে, ততদিন দাশরথির প্রভাব চির সমুজ্জল থাকিবে। আমি নিম্নলিখিত বিষয়ে তাঁহার কাব্য-জীবন আলোচনা করিব।

১। সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্য, বৈচিত্র্য এবং অর্থগৌরব।

২। শব্দের বাঁধুনী এবং অর্থগৌরব।

৩। উপমা এবং অর্থগৌরব।

৪। পূর্ণব্রহ্মভাব-মিশ্রিত ভক্তি, প্রীতি,-করুণ প্রভৃতি রসের সৃষ্টি।

৫। রসিকতা ও ব্যঙ্গ।

৬। সমাজে এবং সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা।

(১) সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্য, বৈচিত্র্য এবং অর্থগৌরব।

দাশরথির পাঁচালী শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ইতর-ভদ্র, ধনী-নির্ধন, সকলেই তুল্যরূপে মুগ্ধ হইতেন। কেহ সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইতেন, কেহ সুরে হইতেন, কেহ শব্দের বাঁধুনিতে হইতেন, কেহ বা ভাবে মুগ্ধ হইতেন। আজকালকার যাত্রা থিয়েটারের মতন, ভাল পোষাক পরিচ্ছদ, সাজ সরঞ্জাম

প্রভৃতি নয়নঃসুখকর কোন সামগ্রী না থাকিলেও, তাঁহার পাঁচালী শুনিতে অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। দাশরথি নিজে ছড়া কাটাইতেন এবং তাঁহার অনুজ তিনকড়ি গান করিতেন। দাশরথি খেয়াল ভাঙ্গিয়া সঙ্গীতের এক নূতন রীতির সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাতে নানাবিধ সুরের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ গানই অর্থগৌরবে পরিপূর্ণ এবং সুগায়কদিগের বিশেষ আদরের বস্তু। সুগায়ক ভিন্ন তাঁহার গান যে কেহ গাহিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গুটিকতক গান এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

মূলতান—একতালা

দোষ কারো নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্য-ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ
সে কূপ ব্যাপিল,—কালরূপ জল—
কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণি
বিগুণ করেছি স্বগুণে
কিসে এ বারি নিবারি
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে—
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে
তবে তরি—চরণ-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি করি ক্ষমা।

বাগেশ্রী বাহার—একতালা

হে কুলদায়িনী সতি! ব্যাকুল সব কুলবতী
অকুল মাঝে কুলাও যদি কূল, জননি।
তবে দাও মা, গোকুলপতি পতি।
যার তরে চিত্ত কাতর, নেত্রে নীর নিরন্তর
বিতর সত্বর বর, হে হৈমবতী
সংসারে আর নাই মা মতি
দেখিলাম যে হতে গোলকের পতি
রূপে নয়ন মত্ত; শ্যামের তত্ত্ব
শুনে মত্ত শ্রুতি।

সুরট মল্লার—ঢিমে তেতালা

সখি গো! ডুবিলাম ঐ রূপ সাগরে
এই গোকুল নগরে, আছে কে হেন সুহৃদ
আসি তরঙ্গে [illegible] ধরে।
মরি কি রূপ-মাধুরী, নীলোৎপল-বল নিল হরি
দিল লাজ নীল [illegible],
কাল তো কত দেখিলো, সখিলো, একিলো কালো
অখিল ভুবন আলো করে।
ভবে এ নীলধন কে আনিলে, বিনিমূলে তরুমূলে
ও নীলবরণ কিনিল মোরে।
আমি একা কোথা রাখি, কিছু ধরো ধরো গো সখি
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে
কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছুকাল ঐ কালোনিধি
হেরিলে আঁখির [illegible] হবে।
ঐ যে ক [illegible], [illegible]রূপাকপ—
দাশরথি কয়, শ্রীমতি, দেখ নয়ন মুদে অন্তরে।

খাম্বাজ—একতালা

মম-মানস-শুক পাখি
সুখ-মোক্ষধাম সুকোমল-নামটি-কমল-আঁখি-
ঐ বুলিটি ধর। আমায় সুখী কর
শুক নারদ যায় সুখী।
সদা বল তুমি কৃষ্ণ-রাধা-রাধা
পাবে সুধা—ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা,
কেন খাও [illegible]হীন ফল সদা
বিসম্ব কাননে থাকি।
আশা-বৃক্ষে বসে, আর কেন নিয়ত
এখন হও দাশরথির অনুগত
আয় রে আমি তোরে হেম-বিনিন্দিত
প্রেম-পিঞ্জরেতে রাখি।

(২) শব্দের বাঁধুনী এবং অর্থগৌরব।

এ বিষয়ে দাশরথি পরবর্তী লেখকগণের গুরু স্থানীয়। সাধারণতঃ দেখা যায় শব্দের বাঁধুনী করিতে গেলে অর্থ-গৌরবের হ্রাস হয়। কিন্তু দাশরথির রচনায় এ উভয়ের মর্য্যাদা সমানভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার

অধিকাংশ রচনাই যমক অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ। মনে হয় এত যমক অনুপ্রাস অপরে কেহ ব্যবহার করেন নাই। ইহার প্রভাব এখনও বাঙ্গালা-সাহিত্যে সর্ব্বত্র দেখা যায়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার এ প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি রচনা উদ্ধৃত করিলাম।

(মা !) তারিণি-তাপ হারিণি !
তার তারা ! প্রদানে পদ-তরণী
তপন-তনয়-তাপে, তাপিত তনয়-তনু
ত্রাশ নাশ, তারা, ত্রিবিধ-তাপ বারিণি
তপাদি-লোক-মন-তৃপ্তি-কারিণি,
তুমি-তপ্ত-হেম-বরণী,
তন্ত্রে তদন্ত-বিহীন
জানে কে তত্ত্ব তব, পদ-তরঙ্গ তরল তরণী
ত্রিগুণ-ধারিণি ত্রিলোচনি !
তৃণাতীত-তৃণ, তপ-বিহীন
তুচ্ছ তব তনয় দাশরথির তিমির-দূর-কারিণী।

ধনি ! মম ভক্ত কৃত্তিবাস,
করে বাসনা পীতবাস,
বাস নাহি পরে, ঘরে বাস নাহি করে,
শ্মশান-বাসেতে বাস,
শুন নাই কি তোমরা সুন্দরী সকলে,
শুকদেব জন্মলয়ে ধরাতলে,
না করে বস্ত্র ধারণ আমার কারণ,
ধারণ করিলেন সন্ন্যাস।
মাতৃগর্ভে যদিন থাকে বস্ত্রশূন্য
সে কদিন ত জীবের থাকে হে চৈতন্য
হইলে ভূমিষ্ঠ সে চৈতন্য নষ্ট,
নানা সুখের অভিলাষ।
বাসে বাসত্যাগী, রতনে নয় রত,
বাসনার বশ নহে জ্ঞানী যত,
ত্যজিয়ে অম্বর, ভজিলে পীতাম্বর
গোলক বাসেতে বাস।

ননদিনি গো ! বলে দগ্ধুরে সবারে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি বাস,—কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে, যে থাকে বার হৃদয়বাসে,
ওলো ! সেকি বাসে বাস করে॥
কাজ কি গোকুল ! কাজ কি গো-কুল !
গোকুলের সব হক প্রতিকুল,
আমিত সঁপেছি গো-কুল !—
অকুল কাণ্ডারীর করে।

হেথা সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে গোপাল গো-পাল লয়ে
আসিছেন সখাগণ সনে,
পথ মধ্যে অদর্শন হইয়ে পীত-বসন
যান চন্দ্রাবলী-কুঞ্জবনে॥
চন্দ্রাবলী রাধাধনে(র) চন্দ্রমুখ দরশনে,
চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে,
বলছে গোকুলচন্দ্র ! আজি কি আমার শুভচন্দ্র,
উদয় হইল ব্রজপুরে॥
কোন ঘাটে ধুয়েছি মুখ যাঁরে ভজে চতুর্ম্মুখ
সে মুখ সম্মুখে—একি লাভ,
যদি চাও চন্দ্রমুখ তুলি, মুখ রাখ একটী কথা বলি,
নতুবা জানিব মুখের ভাব॥
অধো কবোনা ! তুল শির, শুন ওহে তুলসীর,
প্রিয় কৃষ্ণ ! দাসীর অভিলাষ,
অন্তরে-গণি প্রয়াস এক রজনী পীতবাস
দাসীর বাসেতে কর বাস॥

(৩) উপমা এবং অর্থগৌরব।

দাশরথির রচনায়, যমক অনুপ্রাসের যেরূপ বাহুল্য, উপমারও সেইরূপ বাহুল্য দেখা যায়। উপমায়ও তিনি অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এত মালোপমা অন্য কাহারও রচনায় দেখা যায় না। কোনও কোনও স্থলে এই উপমাগুলি কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর হইলেও অধিকাংশ স্থলে ইহারা মনের ভাবকে বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত করিয়াছে। সংস্কৃত

সাহিত্যের অনেক নীতিগর্ভ কথা, এবং আমাদের সমাজের অনেক চিত্র, এই সকল উপমাগুচ্ছে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উপমা উদ্ধৃত করিলাম।

অমৃত খাইয়া রোগ, ব্রহ্ম বস্তুর প্রাণ বিয়োগ,
ভেবে কিছু করতে নারি ধার্য্য।
সখ্য যার গড়ুরের সঙ্গে তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে
ওহে মোক্ষদাতা! কিমাশ্চর্য্য।
গ্রহ যাগের এই কি গুণ, দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ,
জ্বেলে আগুণ—দ্বিগুণ কম্প শীতে।
বাসকে বাড়িল কাস, দয়া করে ধর্ম্মনাশ
গয়া করে কি নরকে যায় পিতে।
ভক্তি করে ভাব চটে, দান করে দুর্গতি ঘটে,
মিছরির পানা পান করে ক্ষিপ্ত।
কোন শাস্ত্রে শ্রীনিবাস! কাশিতে মরে স্বর্গবাস!
কাশীতে মরে ভুতযোনী প্রাপ্ত।
জগন্নাথ দেখে রথে নর যায় কি নরকেতে,
গণেশ ভজিয়া কর্ম্মে বাধা—
মাণিক রাখিয়ে ঘরে (যেমন) দৃষ্ট হয়না অন্ধকারে,
(তেমন) কৃষ্ণ ভ'জে কলঙ্কিনী রাধা।

সন্তানের তুল্য মায়া নাই, সে কেমন,—

শশীর তুল্য রূপ নাই, কাশীর তুল্য ধাম।
প্রেমের তুল্য সুখ নাই, রামের তুল্য নাম।
রোগের তুল্য শত্রু নাই যোগের তুল্য বল।
ভক্তির তুল্য ধন নাই মুক্তির তুল্য ফল।
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই গঙ্গা তুল্য জল!
বিপ্র তুল্য জাতি নাই — সর্প তুল্য খল॥
পবন তুল্য গমন নাই, রাবণ তুল্য দাপ।
মরণ তুল্য শঙ্কা নাই, হরণ তুল্য পাপ।
গড়ুর তুল্য পক্ষী নাই, শুকের তুল্য মুণি।
বখিল তুল্য অধম নাই, কোকিল তুল্য ধ্বনি।
স্বর্ণ তুল্য ধাতু নাই, কর্ণ তুল্য দাতা।
ইষ্ট তুল্য দেব নাই, কৃষ্ণ তুল্য কথা।
তরী তুল্য বাহন নাই করী তুল্য দন্ত।
মানব তুল্য জনম নাই প্রণব তুল্য মন্ত্র।
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই সুজন তুল্য জন।
দৈন্য তুল্য বিপদ নাই পুণ্য তুল্য ধন।
পদ্ম তুল্য পুষ্প নাই শঙ্খ তুল্য নাদ।
মরণ তুল্য গালি নাই চোরের তুল্য বাদ।
অযশ তুল্য অসুখ নাই পীযুষ তুল্য রস।
মায়ের তুল্য আপন নাই দাতার তুল্য যশ।
শব তুল্য কুজন নাই, বট তুল্য ছায়া।
সাত্বিক তুল্য কর্ম্ম নাই, কার্ত্তিক তুল্য কায়া।
তেমনি সন্তানের তুল্য মায়া নাই, মা মহামায়া!

সে কেমন শোভা?—

যেমন ব্রজের শোভা কৃষ্ণচন্দ্র, নোদের শোভা গোরা।
নিশির শোভা শশী যেমন, শশীর শোভা তারা।
ঐরাবতের ইন্দ্র শোভা, যোগীর শোভা জটা।
ব্রাহ্মণের পৈতা শোভা, কপালের শোভা ফোঁটা।
মেঘের শোভা সৌদামিনী, জাতির শোভা কুল।
বনের শোভা বৃক্ষ যেমন, বৃক্ষের শোভা ফুল।
নবদ্বীপের পাহাড় শোভা, চড়ার শোভা বালি।
সরোবরের পদ্ম শোভা, পদ্মের শোভা অলি॥
উদাসীনের ভজন শোভা, গৃহীর শোভা ধনী।
ময়ুরের পাখা শোভা, ফণীর শোভা মণি।
নগরের শোভা, যেমন অট্টালিকা বাড়ী।
বৈষ্ণবের কণ্ঠী শোভা, মোল্লার শোভা দাড়ী॥
দাঁতের শোভা মিসির রেখা, মাথার শোভা চুল।
হাটের শোভা কলরব, তাঁতের শোভা তুল॥
যুবতীর পতি শোভা, দ্বারের শোভা দ্বারী।
পুরুষের বিদ্যা শোভা, ঘরের শোভা নারী॥
অন্ধকারের আলো শোভা, দেউলের শোভা চূড়ো।
অধ্যাপকের টোল শোভা, টোলের শোভা প'ড়ো॥
সমুদ্রের ঢেউ শোভা, ঢাকের শোভা টোয়ে।
তেমনি শোভা দেখেন মুনি কৈলাসে আসিয়ে॥

আমার প্রাণ কি প্রকার, তাহা শুন।

যেমন বারিগত মীন, দাতাগত দীন।
নদীগত তরী, ভক্তগত হরি॥

যেমন বনগত পশু, মাতৃগত শিশু।
স্বামি গত সতী, ক্রিয়াগত গতি॥
জলগত মকর চন্দ্রগত চকোর॥
বৃক্ষগত লতা, জিহ্বাগত কথা॥
আহার গত কায়া, ধর্ম্মগত দয়া।
অর্থগত নর, পিত্তগত জ্বর॥
উৎপন্নগত ধন, আশাগত মন॥
ধনগত মান, আমার তেমনি
কৃষ্ণগত প্রাণ॥

৪। পূর্ণব্রহ্মভাবমিশ্রিত ভক্তি, প্রীতি-করুণ, প্রভৃতি রসের সৃষ্টি।

এই বিষয়েও দাশরথির কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল। তাঁহার পূর্ব্বে বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাগণ এই সকল রসে কৃতিত্ব দেখাইয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচনাও ইঁহার অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী কারণ তাঁহারা যাহা অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই ভাষার আকারে দান করিয়াছেন। কাল্পনিক ভাবের এবং সত্যের মধ্যে ব্যবধান অনেক। তাই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এত মিষ্ট লাগে। তাই রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের পদ মাথায় করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে দাশরথি এই বিষয়ে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ করি আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেম তাঁহার কাছে নায়ক নায়িকার প্রেম নহে। তাঁহার কাছে ইহা শুদ্ধ জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ। গোপী-দিগের সকল উক্তিরই ভিতর দিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব দেখাইয়াছেন। মনকে বশীভূত করিলে যে ইন্দ্রিয় সকলকে, এমন কি, ত্রিজগৎকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে পারা যায়, তাহা দাশরথির রচনায় ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য জগতের (Realism) ভিতর দিয়া যে অন্তর্জগৎ (Idealism) কে ধরা যায়, সান্তের ভিতর দিয়া যে অনন্তকে ধরা যায়, জড়ের ভিতর দিয়া যে চৈতন্যকে ধরা যায়, তাহা দাশরথির রচনার অনেক স্থানে আমরা দেখিতে পাই। হিন্দুত্বের এই অভিব্যক্তির জন্য, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ দাশরথির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি রচনা উদ্ধৃত করিলাম।

সেই যশোদা, দেখাই সদা, সেই রাধা সেই দূতী—
তুল্য বিধু, গোপের বধূ, সেই মধু-মালতী।

সেই নন্দ সেই সানন্দ, দেখে সানন্দে রবে
সেই মধু-বন, জুড়াবে জীবন, সেই কোকিলের রবে।
সেই সব ধন, সেই যে গোধন, সেই গোবর্দ্ধন-গিরি
এসে সংসারে আমার, নন্দ কুমার! দেখ করুণা করি।

হৃদি বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি!
ওহে ভক্ত প্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হ'বে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমার ধর ধর জনার্দ্দন! পাপ ভার গোবর্দ্ধণ
কামাদি ছয় কংস চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী মন ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ-যমুনা কূলে, আশা-বংশী বটমূলে
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে সতত করি বসতি॥
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি॥

হে কি শুনি ত্রিশূল পাণি।
নাহি পাই কুল, ভেবে প্রাণাকুল,
শিরে কুল কুল কিসের ধ্বনি॥
সে ভূষণ কোথা লুকাইল সব,
করিতে অঙ্গেতে ভুজঙ্গেতে রব,
কল-কল রব শুনি কলরব,
ভয়েতে নীরব সে সব ফণী,

কর দিয়ে শিরে বলো হে কারণ

কারে শিরে তুমি করেছ ধারণ,

দাশরথি বলে শুন মা কারণ,

কারণ বারি ও পাপ বারিণী ॥

তুই কি ঘরে এলি রে রামধন,

আমার অন্তরের যে ব্যথা তুই বই কে জানে তা,

আমি যে তোর কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা,

কই কই দুঃখের কথা, কই কই রাম ! তুই কোথা

আয় দেখিরে দেখি চাঁদ বদন ॥

ভু'বন জীবন ! তোমায় বনে দেই নাই আমি,

অন্তরেরি কথা জান অন্তর্যামী,

রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি,

আমায় করে বিড়ম্বন ॥

বিধির চক্রে বাছা ! বনে গমন তোমার

বনপশু আমার দুঃখে কাঁদে কুমার,

পাপিনী মা বলে মুখ দেখে না আমার,

পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন ॥

আমার কি ফলের অভাব,

তোরা এলি বিফল ফল-খেলায়

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,

মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম-হৃদয়ে ॥

শ্রীরাম চরণ-কল্পতরু-মূলে রই,

যে ফল বাঞ্ছা করি সেই ফল প্রাপ্ত হই,

ফলের কথা কই ও ফল গ্রাহক নই,

যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে ॥

গিরি গৌরী আমার এসেছিল,

স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,

চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো ॥

কহিছে শিখরী কি করি, অচল,

নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,

চঞ্চলার মত জীবন যে চঞ্চল,

অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,

মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,

আবার ভাবি গিরি ! কি দোষ অভয়ার,

পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ॥

ও মা শঙ্করি, আমার স্বর্ণপুরে, ত্যেজে কেন বিল্বমূলে।

কত কেঁদে মলাম উমে ! মায়ের কপাল ক্রমে,

এমন অবোধ মেয়ে, তুমি জন্মেছ কুলে ।

রেখ মায়ের কথা কাল যেখানে সেখানে,

বসো না বসো না উমা বিল্বমূলে ।

দুখ পাবি গো উমে ! কোলে আয় না !

ত্যেজে বিল্বমূলে,

যেন কণ্টক বেঁধে না তোর চরণ কমলে ॥

যাবে মা ! যখন আসিবে মায়ের দুঃখ-নাশিনে,

মা বলিবে—তুষিবে বসিবে কোলে,

শিবের বামে বসো মা !

(বসো মা বসো মা ! একবার মায়ের কোলে)

আয় তোর দাস—দাশরথি-হৃদয়-কমলে ॥

গা তোল গা তোল বাঁধ মা ! কুন্তল,

ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী ।

লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে,

ডাকছে মা তোর শশধর বদনী ।

মা গো ত্রিভুবন মান্যে ত্রিভুবন ধন্যে,

তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি ।

আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, মা নাকি তোর মেয়ে ;

তিনি নাকি ভবের ভয়হারিণী ॥

ধরণী যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে

রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী—

মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়া দারা,

চন্দ্র-শেখরা চন্দ্রাননী,

এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার।

হরে মা ! তোর হর মনোমোহিনী ॥

এ কলঙ্ক তোমার, কালা ! কলঙ্কী হয় রাজবালা।

যার গলে হে গোকুলচন্দ্র ! অকলঙ্ক চাঁদের মালা ॥

যে চাঁদে করেছে দূর, সদানন্দের মনের অন্ধকার,

রাধার পক্ষে ঘটলো কি দায় !
ঘটিলো না সে চাঁদের আলো ॥
নাথ হে গোকুলের মাঝে,
কুল কন্যা হয়ে কুল ত্যজে,
অকুলের কাণ্ডারী ভ'জে রাই হলো না কূলে

৫। ব্যঙ্গ ও রসিকতা।

ব্যঙ্গ-কাব্য রচনায় দাশরথি স্থানে স্থানে যেরূপ অদ্ভুত লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। তিনি ভণ্ডামি, গোঁড়ামি, ন্যাকামি, অনাচার, অত্যাচার প্রভৃতি দেখিলে অতিশয় চটিয়া যাইতেন। নিজের মনোভাব কোন মতে চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। ভাক্তবৈষ্ণব, কুব্রাহ্মণ, হাতুড়ে বৈদ্য, অত্যাচারী নায়েব প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। তিনি শিষ্টের যেমন বন্ধু, অশিষ্টের তেমনি শত্রু। নিজের রাগ চাপিয়া, পরকে রাগাইতে পারিতেন না বলিয়া, এরূপ স্থলে তাঁহার ভাষা বড় তীব্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সময়ের প্রভাব দাশরথির জীবনে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। সে সময়ে আদিরসঘটিত রসিকতা সমাজে কিছু মাত্র নিন্দনীয় ছিল না। বরং প্রশংসনীয়ই ছিল। চির রসিক দাশরথি এই অশ্লীল-রসিকতার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনার অনেক স্থান এই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, পৌরাণিক আখ্যানমূলক পালাগুলিতে এ দোষের ভাগ অতি অল্প; প্রহসনগুলিতেই বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি রচনা উদ্ধৃত করিলাম।

ধনি ! আমি কেবল নিদানে
বিদ্যা যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার—
বিশেষ গুণ সে জানে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা ! কব কি কৌতুক
আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুঃখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।
চারিযুগে আমার আস্ফালন হয়,
একক্রেতে করি চূর্ণ সকল,
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয় কেবা তুল্য মম গুণে ॥
দৃষ্টি মাত্র দেহে রাখিনে বিকার,
তাহাতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তার কি থাকে অধিকার ?
সদাই আমায় ডাকে যে জনে ॥
আমি ব্রহ্মাণ্ড আনি চণ্ডেশ্বর,
আমারি জানিবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
জয় মঙ্গলাদি কোথা পায় নর,
কেবল আমারি স্থানে,
সংসার কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য,
এ জন্মের মত করি তায় আরোগ্য,
বাসনা বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈত্তিক,—
ঘুচাই তার যতনে ॥

অপরূপ রূপ কেশবে কেশবে
দেখ বা তারা এমন ধারা,
কালোরূপ কি আছে ভবে ॥
আমরি কি প্রেমভরে সদানন্দ হৃদে ধরে,
ঐ রমণী মন হরে, ভজে সে মুক্ত ভবে,
না-বারি মৃত্তিকা মাখ, মাধবে দাঁড়ায়ে দেখ,
দিন সব হরিতে থাক,
নইলে মা দুখ আবার দিবে ॥

সইলো, তোর মরা মানুষ ফিরেচে
কিন্তু পচে নাই—কিঞ্চিৎ রসেছে
আমি দেখে এলাম রাণাঘাটে,
ভাসতে ভাসতে আস্‌তেছে।
নেড়া মাথা বুনো ওল
ফুলিয়ে হয়েছে ঢোল

বোধ করি—রসা সলসা-খেয়েছে
শুন ওলো সতি, হবে তোর পতি
আবার অভিমানে মনের দুঃখে
ঘাড় বাঁকায়ে রয়েছে।

দাশরথির রহস্যপ্রিয়তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

(১) ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গায় একবার পাঁচালী গান হয়। অপরদলকে ভাল বাসা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু দাশরথিকে একটি আটচালা ঘর দেওয়া হইয়াছিল। উপরে অনেক স্থানে ছিদ্র ছিল। তাহাতে তিনকড়ি দাশরথিকে বলিয়াছিলেন—"এই বাসা কি আমাদের উপযুক্ত!" স্থানীয় লোকে দাশরথির নিকট রহস্য শুনিবার জন্য এইরূপ করিয়াছিল। তাহার পর স্থানীয় লোক বলিয়াছিল—"চলুন আপনার জন্য দালানে ভাল বাসা দেওয়া হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া দাশরথি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন "এখন প্রকৃতই ভালবাসা হইল।"

(২) দাশরথিকে সভাস্থ হইতে দেখিয়া কথক ঠাকুর বলিলেন "এস বাপ ভূত এস" ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন।—দাশরথি প্রত্যুত্তরে বলিলেন "আপনারা একটা ভূতের কথাতেই যে হেসে পাগল হলেন, আর দুপাঁচটা যুটলে কি হইত বলিতে পারি না।"

(৩) একদিন তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন উপলক্ষে দাশরথি বলিয়াছিলেন "এমন দিন (দীন) কখন পান নাই"—"এমন কখন খান নাই।"

এরূপ অনেক গল্প তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে।

(৬) সমাজে এবং সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা—

কবিত্বে ভাষায় ও রচনা চাতুর্য্যে, দাশরথি নবদ্বীপ ভট্টপল্লী প্রভৃতির পণ্ডিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তৎকালের সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের মত এই যে দাশরথির তুল্য নিপুণ কবি—বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লীর শীর্ষস্থানীয়, ৺শ্রীরাম শিরোমণি, ৺মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ৺হলধর তর্কচূড়ামণি, ৺মদনাথ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার যেরূপ গুণমুগ্ধ ছিলেন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দেশপূজ্য পণ্ডিতবৃন্দও সেইরূপ গুণমুগ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন 'যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যকরূপ ব্যুৎপন্ন হইতে চাহেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশরথির পাঁচালী পাঠ করুন।' শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন 'যাহারা দাশরথিকে কবি বলিতে চাহেন না, তাঁহারা হয় কাব্যের রসাস্বাদনে অক্ষম, না হয় দাশরথির রচনা কখন পড়েন নাই।' কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত দাশরথির সহিত আলাপের পর বলিয়াছিলেন যে রায় মহাশয়ের কবিত্বশক্তি তাঁহার হিংসার বস্তু। প্রসিদ্ধ গীত রচয়িতা ৺নীলকণ্ঠ অধিকারী দাশরথিকে ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিতেন এবং তাঁহার বাসস্থান পীলাকে পীঠস্থান মনে করিতেন। পঞ্চাশ বৎসরের উপর দাশরথি গত হইয়াছেন, তথাচ রসজ্ঞদিগের নিকট, তাঁহার গানের সমাদর, কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সমব্যবসায়ীর নিকট দাশরথির কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

উলার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে একবার সমসাময়িক তিনটি অদ্বিতীয়

গীত রচয়িতার সম্মিলন হয়। ইহারা আমাদের চিরপরিচিত দাশরথি রায়, মধুসূদন কিন্নর, গোবিন্দ চন্দ্র অধিকারী। তিন জনেই অনুরুদ্ধ হইয়া "অক্রুর সংবাদ" গান করিলেন। প্রত্যেকের গানেই শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইলেন। গৃহস্বামী বামনদাস বাবু, কি রচনায় কি গানে কাহারও ইতর বিশেষ করিতে না পারিয়া তিন জনকে সমানভাবে পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মধুকান ও গোবিন্দ অধিকারী এক আসরে দাশরথির সহিত সমান পুরস্কার লইতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয়ে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন "রায় মহাশয় আমাদের শিরোমণি, তাঁহার পুরস্কার আমাদের অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত"।

এই উপলক্ষে গীত, দাশরথি ও মধুকানের দুইটি গানও উদ্ধৃত করিলাম।

কেন চক্র ধরে' সকলে।

ঐ চক্রে কি যায় গো রথ, জান না কার চক্রে চলে॥
ভেবেছ রথ টান্‌ছে বাজী,
সই তোরে কই, বাজী কই, ও কেবল বাজি.
আজি আমাদের সুখের বাজি,
সাঙ্গ হলো এ গোকুলে॥

হয় ধর, হয় হতে কি হয় এ [illegible] যা হতে হয়,
আগে তা বুঝিতে হয়—
হয় ছেড়ে সকলে, হয় প্রাণ জলে, না হয় দাও অনলে।
কেন কও সব কুভারতী, সারথিরে বল সই!
অসার অতি,—
কি করিবে সারথি, এর মূল রথী দাসরথি বলে॥

রথ রাখ বংশীবদন, হেরিব বদন
রথ রাখ, কথা রাখ, একবার মোরা দেখি দেখ
যাই যাই বলে ডাক
শুনে যাই কথাটি মিঠে কেমন
শূণ্য করি হৃদি-রথে, কেন অন্য রথে
এ রথ কেঁদে ব্যাকুল হইল, দেখে মুনি-রথে
রথ যেতে চায় তোমার সাথে
এরথ লইয়ে যাও ওরথে, তা লইলে মথুরার পথে
রথে রথ করব পতন।
ব্রজে এসে অক্রুর-মুনি, হরে নিল মণি
মণিহারা ফণী কি হবে গুণমণি
প্রাণ লইয়ে যায় রথের মধ্যে, দেখ গো
মুনি নাকি ভক্ত্য, সূদন কয়, বাঁচি কি কষ্টে
ঐ পাদপদ্মে দিলেম জীবন।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

মফঃস্বলের বাণী

১। ভারতে ভলাণ্টিয়ার আন্দোলন ও দেশসেবা

(জাপান হইতে একটি দৃষ্টান্ত)

এদেশের মধ্যে সকল লোকেরই মনে কিছু না কিছু দেশসেবার ভাব জাগিয়াছে। এংগ্লো জার্ম্মেণ যুদ্ধের আকস্মিক উচ্ছ্বাসে অনেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক ভলাণ্টিয়ার হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট এখনও এদেশবাসীকে ভলাণ্টিয়ার করিতে প্রস্তুত নহেন। তা' না হইলেও আমরা বলি, দেশকে যদি সেবা করিতে হয় তবে কেবল ভলাণ্টিয়ার হওয়ার চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা সাম্রাজ্যের সেবা করিতে পারি।

পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে এমন অনেক প্রতিষ্ঠাবান (organisation) আছে যাহ

পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা গ্রহণ করিয়া দেশের উপযোগী করিয়া কার্য্যে খাটাইতেছে। তদ্দ্বারা দেশসেবা হইতেছে শুধু এমন নহে, তদ্দ্বারা কি নিজ দেশের, কি পর দেশের, কি শান্তির সময় আর্ত্ত বিপন্নের উদ্ধার, কি যুদ্ধের সময় আহত, মৃতপ্রায়ের সেবা শুশ্রূষা সকলি করা যাইতে পারে।

দেশের লোকেরা ভলাণ্টিয়ার হইয়া সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিবার অধিকারের জন্য লালায়িত হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদিন এই অধিকার আমরা পাইতে না পারি আমরা অন্য দিকেও আমাদের চেষ্টা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারি।

জাপান কিরূপে একটি পাশ্চাত্যভাব নিজেদের জাতিগত করিয়া স্বদেশের ও পর দেশের বিপন্ন আর্ত্তের কি পরিমাণ উপকার সাধিত করিয়াছে, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

"রেড-ক্রস সমিতি" ইউরোপীয় সভ্যতার একটি অত্যুৎকৃষ্ট ফল। খ্রীষ্টানজাতির ধারণা ছিল খ্রীষ্টান না হইলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেমে হৃদয় দ্রবীভূত না হইলে, খ্রীষ্টান রমণীদের মত অন্য কোনও রমণীর পক্ষে বিপন্নের সেবা করিবার ভার গ্রহণ করা সহজ নহে। এই সমিতির মূলে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেমের ভাব জাগ্রত রহিয়াছে। যাহারা যুদ্ধে আহত, দুর্ভিক্ষে পীড়িত, বন্যায়, ঘূর্ণিবায়ুতে, ভূকম্পে, অগ্নি-দাহে, বিদ্রোহে, বিপ্লবে ক্ষতিগ্রস্ত এই "রেড-ক্রস সমিতি" সকলকেই জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে।

বিগত ১৮৭০ অব্দে যখন জাপান পাশ্চাত্য জগতের আদর্শে নিজেদের সংস্কার আরম্ভ করে তখন জাপানী লোকেরা জানিতে পারে যে যুদ্ধের সময় সমরক্ষেত্রে রেডক্রস্ সমিতির সকল ধাত্রী, সকল ডাক্তার ও পরিচারক-দিগের স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল লোকেরাই ভক্তি করিয়া থাকে—এবং শত্রু মিত্র সকলেই ইহাদিগকে সমভাবে আশ্রয় দিয়া থাকে।

ইউরোপে প্রথম রেডক্রস্ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় জেনেভা কনভেনশনের সময়,—অর্থাৎ ১৮৬৪ অব্দে।

১৮৭২ অব্দে যখন জাপানের মন্ত্রীসভা দেশ-সংস্কার কার্য্যে নানাদিকে হস্তক্ষেপ করেন, তখন এই সমিতির দিকে জাপানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন ক্রস-চিহ্ন ধারণের জন্য ধর্ম্মগত আপত্তি উঠে। ক্রসের স্থানে জাপানের সামরিক বিভাগের চিকিৎসা-কর্ম্মচারীদিগের বুকে একটি লাল রেখা ধারণ করিবার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়।

সেই সময় মার্শাল ওয়ামা ও মিঃ সুনেতামী সানু বিদেশের সামরিক বিভাগের কার্য্যাদি দর্শনের জন্য ইউরোপে যান। তাঁহারা খ্রীষ্টান রেডক্রস সোসাইটির কার্য্যাদি দেখিয়া এই অনুষ্ঠান দেশে প্রবর্ত্তিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

মিঃ সানু দেশে ফিরিয়া এই রেড-ক্রস্ সমিতি দেশে প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রেড-ক্রসের স্থানে একটি রক্ত রেখা, তদুপরি একটি রক্তবিন্দু—এই চিহ্ন অবলম্বিত করিয়া জাপানী রেডক্রস্ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরেই এক বিদ্রোহে জাপানী সৈনিক-দিগের শুশ্রূষার জন্য এই ক্ষুদ্র সমিতিকে প্রেরণ করা হয়। ৮ মাস ধরিয়া এই শিশু-সমিতি এই অন্তর্বিদ্রোহের সময় উভয় পক্ষের রুগ্ন ও পীড়িতদের অশেষ সেবা শুশ্রূষা করিয়া জাপান গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৮৮৬ অব্দে এই সমিতিকে জেনেভা কনভেন-শনের অন্তর্গত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা

করা হয়, তদনুসারে উহা সেই বৎসরেই জেনেভা কন্‌ভেনশনের (Geneva Convention) অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন হইতে এই সমিতির সেবকদের বুকে একটি লাল ক্রস্‌ চিহ্ন ধারণ করার ব্যবস্থা হয়।

সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে যে সকল রেড-ক্রস্‌ সমিতি আছে সকলের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া জার্ম্মেণির কার্লস্রু নগরে ১৮৮৭ অব্দে এক আন্তর্জাতিক সভা আহূত হয়; জাপানী রেড-ক্রস্‌ সমিতিকে সেই জগদ্ব্যাপী রেডক্রস্‌ সমিতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করিলে জাপানীরা খ্রীষ্টান নহে বলিয়া এই সমিতিকে বাহিরে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় এবং অনেক সংঘর্ষের পরে এই সমিতিকে আন্তর্জাতিক রেড-ক্রস্‌ সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানীদের চেষ্টায় এই সমিতি বিশেষ উন্নত হয়। ১৮৯৪ অব্দে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় ১৫৮৭ জন সেবক এই সমিতির উদ্যোগে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া কত সহস্র সহস্র চীন ও জাপানী রুগ্ন পীড়িতদিগের শুশ্রূষা করে এবং জাপানের রিজার্ভ হাঁসপাতালে ১৪৮৪ জন চীন কয়েদীকে শুশ্রূষার জন্য পাঠাইয়া দেয়।

এই সময় হইতে এই রেড-ক্রস্‌ সমিতিতে বহুসংখ্যক জাপানী সম্ভ্রান্ত মহিলা যোগদান করেন। তাঁহাদিগকে রোগী পরিচর্য্যাদি যথানিয়মে শিক্ষাদান করা হয়। চীনের বক্সার যুদ্ধের সময় জাপান চীনের জন্য এই সমিতির ৪৯১ জন সেবক ও সেবিকা প্রেরণ করেন। তাঁহারা অনেক চীনা অনেক জার্ম্মেণ এবং ১২৫ জন ফরাসী সৈনিককে জাপানের কেন্দ্র হাসপাতালে পাঠাইয়া রক্ষা করে।

বিগত রুষ জাপান যুদ্ধের সময় এক। জাপান এই রেডক্রস্‌ সমিতি হইতেই কেবল ৪ হাজার ৭ শত জাপানী ধাত্রী মহিলা প্রেরণ করে এবং ইঁহারা যে ভাবে আহত, রুগ্ন পীড়িতদের সেবা করেন তাহা সমগ্র সভ্য-জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

এইত গেল যুদ্ধের সময় রেড ক্রস্‌ সমিতির কার্য্যের কথা! ১৯০৬ অব্দে জাপানের দুর্ভিক্ষের সময়, ১৯০৭ অব্দে কিয়োটো জেলা-সমূহে জলপ্লাবনের সময়, ১৯০৯ অব্দের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সময়, ১৯০৭ অব্দে খনির মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের সময় বৌদ্ধ যাত্রীদের মহামারীর সময় এই সমিতি দেশের যে অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া যায় না।

আজ জাপানী রেড-ক্রস্‌ সমিতির শক্তি কত! ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার স্ত্রী পুরুষ এই সমিতির সভ্য; জাপানের প্রত্যেক ৩৬ জন লোকের একজন লোক এই সমিতির সভ্য; এই সমিতির গৃহ, হাসপাতাল, জাহাজ ও নানাবিধ সরঞ্জাম প্রভৃতির মূল্য—

২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; ইহার হাতে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টাকা।

আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম নামে ভারতের নানা স্থানে কতকগুলি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আজ যাঁহারা ভলাণ্টিয়ার হইয়া দেশের সেবার জন্য উদগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা যদি যথার্থ প্রেমের সহিত দেশের সেবা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সকলে মিলিয়া এদেশেও অনুরূপ সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশসেবার জন্য আত্মচেষ্টা নিয়োজিত করুন আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। যে অধিকার আপাতত লাভ করা যাইবে না, যাহা পাইবার জন্য প্রার্থনা করাও এই সময় উপযুক্ত নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, তাহার জন্য হতাশের আক্ষেপ না করিয়া দেশের নেতৃবর্গ দেশের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসকে একটি স্থায়ী অনুষ্ঠানে পরিণত ও কার্য্যকারী করিয়া তুলুন আমরা ইহা আকাঙ্ক্ষা করি!

অনেকবার দেশের উপর দিয়া দেশসেবার অনেক অসাধারণ উচ্ছ্বাসের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে—দেশের নেতৃবর্গ তাহাকে সুনিয়মিত, সুগঠিত করিবার জন্য যথাপরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহার নিশান পর্য্যন্তও দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। দেশকে রক্ষা করিবার, দেশকে সেবা করিবার

যে অপর্য্যাপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ ভারতময় জাগিয়াছে, যাঁহারা এই প্রবাহকে চিরস্থায়ী করিবার অবসর দিবেন তাঁহারাই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সেবক, প্রকৃত দেশভক্ত ও রাজভক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন—অন্যথা এই সকল উচ্ছ্বাস কন্‌ফারেন্স-মণ্ডপের আর্ত্তনাদের মত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। তদ্দ্বারা দেশের শক্তি বাড়িবার সামর্থ্য জাগিয়া উঠিবে না।

জ্যোতিঃ

২। ব্যবসায়ীর অত্যাচার

ইউরোপ মহাদেশে যে মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার পরিণামে কাহার কিরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে, তাহা আজিও বুঝিবার উপায় নাই; কিন্তু এই যুদ্ধব্যপদেশে এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহা একান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মহাসংগ্রামের ফলে, প্রথমেই বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়াছে; কাযেই এদেশবাসীর নিত্য-প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্যাদি সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবনার কারণ হইতেছে। অবশ্যই, বিদেশ-জাত দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ হইলে, সে সকল আর কাহারও পাইবার উপায় থাকিবে না; তখন অগত্যা যে ব্যবস্থা হয়, হইবে। কিন্তু যে সকল জিনিষ পূর্ব্বে আমদানী হইয়া এ দেশে মজুত আছে, যুদ্ধের দোহাই দিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে ঐ সকল জিনিষের জন্য উপযুক্ত মূল্যের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মূল্য আদায় করা যে একান্তই অবৈধ ও অসঙ্গত, তৎপক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়িগণ স্বকীয় পৈশাচিক অর্থ-পিপাসার পরিতৃপ্তির নিমিত্তই এইরূপে ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া জন-সাধারণের অর্থশোষণে উদ্যত হইয়াছে।

যুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে সকল জিনিষ যথোচিত মূল্যে বিক্রিত হইয়াছে, যুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র ঐ সকল জিনিষের মূল্য অত্যধিক-রূপে বৃদ্ধি করা হইল কি কারণে, কেহ তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারেন কি? ব্যবসায়ীরা এখন পর্য্যন্ত ঐসকল জিনিস উচ্চমূল্যে ক্রয় করে নাই; এ অবস্থায় গত্যন্তররহিত ক্রেতাগণের নিকট হইতে অতিরিক্ত মূল্য আদায় ও দস্যুতা দ্বারা অপরের অর্থাপহরণ উভয়ই একরূপ অসৎ কার্য্য! দুঃখের বিষয়, দস্যুদানবের ন্যায় এই দুষ্ট ব্যবসায়িগণের দমন জন্য আজিও রাজশাসনের ব্যবস্থা হইতেছে না। ফলে, ব্যবসায়ীদিগের এইরূপ অবৈধ অত্যাচারে উৎপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে ঘোর অশান্তির সূত্রপাত হইতেছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দরিদ্র দেশবাসীর এইরূপ উদ্বেগের কারণ দূর করা কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য।

যুদ্ধারম্ভের সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রই ব্যবসায়িগণ প্রথমে লবণ, চিনি, ময়দা, দিয়াশলাই, কাচের জিনিষ, প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছিল; তৎপর জনসাধারণের ব্যবহার্য্য প্রায় সকল জিনিষেরই মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এমন কি, কোন কোন স্থলে মাছ তরকারীর মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। লবণের মূল্য মণ প্রতি ১৵০, ১৶০ ছিল; উহা কোথায়ও ৩৲, কোথায়ও ৩৷৷০, কোথায়ও বা ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মণদরে বিক্রীত হইয়াছে। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এই সংবাদ পাইয়াই ত্বরায় ইহার প্রতিকারবিধান করাতে, ব্যবসায়িগণ লবণের মূল্য পুনরায় পূর্ব্ববৎ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে কোন কোন দুষ্ট ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মূল্যে লবণ বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। শুনিতেছি, গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হওয়ার পরও, কোন কোন বন্দরে অতিরিক্ত মূল্যে লবণ ও করকচ বিক্রীত হইতেছে। আমরা এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতেছি। দরিদ্রের দুইমুষ্টি অন্নের একমাত্র উপকরণ একটুকু লবণ; ইহা হইতেও যাহারা অযথা অভাগাগণকে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, দস্যু তস্কর অপেক্ষাও তাহারা অধিকতর দণ্ডার্হ!

বিদেশজাত দ্রব্যাদি, যথা—ম্যাচবাক্স,

হ্যারিকেন লণ্ঠন, ডাক্তারি ঔষধ, কাগজ প্রভৃতির মূল্য প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে ব্যবসায়িগণ বলে, "কি করিব, আমদানী নাই।" ভাল, আমদানী না থাকিলে মূল্য বৃদ্ধি হইবে কেন? তাহারা তো বেশী মূল্য দিয়া জিনিষ ক্রয় করে নাই যে, এখন বেশী মূল্য না হইলে উহা বিক্রয় করিতে পারে না। জিনিষ যখন ফুরাইয়া যায়, যাইবে; তখন সকলেরই যে গতি হয়, হইবে। কিন্তু এখন তাহারা সে দোহাই দিয়া অপরের অর্থশোষণে প্রবৃত্ত হইতেছে কোন ন্যায় অনুসারে? তার পর, এদেশজাত জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি আরও অসঙ্গত; দেশীয় দ্রব্যোৎপাদন সম্বন্ধে তো কোনই ব্যাঘাত হয় নাই, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই।

বাজারে প্রকাশ, টীটাগড়স্থ কাগজের কলওয়ালারা নাকি কাগজের মূল্য পাউণ্ড প্রতি ১৷৷ পাই ২ পাই হিসাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন; এজন্য মফঃস্বলের বাজারে কাগজের দর চড়িয়া গিয়াছে। কলওয়ালারা এরূপ অপকর্ম্ম করিবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না; এদেশের স্বার্থান্ধ নরাধমগণই এই সুযোগে অভীষ্টসিদ্ধি করিতেছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বিলাতী ঔষধ ও যন্ত্রাদির মূল্য প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে, জীবনরক্ষার জন্য যে ঔষধের প্রয়োজন, মূল্যবৃদ্ধি নিবন্ধন তাহা ক্রয় যদি দরিদ্রগণের সাধ্যায়ত্ত না হয়, অথবা দরিদ্রের শোণিতসম অর্থ যদি ব্যাবসায়ীর দুর্লোভানলে এভাবে আহুতি দিতে হয়, তবে এতদপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে!

যে সকল বিবেকবিহীন ব্যবসায়ী এভাবে অপরের অর্থ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সমুচিত শাসন জন্য সত্বর রাজবিধান প্রবর্ত্তিত হওয়া আমরা একান্ত আবশ্যক মনে করি। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হওয়াতে, এ দেশের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য পাটের বাজার মাটী হইয়া গিয়াছে, ফলে, এ দেশের অর্দ্ধাধিক অধিবাসীর গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে! দেশের অধিকাংশ কৃষকই এখন পাটের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; বহুলোক এখন পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং এই পাটের ব্যবসায়ে যে কত শত সহস্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, তাহারও ইয়ত্তা করা কঠিন; মহাজনগণের ব্যবসায়ও এখন এই পাটের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে; অবশেষে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামিবর্গও এই পাট বিক্রয় হইলেই এখন প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে সমর্থ হন। এইরূপে দেখা যায়, কৃষক, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী, মহাজন, জমিদার প্রভৃতি দেশের বহুশ্রেণীর লোকেরই পাট প্রধান অবলম্বন। এই পাটের বাজার পড়িয়া যাওয়াতে, ইহাদের সকলকেই এবার প্রমাদ গণিতে হইতেছে! একেই এখন নানা কারণে ঘোরতর জীবনসংগ্রাম চলিতেছে; ইহার উপর এবার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! এ অবস্থায় ব্যবসায়িগণের অত্যাচারে যদি জনসাধারণের জীবন সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া পড়ে, তবে গুরুতর অনর্থের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। এজন্যই এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

কোনরূপ কায়ক্লেশেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হইলে, কেহই স্থির থাকিতে পারে না। নিজের ও পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করার জন্যই অধিকাংশ লোক পায়ের ঘাম মাথায় ফেলিয়া অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া থাকে। কিয়ৎকাল যাবত নানাকারণে আহার্য্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে, অনেকের উপার্জ্জনই এখন পরিজনপ্রতিপালনের পক্ষে অপ্রচুর হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর ব্যবসায়িগণের এই দৌরাত্ম্য কিরূপ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রজাপালক গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে ত্বরায় হস্তক্ষেপ করিয়া দীনহীন প্রজাবর্গকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অভাগাগণের আর উপায় নাই! সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়

বক্তৃতাকালে লর্ডকারমাইকেল বলিয়াছেন—"Nothing can be meaner than for private persons to make money out of public difficulties."
অর্থাৎ জনসাধারণের অসুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা হেয় কর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না! বঙ্গেশ্বরের এইরূপ উক্তিতে আমাদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ব্যবসায়িগণের চৈতন্য হইবে, তাহার আশা অতি অল্প!

কেহ কেহ বলিবেন, স্বাধীন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা গভর্ণমেণ্টের নীতিবহির্ভূত। অবশ্যই, বৈধ ব্যবসায় সম্বন্ধে একথা সর্ব্বথা প্রযোজ্য; কিন্তু অবৈধ ব্যবসায় সম্বন্ধে এ অজুহাত চলিতে পারে না। অবৈধ কর্ম্ম সর্ব্বদাই নিবারণযোগ্য এবং অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা রাজশাসনে দণ্ডার্হ। ব্যবসায়গত দ্রব্যাদির এইরূপ অযথা মূল্যবৃদ্ধি যে একান্ত অবৈধ ও ন্যায়বিগর্হিত, তৎপক্ষে সন্দেহমাত্র নাই; কাযেই, এইরূপ অবৈধ ব্যবসায় নিবারণে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ নীতিবহির্ভূত তো দূরের কথা, উহা সর্ব্বথা সুনীতিসম্মত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই অত্যাচারদমনে যত্নবান হইয়া দেশবাসীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর করিবেন, উপসংহারে আমরা যুক্তকরে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

ঢাকাপ্রকাশ।

৩। ইয়োরোপীয় সমর ও আমাদের শিল্প-বাণিজ্য।

সম্প্রতি রয়টার খবর পাঠাইয়াছেন:—"ইংলণ্ডের বাণিজ্যসমিতি, জার্ম্মাণী যে সমুদায় জিনিষ এ পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল সেই সমুদায় জিনিষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। যদি মূলধন সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে যুদ্ধ শেষ হইতে হইতে গ্রেট ব্রিটেনে নানাবিধ ঔষধ, রাসায়নিক উপকরণ, রং, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বিষয়ক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ফরাসীরাও জার্ম্মাণ বাণিজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।" স্বাধীন প্রকৃতি, আত্মসম্মানজ্ঞান ও ব্যবসায়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জাতি বিপৎপাতেও আপনাদের মঙ্গল-চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। এই সমগ্র ইয়োরোপ-ব্যাপী মহাসমরে ইয়োরোপের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা কাঁপিয়া উঠিয়াছে—যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন কথা কাহারও মুখে স্থান পাইতেছে না—কিন্তু এ বিপদের দিনেও ইংরেজজাতি আপনাদের শিল্প-বাণিজ্য-প্রসারের সুযোগ অন্বেষণে পরাঙ্মুখ নহেন। এইরূপ সকল বিষয়ে দৃষ্টি না থাকিলে কোন জাতি বড় হইতে পারে না।

আমরা যুদ্ধের জন্য জাহাজ দিতেছি হাজারে হাজারে লাখে লাখে টাকা দিতেছি, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের জন্য কি করিতেছি? এত নিঃস্বার্থ দান নহে—এ যে ভাবী স্বার্থেরই বীজ বপন! কিন্তু আমরা নিজের মঙ্গল কবে দেখিয়া থাকি? ইংলণ্ড, স্কটলণ্ডের লোক দুই চারিটা ঔষধ, রাসায়নিক উপকরণ, রং ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে আনাইয়া থাকেন, তাহাই তাঁহাদের সহ্য হয় না—এই সুযোগে সে অভাব দূর করিবার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে, আর আমাদের দেশে সূচ সূতা দিয়াবাতির জন্যও বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইলেও আমাদের দেশের লক্ষপতিদের সে বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। 'স্বদেশী' দুদিনের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল আবার কুম্ভকর্ণের মত মোহনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন বিদেশীয়দের সহিত প্রতিযোগিতায় পারা যাইবে না, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অর্থব্যয় কেবলমাত্র অর্থদণ্ডেই পর্য্যবসিত হইবে। সকল শিক্ষা, সকল ব্যবসায়, সকল কার্য্যে উত্থান-পতনই ভাবি-উন্নতির মূল সোপান—আছাড় না খাইয়া কেহ কখন হাঁটিতে পারে নাই, জল না খাইয়া কেহ কখন সাঁতার শেখে নাই। সুতরাং আমরা শিল্প-বাণিজ্যে হাত দিয়াই এ বিষয়ে অগ্রগামী-দিগকে পরাভূত করিব এরূপ আশা পোষণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ কত অর্থদান করিতেছেন,

তাঁহারা না হয় কিছু অর্থ শিল্পবাণিজ্যের নামে দানই করিলেন! বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা টি পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের নাম শুনিয়াছি, শিল্পবাণিজ্যে কি সেরূপ নাম শুনিতে পাইব না? শুধু সাহিত্য-বিজ্ঞানে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিলেই দেশ উন্নত হইবে না, শিল্পবাণিজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত না হইলে কখনই দেশের মঙ্গলের আশা নাই।

যাঁহারা বিদেশীয় প্রতিযোগিতার ভয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে আজ সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। অনেক বিষয়ে কিছু দিনের জন্য প্রতিযোগিতার আশঙ্কা উঠিয়াই গেল, এখন হয় ত কোন কোন জিনিষের জন্য আমাদিগকে চোখে অন্ধকার দেখিতে হইবে। জার্ম্মাণীর মাল বন্ধ হওয়ায় এখন আমাদিগকে অনেক বিষয়ে মহা-অসুবিধায় পড়িতে হইবে। ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্র-রাজ্যের দ্রব্যাদিও যে অনায়াসে পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। যুযুধান জাতি-সমূহের মুটে মজুরেরাও সখের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে, অনেক শিল্প বন্ধ হইয়াছে। যে সমুদায় শিল্প এখনও চলিতেছে চতুঃ-সমুদ্র শত্রুপক্ষীয় জাহাজের দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া সে সমুদায়েরও বাণিজ্যে প্রসারলাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এখন আমাদের নিজেদের জিনিষ নিজেদের প্রস্তুত করিবার সময় উপস্থিত।

জার্ম্মাণী প্রভৃতি হইতে অনেক টাকার ডাক্তারী ঔষধ আসিত; সে সমুদায় এখন বন্ধ হওয়ায় ডাক্তার ও রোগীদিগকে কম অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের মূলধন বাড়াইয়া নূতন নূতন প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রস্তুত করান হউক। বেঙ্গল কেমিক্যালের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠ কারখানার সেয়ার কিনিতে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইবে না। পঞ্জাবে নাকি একটী কাচের কারখানা আছে, তাহার মূলধন বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করা হউক। ধারিয়াল প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের যে সমুদায় পশমী বস্ত্রের কারখানা আছে তাঁহারাও কার্য্যক্ষেত্র বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করুন—মূলধনের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। নূতন কারখানায় অনেক বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু পুরাতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কারখানার সেয়ার কিনিতে কেহই ইতস্ততঃ করিবে না। কাগজ না হইলে শিক্ষিত ব্যক্তির এক মুহূর্ত্ত চলে না—ভারতীয় মিল সমুদায়ের উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ দেশের শর্করাশিল্প লুপ্তপ্রায়—বাঙ্গালীর এ দিকে লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, বিশেষতঃ এবার ইক্ষুর আবাদ গত বৎসর অপেক্ষা বেশী। বরিশাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের জনৈক অধ্যাপক ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে রঞ্জনবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন—দেশের ধনিগণ তাঁহাকে লইয়া একটা কারখানা খুলুন না কেন—আজকাল রঙীন বস্ত্রের প্রতি মহিলাদের আকর্ষণ কম দেখা যায় না। জাপানকেও বোধ হয় যুদ্ধে জড়িত হইতে হইবে, সুতরাং আর একবার দিয়াবাতির জন্য চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? অবশ্য দেশের ধনকুবেরগণ পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে কিছুই হইবে না।

বর্ত্তমান যুদ্ধে অনেক জিনিষের রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় আমাদের ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু চাউলের রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় চাউল কিছু সস্তা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। গম যব, ভুট্টা, ছোলা, ডাল প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। খাদ্য-সামগ্রী সস্তা হইলেও অনেক লাভ। নারিকেল, তিল, এরণ্ডের (ভেরেণ্ডা) বীচি প্রভৃতিও বিদেশে চালান দেওয়ায় এ দেশে ঐ সমুদায় দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশের ঐ সমুদায় দ্রব্য দেশে থাকিলে সুলভ মূল্যে টাটকা জিনিষ পাওয়া যাইবে, অনেক নষ্ট-শিল্পও পুনরুদ্ধৃত হইবে। আমরা এ বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ।

পরিশিষ্ট

বিচার্য্য। টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শেষোক্ত সূত্রদ্বয়ে "কুজ বুধান্যতর ক্ষেত্রজে" বলিয়া তৎকৃত টীকায় যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচ্য। পর পর দুই সূত্রের সহিত তৎপরবর্ত্তী সূত্র কখনই অন্বিত হইতে পারে না, সুতরাং কুজ ক্ষেত্রে চ বলাতেই বুধের ক্ষেত্র নিবৃত্ত হইয়াছে। তৎকৃত ব্যাখ্যানুরূপ অর্থ হইলে কুজ বুধ ক্ষেত্রে ইত্যাদি রূপ লিখিলেই যথেষ্ট হইত, সূত্রান্তর প্রণয়নের কোন প্রয়োজন ছিলনা। ॥ ১৯ ।

শনিরাহুভ্যাং কন্যাতুলয়োঃ পঙ্গুর্বাতরোগো বা॥ ২০॥

কন্যা (১১) তুলয়োঃ (৩৬ = ১২) কুম্ভর্কে মীন রাশৌ বা উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থান গতে তস্মিন্ শনি রাহুভ্যাং যোগে গৃহিণী পঙ্গুর্বাতরোগবতী বা স্যাৎ। "যৎ-তু-কন্যাতুলান্যতরগে" ইতি নীলকণ্ঠেনোক্তং তৎ "সর্ব্বত্র সবর্ণা ভাবা রাশয়শ্চ" ইতি সূত্রাদসঙ্গতং ॥ ২০ ॥

কুম্ভ ও মীন রাশি গত উপপদের দ্বিতীয় স্থান, শনি ও রাহু কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইলে পত্নীর পঙ্গু বা বাতরোগ সংঘটিত হয়। বর্ত্তমান সূত্রে স্বকৃত টীকায় সুবোধিনীকার কটপয়াদি সংজ্ঞোক্ত রাশির নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূত্রোক্ত কন্যা ও তুলা শব্দ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অর্থ বৈপরীত্য সংঘটন করিয়াছেন। বিশেষতঃ পদের হীনতা বশতঃ কুম্ভ ও মীন রাশিতেই উক্ত পঙ্গু ও বাত রোগ ঘটিবার সম্ভাবনা সমধিক ও যুক্তি সঙ্গত। ২০॥

শুভদৃগ্‌যোগান্ন ॥ ২১ ॥

যদ্যুপপদাৎ দ্বিতীর স্থানে শুভ গ্রহাণাং দৃষ্টিযোগো বা স্যাৎ তর্হি পূর্ব্বোক্তা দোষা ন স্যুঃ ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুর্যোগ সমূহ সংঘটিত হইলে যদি পুনর্ব্বার তথায় অন্য কোন শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে, তবে তত্তৎ যোগ প্রায়ই সবিশেষ ফলপ্রদ হয় না॥ এই সূত্রে উপপদের দ্বিতীয় স্থান গত ফল নিবৃত্ত হইল॥ ২১ ॥

সপ্তেশাভ্যাং গ্রহেভ্যশ্চৈবং ॥ ২২ ॥

সপ্তেশাভ্যাং উপপদাৎ যঃ সপ্তঃ (৬৭ = ৭) সপ্তমোভাব স্তদীশশ্চ তাভ্যাং দ্বিতায় স্থান স্থিতেভ্যো ভিন্ন ভিন্ন গ্রহেভ্যোপি চৈবং পূর্ব্ববৎ ভিন্ন ভিন্ন ফলং বিচার্য্যং। অতশ্চোপপদাৎ যঃ সপ্তমো ভাব স্তদীশশ্চ তৌ উপপদ ইব চিন্তনীয়াবিতি স্পষ্টার্থঃ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বে উপপদের দ্বিতীয় স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ যোগে যে প্রকার ফল বিচার করা হইয়াছে, উপপদের সপ্তম রাশি এবং তৎপতি গ্রহের দ্বিতীয় স্থান হইতেও তদ্রূপ ফল বিচার কার্য্য। অর্থাৎ উপপদের সপ্তম রাশি ও তৎপতিস্থিত রাশি, এই স্থানদ্বয়ের দ্বিতীয় স্থান হইতেও উপপদের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল বিচার্য্য। বৃদ্ধ কারিকাও বলেন "সপ্তমেশাৎ দ্বিতীয়স্থেঽপ্যেবং ফল মুদাহৃতং॥ এস্থলে সপ্তমেশাৎ শব্দে সপ্তম ভাব এবং তদধিপতি গ্রাহ্য। এই স্থান হইতে উপপদের দ্বিতীয় স্থান গত ফল নিবৃত্ত হইল ॥ ২২ ॥

পুত্রে বুধ শনি শুক্রে চানপত্যঃ ॥ ২৩ ॥

উপপদাৎ যঃ সপ্তমোভাব স্তদীশশ্চ তাভ্যাং পুত্রে (২১=৯) নবম স্থানে পঞ্চমে বা (পুত্র বিচার প্রসঙ্গাদত্র পুত্র শব্দেন পঞ্চম স্থান মপ্যবশ্যমেব সিদ্ধং) বুধ শনি শুক্রে সতি মনুষ্য শ্চানপত্যঃ অপত্য রহিতো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

উপপদের সপ্তম রাশি ও তৎপতি হইতে পঞ্চম বা নবম স্থানে বুধ শনি কিম্বা শুক্র গ্রহের যোগ থাকিলে মনুষ্য অপত্য রহিত হয়। শ্রীমন্নীল কণ্ঠোক্ত টীকা এবং পারাশরী হোরায় পুত্র শব্দে কেবল পঞ্চম স্থানেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু সংখ্যা সঙ্কেত বাক্যে পুত্র শব্দে নবম ভিন্ন পঞ্চম স্থান অর্থ করা অসঙ্গত। তবে পুত্র বিচার সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মানুসারে পঞ্চম স্থান অবশ্যই গ্রাহ্য ॥ ২৩ ॥

রবি রাহু গুরুভির্ব্বহুপুত্রঃ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্তে পঞ্চমে রাশৌ নবমে বা রবি রাহু গুরুভি র্যুক্তে সতি মনুষ্যো বহুপুত্রঃ স্যাৎ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম বা নবম স্থানে রবি রাহু কিম্বা বৃহস্পতির যোগ থাকিলে মনুষ্য বহু পুত্র প্রাপ্ত হয়। ইহার পরবর্ত্তী সূত্রপঞ্চক স্পষ্টার্থ ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রেণ চৈকপুত্রঃ ॥ ২৫ ॥
মিশ্রে পুত্রো বিলম্বাৎ ॥ ২৬ ॥
কুজশনিভ্যাং দত্ত পুত্রঃ ॥ ২৭ ॥
ওজে বহুপুত্রঃ ॥ ২৮ ॥
স্বল্প প্রজশ্চ যুগ্মে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম বা নবম স্থানে চন্দ্র থাকিলে একটি মাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করে (২৫)।

উক্ত স্থান দ্বয়ে পুত্রকারক এবং পুত্র বাধক গ্রহের মিশ্রিত ভাবে সমাবেশ দেখিলে বিলম্বে পুত্রোৎপত্তি চিন্তা করিবে। ২৬। তৎতৎ স্থানে শনি ও মঙ্গলের যোগে মনুষ্য পরপুত্রে পুত্রবান্ হয়॥ ২৭॥ উক্ত পঞ্চম বা নবম স্থান ওজ রাশি গত হইলে বহু পুত্র এবং যুগ্ম রাশি গত হইলে স্বল্পসংখ্যক সন্তানেরই সম্ভাবনা। উপরোক্ত পুত্র বিচার সম্বন্ধে বৃদ্ধ কারিকায় লিখিত আছে যে—

কুম্ভ বৃশ্চিক বৃষা হি সসিংহাঃ পঞ্চমক্ষ' পতিতা ইহ লগ্নাৎ।
একশো দদাতি চাত্মসুতত্বং পুত্রশোক মথ তে গ্রহ যুক্তাঃ॥

কুম্ভ বৃশ্চিক বৃষ এবং সিংহ রাশি অর্থাৎ স্থির চতুষ্টয় লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান গত হইয়া গ্রহশূন্য হইলেই মনুষ্য পুত্র লাভ করে। তৎ তৎ স্থানে গ্রহ থাকিলে পুত্র শোক অথবা পুত্র হইতে বিশেষ কষ্ট জ্ঞাতব্য॥ ২৯॥

গৃহক্রমাৎ কুক্ষি তদীশ পঞ্চভেশ গ্রহে ভ্যশ্চৈব॥ ৩০॥

গৃহক্রমাৎ জন্মলগ্ন ক্রমাৎ যথা ভাবানাং বিচারঃ ক্রিয়তে তথৈব কুক্ষি লগ্নমত্র প্রকরণ পঠিতোপপদস্যগ্রহণং তদীশঃ উপপদেশ স্তভ্যাং কুক্ষিতদীশাভ্যামপি কুর্য্যাৎ। কুক্ষে রুপপদাৎ যঃ পঞ্চভং (৪৬১-৫) পঞ্চগোরাশিঃ তদীশশ্চ পঞ্চভেশৌ তাভ্যাং পঞ্চভেশাভ্যামপি তৎ তৎ স্থানস্থিতেভ্যো গ্রহেভ্যশ্চৈবঃ পূর্ব্ববৎ ফলবিচারঃ কার্য্যঃ। অত্র যেষাং যত্র যত্র প্রয়োজনং তেষা মাগ্রিম সূত্রেষু তত্রতত্রানুবৃত্তি জ্ঞেঁয়া। অত্র বৃদ্ধ বাক্যোঽপি দৃশ্যতে যথা—

পূর্ব্বেশাভ্যা মিদং সর্ব্বং জ্ঞাতব্যঞ্চ গৃহক্রমাৎ।
পূর্ব্বেশাভ্যাং পঞ্চমেশাভ্যাং॥ পূর্ব্ব (৮১৫) পঞ্চম ইতি॥ ৩০॥

জন্মলগ্ন হইতে যেরূপ পর পর দ্বাদশ ভাবে তত্তৎ ভাবোত্থ ফলের বিচার হইয়া থাকে, উপপদ এবং তদধিপতি হইতেও তদ্রূপ দ্বাদশ ভাবের ফল বিচার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ যোগে, উপপদ হইতে সপ্তম ভাবের পঞ্চম ও নবম স্থান হইতে পুত্র সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে, উপপদের পঞ্চম স্থান এবং তদধিপতি হইতেও তত্তৎ গ্রহযোগে তদ্রূপ ফলবিচার কার্য্য। পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে এই সূত্রের যতটুকু প্রয়োজন তাহারই অনুবৃত্তি আবশ্যক বলিয়া গ্রাহ্য। পূর্ব্বোক্ত পুত্র বিচার সম্বন্ধে "পূর্ব্বেশাভ্যা মিদং সর্ব্বং জ্ঞাতব্যঞ্চ গৃহক্রমাৎ" এই বৃদ্ধ বাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে পূর্ব্ব শব্দ বর্ণ সঙ্কেতানুসারে পঞ্চম স্থানের বোধক ইতি॥ ৩০॥

ভ্রাতৃভ্যাং রবি রাহুভ্যাং ভ্রাতৃনাশঃ॥ ৩১॥

উপপদাৎ তদীশাদ্ বা ভ্রাতৃভ্যাং তৃতীয়ৈকাদশ স্থান স্থিতাভ্যাং রবি রাহুভ্যাং ভ্রাতৃনাশঃ স্যাৎ। তৃতীয়স্থাভ্যাং রবি রাহুভ্যাং কনিষ্ঠস্য একাদশ স্থিতাভ্যাং তাভ্যাং জ্যেষ্ঠস্য নাশো জ্ঞাতব্যঃ। একাদশে জ্যৈষ্ঠ-ভ্রাতু স্তৃতীয়ে পরজন্মন ইত্যুক্তত্বাৎ॥ ৩১॥

উপপদ বা তদধিপতি হইতে ভ্রাতৃস্থানে অর্থাৎ তৃতীয় বা একাদশে রবি বা রাহুর যোগ থাকিলে ভ্রাতৃনাশ ঘটে। একাদশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং তৃতীয়ে কনিষ্ঠের বিচার হইয়া থাকে, সুতরাং রবি বা রাহু একাদশে থাকিলে জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার এবং তৃতীয়ে কনিষ্ঠের বিনাশ চিন্তনীয়। জাতক শাস্ত্রে লিখিত আছে সহজ স্থানগো হেলির্নাশয়েৎ সহজং ধ্রুবং। শম্ভুহোরা বলেন চেদত্রভানৌ নবমে স্বগেহে তদা বিনশ্যন্ত্যখিলাঃ সহোত্থাঃ। অর্থাৎ রবি স্বক্ষেত্রে নবমস্থ হইলে ভ্রাতৃকুল নির্মূল হয়, একটী জীবিত থাকে মাত্র। কেন্দ্র কোণ প্রভৃতি একাধিক রাশিবাচক শব্দ সঙ্কেতাক্ষরে লিখিত না থাকায় এখানে দ্বিবচনান্ত ভ্রাতৃশব্দ তৎসূত্রের বহির্ভূত হইয়াছে॥ ৩১॥

শুক্রেণ ব্যবহিত গর্ভনাশঃ॥ ৩২॥

উপপদাৎ তদীশাদ্ বা তৃতীয়ৈকাদশস্থেন শুক্রেণ যথাক্রমং ব্যবহিত মাতৃ—গর্ভনাশঃ স্যাৎ। একাদশস্থেন শুক্রেণ পূর্ব্বগর্ভ স্তৃতীয়স্থেন পরগর্ভো বিনষ্টো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩২॥

উপপদ বা তদধিপতি হইতে একাদশে বা তৃতীয় স্থানে শুক্রের অবস্থিতি নিবন্ধন যথাক্রমে পূর্ব্বাপর মাতৃগর্ভ বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

পিতৃভাবে শুক্র দৃষ্টেঽপি॥ ৩৩॥

পিতৃ জন্মলগ্নাৎ প্রকরণানুসারাদুপপদাদ্ বা ভাবে (৪৪-৮) অষ্টম-স্থানে শুক্রদৃষ্টেঽপি ব্যবহিত গর্ভনাশঃ স্যাৎ। অত্র পর গর্ভং বিচিন্ত্যং। লগ্নে শুক্র দৃষ্টেঽপীতি কেচিদ্ বদন্তি॥ ৩৩॥

জন্মলগ্ন কিম্বা প্রকরণানুরোধে উপপদ হইতে অষ্টম স্থানে শুক্রের দৃষ্টি থাকিলে জননীর ব্যবহিত গর্ভ বিনষ্ট হয়। অনেকেই লগ্ন কিম্বা তাহার অষ্টম স্থানে শুক্রের দৃষ্টি, ব্যবহিত গর্ভনাশের হেতু বলিয়া বিবেচনা করেন বটে কিন্তু ভাব শব্দ একবচনান্ত থাকায় এস্থলে কেবল অষ্টম স্থানকেই গণ্য করা সমীচীন। ৩৩॥

কুজগুরু চন্দ্রবুধৈ র্বহু ভ্রাতরঃ॥ ৩৪॥

উপপদাৎ তদীশাদ্ বা তৃতীয়ৈকাদশস্থৈঃ কুজগুরু চন্দ্রবুধৈ র্যথাক্রমং বহুভ্রাতরো ভবন্তি। একাদশস্থৈ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ বাহুল্যং তৃতীয় স্থান গতৈঃ কনিষ্ঠাধিক্যং বোধ্যং॥ ৩৪॥

উপপদ বা তদধিপতি হইতে তৃতীয় বা একাদশ স্থানে মঙ্গল গুরু চন্দ্র বা বুধের যোগ থাকিলে যথাক্রমে বহু ভ্রাতৃযোগ চিন্তা করিবে। অর্থাৎ একাদশ স্থান গত গ্রহ হইতে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ বাহুল্য এবং তৃতীয় স্থান গত গ্রহ দৃষ্টে কনিষ্ঠাধিক্যই বিচার্য্য॥ ৩৪॥

শন্যারাভ্যাং দৃষ্টে যথা স্বং ভ্রাতৃনাশঃ॥ ৩৫॥

উপপদাৎ তদীশাদ্বা তৃতীয়ৈকাদশে শন্যারাভ্যাং শনি কুজাভ্যাং দৃষ্টে যথাস্বং যথাক্রমং ভ্রাতৃনাশঃ স্যাৎ। তৃতীয়ে দৃষ্টে কনিষ্ঠস্য একাদশে জ্যৈষ্ঠস্য। যদা তু দ্বৌ ভাবৌ শনি কুজাভ্যাং দৃষ্টৌ দ্বয়োরপি বিনাশশ্চিন্তনীয়ঃ॥ ৩৫॥

উক্ত তৃতীয়াদি স্থানে শনি বা মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে যথাক্রমে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে দৃষ্টি থাকিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার তথা একাদশে দৃষ্টি থাকিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু চিন্তা করিবে। সুতরাং উভয় স্থানেই উক্ত গ্রহদ্বয় কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে উভয় ভ্রাতারই বিনাশ বিচার্য্য। পূর্ব্ব সূত্রে মঙ্গল হইতে বহুভ্রাতৃযোগ লিখিত থাকায় দেখা যাইতেছে যে মঙ্গলের যোগ অপেক্ষা দৃষ্টি ফল সম্পূর্ণ বিপরীত॥ ৩৫॥

শনিনা স্বমাত্র শেষশ্চ॥ ৩৬॥

উপপদাৎ তদীশাদ্বা পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ান্যতম স্থানে শনিনা যুক্তে সতি কেবলং স্বমাত্র শেষঃ স্যাৎ। অন্যে ভ্রাতরো নশ্যন্তীত্যর্থঃ। তথাচ পারাশরীয়ে—ভ্রাতৃ স্থান গতে শৌরৌ লাভস্থে বা তৃতীয়গে। মাতা স্বস্তিমতী তেন অন্যান্ নশ্যন্তি বৈ দ্বিজ॥ ৩৬॥

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় বা একাদশ স্থানে শনির যোগ থাকিলে জাতক মাত্র অবশিষ্ট থাকে অন্য ভ্রাতারা সকলেই বিনষ্ট হয়। টীকাকারগণ প্রায় সকলেই এস্থলে পূর্ব্বোক্ত সূত্র সাদৃশ্যে তত্র শনির দৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই "শনিনা দৃষ্টে" বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ অতি বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সূত্রে শনির দৃষ্টি ফলই যদি সূত্রকারের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে

উপরে শনি শব্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন ছিলনা। সুতরাং পারাশরী শ্লোকোক্তিই এ স্থলে সমীচীন। সূত্রদ্বয় পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে শনির দৃষ্টি ফল অপেক্ষা যোগ ফল প্রবল ॥ ৩৬ ॥

কেতৌ ভগিনী বাহুল্যং ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্তে ভ্রাতৃ-স্থান-দ্বয়ে কেতৌ সতি যথাক্রমং ভগিনী বাহুল্যং জ্ঞাতব্যং। ভ্রাতৃসুখং স্বল্পং ভবতীতি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় বা একাদশ স্থানে কেতু থাকিলে যথাক্রমে ভগিনী বাহুল্য চিন্তনীয়। একাদশে থাকিলে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর এবং তৃতীয়ে থাকিলে কনিষ্ঠা ভগিনীর সংখ্যাধিক্য ঘটে। ভ্রাতৃজন্ম জনিত সুখ স্বল্প হয় ॥ ৩৭ ॥

লাভেশাদ্‌ ভাগ্যভে রাহৌ দংষ্ট্রাবান্‌ ॥ ৩৮ ॥

কেতৌ স্তব্ধবাক্‌ ॥ ৩৯ ॥

মন্দে কুরূপঃ ॥ ৪০ ॥

লাভেশাৎ জন্মলগ্নাদুপপদাদ্বা যঃ সপ্তমোভাব স্তদীশাদ্‌ ভাগ্যভে দ্বিতীয় স্থানে রাহৌ সতি নরো দংষ্ট্রাবান্‌ দন্তুরঃ স্থূলদন্তোঽধিক দন্তো বা ভবতি ॥ ৩৮ ॥ তত্র কেতৌ সতি, স্তব্ধবাক্‌ অস্ফুটোক্তিমান্‌ (৩৯) তথা মন্দে শনৌ স্থিতে কুরূপঃ স্যাৎ ॥

জন্মলগ্ন কিম্বা উপপদের সপ্তম ভাবপতির দ্বিতীয় স্থানে রাহু থাকিলে মনুষ্য দংষ্ট্রাবান্‌ অর্থাৎ স্থূলদণ্ড বা অধিক দণ্ড বিশিষ্ট হয়। তত্র কেতু থাকিলে জাতক স্তব্ধবাক্‌ এবং শনি থাকিলে কুরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে বৃদ্ধকারিকা বলেন—

সপ্তমেশাদ্‌ দ্বিতীয়স্থে রাহৌ মূকঃ খলেস্থিতে।
অদন্তোঽধিক দন্তোবা দংষ্ট্রাযুক্তোঽথবা ভবেৎ ॥
পবন ব্যাধিমান্‌ কেতৌ যদ্বা স্যাদস্ফুটোক্তিমান্‌।
তত্র নানাগ্রহৈর্যোগে মিশ্রং ফল মুদাহৃতং ॥

সপ্তমাধিপতির দ্বিতীয় স্থানে রাহু থাকিলে মনুষ্য মূক অর্থাৎ বাক্যহীন, অন্য কোন পাপগ্রহ থাকিলে দন্তুর অর্থাৎ দন্তহীন কিম্বা অধিক দন্ত বিশিষ্ট এবং কেতু থাকিলে স্খলিতবাক্‌ অর্থাৎ তোৎলা হইয়া থাকে। তত্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ যোগে মিশ্রফল চিন্তনীয় ॥ ৪০ ॥

স্বাংশবশাদ্ গৌর নীল পীতাদি বর্ণাঃ ॥ ৪১ ॥

স্বাংশবশাৎ আত্মকারকাশ্রিত নবাংশরাশেঃ স্বভাবাৎ শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধাঃ পুরুষস্য গৌর নীল পীতাদি বর্ণা বাচ্যাঃ। এবং তৎ তৎ কারক বশাৎ তেষাং তেষামপি বর্ণা শ্চিন্তনীয়া ইতি ॥ ৪১ ॥

জাতক শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধ আত্মকারণাশ্রিত নবাংশ রাশির বর্ণানুসারে জাতকের বর্ণ নিরূপণ করিবে। অপরাপর কারক সম্বন্ধেও তদ্রূপ বিবেচ্য ॥ ৪১ ॥

অমাত্যানুচরাৎ দেবতা ভক্তিঃ ॥ ৪২ ॥

অমাত্যানুচবাৎ অমাত্যকারক গ্রহস্য যোহনুচর স্তস্মাৎ ভ্রাতৃ কারকাৎ দেবতা ভক্তি র্বিচার্য্যাঃ। তস্য শুভত্বে শুভ দেবতায়াং পাপত্বে ক্রূরদেবতায়াং উচ্চাদিগত্বে দৃঢ়াভক্তি নীচাদিগত্বে অস্থিরেতি জ্ঞাতব্যাঃ ॥ ৪২ ॥

অমাত্যানুচর অর্থাৎ ভ্রাতৃকারক গ্রহ হইতে দেবতাভক্তি চিন্তা করিবে। ভক্ত কারক গ্রহের পাপত্বে ক্রূর দেবতা, শুভত্বে সৌম্য দেবতা, উচ্চাদি স্থানে থাকিলে ভক্তির দৃঢ়তা এবং তদ্বিপরীতে শৈথিল্যাদি বিচার্য্য ॥ ৪২ ॥

স্বাংশে কেবল পাপ সম্বন্ধে পরজাত ॥ ৪৩ ॥

কারকাংশে আত্মকারক নবাংশ রাশৌ কেবল পাপ সম্বন্ধে শুভগ্রহ দৃষ্টি যোগাদি রহিতে কেবলং পাপ ক্ষেত্রে পাপদৃষ্টে পাপযুক্তে চ সতি জাতকঃ পরজাতঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

কারক নবাংশ রাশি কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগাদি বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল মাত্র পাপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ পাপগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্তদৃষ্ট হইয়া পাপক্ষেত্রগত হইলে জাতক পরজাত বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ৪৩ ॥

নাত্র স্যাৎ পাপাৎ ॥ ৪৪ ॥

অত্র যোগে স্যাৎ আত্মকারকাৎ আত্মকারকশ্চেৎ পাপাৎ পাপো ভবতি তদাত্বিদং ফলং ন বাচ্যং। কারকাতিরিক্ত পাপ সম্বন্ধাৎ ইদং ফলং জ্ঞেয়ং ন পাপ কারকাৎ। তথাচ পারাশরীয়ে

কারকশ্চেদ্ ভবেৎ পাপো ন জ্ঞেয়ঃ পরজাতকঃ।
অন্যেষাং পাপখেটানাং যোগং ঘটত্ব মাপ্নুয়াৎ।
তথাচ রন্ধ্রভে পাপে নায়ং যোগো বিচিন্তয়েৎ ॥

কারক স্বয়ং পাপগ্রহ হইলে উক্ত ফল হইবে না। কারক নবাংশ রাশি, কারক ভিন্ন অপর পাপগ্রহসহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেই পর জাতকত্ব নির্ণেয় ॥ পরাশরী মতে উক্ত কারক নবাংশ রাশির অষ্টমে কোন পাপগ্রহ থাকিলে পরজাতত্ব দোষ চিন্তনীয় নহে ॥ ৪৪ ॥

শনি রাহুভ্যাং প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৫ ॥ গোপন মন্যেভ্যঃ ॥ ৪৬

শনি রাহুভ্যাং দৃষ্টি যোগাদিভি র্যদি শনিরাহূ যোগ ঘটকৌ ভবেতাং তদা পরজাতত্বং প্রসিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধমিতি জ্ঞাতব্যং। অন্যেভ্যঃ তদিতর পাপগ্রহেভ্যঃ গোপনং গুপ্তং ভবতি ॥ ৪৫।৪৬ ॥

উক্ত কারকাংশ রাশিতে শনি কিম্বা রাহুর দৃষ্টি যোগাদি কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিলে এই পরজাতত্ব দোষ, লোক প্রসিদ্ধ। তদিতর পাপগ্রহে গুপ্ত থাকে ॥ ৪৬ ॥

শুভবর্গেঽপবাদ মাত্রং ॥ ৪৭ ॥

কারকাংশ রাশৌ শুভবর্গে সতি পাপগ্রহ দৃগ্‌যোগেঽপি পরজাতত্বং ন স্যাৎ কিন্ত্বপবাদমাত্রং জ্ঞেয়ং ॥ ৪৭ ॥

পাপগ্রহের দৃষ্টি যোগাদি সত্ত্বেও কারকাংশ শুভবর্গস্থ হইলে পরজাতত্ব দোষ অপবাদ মাত্র চিন্তা করিবে। বাস্তবিক সে ব্যক্তি পরজাত নহে ॥ ৪৭ ॥

দ্বিগ্রহে কুলমুখ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

কারকাংশ রাশৌ দ্বিগ্রহে গ্রহদ্বয়েন যুক্তেঽথবা কুণ্ডলী মধ্যে যত্র তত্র দ্বিগ্রহে উচ্চে সতি জাতকঃ কুলমুখ্যো ভবতি ॥ ৪৮

আত্মকারক নবাংশ রাশিতে অন্ততঃ গ্রহদ্বয়ের যোগ থাকিলে অথবা যত্রতত্র গ্রহদ্বয় তুঙ্গী থাকিলে মনুষ্য কুলমুখ্য হয় ॥ ৪৮ ॥

ইতি উপদেশ সূত্রে সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমোধ্যায়ঃ।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেয়াস্তা রসাত্মিকাঃ ॥ ৫৪ ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধং সমাবিশৎ।
সংহতা গন্ধমাত্রেণ আবৃণ্বংস্তে মহীমিমাম্ ॥ ৫৫ ॥
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥ ৫৬ ॥
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
ভূমেরন্তস্ত্বিমং সর্ব্বং লোকালোকং ঘনাবৃতম্ ॥ ৫৭ ॥
বিশেষাশ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।
গুণং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্ ॥ ৫৮ ॥
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাঃ সপ্তৈতে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥ ৫৯ ॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগমন্যোন্যাশ্রয়িণশ্চ তে।
একসঙ্ঘাতচিহ্নাশ্চ সম্প্রাপ্যৈবমশেষতঃ ॥ ৬০ ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ যবে মিসে রস সনে
চারিগুণ যুক্ত জল জন্মে সেইক্ষণে। ৫৪।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধেতে পশিল;
সংহত হইয়া তাহে ক্ষিতি প্রকাশিল। ৫৫।
এই হেতু ভূমি হয় পঞ্চগুণ ময়;
ভূতগণ মাঝে স্থূল রূপে দৃষ্ট হয়।
শান্ত, ঘোর, মূঢ় আর, বিশেষ তাহার,
ক্ষিতি বিবরণ এই কহিলাম সার। ৫৬।
পরস্পর পরস্পরে প্রবেশ করিয়া,
পরস্পরে দৃঢ়রূপে রেখেছে ধরিয়া।
ঘনাবৃত সমুদায় লোকালোক চয়,
ভূমির অন্তরে আছে নিবিষ্ট নিশ্চয়। ৫৭।

নিয়তত্ব হেতু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়,
"বিশেষ" নামেতে তাই খ্যাত বিশ্বময়।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ যত আছে পর মাঝে,
এরূপে এ সব, এই ভব মাঝে রাজে। ৫৮।
নানা বীর্য্যযুক্ত এই সপ্ত তত্ত্ব হয়,
যখন পৃথক্ ভাবে না মিলিয়া রয়;
সেই কালে সৃজনের শক্তিহীন তা'রা,
মিলনেতে হয় সৃষ্টি জগতের ধারা। ৫৯।
পরস্পর মিলি' যবে পরস্পর সনে
অন্যের আশ্রয় একে হয় যেই ক্ষণে,
একত্র-সংঘাত-চিহ্ন করয়ে ধারণ
সেই ক্ষণে ঘটে কিবা অদ্ভুত ঘটন। ৬০।

পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥ ৬১॥
জলবুদ্বুদবৎ তত্র ক্রমাদ্বৈ বৃদ্ধিমাগতম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্॥ ৬২॥
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবৃদ্ধঃ সন্ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥ ৬৩॥
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৬৪।
মেরুস্তস্যানুসম্ভূতো জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ।
সমুদ্রা গর্ভসলিলং তস্যাণ্ডস্য মহাত্মনঃ॥ ৬৫॥
তস্মিন্নণ্ডে জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
দ্বীপাদ্যদ্রিসমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ॥ ৬৬॥
জলানিলানলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতমণ্ডং দশগুণৈরেকৈকত্বেন তৈঃ পুনঃ॥ ৬৭॥

পুরুষাধিষ্ঠিত সেই অব্যক্ত আশ্রয়
লাভ করি' হয় এরা কৃতার্থ নিশ্চয়।
মহদাদি বিশেষান্ত ক'রি' আবরণ
অণ্ডের উৎপত্তি হয় অতি সুশোভন। ৬১।
জলের বুদ্বুদ-সম ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
অতীব বৃহৎ তাহা সন্দেহ কি তা'য়।
ভূতসঙ্ঘ হ'তে তাহা বৃহৎ নিশ্চয়
প্রকট হইয়া তাহা জলে ভেসে রয়। ৬২।
সেই ত প্রাকৃত অণ্ডে ব্রহ্মা নাম যাঁ'র
ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ আদি, শরীর তাঁহার,
সেই অণ্ড মাঝে থাকি' ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
সহজে সে গূঢ় তত্ত্ব নাহি বোঝা যায়। ৬৩।
আদিকর্ত্তা সকল ভূতের যেই জন
ব্রহ্মা নাম অগ্রে তাঁ'র উৎপত্তি এমন।
তাঁহা হ'তে ব্যাপ্ত এই বিশ্ব চরাচর,
বিশেষে বুঝহ—স্থির করিয়া অন্তর। ৬৪।
মেরু সেই অণ্ড সনে হইল উদয়,
পর্ব্বত জরায়ু তা'র জানিহ নিশ্চয়।
গর্ভের সলিল হয় সমুদ্রনিচয়
মহাত্মা ব্রহ্মের অণ্ড অতি শোভাময়। ৬৫।
সেই অণ্ডে এ জগৎ রহে সমুদয়
দেবতা-অসুর-মানবাদি যাহে রয়।
দ্বীপচয়, অদ্রি আর সমুদ্রনিচয়
জ্যোতির্ম্ময় মনোহর যত লোকচয়। ৬৬।
জলানিল-অনল-আকাশ-আবরণ
পর-পর দশগুণ সবার গণন। ৬৭।

মহতা তৎ প্রমাণেন সহৈবানেন বেষ্টিতঃ।
মহান্তৈস্তৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈরব্যক্তেন সমাবৃতঃ ॥ ৬৮ ॥
এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।
অন্যোন্যমাবৃত্য চ তা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৬৯ ॥
এষা সা প্রকৃতির্নিত্যা তদন্তঃ পুরুষশ্চ সঃ।
ব্রহ্মাখ্যঃ কথিতো যস্তে সমাসাচ্ছ্রূয়তাং পুনঃ ॥ ৭০ ॥
যথা মগ্নো জলে কশ্চিদুন্মজ্জন্ জলসম্ভবম্।
বলয়ং ক্ষিপতি ব্রহ্মা স তথা প্রকৃতির্বিভুঃ ॥ ৭১ ॥
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
এতৎ সমস্তং জানীয়াৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণম্। ৭২ ॥
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রাদুর্ভূতস্তড়িদ্‌যথা ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়ক্রৌষ্টুকিসংবাদে
ব্রহ্মোৎপত্তির্নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সবার সমান মহতের পরিমাণ
সেই আবরণ পরে, শুন মতিমান।
তা'র পরে হয় অব্যক্তের আবরণ,
যাহা সমুদায় ঢাকি' রহে সর্ব্বক্ষণ। ৬৮।
এই ত প্রাকৃত সপ্ত-মহা আবরণে,—
ঢাকা সেই মহা-অণ্ড আছে প্রতিক্ষণে।
অন্যোন্যে আবৃত করি' এই অষ্ট জন,
প্রকৃতি আছেন সদা, শুন দিয়া মন। ৬৯।
এই সে প্রকৃতি নিত্যা ব্রহ্ম সনাতনী,
পুরুষ তাঁহাতে মিশি' আছেন আপনি।
ব্রহ্মা বলি' আখ্যা যাঁ'র বলিনু তোমায়
সংক্ষেপে তাঁহার তত্ত্ব শুনিতে জুয়ায়।
এবে সেই কথা আমি করিব বর্ণন,
অবহিত হ'য়ে তাহা করহ শ্রবণ। ৭০।
জলে মগ্ন হ'য়ে কেহ উঠে যেইক্ষণ,
বলয়-আকারে হয় তরঙ্গ তখন।
প্রকৃতির বিভু ব্রহ্মা হইলে উদয়,
এই সব আবরণ তরঙ্গিত হয়। ৭১।
অব্যক্তা প্রকৃতি ক্ষেত্র, ব্রহ্মাই তাহায়
ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও এই কহিনু তোমায়।
এই সব ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ
অতি গূঢ় তত্ত্ব ইহা রাখিও স্মরণ। ৭২।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত সৃষ্টি প্রাকৃত এ হয়
তড়িতের মত হ'লো প্রথমে উদয়। ৭৩।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়-পুরাণে, মার্কণ্ডেয়-ক্রৌষ্টুকিসংবাদান্তর্গত
ব্রহ্মোৎপত্তি নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

ভগবংস্ত্বণ্ডসম্ভূতির্যথাবৎ কথিতা মম।
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মণো জন্ম তথা চোক্তং মহাত্মনঃ॥ ১॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তো ভৃগুকুলোদ্ভব।
যদা ন সৃষ্টির্ভূতানামস্তি কিং নু ন চাস্তি বা।
কালে বৈ প্রলয়স্যান্তে সর্ব্বস্মিন্নুপসংহৃতে॥ ২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥ ৩॥
স্বাত্মন্যবস্থিতেঽব্যক্তে বিকারে প্রতিসংহৃতে।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব সাধর্ম্ম্যেণাবতিষ্ঠতঃ॥ ৪॥

ক্রৌষ্টুকি বলেন মুনি "কি আশ্চর্য্য কথা শুনি
অণ্ডের উৎপত্তি মনোহর,
বলিলে যতনে মোরে তারিলে অজ্ঞান ঘোরে
শুনি নাই এমন সুন্দর।
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার জন্ম বুঝিনু তাহার মর্ম্ম
হৃদয়ে রহিল গাঁথা মোর,
তোমার মধুর কথা ঘুচায় অন্তর-ব্যথা
ঘুচে গেচে অজ্ঞানের ঘোর। ১।
এবে ইচ্ছা শুনিবার যাহা অন্তরে আমার
বিস্তারি' নিবেদি' তব পায়,
সৃষ্টি না ছিল যে কালে, ভূতগণ সেই কালে
ছিল কি না? বলহ আমায়।
প্রলয় হইল যবে সবি নষ্ট হলো তবে
কিছু কি, না ছিল সে সময়?
ভূতের উদ্ভব তবে বল না কেমনে হ'বে?
বিস্তারিয়া বল সমুদয়। ২।"

বলিলেন মার্কণ্ডেয়—"শুন তপোধন,
যেই কালে বিশ্ব হয় প্রলয়ে মগন,
প্রকৃতিতে মিলে গেলে এই সমুদয়
প্রাকৃত-প্রলয় তা'রে সাধুজন কয়। ৩।
অব্যক্তা প্রকৃতি রহে আত্মাতে মিলিয়া
সমস্ত পদার্থ রহে তদঙ্গে মিশিয়া।
পুরুষ প্রকৃতি তবে সাধর্ম্ম্য আশ্রয়ে
অনন্তের কোলে রহে অপ্রকট হ'য়ে। ৪।

তদাতমশ্চ সত্ত্বঞ্চ সমত্বেন গুণৌ স্থিতৌ।
অনুদ্রিক্তাবন্যূনৌ চ ওতঃপ্রোতৌ পরস্পরম্ ॥ ৫ ॥
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতঃ পয়সি বা স্থিতম্।
তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোঽপ্যনুসৃতং স্থিতম্ ॥ ৬
উৎপত্তির্ব্রহ্মণো যাবদায়ুর্বৈ দ্বিপরার্দ্ধিকম্।
তাবদ্দিনং পরেশস্য তৎসমা সংযমে নিশা ॥ ৭ ॥
অষ্টৌ যুগসহস্রাণি অহোরাত্রং প্রজাপতেঃ।
অনেনৈব তু মানেন শতং ব্রহ্মা স জীবতি ॥ ৮ ॥
পিতামহশতেনৈব বিষ্ণোর্মানং বিধীয়তে।
নিমেষার্দ্ধেন শম্ভোস্তু সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
বিনশ্যন্তি তথা বিষ্ণোরসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ ৯
অহর্ম্মুখে প্রবৃদ্ধস্তু জগদাদিরনাদিমান্।
সর্ব্বহেতুরচিন্ত্যাত্মা পরঃ কোঽপ্যপরক্রিয়ঃ। ১০
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাশু জগৎপতিঃ।
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥
যথা মদো নবস্ত্রাণাং যথা বা মাধবানিলঃ।
অনুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভায় তথাসৌ যোগমূর্ত্তিমান্ ॥ ১২

সত্ত্ব আর তমঃ দোঁহে সাম্য ভাবে রয়,
পরস্পরে মিশি' বৃদ্ধি হ্রাস নাহি হয়। ৫।
তিলে যেই মত তৈল, ঘৃত দুগ্ধে যথা,
সত্ত্ব তমে রজোগুণ মিশে থাকে তথা। ৬।
ব্রহ্মার আয়ু যে জানি দ্বি-পরার্দ্ধ-কাল,
দিন যেই মত, সেই মত নিশাকাল। ৭।
দিবারাত্র মহাযুগ সে অষ্ট হাজার,
সেই মানে শতবর্ষ পরমায়ু তাঁ'র। ৮।
ব্রাহ্মমান শতগুণে বিষ্ণু-পরিমাণ,
এই ত অপূর্ব্ব তত্ত্ব শুন মতিমান।
শিবের নিমেষ অর্দ্ধে সে চৌদ্দ হাজার
ব্রহ্মার উদয় নাশ কহিলাম সার।
বিষ্ণুর নিমেষ অর্দ্ধে অসংখ্য ব্রহ্মার
উদয় বিলয় হয় সঙ্খ্য নাহি তা'র। ৯।
দিবার আগমে জগদাদি সনাতন,
সর্ব্বহেতু অচিন্ত্যাত্মা জাগেন যখন, ১০।
জগৎপতি পুরুষ পশিয়া প্রকৃতিতে,
পরম যোগেতে ক্ষোভ জন্মাইলে তাঁ'তে, ১১।
যথা মদগর্ব্বে কিম্বা বসন্ত অনিলে,
যুবতীর অন্তরে বিক্ষোভ আসি মিলে,
সেই মত যোগ-মূর্ত্তি-পরশ পাইয়া
ক্ষুব্ধ হন প্রকৃতি, জানিহ বিশেষিয়া। ১২।

প্রধানে ক্ষোভ্যমাণে তু স দেবো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ।
সমুৎপন্নোঽণ্ডকোষস্থো যথা তে কথিতং ময়া ॥ ১৩ ॥
স এব ক্ষোভকঃ পূর্ব্বং সংক্ষোভ্যঃ প্রকৃতেঃ পতিঃ ।
সসঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি সংস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
উৎপন্নঃ স জগদ্‌যোনিরগুণোঽপি রজোগুণম্ ।
ভুঞ্জন্ প্রবর্ত্ততে সর্গে ব্রহ্মত্বং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মত্বে স প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ততঃ সত্ত্বাতিরেকবান্ ।
বিষ্ণুত্বমেত্য ধর্ম্মেণ কুরুতে পরিপালনম্ ॥ ১৬ ॥
ততস্তমোগুণোদ্রিক্তো রুদ্রত্বে চাখিলং জগৎ ।
উপসংহৃত্য বৈ শেতে ত্রৈলোক্যং ত্রিগুণোঽগুণঃ ॥ ১৭
যথা প্রাগ্‌ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা ।
তথা স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশকারিণী ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি ।
বিষ্ণুত্বে বাপ্যুদাসীনস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুব ১৯

সেই ক্ষোভে ব্রহ্মা তবে হ'য়েন উদয়
অণ্ডমধ্যে, শুনিয়াছ সেই সমুদয় । ১৩ ।
প্রকৃতিরে বিক্ষোভিত করি' নিজে পরে,
বিক্ষোভিত হন দেব আপন অন্তরে ।
এই রূপে সঙ্কোচ বিকাশ সদা হয়,
তাহাতে "প্রধান" সদা প্রকাশিত রয় । ১৪ ।
জগতের যোনি সে অগুণ সনাতন
উৎপন্ন হইয়া রজোগুণ যুক্ত হন ।
ব্রহ্মা নাম ধরি' রত হন সৃষ্টি কাজে
স্রষ্টা নাম তাই তাঁ'র দেবের সমাজে । ১৫ ।
ব্রহ্মা হ'য়ে করি' তিনি প্রজার সর্জন,
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু হ'য়ে করেন পালন । ১৬ ।
তমোগুণে রুদ্র রূপে অখিল সংহারি,
ত্রিগুণে অগুণ হ'য়ে রহে ত্রিপুরারি । ১৭ ।
প্রধানে ব্যাপক পরে সৃজন পালন,
নিধনার্থে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপী হন । ১৮ ।
ব্রহ্মা হ'য়ে সর্ব্বলোক করেন সৃজন,
রুদ্র হ'য়ে লোকচয় করেন নিধন,
বিষ্ণুরূপ ধরি' সদা উদাসীন র'য়ে
পালন করেন বিশ্ব শান্তমূর্ত্তি হ'য়ে ।
এ তিন অবস্থা তাঁ'র জানিহ নিশ্চয়,
তিনে এক একে তিন কভু মিথ্যা নয় । ১৯

রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বং জগৎপতিঃ।
এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ২০ ॥
অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্ ॥ ২১ ॥
এবং ব্রহ্মা জগৎপূর্ব্বো দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
রজোগুণং সমাশ্রিত্য স্রষ্টৃত্বে স ব্যবস্থিতঃ ॥ ২২ ॥
হিরণ্যগর্ভো দেবাদিরনাদিরুপচারতঃ।
ভূপদ্মকর্ণিকাসংস্থো ব্রহ্মাগ্রে সমজায়ত ॥ ২৩ ॥
তস্য বর্ষশতং ত্বেকং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মেণৈব হি মানেন তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥ ২৪ ॥
নিমেষৈর্দ্দশভিঃ কাষ্ঠা তথা পঞ্চভিরুচ্যতে।
কলাস্ত্রিংশচ্চ বৈ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তং ত্রিংশতিঃ কলাঃ ॥ ২৫
অহোরাত্রং মুহূর্ত্তানাং নৃণাং ত্রিংশৎ তু বৈ স্মৃতম্।
অহোরাত্রৈশ্চ ত্রিংশদ্ভিঃ পক্ষৌ দ্বৌ মাস উচ্যতে ॥ ২

রজোগুণে ব্রহ্মা তমোগুণে রুদ্র হয়
সত্ত্বে বিষ্ণু জগৎপতি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
এই তিন, তিন দেব, তিন গুণ আর
বিশেষিয়া বলিলাম গুণ-অবতার। ২০।
অন্যোন্যে মিলিত হ'য়ে অন্যোন্য আশ্রয়ে,
একত্রে আছেন সদা জগৎ ভিতরে। ২১।
এরূপে জগত-আদি সে চতুরানন,
রজোগুণাশ্রয়ে করে জগৎ সৃজন। ২২।
তিনি সে হিরণ্যগর্ভ দেবাদির আদি,
তাই তাঁরে সুধীগণ বলেন অনাদি।
ভূ পদ্ম কর্ণিকা তিনি করিয়া আশ্রয়,
আবির্ভূত হইলেন পূর্ব্বে কৃপাময়। ২৩।
শতবর্ষ এক শত পরমায়ু তাঁ'র
ব্রাহ্ম মানে এ সংখ্যা কহিলাম সার।
কাল পরিমাণ বিধি বলিব এখন
এক মন হ'য়ে, বৎস, করহ শ্রবণ। ১৪।
পঞ্চদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়;
ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা জানিহ নিশ্চয়;
ত্রিংশৎ কলায় হয় মুহূর্ত্ত গণন;
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে অহোরাত্র-নিরূপণ;
অহোরাত্র ত্রিংশতেতে দুই পক্ষ হয়,
এক মাস তাহি নাম জানিহ নিশ্চয়। ২৫-২৬।

তৈঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে।
তদ্দেবানামহোরাত্রং দিনং তত্রোত্তরায়ণম্ ॥ ২৭ ॥
দিব্যৈ বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং শৃণুষ্ব মে ॥ ২৮ ॥
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কৃতমুচ্যতে।
শতানি সন্ধ্যা চত্বারি সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ২৯ ॥
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি দিব্যাব্দানাং শতত্রয়ম্।
তৎসন্ধ্যা তৎসমা চৈব সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৩০ ॥
দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং দ্বে শতে তথা।
তস্য সন্ধ্যা সমাখ্যাতা দ্বে শতাব্দে তথাংশকঃ ॥ ৩১ ॥
কলিঃ সহস্রং দিব্যানামব্দানাং দ্বিজসত্তম।
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশকশ্চৈব শতকৌ সমুদাহৃতৌ ॥ ৩২ ॥
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা কবিভিঃ কৃতা।
এতৎ সহস্রগুণিতমহর্ব্রাহ্মমুদাহৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
ভবন্তি ভাগশস্তেষাং সহস্রং তদ্বিভজ্যতে ॥ ৩৪ ॥

ছয় মাসে অয়ন, বৎসর দু' অয়নে,
উত্তর, দক্ষিণ দুই জানে সর্ব্বজনে।
তা'হে দেবতার সদা অহোরাত্র হয়,
উত্তর অয়ন দিন জানিহ নিশ্চয়। ২৭।
দিব্য বার হাজার বৎসরে যুগ চারি
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, সে কলি নাম-ধারী
চতুর্যুগ ভাগ এবে বলিব তোমায়
মন দিয়া শুন, বৎস, এই সমুদায়। ২৮।
সত্যযুগ হয় বর্ষ চারিটি হাজার,
চারি শত সন্ধ্যা তথা সন্ধ্যাংশ তাহার। ২৯।
ত্রেতা পরিমাণ দিব্য তিনটি হাজার ;
তিন শত সন্ধ্যা তথা সন্ধ্যাংশ তাহার। ৩০।
দ্বাপরের পরিমাণ দুইটি হাজার ;
দুই শত সন্ধ্যা তথা সন্ধ্যাংশ তাহার। ৩১।
কলিযুগ পরিমাণ কেবল হাজার,
এক শত সন্ধ্যা তথা সন্ধ্যাংশ তাহার। ৩২।
দ্বাদশ সহস্র বর্ষে মহাযুগ হয়,
ইহার সহস্র, ব্রাহ্ম দিবা সুনিশ্চয়। ৩৩।
ব্রাহ্ম দিনে চতুর্দ্দশ মনুর উদয়
বিভাগ সহস্র তাহে আছে সুনিশ্চয়। ৩৪।